সচিত্র ছোটদের

টারজন সমগ্র

এডগার রাইস বারুজ
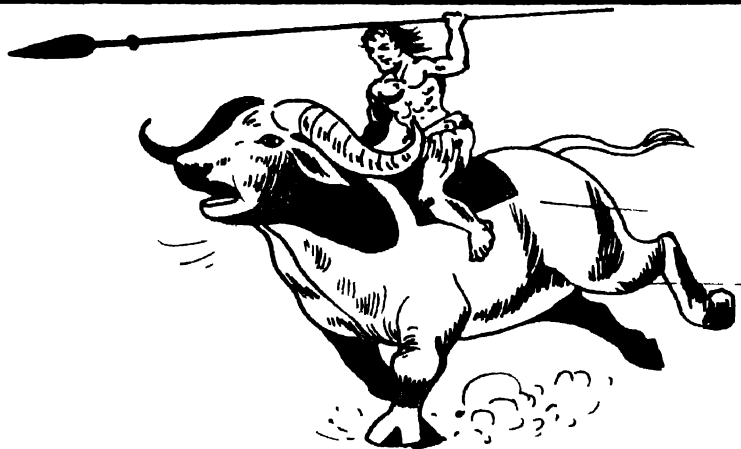
ভাষান্তর : মণীন্দ্র দত্ত
সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

প্রচ্ছদ : কুমার অজিত

অলঙ্করণ : নৃপেন দে

সূচীপত্র

উপনিবেশসংক্রান্ত সরকারী নথিপত্র ও এক মৃত লোকের ডায়েরী থেকে আমরা জানতে পারি যে লর্ড গ্রেস্টোক বা জন ক্লেটন নামে জনৈক ইংরেজ সামন্তকে একবার আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী এক বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলে এক জটিল অনুসন্ধানকার্যের জন্য পাঠানো হয়।

আফ্রিকার ইংরেজ বাসিন্দারা প্রায়ই বলাবলি করত সেই ইউরোপীয় জাতির লোকেরা বৃটিশ উপনিবেশ থেকে সেখানকার আদিম অধিবাসীদের ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস করে রাখে।

এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্যই বৃটিশ উপনিবেশ দপ্তর বৃটিশ-অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকায় এক নতুন পদ সৃষ্টি করে সেই পদে জন ক্লেটনকে নিযুক্ত করে। তবে তাকে গোপনে এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে সে যেন কোন এক ইউরোপীয় মিত্রশক্তি পশ্চিম আফ্রিকার কৃষ্ণকায় বৃটিশ প্রজাদের উপর যে অত্যাচার করছে তার এক পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে।

নিয়োগপত্র পেয়েই একই সঙ্গে আনন্দিত আর দুঃখে অভিভূত হয়ে উঠল ক্লেটন। কিন্তু অন্য দিকে একাজের কথা ভেবে ভয় পেয়ে গেল সে, কারণ মাত্র তিন মাস হলো সে সুন্দরী তরুণী এ্যালিস রাদারফোর্ডকে বিয়ে করেছে। এই সুন্দরী তরুণী স্ত্রীকে আফ্রিকার নির্জন প্রদেশে নিয়ে যেতে হবে ভেবে সত্যিই ভয় পেয়ে গেল সে।

এ্যালিসের খাতিরে সে একাজের দায়িত্বভার প্রত্যাখ্যান করে নিয়োগপত্র বাতিল করে দিতে পারত। কিন্তু এ্যালিসই জেদ ধরল, একাজের ভার নিয়ে তাকে বিদেশে যেতেই হবে এবং তাকেও তার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

১৮৮৮ সালের মে মাসের কোন এক উজ্জ্বল সকালে জন ক্লেটন বা লর্ড গ্রেস্টোক লেডী এ্যালিসকে সঙ্গে নিয়ে ডোভার থেকে আফ্রিকার পথে রওনা হয়।

একমাস পর তারা পৌঁছল ফ্রীটাউনে। সেখানে তারা ফুবালদা নামে জাহাজে চাপে। এই জাহাজই তাদের নিয়ে যাবে তাদের গন্তব্যস্থানে। কিন্তু গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার আগেই তাদের যাত্রাপথে এই জাহাজ থেকে লর্ড গ্রেস্টোক ও লেডী এ্যালিস কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় চিরদিনের মত তা পৃথিবীর কেউ কোনদিন জানতে পারেনি।

ফ্রীটাউন থেকে ক্লেটনরা যাত্রা করার ছমাস পর তাদের সেই ছোট্ট জাহাজটার খোঁজে ছুটে বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ দক্ষিণ আতলান্তিকের সমগ্র অঞ্চলটা চষে বেড়ায়। কিন্তু অনুসন্ধানকার্য শুরু করার কিছু পরেই সেন্ট হেলেনা দ্বীপের উপকূলে একটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। ফলে সেখানেই অনুসন্ধানের ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটে। ধরে নেওয়া হল ফুবালদা নামে সেই ছোট্ট জাহাজটা তার সমস্ত যাত্রী ও নাবিকসহ ঢেউ-এর আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ডুবে যায় সমুদ্রগর্ভে।

ওদিকে ফুবালদা জাহাজের বিদ্রোহী নাবিকরা জাহাজের অফিসারদের সব মেরে ফেলার পর তারা পথে জঙ্গলাকীর্ণ একটা ভূখণ্ডে নামিয়ে দিয়ে যায় ক্লেটন আর তার স্ত্রীকে।

ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিপদ আর তার মাঝে তাদের অসহায়তার কথা ভেবে ভয়ে শিউরে উঠল ক্লেটন। তবু ঐ বিশাল বনভূমির অন্ধকার গভীরে যে দুর্ভাগ্য তাদের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে ঈশ্বরের অনুগ্রহে তা সে দেখতে পেল না ঠিকমত। ফলে ভাগ্যের উপর আত্মসমর্পণ করে চুপ করে রইল।

পরদিন সকালে জাহাজ থেকে একটা ছোট নৌকোয় ক্লেটনদের সব মালপত্র নামিয়ে দেওয়া হলো। মাইকেল নিজে তদারক করতে লাগল, ক্লেটনদের কোন জিনিস যেন জাহাজে না থাকে।

উপকূলে ওদের নামিয়ে দিয়ে নদী থেকে বেশ কিছু পানীয় জল ভরে নিয়ে নৌকো নিয়ে আবার জাহাজে ফিরে এল।

মাইকেলদের নৌকোগুলো যখন উপসাগরের শান্ত জলের উপর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ফুবালদার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তাদের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ক্লেটন আর তার স্ত্রী। আসন্ন বিপদ আর নিবিড় হতাশার অনুভূতিতে তোলপাড় হতে লাগল তাদের বুকদুটো। দেখতে দেখতে ফুবালদা জাহাজটাও যখন ধীরে ধীরে চোখের আড়াল হয়ে দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল তখন এ্যালিস ক্লেটনের গলাটা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। অবরুদ্ধ আবেগ আর চেপে রাখতে পারল না বুকের মধ্যে।

অবশেষে সে তার স্বামীকে বলল, ও জন, কী ভয়ঙ্কর কথা! এখন আমরা কি করব?

কাজ। এখন আমাদের একমাত্র উচিত কাজ করা, এখন কাজই আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায়। বেশী চিন্তা করলে আবার পাগল হয়ে যেতে হবে।

ক্লেটনের প্রথম চিন্তা হলো রাত কাটাবার মত এমন একটা আশ্রয় বা আস্তানা গড়ে তুলতে হবে যেটা হবে বন্য জন্তুর নাগালের বাইরে।

যাই হোক, বাক্স খুলে আগে রাইফেল দুটো ও কিছু গুলি বার করল ক্লেটন যাতে আকস্মিক কোন আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করতে পারে তারা। তারপর দুজনে মিলে রাত্রির আস্তানা গড়ে তোলার জন্য জায়গা দেখতে লাগল।

সমুদ্রের বেলাভূমি থেকে একশো গজ দূরে একটুখানি ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল ওরা। ওরা ঠিক করল ঐখানে একটা ঘর তৈরী করবে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য। কিন্তু তার আগে রাত্রিবাসের জন্য একটা আশ্রয় চাই।

গাছের উপর একটা মাচা তৈরী করার জন্য চারটে বড় গাছ বেছে নিল ক্লেটন। মাটি থেকে দশ ফুট উঁচুতে চারটে গাছের উপর আয়তক্ষেত্রাকার এমন একটা মাচা তৈরী করল সে যেটাকে লাফ দিয়েও ধরতে পারবে না কোন জন্তু।

কুড়ুল দিয়ে গাছের ডাল কেটে আর জাহাজ থেকে আনা মোটা দড়ি দিয়ে মাচা তৈরীর কাজ তখনি শুরু করে দিল ক্লেটন। চারটে মোটা ডালের ঘেরা দিয়ে ছোট ছোট ডাল দিয়ে পাটাতন তৈরী করল মাচার উপর। সেই পাটাতনের উপর ঢালা ঢালা

অনেক পাতা বিছিয়ে দিয়ে বিছানার মত নরম করল। মাথার উপরেও অনুরূপভাবে একটা ছাউনি তৈরী করল ক্লেটন। তারপর পালের মোটা কাপড় দিয়ে মাচাটার চারদিক ঘিরে দিল। সবশেষে এ্যালিসের ওঠা-নামার জন্য একটা মই তৈরী করল।

সন্ধ্যা হবার কিছু আগেই ওদের কম্বল ও বিছানা আর কিছু হালকা জিনিসপত্র মাচার উপর তুলে ফেলল ক্লেটন। তারপর দুজনে উঠে পড়ল মাচার উপর।

সারাদিনের মধ্যে ওরা শুধু নানা জাতের অসংখ্য পাখি ছাড়া আর কোন বড় জন্তু জানোয়ার দেখতে পায়নি। পাখি ছাড়া কিছু বাঁদর দেখেছে। পাখি আর বাঁদরের কিচিমিচি ছাড়া আর কোন জন্তুর ডাক শুনতে পায়নি।

ওরা মাচার উপর বিছানা পেতে বসল। তখন গরম ছিল বলে ক্লেটন পালের কাপড়গুলো ছাদের উপর তুলে দিল। তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল।

সহসা ক্লেটনের একটা হাত জড়িয়ে ধরে এ্যালিস বলল, দেখ দেখ ওটা কি মানুষ ?

অন্ধকারে ভাল দেখা না গেলেও ক্লেটন দেখল সমুদ্রের ধারে উঁচু জায়গাটার উপর বিরাটকায় একটা মানুষের মূর্তি দাঁড়িয়ে যেন কি শুনছে তাদের পানে তাকিয়ে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর পিছন ফিরে চলে গেল মূর্তিটা।

ক্লেটন গম্ভীরভাবে বলল, অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারছি না।

এ্যালিস বলল, না জন, ওটা মানুষ নয়, কিম্ভূতকিমাকার এক জন্তু। আমার কিন্তু ভয় পাচ্ছে।

এ্যালিসের কানে কানে অনেক সাহস আর ভালবাসার কথা বলে তাকে শান্ত করল ক্লেটন। তারপর দুজনে শুয়ে পড়ল।

যাই হোক, তার হাতের কাছে একটা রাইফেল আর একটা রিভলবার রেখে দিল ক্লেটন।

ঘুমে তাদের চোখদুটো সবেমাত্র জড়িয়ে এসেছে এমন সময় একটা বিরাট সিংহের ডাক শুনতে পেল ওরা। সিংহটা ক্রমশই এগিয়ে এসে ওদের মাচার তলায় দাঁড়িয়ে গাছের উপর আঁচড় কাটতে লাগল। একঘণ্টা ধরে সিংহটা সেখানে থাকার পর চলে গেল। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় ক্লেটন দেখল একটা বিরাট জন্তু ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে।

সেরাতে ভাল ঘুম হলো না ওদের।
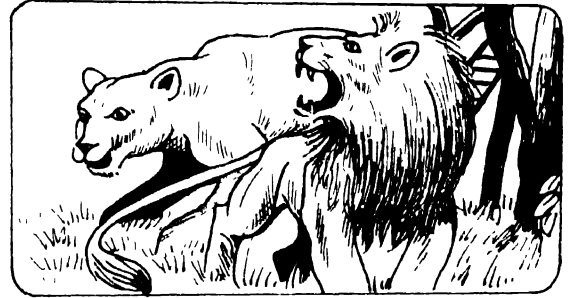
সকাল হতেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ওরা। রাতটা নিরাপদে কাটিয়ে ওরা বেশকিছুটা স্বস্তি অনুভব করল।

কোনরকমে প্রাতরাশটা সেরে নিয়েই ঘর তৈরীর কাজে মন দিল ক্লেটন।

কাজটা খুবই কঠিন এবং এ কাজ শেষ করতে কিছু কম একটা গোটা মাসই লেগে গেল। একমাসের চেষ্টায় মাত্র একটা ছোট ঘর তৈরী করল ক্লেটন। মোটা মোটা কাঠের গোটাকতক খুঁটি দিয়ে ঘরটাকে দাঁড় করিয়ে সরু কাঠের ছিটে-বেড়া দিয়ে দিল। তার উপর কাদা-মাটি লাগিয়ে দিল পুরু করে। ঘরের একপাশে ঘাট থেকে কতকগুলো নুড়ি পাথর এনে উনোন তৈরী করল একটা। সরু সরু শক্ত কাঠ দিয়ে ঘরটার মধ্যে একটামাত্র জানালা করল

ক্লেটন যাতে কোন জন্তু চাপ দিলেও তা ভেঙ্গে না যায়। কাঠের ফাঁক দিয়ে হাওয়া বইবে, আলো আসবে, অথচ তাদের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবে না কোনভাবে।

কেবিনটা দেখতে হলো ঠিক ইংরাজি 'এ' অক্ষরের মত। ঘরের ছাদটা লম্বা লম্বা বুনো ঘাস আর তাল-পাতা দিয়ে ছাইয়ে নিয়ে উপরে আবার কাদামাটি দিয়ে লেপে দিল। প্যাকিং বাক্সের কাঠগুলোকে একটার পর একটা রেখে পেরেক পিটিয়ে ছুটো দরজার কপাট তৈরী করল ক্লেটন। দরজাটা এমন ভারী আর মজবুত হলো যে সে একা সেটা তুলে বসাতে পারছিল না। ঘরের ছাদটা তৈরী হয়ে যেতেই বাক্স পেটরা চেয়ার টেবিল সব ঘরের মধ্যে গুছিয়ে রাখল ওরা।

দ্বিতীয় মাসের শেষের দিকে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধল ওরা ওদের নতুন কেবিনটায়। বন্য জন্তুদের আক্রমণের ক্রমাগত আশঙ্কা আর ভয়ঙ্কর অন্তহীন নির্জনতা ছাড়া ওদের মনোকষ্টের আর কোন কারণ ছিল না।

এমন কি ওদের চারপাশে সারাদিন ধরে যেসব পাখি আর বাঁদর দেখত তারা, ওদের সঙ্গে যেন পরিচিত হয়ে উঠছিল। ওদের কাছে আসতে আর ভয় পেত না তারা।

সেদিন বিকেলবেলায় ক্লেটন তাদের কেবিনটার পাশে আর একটা ঘর তৈরী করার জন্য কাজ করছিল। তার ইচ্ছা ছিল পাশাপাশি আরও কয়েকটা ঘর সে তৈরী করবে। হঠাৎ এক ঝাঁক পাখি আর বাঁদর উঁচু ঢিবিটা থেকে ছুটে এসে ক্লেটনদের চারপাশে ভিড় করে কিচমিচ করতে লাগল জোরে।

ওদের চেঁচামেচিতে মুখ তুলে তাকাল ক্লেটন। এতক্ষণে যাকে ছোট ছোট বাঁদরগুলো সবচেয়ে বেশী ভয় করে সেই বিরাটকায় মানবাকৃতি জীবটাকে স্বচক্ষে ভাল করে দেখল ক্লেটন। দেখল সেটা ডালপালা ভেঙ্গে গর্জন করতে করতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

ক্লেটন তখন তার কেবিন থেকে একটু দূরে একটা গাছ কাটছিল। প্রায় তুমাস যাবৎ এখানে আসার পর থেকে কোন বিপদের মুখে না পড়ায় আত্মরক্ষার সম্বন্ধে ক্রমশই উদাসীন হয়ে উঠেছিল ক্লেটন। তার রাইফেল ও রিভলবার সব কেবিনের ভিতর রেখে দিয়েছিল। তাই যখন দেখল জানোয়ারটা এমনভাবে দ্রুত তার দিকে আসছে যে ছুটে গিয়ে কেবিন থেকে অস্ত্র আনা সম্ভব হবে না তখন চরম ভয়ের একটা শিহরণ খেলে গেল ওর সর্বাঙ্গে।

ক্লেটন দেখল তার হাতে একটা কুড়ুল ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই এবং সামান্য এই অস্ত্র দিয়ে রাক্ষসের মত এই বিরাট জন্তুটার সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়।

তবু একবার চেষ্টা করে দেখল ক্লেটন। সে উর্ধ্বশ্বাসে কেবিনের দিকে ছুটতে লাগল। চীৎকার করে এ্যালিসকে সাবধান করে দিল।

কেবিন থেকে একটু দূরে তখন বসেছিল এ্যালিস। ক্লেটনের চীৎকারে সে মুখ ফিরিয়ে দেখল বনমানুষের মত একটা বিরাট জন্তু তার স্বামীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এগিয়ে আসছে জোর গতিতে। তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে কেবিনের মধ্যে ছুটে গিয়ে ঢুকে গেল সে। যাবার সময় পিছন ফিরে তাকিয়ে একবার দেখল তার স্বামী তার হাতের কুড়ুলটা দিয়ে সেই ভয়ঙ্কর বিরাটকায় জন্তুটার সঙ্গে লড়াই করছে।

ক্লেটন একবার চীৎকার করে বলল, কেবিনের দরজাটা বন্ধ করে ভিতরে থাক এ্যালিস। আমি এই কুড়ুল দিয়েই একে শেষ করে ফেলব।

সেই বিরাট পুরুষ বাঁদর-গোরিলাটার ওজন হবে প্রায় তিনশো পাউণ্ড। তার চোখগুলো ঘৃণায় ও হিংসায় জ্বলছিল। তার বড় বড় দাঁতগুলো বার করে হাঁ করে গর্জন করছিল ক্লেটনের সামনে।

ক্লেটন দেখল সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে তার কেবিনটা মাত্র কুড়ি পা দূরে। সে যখন দেখল কেবিন থেকে তার স্ত্রী হাতে একটা রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে আসছে তখন এক ভয়ের শিহরণ খেলে গেল তার সর্বাঙ্গে।
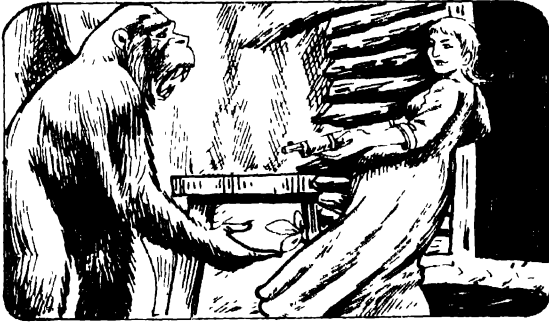
সাধারণতঃ আগ্নেয়াস্ত্রকে ভয় করে চলত এবং কখনো ছুঁত না জেন। কিন্তু আজ সে স্বামীকে বিপদাপন্ন দেখে শাবকবৎসলা এক সিংহীর মত নির্ভীকতার সঙ্গে ছুটে এল বাঁদর-গোরিলার দিকে।

ক্লেটন চীৎকার করে উঠল, ফিরে যাও এ্যালিস। ঈশ্বরের নামে বলছি।

কিন্তু এ্যালিস গেল না। বাঁদরটা এবার ক্লেটনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্লেটনও তার কুড়ুলটা দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘোরাতে লাগল তার চারদিকে। কিন্তু জন্তুটা তার বলিষ্ঠ বিরাট হাতদুটো দিয়ে কুড়ুলটা ধরে ক্লেটনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিল সেটা একধারে।

এবার এক বিকট চীৎকার করে বাঁদরটা যেমনি ক্লেটনের গলাটা দুহাত দিয়ে ধরতে গেল অমনি এ্যালিসের রাইফেল থেকে বেরিয়ে আসা একটা গুলি বাঁদর-গোরিলার পিঠটাকে বিদ্ধ করল।

সঙ্গে সঙ্গে ক্লেটনকে ছেড়ে দিয়ে জন্তুটা তার নতুন শত্রু এ্যালিসের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু রাইফেলটাতে আর গুলি না থাকায় চেষ্টা করেও আর গুলি করতে পারল না সে। জন্তুটা এবার হাত বাড়িয়ে ধরতেই তার সামনে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল এ্যালিস। সঙ্গে সঙ্গে জন্তুটাও তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ক্লেটন তখন তার স্ত্রীর অচেতন দেহটা থেকে সরিয়ে দেবার জন্য জন্তুটাকে পিছন থেকে টানতে লাগল।

একটু টানতেই জন্তুটা টলতে টলতে পড়ে গেল। তার পিঠে লাগা বুলেটের ক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হলো এতক্ষণে।

ক্লেটন তার স্ত্রীর দেহটা তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করে দেখল দেহের উপর কোন ক্ষতচিহ্ন নেই। সে বুঝল

জানোয়ারটা এ্যালিসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়।

ধীরে ধীরে এ্যালিসের অচেতন দেহটা তুলে ধরল ক্লেটন। কেবিনের মধ্যে নিয়ে গেল। কিন্তু পুরো দুঘন্টার আগে জ্ঞান ফিরল না এ্যালিসের।

কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর এ্যালিস প্রথমে যা বলল তা শুনে ভয় পেয়ে গেল ক্লেটন। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ্যালিস কেবিনটার চারদিকে তাকাল পরম বিস্ময়ের সঙ্গে। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, ও জন, সত্যি সত্যি ঘরে থাকাটা কত আরামদায়ক! আমি একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

ক্লেটন তার স্ত্রীর কপালে হাত বুলিয়ে বলল, ঠিক আছে। ঘুমিয়ে পড়। দুঃস্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামিও না।

সেই রাত্রিতেই একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল এ্যালিস। সেই আদিম জঙ্গলের মাঝে ছোট কেবিনটাতে শিশুটির জন্ম হলো যখন তখন দরজার বাইরে একটা চিতাবাঘ ডাকছিল এবং উপকূলবর্তী সেই ঢিবিটার উপর হতে একটা সিংহের গর্জন ভেসে আসছিল।

তার শিশুসন্তানের জন্মের পর পুরো একটা বছর বেঁচে ছিল লেডী গ্রেস্টোক, কিন্তু সেই বাঁদর-গোরিলার আকস্মিক আক্রমণ থেকে যে আঘাত সে পেয়েছিল সেই আঘাতের প্রকোপটা জীবনে কোনদিন সামলে উঠতে পারেনি। তবে যতদিন বেঁচেছিল ততদিন সে সেই কেবিনটার বাইরে একটিবারের জন্যও বার হয়নি অথবা একথা সে কোনদিন বুঝতে পারেনি যে সে আর ইংলণ্ডে নেই।

তাদের শিশুটির জন্মের এক বছর গত হতেই কোন এক রাতে নীরবে পৃথিবী থেকে চিরদিনের মত চলে গেল লেডী এ্যালিস। তার মৃত্যুটা ঘটে এমনই নীরবে ও নিঃশব্দে যে ক্লেটন বুঝতেই পারেনি প্রথমে।

বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লেটনের দুঃখটা এক অন্তহীন বিশালতায় প্রকট হয়ে উঠল তার সামনে। তার দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তানটির সমস্ত দায়িত্ব কিভাবে পালন করবে সেকথা ভাবতে গিয়ে কোন কূল কিনারা খুঁজে পেল না।

এ্যালিসের মৃত্যু ঘটে যে রাতে তার পরদিন সকালে শেষবারের মত ডায়েরী লেখে ক্লেটন। এক অন্তহীন দুঃখ আর হতাশায় সকরুণ হয়ে ওঠে তার প্রতিটি কথা।

বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে এই কথাগুলো ডায়েরীতে লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে হাত দুটো টান করে বিছানার উপর ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল ক্লেটন। তার হাত থেকে কলমটা পড়ে যায়। স্ত্রীর মৃতদেহটা তখনও পড়ে ছিল সেই বিছানায়।

উপকূলভাগ হতে এক মাইল দূরে অরণ্যের মধ্যে বাঁদর-গোরিলাদের প্রধান কার্চাক সেদিন রাগের মাথায় এক তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছিল তার দলের মধ্যে।

কালা নামে একটা মেয়ে বাঁদর-গোরিলা তার একটা কোলের বাচ্চাকে নিয়ে আহারের সন্ধানে দূরে

গিয়েছিল। কার্চাকের তাণ্ডবলীলার কথা জানত না সে। হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো বাঁদরের চীৎকারে হুঁস হলো তার। বুঝল কার্চাক নিশ্চয় পাগলা হয়ে গেছে এবং এই মুহূর্তে সেখানে গিয়ে পড়লে তার জীবন বিপন্ন হবে।

নিরাপত্তার খোঁজে কালা এগাছ ওগাছ করতে লাগল। কার্চাক একসময় তাকে ধরতে গিয়ে তার এত কাছে চলে এল যে কালা একটা উঁচু গাছের মাথা থেকে লাফ দিল জোরে। কালা অন্য একটা গাছের ডাল ধরল। কিন্তু তার কোলের বাচ্চাটা তিরিশ ফুট নিচে পড়ে গেল। কালা তখন একটা আর্তনাদ করে কার্চাকের সব ভয় ভুলে গিয়ে তার বাচ্চাটার কাছে গিয়ে তাকে মাটি থেকে তুলে নিল। কিন্তু তার আগেই তার প্রাণটা বেরিয়ে গেছে তার দেহ থেকে।

দলের বাঁদর-গোরিলাগুলো যখন দেখল কার্চাক শান্ত হয়ে উঠেছে তখন তারা নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে আপন আপন কাজে মন দিল।

এইভাবে ঘন্টাখানেক কেটে যাওয়ার পর তার দলের সব বাঁদরদের এক জায়গায় ডেকে তাকে অনুসরণ করতে বলল কার্চাক।

প্রথমেই তারা ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে কিছুক্ষণ গেল। তারপর হাতিচলা বনপথের মধ্য দিয়ে যেতে লাগল। এরপর গাছগুলোর ডাল ধরে ধরে খুব দ্রুত এগিয়ে চলল তারা। কালাও তার মরা বাচ্চাটা আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলতে লাগল তাদের সঙ্গে।

দুপুরের কিছু পরে সমুদ্রের বেলাভূমির কাছে পৌঁছল যেখানে সেই টিবিটার পাশে কেবিনটা ছিল, এই কেবিনটাই ছিল কার্চাকের লক্ষ্য।
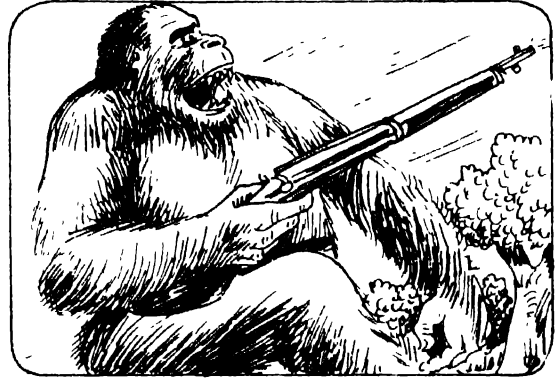
আসলে কার্চাকের লক্ষ্য ছিল দুটো। কার্চাকের প্রথম লক্ষ্য হলো কালো বাঁটওয়ালা সেই রাইফেলটা যার মুখ থেকে বেরোন গুলি থেকে অনেক বাঁদর-গোরিলার মৃত্যু হয়েছে।

সম্প্রতি আর এদিকে আসত না কার্চাক। কারণ যখনি তার দলবল নিয়ে কেবিনটার দিকে এগিয়ে যেত অথবা আক্রমণ করার চেষ্টা করত তখনি সেই কালো বাঁটওয়ালা বস্তুটা গর্জন করে উঠে তাদের দলের কারো না কারোর মৃত্যু ঘটাত।

আজ কিন্তু সেই সাদা লোকটার কোন পাত্তা নেই। কার্চাক দূর থেকে দেখল কেবিনের দরজাটা খোলা রয়েছে। কোনরূপ চেঁচামেচি বা তর্জন গর্জন করল না। কালো লাঠির মত সেই ভয়ঙ্কর বস্তুটার ভয়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে লাগল।

সবার আগে ছিল কার্চাক। তার পিছনে ছিল দুজন পুরুষ বাঁদর আর তাদের পিছনে ছিল কালা। কালার কোলে তখনো ছিল সেই মরা বাচ্চাটা

কার্চাক দেখল ঘরটার মধ্যে সেই আশ্চর্য সাদা লোকটা একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে হাতদুটো টান

করে শুয়ে আছে। বিছানার উপর একটা নিস্পন্দ দেহ কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় শুয়ে আছে। আর ঠিক সেই সময়ে ঘরের একপাশে ঝুলতে থাকা একটা দোলনা থেকে একটা শিশু সকরুণ স্বরে কেঁদে উঠল।

নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হতেই জেগে উঠল ক্লেটন। চমকে উঠল কাচাকদের দিকে তাকিয়ে।

দরজার দিকে তাকিয়ে ক্লেটন যা দেখল তাতে তার দেহের সব রক্ত হিম হয়ে জমে গেল। সে দেখল তার পিছনে তিন-চারটে পুরুষ বাঁদর কখন চুপিসারে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের পিছনে আরো কত বাঁদর আছে এবং সংখ্যায় কত হবে তার কিছু জানতে পারল না ক্লেটন। দেখল কার্চাক তার লোমশ হাতদুটো বাড়িয়ে তাকে ধরতে আসছে।

ক্লেটনের দেহটাকে সামান্য একতাল মাংসে পরিণত করে তাকে যখন ছেড়ে দিল কার্চাক ঠিক তখনি তার দৃষ্টি পড়ল দোলনার শিশুটার উপর।

কার্চাক তাকে ধরার আগেই কালা ছুটে গিয়ে শিশুটাকে তুলে নিয়ে তার জায়গায় তার কোলের মরা শিশুটাকে রেখে দিল। তারপর সেই মানব-শিশুটাকে কোলে নিয়ে লাফ দিয়ে একটা উঁচু গাছের উপর উঠে গেল। সেই জীবন্ত মানবশিশুর কান্না তার বুকের মধ্যে তার মাতৃত্বকে জাগিয়ে তুলল।

গাছটার অনেক উঁচু একটা ডালে বসে কালা সেই মানবশিশুটাকে বুকে চেপে ধরে আদর করতে লাগল। কালা পশুমাতা হলেও তার সহজাত মাতৃত্ববোধ মানবশিশুর অর্ধস্পষ্ট বোধশক্তির মধ্যে মাতৃস্নেহের এক আশ্চর্য রূপ ধারণ করল। ফলে সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল শিশুটি। কোন ইংরেজ লর্ড পরিবারের সন্তান কালা নামে এক বাঁদরীর বুকে মানুষ হতে লাগল।

প্রথমেই কার্চাকের নজর পড়ল দেওয়ালের উপর টাঙ্গানো ক্লেটনের রাইফেলটার উপর। বজ্রদণ্ডটা করায়ত্ত করার জন্য বহুদিন ধরে কামনা করে আসছে কার্চাক তার মনের মধ্যে। কিন্তু আজ সেই বস্তুটা হাতের কাছে পেয়েও সেটাকে হাত দিয়ে ধরতে সাহস পাচ্ছে না সে।

কার্চাক রাইফেলটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর একসময় ট্রিগারটার উপর হাত পড়তেই গর্জনের মত জোর শব্দ হলো একটা। শব্দটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁদরগুলো পালাতে গিয়ে এ ওর ঘাড়ের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

কার্চাকও ওদের মত ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু সে রাইফেলটা না ছেড়ে সেটা হাতে ধরেই পালিয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কেবিন থেকে বেরিয়ে সে রাইফেলটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল

পরম যত্নের সঙ্গে শিশুটাকে মানুষ করে যেতে লাগল কালা। কিন্তু এত সেবা যত্ন করেও ঠিকমত বাড়ে না বা গায়ে বল পায় না শিশুটা। প্রায় এক বছর হয়ে গেল শিশুটা তার হাতে এসেছে। তবু এখনো সে অন্যান্য বাঁদরশিশুর মত একা একা হাঁটতে বা গাছে চড়তে পারে না। একথাটা প্রায়ই এক নীরব বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবতে থাকে কালা।

কালার স্বামী তুবলাতেরও বিরক্তির অন্ত ছিল না এবিষয়ে। কালা যদি সব সময় শিশুটাকে নজর না রাখত তাহলে তুবলাত অনেক আগেই তাকে সরিয়ে দিত পৃথিবী থেকে।

এরপর কালার বিরুদ্ধে নালিশ জানাবার জন্য একদিন কার্চাকের কাছে গেল তুবলাত। কার্চাক যেন তুবলাতের কথামত চলার জন্য বাধ্য করে কালাকে। কালা যেন তার দ্বারা বাধ্য হয়ে ত্যাগ করে ঐ মানবশিশুটাকে।

কিন্তু কার্চাক যখন কালাকে ডেকে কথাটা তুলল তার কাছে তখন কালা তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল যদি তারা এই শিশুটাকে নিয়ে শান্তিতে থাকতে না দেয় তাকে তাহলে সে দল ছেড়ে চলে যাবে চিরদিনের মত।

কালার কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটার গায়ের চামড়া সাদা বলে ওরা সবাই মিলে ওর নামকরণ করেছিল 'টারজন।' টারজন কথাটার মানেই হলো সাদা চামড়া।

দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল টারজন। তার বয়স যখন দশ বছর হলো তখন সে ভালভাবে গাছে চড়তে শিখল। গাছে গাছে ঘুরে বেড়াতে পারত সে। মাটির উপরেও সে এমন সব মজার মজার খেলা দেখাত যা কেউ পারত না।

অনেক বিষয়েই অন্যান্য বাঁদরশিশুদের সঙ্গে তফাৎ ছিল টারজনের।

অন্যান্য বাঁদরশিশুদের থেকে টারজনের বুদ্ধি অনেক বেশী থাকলেও তার আকৃতি আর শক্তি তাদের থেকে ছিল অনেক কম। দশ বছর বয়সে বাঁদর-শিশুরা এক একটা বড় বাঁদরে পরিণত হয়। কিন্তু টারজন আজও পর্যন্ত একটা অপরিণত বালকই রয়ে গেছে।

কিন্তু বালক হলেও সাধারণ বালক ছিল না সে। শৈশব থেকেই তার হাত দিয়ে গাছের ডালে ডালে ঝুলত টারজন। এই ঝোলার কায়দাটা সে শিখেছিল তার মা কালার কাছ থেকে। তারপর যতই বড় হয়ে উঠতে লাগল ততই সে অন্যান্য বাঁদরশিশুদের সঙ্গে গাছে গাছে লাফিয়ে খেলা করে বেড়াত।

একটা গাছ থেকে শূন্যে লাফ দিয়ে কুড়ি ফুট শূন্যতা অতিক্রম করে অন্য একটা গাছের ডাল অভ্রান্তভাবে ধরতে পারত টারজন।

টারজনের বয়স দশ বছর পার হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বাঁদরশিশুদের সঙ্গে তার দেহগত তফাৎটা প্রকট হয়ে উঠল তার কাছে। তার গায়ের সাদা চামড়াটা রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে হয়ে গিয়েছিল। তা হোক। কিন্তু তার সবচেয়ে দুঃখ ও লজ্জার কারণ হলো এই যে অন্যান্য বাঁদরদের মত কোন লোম ছিল না তার গায়ে। এই লজ্জাটা ঢাকার জন্য অনেক সময় গোটা গায়ে কাদা মেখে থাকত। কিন্তু কাদাগুলো শুকিয়ে গেলেই ঝরে পড়ত আর তা ছাড়া বড় অস্বস্তি লাগত। তাই শেষে কাদা মাখা ছেড়ে দিল। অস্বস্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য লজ্জাকেই বরণ করে নিল।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন জলাশয়ের স্বচ্ছ জলে জীবনে প্রথম তার মুখের প্রতিবিম্ব দেখল টারজন।

টারজন সেখানে গিয়েছিল কালার এক সন্তান অর্থাৎ তার এক ভাইয়ের সঙ্গে। সেখানে জলের ধারে দাঁড়িয়ে জলের উপর ঝুঁকে তাকাতেই দুজনের মুখের ছায়া ফুটে উঠল হ্রদের শান্ত জলের উপর। কোন এক ভয়ঙ্কর বাঁদর যুবকের কদাকার মুখের পাশে অতি সুন্দর এক মানবযুবকের মুখ।

সে মুখ দেখে এক পুলকিত বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল টারজন। তার গায়ে লোম না থাক কিন্তু কী সুন্দর মুখ! তার মুখগহ্বরটা কত ছোট, তার দাঁতগুলো কত সাদা আর ছোট। তার বাঁদরভাইদের মোটা মোটা ঠোঁট আর বড় বড় দাঁতগুলোর পাশে কত সুন্দর দেখাচ্ছিল সেগুলো। তার নাক আর নাসারন্ধ্রদুটো কত ছোট। অবশেষে সে ভাবল এমন সুন্দর আকৃতি পাওয়া সত্যিই কত ভাল।

কিন্তু তার চোখদুটোকে খুব ভয়ঙ্কর বলে মনে হলো। সাদায় কালোয় মেশা একটা গোলাকার পদার্থ। কি বিশ্রী! সাপদেরও চোখগুলো এমন ভয়ঙ্কর নয়।

নিজের চেহারাটা খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে তন্ময় ও অভিভূত হয়ে পড়েছিল টারজন।
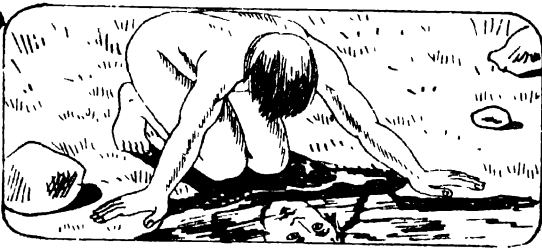
হঠাৎ ওরা দুজনেই দেখতে পেল ওদের থেকে মাত্র তিরিশ হাত দূরে একটা বিরাট সিংহী লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে। তার পেটটা প্রায় মাটি স্পর্শ করছিল। একটা বিরাট বিড়ালের মত নীরবে নিঃশব্দে তার শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ করছিল সে।

সিংহীটার গর্জনে সচকিত হয়ে টারজন দেখল তার একদিকে সামনে হ্রদের বিস্তৃত জলরাশি আর একদিকে নিশ্চিত মৃত্যু।

সিংহীটার কবল থেকে আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না পেয়ে হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। সাঁতার না জানলেও হাত পা নেড়ে কোনরকমে জলের উপর মাথাটা বার করে তার দলের বাঁদরদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করতে লাগল। দেখল সিংহীটা ততক্ষণে তার সঙ্গীর নিথর দেহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে আর তার দিকে তাকাচ্ছে। ভাবছে সে জল থেকে উঠলে তাকেও ধরবে।

টারজনের বিপদসূচক চীৎকার শোনার সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ পঞ্চাশটি বড় বড় বাঁদর বিদ্যুৎবেগে গাছের ডালে ডালে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলো। সে দলে কালাও ছিল। টারজনের গলার স্বর সে ভালই চিনত।

এতগুলো বিরাটকায় বাঁদরের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় ভেবে সিংহীটা টারজনের সঙ্গীর মৃতদেহটা ছেড়ে রাগে গর্জন করতে করতে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল।

সাহস পেয়ে জল কেটে শুকনো ডাঙ্গায় এসে উঠল টারজন। শীতল জলে গাটা ডুবিয়ে আজ জীবনে প্রথম এক অনাস্বাদিতপূর্ব আরামবোধ করল। এরপর থেকে সে রোজ একবার জলে গা ডুবিয়ে স্নান করত।

যে বাঁদরদলটার সঙ্গে টারজন বাস করত সে দলটা সমুদ্র-উপকূল থেকে পঁচিশ মাইল জুড়ে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াত।" তারা কয়েক মাস করে এক একটা জায়গায় থাকত। পরে আবার অন্য এক জায়গায় বনের মধ্যে চলে যেত। আহার সংগ্রহ, আবহাওয়ার অবস্থা আর বিপজ্জনক বন্য জন্তুদের অবস্থিতি—এই সবকিছু বিবেচনা করেই স্থান পরিবর্তন করত তারা।

সারাদিন আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়ে রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলেই বাঁদরদলের সবাই কেউ মাটির উপর, কেউ বা গাছের উপর ঘুমিয়ে পড়ত। টারজন ঘুমোত কালার কোলের উপর।

মাঝে মাঝে কালার অবাধ্য হলে টারজনকে কালা দু-এক ঘা মারত। কিন্তু কোনদিন সে নিষ্ঠুর বা খুব কঠোর হতে পারেনি তার উপর। বরং সে তাকে তিরস্কারের থেকে আদরই করত বেশী।

কালার স্বামী তুবলাত এজন্য ঘৃণার চোখে দেখত টারজনকে। কতবার সে রাগের মাথায় টারজনের জীবনের অবসান ঘটাবার চেষ্টা করেছে।
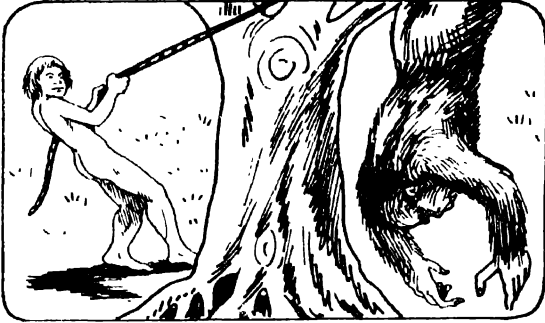
টারজনও যখনি সুযোগ পেয়েছে তখনি সে তুবলাতের প্রতি তার ঘৃণার ভাবটা জানিয়ে দিয়েছে। কখনো কালার কোলের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে অথবা কখনো গাছের মাথায় সরু সরু ডাল থেকে তুবলাতকে ভেংচি কেটে অপমান করেছে।

ছোটবেলা থেকে দড়ি তৈরী ও দড়ি নিয়ে মজার মজার খেলায় পটু হয়ে ওঠে টারজন। বন থেকে লম্বা লম্বা ঘাস তুলে তাই দিয়ে লম্বা লম্বা দড়ি তৈরী করত সে। তারপর সেই দড়ির ফাঁস তৈরী করে তার খেলার সাথীদের ও মাঝে মাঝে তুবলাতের গলায় আটকে দিত।

এই ধরনের খেলায় খুব মজা পেত বাঁদরগুলো। কোন খেলার সাথী গাছের তলা দিয়ে ছুটে কোথাও গেলে টারজন তখন উপর থেকে দড়ির ফাঁসটা নামিয়ে তার গলায় লাগিয়ে দিত আর সে হঠাৎ থেমে যেতে বাধ্য হত। এতে সবাই মজা পেত।
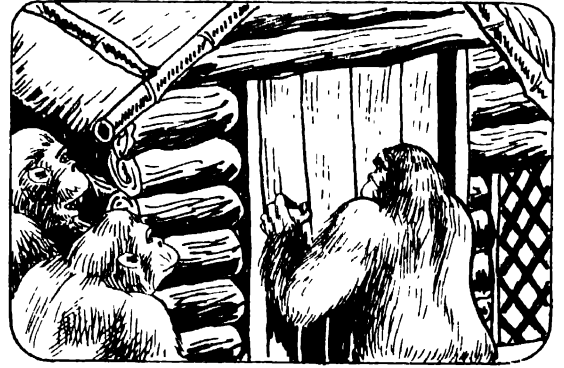
তুবলাতের গলায় একদিন এই দড়ির ফাঁসটা আটকে যাওয়ায় সে কিন্তু এটাকে বড় ভয়ের চোখে দেখত।

এর জন্য কালাকে একবার শাস্তি দিল তুবলাত। কার্চাকের কাছে নালিশ করল। কার্চাকও সাবধান করে দিল কালাকে ও টারজনকে। কারো কোন কথা শুনত না টারজন। সুযোগ পেলেই সে তার দড়ির ফাঁসটা অতর্কিতে আটকে দিত তুবলাতের গলায়।

আর তখন তুবলাতের সেই দুরবস্থা দেখে অন্যান্য বাঁদরগুলো মজা পেত। কারণ ভাঙ্গা নাকওয়ালা তুবলাতকে দলের কেউ ভাল চোখে দেখত না।

দিনের বেলায় আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানোর সময় বাঁদরের দলটা প্রায়ই উপকূলভাগের কাছে মৃত ক্লেটনের সেই কেবিনটার কাছাকাছি এসে পড়ত। আর সেই জায়গাটায় ওরা এসে পড়লেই কেবিনটার

কাছে এসে প্রায়ই জানালাগুলোর পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি মেরে দেখত টারজন। এক একবার ছাদের উপর উঠে চিমনি দিয়ে উঁকি মারত। ভিতরে কি আছে তা দেখার জন্য এক অদম্য কৌতূহলে ফেটে পড়ত সে।

একদিন একাই কেবিনটার কাছে চলে এল টারজন। আসার সঙ্গে সঙ্গেই কেবিনটার দরজার উপর চোখ পড়ল। এতদিন এই দরজাটাকে দেওয়ালের একটা অংশ বলে দেখে এসেছে এবং তাই তার মনে হয়েছে। কিন্তু আজ তার মনে হলো বাইরে দেওয়ালগুলোর অংশ বলে মনে হলেও এটা একটা স্বতন্ত্র বস্তু এবং এটা ঘরে ঢোকার পথ।

ক্লেটনের মৃত্যুর পর হতে পর পর দশটি বছর কেটে গেছে। তবু এই কেবিনটার ভিতরে কালো বাঁট-ওয়ালা সেই ভূতুড়ে জিনিসটার প্রতি কার্চাক ও তার দলের লোকদের ভয় আজও যায়নি তাদের মন থেকে। কেবিনটাতে একদিন কি ঘটনা ঘটেছিল সেকথা তারা বলেনি টারজনকে। তাছাড়া তারা সব ভুলে গেছে এতদিনে।

একমাত্র কালা শুধু মাঝে মাঝে টারজনকে বলত তার বাবা ছিল অদ্ভুত ধরনের সাদা বাঁদর। কিন্তু সেকথার মানে বুঝতে পারত না টারজন। তার বাবা যেই হোক, কালা তার মা নয় একথা কখনো ভাবতে পারত না সে।

আজ প্রথম কেবিনের দরজাটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করতে লাগল টারজন। তার প্রতিটি অংশ খুঁটিয়ে দেখল। অবশেষে ঠিক জায়গায় হাত পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বিস্ময়বিমূঢ় চোখের সামনে সশব্দে খুলে গেল দরজাটা।

দরজাটা খুলে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারল না টারজন। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে তাকিয়ে থাকার পর ভয়টা ভেঙ্গে গেল তার। তারপর ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

টারজন দেখল ঘরের মাঝখানে মেঝেতে একটা কঙ্কাল পড়ে আছে। ঘরের মধ্যে যে একটা খাট ছিল তার উপর আর একটা কঙ্কালকেও পড়ে থাকতে দেখল। দুটো কঙ্কালের মধ্যে মাংসের কোন চিহ্ন নেই। ঘরের একধারে যে একটা দোলনা ছিল তার মধ্যেও একটা ছোট্ট কঙ্কাল ছিল, মনে হলো সেটা যেন কোন শিশুর কঙ্কাল।

এরপর ঘরের মধ্যেকার অন্যান্য জিনিসপত্রের দিকে নজর দিল টারজন। ঘরের মধ্যে যেসব যন্ত্র-পাতি, অস্ত্রশস্ত্র, বইপত্র, পোশাক-আশাক এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিল সেগুলো একে একে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল সে। বন্য আবহাওয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে কালের আঘাত সহ্য করতে করতে এই সব বস্তু বিবর্ণ ও বিকৃত হয়ে গেছে অনেকখানি।

কিন্তু টারজন একটা সিন্দুক আর একটা আলমারি খুলে দেখল তার মধ্যে যেসব জিনিস ছিল সেগুলো সব ভাল অবস্থায় আছে। সেই সব জিনিসগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা ছুরি দেখতে পেল টারজন। ছুরিটা শিকারের সময় ব্যবহার করত ক্লেটন। ছুরিটার ফলাটায় দারুণ ধার থাকায় তার আঙুলের এক জায়গায় কেটে গেল। এরপর সে ছুরিটাকে খেলনার মত ব্যবহার করতে করতে চেয়ার ও টেবিলের ধার-গুলো কাটতে লাগল।
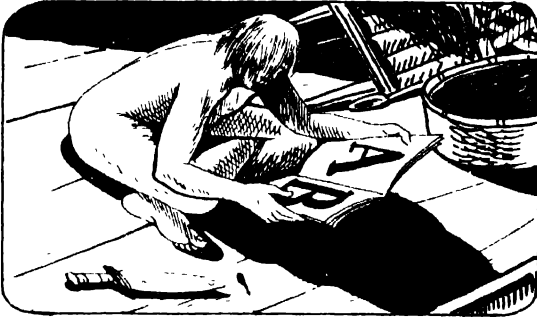
এইভাবে ছুরিটা নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করার পর আলমারির ভিতরকার বইগুলো ঘাঁটতে গিয়ে ছবিওয়ালা একটা ছোটদের বই দেখতে পেল। বইটাতে ছবির মাধ্যমে বর্ণমালা শেখানো হয়েছে শিশুদের। যেমন 'এ' অক্ষরটার পাশে আছে একটা তীরন্দাজের ছবি আর 'বি' অক্ষরের পাশে আছে একটা বালকের ছবি। 'এম' অক্ষরের কাছে কতক-গুলো ছোট ছোট বাঁদরের ছবিও দেখতে পেল টারজন।

বই-এর মধ্যে যেসব মানুষ বা জীবজন্তুর ছবি দেখছিল টারজন প্রথম প্রথম সেগুলো জীবন্ত মনে হচ্ছিল তার। তাই সে বই থেকে তুলতে যাচ্ছিল সেগুলোকে। কিন্তু পরে বুঝল সেগুলো জীবন্ত নয়।

বইটার মাঝখানে এক জায়গায় তার শত্রু সিংহী আর একটা সাপের ছবি দেখল টারজন। ওদের বাঁদরদলের ভাষায় সিংহীকে স্যাবর আর সাপকে হিস্তা বলে।

বইটা আবার আলমারিতে রেখে দিল টারজন। তারপর ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর হতে।

যাবার সময় ঘরের মেঝে থেকে সেই ছুরিটা তুলে নিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেল। এগুলো সে বাঁদরগুলোকে দেখাবে।

কেবিন থেকে বেরিয়ে দশ পা এগিয়ে যেতে না যেতেই টারজন দেখল পাশের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এক বিরাটকায় বাঁদর-গোরিলা তার সামনে এসে হাজির হলো। টারজন প্রথমে ভেবেছিল গোরিলাটা তাদেরই দলের কেউ হবে। কিন্তু পরে দেখল গোরিলাটা তাদের গোঁড়া শত্রু বোলগানি।

টারজন দেখল তাদের ঘোর শত্রু বোলগানির সামনাসামনি সে যখন পড়ে গেছে তখন সে তাকে ছাড়বে না। সে তার কাছ থেকে পালিয়ে যেতেও পারবে না।

বোলগানিকে দেখে কোন ভয় জাগল না টারজনের অন্তরে। বরং এক দুঃসাহসিক অভিযানের আনন্দে ও উত্তেজনায় তার হৃৎপিণ্ডটা লাফাতে লাগল। সুযোগ পেলে অবশ্যই পালাত সে। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল বোলগানির সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে পেরে উঠবে না সে।

টারজনই প্রথমে একটা ঘুষি মারল বোলগানির গায়ে। কিন্তু ঘুষিটাকে হাতির উপর একটা মাছির আঘাত বলে মনে হলো। হঠাৎ কি মনে হলো কেবিন থেকে নিয়ে আসা ধারাল ছুরিটা বোলগানি তাকে কামড়াতে এলেই তার বুকে সজোরে বসিয়ে দিল। যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে টারজনকে বার বার কামড়ে তার ঘাড় ও হাত থেকে কিছুটা করে মাংস তুলে নিল। তারপর টারজনকে নিয়ে সে মাটিতে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। এই অবসরে বোলগানির বুক থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে আবার পর পর কয়েকবার ছুরিটা সেই বুকে বসিয়ে দিতে লাগল। অবশেষে বোলগানির দেহটা নিথর নিস্পন্দ হয়ে উঠল আর টারজনও জ্ঞান হারিয়ে ফেলল আঘাতের যন্ত্রণায়।

কার্চাকের বাঁদরদলটা ছিল সেখান থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে। হঠাৎ বোলগানির বিকট চীৎকার শুনে সচকিত হয়ে ওঠে কার্চাক। তার দলের সবাইকে ডেকে দেখল সবাই উপস্থিত আছে কি না। কারণ সে জানত বোলগানি তাদের দলের শত্রু এবং সে দলের কাউকে একা পেলে সে কখনই ছাড়বে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল টারজন দলের মধ্যে নেই। তখন ওরা বুঝল নিশ্চয় বোলগানির কবলে পড়েছে।

কালা কিন্তু অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছিল টারজনকে। তার কোন বিপদের আশঙ্কায় তার মায়ের প্রাণ কাতর হয়ে উঠেছিল। তাই সে গাছের উপর উঠে তার খোঁজ করতে করতে এগিয়ে গেল।
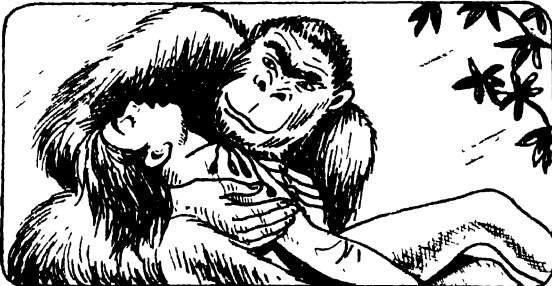
অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে কালা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখল মরার মত রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহে পড়ে আছে টারজন। সঙ্গে সঙ্গে বুকে কান পেতে দেখল তখনও দেহে তার প্রাণ আছে। ধীর গতিতে ধুক ধুক করছে হৃৎপিণ্ডটা। আরও দেখল অদূরে বোলগানির প্রাণহীন বিরাট দেহটা পাথরের মত শক্ত হয়ে পড়ে আছে।

টারজনের অচৈতন্য দেহটা কাঁধে তুলে তার দলের আড্ডায় বয়ে নিয়ে এল কালা। তার ক্ষতস্থান-গুলোকে জিব দিয়ে চেটে পরিষ্কার করে দিল। প্রবল জ্বরে কাতর হয়ে ছটফট করতে লাগল টারজন। বার বার জল চাইতে লাগল। কালা তখন মুখে করে নদী থেকে জল এনে তাকে দিতে লাগল। এইভাবে বেশ কয়েকদিন ধরে অক্লান্তভাবে সেবাযত্ন করে টারজনকে সারিয়ে তুলল কালা।

অসুখের সময়টা টারজনের খুব দীর্ঘ হলেও ধীরে ধীরে সেরে উঠতে লাগল টারজন। একমাসের মধ্যেই সে আবার হেঁটে বেড়াতে লাগল। আবার সে আগের মত গায়ে বল পেয়ে কর্মঠ হয়ে উঠল।

একদিন সকালবেলায় একা একা বেরিয়ে পড়ল সে। প্রথমে ছুরিটার খোঁজে সেদিনকার সেই ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সেখানে গিয়ে সে ঝরা পাতায় ঢাকা বোলগানির কঙ্কালটা পড়ে থাকতে দেখতে পেল। সেখানে পাতায় ঢাকা তার ছুরিটাকেও দেখতে পেল সে। ছুরিটার গায়ে

লেগে থাকা গোরিলাটার রক্ত শুকিয়ে যাওয়ায় মরচে ধরে গেছে সেটাতে। তাই আগেকার মত তার মুখটাতে আর চকচকে ধার নেই। তবু সেই ছুরিটাকে কাছে রেখে দিল টারজন।

এরপর সোজা কেবিনটায় চলে গেল সে।

আজ ঘরটার সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে প্রথমে বইগুলো তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই বইগুলো এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করল তার মনে যে সে আর কিছু দেখতে চাইল না। আর কোন দিকে মন গেল না।

একটা প্রাথমিক পাঠের বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে তারই মত একটা ছেলের ছবি দেখতে পেল সে। টারজন দেখল ছেলেটা তার মত নগ্নদেহ নয়। তার হাত আর মুখ ছাড়া লোমের তৈরী জ্যাকেটে ঢাকা তার দেহটা। ছবির তলায় 'বালক' এই কথাটা শুধু লেখা আছে। আরো দেখল যেসব অক্ষরগুলো দিয়ে এই কথাটা লেখা রয়েছে সেই সব অক্ষরগুলো আলাদা করেও বিভিন্ন জায়গায় লেখা আছে।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আর এক জায়গায় দেখল আর একটা ছবির তলায় লেখা রয়েছে একটি বালক ও একটি কুকুর। এইভাবে সে কোন অক্ষর বা লিখিত ভাষার জ্ঞান ছাড়াই অক্ষর পরিচয়ের চেষ্টা করতে লাগল ধীরে ধীরে।

এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে নিজে নিজে শিখে যেতে লাগল সে। বিভিন্ন ছবির তলায় অক্ষরগুলো দেখে দেখে তাদের সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা জাগল তার মনে।

টারজনের বয়স যখন বারো তখন একদিন কেবিনটার মধ্যে ঢুকে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা কাঠের পেন্সিল নিয়ে টেবিলের উপর ক'টা আঁচড় কাটতে কতকগুলো কালো রেখার সৃষ্টি হলো। হিজিবিজি দাগ কেটে পেন্সিলের সীসটা ক্ষয় করে ফেলল। তারপর কি মনে হতে আর একটা পেন্সিল নিয়ে সেই ছবির বই-এর অক্ষরগুলো লেখার চেষ্টা করতে লাগল।

অনেক চেষ্টার পর সে বই-এর অক্ষরগুলো লিখতে পারল। অক্ষরগুলো দেখে দেখে লিখতে গিয়ে সে সংখ্যাও শিখতে লাগল। তার হাতের আঙুলগুলো গুণতে শিখল। এইভাবে লেখা শুরু হলো তার। বিভিন্ন শব্দের মধ্যে যেসব অক্ষরগুলো ঘুরে ফিরে ব্যবহৃত দেখল সেগুলো সাজিয়ে একটা বর্ণমালা খাড়া করল টারজন।

এইভাবে টারজনের বয়স যখন সতের হয়ে উঠল তখন সে প্রাথমিক পাঠের বইটা পুরো পড়তে পারল।

মাঝে মাঝে বাঁদরদলটা বাসস্থান পরিবর্তন করার জন্য কেবিনে গিয়ে পড়াশুনো করার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে লাগল টারজনের। তবু সে পথের কোথাও কোন গাছের বড় পাতা বা ফাঁকা জায়গায় মাটি দেখতে পেলেই তার উপর ছুরি দিয়ে তার শেখা

অক্ষরগুলো লিখত টারজন।

টারজন যখন প্রথম বাঁদরদলে আসে তখনকার থেকে দলটা এখন অনেক বেড়ে গেছে। কার্চাকের নেতৃত্বে তাদের দলের সদস্যসংখ্যা বেড়েছে। তাছাড়া বনের অন্যান্য জন্তুর আক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যাও কম। তাদের দলে খাদ্যেরও কোন অভাব হয় না। দলের ছোট ছোট পুরুষ বাঁদরগুলো বড় হয়ে সবাই কার্চাকের প্রভুত্ব মেনে নিয়ে তার সঙ্গে শান্তিতে বাস করছে।

বাঁদরদলের মধ্যে টারজনের একটা বিশেষ স্থান ছিল। তারা তাকে তাদের দলেরই একজন হিসাবে দেখত। প্রবীণ পুরুষ বাঁদরগুলো উপেক্ষা করত অথবা ঘৃণার চোখে দেখত। টারজনের আশ্চর্য বুদ্ধি, শক্তি ও সাহস আর কালা না থাকলে অনেক আগেই টারজনকে মেরে ফেলত তারা।

কালার স্বামী তুবলাত ছিল টারজনের ঘোর শত্রু। তবে টারজনের বয়স যখন তের তখন একদিন তুবলাতের মধ্যস্থতাতেই টারজনের উপর দলের পক্ষ থেকে সব পীড়ন বন্ধ হয়ে যায় এবং ঠিক হয় দলের কেউ টারজনকে ঘাঁটাবে না বা তার উপর কোনভাবে পীড়ন চালাবে না, খেলার ছলেও কেউ কিছু করবে না। সে সম্পূর্ণ একা একা থাকবে।

দলের মধ্যে টারজন যেদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেদিন বনের মধ্যে ফাঁকা একটা জায়গায় সমবেত হয় দলের সবাই। জায়গাটা ঠিক কোন রঙ্গালয়ের মত। সে জায়গার মাঝখানে কতকগুলো মাটির ঢাক আনা হলো কোথা থেকে। গাছের উপর থেকে প্রায় একশোটা বাঁদর-গোরিলা নেমে এসে সমবেত হলো সেই জায়গায়। চাঁদ উঠেছে আকাশে। চাঁদের আলো ঝরে পড়া সেই নৈশ বনভূমিতে আজ দমদম নাচ নাচবে ওরা। আজ ওদের অদ্ভুত এক উৎসব।

সহসা কার্চাক গলা ফাটিয়ে গর্জন করে পর পর তিনবার তার লোমশ বুকটা চাপড়াল তার দুটো থাবা দিয়ে। এরপর জায়গাটার মাঝখানে পড়ে থাকা একটা বাঁদর-গোরিলার মৃতদেহের পানে তার রক্ত-লাল চোখদুটো দিয়ে তাকিয়ে সেটাকে একবার প্রদক্ষিণ করল।

তারপর দলের অন্যান্য পুরুষ বাঁদরগুলোও একে একে গলা ফাটিয়ে একবার করে জোর গর্জন করে মৃতদেহটাকে সেইভাবে প্রদক্ষিণ করল। তাদের সেই বিরাট গর্জনে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল সমস্ত বনভূমি। এই গর্জনের অর্থ হলো শত্রুপক্ষের প্রতি সদম্ভ আহ্বান।
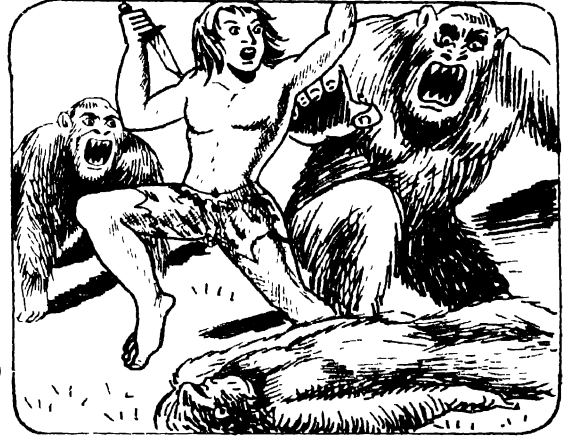
এবার পুরুষ বাঁদরগুলো সার দিয়ে নাচিয়েদের সঙ্গে দাঁড়াল। এরপর শুরু হল মৃতদেহের প্রতি আক্রমণ। এক জায়গায় অনেকগুলি লাঠি গাদা করা ছিল। কার্চাক প্রথমে সেই গাদা থেকে একটা বড় লাঠি তুলে নিয়ে মৃতদেহটার উপর জোর আঘাত করল এবং সেইসঙ্গে সেইরকম যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে গর্জন করল। মারের সঙ্গে সঙ্গে ঢাক বাজতে লাগল আর নাচ শুরু হলো। সেই বাজনা আর নাচের সঙ্গে সঙ্গে পালাক্রমে একজন করে পুরুষবাঁদর লাঠি দিয়ে মৃতদেহটাতে আঘাত করতে লাগল।

এইভাবে মৃত্যুর যে নৃত্যোৎসব চলছিল তাতে টারজনও যোগদান করেছিল। জোরে জোরে তালে তালে পা ফেলতে, লাফ দিতে ও এক ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আক্রমণ ও আঘাত করতে সে ছিল সবার

চাইতে বেশী তৎপর।

ক্রমে তালে তালে ঢাকের বাজনার বেগ বেড়ে যেতে লাগল।

পুরো আধঘণ্টা ধরে এই উন্মত্ত নাচ চলতে লাগল। তারপর একসময় কার্চাক ইশারা করতেই নাচ ও বাজনা একমুহূর্তে থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই একযোগে সেই মৃতদেহটার দিকে ছুটল। অসংখ্য লাঠির আঘাতে মৃতদেহটা একতাল মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছিল, সবাই তাতে তার দাঁত বসিয়ে তার থেকে এককামড় করে মাংস ছিঁড়ে নিয়ে খেতে লাগল। যাদের গায়ের জোর বেশী তারা কামড় দিয়ে বেশী মাংস তুলে নিচ্ছিল।

অন্যদের মত টারজনেরও মাংসের দরকার ছিল। কিন্তু ঐ সব কাড়াকাড়ির মধ্যে থেকে তার প্রয়োজনীয় মাংস ছিনিয়ে আনার মত শক্তি তার ছিল না। কিন্তু সেই ধারাল ছুরিটা তার কোমরে তারই হাতে তৈরী করা একটা খাপের মধ্যে ছিল। সেই ছুরিটা নিয়ে মৃতদেহটার কাছে গিয়ে তার একদিকের বগল থেকে বড় একতাল মাংস কেটে নিল টারজন। কার্চাক তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল বলে এটা সে দেখতে পায়নি। টারজন তার কাছ দিয়েই নিঃশব্দে সবার থেকে একটু দূরে চলে গেল।

তাকে অন্য কেউ লক্ষ্য না করলেও একজন করল। সে হলো তুবলাত। তুবলাত প্রথম দিকেই একতাল মাংস ছিঁড়ে এনে ভিড় থেকে একটু দূরে নির্জনে বসে খাচ্ছিল তা। পরে আর একতাল মাংস আনার মতলব করছিল যখন তখন হঠাৎ দেখতে পেয়ে গেল টারজনকে। দেখল বড় একটা মাংসের তাল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে টারজন।

তার রক্তলাল চোখগুলো বড় বড় করে ঘৃণাভরে টারজনের পানে তাকিয়ে তাকে তেড়ে গেল তুবলাত। তখন মারামারি বা ঝগড়া বিবাদ করার কোন প্রবৃত্তি ছিল না টারজনের। সে তাই মাংস নিয়ে মেয়েদের দলে গিয়ে লুকোবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তুবলাত খুব দ্রুত তার দিকে ছুটে যাওয়ায় লুকোতে পারল না সে। লুকোতে না পেরে সে একটা গাছের ডাল ধরে তার উপরে উঠে পড়ল। মাংসটা দাঁতে কামড়ে ধরে গাছটার সবচেয়ে উপরের ডালে উঠে গেল। কিন্তু দেহটা অত্যধিক ভারী হওয়ার জন্য বৃদ্ধ তুবলাত সেখানে উঠতে পারল না।

তুবলাত তখন রাগে গর্জন করতে করতে ক্ষেপে গিয়ে গাছ থেকে মাটিতে নেমে এল। সে তখন পাগল হয়ে গেছে। মেয়ে-বাঁদর ও শিশুগুলোকে অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের অনেকের ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে একতাল করে মাংস তুলে নিয়েছে। তার ভয়ে তখন মেয়ে পুরুষ ও শিশুবাঁদরগুলো সবাই যে যেখানে পারল ছুটে পালাতে লাগল। সবাই গাছে উঠে পড়ল।

কিন্তু একজন তখনো কোন গাছে উঠতে পারেনি। সে হলো কালা। তুবলাত তখন কালাকে হাতের কাছে পেয়ে তাকেই আক্রমণ করল। কালা একটা গাছের নীচু ডাল ধরে তুবলাতের মাথার উপর উঠে পড়ল। কিন্তু ডালটা অশক্ত থাকায় সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়তেই তুবলাতের ঘাড়ের উপর পড়ে গেল কালা।

গাছের উপর তুবলাতের প্রচণ্ড পাগলামির সব-কিছুই দেখছিল টারজন। এবার আর সে থাকতে পারল না। সে তীব্র গতিতে গাছ থেকে নেমে তুবলাত মাটি থেকে উঠে কালাকে আক্রমণ করার আগেই কালা আর তুবলাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল বীরবিক্রমে।

তুবলাত এবার তার আকাঙ্খিত শত্রুকে পেয়ে গেল এতক্ষণে। সে তখন বিজয়গর্বে দাঁত বার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজনের উপর। কিন্তু টারজন তাকে কোন সুযোগ না দিয়ে একহাতে তার গলাটা ধরে অন্য হাত দিয়ে ছুরিটা ধরে সেই ছুরি বারবার বসিয়ে দিতে লাগল তুবলাতের বুকে। অবশেষে টারজন দেখল তুবলাতের অসার নিষ্প্রাণ দেহটা জড়পিণ্ডের মত ঢলে পড়ল মাটির উপর।

এবার বাঁদরদলের সকলেই একে একে নেমে এল গাছের আড়াল থেকে। টারজন আর তার ঘোরতর শত্রুর মৃতদেহটার চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়াল। টারজন তখন তুবলাতের মৃতদেহের উপর একটা পা রেখে চাঁদের দিকে মুখ তুলে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে তার প্রভুত্ব ঘোষণা করল। তারপর সে দলের সবাইকে লক্ষ্য করে বলল, শোন তোমরা, আমি হচ্ছি টারজন। শত্রুদের যম। আমাকে আর আমার মা কালাকে তোমরা সবাই মান্য করবে। আমার মত শক্তিমান তোমাদের মধ্যে আর একজনও নেই। একথা যেন আমার শত্রুরা মনে রাখে।

কাচাকের রক্তচক্ষুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার বুকটা চাপড়ে আর একবার চীৎকার করল টারজন।

তুবলাতের মৃতদেহটা সেখানে সেই উৎসবস্থানেই পড়ে রইল। কারণ ওরা নিজেদের দলের কারো মৃতদেহ খায় না।

মাচ মাসটা ওদের আহারের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে কেটে গেল। কোন কোন গাছের পাতা, বুনো আতাফল, কিছু জীবজন্তু, পাখি, পাখির ডিম, সরীসৃপ জাতীয় কিছু জীব আর পোকামাকড় খেয়ে গোটা মাসটা কাটাল তারা।

সেদিন টারজন একটা গাছের নিচু ডালে বসেছিল। তার নিচেই ছিল একটা সিংহী, টারজন তাকে রাগাবার জন্য একটা আতাফল ছুঁড়ে দিল তার গায়ের উপর। সিংহীটা রেগে গিয়ে মুখ বার করে গর্জন করে উঠল। সে টারজনের চোখে চোখ রেখে তাকাল ভয়ঙ্করভাবে। টারজনও তখন তার স্বরের অনুকরণ করে চীৎকার করল। সিংহীটা তখন ধীরে ধীরে বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

কিন্তু সিংহীটাকে বধ করার একটা সংকল্প জাগল টারজনের মাথায়। তার প্রধান কারণ সিংহীটাকে বধ করে তার চামড়া দিয়ে তার নগ্নতাকে ঢাকার জন্য একটা আচ্ছাদন তৈরী করবে সে। কেবিনে সেই ছবির বইটা দেখার পর হতে সে আর বাঁদর-গোরিলা-গুলোর মত উলঙ্গ হয়ে থাকতে চায় না।
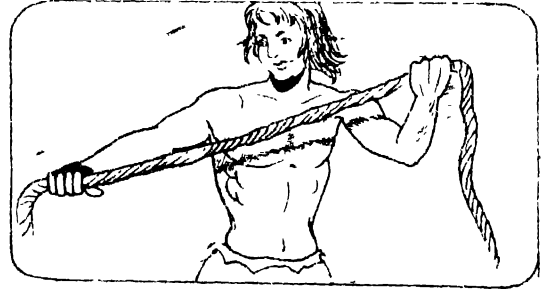
তাই সিংহীটাকে বধ করার বাসনা এতে বেড়ে গেল তার। কিন্তু টারজনের অস্ত্র বলতে একটা ছুরি আর সেই ফাঁসের দড়ি।

দড়িটা তৈরী হয়ে গেলে একদিন নদীর কাছাকাছি একটা পথের ধারে একটা গাছের ডালে শিকারের সন্ধানে গা-ঢাকা দিয়ে বসে রইল টারজন।

অবশেষে পাশের একটা ঝোপ থেকে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সিংহীটা এসে দাঁড়াল সেই গাছটার তলায়।

এদিকে ফাঁসের দড়িটা শক্ত করে হাতের মুঠোর

মধ্যে ধরে স্থিরভাবে একটা ব্রোঞ্জমূর্তির মত বসেছিল টারজন। এবার ফাঁসের দড়িটা সিংহীটার মাথার উপর প্রথমে ঝুলিয়ে দিল সে। দড়িটা সাপের মত ঝুলতে থাকায় সিংহীটা মুখ তুলে সেইদিকে তাকিয়ে সেটা কি তা ভাবতে লাগল। এমন সময় ফাসটা উপর থেকে কায়দা করে সিংহীর গলায় আটকে দিল টারজন। তারপর তার হাতের দড়ির শেষ প্রান্তটা একটা ডালে শক্ত করে বেঁধে দিল।

ফাঁসটা গলায় আটকে যাওয়ার পর সিংহীটা উপর দিকে মুখ তুলে দেখতে পেল টারজনকে। তাকে ধরার জন্য লাফ দিল সিংহীটা। গর্জন করতে লাগল প্রবলভাবে। কিন্তু টারজন আরও উপর ডালে উঠে গেল। তার ইচ্ছা ছিল দড়িটা ধরে উপর থেকে টেনে সিংহীটাকে শূন্যে ঝোলাবে। কিন্তু টারজন এর-পর দড়িটা আরও টেনে বাঁধতে গেলে সিংহীটা তখন তার বড় বড় থাবা দিয়ে দড়িটা ছিঁড়ে দিল। তবে তার গলায় ফাঁসটা শুধু আটকে রইল।

টারজনের আশা সবটা পূরণ হলো না তবু সিংহীটার গলায় ফাঁস লাগাতে পারার জন্য গর্ব অনুভব করতে লাগল। সে দলের কাছে ফিরে গিয়ে সবার সামনে কথাটা বলল। কথাটা শুনে তার ঘোর শত্রুরাও মুগ্ধ হয়ে গেল তার সাহস আর বীরত্বে। বিশেষ করে কালা আনন্দ ও গর্বের আতিশয্যে নাচতে লাগল।

সেসময় কার্চাকের গোরিলাদলটা কেবিনের কাছাকাছি বনাঞ্চলটায় বাস করছিল।

অনেকে বলত একটা হাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল টারজনের। হাতিকে বাঁদর দলের সবাই 'ট্যান্টর' বলত। সিংহীকে তারা যেমন বলত 'স্যাবর' আর সিংহকে বলত 'নুমা'; অনেকে নাকি চাঁদের আলোঝরা বনভূমিতে একটা হাতির পিঠে চেপে বেড়াতে দেখেছে টারজনকে। কিন্তু কিভাবে সে বন্ধুত্ব হলো তা কেউ বলতে পারেনি। সেই হাতিটা ছাড়া বনের অন্য জন্তু শত্রু ছিল না তার। তবে অবশ্য তার বাঁদর দলের মধ্যে এখন আর কেউ বিশেষ কোন শত্রুতা করে না তার সঙ্গে।

টারজন আঠারো বছর বয়সে পড়তেই কেবিনে যেসব বই ছিল তা গড়গড় করে পড়তে পারত। সে তাড়াতাড়ি লিখতেও শিখে ফেলল। মুখে উচ্চারণ বা ইংরাজি শব্দ পড়তে না পারলেও সে মনে মনে ইংরাজি পড়ে বুঝতে ও লিখতে পারত।

কিন্তু একদিন টারজন যখন তার বাবার কেবিনটার মধ্যে বই পড়ায় ব্যস্ত ছিল তাদের বাসস্থানের পূর্ব-প্রান্তে পঞ্চাশজন কৃষ্ণকায় সশস্ত্র নিগ্রো কোথা থেকে এসে হাজির হয়। তাদের কপালে ছিল তিনটে করে রঙীন সমান্তরাল রেখার উল্কি আর বুকে ছিল তিনটে করে বৃত্ত। তাদের হাতে ছিল বর্শা আর তীর ধনুক। আসলে তারা আগে থাকত একটা দূর গাঁয়ে। সেই অঞ্চলে একদল শ্বেতাঙ্গ কিছু নিগ্রোসেনা নিয়ে রবার আর হাতির দাঁতের খোঁজে তাদের সেই গাঁ আক্রমণ করে। তখন তারা একজন শ্বেতাঙ্গ অফিসার আর কিছু নিগ্রো সেনাকে নিহত করে। কিন্তু পরে শ্বেতাঙ্গদের এক বিরাট সেনাদল এসে পড়ায় তারা তাদের সেই গাঁ ছেড়ে আরও ভিতরে চলে এসে এক নতুন বস্তী গড়ে তোলে ওরই মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায়। সেখানে কাছাকাছি রবার গাছ না থাকায় নিশ্চিন্তে বসতি স্থাপন করে সেখানে।

এই নিগ্রোদলের রাজা ছিল মবঙ্গা। একদিন মবঙ্গার ছেলে কুলঙ্গা শিকারের সন্ধানে বর্শা আর তীর ধনুক নিয়ে একাই তাদের বস্তী থেকে পশ্চিম দিকের ঘন জঙ্গলে বেরিয়ে পড়ে। সেদিন রাত্রিতে একটা গাছের উপর শুয়ে রাত কাটায় কুলঙ্গা। সেখান থেকে পশ্চিমে তিন মাইলের মধ্যে কার্চাক তার দলবল নিয়ে বাস করত।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই পশ্চিম দিকে আবার যাত্রা শুরু করল। তখন টারজন একা একা দল ছেড়ে কেবিনের দিকে চলে গেল আর দলের সবাই দু তিনজন করে এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে আহার সংগ্রহের জন্য এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কালা তখন একা একা খাবার জন্য পুরনো পচা কাঠ আর পোকামাকড় সংগ্রহ করতে করতে কিছুটা পূব দিকে গিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ অদ্ভুত একটা শব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠল কালা। দেখল তার সামনে পায়েচলা বনপথটার প্রান্তে একটা ভয়ঙ্কর মূর্তি ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। আসলে লোকটা ছিল কুলঙ্গা। এই ধরনের মানুষের মূর্তি এর আগে তারা দেখেনি কখনো।

কালা কিন্তু সেখানে আর না দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তার দলের কাছে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু বেশীদূর যেতে পারল না কালা। কুলঙ্গার হাত থেকে ছাড়া একটা বর্শার বিষাক্ত ফলক তার পাশ দিয়ে চলে গেল। কালা তখন ঘুরে তার আক্রমণকারীকে আক্রমণ করল। তার চীৎকারে তার দলের সবাই ছুটে এল তার কাছে।

এদিকে কুলঙ্গার নিক্ষিপ্ত বর্শাটা ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে একটা বিষাক্ত তীর তার ধনুক থেকে ছুঁড়ে দিল। তীরটা কালার বুকে এসে লাগলে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে তাদের দলের সকলের সামনেই পড়ে গেল কালা।
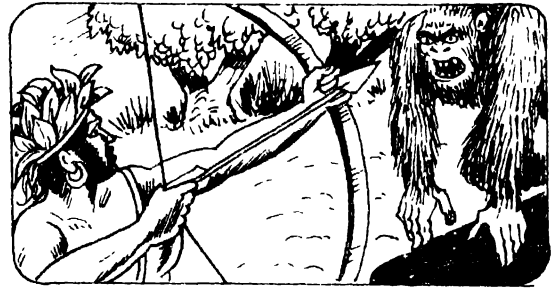
বাঁদর-গোরিলাগুলো কুলঙ্গাকে দেখতে পেয়ে তাড়া করল একযোগে। কিন্তু সে হরিণের মত তীর বেগে ছুটে পালিয়ে গেল। তাদের চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তে। ফলে কিছুক্ষণ পর বাঁদরগুলো ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। কালার প্রাণবায়ু তখন তার দেহ ছেড়ে চলে গেছে।

এদিকে বাঁদরদলের বিরাট চেঁচামেচির সঙ্গে আর্তনাদের মত একটা ধ্বনি শুনতে পেয়ে টারজন তার কেবিন থেকেই বুঝতে পেরেছিল একটা বিপদ ঘটেছে তার দলে। তাই সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল তার দলের কাছে। এসে দেখল কালার মৃতদেহটার চারদিকে সবাই দাঁড়িয়ে আছে ভিড় করে।

শোক আর দুঃখের সীমা পরিসীমা রইল না টারজনের।

দুঃখের প্রথম আঘাতটা কোনরকমে কাটিয়ে উঠে কালার মৃত্যু সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে লাগল টারজন। কে মেরেছে, হত্যাকারী কোনদিকে পালিয়েছে তা জেনে নিয়ে আর না দাঁড়িয়ে গাছের উপর উঠে ডালে

ডালে এগিয়ে চলল টারজন সেই পলাতক হত্যাকারীর সন্ধানে। তার কোমরে ছিল কেবিনে পাওয়া সেই ছুরিটা আর তার কাঁধের উপর ঝোলানো ছিল সেই ফাঁসের দড়ি।

গাছে গাছে অনেক দূর যাওয়ার পর টারজন একটা ছোট নদীর ধারে মাটির উপর একবার নামল। মাটির উপর পায়ের দাগ দেখে বুঝতে পারল পলাতক হত্যাকারী তারই মত মানুষ এবং একটু আগে সে এখান থেকে গেছে।

এইভাবে মাইলখানেক যাবার পর টারজন গাছের উপর থেকে অদূরে একটা ফাঁকা জায়গায় তীর ধনুক হাতে কৃষ্ণকায় একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। তার সামনে দাঁত বার করে তাকে আক্রমণ করার উদ্যোগ করছিল একটা বনশুয়োর, ওরা যাকে 'হোর্তা' বলে।

জীবনে প্রথম একজন মানুষ দেখল টারজন। কিন্তু কালো চকচকে এমন জীবন্ত মানুষ দেখেনি কখনো।

শুয়োরটা মারা গেল। কুলঙ্গা তখন গাছ থেকে নেমে তার কোমর থেকে একটা ছোরা বার করে মৃত শুয়োরটার গা থেকে মাংস ছাড়িয়ে আগুন জ্বেলে তা পুড়িয়ে খেতে লাগল ইচ্ছামত। তারপর বাকি মাংসওয়ালা মৃতদেহটা সেখানে ফেলে রেখেই চলে গেল সেখান থেকে।

টারজন গাছের উপর থেকে সবকিছু নীরবে নিঃশব্দে দেখে গেল। সে কিন্তু ঠিক সেইমুহূর্তে আক্রমণ করল না কুলঙ্গাকে।

কুলঙ্গা চলে গেলে টারজনও গাছ থেকে নেমে এসে বেশকিছুটা মাংস কাঁচাই খেয়ে নিল। তারপর আবার গাছে উঠে অনুসরণ করে যেতে লাগল কুলঙ্গাকে। সে ভাবল লোকটা যখন বিষাক্ত তীর আর ধনুক পাশে রেখে বিশ্রাম করবে সেই অবসরে তাকে বধ করবে।

সারাটা দিন ধরে গাছে গাছে এক প্রতিচ্ছায়ার মত কুলঙ্গাকে অনুসরণ করে যেতে লাগল টারজন। দেখল কুলঙ্গা আরও দুবার তার সেই বিষাক্ত তীর দিয়ে একটা হায়েনা আর একটা বাঁদরকে মারল। টারজন ভাবতে লাগল ঐ তীরটার ফলায় নিশ্চয় এমন কিছু রহস্যময় বিষ মাখানো আছে যা কোন জীবের রক্তে লাগার সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটবে।

সে রাত্রিতে একটা গাছের তলায় রাত কাটাল কুলঙ্গা। আর সেই গাছের উপরেই একটা উঁচু ডালে ওৎ পেতে বসে রইল টারজন।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই কুলঙ্গা দেখল তার তীর ধনুক নেই। আশেপাশে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে ভয় পেয়ে গেল। কালাকে মারতে গিয়ে বর্শাটা আগেই হারিয়েছে। এবার তীর ধনুকটাও গেল। আছে শুধু একটা ছুরি। তাই সে ভয়ে তার গাঁয়ের দিকে পা চালিয়ে দিল।

টারজন দেখল আর দেরী করা উচিত হবে না।

কুলঙ্গাকে অনুসরণ করে টারজন গাছের ডালে ডালে এগিয়ে চলল। অবশেষে কুলঙ্গার মাথার উপর এসে পড়ল টারজন। এবার হাতের মুঠোয় ফাঁসের দড়িটা শক্ত করে ধরল। কুলঙ্গাদের গাঁটা দেখতে

পাচ্ছিল। বনটার প্রান্তে একটা মাঠ আর মাঠের ওধারে গাঁ। আর মোটেই দেরী করলে চলবে না।

কুলঙ্গা বন থেকে বার হবার আগেই তার প্রান্ত-সীমায় একটা গাছের উপর থেকে একটা ফাঁসের দড়ি ঝুলতে ঝুলতে তার গলায় এসে আটকে গেল।

তার গলায় ফাঁসটা আটকে যেতেই টারজন এমন কায়দা করে দড়িটা গাছের উপর টেনে ধরল যে কুলঙ্গা মোটেই চীৎকার করতে পারল না। এবার তার দড়িটা গাছের একটা মোটা ডালের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে নিজে নেমে গেল। তারপর তার কোমর থেকে ছুরিটা বার করে সেটা কুলঙ্গার বুকের উপর আমূল বসিয়ে দিল। এইভাবে তার মা কালার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিল সে।

কিন্তু কুলঙ্গার মৃতদেহ থেকে ছুরি দিয়ে মাংস কাটার জন্য উদ্যত হয়েও তা কাটতে পারল না টারজন।

যাই হোক, কুলঙ্গার মৃতদেহটা ফেলে রেখে গাছে উঠে ফাঁসের দড়ি খুলে দড়িটা হাতে নিয়ে সেখান থেকে গাছের ডালে ডালে পা চালিয়ে চলে গেল টারজন।

একটা উঁচু গাছের উপর থেকে কুলঙ্গাদের গাঁ-টা ভাল করে দেখল টারজন। দেখল বন আর গাঁয়ের মাঝখানে একটা মাঠ থাকলেও বনের দিকটা পাশ দিয়ে গিয়ে স্পর্শ করেছে গাঁটাকে। সেই গাঁয়ে যারা থাকে তারাও কুলঙ্গার মত মানুষ। সেই সব মানুষদের জীবনযাত্রা জানার এক কৌতূহল অনুভব করল টারজন।

বনের যেদিকটা মাঠটার পাশ দিয়ে গাঁয়ের কাছ পর্যন্ত চলে গেছে, বনের সেই দিকটা দিয়ে মবঙ্গাদের গাঁয়ের কাছে চলে গেল টারজন।

বনটার শেষ প্রান্তে একটা বিরাট বড় গাছের উঁচু ডালের উপর বসে গাঁ-টা দেখতে লাগল টারজন।

উলঙ্গ শিশুরা গাঁয়ের পথে পথে খেলা করে বেড়াচ্ছিল। মেয়েদের অনেকে শুকনো কলাগাছগুলো পাথরে পেষাই করছিল। অনেকে আবার ময়দা থেকে কেক তৈরী করছিল।
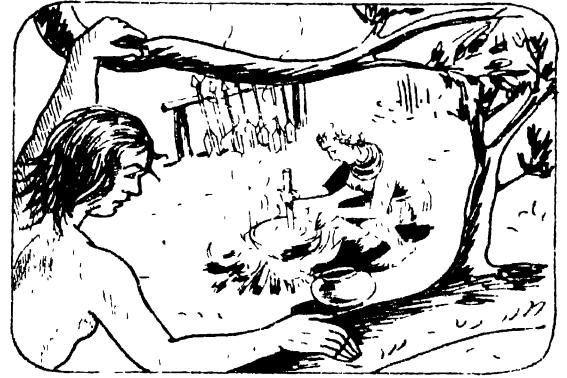
শুকনো ঘাস দিয়ে তৈরী একধরনের মাদুরের মত জিনিস মেয়েদের কোমর থেকে হাটুর উপর পর্যন্ত ঢাকা ছিল। তাদের পায়ে হাতে বুকের উপর পিতল আর তামার গয়না ছিল। গলায় ছিল তারের হার। অনেক মেয়ের নাকে আবার আংটির মত একটা গয়না ছিল।

জীবনে এই প্রথম মেয়েমানুষ দেখল টারজন।

টারজন দেখল নারীরাই একমাত্র কাজ করছে। মাঠে চাষের কাজ এবং ঘর সংসারের কাজ সব মেয়েরাই করছে। পুরুষদের কোথাও সে কাজ করতে দেখল না।

এরপর টারজন দেখল যে গাছের উপর সে চেপেছিল তার ঠিক তলায় একটা মেয়ে কি করছিল। তার পাশে অনেকগুলো তীর ছিল। তার সামনে জ্বলন্ত আগুনের উপর কড়াইয়ে লালমত কি একটা জিনিস ফুটছিল। মেয়েটি একটি করে তীর তুলে

নিয়ে তার সুচলো মুখটা সেই কড়াইয়ের মধ্যে একবার করে ডুবিয়ে পাশে এক জায়গায় রেখে দিচ্ছিল।

এবার টারজন সামান্য একটা তীর কিভাবে ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে জন্তুর মৃত্যু ঘটায় তার রহস্যটা বুঝতে পারল।

বিষমাখা ঐ সব তীরের কয়েকটা নিয়ে যাবার ইচ্ছা হলো টারজনের। টারজন যখন এবিষয়ে একটা পরিকল্পনা খাড়া করার চেষ্টা করছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা জোর চীৎকার শুনতে পেল সে। যেদিক থেকে চীৎকারের শব্দটা আসছিল সেদিকে তাকিয়ে সে দেখল যে গাছের তলায় সে কুলঙ্গাকে মেরেছিল সেইখানে একটা নিগ্রো যোদ্ধা দাঁড়িয়ে তার মাথার উপর বর্শাটা সঞ্চালিত করতে করতে খুব জোরে চীৎকার করছে।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত গাঁ-টায় হৈ-চৈ পড়ে গেল। টারজন দেখল গাঁয়ের কুঁড়েঘরগুলোতে ভিতর থেকে অসংখ্য সশস্ত্র যোদ্ধা ফাঁকা মাঠটা পার হয়ে ছুটে যেতে লাগল সেই গাছতলাটার দিকে। তাদের পিছনে যেতে লাগল গাঁয়ের যতসব বৃদ্ধ, নারী আর শিশু।

টারজন বুঝল এতক্ষণে ওরা কুলঙ্গার মৃতদেহটা দেখতে পেয়েছে। এবার সে নিকটবর্তী একটা কুঁড়েঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল ঘরের দরজাটা খোলা। ভিতরে কি আছে তা দেখার একটা কৌতূহল জাগল তার মনে। তাই সে নিঃশব্দে ঘরটার দরজার সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াল। কান পেতে শুনল ঘর থেকে কোন শব্দ আসছে কিনা। তারপর সে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। দেখল ঘরটার দেওয়ালে বর্শা, অদ্ভুত আকারের ছোরা প্রভৃতি অনেক অস্ত্র আর ঢাল সাজানো আছে। ঘরের কোণে অনেক ঘাস আর কতকগুলো মাদুর আছে। ঐগুলো হলো ওদের বিছানা।

একটা লম্বা বর্শা নেবার ইচ্ছা হলো টারজনের। কিন্তু সে অনেকগুলো বিষমাখা তীর নিয়ে যাবে বলে এখন আর বর্শা নিয়ে যেতে পারবে না। দেওয়াল থেকে একে একে অস্ত্রগুলো নামিয়ে ঘরের মাঝখানে সেগুলো রেখে তার উপর রান্নার পাত্রটা রেখে তার উপর মড়ার খুলিটা রাখল। সবশেষে কুলঙ্গার মাথার পোশাকটা চাপিয়ে দিল তার উপর। নিজের কাজ দেখে নিজেই হাসল টারজন।

এরপর ঘর থেকে বেরিয়ে সেই গাছতলায় এসে হাজির হলো।

গাছের পাতার আড়ালে এক নিরাপদ আশ্রয়ে বসে ওদের ব্যাপারটা দেখতে লাগল টারজন। দেখল চারজন লোক কুলঙ্গার মৃতদেহটা গাঁয়ের পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

টারজন দেখল জনাকতক লোক ঘরের মধ্যে ঢুকেই সবকিছু দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কি সব বলাবলি করতে লাগল। মবঙ্গা কি বলতেই কয়েকজন লোক কার খোঁজে

গোটা গাঁ খুঁজে তোলপাড় করতে লাগল। এমন সময় সেই গাছতলাটায় ওদের নজর পড়ল। ওরা দেখল সেই বিষমাখা তীরগুলোর মধ্যে দু একটা তীর আছে আর বাকিগুলো রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছে। তার উপর কড়াইটা উল্টোন।

এবার সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে গেল গাঁয়ের লোকেরা। ঘরের কাছে কুলঙ্গার আকস্মিক মৃত্যু, তার ঘরের মধ্যে রহস্যময় রসিকতা, এতগুলি তীরের অপহরণ—একসঙ্গে এই ঘটনাগুলি প্রায় একই সঙ্গে পর পর ঘটে গেছে। অথচ এই সব ঘটনার কোন কারণ তারা অনেক ভেবেও খুঁজে পেল না।

এদিকে তখন বেলা প্রায় দুপুর। সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি তার। তাই গাছের উপর দিয়ে ডালে ডালে তাদের ডেরার দিকে ফিরে যেতে লাগল টারজন। পথের মাঝখানে একবার কুলঙ্গার হাতে মারা সেই শুয়োরটার অবশিষ্ট মাংসটুকু খাবার জন্য ও কুলঙ্গার যে তীর ধনুক একটা গাছের উপর লুকিয়ে রেখেছিল তা নেবার জন্য থেমেছিল।

তার দলের কাছে টারজন যখন ফিরে এল তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেছে। টারজন যখন কার্চাক আর তার দলের সকলের সামনে অনেক তীর ও একটা ধনুক নামিয়ে তার দুঃসাহসিক অভিযানের কথা বলল তখন তার নিজের বুক গর্বে ও গৌরবে ফুলে উঠল।

তার এই সব গৌরবের কথা শুনে একমাত্র দলনেতা কার্চাকই ক্ষুব্ধ হয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

পরের দিন তার তীর ধনুক নিয়ে তীর ছোঁড়া অভ্যাস করতে লাগল টারজন। কিন্তু এইভাবে অভ্যাস করতে গিয়ে তার সব তীরগুলো চলে গেল।

টারজনের বাঁদরদল কেবিনটার আশেপাশে সমুদ্র-উপকূলের কাছাকাছি তখন শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। ফলে টারজন কেবিনটায় ঢুকে নিশ্চিন্তে অনেকক্ষণ কাটাতে পারত। একদিন কেবিনে একটা আলমারির পিছনে একটা ছোট বাক্স পেয়ে গেল টারজন।

বাক্স খুলতেই তার মধ্যে এক যুবকের ছবির সঙ্গে হীরকখচিত একটা সোনার হার আর একটা চিঠি পেল টারজন। ছবিটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল টারজন। সে জানত না ওটা তার বাবার ছবি। তবে তার মুখের হাসিটা খুব মিষ্টি লাগছিল। লকেটওয়ালা সোনার হারটা দেখেও খুব ভাল লাগল তার। তাই সে তার গলায় সেই সোনার হারটা পরে ফেলল।

এরপর চিঠিটা দেখতে লাগল টারজন। চিঠির অক্ষরগুলো সে চিনতে পারলে জানতে পারত যে ওটা কোন চিঠি নয়, তার বাবার লেখা ডায়েরী। ঐ ডায়েরীর মধ্যে তার জন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত লেখা আছে। তার জীবনের সব রহস্য জানতে পারত তার মধ্যে। ডায়েরীটা ফরাসী ভাষায় লেখা।

যাই হোক, সেই ডায়েরীর রহস্য তখন ভেদ করতে না পারলেও একটা সংকল্প তার মনের মধ্যে রয়ে গেল। সে রহস্য একদিন সে ভেদ করবেই।

বর্তমানে তার হাতে এখন গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ আছে। তার তীর সব ফুরিয়ে যাওয়ায় আবার তাকে মবঙ্গাদের সেই গাঁয়ে গিয়ে কিছু তীর চুরি করে আনতে হবে।

পরের দিন সকালেই বেরিয়ে পড়ল টারজন। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সেই মাঠটার কাছে পৌঁছে গেল সে। তখনো দুপুর হয়নি। সেদিনকার মত আবার তেমনি করে গাছের উপর ওৎ পেতে লুকিয়ে বসে রইল।

কখন গাঁয়ের লোকেরা সবাই ঘরে চলে যাবে এবং কখন মেয়েটা গাছতলা থেকে চলে যাবে তার সুযোগ খুঁজতে লাগল টারজন। এই সুযোগের অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গাছের উপর চুপচাপ বসে রইল।

অবশেষে দিন গিয়ে সন্ধ্যা হলো। মাঠের কাজ সেরে মেয়েরা একে একে ঘরে চলে গেল। গাছতলা থেকে মেয়েটাও গাঁয়ের ভিতর চলে গেল। গাঁয়ের গেট বন্ধ হয়ে গেল। টারজন দেখল গাঁয়ের ভিতর প্রতিটি কুঁড়ের সামনে মেয়েরা নানারকম খাবার তৈরী করছে।

হঠাৎ একটা গোলমালের শব্দ শুনতে পেল টারজন। দেখল একদল শিকারী দেরী করে ফিরেছে। তাই বন্ধ গেটের বাইরে চীৎকার করছে। সঙ্গে সঙ্গে গেট খুলে গেল আর তারা ভিতরে ঢুকে পড়ল। টারজন দেখল ওদের সঙ্গে একজন বন্দী ছিল। বন্দীটাকে শিকারদের সঙ্গে দেখতে পেয়েই গাঁয়ের নারী পুরুষ সকলে এক পৈশাচিক আনন্দে চীৎকার করতে লাগল। মেয়েরা লাঠি আর পাথর দিয়ে আঘাত করতে লাগল লোকটাকে। ওদের পাশবিক নিষ্ঠুরতা দেখে অবাক হয়ে গেল টারজন। সে দেখল তার মত যারা মানবজাতি তারাও সিংহী আর চিতাবাঘের মতই নিষ্ঠুর। মানবজাতির প্রতি ঘৃণা হতে লাগল টারজনের।

এবার টারজন দেখল বন্দীকে গাঁয়ের মাঝখানে এক জায়গায় মবঙ্গার ঘরের সামনে একটা লম্বা খুঁটি পুঁতে তার সঙ্গে বেঁধে রাখল গাঁয়ের লোকেরা। তারপর বন্দীকে ঘিরে ছুরি বর্শা প্রভৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে এক নাচের উৎসবের আয়োজন করতে লাগল। মেয়েরা পুরুষ যোদ্ধাদের পিছন থেকে ঢাক বাজাতে লাগল। এই উৎসবের প্রস্তুতি দেখে বাঁদর-গোরিলাদের দমদম উৎসবের কথা মনে পড়ে গেল টারজনের। এরপর কি হবে তা বুঝতে পারল। এরপর বন্দীটাকে ওরা পালাক্রমে আঘাত করবে বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে।

হঠাৎ একজনের হাত হতে একটা বর্শা বন্দীর দেহের একটা অংশকে বিদ্ধ করল। তার মানে এটা হলো সংকেত। এরপর পঞ্চাশটা বর্শা বন্দীর কান, নাক, চোখ, হাত, পা প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিদ্ধ করল একে একে। বন্দীটার মধ্যে তখনো কিছু চেতনা অবশিষ্ট ছিল। তবু ভয়ঙ্করভাবে পীড়ন চালিয়ে যেতে লাগল তারা তার উপর।

টারজন যখন দেখল গাঁয়ের যত সব সমবেত নরনারীর দৃষ্টি বন্দীটার উপর নিবদ্ধ তখন সে গাছ থেকে বিষমাখানো সব তীরগুলো একটা দড়িতে বেঁধে সেইখানেই রেখে দিল। তারপর তার উপস্থিতিটা তাদের জানিয়ে দেবার জন্য মতলব আঁটতে লাগল।

হঠাৎ কি মনে হতে সেদিন যে কুঁড়েটাতে গিয়েছিল সেই ঘরটাতে চুপি চুপি সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে গিয়ে হাজির হলো। অন্ধকার ঘরখানার মধ্যে সে ঢুকতেই একটা মেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা রান্নার পাত্র নিয়ে গেল। টারজন একটা দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মেয়েটা বেরিয়ে গেলে সে একটা নারকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আবার সেই গাছতলাটায় গিয়ে পৌঁছল টারজন। তারপর তীরের বাণ্ডিলটা নিয়ে গাছের একটা উঁচু ডালের উপর উঠে বসল। তারপর যখন দেখল মেয়েরা রান্নার জন্য জল গরম আর লোকগুলো মৃত বন্দীটার মাংস তৈরী করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তখন সে সেই নারকেল সজোরে ওদের মাঝখানে ছুঁড়ে দিল। নারকেলটা ভিড়ের মধ্যে একটা লোকের মাথায় লাগতেই সে মাটিতে পড়ে গেল।

সমবেত জনতা এতে দারুণ ভয় পেয়ে সকলে ছুটে পালিয়ে গেল আপন আপন ঘরে। আকাশ থেকে অকস্মাৎ একটা নারকেল পড়ায় তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন ভয়ে অভিভূত হয়ে গেল। পরে যখন তারা দেখল বিষমাখানো তীরগুলো কে নিয়ে গেছে আর কড়াইটা সেদিনকার মত উল্টোন অবস্থায় পড়ে আছে তখন তাদের ভয় আরও বেড়ে গেল। তারা ভাবল তারা হয়ত জঙ্গলের দেবতাকে রুষ্ট করেছে কোনভাবে। তাই তাঁকে তুষ্ট করার জন্য কিছু পূজা উপাচার দিতে হবে। সেই থেকে গাছতলাটায় রোজ কিছু খাবার রেখে দিত সেই বনদেবতার উদ্দেশ্য।

সেই রাতটা টারজন সেই গাছটা হতে কিছু দূরে কাটাল। তারপর সকাল হতেই সে তাদের ডেরার দিকে রওনা হলো। হঠাৎ টারজন দেখল তার থেকে কুড়ি পা দূরে একটা সিংহী দাঁড়িয়ে আছে। তার হলুদ জ্বলজ্বলে চোখদুটো টারজনের উপর নিবদ্ধ ছিল।
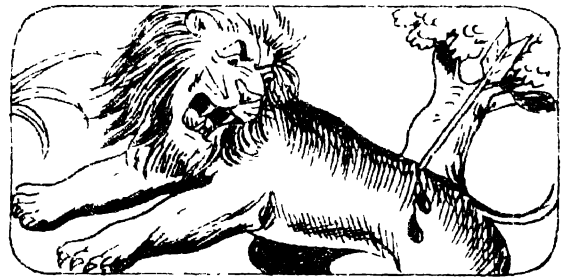
টারজন এই সুযোগ অনেকদিন ধরে খুঁজছিল। ফাঁসের দড়িটা তার ঘাড়ের উপর ছিল। কিন্তু এবার ফাঁসের দড়ির কোন প্রয়োজন নেই। এবার সে ধনুকে একটা তীর লাগিয়ে ছুঁড়ে দিল সিংহীটা লাফ দেবার আগেই। টারজন পাশে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা তীর ছুঁড়ে দিল। তীরটা সিংহীটার পাছায় লাগল। সিংহীটা গর্জন করে ঘুরে টারজনকে আক্রমণ করল। টারজন আবার একটা তীর ছুঁড়ল। এই তৃতীয় তীরটা সিংহীটার একটা চোখে লাগল।

চোখটা তীরবিদ্ধ হওয়ায় সিংহীটা ক্ষেপে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজনের উপর। টারজন সিংহীটার তলায় পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার ছুরিটা বার করে সিংহীটার পেটে বসিয়ে দিল। ক্রমে টারজন দেখল সিংহীটার দেহটা নিথর হয়ে ঢলে পড়ল।

তার উপর পড়ে থাকা সিংহীটার মৃতদেহ সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটা পা মৃতদেহের উপর রেখে বিজয়ী পুরুষ বাঁদর-গোরিলার মত উল্লাসে চীৎকার করে উঠল টারজন।
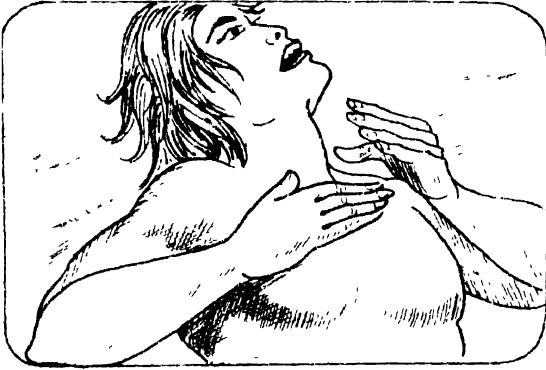
সিংহীর মাংসটা খেতে ভাল নয়। শক্ত আর কেমন বিদকুটে গন্ধ। তবু ক্ষিদের জ্বালায় বেশ কিছুটা খেয়ে চামড়াটা ছাড়িয়ে নিল। তারপর রোদে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল গভীরভাবে। পরের দিন উঠতে দুপুর হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ ধরে বনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটা হরিণ দেখতে পেল পথে। হরিণটা টারজনকে দেখতে পাবার আগেই তার একটা বিষাক্ত তীর এসে তার বুকে বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গে হরিণটা মরে পড়ে গেল ঝোপের ধারে। আবার পেট ভরে হরিণের মাংস খেল টারজন। কিন্তু এবার আর ঘুমোল না। সোজা ডেরার দিকে এগিয়ে চলল।

দলের সামনে টারজন গিয়েই সিংহীর চামড়াটা তাদের গর্বের সঙ্গে দেখাল। তারপর বলল, শোন কার্চাকের দলের বাঁদরেরা, দেখ দেখ, বিরাট হত্যাকারী টারজন কি করেছে। তোমাদের মধ্যে 'মুমাদের' দলের কাউকে মারতে পেরেছে? টারজন তোমাদের সব বাঁদরদের মধ্যে শক্তিশালী। টারজন হচ্ছে— 'মানুষ' একথাটা বলতে গিয়েও বলল না, কারণ মানুষ কাকে বলে তা বাঁদরেরা জানে না।

বাঁদরদলের সবাই টারজনের চারপাশে সমবেত হয়ে তার শক্তির কথা সব মন দিয়ে শুনতে লাগল। একমাত্র কার্চাক সরে গিয়ে টারজনের প্রতি তার ঘৃণা আর বিদ্বেষটাকে লালন করতে লাগল।

হঠাৎ কার্চাকের মাথায় একটা কুবুদ্ধি খেলে গেল। ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করতে করতে তার দলের অনেকগুলো বাঁদরের উপর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের কামড়াতে শুরু করে দিল। কয়েকজনকে মেরে ফেলল। তারপর তার প্রধান শত্রু টারজনের খোঁজ করতে লাগল। দেখল টারজন একটা গাছের নিচু ডালে বসে রয়েছে।

কার্চাক তখন সদম্ভে আহ্বান জানাল টারজনকে। বলল, নেমে এস টারজন! শক্তিশালী যোদ্ধারা কখনো শত্রুর ভয়ে গাছে উঠে থাকে না।

ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে পড়ল টারজন। কার্চাক তার দিকে এগিয়ে যেতেই দলের সবাই গাছের উপর এক একটা নিরাপদ জায়গা থেকে দেখতে লাগল। সাত ফুট লম্বা কার্চাকের বিশাল দেহটার উপর তার ছোট মাথাটা একটা গোলাকার বলের মত দেখাচ্ছিল। হাঁ করে দাঁতগুলো বার করে সে গর্জন করতে লাগল।

টারজনের হাতে তখন একমাত্র ছুরি ছাড়া আর কোন অস্ত্র ছিল না। তার তীর ধনুকটা একটু আগে কিছুটা দূরে নামিয়ে রেখেছে। কারণ সে তখন সিংহীর চামড়াটা সবাইকে দেখানোর জন্য ব্যস্ত ছিল।

যাই হোক, খাপ থেকে ছুরিটা বার করে এগিয়ে আসা কার্চাকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল টারজন। কার্চাক দুটো হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে এলে সে একটা হাত ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে তার ছুরিটা আমূল

বসিয়ে দিল কার্চাকের বুকের উপর হৃৎপিণ্ডটার একটু নিচে। কিন্তু ছুরিটা তার বুক থেকে তুলতে পারল না টারজন। সেটা তেমনি বুকের উপর গাঁথাই রয়ে গেল। কারণ কার্চাক তখন দাঁত বার করে টারজনের ঘাড়ের উপর একটা কামড় বসাতে যাচ্ছিল। দুজনে পরস্পরকে বধ করার জন্য প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছিল।

কিন্তু টারজনের ছুরিটা কার্চাকের বুকে আমূল তখনো বসে থাকায় কার্চাকের শক্তি প্রায় কমে আসছিল। সে যতবার দুহাত দিয়ে টারজনের দেহটাকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল, ততবারই টারজন ঘুষি মেরে সরিয়ে দিচ্ছিল কার্চাককে। অবশেষে কার্চাকের দেহটা শক্ত হয়ে বুকে ছুরি সমেত লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

টারজন তখন কার্চাকের বুক থেকে ছুরিটা বার করে তার মৃতদেহের উপর একটা পা তুলে দিয়ে তার বিজয়োল্লাসের দ্বারা সমস্ত বনভূমিকে ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত করে তুলল সে। এইভাবে প্রথম যৌবনেই বাঁদরদলের রাজা হয়ে উঠল টারজন।

দলের মধ্যে আর একজন ছিল যে টারজনের প্রভুত্বকে মানতে চাইত না। সে হলো তুবলাতের ছেলে টারকজ। কিন্তু টারজনের ধারাল চকচকে ছুরিটাকে দারুণ ভয় করত সে।

টারজন জানত কার্চাকের মত টারকজও সুযোগ খুঁজছে তার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য। সুযোগ পেলেই প্রভুত্বটা ছিনিয়ে নেবে তার কাছ থেকে।

একমাত্র দলপতির পরিবর্তন ছাড়া কয়েক মাস ধরে আর কোন ঘটনা ঘটেনি দলের মধ্যে। প্রায় দিন রাত্রিতে টারজন তার দলের সবাইকে দলপতি হিসাবে সেই নিগ্রোদের গাঁয়ের সামনের মাঠটায় নিয়ে যেত। সেখানে গিয়ে বাঁদরগুলো পেটভরে ফসল খেত।

এই সময় টারজনও মাঝে মাঝে সেই গাঁয়ের ধারে গাছতলাটায় গিয়ে বিষমাখানো তীর চুরি করে নিয়ে আসত। গাছতলায় জঙ্গলের দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যা খাবার থাকত টারজন তার কিছুটা খেত।

গাঁয়ের লোকেরা যখন দেখত গাছতলায় নামানো খাবার রাতের মধ্যে এসে কে খেয়ে গেছে, তখন তারা ভাবত নিশ্চয় দেবতা স্বয়ং এসেছিল। ভাবত রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাওয়া তীরগুলোও সেই দেবতাই হয়ত নিয়ে যায়। তখন তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে ভয়ের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। দলপতি মবঙ্গা তখন ভয়ে অন্য কোথাও সরে যাবার কথা ভাবে।

কিছুকাল সমুদ্রের উপকূলের ধারে বাঁদর-দলটা বাস করতে লাগল। কারণ তাদের দলপতি টারজন কেবিনটার কাছাকাছি থাকতে ভালবাসত। কিন্তু একদিন যখন তারা দেখল একদল কৃষ্ণকায় লোক কোথা থেকে এসে সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের জন্য কতকগুলো কুঁড়েঘর তৈরী করছে তখন তারা আবার এমন এক নতুন জায়গায় চলে গেল যেখানে মানুষ যায় না।

সেই গাঁ থেকে শিকারের জন্য তীর চুরি করে আনা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ল টারজনের পক্ষে। কারণ আগে যেখানে তীর রাখত প্রায়ই তীর চুরি হওয়ার জন্য সেখানে আর তীর রাখে না তারা। অন্য এক গোপন জায়গায় কোন ফসলের স্তূপের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। তার জন্য টারজন একদিন সমস্তক্ষণ একটা গাছের উপর পাতার আড়ালে লুকিয়ে রইল। তীরগুলোতে বিষ মাখিয়ে কোথায় তারা রাখে তা দেখে নিল।

এরপর দুবার রাত্রিকালে সেই গাঁয়ে গিয়ে একটা কুঁড়েঘর থেকে বেশকিছু তীর চুরি করে নিয়ে এল। গাঁয়ের সশস্ত্র যোদ্ধাগুলো সবাই তখন ঘুমোচ্ছিল। যে ঘরে তীর ছিল সে ঘরেও কিছু লোক ঘুমোচ্ছিল। টারজন নিরাপদে সেখান থেকে তীর নিয়ে বেরিয়ে এলেও সে বুঝল একাজ বিপজ্জনক এবং বার বার তা করা উচিত নয়। তাই সে আর রাত্রিতে গাঁয়ের ভিতর তীর চুরি করতে না গিয়ে পথে কোন নিগ্রো শিকারীকে দেখতে পেলে গাছের উপর থেকে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাকে বধ করে তার অস্ত্রগুলো সব কেড়ে নিত। অনেক সময় সেই সব মৃতদেহগুলো গলায় ফাঁস লাগা অবস্থায় গাঁয়ের পথে ফেলে রেখে দিত।

টারজনের কেবিনের কাছাকাছি যেসব নিগ্রোরা অন্য জায়গা থেকে এসে বসতি স্থাপন করে তারা কেবিনটাকে দেখতে পায়নি। তবু টারজন প্রায়ই ভয় করত, তারা যেকোন সময়ে কেবিনটাকে দেখতে পেলেই তার ভিতরকার জিনিসপত্র সব লুটপাট করে নিয়ে যাবে। এজন্য সে দল ছেড়ে প্রায়ই কেবিনের ভিতরে অথবা তার কাছে কাছে থাকত। ফলে দলপতি হিসাবে তার কাজকর্মে অবহেলা হতে লাগল। বাঁদরদলের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি হয়, বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং দলপতিকেই তা মেটাতে হয়। কিন্তু টারজন প্রায়ই অন্যত্র থাকায় দলের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সব অমীমাংসিত রয়ে যায়। এ নিয়ে একদিন দলের কয়েকজন প্রবীণ সদস্য টারজনের কাছে অভিযোগ জানাল। তাদের কথা মেনে নিয়ে একটা মাস টারজন দলের সঙ্গে সঙ্গে থেকে কাটাল।

একবার ট্যানা নামে একটা মেয়ে-বাঁদর এসে তার স্বামী গান্টোর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাল টারজনের কাছে। গান্টো তাকে মেরেছে, কামড়ে দিয়েছে। গান্টোকে ডাকলে সে এসে বলল ট্যানা বড় কুঁড়ে, সে তার স্বামীকে মোটেই দেখে না, ফল-মাকড় এনে দেয় না। টারজন দুপক্ষের কথা শুনে বিচার করে তাদের দুজনকেই তিরস্কার করল। গান্টো যেন তার স্ত্রীকে আর না মারে, মারলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে তাকে আর ট্যানাও যেন কর্তব্যকর্ম ঠিকমত করে চলে।

এই সব ছোটখাটো ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে দলের মধ্যে। টারজন এতে বিরক্তি বোধ করে। তার কেবলি মনে হয় দলের অধিপতি হয়ে দলের সঙ্গে সঙ্গে সব সময় থাকা মানেই তার ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করে ক্ষুণ্ণ করে চলা। তাছাড়া তার কেবিনটা আর আশপাশের জায়গাটাকে বড় ভাল লাগল তার। নির্জন উপকূল, সূর্যালোকিত সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি, কেবিনটার ভিতরের পরিচ্ছন্নতা, তারপর অসংখ্য বই-এর এক বিস্ময়কর জগৎ—এই সব কিছুর জন্য মনটা তার ব্যাকুল হয়ে থাকত সব সময়।

একদিন সমুদ্রের ধারে শুয়ে ছিল টারজন। টারজনের কাছ থেকে কিছু দূরে টারকজ তাদের দলের একটা বুড়ীকে তার চুলের মুঠি ধরে খুব জোর মারছিল আর বুড়ীটা চীৎকার করছিল।

টারকজ যখন দেখল টারজন তার তীর ছাড়াই শুধু হাতেই এগিয়ে আসছে তার দিকে, তখন সে তার প্রভুত্বকে অস্বীকার করে ইচ্ছা করে আরো বেশী করে বুড়ীটাকে পীড়ন করতে লাগল।

তারপর জোর লড়াই চলতে লাগল দুজনের মধ্যে। টারকজ তার বুকে আর মাথায় অনেকগুলো ছুরির আঘাত খেল। আর টারকজও তার দাঁত আর নখ দিয়ে টারজনের দেহের অনেক জায়গায় ক্ষত করে দিল। তার মাথার নিচে কপালের কাছে অনেকখানি চামড়া কেটে গিয়ে চোখের উপর ঝুলতে লাগল এমনভাবে যে সে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না। একসময় দুজনে গড়াগড়ি খেতে লাগল। অবশেষে টারজন টারকজের পিঠের উপর বসে তাকে বেকায়দায় ফেলে তার মাথাটা ধরে তার বুকের উপর নোয়াতে লাগল আর একটু চাপ দিলে তার ঘাড়টা ভেঙ্গে যেত এবং টারকজ মারা যেত।

টারজন অনেক ভেবে টারকজকে বাঁচিয়ে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য তার ঘাড়টা বুকের উপর নুইয়ে বলল, 'কা গোদা?' তার মানে তুমি এবার হার মানছ?

এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল টারকজ। বলল, 'কা গোদা।' অর্থাৎ হার মানছি।

এবার চাপ কিছু কমিয়ে দিল টারজন। কিন্তু একেবারে মুক্তি দিল না টারকজকে। বলল, শোন, আমি হচ্ছি বাঁদরদলের রাজা, বিরাট শিকারী, বিরাট যোদ্ধা। সারা জঙ্গলের মধ্যে আমার চেয়ে বড় আর কেউ নেই। তুমি হার মেনেছ আমার কাছে। দলের সবাই তা শুনেছে। আর কখনো তোমার রাজার সঙ্গে বা দলের আর কারো সঙ্গে ঝগড়া করো না। যদি তা করো তাহলে এর পরের বার তোমাকে মেরে ফেলব। বুঝলে?

টারকজ বলল, হুঁ।

এবার বাঁদরদলের দিকে তাকিয়ে টারজন বলল, তোমরা এতে সন্তুষ্ট?

সকলেই সমবেতভাবে উত্তর দিল, হুঁ।

টারজন এবার টারকজকে ধরে তুলে দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সকলে যে যার কাজে চলে গেল। যেন কিছুই হয়নি।

কিন্তু বাঁদরদলের সকলের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে রইল যে টারজন এক বিরাট যোদ্ধা আর এক অদ্ভুত প্রাণী। শত্রুকে বধ করার ক্ষমতা তার থাকা সত্ত্বেও তাকে ছেড়ে দিয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে দলের পুরুষ বাঁদরদের সকলকে এক জায়গায় ডেকে টারজন বলল, আজ তোমরা সকলে নিজের চোখে দেখেছ টারজন তোমাদের সবার থেকে বড়, সবচেয়ে শক্তিশালী।

তারা একবাক্যে সবাই বলল, হুঁ। টারজন সত্যিই মহান।

টারজন আরও বলল, টারজন কিন্তু তোমাদের মত বাঁদর নয়। তার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ আলাদা। সে তার জাতির লোকদের খোঁজে দূরে চলে যাবে সমুদ্রের ধার দিয়ে। তোমরা তোমাদের রাজাকে বেছে নাও দলের ভিতর থেকে। কারণ টারজন আর ফিরবে না।

এইভাবে শ্বেতাঙ্গদের সন্ধানে একা বেরিয়ে পড়ল যুবক টারজন।

বেশ কয়েকদিন ধরে কেবিনটাতেই সব সময় থেকে বিশ্রাম করতে লাগল টারজন।

দশ দিন পরেই সুস্থ হয়ে উঠল টারজন। শুধু চোখের কাছে কপালের ক্ষতটা রয়ে গেল।

টারকজের সঙ্গে লড়াইয়ে আহত হবার পর আবার দেহে শক্তি ফিরে পেয়েছে।

একদিন টারজন দেখল কতকগুলো কৃষ্ণকায় লোক

বনের ভিতর দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে পালাচ্ছে। কিন্তু তারা দেখতে পেল না টারজন কখন তাদের গতিপথে মাথার উপর একটা গাছের ডালের উপর উঠে ওৎ পেতে বসে আছে।

টারজন প্রথম দুজনকে গাছের তলা দিয়ে চলে যেতে দিল। কিন্তু তৃতীয় লোকটা গাছের তলায় এলেই তার দড়ির ফাঁসটা লোকটার গলায় আটকে দিয়ে তাকে গাছের উপর তুলতে লাগল। লোকটার সঙ্গীরা পিছন ফিরে তা দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল। টারজন তখন তাড়াতাড়ি লোকটাকে বধ করে তার অস্ত্র ও গয়নাগুলো নিয়ে নিল। তারপর তার কোমর থেকে হরিণের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে নিজে পরল। তাকে সত্যিই মানুষের মত সুন্দর দেখাচ্ছে। এবার তার ইচ্ছা হলো তার এই পোশাকটা বাঁদরদলের সবাইকে দেখায়।

টারজন এবার মৃতদেহটাকে কাঁধে করে গাঁয়ের গেটটার কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল। তারপর সে সেই গাছতলাটায় গিয়ে অনেকগুলো তীর নিয়ে বনদেবতার উদ্দেশ্যে রেখে দেওয়া খাবার খেয়ে চলে এল। এইভাবে তার কাজ হাসিল করে কেবিনে ফিরে এল টারজন।

সেদিন কেবিনে ফিরে এসে সমুদ্রের ধারে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখল টারজন। দেখল স্থল দিয়ে তিন দিকে ঘেরা এক প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়ের মত জায়গাটায় সমুদ্রের শান্ত জলের উপর একটা বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। আর বেলাভূমির কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা নৌকো। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো এই যে একদল শ্বেতাঙ্গ বেলাভূমি আর তার কেবিনটার মাঝখানে ঘোরাফেরা করছে। টারজন একটা গাছের উপর উঠে পাতার আড়াল থেকে লক্ষ্য করতে লাগল ওদের।
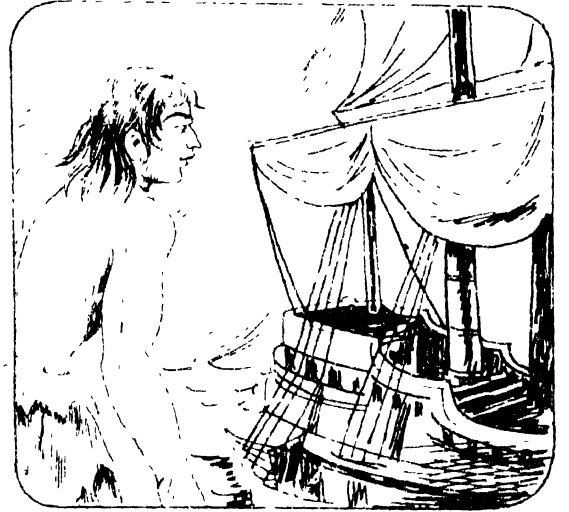
শ্বেতাঙ্গ লোকগুলো সংখ্যায় দশজন।

রিভলবারের গুলির আওয়াজ জীবনে প্রথম শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল টারজন। কিন্তু কোনরকম ভয় পেল না।

টারজন দেখল, দৈত্যাকার লোকটা একজনের গুলিতে মরে যাবার পর বাকি লোকগুলো নৌকোয় করে সেই জাহাজটায় গিয়ে উঠল। জাহাজের ডেকেও আরো কতকগুলো লোক ঘোরাফেরা করছিল।

এই অবসরে টারজন গাছ থেকে নেমে কেবিনে গিয়ে দেখল কারা তার ভিতরে ঢুকে সব জিনিসপত্র তচনচ করে দিয়ে গেছে। তার হঠাৎ কি মনে

পড়তেই ছুটে গিয়ে আলমারীটা খুলে দেখল টিনের বাক্সটা ঠিকই আছে। সেই ছোট্ট টিনের বাক্সটাতে ক্লেটনের একটা ফটো আর তার ডায়েরী ছিল যে ডায়েরীর লেখাগুলো সে পড়ে বুঝতে পারেনি।

টারজন কেবিনের জানালা দিয়ে দেখল জাহাজ থেকে একটা নৌকো নামিয়ে আর একদল লোককে চাপানো হচ্ছে তার উপর।

টারজন বুঝতে পারল ওরা নিশ্চয় তীরে এসেই এই কেবিনটায় আশ্রয় নেবে। হঠাৎ সে একটা কাগজ আর পেন্সিল দিয়ে একটা নোটিশের মত লিখে দরজার উপর টাঙ্গিয়ে দিল। তারপর সেই টিনের বাক্সটা, অনেকগুলো তীর আর বর্শাটা নিয়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

দুটো নৌকোয় করে কুড়িজন লোক মালপত্র নিয়ে বেলাভূমির রূপালি বালির স্তূপের উপর নামল। ওদের মধ্যে পনেরজন ছিল নাবিক। তাদের মুখগুলো ছিল শয়তানের মত দেখতে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল তারা নোংরা প্রকৃতির আর রক্তপিপাসু। বাকি পাঁচজন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। এই পাঁচজনের মধ্যে একজন ছিল বয়োবৃদ্ধ। তার মাথার চুলগুলো ছিল সাদা ধবধবে। বৃদ্ধের পিছনে ছিল লম্বা চেহারার এক যুবক, তার পরনে ছিল সাদা পোশাক। তার পিছনে ছিল আর একজন বয়োপ্রবীণ লোক। তার কপালটা খুব উঁচু এবং তার চালচলনের মধ্যে একটা উত্তেজনার ভাব ছিল। ওদের পিছনে ছিল একজন মোটাসোটা চেহারার নিগ্রো মহিলা। জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তার চোখগুলো ঘুরছিল। নাবিকগুলো যখন তাদের বাক্সপেটরাগুলো নৌকো থেকে নামাচ্ছিল নিগ্রো মহিলাটি তখন তাদের পানে তাকিয়েছিল। সবশেষে নামল উনিশ বছরের এক তরুণী। লম্বা চেহারার যুবকটি তাকে ধরে শুকনো বালির উপর নামিয়ে দিলে মেয়েটি তাকে ধন্যবাদ দিল।

এই পাঁচজনের দলটি নীরবে বেলাভূমি থেকে কেবিনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। মনে হলো এই কেবিনে এসে ওঠার ব্যাপারটা আগেই ঠিক হয়ে ছিল। নাবিকরা তাদের মালপত্রগুলো সব কেবিনটার মধ্যেই রেখে দিল।

সহসা দরজার উপর টাঙ্গানো নোটিশটার উপর একজন নাবিকের চোখ পড়তেই বলল, এ আবার কি? এটা ত একটু আগে ছিল না।

তখন অন্যান্য নাবিকরাও সেখানে জড়ো হয়ে ঘাড় উঁচু করে নোটিশটা দেখতে লাগল। বৃদ্ধ অধ্যাপক নোটিশটা জোরে চীৎকার করে পড়তে লাগল। এই বাড়িটা টারজনের। টারজন বন্য পশু আর কৃষ্ণকায় ব্যক্তির হত্যাকারী। টারজনের কোন জিনিসপত্র নষ্ট করবে না। সে সবকিছু লক্ষ্য রাখছে।

বাঁদরদলের রাজা টারজন।

নাবিকটা তখন বলে উঠল, কে এই শয়তান টারজন?

যুবকটি বলল, সে নিশ্চয় কোন ইংরেজ।

তরুণী মেয়েটি বলল, কিন্তু বাঁদর দলের রাজা টারজন কথাটার মানে কি?

যুবকটি বলল, তা ত জানি না মিস পোর্টার। আপনি কি বলেন অধ্যাপক পোর্টার?

অধ্যাপক আর্কিমেদিস পোর্টার চশমাটা ঠিক করে বললেন, খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। কিন্তু আমি যা বলেছি তার বেশী ত কিছু বলতে পারব না

ঘটনাটার ব্যাখ্যা করে।

তরুণীটি বলল, কিন্তু বাবা, তুমি ত কিছুই বলনি এবিষয়ে।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, থাম থাম বাছা। এই সব সমস্যামূলক ব্যাপার নিয়ে তোমার ছোট্ট মাথাটা ঘামিও না।

এই বলে তিনি তাঁর পায়ের তলার মাটিটার দিকে তাকিয়ে তাঁর পিছনের দিকে কোটের কোণটা ধরলেন।

ইঁদুরমুখো নাবিকটা তখন বলল, এই বুড়োটা আমাদের থেকে বেশী কিছুই জানে না।

নাবিকটার অপমানজনক কথায় রেগে গিয়ে যুবকটি বলল, তুমি যদি অধ্যাপক পোর্টার আর মিস পোর্টারের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার না করো তাহলে আমার হাতে বন্দুক না থাকলেও তোমার ঘাড়টা শুধু হাতে ভেঙ্গে দেব।

নাবিকটা এবার যুবক ক্লেটনের পিছন দিকে তাকিয়ে তার রিভলবারের ঘোড়াটার উপর হাত রাখল।

এতক্ষণ ওরা কেউ দেখতে পায়নি ওদের সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে একজন অদূরে একটা গাছের উপর পাতার আড়ালে বসে ওদের সব কাজকর্ম লক্ষ্য করছে। টারজন যখন প্রথম দেখে একটা নাবিক রিভলবার থেকে গুলি করে একজন লম্বা শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করে তখনই সে নাবিকটার এই বর্বর আচরণে রেগে যায়। তারপর যখন দেখল সেই নাবিকটা আবার ক্লেটন নামে এক সুদর্শন শ্বেতাঙ্গ যুবককে হত্যা করার জন্য তার রিভলবারে হাত দিয়েছে তখন আর থাকতে পারল না।

টারজন তখন তার হাতের বর্শাটা সেই উদ্ধত নাবিকটাকে লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে দিল। বর্শাটা গিয়ে নাবিকটার একটা কাঁধ গভীরভাবে বিদ্ধ করল।

ইঁদুরমুখো নাবিকটা যখন তার রিভলবারটা অর্ধেক বার করে গুলি করতে যায় এবং যখন অন্যান্য নাবিকরা তার পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তখনি অকস্মাৎ ঘটে যায় ঘটনাটা। বর্শার তীক্ষ্ণ ফলকের আঘাতে নাবিকটা পড়ে যায় মাটিতে।

অধ্যাপক পোর্টার তখন তাঁর সহকারী সম্পাদক স্যামুয়েল ফিলাণ্ডারকে নিয়ে বনের ভিতর ঘুরতে চলে গেছেন। নিগ্রো মহিলা এসমারাল্ডা তখন কেবিনের ভিতর মালপত্রগুলো গুছিয়ে রাখছিল। নাবিকটা ক্লেটনের পিঠ লক্ষ্য করে গুলি করতে গেলে মিস পোর্টার ভয়ে চীৎকার করে ওঠে। এমন সময় টারজনের বর্শাটা নাবিকটার ডান কাঁধটাকে বিদ্ধ করতে সে পড়ে যায়। তার রিভলবার থেকে তখন গুলিটা বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু কারো গায়ে লাগেনি।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নাবিকরা এসে তার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়ায়। অনেকে অস্ত্র হাতে বনের যেদিক থেকে বর্শাটা নিক্ষিপ্ত হয় সেদিকে তাকায়। কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে ভয় পেয়ে যায়। ক্লেটনও তখন ভিড়ের মাঝে এসে নাবিকের হাত থেকে পড়ে যাওয়া রিভলবারটা সকলের অলক্ষ্যে তুলে নিয়ে পকেটে রাখে।

জেন পোর্টার নামে তরুণীটি তখন বলে ওঠে, কে বর্শা ছুঁড়ল?

ক্লেটনও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বনের দিকে তাকাল। তারপর বলল, আমি জোর গলায় বলতে পারি বাঁদরদলের রাজা টারজন আমাদের লক্ষ্য করছে। বুঝেছি কাকে লক্ষ্য করে সে বর্শাটা ছোঁড়ে। তা যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে সে আমাদের বন্ধু।

কিন্তু তোমার বাবা ও ফিলাণ্ডার কোথায়? যেই হোক, জঙ্গলের মধ্যে সশস্ত্র একজন কেউ আছে।

অধ্যাপক পোর্টার ও ফিলাণ্ডারের নাম ধরে জোরে ডাকতে লাগল ক্লেটন। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পেল না। তখন উদ্বেগে বিহ্বল হয়ে ক্লেটন বলল, এখন কি করা উচিত মিস পোর্টার? আমি তোমাকে এই সব গলাকাটা লোকগুলোর কাছে একা রেখে যেতে পারি না। জঙ্গলেও আমার সঙ্গে যেতে পারবে না। অথচ তোমার বাবার অবশ্যই খোঁজ করা উচিত। এই গভীর জঙ্গলে আমাদের সকলেরই জীবন বিপন্ন। কিছু মনে করো না, তোমার বাবা ফিরে এলে আমাদের বিপদাপন্ন অবস্থার কথাটা বুঝিয়ে দিতে হবে তাঁকে।

জেন পোর্টার বলল, আমি মোটেই কিছু মনে করব না। এবিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

ক্লেটন আবার জেনকে বলল, তুমি রিভলবার ব্যবহার করতে পার? আমার কাছে একটা আছে। এইটা নিয়ে তুমি আর এসমারাল্ডা কেবিনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে থাকতে পারবে। আমি ততক্ষণে ওঁদের খোঁজ করে আসি।

ক্লেটনের কথামত কেবিনের মধ্যে চলে গেল জেন। ক্লেটন তখন নাবিকদের কাছে গিয়ে একটা রিভলবার চাইল। সে বনের ভিতরে যাবে। আহত নাবিকটা তখনো মরে নি। সে তার সঙ্গীদের বলল, ওকে অস্ত্র দিও না। সেই দীর্ঘদেহী শ্বেতাঙ্গ অফিসারকে খুন করার পর এই নাবিকটাই এখন তাদের ক্যাপ্টেন আর নাবিকদলের নেতা হয়েছে। অন্যান্য নাবিকরা তার বিরোধিতা করতে সাহস পায় নি।

রিভলবারটা না পেয়ে মাটির উপর পড়ে থাকা বর্শাটা হাতে নিয়ে জঙ্গলের ভিতর চলে গেল ক্লেটন। এদিকে জেন আর এসমারাল্ডা কেবিনের দরজা বন্ধ

করে ভিতরটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে তিনটে নরকঙ্কাল দেখতে পেয়ে ভয়ে চীৎকার করে উঠল এসমারাল্ডা।

জেন ভাবতে লাগল এই কঙ্কালগুলো কাদের, কিভাবেই বা তারা এখানে আসে এবং কোন অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে এরা নিহত হয়।

ক্লেটন জঙ্গলের মধ্যে চলে গেলে 'এ্যারো' নামে অপেক্ষমান জাহাজের বিদ্রোহী নাবিকরা সকলে সেই দুটো নৌকোয় করে জাহাজে চলে গেল।

আজ টারজন জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। আজ সে অল্প সময়ে এতকিছু দেখেছে যে তার মাথা ঘুরছিল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যে বস্তু সে দেখেছে তা হলো সুন্দরী তরুণী জেন পোর্টারের মুখখানা। টারজন বুঝল এই দলের মধ্যে যেসব শ্বেতাঙ্গরা রয়েছে তারা তারই মত মানুষ। তাছাড়া তাদের হাতে কোন অস্ত্র নেই; সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় তারা কাউকে খুন করেনি এবং নাবিকগুলোর মত তারা অন্ততঃ নিষ্ঠুর নয়। অবশ্য সে যদিও দেখেছে যুবকটি তার হাত থেকে রিভলবারটা তরুণীটিকে দিয়েছে তবু তার যুবকটিকে ভাল লেগেছে এবং নিগ্রো মহিলাটি সুন্দরী তরুণীর সঙ্গিনী বলে তাকেও তার ভাল লাগছে।

টারজন যখন দেখল দুর্বৃত্ত নাবিকগুলো জাহাজে চলে গেছে এবং জেনরা তার কেবিনের মধ্যে নিরাপদে আছে তখন যুবকের অনুসরণ করতে লাগল সে। যুবক কিজন্য বনের মধ্যে গেছে, বৃদ্ধ দুজনই বা কেন গেছে তা সে কিছুই জানে না। তবু তারা বিপদে পড়তে পারে এই ভেবে গাছের উপর উঠে তাদের খোঁজ করতে গেল।

গাছের ডালে ডালে এগিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লেটনের দেখা পেল টারজন। দেখল একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে ক্লান্ত হয়ে মুখের ঘাম মুছছে ক্লেটন। আর তার অদূরে শীতা বা একটা চিতাবাঘ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। চিতাবাঘটাকে দেখতে পায়নি ক্লেটন। মাঝে মাঝে সে দুজন লোকের নাম ধরে চীৎকার করে ডাকছিল। টারজন বুঝল সে সেই দুজন বৃদ্ধের খোঁজ করছে। চিতা-বাঘটাকে দেখতে না পেলে টারজন নিজেই সেই বৃদ্ধদের খোঁজ করতে চলে যেত।

শীতা বা চিতাবাঘটা ক্লেটনের উপর ঝাঁপ দেবার জন্য লাফ দিতে না দিতে বাঁদরগোরিলাদের মত ভয়ঙ্কর একটা চীৎকার করে উঠল টারজন। সেই গর্জন শুনে চিতাবাঘটা লেজ গুটিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ক্লেটন তা শুনে চমকে উঠল ভয়ঙ্করভাবে। তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। এমন বিকট চীৎকার জীবনে সে কখনো শোনেনি।

প্রথমে ক্লেটন বুঝে উঠতে পারল না এমন অবস্থায় কি সে করবে।

কিন্তু টারজন বুঝল ক্লেটন ভুল পথে যাচ্ছে। এই পথে গেলে মবঙ্গাদের গাঁয়ে গিয়ে উঠবে সে। বুঝল ক্লেটনের মত একজন শ্বেতাঙ্গ সামান্য একটা বর্শা হাতে নিয়ে সেখানে গেলে মৃত্যু তার অবধারিত।

টারজন এবার কি করবে তা ভেবে পেল না। যদি সে তাকে কেবিনে যাবার সঠিক পথ দেখিয়ে না দেয় তাহলে এই জঙ্গলে মৃত্যু তার অনিবার্য। তাছাড়া তার ডান দিকে অল্প কিছু দূরেই একটা নুমা বা সিংহ তার উপর ঝাঁপ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সিংহটা গর্জন করতেও শুরু করে দিয়েছে এবং তা শুনে ভয়ে সচকিত হয়ে বর্শাটা উঁচু করে ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্লেটন।

হঠাৎ তার মাথার উপর একটা অদ্ভুত চীৎকার শুনতে পেল ক্লেটন। একটু আগে সে এই চীৎকারই শুনেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্লেটন দেখল গাছের উপর থেকে একটা তীর এসে সিংহের গাটাকে বিদ্ধ করল। ক্লেটন একটু সরে গেল। সিংহটা তখন আবার তাকে আক্রমণ করার জন্য লাফ দিল। এবার ক্লেটন আশ্চর্য হয়ে দেখল দৈত্যাকার এক নগ্নদেহ মানুষ গাছ থেকে সিংহটার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল। এরপর যে দৃশ্য ক্লেটন দেখল তা সে জীবনে ভুলতে পারবে না কখনো। দৈত্যাকার সেই শ্বেতাঙ্গ মানুষটা সিংহটার কেশর ধরে খানিকটা উপর দিকে তুলে ডান হাত দিয়ে সিংহের ঘাড়টা জড়িয়ে ধরে ছুরিটা বাঁ দিকের ঘাড়ের উপর বারবার আমূল বসিয়ে দিতে লাগল। টারজন এই আক্রমণের কাজটা এত দ্রুত সেরে ফেলল যে সিংহটা প্রতিআক্রমণের কোন সুযোগ পেল না।

এবার তার সামনে সেই অদ্ভুতদর্শন দৈত্যাকার মানুষটাকে দেখতে লাগল ক্লেটন। কোমরে একটা পশুর চামড়া ছাড়া গায়ে আর কোন পোশাক-

আশাক বলতে কিছুই নেই। গায়ে ও পায়ে রয়েছে আদিম অধিবাসীদের মত কতকগুলো গয়না। গলায় হীরকের লকেটওয়ালা একটা সোনার হার। গায়ের রংটা তারই মত আর বয়সে সে তারই মত যুবক।

টারজন এবার শিকারের ছুরিটা খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে তার ফেলে দেওয়া তীর ধনুকটা কুড়িয়ে নিল। ক্লেটন ইংরিজি ভাষায় তাকে ধন্যবাদ দিল তার জীবন রক্ষার জন্য। কিন্তু টারজন লিখতে না জানলেও উচ্চারণ না জানায় কোন কথা বলতে পারল না। এরপর ছুরি দিয়ে সিংহের মৃতদেহটা থেকে কিছুটা মাংস কেটে খাবার সময় ক্লেটনকেও ডাকল। কিন্তু ক্লেটন কাঁচা মাংস খেতে পারে না বলে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খাওয়া হয়ে গেলে টারজন ইশারায় ক্লেটনকে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু ক্লেটন ভাবল লোকটা হয়ত তাকে জঙ্গলের গভীরে নিয়ে যাবে। সেজন্য সে তার সঙ্গে যেতে চাইল না। ক্লেটন একবার ভাবল এই হচ্ছে বাঁদরদলের টারজন। কিন্তু নাবিকের কাগজে ইংরিজি লেখা দেখে ভেবেছিল টারজন যে-ই হোক ইংরিজি জানে। কিন্তু এই লোকটা ইংরিজিতে কথা বলতে না পারায় সেবিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারল না ক্লেটন।

এদিকে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। টারজন তাকে পথ দেখিয়ে কেবিনে নিয়ে যাবে একথা ইশারায় ক্লেটন বললেও ক্লেটন তার সঙ্গে যেতে না চাওয়ায় তার জামার কলার ধরে তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল টারজন।

এদিকে কেবিনের মধ্যে সেই বেঞ্চটায় বসে এসমারাল্ডা ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। জেন তার পাশেই বসে ছিল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। জানা অজানা কত সব জন্তু জানোয়ারের ডাক শোনা যাচ্ছে। অথচ তাদের তিনজন লোকই জঙ্গলের কোথায় কি করছে তার কিছুই ঠিক নেই।

সহসা দরজার বাইরে কিসের একটা শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে উঠল জেন।

তার মনে হলো কোন একটা জন্তু তার ভারী দেহটা দিয়ে দরজায় চাপ দিচ্ছে। তার কিছু পরেই কেবিনের জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে বাইরে একটা সিংহকে দেখতে পেল। সিংহটা এবার জানালার গরাদের ভিতর দিয়ে মুখটা ঢোকাবার চেষ্টা করতে লাগল। তখন আকাশে চাঁদ থাকায় চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল সিংহটাকে।

সিংহের মুখটা দেখে আর তার ডাক শুনে এসমারাল্ডা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর।

হঠাৎ জেনের মনে পড়ল ক্লেটন তাকে একটা রিভলবার দিয়ে গেছে। এবার সে সিংহের মুখের কাছে রিভলবার নিয়ে গিয়ে একটা গুলি করল। সঙ্গে সঙ্গে সিংহটাও নেমে গেল জানালার গরাদ থেকে।

সিংহটা মরেনি। গুলি তার ঘাড়ের কাছে একটু লেগে যায়। গুলির কর্ণবিদারক শব্দে আর চোখ-ধাঁধানো ঝলকানিতে ভয় পেয়ে কিছুটা সরে যায় সিংহটা। পরমুহূর্তেই সে নতুন উদ্যমে ও প্রচণ্ড রাগে আবার জানালার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু এবার ঘরের দুজন বাসিন্দাই নীরব হয়ে শুয়ে আছে। আর কোন বাধা না পেয়ে এবার সে গরাদের ফাঁক দিয়ে তার মুখ আর কাঁধদুটো একটু একটু করে ঢোকাতে লাগল। আর একটু হলেই সে তার গোটা দেহটা

ঢুকিয়ে দেবে।

জেন সহসা চোখ মেলে এই দৃশ্যই দেখতে পেল।

পথ চলতে চলতে ক্লেটন একটা গুলির শব্দ শুনে ভয় পেয়ে যায়। জেনের জন্য শঙ্কা বেড়ে যায় তার।

অবশেষে তারা উপকূলের কাছে ফাঁকা জায়গাটায় এসে পড়ল। টারজন ক্লেটনকে নিয়ে একশো ফুট উঁচু একটা গাছের উপর থেকে নেমে পড়ল। ওরা মাটিতে নেমেই দেখল কেবিনের জানালার উপর একটা সিংহ দাঁড়িয়ে গরাদের ভিতর দিয়ে ভিতরে মুখটা ঢুকিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে টারজন দ্রুত গতিতে সেখানে গিয়ে সিংহটার পিছনের পা দুটো ধরে টানতে লাগল। ক্লেটনও গিয়ে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করতে লাগল।

টারজন ক্লেটনকে বলল তার পিঠের তূণ থেকে একটা বিষাক্ত তীর আর কোমর থেকে ছুরিটা বার করে সেগুলো সিংহটার পিঠের উপর যেন সে বসিয়ে দেয়। কিন্তু ক্লেটন তার কথা বুঝতে পারল না। এদিকে টারজন সিংহটাকে ছাড়তেও পারছিল না।

ওদিকে জেন চেতনা ফিরে পেয়ে যখন দেখল সিংহটা এবার ঘরে ঢুকবেই এবং তাদের দুজনের জীবন্ত দেহ থেকে মাংস ছিঁড়ে খাবে তখন সে ঘরের মেঝে থেকে রিভলবারটা তুলে নিয়ে গুলি করে তাদের দুজনকেই হত্যা করার কথা ভাবছিল যাতে সিংহটা তাদের জীবন্ত ধরতে না পারে। এমন সময় সে দেখল বাইরে থেকে দুজন লোক সিংহটাকে টেনে জানালা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ক্লেটন এবার কেবিনের মধ্যে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে জেনকে দরজা খুলতে বলল। জেনও তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ক্লেটনকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিল। বলল, ঐ বিকট চীৎকারটা কিসের?

ক্লেটন বলল, যে ব্যক্তিটি সিংহীটাকে মেরে তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে এ চীৎকার তারই।

এবার ক্লেটনের সঙ্গে বাইরে গিয়ে মরা সিংহীটাকে একবার নিজের চোখে দেখল জেন। কিন্তু টারজনকে দেখতে পেল না ওরা। তার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে সে কোথায়। ওরা আবার ঘরের মধ্যে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। জেন বলল, কী বিকট চীৎকার! এ চীৎকার কোন মানুষের হতে পারে না।

ক্লেটন বলল, হ্যাঁ মিস পোর্টার। আমি দেখেছি। তবে সে হয় মানুষ অথবা কোন বনদেবতা।

এরপর বনের মধ্যে যা যা ঘটেছিল, টারজন কিভাবে তার প্রাণ বাঁচায় তার সব কথা একে একে বলল জেনকে। সেই সঙ্গে বাদামী রঙের চামড়া, সুন্দর মুখ, অমিত আশ্চর্য শক্তি আর অবিশ্বাস্য দ্রুতগতি-সম্পন্ন সেই মানুষটার প্রতি শ্রদ্ধা জানাল ওরা দুজনেই।

ক্লেটন বলল, প্রথমে ভেবেছিলাম ঐ লোকটাই হলো টারজন। কিন্তু পরে দেখলাম ও ইংরিজি ভাষা বোঝে না, কথা বলতেও পারে না। সুতরাং ও কখনই টারজন নয়।

জেন বলল, ও যেই হোক, ওর কাছে আমরা আমাদের জীবনের জন্য ঋণী। ঈশ্বর ওর মঙ্গল করুন। ওর জঙ্গলজীবন নিরাপদ করুন।

কেবিন থেকে কয়েক মাইল দূরে বালুকাময় এক বেলাভূমির উপর দুজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়েছিল। দুজনে কোন একটা বিষয় নিয়ে তর্ক করছিল।

প্রায় প্রতি মুহূর্তেই বন্য জীবজন্তুর গর্জন শোনা যাচ্ছিল। কেবিনটাতে ফিরে যাবার জন্য অনেক চেষ্টা

করেছে তারা। মাইলের পর মাইল ধরে বহু বনপথ পার হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই ভুল পথে এগিয়ে গেছে।

এখন তাদের সামনে একমাত্র সমস্যা কিভাবে তাদের শিবিরে ফিরে যাবে। কোন পথে গেলে কেবিনটাকে খুঁজে পাবে। এরই উপর নির্ভর করছে তাদের জীবনমৃত্যু।

ফিলাণ্ডার ঝোপের দিকে তাকিয়ে বলল, ঈশ্বরের নামে বলছি অধ্যাপক, বোধ হয় একটা সিংহ।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, হ্যাঁ, খারাপ ভাষায় যদি বল তাহলে ওটা সিংহ। কিন্তু আমি বলছিলাম—

'সিংহটা আমাদের অনুসরণ করছে।' এই বলে ফিলাণ্ডার ছুটতে লাগল।

অধ্যাপক পোর্টার তখন বললেন, থাম থাম ফিলাণ্ডার। এইভাবে ছোটাটা আমাদের মত শিক্ষিত লোকের কখনো শোভা পায় না।

কিন্তু এবার অধ্যাপক নিজে পিছন ফিরে তাকিয়ে সিংহটার হলুদ চোখদুটো আর আধখোলা মুখের দাঁতগুলো দেখে ফিলাণ্ডারের পিছু পিছু তিনিও ছুটতে লাগলেন।

অদূরে একটা গাছ থেকে একজোড়া চোখ তাদের সবকিছু লক্ষ্য করছিল। সে চোখ হচ্ছে টারজনের। টারজন তাদেরই খোঁজ করতে করতে এখানে এসে পড়ে।

টারজন যখন দেখল ফিলাণ্ডার ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন যে গাছে সে বসেছিল সেই গাছের নিচু ডালটা থেকে তার জামার কলার ধরে গাছের উপর উঠিয়ে নিল তাকে। তারপর অধ্যাপক পোর্টার সেই গাছের তলায় এলে তাঁকেও তুলে নিল টারজন। নুমা বা সিংহটা তখন তার শিকার হাতছাড়া হয়ে যেতে হতবুদ্ধি হয়ে একটা লাফ দিয়ে গর্জন করে উঠল একবার।

এদিকে টারজনের গর্জন শুনে হঠাৎ চমকে উঠে

ফিলাণ্ডার পড়ে যাচ্ছিল গাছের ডাল থেকে। তার উপর অধ্যাপক পোর্টার ঢলে পড়ায় সে টাল সামলাতে না পারায় দুজনেই দুজনকে জড়াজড়ি করে পড়ে গেল গাছ থেকে।

কিছুক্ষণ তারা দুজনেই চুপ করে মরার মত শুয়ে রইল। ভাবল তাদের হাত পা হয়ত ভেঙ্গে গেছে।

কিছুক্ষণ পর প্রথমে দু হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অধ্যাপক পোর্টার।

ফিলাণ্ডার এবার ধীরে ধীরে উঠে দাড়াল। দেখল তারও হাত পা ভাঙ্গেনি এবং দেহের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অক্ষত আছে। এমন সময় নগ্নদেহ টারজনের দৈত্যাকার মূর্তিটা দেখে অধ্যাপক পোর্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অধ্যাপক পোর্টার দেখল সত্যিই তাদের সামনে একটা কৌপীন আর কতকগুলো ধাতুর গয়না পরা একটা নগ্নদেহ দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে।

অধ্যাপক টারজনকে অভিবাদন করে বলল, শুভ সন্ধ্যা স্যার।

তার উত্তরে টারজন নীরবে তাকে অনুসরণ করার জন্য ইশারা করল।

ফিলাণ্ডার বলল, আমার মনে হয় ওকে অনুসরণ করাই আমাদের উচিত।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, কিছু আগে তুমি আমাকে বুঝিয়েছিলে আমাদের শিবিরটা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এবং সেইমত আমরা এগোচ্ছিলাম। সুতরাং আমাদের দক্ষিণ দিকেই যেতে হবে।

কিন্তু এবিষয়ে ওদের তর্কবিতর্ককে আর এগোতে দিল না টারজন। সে তার দড়িটা দিয়ে ওদের দুজনের ঘাড় দুটোকে বেঁধে ওদের টেনে নিয়ে যেতে লাগল। তখন দুজনেই আর বাধা না দিয়ে স্বেচ্ছায় অনুসরণ করতে লাগল টারজনকে। যেতে যেতে অধ্যাপক পোর্টার একবার ফিলাণ্ডারকে বললেন, থাম থাম ফিলাণ্ডার, এই সব জোর জবরদস্তিমূলক কৌশলের কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়। কিন্তু সে বাধা টেকেনি।

এইভাবে টারজনের সঙ্গে অনেকক্ষণ যাওয়ার পর ওরা ওদের সামনের কেবিনটাকে দেখতে পেল। কেবিনের কাছে এসে ওদের গলা থেকে দড়ির বাঁধনটা খুলে দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল টারজন।

অধ্যাপক পোর্টার তখন বললেন, এখন দেখছ ফিলাণ্ডার, আমি যা বলেছিলাম তাই ঠিক। তোমার গোঁড়ামির জন্য কত বিপদে পড়তে হলো আমাদের।

এরপর কেবিনে গিয়ে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সকাল পর্যন্ত তারা তাদের ভয়ঙ্কর কত সব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে লাগল।

সব শুনে এসমারাল্ডা বলল, ও মানুষ নয় যেন এক দেবদূত। ঈশ্বর একে আমাদের উদ্ধারের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ক্লেটন রসিকতার সুরে হেসে বলল, যদি তুমি মরা সিংহের কাঁচা মাংস খেতে স্বচক্ষে দেখতে এসমারাল্ডা তাহলে বলতে ও এই মর্ত্যেরই দেবদূত।

গতকাল সকাল থেকে ওদের কারো কিছু খাওয়া হয়নি। তাই এবার ওরা খাবার তৈরীর কথা ভাবল। নাবিকরা ওদের এখানে নামিয়ে দেবার সময় ওদের পাঁচজনের জন্য কিছু শুকনো মাংস, ময়দা, শাকসব্জী, বিস্কুট, চা, কফি প্রভৃতি দিয়ে যায়। কিন্তু তাতে ওদের ক্ষিদে মিটবে না।

কিন্তু যা হোক কিছু খাওয়ার পরই ওদের এই কেবিনটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তাকে বসবাস-যোগ্য করে তুলতে হবে। তবে ঠিক হলো প্রথমেই ঘর থেকে কঙ্কালগুলো সরাতে হবে। অর্থাৎ মাটি খুঁড়ে কবর দিতে হবে।

অধ্যাপক পোর্টার কঙ্কালগুলো পরীক্ষা করে বললেন, বড় কঙ্কালদুটো কোন এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আর এক শ্বেতাঙ্গ নারীর। ছোট কঙ্কালটা অবশ্যই এই হতভাগ্য দম্পতির ছেলের। ক্লেটন পুরুষ কঙ্কালটার হাতের আঙ্গুলে একটা আংটি দেখতে পেল। আশ্চর্য হয়ে সে দেখল আংটিটাতে তাদের গ্রেস্টোক পরিবারের চিহ্ন রয়েছে।

এমন সময় জেন একটা বই খুলে তার প্রথম পাতাতেই দেখল 'জন ক্লেটন, লণ্ডন' এই কথাগুলো লেখা রয়েছে। আর একটা বইয়ে শুধু গ্রেস্টোক এই নামটা লেখা আছে।

জেন আশ্চর্য হয়ে ক্লেটনকে বলল, এর মানে কি মাস্টার ক্লেটন? এখানে তোমাদের পরিবারের লোকজনের নাম এল কোথা থেকে?

ক্লেটন গম্ভীরভাবে উত্তর করল, আমার কাকা জন ক্লেটন নিখোঁজ হবার পর গ্রেস্টোক পরিবারের এই আংটিটা পাওয়া যাচ্ছিল না। আমরা জানতাম আমার কাকা সমুদ্রে ডুবে যান।

জেন আবার বলল, কিন্তু এই আফ্রিকার জঙ্গলে কি করে এলেন তাঁরা?

হয়ত সমুদ্রে জাহাজডুবিতে তাঁদের মৃত্যু ঘটেনি, এই কেবিনেই তাঁদের মৃত্যু হয়। মেঝের উপর পড়ে থাকা তাঁর ঐ কঙ্কালই তার প্রমাণ।

জেন বলল, তাহলে ঐ কঙ্কালটা হলো তাঁর স্ত্রী লেডী গ্রেস্টোকের।

ক্লেটন বলল, সুন্দরী লেডী এ্যালিসের রূপগুণের কত কথাই না বাবা মার কাছ থেকে ছোটবেলায় শুনেছি। হায় হতভাগিনী মহিলা!

যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে কঙ্কালগুলোকে সমাহিত করল ওরা কেবিনের পাশে। দুটো কবরের মাঝখানে একটা ছোট কবরে সমাহিত করা হলো কালার মৃত শিশুর কঙ্কালটাকে। এই শিশু কঙ্কালটাকে কবরের ভিতর রাখতে গিয়ে ফিলাণ্ডার আশ্চর্য হয়ে একবার অধ্যাপক পোর্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কারণ এত বড় লম্বা চওড়া কোন মানবশিশু সে কখনো দেখেনি।

টারজন দূর থেকে একটা গাছের উপর থেকে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে লাগল।

কবরে মাটি চাপা দেওয়ার কাজটা হয়ে গেলেই কেবিনের মধ্যে ফিরে এল ওরা।

হঠাৎ সমুদ্রের উপর চোখ পড়তেই চমকে উঠল এসমারাল্ডা। ঐ দেখ, এ্যারো নামে জাহাজটা আমাদের এখানে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে।

ক্লেটন বলল, ওরা বলেছিল আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে যাবে আমাদের হাতে।

জেন বলল, এটা হচ্ছে স্নাইপ নামে সেই পাজী লোকটার কাজ। কিং নামে যে লোকটাকে ওরা মেরে ফেলল সে থাকলে আমাদেব আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত অস্ত্র দিয়ে যেত।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, যাবার আগে আমাদের সঙ্গে দেখা না করে ওরা চলে যাওয়ায় আমি দুঃখিত। আমি ভেবেছিলাম আমার ধনরত্ন যা আছে ওদের কাছে তা আমাদের দিয়ে যেতে বলব। তা না হলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

জেন তার বাবার পানে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর বলল, ওদের সেকথা বললেও তাতে কোন ফল হত না বাবা। কারণ ঐ ধনরত্নের জন্যই ওরা

অফিসারকে খুন করে আমাদের এখানে ফেলে রেখে গেছে।

অধ্যাপক পোর্টার হাতদুটো জড়ো করে পিছনে কোমরের উপর রেখে জঙ্গলের দিকে একাই চলে গেলেন।

জাহাজটার গতিবিধি লক্ষ্য করে সমুদ্রের ধারে গাছের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল টারজন।

টারজন দেখল জাহাজটা মৃদুমন্দ বাতাসে ধীর গতিতে কূলের দিকে আবার এগিয়ে আসছে। একটা নৌকো জাহাজ থেকে নামানো হলো। তাতে একটা বড় সিন্দুক চাপানো হলো। নৌকোটা কূলে এসে ভিড়তেই কয়েকজন লোক সিন্দুকটা কূলের উপর নামাল।

এবার স্নাইপ নামে সেই ইঁদুরমুখো নাবিকটা নৌকো থেকে অন্য সব লোকজনদের ডাকতেই তারা কোদাল গাঁইতি প্রভৃতি নিয়ে মাটি খোঁড়ার জন্য এগিয়ে এল।

স্নাইপ প্রভুত্বের সুরে তাদের হুকুম করতে একজন নাবিক বলে উঠল, তুমি কি করবে?

স্নাইপ বলল, আমি এখন ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন হয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে মাটি খুঁড়ব, এটা নিশ্চয় তোমরা চাও না?

স্নাইপ তাদের রিভলবারের ভয় দেখাতে টারান্ট নামে একজন নাবিক কুড়ুল দিয়ে অতর্কিতে স্নাইপের মাথায় আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে স্নাইপের মাথাটা দু ফাঁক হয়ে গেল এবং সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তারপর তারা সকলে মিলে মাটি খুঁড়ে অনেকটা খাল করে সিন্দুকটা বসিয়ে তার উপর স্নাইপের

মৃতদেহটা শুইয়ে দিল। স্নাইপের কাছে যেসব অস্ত্র, পোশাক আর লোভনীয় জিনিস ছিল তা সব তারা নিয়ে নিল।

কাজ সেরে নাবিকরা সবাই নৌকোয় করে জাহাজে গিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। জাহাজটা ধীর গতিতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

গাছ থেকে নেমে পড়ল টারজন। দেখল একটা কোদাল পাশের ঝোপের মধ্যে ফেলে রেখে গেছে নাবিকরা। সেই কোদালটা দিয়ে সে কবরটার নরম মাটিগুলো আবার খুঁড়তে লাগল। তারপর সিন্দুকটা বার করে স্নাইপের মৃতদেহটা তার মধ্যে রেখে আবার মাটি চাপা দিয়ে দিল। তারপর কোদালটা দড়ি দিয়ে বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে সিন্দুকটা অনায়াসে কাঁধে নিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলল। জঙ্গলের গভীরে সে এমন একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজল যেখানে সে এটা পুঁতে রাখতে পারবে। লোহার সিন্দুকটায় ভারী তালা লাগানো থাকায় সে এটা বুঝতে পেরেছে যে এর মধ্যে নিশ্চয় কোন মূল্যবান বস্তু আছে।

কয়েক ঘণ্টা পথ চলার পর একদিন যেখানে তার দলের বাঁদর-গোরিলারা দমদম নাচের উৎসব করেছিল সেখানে গিয়ে হাজির হলো সে। তারপর সেই ফাঁকা জায়গাটায় কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে অনেকটা খাল করে সিন্দুকটা পুঁতে রাখল। অবশেষে কাজ সেরে গাছের উপর দিয়ে যখন কেবিনের কাছটায় গিয়ে পৌঁছল তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

কেবিনের কাছে গিয়ে টারজন দেখল কেবিনের ভিতর আলো জ্বলছে। জেন টেবিলের উপর কাগজ রেখে কি লিখছিল আর এসমারাল্ডা পুরু ঘাস বিছিয়ে তার উপর বিছানা পেতে ঘুমোচ্ছিল।

টারজন দেখল ঘরটা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। সে তখন জানালা দিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে জেনের পাণ্ডুলিপিটা তুলে নিয়ে সেটা তার তূণের মধ্যে ভরে রেখে বনের মধ্যে চলে গেল।
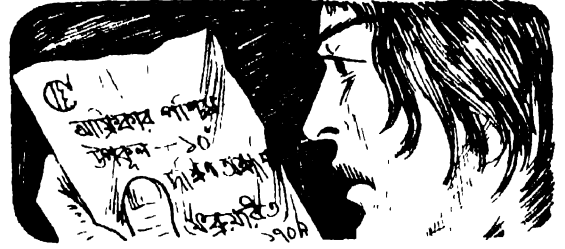
পরের দিন সকালে উঠেই টারজন কুড়ি মিনিট ধরে ক্রমাগত চেষ্টা করে যেতে লাগল লেখাগুলো পড়ার জন্য। অবশেষে দুই একটা শব্দ এখানে ওখানে বুঝতে পারল। তার অন্তরটা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। আরো এক ঘণ্টা চেষ্টা করার পর সে সব লেখাগুলো পড়তে পারল। কাগজটাতে লেখা ছিল :

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল, ১০° দক্ষিণ অক্ষাংশ।
ফেব্রুয়ারি ৩, ১৭০৯।

প্রিয় হেজেল,

নির্বোধের মত এ চিঠি লিখছি তোমায়, কারণ এ চিঠি তুমি কোনদিন পাবে কি না তা জানি না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ্যারো জাহাজে করে ইউরোপ থেকে রওনা হবার পর থেকে যেসব ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সেই সব অভিজ্ঞতার কথা কাউকে না বলে পারছি না। যদি আমরা সভ্য জগতে আর না ফিরি এবং তারই সম্ভাবনা বেশী, তাহলে যেসব ঘটনাবলী আমাদের সকরুণ পরিণতির দিকে নিয়ে যায় তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ অন্ততঃ এই চিঠির মধ্যে পাওয়া যাবে।

তুমি জান, আমরা এক বৈজ্ঞানিক অভিযানে ইউরোপ থেকে কঙ্গো প্রদেশের পথে রওনা হই। আমার বাবার বিশ্বাস এক অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন কঙ্গো উপত্যকার গর্ভে নিহিত আছে। কিন্তু সমুদ্রপথে আসার সময় এক আসল সত্যের সন্ধান পাই আমরা।

বাল্টিমোরের এক বইপোকা পাঠক একখানা বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে ১৫৫০ সালে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা একটি চিঠি আবিষ্কার করেন। তাতে লেখা ছিল স্পেন থেকে দক্ষিণ আমেরিকাগামী একটি স্প্যানিশ জাহাজের বিদ্রোহী একদল নাবিক প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী হয়। তবে যতদূর মনে হয় জলদস্যু হিসাবেই এই ধনরত্ন অধিকার করে তারা।

পত্রলেখক এই প্রসঙ্গে আরও লেখে স্পেন থেকে একটি জাহাজে করে রওনা হবার এক সপ্তাহ পরেই সে জাহাজের নাবিকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে জাহাজের সব অফিসার ও সুযোগ্য নাবিকদের হত্যা করে। ফলে এতে তাদেরই ক্ষতি হয়। কারণ জাহাজ চালাবার মত কোন সুযোগ্য নাবিক আর কেউ ছিল না তাদের মধ্যে।

কোন না কোনভাবে উদ্ধার হবার আশায় তিন বছর সেখানে বাস করে ঐ দশজন নাবিক। পরে নানারকম রোগে ভুগতে ভুগতে মাত্র একজন ছাড়া সকলেই মারা যায় একে একে। এই জীবিত নাবিকটিই চিঠিখানি লেখে।

সৌভাগ্যক্রমে সে উত্তর দিকেই যাচ্ছিল এবং সপ্তাহখানেকের মধ্যেই স্পেনদেশীয় এক পণ্যবাহী জাহাজের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে যায় তার সঙ্গে। জাহাজটি তখন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে স্পেনে যাচ্ছিল। জাহাজটি তাকে সেই নৌকো থেকে তুলে নিয়ে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন তার সব কথা শুনে তাকে বলে যে দ্বীপে সে ছিল এবং যে দ্বীপ থেকে এসেছে সে দ্বীপটি হল ১৬° বা ১৭° উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত আফ্রিকার
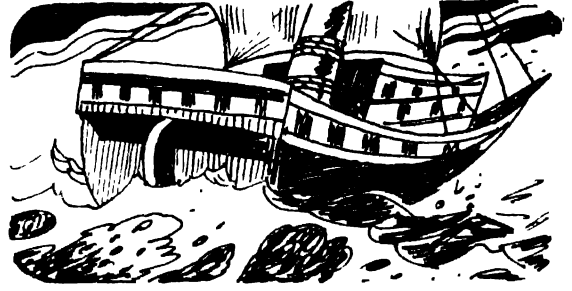
পশ্চিম উপকূলের অন্তর্গত কেপ ভার্দে ছাড়া আর কিছু নয়।

পত্রলেখক সেই দ্বীপটি এবং যে জায়গায় ধনরত্ন-ভরা সিন্দুকটি পুঁতে রাখা হয় তার কথা বিস্তারিত-ভাবে লেখে এবং তার সঙ্গে জায়গাটার একটা মানচিত্রও জুড়ে দেয়।

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম আমরা এক বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে যাচ্ছি। কিন্তু বাবা যখন তাঁর আসল উদ্দেশ্যের কথা আমাকে বললেন তখন আমি দমে গেলাম। যখন শুনলাম তিনি এই সন্ধানকার্যের জন্য রবার্ট ক্যানলারের কাছ থেকে আরও দশ হাজার ডলার ঋণ নিয়েছেন তখন বুঝলাম আরও তিনি ঠকবেন! এই ঋণের ব্যাপারে আমার দুঃখ ও উদ্বেগ আরো বেড়ে গেল। বাবা সেই চিঠি আর মানচিত্রটার জন্য ঐ দশ হাজার ডলারই খরচ করেন।

ক্যানলার তার টাকার জন্য কোন সুদ বা নিরাপত্তাসূচক কোন বন্ধকী জিনিস চায়নি। কিন্তু বাবা সে টাকা শোধ দিতে না পারলে আমার ভাগ্যে কি ঘটবে তা আমি জানি। লোকটাকে আমি সত্যিই দারুণ ঘৃণা করি।

দীর্ঘ কাহিনীটাকে এবার সংক্ষিপ্ত করা যাক। আমরা মানচিত্রে নির্দিষ্ট দ্বীপ আর বহুআকাঙ্খিত ধনরত্ন ভরা সিন্দুকটা পেয়ে যাই যথাসময়ে। লোহার সিন্দুকটা অনেকগুলো পালের কাপড় দিয়ে জড়ানো ছিল। সেটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন দু'হাজার বছর ধরে মাটির ভিতর পোঁতা আছে সেটা। সিন্দুকটা ছিল শুধু অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রায় ভরা এবং এত

ভারী যে চারজন লোকে সেটা বয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এত ধনরত্নে ভরা সিন্দুকটা সত্যিই কি ভয়ঙ্কর বস্তু। এ সিন্দুক যখন যেখানেই যায় সেখানেই এসে জোটে যত দুর্ভাগ্য আর হানাহানির ব্যাপার।

তুমি হয়ত ক্লেটনকে জান। সে লর্ড গ্রেস্টোকের একমাত্র পুত্র। ভবিষ্যতে সে-ই একদিন পিতার সব ভূসম্পত্তি আর সম্মানের উত্তরাধিকারী হবে। তাছাড়া ওর নিজেরও প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে।

এখানে অবতরণ করার পর থেকেই কত সব অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করছি আমরা।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এক আশ্চর্য ব্যক্তির আবির্ভাব যে আমাদের সকলকে সব বিপদ থেকে উদ্ধার করে একে একে। আমি তাকে এখনো দেখিনি। কিন্তু বাবা, ফিলাণ্ডার আর ক্লেটন তাকে দেখেছে।

এখন আমি খুবই ক্লান্ত। ক্লেটনের আনা একরাশ ঘাস দিয়ে তৈরী এক অদ্ভুত বিছানায় শুতে যাচ্ছি আমি। এরপর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা যা ঘটে তা সব জানাব।—ইতি জেন পোর্টার।

চিঠিখানা পড়ে একমনে ভাবতে লাগল টারজন। এ চিঠিতে এত সব কথা আছে যেকথা ভাবতে গিয়ে তার মাথা ঘুরছিল। একটা জিনিস এর থেকে বুঝল টারজন। টারজন আর সাইনবোর্ডে স্বাক্ষরকারী বাঁদরদলের টারজন যে একই ব্যক্তি তা ওরা জানে না। একথাটা সে তাদের অবশ্যই বলবে।

টারজনের কাছে একটা পেন্সিল ছিল। তাই দিয়ে সে জেনের স্বাক্ষরের তলায় চিঠিটার উপর 'আমিই হচ্ছি বাঁদরদলের টারজন' এই কথাগুলো লিখে দিল।

টারজন ভাবল তাদের মন থেকে সন্দেহ দূর করার পক্ষে এটাই যথেষ্ট। পরে জেনের এই চিঠিটা কেবিনে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে একসময়। তারপর ভাবল খাদ্য সম্বন্ধে তাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। সে তাদের মাংস জুগিয়ে দেবে।

পরের দিন সকালে জেন তার দুদিন আগে হারানো চিঠিটা ঠিক সেই জায়গাতেই পেয়ে গেল টেবিলটার যেখানে সে রেখেছিল সেটাকে। আশ্চর্য হয়ে গেল সে। কিন্তু চিঠিটার তলায় টারজনের স্বাক্ষরটা দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিমশীতল একটা রোমাঞ্চ খেলে গেল তার গোটা মেরুদণ্ডটা জুড়ে। সে চিঠিটা দেখাল ক্লেটনকে।

জেন বলল, মনে হলো সেই ভূতুড়ে মানুষটা আমি চিঠি লেখার সময় সর্বক্ষণ আমাকে দেখছিল। একথা ভাবতেও ভয়ের একটা শিহরণ জাগে আমার সর্বাঙ্গে।

ক্লেটন তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, সে কিন্তু আমাদের বন্ধু।

তারপর থেকে রোজই কোন একটা মরা জীব জন্তু বা ফলমাকড় তাদের দরজার সামনে রাতের অন্ধকারে রেখে যেত টারজন। কোনদিন হরিণ, কোনদিন শুয়োর বা চিতাবাঘ, আবার কোনদিন পাশের গাঁ থেকে চুরি করে আনা কিছু রান্না খাবার বা চাল-গুঁড়োর পিঠে তাদের জন্য রেখে দিয়ে যেত সে। একদিন একটা সিংহের মৃতদেহও রেখে দিয়ে যায়।

এইভাবে একটি মাস কেটে গেল। একদিন বিকেলবেলায় ওদের সঙ্গে দেখা করার জন্য কেবিনে চলে গেল টারজন। গিয়ে দেখল ওরা তখন কেউ কেবিনে নেই।

টারজন যখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল জেনের জন্য তখন তার অপরিচিত একটা শব্দ শুনে চমকে উঠল সে। বুঝল একটা বাঁদর-গোরিলা এইমাত্র একটা গাছে উঠল একটা শব্দ করে। আর ঠিক সেইসঙ্গে টারজন স্পষ্ট শুনতে পেল এক নারী কণ্ঠের ভয়ার্ত চীৎকার।

ক্লেটন, অধ্যাপক পোর্টার ও ফিলাণ্ডার এই চীৎকার একই সঙ্গে শুনতে পায়। শুনতে পেয়েই তাড়াতাড়ি কেবিনের কাছে চলে আসে সকলে। কিন্তু এসে দেখে জেন বা এসমারাল্ডা কেবিনের মধ্যে কেউ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে তারা তিনজনে জঙ্গলে গিয়ে জেনের নাম ধরে ডাকতে লাগল। কিন্তু ওদের দুজনেরই কোন সাড়াশব্দ শুনতে পেল না। হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে ক্লেটন এক জায়গায় দেখতে পেল এসমারাল্ডা মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়ে আছে।

ক্লেটন দেখল এসমারাল্ডা ভয়ে শুধু অচৈতন্য হয়ে পড়েছে।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, আমি কি করব ক্লেটন বলতে পার? ঈশ্বর এমন নিষ্ঠুরভাবে আমার মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন?

ক্লেটন বলল, দাঁড়ান, আগে এসমারাল্ডাকে জাগিয়ে দেখি, কি ঘটেছে ওর কাছ থেকে শুনি।

এসমারাল্ডাকে জোর নাড়া দিয়ে জাগাল ক্লেটন। বলল, কি ঘটেছে বল। মিস পোর্টার কোথায়?

এসমারাল্ডা উঠে বসে বলল, হা ভগবান, আমি মরতে চাই। জেন এখানে নেই? তাহলে তাকে নিয়ে গেছে।

ক্লেটন বলল, কে তাকে নিয়ে গেছে?

এসমারাল্ডা বলল, সারা দেহ লোমে ঢাকা দৈত্যের মত একটা জন্তু।

মিস্টার ফিলাণ্ডার বলল, একটা গোরিলা?

গোরিলার নাম করতেই সকলে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

ক্লেটন একবার চারদিক তাকিয়ে দেখল। কিন্তু চারদিক ঘন জঙ্গলের মধ্যে কিছুই দেখতে পেল না। কিছুই বুঝতে পারল না।

তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। ওরা হতাশ হয়ে কেবিনে ফিরল। কেবিনের মধ্যে ওরা চুপচাপ বসে রইল।

টারজন দল থেকে চলে যাবার পর টারকজ সেই দলের অধিপতি হয়। কিন্তু তারপর থেকে দলের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ বেড়ে যায়। তখন টারজনের উপদেশের কথা স্মরণ করে একদিন টারকজকে চার পাঁচজন মিলে আক্রমণ করে। টারকজ পালিয়ে যায়।

কয়েকদিন ধরে টারকজ একা একা ঘুরে বেড়িয়ে তার দলের বাঁদরদের উপর প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে ছুটো মেয়েকে বনের মধ্যে দেখতে পায়। দলপতি হিসাবে তার যেসব স্ত্রী ছিল দলের লোকেরা তাদের আটকে রেখে দিয়েছে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে। তাই টারকজ তার স্ত্রী করার জন্য এক নতুন মেয়ে বাঁদর-গোরিলার খোঁজ করছিল। জেনকে দেখে লোমহীন এক সাদা মেয়ে-বাঁদর ভেবে তাকে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে গাছের উপর দিয়ে জঙ্গলের গভীরে পালাতে থাকে সে।

এদিকে টারজন জেনের প্রথম চীৎকার শুনে ছুটে এসমারাল্ডা যেখানে পড়ে ছিল সেখানে এসে হাজির হলো। তারপর গাছের উপর উঠে জেনের খোঁজ করতে লাগল। এসমারাল্ডাকে পড়ে থাকতে দেখে

সে বেশ বুঝতে পারল তার সঙ্গিনী জেনকে কোন কিছুতে নিশ্চয় ধরে নিয়ে গেছে। তার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে বাতাসে গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগিয়ে যেতে লাগল গাছের উপর দিয়ে। বাঁদরদলের কাছ থেকে এক পশুসুলভ ঘ্রাণশক্তির অধিকারী হয় টারজন। তাই দিয়ে সে বুঝল কোন বাঁদর-গোরিলা গাছের উপর দিয়ে ধরে নিয়ে গেছে জেনকে কিছুক্ষণ আগে।

ওদিকে টারকজও বুঝতে পেরেছিল তার পিছনে কেউ তাকে অনুসরণ করছে। এই ভেবে সে তার গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। কিন্তু যখন দেখল অনুসরণ-কারী অনেক কাছে এসে পড়েছে তখন সে গাছ থেকে নেমে পড়ে জেনকে ধরে রইল। সে ভাবল তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করবে দরকার হলে, সে পালিয়ে যাবে না। এইভাবে তিন মাইল গাছে গাছে যাবার পর টারজন টারকজের সামনে চিতা বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল।

টারকজ যখন টারজনকে দেখল তখন ভাবল এই মেয়েটা টারজনের। তখন তার পুরনো শত্রুতা এবং ঘৃণা আবার জেগে উঠল নতুন করে। তখন সে জেনকে ছেড়ে দিয়ে টারজনের সঙ্গে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হলো। টারজনও তার ছুরিটা শক্ত করে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। টারকজ তার ধারাল দাঁত বার করে টারজনের গায়ে কামড় দেবার আগেই টারজন বার বার তার ধারাল ছুরিটা বসিয়ে দিতে লাগল টারকজের বুকে। অবশেষে টারকজের রক্তাক্ত দেহটা নিষ্প্রাণ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই জেন দুহাত বাড়িয়ে টারজনকে জড়িয়ে ধরল।

টারজনকে দেখে জেনও বুঝতে পেরেছিল এই লোকই তার বাবা ও ক্লেটনকে উদ্ধার করে এবং তাকে উদ্ধার করার জন্য সে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু মানুষ হয়ে টারকজের মত এক ভয়ঙ্কর বাঁদর-গোরিলার সঙ্গে কিভাবে পেরে উঠবে সে সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল তার। অবশেষে বাঁদর-গোরিলাটার মৃত্যু ঘটতে সে টারজনের শক্তিতে আশ্চর্য হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে।

কিন্তু সে প্রেমের আবেগটা কেটে যেতেই হুঁস হয় তার। সে টারজনকে সরিয়ে দেয় দুহাত দিয়ে। টারজন আবার তার কাছে সরে আসতে এবারও সে তাকে সরিয়ে দেয়। তার প্রতি জেনের এই প্রবল ঘৃণা দেখে তার মন বদলে গেল। সে জেনকে দুহাত দিয়ে ধরে জঙ্গলের গভীরে নিয়ে গেল।

পরদিন সকালে কেবিন থেকে কামানের গোলার একটা শব্দ শুনে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ক্লেটন। দেখল সমুদ্রের উপর দুটো জাহাজ উপকূলের খুব কাছাকাছি এসে ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করছে। জাহাজ দুটোর মধ্যে একটা এ্যারো আর একটা ফরাসী যুদ্ধ-জাহাজ। সে ফরাসী জাহাজটার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সেই উঁচু জায়গাটায় স্তূপাকৃত কাঠে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার একটা শার্ট ধরে নাড়াতে লাগল। তা দেখে ফরাসী যুদ্ধজাহাজটা এগিয়ে এসে একটা নৌকো নামিয়ে দিল। এক যুবক অফিসার কয়েক-জন সৈন্য নিয়ে নৌকোয় করে বেলাভূমিতে এসে নামল।

যুবক অফিসারটি এগিয়ে এসে ক্লেটনকে বলল, আপনিই মঁসিয়ে ক্লেটন না?

ক্লেটন বলল, অবশেষে তুমি এসেছ? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। খুব একটা দেরী হয়ে যায়নি।

যুবক অফিসার বলল, এ কথার কি মানে মঁসিয়ে?

ক্লেটন তখন তাকে জেনের অপহরণের কথা সব বলল। বলল, এখন তার অনুসন্ধানের জন্য সশস্ত্র লোকের দরকার।

অফিসার বলল, হা ভগবান! গতকাল? তাহলে এখনো সময় আছে। খুবই ভয়ঙ্কর কথা।

কিভাবে তারা এখানে এসে হাজির হয় এবিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে যুদ্ধজাহাজের কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন দাফ্রেন জানাল কয়েক সপ্তাহ আগে 'এ্যারো' জাহাজটা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তাদের জাহাজ থেকে সরে যাওয়ার পর তার খোঁজ করতে থাকে তারা। তারপর কয়েকদিন আগে দেখে সেটা সমুদ্রের বুকে ভেসে চলেছে। দূর থেকে মনে হলো জাহাজে যেন কোন লোক নেই। শুধু একজন লোক রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে তাদের কাছে যাবার জন্য ডাকছে।

অবশেষে এমনি ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়ি আমরা। আমরা গতকাল সন্ধ্যার সময় এসেই একটা কামান দাগি। কিন্তু তা আপনারা শুনতে পাননি। তারপর আজ সকালে আবার একটা কামান দাগি।

গত সন্ধ্যায় ওরা বনের মধ্যে জেনের খোঁজে ব্যস্ত থাকায় কামানের গোলার শব্দ শুনতে পায়নি।

এদিকে ততক্ষণে জাহাজ থেকে রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র এসে পড়ায় অধ্যাপক পোর্টার আর ক্লেটনের সঙ্গে ফরাসী সেনাদের একটি দল তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গেল জেনের খোঁজে।

টারজন এবার বনপথ ছেড়ে গাছের উপর দিয়ে যেতে লাগল। জেন বুঝল এই ভীষণ অরণ্যে টারজনের কোলে সে সবচেয়ে নিরাপদ।

তখন সবেমাত্র বিকেল হয়েছে। ভাবতে ভাবতে কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করে অবশেষে সেই দমদম নাচের উৎসবের ফাঁকা জায়গাটার কাছে এসে পড়েছে তারা। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে

বিকেলের রোদ এসে লুটোপুটি খেলছিল সেই ফাঁকা জায়গাটায়।

টারজন গাছ থেকে নেমে নরম ঘাসে ঢাকা একটা জায়গায় নামিয়ে দিল জেনকে। এক শান্ত স্বপ্নাবেশে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে উঠল জেনের। তার সামনে টারজনের দৈত্যাকার চেহারাটা দেখে তার নিরাপত্তাবোধ গভীর হয়ে উঠল আরো।

টারজন একসময় ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে বনের ভিতর চলে গেল।

কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে টারজন তার পিছনে এসে দাঁড়াল। টারজনের পায়ের শব্দে ভয় পেয়ে পিছন ফিরতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল জেন। টারজন তাকে ধরে ফেলল।

একবার হাসতে হাসতে জেন বলল, তুমি ইংরিজিতে কথা বললে ভাল হত।

টারজন নীরবে মাথা নাড়ল। জেন তখন ফরাসী ও জার্মান ভাষায় কথা বলল। কিন্তু তাও বুঝতে পারল না টারজন।

একসময় টারজনের গলায় সোনার চেন দিয়ে ঝোলানো হীরের লকেটটার দিকে তাকিয়ে সেটার দিকে হাত বাড়াল জেন। টারজন সেটা গলা থেকে খুলে জেনের হাতে দিল।

জেন এবার টারজনের দিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখল। দেখে মনে হলো মূর্তির পুরুষটি হয় টারজনের ভাই অথবা বাবা। টারজনও লকেটের ভিতরকার মূর্তি দুটো অপার বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে লাগল। সে

কখনো এই মূর্তিদুটো দেখেনি। লকেটটা যে খোলা যায় এবং তার মধ্যে এই দুটো মূর্তি আছে তা সে ভাবতেই পারেনি।

জেন ভেবে পেল না এই হীরের লকেটটা এই সুদূর আফ্রিকার জঙ্গলে এল কি করে।

টারজন এবার তার পিঠের তূণ থেকে তীরগুলো সরিয়ে তার তলা থেকে একটা ফটো বার করে জেনের হাতে দিল। ফটোটি লকেটনিহিত সেই পুরুষ মূর্তিটির। জেন মূর্তিদুটোর পানে টারজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু টারজন মাথা নেড়ে কি বোঝাতে চাইল। তারপর ফটোটা জেনের হাত থেকে নিয়ে আবার সেটা তূণের ভিতরে পুরে রাখল।

জেন লকেটের পুরুষটার দিকে তখনো তাকিয়ে ভাবতে লাগল। পরে সে এই রহস্যের একটা সমাধান খুঁজে পেল। সে ভাবল এই লকেটটা আসলে লর্ড গ্রেস্টোকের। পরে তাঁর কেবিন থেকে টারজন সেটা ঘটনাক্রমে পেয়ে যায়। আর ঐ নারীমূর্তিটা লেডী এ্যালিসের। কিন্তু টারজনের চেহারা ও চোখমুখের সঙ্গে ঐ মূর্তির সাদৃশ্যের কারণ কি তা বুঝতে পারল না অনেক ভেবেও।

টারজন এবার লকেটসমেত চেনটা জেনের কাছ থেকে নিয়ে আবার জেনের গলাতেই পরিয়ে দিল। জেনকে এতে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে উঠতে দেখে হাসতে লাগল।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে তারা আবার কিছু ফল খেল। তারপর টারজন জেনকে নিয়ে তার বিছানায় দিয়ে এল। তার নিজের ছুরিটা তার হাতে দিল। তারপর ডালপালার বেড়া দিয়ে ঘেরা তার বিছানাটা হতে বেরিয়ে এসে সেটার বাইরে ঘাস দিয়ে নিজের জন্য একটা বিছানা তৈরী করে শুয়ে পড়ল।

সকালে ঘুম ভাঙতে জেন দেখল তখন রোদ উঠে গেছে।

ফল দিয়ে প্রাতরাশ করার পর টারজন ইশারায় অনুসরণ করতে বলল জেনকে। তারপর জেনকে কাঁধে নিয়ে গাছের উপর উঠে পড়ল। জেন বুঝল টারজন তাকে কেবিনে নিয়ে যাচ্ছে।

পথে যেতে যেতে মাঝখানে একবার একটা নদীর ধারে নেমে কিছু ফল আর জল খেয়ে নিল ওরা। কেবিনের কাছাকাছি এসে একটা লম্বা গাছের তলায় এসে টারজন হাত বাড়িয়ে কেবিনটা দেখিয়ে দিল জেনকে।

কেবিনের পথে পা চালিয়ে দিল জেন। তখন গোধূলির অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছিল বেশ। ফিলাণ্ডার কেবিনের বাইরে ছিল। এসমারাল্ডা ছিল কেবিনের ভিতরে। ফিলাণ্ডারের দৃষ্টিশক্তিটা ছিল বড় ক্ষীণ। দূরের জিনিস নজর যায় না।

হঠাৎ সামনে জেনকে দেখতে পেয়ে ফিলাণ্ডার আশ্চর্য হয়ে বলল, জেন তুমি! কোথা থেকে আসছ? কোথায় ছিলে?

জেন হেসে বলল, দয়া করুন মিস্টার ফিলাণ্ডার, কি করে একসঙ্গে এত প্রশ্নের উত্তর দেব?

ফিলাণ্ডার বলল, তোমাকে নিরাপদ দেখে একই সঙ্গে এতদূর আনন্দিত ও বিস্মিত হয়েছি যে কি বলছিলাম তা আমি নিজেই জানি না। এখন ভিতরে এস, যা যা ঘটেছিল সব বলবে আমায়।

জেনের খোঁজে লেফ্‌টন্যান্ট দার্ণৎ আর লেফ্‌টন্যান্ট শার্পেন্তিয়েরের নেতৃত্বে সশস্ত্র দলটি বনের মধ্যে এগিয়ে যেতে যেতে বুঝল তাদের কাজটা ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছে। কিন্তু অধ্যাপক পোর্টার আর ক্লেটনের হতাশ মুখদুটোর পানে তাকিয়ে ফিরে যেতে পারছিল না তারা। তাছাড়া দার্ণৎ ভাবছিল জেন আর বেঁচে নেই। এতক্ষণ তাকে কোন বন্যজন্তু খেয়ে ফেলেছে এবং তার কঙ্কালটাই হয়ত পড়ে আছে কোথাও।

হঠাৎ প্রায় পঞ্চাশজন নিগ্রো যোদ্ধা দার্ণৎকে ঘিরে ফেলতেই সে চীৎকার করে উঠল। সে তার রিভলবার থেকে গুলি করার আগেই তাকে তুলে নিয়ে পালাল জনকতক নিগ্রো। বাকিগুলো পথের ধারে ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে রইল।

দার্ণতের চীৎকার শুনতে পেয়ে সৈন্যরা ছুটে গিয়ে রাইফেল থেকে গুলি করতে লাগল। এমন সময় বনের ভিতর থেকে একটা বর্শা এসে একজনের বুকে বিদ্ধ করতে সে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। অনেকগুলো তীর এসেও তাদের জনাকতকের গায়ে লাগল। ওরা তখন বন লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে নিগ্রোদের দেখতে পেয়ে জোর গুলি চালাতে লাগল। নিগ্রোরা তখন ভয়ে পালিয়ে গেল।

কুড়িজন সৈন্যের মধ্যে চারজন ঘটনাস্থলে মারা যায়, প্রায় বারোজন আহত হয় এবং দার্ণৎ নিখোঁজ হয়।

শার্পেন্তিয়ের তখন একটা ফাঁকা জায়গা দেখে শিবির স্থাপনের হুকুম দিল। শিবিরের সামনে আগুন জ্বেলে পালা করে প্রহরা দিয়ে রাতটা কাটাল ওরা।

এদিকে দার্ণৎকে নিয়ে একজন নিগ্রো একেবারে গাঁয়ের মধ্যে চলে গেল। এক শ্বেতাঙ্গ বন্দীকে দেখতে পেয়ে গাঁয়ের সব নারী পুরুষেরা ছুটে এল। আফ্রিকার একদল মানুষখেকো আদিম অধিবাসীদের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ বন্দী হিসাবে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলো দার্ণৎ। প্রথমে মেয়েরা লাঠি দিয়ে ও পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগল দার্ণৎকে।

দার্ণৎ তখন অর্ধচেতন হয়ে পড়েছিল। এমন সময় কয়েকটা বর্শা তার গায়ের কয়েকটা জায়গা বিদ্ধ করল। তার গা থেকে তাজা গরম রক্ত ঝরতে লাগল।

এদিকে টারজন জেনের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গুলির শব্দ শুনে মবঙ্গাদের গাঁয়ের দিকে ছুটে যেতে থাকে। মবঙ্গাদের গাঁয়ের দিকে গুলির আওয়াজ পেয়ে বিপদের আভাস পায় সে।

অবশেষে গাঁয়ের কাছে গিয়ে একটা গাছ থেকে টারজন দেখল একজন শ্বেতাঙ্গ বন্দী খুঁটিটায় বাঁধা আছে আর তার গায়ে খোঁচা মারা হচ্ছে। তবে তার মৃত্যু ঘটেনি তখনো।

এমন সময় এক দুর্ধর্ষ পুরুষগোরিলার মত গাছের উপর গর্জন করে উঠল টারজন। মুহূর্তে টারজন তার ফাঁসের দড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে একজন নিগ্রোকে টেনে তুলে নিল গাছের উপরে। নিগ্রোরা তাদের চোখের সামনে দেখল তাদেরই একজনের দেহটা গলায় ফাঁস-বদ্ধ অবস্থায় শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে একটা গাছের উপর ঘন পাতার মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়।

তারা ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি ও অভিভূত হয়ে প্রথমে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে যে যার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

দার্ণৎ একা সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সে দেখল গাছের উপর পাতার মধ্যে দেহটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পরমুহূর্তেই সেই কৃষ্ণকায় দেহটা গাছের তলায় মাটির উপর সশব্দে পড়ে গেল। নিথর নিস্পন্দ দেহটা পড়ে রইল মাটিতে। এবার দেখল গাছ থেকে এক দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গ সোজা নেমে এসে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

দার্ণৎ ভাবল লোকটা হয়ত তাকে নতুনভাবে পীড়ন করে হত্যা করার জন্য আসছে। কিন্তু তার মুখে নিষ্ঠুরতার কোন চিহ্ন খুঁজে পেল না। লোকটা এসেই তার বাঁধন কেটে দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিল। দার্ণৎ তখন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। তার ক্ষত-বিক্ষত দেহটা কাঁপছিল। কিন্তু টারজন তাকে ধরে ফেলে কাঁধের উপর তুলে নিল। দার্ণৎ এবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

এদিকে ফরাসী সৈন্যদের শিবিরে সকাল হতেই লেফটন্যান্ট শার্পেন্তিয়ের কেবিনে ফিরে যাবে ঠিক করল।

ওরা যখন কেবিনে গিয়ে পৌছল তখন বিকেল হয়ে গেছে। শোকে দুঃখে ওদের অন্তরগুলো ভারী হয়ে থাকলেও কেবিনে পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গে সব শোক-দুঃখ দূর হয়ে গেল মুহূর্তে। যে জেনের জন্য এত কাণ্ড সেই জেন কেবিনের সামনে দাঁড়িয়েছিল। জঙ্গল থেকে বেরিয়েই জেনকে দেখতে পেলেন অধ্যাপক পোর্টার আর ক্লেটন। জেন ছুটে এসে তার বাবার গলাটাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। তার চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছিল। অধ্যাপক জেনের কাঁধের উপর মুখটা রেখে শিশুর মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

জেন তার বাবাকে হাত ধরে কেবিনে নিয়ে গেল। ফরাসী সৈন্যরা শার্পেন্তিয়েরের সঙ্গে বেলাভূমি থেকে নৌকোয় করে জাহাজে চলে গেল। ক্লেটনও প্রথমে ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গিয়ে কেবিনে ফিরে এসে জেনের সঙ্গে দেখা করল।

জেনকে দেখেই ক্লেটন আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, জেন, ঈশ্বরের কি অসীম দয়া, তিনি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন আমাদের। কিন্তু কেমন করে উদ্ধার পেলে?

জেন কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলল, মিস্টার ক্লেটন, আমি আপনাকে আমার বাবার প্রতি বীরোচিত শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দেখে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না।

একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে পারল না। বলল, যে তোমাদের রক্ষা করেছিল সেই বনের মানুষটির খবর কি? সে আর আসেনি?

ক্লেটন বলল, কার কথা বলছ বুঝছি না।

জেন বলল, যে তোমাকে এবং আমাকে ও আমাদের প্রায় প্রত্যেককেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে।

ক্লেটন বিস্মিত হয়ে বলল, ও বুঝেছি এবার। তোমাকেও তাহলে সে-ই উদ্ধার করে? তুমি এখনো কিন্তু সেসব কথার কিছুই বলনি। বল সেকথা।

জেন বলল, সে আমাকে গতকাল কেবিনের কাছে ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছে দিয়ে জঙ্গলের ভিতর গুলির শব্দ শুনেই ছুটে চলে গেল। তারপর থেকে তাকে দেখতে পাইনি। আমার মনে হয় সে তোমাদের সাহায্যেই ছুটে যায়।

শান্ত কণ্ঠে ক্লেটন বলল, তার দেখা আমরা পাইনি। সে হয়ত উপজাতিদের দলেই যোগ দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারিত চোখে ক্লেটনের দিকে তাকিয়ে জেন বলল, না, কখনই তা হতে পারে না। উপজাতিরা নিগ্রো আর সে শ্বেতাঙ্গ এবং ভদ্র।

ক্লেটন প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। পরে বলল, সে একজন বন্য অর্ধবর্বর লোক মিস জেন। আমি তার বিষয় কিছুই জানি না। সে কোন ইউরোপীয় ভাষাই জানে না। তাছাড়া তার গায়ের গয়নাগুলোও পশ্চিম আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মত। এখান থেকে শত শত মাইলের মধ্যে কোন ভদ্র ও সভ্য মানুষ নেই। সেও হয়ত উপজাতিদেরই একজন এবং সেও একজন মানুষখেকো।

জেন আবার জোর দিয়ে বলল, একথা আমি বিশ্বাস করি না। দেখো, নিশ্চয় সে ফিরে এসে প্রমাণ করে দেবে তোমার ধারণা ভুল। আমি বলছি সে একজন ভদ্রলোক।

পরদিন সকালে দুশো ফরাসী সৈন্যের এক সশস্ত্র দল আবার দার্ণতের খোঁজে রওনা হলো। ওরা সরাসরি মবঙ্গাদের গাঁয়ে গিয়ে গাঁটাকে আক্রমণ করবে। দার্ণৎকে নিগ্রোরা সেই গাঁয়েই নিয়ে যায়। লেফটন্যান্ট শার্পেন্তিয়ের গেল দলের নেতা হিসাবে।

দুপুর হতেই তারা সেই জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছল যেখানে নিগ্রোদের সঙ্গে তাদের লড়াই হয়। পথটা তাদের চেনা বলে পৌঁছতে কষ্ট হলো না। সেখান থেকে সোজা গাঁয়ের কাছে মাঠের ধারে জঙ্গলের শেষ প্রান্তে গিয়ে থামল। শার্পেন্তিয়ের একদল সৈন্যকে বনের পাশ দিয়ে কাঁটার পিছন দিকে পাঠিয়ে দিল। তারা প্রথম গুলি করে আক্রমণ শুরু করলেই ওরাও আক্রমণ শুরু করবে।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে শার্পেন্তিয়ের তার সেনাদল নিয়ে ঘন জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে রইল। মাঠে তখন কিছু লোক কাজ করছিল। গাঁয়ের পথে অনেক লোক ঘোরাঘুরি করছিল। অবশেষে গুলির শব্দ শুনেই শার্পেন্তিয়ের তার দল নিয়ে গুলি করতে করতে গেটের কাছে এগিয়ে যেতে লাগল। মাঠ থেকে

লোকেরা ছুটে গাঁয়ের ভিতর পালিয়ে গেল। গাঁয়ের লোকেরা অস্ত্র হাতে বেরিয়ে গাঁয়ের পথে পথে লড়াই করতে লাগল।

অতর্কিতে আক্রমণের জন্য গ্রামবাসীরা প্রস্তুত না থাকায় খুব একটা বাধা দিতে পারল না ফরাসী সৈন্যদের। বেশকিছু ফরাসী সেনা আহত ও নিহত হলেও অনেক নিগ্রো যোদ্ধা গুলি খেয়ে মারা গেল। অনেকে বন্দী হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা গাঁটা ওরা দখল করে ফেলল। নারী ও শিশুদের তারা অব্যাহতি দিল। অবশ্য কোন নারী তাদের আক্রমণ করলে আত্মরক্ষার খাতিরে মারতে হচ্ছিল।

এবার দার্ণৎ সম্বন্ধে বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিল শার্পেন্তিয়ের। কয়েকজন গ্রামবাসীর পরনে দার্ণতের পোশাকের কিছু কিছু অংশ দেখে তার সন্দেহ গাঢ় হলো। ওরা হয়ত দার্ণৎকে হত্যা করে তার মাংস খেয়েছে। কিন্তু ওদের কথা নিগ্রো গ্রামবাসীদের কেউ বুঝতে পারল না। তারা শুধু ভয়ে অদ্ভুত রকমের অঙ্গভঙ্গি করে কি সব বোঝাতে চাইল।

অবশেষে দার্ণতের কোন খোঁজ না পেয়ে হতাশ হয়ে রাত্রির মত গাঁয়ের মধ্যেই শিবির স্থাপন করল শার্পেন্তিয়ের। রাতটা শিবিরে কাটিয়ে প্রত্যাবর্তনের সময় ওরা গাঁটা পুড়িয়ে দেবার মনস্থ করল। কিন্তু বন্দী গ্রামবাসীরা কান্নাকাটি করতে থাকায় তা করল না। তাহলে ওদের মাথা গোঁজার মত কোন ঠাঁই থাকবে না।

ক্লেটন আর শার্পেন্তিয়েরের সেনাদলের আগে আগে যেতে লাগল। সবশেষে আহতদের নিয়ে ঠেলা গাড়িগুলো আসছিল। শার্পেন্তিয়ের দুঃখে সান্ত্বনা দেবার মত ভাবা খুঁজে পাচ্ছিল না ক্লেটন। শার্পেন্তিয়ের খুবই দুঃখ পেয়েছে, কারণ দার্ণৎ ছিল তার ছেলেবেলাকার বন্ধু এবং সহকর্মী। শার্পেন্তিয়েরের দুঃখটা আরো বেশী করে বোধ করছিল এই কারণে যে দার্ণৎ বৃথাই বর্বর আদিবাসীদের হাতে প্রাণ দিল এবং সে প্রাণ দেবার আগেই জেন উদ্ধার পেয়ে ফিরে আসে।

আহত ও মৃতদের নৌকোয় করে জাহাজে নিয়ে যাওয়া হলো। ক্লেটন কয়েকদিন ধরে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কেবিনে ঢুকতে যাবার সময় জেনের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। জেন দুঃখের সঙ্গে বলল, আহা বেচারা লেফটন্যান্টের কোন খোঁজই পেলে না।

ক্লেটনও দুঃখের সঙ্গে জানাল, আমাদের যেতে দেরী হয়ে গেছে মিস পোর্টার।

জেন আবার জিজ্ঞাসা করল, ওরা তাকে খুব পীড়ন করেছিল ?

ক্লেটন উত্তর কবল, তাকে হত্যা করার আগে কি করেছিল তা আমরা জানতে পারিনি।

জেন বলল, তাকে হত্যা করার আগে এই কথাটা কেন বললে ?

ক্লেটন বলল, হ্যাঁ মিস পোর্টার, ওরা নরখাদক।

এমন সময় টারজনের প্রতি তার ঈর্ধাটা নতুন করে জেগে উঠল, বলল, তোমার বনদেবতা তোমার কাছ থেকে গিয়ে নিশ্চয় ওদের ভোজসভায় যোগদান করে।

দার্ণৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখল সে বনের মধ্যে একটা পুরু ঘাসের বিছানার উপর শুয়ে রয়েছে। তার চারদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গলের প্রাচীর।

পূর্ণ চেতনা ফিরে পাবার পর দার্ণৎ অসংখ্য আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহটায় সর্বত্র ব্যথা অনুভব করতে লাগল। সে বুঝল পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাড়াবার বা হাঁটা চলার ক্ষমতা তার নেই। বুঝতে পারছিল না সে কোথায় আছে—শত্রুদের না মিত্রদের কবলে।

চেতনা হারাবার আগে যা যা ঘটেছিল তা সব একে একে মনে করার চেষ্টা করতে লাগল দার্ণৎ। তখন সেই দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গের কথা মনে পড়ে গেল তার। মনে পড়ে গেল তারই কোলের মধ্যে চেতনা হারিয়ে ফেলে। সে জানে না তার ভবিষ্যৎ কি, তার ভাগ্যে কি আছে। বনের অসংখ্য পোকামাকড় আর ঝিঁঝিঁর ডাক, পাখি আর বাঁদরদের কিচিরমিচির, গাছের পাতা নড়ার শব্দ, সব মিলিয়ে এ এক আশ্চর্য জগৎ। লোকালয় বা মানুষের সমাজ থেকে কত দূরে। দার্ণৎ আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকেলে ঘুম ভাঙ্গলে দার্ণৎ দেখল তার পায়ের কাছে তার দিকে পিছন ফিরে একজন দৈত্যাকার লোক বসে আছে। তার পিঠটা দেখতে তামাটে রঙের হলেও সে শ্বেতাঙ্গ।

দার্ণৎ তাকে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল। লোকটি তার পাশ দিয়ে মাথার কাছে এসে তার কপালে তার ঠাণ্ডা হাতটা রাখল। দার্ণৎ তাকে ফরাসী ভাষায় কি বলল।

দার্ণৎ দেখল লোকটি ইংরিজি জানে। সে মুখে বলল হ্যাঁ, আমি ইংরিজি বলতে ও লিখতে পারি। এবার আমরা তাহলে কথা বলে আলাপ করতে পারি। প্রথমে তুমি আমার জন্য যা করেছ তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমায়।

দার্ণৎ ছালটার উপর পেন্সিল দিয়ে লিখল, আমার নাম দার্ণৎ। আমি ফরাসী সেনাবাহিনীর একজন লেফটন্যান্ট। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। তুমি

আমার জন্য যা যা করেছ তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমার যা কিছু আছে তা তোমার। তবে কেন তুমি ইংরিজিতে কথা বলতে পার না তা জানতে পারি কি?

টারজন তার উত্তরে লিখল, আমি যে কাচাকের বাঁদরদলের মধ্যে ছিলাম তাদের ভাষা আর কিছু বন্য জীবজন্তুর ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা বুঝতে পারি না। আমি কোন মানুষের সঙ্গে কখনো কথা বলিনি। একমাত্র আমেরিকান মেয়ে জেন পোর্টারের সঙ্গে ইশারায় কিছু কথা বলেছিলাম। জেনকে একটা বাঁদর-গোরিলা ধরে নিয়ে পালিয়ে যায়।

দার্ণং আবার লিখে জানতে চাইল, জেন পোর্টার কোথায়? অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা আলো খুঁজে পেল দার্ণং।

টারজন লিখল, এখন সে কেবিনে তার সঙ্গীদের কাছে আছে।

দার্ণং আবার জানতে চাইল, সে তাহলে মরেনি? কোথায় সে ছিল? কি কি ঘটেছিল?

টারজন জানাল, সে মরেনি। টারকজ নামে একটা বাঁদর-গোরিলা তাকে তার বউ করার জন্য ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তারপর টারজন টারকজকে হত্যা করে তাকে উদ্ধার করে। এই বনের কেউ টারজনের সঙ্গে লড়াই করে পেরে ওঠে না। আমিই হচ্ছি সেই বিরাট যোদ্ধা ও শিকারী বাঁদরদলের টারজন।

দুদিন পর দার্ণং একটু সুস্থ হলো। সে সেই ফাঁকা জায়গাটায় একটু হাঁটতে লাগল। সে যাতে পড়ে না যায় তার জন্য টারজন তাকে ধরে রইল। এবার কিছু কথাবার্তা বলার জন্য টারজন তাকে পেন্সিল আর গাছের ছাল দিল। দার্ণং লিখল, তুমি আমার জন্য অনেক কিছু করেছ। আমি কিভাবে তোমার ঋণ শোধ করতে পারি?

টারজন লিখল, তুমি আমাকে সেই ভাষা শিখিয়ে দাও যার মাধ্যমে আমি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারি।

সেই দিন থেকেই টারজনকে ফরাসী ভাষায় কথা বলতে শেখাতে শুরু করে দিল দার্ণং। কারণ সে ভাবল এটা তার নিজের মাতৃভাষা এবং এই ভাষাটা শেখানো সহজ হবে তার পক্ষে।

প্রথমে শব্দ ও তারপর দুদিনের মধ্যে ছোট ছোট বাক্য উচ্চারণ করতে শিখল টারজন। এইভাবে তিনদিন শেখার পর টারজন দার্ণংকে লিখে জানতে চাইল সে এখন বেশ সুস্থবোধ করছে কি না এবং সে তাকে কেবিনের কাছে বয়ে নিয়ে গেলে তার কোন কষ্ট হবে কি না। দার্ণতেরও যাবার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল। তবু সে লিখল, কিন্তু এই এতখানি পথ বনের মধ্য দিয়ে কিভাবে আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে?

টারজন হাসল।

দার্ণংকে কাঁধে করে রওনা হয়ে পড়ল টারজন।

ভর দুপুরে তারা কেবিনের সামনের সেই ফাঁকা জায়গাটার কাছে এসে পৌঁছল। গাছ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে টারজনের অন্তরটা লাফিয়ে উঠল। জেনকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল সে।

কিন্তু তারা দেখল কেবিনে কোন লোক নেই। দার্ণৎ দেখল দুটো জাহাজের কোনটাই নেই। এক নির্জন নীরবতা নিঃসীম শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে সমস্ত উপকূলভাগ জুড়ে।

কেউ কোন কথা বলল না। টারজনই প্রথমে কেবিনের দরজা খুলল। ভিতরে কেউ নেই। দুজনেই দুজনের পানে তাকাল। দার্ণৎ ভাবল তার দলের লোকেরা ভেবেছে সে মারা গেছে।

টারজন যখন কেবিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে তখন দার্ণৎ ঘরে ঢুকল। দেখল অনেক কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তার জন্য রেখে গেছে তারা। বেশ কিছু খাবার, রান্নার বাসনপত্র, একটা খাট, দুটো চেয়ার, একটা রাইফেল, অনেক গুলি আর পত্রপত্রিকা।

টেবিলটার দিকে এগিয়ে দার্ণৎ তার উপর দুটো চিঠি দেখতে পেল। দুটো চিঠিই বাঁদরদলের টারজনকে লেখা। একটা চিঠি পুরুষের লেখা এবং সেটার মুখ খোলা, আর একটা চিঠি মেয়েমানুষের হাতে লেখা এবং সেটির মুখ আঁটা। দার্ণৎ দরজার দিকে এগিয়ে টারজনকে বলল, তোমার দুটো চিঠি আছে। কিন্তু দেখল টারজন নেই, কোথায় চলে গেছে।

দার্ণৎ বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দেখল টারজন কোথাও নেই। সে তাহলে তাকে এখানে একা ফেলে রেখে বনে চলে গেল। কেবিনটা শূন্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে টারজনের মুখে আহত হরিণীর মত এক সকরুণ ভাব ফুটে উঠতে দেখে দার্ণৎ।

তাহলে ওরা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। চিঠিখানা পড়েই হতাশ হয়ে খাটটার উপর বসে পড়ল দার্ণৎ। একঘন্টা পরে দরজায় কিসের শব্দ শুনে চমকে উঠল সে। কে যেন দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কেবিনের ভিতরটা অন্ধকার। দার্ণৎ দেখল খিলটা খুলে গেল এবং দরজাটার মধ্যে একটু ফাঁক হলো। মনে হলো একটা

মানুষ যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইরে। রাইফেলটা হাতে নিয়ে ঘোড়াটা টিপে দিল দার্ণৎ।

সেদিন দার্ণৎকে না পেয়ে শার্পেন্টিয়ের ও ক্লেটন ফিরে এলে ফরাসী যুদ্ধজাহাজের ক্যাপ্টেন দাফেন জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার মনস্থ করল। ঐ জাহাজে ক্লেটনরাও যাবে। কিন্তু একমাত্র জেন ছাড়া আর সকলেই রাজী হল কথাটায়। এখানে শুধু শুধু বসে থাকার কোন যুক্তি খুঁজে পেল না কেউ।

এরপর দু'দিন গত হতেই ক্যাপ্টেন দাফেন ঘোষণা করল, পরের দিন সকালেই জাহাজ ছাড়বে। আর অপেক্ষা করে লাভ নেই।

এবার আর কোন আপত্তি করল না জেন। কিন্তু সে একটা চিঠি লিখে খামটা এটে রেখে গেল টারজনের জন্য।

তবু পরের দিন সকালে তার দলের সকলে কেবিন থেকে বেরিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠলেও বিভিন্ন তুচ্ছ অজুহাতে কেবিন থেকে বার হতে দেরী করল সে। তারই অনুরোধে কেবিনে ব্যবহারযোগ্য কিছু জিনিসপত্র রেখে যাওয়া হয় দার্ণৎ আর কেবিনমালিক টারজনের জন্য। যাবার সময় ঈশ্বরের কাছে তার সেই বনদেবতার জন্য প্রার্থনা করে জেন।

কেবিনের দরজাটা ফাঁক করে একটা লোক ঢুকতে গেলেই তাকে লক্ষ্য করে রাইফেল থেকে একটা গুলি করল দার্ণৎ। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে ঘরের মেঝের মধ্যে পড়ে গেল লোকটা। দার্ণৎ আবার একটা

গুলি করতে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রথম সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারে দার্ণৎ দেখল লোকটা শ্বেতাঙ্গ। পরমুহূর্তেই জানল সে তার পরম বন্ধু এবং রক্ষাকর্তা টারজনকে গুলি করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদনার্ত চীৎকার করে নতজানু হয়ে বসে টারজনের মাথাটা কোলের উপর তুলে নিল দার্ণৎ। তার বুকে কান পেতে দেখল হৃৎস্পন্দন ঠিক আছে। একটা আলো জ্বেলে দেখল টারজনের মাথার একটা দিকের মাংস ছিঁড়ে দিয়েছে গুলিটা।

মাথার খুলির হাড় ভাঙ্গেনি। সে তখন জল দিয়ে টারজনের ক্ষতটা ধুয়ে দিল। আঘাতটা গুরুতর হয়নি। ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে চোখ মেলে তাকাল টারজন। চোখ খুলেই দার্ণৎকে দেখতে পেল। একটা কাপড় ছিঁড়ে তাই দিয়ে মাথাটাকে বেঁধে দিল দার্ণৎ। তারপর কাগজ কলম নিয়ে টারজনকে লিখে জানাল সে না জেনে টারজনকে গুলি করে চরম ভুল করেছে এবং আঘাতটা মারাত্মক হয়নি দেখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

লেখাটা পড়ে টারজন হেসে ফরাসী ভাষায় বলল, এটা এমন কিছু না।

দার্ণৎ এবার ক্লেটন আর জেনের লেখা চিঠি দুটি তার হাতে দিল। ক্লেটনের চিঠিটা পড়ার পর মুখে একটা বিষাদ ফুটে উঠল তার। দার্ণৎ খামটা খুলে দিলে টারজন পড়তে লাগল।

জেন লিখেছে, ক্লেটনের সঙ্গে আমিও এই কেবিনটা আমাদের ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমায়। তবে জেনে রেখো আমি তোমার চিরদিনের বন্ধু।

চিঠিটা পড়ে বিষণ্ণভাবে মাটির দিকে তাকিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা বসে রইল টারজন। ভাবল সবচেয়ে দুঃখের কথা, আমি আর বাঁদরদলের টারজন একই ব্যক্তি তা জেন জানে না।

আর কথা না বলে জেনের ঘাসের বিছানাটাতেই শুয়ে পড়ল টারজন। দার্ণৎ আলোটা নিভিয়ে দিয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ল।

সেই থেকে কেবিনেই দুজনে রয়ে গেল। দার্ণৎ এক সপ্তাহ ধরে টারজনকে ফরাসী ভাষা শেখাল। তারপর টারজন ফরাসী ভাষায় তার সঙ্গে ভালভাবেই কথাবার্তা বলতে লাগল। একদিন রাত্রিবেলায় বিছানায় শুয়ে টারজন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আমেরিকা কোথায়?

দার্ণৎ বলল, এখান থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে সমুদ্রের ওপারে হাজার হাজার মাইল দূরে।

টারজন তৎক্ষণাৎ আলমারি থেকে একটা মানচিত্র এনে দার্ণৎকে বলল, আমাকে কোথায় কি আছে বুঝিয়ে দাও ত। আমি এসব কিছু বুঝি না।
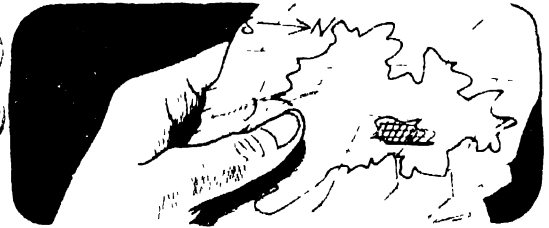
দার্ণৎ তাকে দেখিয়ে দিল তারা আছে আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে আর জেনের দেশ আমেরিকা সেখান থেকে কত দূরে। টারজন কিন্তু বুঝতে পারছিল না মানচিত্রে যেটা এত কাছে আসলে সেটা এত দূরে কেন। দার্ণৎ অনেক কষ্টে বুঝিয়ে দিল তাকে মানচিত্রে কোন জায়গার দূরত্ব কিভাবে মাপতে হয়।

টারজন এবার জিজ্ঞাসা করল, আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ বস্তি আছে?

দার্ণৎ উত্তর দিকে দেখিয়ে বলল, হ্যাঁ আছে।

টারজন আবার জিজ্ঞাসা করল, সমুদ্র পার হবার মত কোন নৌকো বা জাহাজ তাদের আছে?

দার্ণৎ বলল, হ্যাঁ আছে।

টারজন বলল, তাহলে কালই আমরা সেখানে যাব।

দার্ণৎ হেসে বলল, সেখানে আমরা পায়ে হেঁটে যেতে গেলে সেখানে পৌঁছবার আগেই আমরা মরে যাব।

টারজন বলল, তাহলে তুমি এখানেই চিরকাল থাকবে?

দার্ণৎ বলল, না।

টারজন বলল, তাহলে কাল আমরা দুজনেই রওনা হব। এখানে থাকলে আমি মরে যাব।

দার্ণৎ বলল, আমারও এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না। আমিও মরে যাব এখানে বেশীদিন থাকলে।

দার্ণৎ বলল, যাবার টাকা পাবে কোথায়?

টাকা কি টারজন জানে না। দার্ণৎ অনেক করে বোঝাল টাকা কিভাবে রোজগার করতে হয়।

টারজন বলল, আমিও টাকার জন্য খাটব। খেটে রোজগার করব।

দার্ণৎ বলল, ওখানে আমাদের দুজনের যাবার জন্য যা টাকা লাগবে সে টাকা আমার আছে।

পরদিন সকালেই দুজনে রওনা হলো। দুজনে একটা করে বিছানা, একটা করে রাইফেল, বেশ কিছু গুলি, কিছু খাবার আর রান্নার বাসনপত্র সঙ্গে নিল। টারজন বাসনপত্রগুলো ফেলে দিল।

ওরা সমুদ্রের উপকূল বরাবর এগিয়ে যেতে লাগল উত্তর দিকে। পথে কোন বাধা পেল না। যেতে যেতে সভ্য জগৎ সম্বন্ধে দার্ণতের কাছ থেকে অনেক কিছু জেনে নিল টারজন। দার্ণৎ তাকে কাঁটা চামচ দিয়ে কিভাবে খেতে হয় তা দেখিয়ে দিল। বলল, সভ্য জগতে ভদ্রভাবে খেতে হবে।

কথায় কথায় টারজন লোহার সিন্দুকটার কথা বলল। বলল সে সেটা তুলে নিয়ে বনের সেই ফাঁকা জায়গাটায় পুঁতে রেখে দিয়েছে।

দার্ণৎ বলল, সেখান থেকে আমরা তিন সপ্তার পথ হেঁটে এসেছি। সেখানে গিয়ে ফিরে আসতে এক মাসের উপর লেগে যাবে। তাছাড়া যে সিন্দুকটা চারজন নাবিক বইত তা আমরা কি করে নিয়ে পথ চলব? তার চেয়ে কোন জনপদে গিয়ে আমরা একটা নৌকো ভাড়া করে সেখানে গিয়ে সহজেই সেটা নিয়ে আসব।

টারজন বলল, ঠিক আছে, খুব ভাল কথা। আমি সিন্দুকটা একা গিয়ে নিয়ে আসতে পারতাম একপলক-কালের মধ্যেই। কিন্তু তোমাকে একা রেখে যেতে পারছি না।

কথায় কথায় টারজন বলল, আমার মা হচ্ছে কালা নামে এক মেয়ে বাঁদরগোরিলা।

দার্ণৎ বলল, তোমার বাবা কে?

টারজন বলল, আমার মা কালা বলত আমার বাবা একজন সাদা বাঁদর যার গায়ে লোম নেই। অনেকটা আমারই মত।

দার্ণৎ বলল, তোমার মা কখনই বাঁদর হতে পারে না। আচ্ছা, কেবিনের মধ্যে কোন লেখা পাওনি যাতে তোমার জন্ম সম্বন্ধে কোন হদিশ পাওয়া যেতে পারে?

টারজন তার তূণের তলা থেকে সেই ডায়েরীটা বার করে দার্ণতের হাতে দিল। বলল, এটা হয়ত তুমি পড়তে পারবে। ভাষাটা ইংরিজি নয় বলে পড়তে পারিনি।

দার্ণৎ জোরে পড়তে লাগল ডায়েরীটা আর মাঝে মাঝে টারজনের দিকে তাকাতে লাগল। একজায়গায় লেখা ছিল, আজ আমাদের ছোট্ট পুত্র সন্তানটি ছমাসে পড়ল। আমি যে টেবিলে লিখছি তার পাশে এ্যালিসের কোলে সে বসে আছে হাসিখুশিতে ভরা সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে। আমি চাই সে বড় হয়ে উঠুক, জগতের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াক, হয়ে উঠুক দ্বিতীয় ক্লেটন, গ্রেস্টোক বংশের গৌরব বৃদ্ধি করুক। সে আবার আমার কলমটা হাত থেকে ধরে আমার ডায়েরীতে হিজিবিজি কাটছে, তার ছোট ছোট আঙুলগুলোর কাঁটা ছাপও ফেলেছে।

পড়া শেষ করে দার্ণৎ টারজনকে বলল, বুঝতে পারছ না তুমিই লর্ড গ্রেস্টোক ?

টারজন মাথা নেড়ে বলল, না, ওঁদের একটামাত্র সন্তানের কথা লিখেছেন কিন্তু কেবিনের মধ্যে ওঁদের কঙ্কালের সঙ্গে একটি শিশুর কঙ্কালও পাওয়া যায়। অধ্যাপক পোর্টাররা কেবিনে সেই কঙ্কালগুলিকে সমাহিত করেন। আমিও প্রথমে এই কেবিনটাকে আমার জন্মস্থান ভাবতাম। পরে বুঝেছি এটা ভুল।

দার্ণৎ তবু একথা মেনে নিতে পারল না। তার বিশ্বাস টারজনই জন ক্লেটনের ছেলে।

পথ চলতে চলতে ওরা বনের ধারে একটা গাঁয়ের প্রান্তে এসে দাঁড়াল। একজন নিগ্রো তাদের দেখে ছুটে গিয়ে গাঁয়ের লোকদের খবর দিল। সবাই ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগল। এমন সময় একজন শ্বেতাঙ্গ একটা রাইফেল হাতে করে এগিয়ে এল। দার্ণৎ চীৎকার করে তাকে জানাল, তারা তাদের শত্রু নয়, মিত্র।

তখন সেই শ্বেতাঙ্গ বলল, তাহলে দাঁড়াও।

দার্ণৎ টারজনকে বলল, থাম টারজন। উনি ভাবছেন, আমরা শত্রু।

এবার তারা দুজনে শ্বেতাঙ্গের দিকে এগিয়ে গেল। তারা কাছে এলে শ্বেতাঙ্গ ফরাসী ভাষায় বলল, কোন্ জাতীয় মানুষ তোমরা ?

দার্ণৎ বলল, আমরা শ্বেতাঙ্গ। জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছি।

শ্বেতাঙ্গ লোকটি তার রাইফেলটি নামিয়ে তার হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল। তারপর বলল, আমি হচ্ছি ফরাসী মিশনের ফাদার কনস্তানতাইন।

দার্ণৎ বলল, ইনি মঁসিয়ে টারজন আর আমি পল দার্ণৎ, ফরাসী নৌবাহিনীতে কাজ করি।

টারজন তার হাতটা ফাদারের দিকে বাড়িয়ে দিল। এইভাবে জীবনে সর্বপ্রথম সভ্য জগতের সংস্পর্শে এল টারজন। ওরা একসপ্তা সেই গাঁয়েই ফাদার কনস্তানতাইনের কাছে রয়ে গেল।

সেখান থেকে আবার যাত্রা শুরু করে পরের মাসে ওরা একটা বড় নদীর মুখের কাছে একটা শহরে এসে হাজির হলো। শহরটাতে অনেক বড় বড় বাড়ি ছিল। নদীটার মুখে অনেক নৌকো বাঁধা ছিল। টারজন এখন দার্ণতের মত সাদা ধবধবে পোশাক পরে ভদ্র হয়ে উঠেছে। সে এখন কাঁটা চামচের সাহায্যে ভদ্রভাবে রান্না করা খাদ্য খেতে শিখেছে।

নদীতীরবর্তী সেই শহরটাতে পৌঁছেই দার্ণৎ তাদের দেশের সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিল, সে নিরাপদে আছে এবং সেই সঙ্গে তিন মাসের ছুটি চাইল। ছুটি সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুরও হলো। এরপর সে তার দেশের ব্যাঙ্কে কিছু টাকা চেয়ে পাঠাল। কারণ সিন্দুকটা আনার জন্য নৌকো ভাড়া করতে হবে।

এদিকে শহরের যে অঞ্চলের একটা হোটেলে টারজনরা ছিল সে অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় নিগ্রো অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়ে গেল। ক্রমে তারা টারজনের শৌর্যবীর্যের পরিচয়ও পেল। একদিন একটি হোটেলে টারজনরা যখন বসেছিল তখন এক নিগ্রো মাতাল হঠাৎ পাগলের মত একটা ছুরি নিয়ে চারজন লোককে তাড়া করে। তারা তখন ছুটে পালিয়ে গেলে সে টারজনকে ছুরি মারতে যায়! কিন্তু টারজন শুধু একটা হাত বাড়িয়ে তার ছুরিধরা হাতটা ধরে সেটা এমনভাবে মুচড়ে দেয় যে তার হাড় ভেঙ্গে যায়। মাতালটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে তার গাঁয়ে পালিয়ে যায়।

আর একদিন রাত্রিতে সেই হোটেলে সিংহ নিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে তর্ক হচ্ছিল। একজন বলল, সিংহ পশুরাজ হলেও আসলে ভীরু, গুলির আওয়াজে পালিয়ে যায়।

টারজন বলল, সব মানুষ যেমন সাহসের দিক থেকে সমান নয় তেমনি সিংহদের মধ্যেও স্বভাবের তারতম্য আছে। একটা সিংহ হয়ত পালিয়ে যেতে পারে তোমার ভয়ে আবার অন্য সিংহের দ্বারা তুমি প্রাণ হারাতে পার।

তখন একজন বলল, যদি তুমি নগ্নদেহে একটা-মাত্র ছুরি নিয়ে একটা সিংহ শিকার করতে পার তাহলে আমি তোমাকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দেব।

টারজন বলল, ঠিক আছে, একটা দড়ি চাই।

দার্ণৎ বলল, দশ হাজার ফ্রাঁ চাই।

লোকটি বলল, তাই দেব।

টারজন সেই মুহূর্তে তার ঘর থেকে একটা দড়ি আর ছুরি নিয়ে এল। শহরের শেষ প্রান্তে বনের ধারে গিয়ে টারজন তার পোশাক খুলে রেখে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। তখন সেই লোকটি বলল, তোমাকে যেতে হবে না, আমি তোমাকে দশ হাজার ফ্রাঁ দেব। শুধু শুধু প্রাণ দিয়ে লাভ নেই।

কিন্তু টারজন শুনল না সেকথা। সে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। দশজন লোক সেখান থেকে ফিরে এসে কেবিনের বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল।

এদিকে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেই গাছের উপর চড়ে ডালে ডালে এগিয়ে চলল সিংহের সন্ধানে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতাসে একটা সিংহের গন্ধ পেল টারজন। তারপর সিংহটা গাছের তলায় আসতেই সে ফাঁসটা ঝুলিয়ে দিতেই সেটা সিংহের গলায় আটকে গেল। এবার সে গাছের ডালে দড়িটা বেঁধে রেখে দিলে সিংহটা মুক্ত হবার জন্য যখন ছটফট করছিল তখন টারজন তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর ছুরিটা তার পিঠের উপর বারবার আমূল বসিয়ে দিতে লাগল। অবশেষে সিংহটা মরে গেলে তার মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে বিজয়ী বাঁদরগোরিলার মত গর্জন করে উঠল টারজন।

এদিকে সেই দশজন লোক আবার হোটেল থেকে বনের সেই প্রান্তে এসে দাঁড়াল। তারা টারজনের সেই গর্জন শুনতে পেয়েছিল। তা শুনে দার্ণতের আশা হয়। এমন সময় হঠাৎ টারজন বনের মধ্যে থেকে মৃত সিংহটা নিয়ে ফিরে এলে তাদের বিস্ময় চরমে ওঠে। তারা একবাক্যে তার শক্তি ও বীরত্বের প্রশংসা করতে থাকে।

কিন্তু টারজনের এতে প্রশংসা করার কিছু নেই। কোন গরু মারার জন্য যেমন একটা কশাইকে বাহবা দেবার কিছু নেই তেমনি তার এই সিংহ শিকারের জন্যও তার প্রশংসা করার কিছু নেই, কারণ আগে সে এমন বহু সিংহ বধ করেছে।

যাই হোক, লোকটা তার কথামত দশ হাজার ফ্রাঁ দিল। দার্ণৎ টারজনকে বলল, টাকাটা রেখে দাও।

কিন্তু টারজন জোর করে অর্ধেক টাকা দার্ণৎকে দিয়ে দিল।

পরদিন সকালেই দার্ণৎ একটা নৌকো ভাড়া করল। ওরা সমুদ্রের ধার ঘেঁষে নৌকোয় করে রওনা হয়ে পরদিন সকালেই সেই কেবিনের কাছে উপকূলভাগে পৌঁছল। টারজন একটা কোদাল নিয়ে একা সিন্দুকটা আনতে চলে গেল। পরদিন সে সিন্দুকটা একাই ঘাড়ে করে ফিরে এল। তাদের নিয়ে নৌকো আবার উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করল সেই শহরের দিকে।

তখন থেকে তিন সপ্তার মধ্যেই একটি ফরাসী জাহাজে করে দার্ণৎ টারজনকে সঙ্গে করে প্যারিসের পথে যাত্রা করল।

প্যারিসে দার্ণতের অতিথি হিসাবে রয়ে গেল টারজন। এখান থেকে সে আমেরিকা যাবে। কিন্তু তার আগে একদিন দার্ণৎ তার আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষার জন্য এক পুলিশ অফিসারের কাছে নিয়ে গেল। এইভাবে সে টারজনের জন্মরহস্যের সমাধান করতে চায়। কিন্তু টারজনকে প্রথমে সেকথা বলল না। সে আগে নিজের আঙ্গুলগুলোর ছাপ দেবার পর টারজনকেও তার আঙ্গুলগুলোর ছাপ দিতে বলল।

পুলিশ অফিসার বলল, মানুষের আঙুলের ছাপ বয়সের ব্যবধানে পাল্টায় না, শুধু আকারে বড় হয়। সুতরাং ছোট বয়সের কারো আঙুলের ছাপ বড় বয়সের আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তাকে চেনা যায়।

দার্ণৎ বলল, কোন আঙুলের ছাপ দেখে নিগ্রো বা শ্বেতাঙ্গ লোকের ছাপ কিনা তা জানা যায়?

পুলিশ অফিসার বলল, তা ঠিক যায় না, তবে সাধারণতঃ নিগ্রোদের হাতের ছাপে জালের মত অনেক জটিল চিহ্ন দেখা যায়।

ক্লেটনের ডায়েরীর যে পাতায় তার ছয় মাসের ছেলের আঙুলের ছাপ ছিল সেটা অফিসারকে দেখাল দার্ণৎ।

অফিসার একটা কাচ দিয়ে ভাল করে দুটো ছাপ খুঁটিয়ে দেখে মিল দেখে আশ্চর্য হয়ে হাসল।

টারজন এবার সব ব্যাপারটা বুঝতে পারল। বুঝল দার্ণৎ তার জন্মরহস্য ভেদ করতে চায়।

পুলিশ অফিসার বলল, ঠিক আছে। তবু আমাদের বিশেষজ্ঞ দেসকার্ককে দেখিয়ে তার মতামত নেওয়া উচিত।

দার্ণৎ বলল, তিনি ত এখন নেই। কিন্তু মসিয়ে টারজন আগামীকালই আমেরিকা চলে যাচ্ছেন।

অফিসার বলল, তাহলে দেসকার্ক ফিরে এলে ব্যাপারটা জেনে ওঁকে টেলিগ্রাম করে সপ্তা দুইয়েকের মধ্যেই জানিয়ে দেবেন।

বাল্টিমোর শহরের শেষ প্রান্তে একটি পুরনো আমলের বাড়ির সামনে একদিন একটি ট্যাক্সি এসে থামল। চল্লিশ বছরের বলিষ্ঠ ও সুগঠিত চেহারার একটি লোক ট্যাক্সি থেকে বেরিয়ে এসে ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তাকে বিদায় দিল।

বৃদ্ধ অধ্যাপক পোর্টার এগিয়ে গিয়ে বলল, ও মিষ্টার ক্যানলার।

আগন্তুক লোকটি হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, শুভ সন্ধ্যা অধ্যাপক।
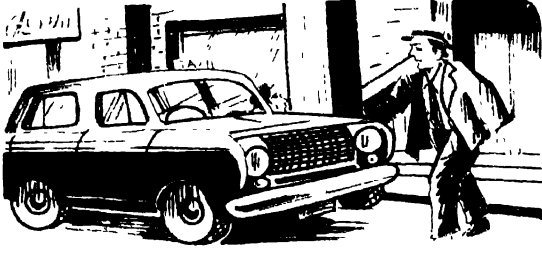
ক্যানলার বলল, ক্লেটন নামে এক যুবক মাসের পর মাস অপেক্ষা করে রয়েছে। জেন অবশ্য তাকে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু সে নাকি তার বাবার তরফ থেকে মোটা রকমের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে জেনকে লাভ করা খুব একটা অসম্ভব নয়।

অধ্যাপক বললেন, সে বলছিল এখনি কাউকে বিয়ে করতে সে রাজী নয়। উত্তর উইসকনসিনে তার মা তাকে যে একটা খামারবাড়ি দিয়ে গেছে সেইখানে গিয়ে বাস করার কথা বলছে। পরের সপ্তার প্রথম দিকেই আমরা সেখানে যাব। ফিলাণ্ডার আর ক্লেটন সেখানে সব ব্যবস্থা করার জন্য চলে গেছে।

ক্যানলার কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু জেন সহসা এসে পড়ায় সে থেমে গেল।

জেন বলল, ও আপনি? মাফ করবেন। আমি ভেবেছিলাম, বাবা একা আছেন।

অধ্যাপক পোর্টার তখনি বেরিয়ে গেলেন। ক্যানলার জেনকে বলল, এভাবে আর কতদিন চলবে জেন?

জেন বলল, আপনি কি বুঝতে পারছেন না আপনি কিছু ডলারের বিনিময়ে আমাকে কিনছেন? আপনি যখন বাবাকে গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য টাকা ধার দিয়েছিলেন শুধু হাতে তখন কোন উদ্দেশ্যেই দিয়েছিলেন। কোন না কোন একটা লাভের আশাতেই দিয়েছিলেন।

ক্যানলারের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল, তুমি যখন সবই জান তখন তুমি যাই ভাব, তোমাকে আমার চাই।

জেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন বিয়ে না করেই ট্রেনে চড়ে উইস-কনসিন স্টেশনে চলে গেল জেন। স্টেশনে ফিলাণ্ডার আর ক্লেটন একটা বড় গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য।

পরের দিন সকালে ক্যানলার শহরে চলে গেল। সেদিন সকাল থেকে পূর্ব দিকের বনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু বাতাসটা উল্টো দিক হতে বইতে থাকায় ধোঁয়াটা আসছিল না। দুপুরের দিকে জেন একাই একবার বের হলো। ক্লেটন তার সঙ্গে যেতে চাইলে সে তাকে সঙ্গে নিল না।

জেন বড় রাস্তাটা ফেলে রেখে পূব দিকের জঙ্গলে কোথায় আগুন লেগেছে তা দেখার জন্য আনমনে এগিয়ে যেতে লাগল। তার মনে তখন ছিল এক চিন্তা। ক্যানলারের কবল থেকে পরিত্রাণ পাবার আর কোন উপায় নেই।

এমন সময় জেনের হঠাৎ নজর পড়ল তার চার-দিকেই আগুন জ্বলছে। বড় রাস্তাটায় যাবার কোন উপায় নেই। সে তখন বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। একটা দিকে কিছু গাছপালা ছিল। সেদিকটায় আগুন কিছুটা কম। কিন্তু সেদিক থেকেও ধোঁয়া আসছিল। হঠাৎ গাছের উপর থেকে দৈত্যাকার এক শ্বেতাঙ্গ যুবক লাফিয়ে পড়ে জেনকে গাছের উপর তুলে নিল। তারপর গাছে গাছে বাঁদরের মত লাফিয়ে তাকে এক নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গেল। জেনের মনে পড়ল আফ্রিকার জঙ্গলের সেই বনবাসী লোকটি একদিন এইভাবেই তাকে এক বাঁদর-গোরিলার কবল থেকে উদ্ধার করে।

লোকটি নিরাপদ জায়গায় গিয়ে জেনকে বলল, রাস্তায় আমার গাড়ি আছে।

জেন বলল, তুমি কে?

লোকটি বলল, আমি সেই বাঁদরদলের টারজন।

জেন আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি এখানে কি করে এলে?

টারজন বলল, দার্ণৎকে আমি উদ্ধার করি। সে-ই আমাকে এখানে আসার পথ বলে দেয়। তোমরা আসার সময় আমাকে যে চিঠি লিখে রেখে এসেছিলে কেবিনে তার একটিতে তোমাদের বাড়ির ঠিকানা ছিল।

এখন এস, আমার গাড়িতে গিয়ে চাপবে। তোমার বাবা এখন হয়ত খামারের কাছে অপেক্ষা করছেন তোমার জন্য। আমি তোমাদের শহরের বাড়িতে ও পরে খামারবাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ক্লেটন আমাকে চিনতে পারেনি।

গাড়িতে যেতে যেতে টারজন বলল, তুমি তোমার চিঠিতে লিখেছিলে তুমি অন্য একজনকে ভালবাস' তুমি হয়ত আমার কথাই বলেছিলে?

জেন বলল, হয়ত তাই।

টারজন বলল, কিন্তু বাল্টিমোরে আমি যখন তোমাদের খোজ করছিলাম তখন সেখানকার লোকরা বলল তোমার এখানে বিয়ে হবে।

হ্যাঁ।

তুমি তাকে ভালবাস?

না।

ওরা দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। রাস্তাটা সমতল না হলেও ডানদিকের আগুনটা বেড়ে যাওয়ায় গাড়ির গতিটা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল টারজন।

ক্রমে বিপদসীমাটা পার হয়ে গাড়ির গতিটা কমিয়ে দিল টারজন। বলল, আমি যদি ক্যানলারকে তোমার জন্য বলি?

জেন বলল, অপরিচিত ব্যক্তির কথা শুনবে না, বিশেষ করে যে ব্যক্তি আমাকে চায়।

কিছুক্ষণ আবার ওরা চুপ করে রইল। টারজন প্রথমে কথা বলল। বলল, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

সঙ্গে সঙ্গে কথাটার উত্তর দিতে পারল না জেন। সে ভাবতে লাগল, যে অদ্ভুত লোকটি তার পাশে বসে রয়েছে সে কে? কি তার পরিচয়? সে নিজেই বা

তার নিজের সম্বন্ধে কতটুকু জানে? তার পিতামাতাই বা কে? কি তার পরিচয়?

টারজন এবার শান্তভাবে বলল, আমি বুঝতে পেরেছি। আর তোমাকে চাপ দেব না। আমি তোমার সুখটাকেই বড় করে দেখতে চাই। বুঝেছি তুমি একটা বাঁদরের সঙ্গে সুখী হতে পার না।

গাড়িটা ক্লেটনের কাছে এসে পৌঁছতে জেনকে দেখতে পেয়ে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। অধ্যাপক পোর্টার জেনকে দেখতে পেয়েই জড়িয়ে ধরলেন। প্রথমে টারজনকে কেউ দেখতে পায়নি। পরে ক্লেটন তাকে গাড়ির ভিতর বসে থাকতে দেখে হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, কি বলে ধন্যবাদ দেব তোমায়? তুমি আমাদের সকলকে উদ্ধার করলে। তুমি খামারবাড়িতে গিয়ে আমার নাম ধরে ডেকেছিলে, কিন্তু আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। তাছাড়া তোমাকে এ বেশে দেখে চেনাই যায় না।

টারজন হেসে বলল, ঠিক বলেছ মঁসিয়ে ক্লেটন।

ক্লেটন বলল, কিন্তু তুমি কে?

আমি বাঁদরদলের সেই টারজন।

কথাটা শুনে চমকে উঠল ক্লেটন।

তাদের পুরনো জঙ্গলের বন্ধুকে এবার চিনতে পেরে অধ্যাপক পোর্টার ও ফিলাণ্ডারও এগিয়ে এসে ধন্যবাদ দিল টারজনকে।

তারা সকলে এবার খামারবাড়িতে গিয়ে উঠল। ক্লেটন তাদের সকলের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করল। এমন সময় একটা মোটর গাড়ির আওয়াজ শুনে চমকে উঠল তারা।

এমন সময় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল ক্যানলার। বলল, আমি কি ভয়ই না করেছিলাম! আমি ত একবার আসতে আসতে আগুনে পথ না পেয়ে শহরে ফিরে গিয়েছিলাম। এখানে পৌছতে পারব ভাবতেই পারিনি।

কেউ তার কথাটা গ্রাহ্য করল না। টারজন একবার ক্যানলারের দিকে তাকাল, সিংহী যেমন তার শিকারের দিকে তাকায়।

জেন ক্যানলারকে বলল, ইনি হচ্ছেন আমাদের পুরনো বন্ধু মঁসিয়ে টারজন।

ক্যানলার তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। কিন্তু টারজন শুধু ভদ্রতার খাতিরে মাথাটা নোয়াল। ক্যানলারের হাতটা ধরল না।

ক্যানলার আবার বলল, আমাদের বিয়েটা এখনি সেরে ফেলতে হবে জেন, যাতে আমরা মধ্য রাতের ট্রেনটা ধরতে পারি।

টারজন এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সে শুধু একবার জেনের দিকে তাকাল।

জেন বলল, আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করলে হয় না মিস্টার ক্যানলার। আমার মাথার ঠিক নেই। আজ সারাটা দিন যা বিপদ গেছে।

তার প্রতি উপস্থিত সকলের বিরুদ্ধভাব দেখে রেগে গেল ক্যানলার। বলল, আমি অনেকদিন অপেক্ষা করেছি। তুমি আমাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছ।

এই বলে জেনের একটা হাত ধরে এগোতেই ক্যানলারের গলাটা একটা হাত দিয়ে ধরে তাকে শূন্যে তুলে ধরল টারজন।

জেন ভয়ে টারজনের দিকে ছুটে গেল। টারজনকে কাতর মিনতি জানিয়ে বলল, দয়া করে আমার খাতিরে ওকে ছেড়ে দাও। তোমার হাতে ওকে মরতে দিতে পারি না। আমি চাই না তুমি খুনের অপরাধে অপরাধী হও।

এবার ক্যানলারের গলাটা ছেড়ে দিয়ে টারজন তাকে বলল, বল, ওকে তুমি তার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি দিলে। তা না হলে তোমাকে তোমার জীবন দিতে হবে।

ক্যানলার হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, হ্যাঁ।

টারজন আবার বলল, বল, তুমি চলে যাবে এবং আর কখনো ওকে বিরক্ত করবে না?

এবারও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল ক্যানলার।

টারজন তাকে ছেড়ে দিল। ক্যানলার টলতে টলতে একমুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টারজন ক্লেটনকে বলল, কিছুক্ষণের জন্য নির্জনে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

টারজন জেনকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অধ্যাপক পোর্টার এই ঘটনায় বিশেষ বিব্রত হয়ে বললেন, কোন্ অধিকারে তুমি আমার মেয়ে আর ক্যানলারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে? আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব।

টারজন বলল, আমি হস্তক্ষেপ করেছিলাম এইজন্য যে আপনার মেয়ে তাকে ভালবাসে না।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, তুমি জান না তুমি

কি করেছ। আর ও বিয়ে করতে চাইবে না এরপর !

টারজন জোর দিয়ে বলল, না, করবে না। তাছাড়া আপনার সম্মানে আঘাত লাগবে বলে আর ভয় করার কিছু নেই। আপনি এবার ওকে ঋণের টাকা শোধ করে দিতে পারবেন।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, থাম থাম স্যার। একথার মানে কি জান ?

টারজন বলল, আপনার হারানো ধন সব পাওয়া গেছে।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, থাম থাম স্যার। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ?

টারজন বলল, আমি লুকিয়ে দেখছিলাম নাবিকরা সিন্দুকটা কোথায় পুঁতে রাখে। তারপর সেটা কার এবং তাতে কি আছে তা না জেনেই সেটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য এক জায়গায় সেটা পুঁতে রাখি। তারপর দার্ণতের সঙ্গে সেটা ফ্রান্সে নিয়ে আসি। সিন্দুকটা এখানে বয়ে আনা কষ্টকর হবে ভেবে তার মধ্যে যেসব ধনরত্ন ছিল তা দার্ণৎ কিনে নিয়ে একটা চেক দিয়েছে। তার মোট দাম হয়েছে দু লক্ষ একচল্লিশ হাজার ডলার।

পকেট থেকে চেকটা বার করে বিস্মিত অধ্যাপক পোর্টারের হাতে দিল টারজন।

অধ্যাপক পোর্টার আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন, আজ আমার মান সম্মান সব রক্ষা করলে তুমি।

ক্লেটন এমন সময় ঘরে ঢুকে বলল, শুনছি আগুনটা এইদিকে এগিয়ে আসছে। এখানে থাকা
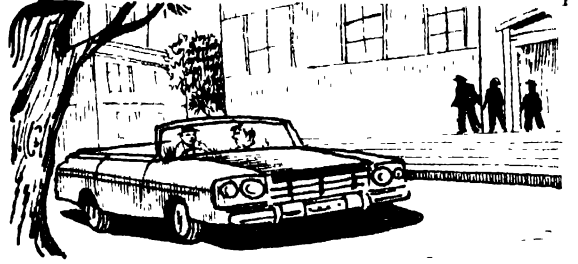
আর নিরাপদ নয় আমাদের পক্ষে। এখনি আমাদের শহরে চলে যেতে হবে।

ফিলাণ্ডার আর টারজন একটা গাড়িতে চাপল। ক্লেটনের গাড়িটাতে বাকি সবাই চাপল।

গাড়িতে যেতে যেতে ক্লেটন জেনকে বলল, এখন তুমি স্বাধীন। এবার কি তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হতে পার না ?

জেন চুপি চুপি বলল, হ্যাঁ।

সেদিন স্টেশানের বিশ্রামাগারের একটি ঘরে টারজন জেনকে ডেকে বলল, এখন তুমি স্বাধীন। আমি তোমাকে পাবার জন্য সুদূর আফ্রিকা হতে কত সমুদ্র পার হয়ে এখানে এসেছি। বল, তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি না।

জেন বলল, ক্লেটনকে জবাব দিতে পারছি না টারজন। ক্লেটনও আমায় ভালবাসে। লোক হিসাবেও সে ভাল। তার দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা উচিত হবে না। তুমি আমাকে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সাহায্য করবে।

সহসা স্টেশানের একজন কর্মচারী ঘরে ঢুকে টারজনের খোঁজ করতেই তার চিন্তায় বাধা পড়ল। লোকটি বলল, মঁসিয়ে টারজনের নামে প্যারিস থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছে।

টারজন বলল, আমিই মঁসিয়ে টারজন।

টারজন টেলিগ্রামটা খুলে দেখল দার্ণৎ সেটা পাঠিয়েছে। তাতে লেখা আছে, আঙ্গুলের ছাপ এই কথাই প্রমাণ করে যে তুমিই লর্ড গ্রেস্টোক। তোমাকে অভিনন্দন জানাই। ইতি দার্ণৎ।

টারজনের পড়া শেষ হতেই ক্লেটন ঘরে ঢুকল। টারজনকে বলল, তুমি আমাদের জন্য যা করেছ তার জন্য ঠিকমত ধন্যবাদ জানাতে পারিনি। তুমি আমাদের সকলকে উদ্ধার করেছ। আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। তুমি এখানে আসায় আমি দারুণ খুশি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তোমার মত লোক কি করে আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে পড়লে?

টারজন শান্তভাবে বলল, আমি সেখানেই জন্মেছিলাম. আমার মা ছিল এক বাদর-গোরিলা। আমার জন্ম সম্বন্ধে কোন কথা সে বলে যেতে পারেনি। আমার বাবা কে তা আমি জানি না।

জাহাজে যেতে কাউন্টেস ডা কুদ আবেগের সঙ্গে বলল, চমৎকার।

কাউন্টপত্নীর চোখে চোখ পড়তেই একজন যুবক উঠে ডেকের দিকে চলে গেল। কাউন্টপত্নী জাহাজের এক কর্মচারিকে বলল, এ ভদ্রলোক কে?

কর্মচারিটি বলল, ভদ্রলোকের নাম মঁসিয়ে টারজন, আফ্রিকা যাবার জন্য টিকিট কেটেছেন।

ডেকে দাঁড়িয়ে অতীতের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের ভাবনা করতে লাগল টারজন. যে বিশাল জঙ্গলে অজস্র সিংহ ও জন্তুদের মাঝে জন্মের পর থেকে তার জীবনের বাইশটি বছর কাটিয়েছে সে, সে জঙ্গলের মধ্যে আবার ফিরে যাবার আনন্দ ও উত্তেজনার আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল তার মন। অবশ্য সে আবার সেখানে ফিরে গেলে কেউ তাকে অভ্যর্থনা জানাবে না। একমাত্র ট্যান্টর বা একটা হাতি ছাড়া তার কোন বন্ধু নেই সেখানে।

একসময় টারজন যখন ডেকের উপর দিয়ে যাচ্ছিল তখন দেখল এক জায়গায় রোকোফ আর পলভিচ একজন অবগুণ্ঠিতা মহিলার সঙ্গে উত্তেজিতভাবে তর্ক-বিতর্ক করছে।

রোকোফের হাবেভাবে টারজন বুঝল সে মহিলাটিকে দৈহিক পীড়নের ভয় দেখাচ্ছে। সে তাই যেতে যেতে থেমে গেল। রোকোফ টারজনকে তখনো দেখতে পায়নি। সে মহিলাটির একটা হাত ধরতে না ধরতেই টারজন তার লোহার মত শক্ত একটা হাত দিয়ে রোকোফের ঘাড় ধরে তাকে সজোরে ঠেলে দিল। রোকোফ এবার টারজনের মুখপানে তাকিয়ে বলল, কি চাও তুমি? তুমি কি এতই নির্বোধ যে নিকোলাস রোকোফকে অপমান করছ?

টারজন কোন কথা না বলে রোকোফকে এমনভাবে আবার ঠেলে দিল যে সে ডেকের উপর পড়ে গেল।

রোকোফ উঠে দাঁড়িয়ে রেগে বলল, শুয়োর কোথাকার। এর জন্য তোমায় মরতে হবে।

এই বলে সে পকেট থেকে রিভলবার বার করে টারজনকে লক্ষ্য করে গুলি করার জন্য উদ্যত হলো। মহিলাটি মিনতি করে বলল, ও কাজ করো না রোকোফ।

কিন্তু টারজন নির্ভয়ে এগিয়ে গেল রোকোফের দিকে। যেতে যেতে বলল, বোকার মত কাজ করো না।

রোকোফ গুলি করল। কিন্তু রিভলবারে গুলি ছিল না তখন। টারজন তখন তার হাত থেকে রিভলবারটা কেড়ে নিয়ে রেলিং পার করে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল।

এবার দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল। রোকোফ বলল, তুমি নিকোলাস রোকোফকে অপমান করলে, তার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে। এবার তুমি রোকোফকে তা বুঝতে পারবে।

টারজন বলল, তুমি যে একটা কাপুরুষ তা আমি বুঝেছি।

রোকোফ মেয়েটিকে আঘাত করছে কিনা জানবার জন্য পিছন ফিরতেই সে দেখল মেয়েটি চলে গেছে সেখান থেকে। টারজন তখন সেখানে আর না

দাঁড়িয়ে ডেকের উপর বেড়াবার জন্য অন্যত্র চলে গেল।

সেদিন রাতে খাওয়া শেষ হতেই ডেকের উপর বেড়াতে বেড়াতে জাহাজের সেকেণ্ড অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিল টারজন। পরে অফিসার চলে গেলে সে একাই বেড়াতে লাগল। হঠাৎ সে রোকোফ আর পলভিচের গলার আওয়াজ পেল। ওরা তাকে দেখতে পায়নি। রোকোফ পলভিচকে অনুচ্চ স্বরে বলছে যদি সে চীৎকার করে তাহলে তার গলাটা টিপে ধরে থাকবে চুপ না করা পর্যন্ত।

কথাটা টারজনের কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এক দুঃসাহসিক অভিযানের আকাঙ্খা প্রবল হয়ে উঠল তার মধ্যে। সে আড়াল থেকে রোকোফের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। টারজন দেখল ওরা ফার্স্ট ক্লাস কেবিনের দিকে চলে গেল। ওরা দরজার সামনে দাঁড়াতেই টারজন একটা গলির মধ্যে গিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল।

দরজায় ঘা দিতেই ভিতর থেকে এক নারীকণ্ঠ বলল, কে?

রোকোফ বলল, আমি ওলগা,—নিকোলাস। ভিতরে আসতে পারি?

নারীকণ্ঠ তখন আবার বলল, কেন আমাকে এভাবে পীড়ন করছ নিকোলাস?

রোকোফ বলল, দরজা খোল, কথা আছে।

এবার দরজাটা ভিতর থেকে খোলার শব্দ হলো। রোকোফ ঘরে না ঢুকেই মহিলাটিকে চুপি চুপি কি বলতেই মহিলাটি বলল, না, তুমি যতই ভয় দেখাও তোমার দাবি আমি মেনে নিতে পারব না।

রোকোফ বলল, ঠিক আছে আমি ঢুকব না। তবে তোমাকে খুব শীগগিরই হার মানতেই হবে।

এরপর মহিলাটি কিছু বলার আগেই রোকোফ পলভিচকে কি ইশারা করতে পলভিচ ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে তালা দিয়ে দিল। রোকোফ দরজার উপর কান পেতে রইল ভিতরের কথাবার্তা শোনার জন্য।

নারীকণ্ঠ বলল, কাপুরুষ কোথাকার! তুমি বেরিয়ে যাও এখনি এবং আর কখনো আসবে না।

একমুহূর্তে সব চুপ হয়ে গেল একেবারে। তারপর নারীকণ্ঠের এক আর্ত চীৎকার শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার চুপ হয়ে গেল সে কণ্ঠ।

নারীকণ্ঠ চুপ হবার সঙ্গে সঙ্গে টারজন তার গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে এল। রোকোফ চমকে উঠে পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু টারজন তার জামার কলারটা ধরে ফেলল। তারপর টারজন তার দানবিক শক্তির চাপ দিয়ে কেবিনের তালাবন্ধ দরজাটা ভেঙ্গে দিয়ে রোকোফকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

এবার মহিলাটি মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানাল টারজনকে।

টারজন বলল, আমি এর আগেই ধূমপান ঘরে ওদের দেখেছি। এই ধরনের লোক ভাল কিছু সহ্য করতে পারে না।

মহিলাটি বলল, মঁসিয়ে টারজনের বীরত্ব ও শক্তির কথা আমার স্বামী সব বলেছেন। তিনি আপনার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতার ঋণে ঋণী।

টারজন বলল, আপনার স্বামী?

হ্যাঁ, আমার স্বামী হলেন কাউন্টেস দ্য কুদ।

তারপর থেকে সেই মহিলার সঙ্গে আর দেখা হয়নি টারজনের।

প্যারিসে পৌঁছেই দার্ণতের কাছে চলে গেল টারজন। টারজন স্বেচ্ছায় তার পৈত্রিক ভূসম্পত্তি আর পদমর্যাদা ত্যাগ করার জন্য দার্ণৎ তাকে তিরস্কার করল।

দার্ণৎ বলল, তুমি নিশ্চয় পাগল হয়েছ বন্ধু। তুমি শুধু ধনসম্পত্তি ও পদমর্যাদা ত্যাগ করলে না, তোমার দেহের শিরায় শিরায় যে ইংলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবারের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে সেটা জগতের সামনে প্রমাণ করার সুযোগটাও হারালে। কিন্তু একথা তারা বিশেষ করে জেন পোর্টার বিশ্বাস করল কি করে যে তুমি এক মেয়ে-বাঁদরের সন্তান? তোমার বাবার ডায়েরীতে পাওয়া তথ্য, তোমার শিশুবয়সের আঙ্গুলের ছাপ প্রভৃতির প্রমাণ সত্ত্বেও তুমি যে সবকিছু ছেড়ে দিলে তা আমার কাছে অবিশ্বাস্য বোধ হচ্ছে।

টারজন বলল, টারজন নামই আমার সবচেয়ে ভাল লাগছে। তুমি যদি আমাকে একটা চাকরি

দেখে দাও তাহলে আমাকে অন্ততঃ নিঃস্ব থাকতে হবে না।

দার্ণং বলল, আমি তা বলছি না। আমি আমার যথাসর্বস্বের অর্ধেক যদি তোমাকে দান করি তাহলেও তোমার ঋণের দশভাগের একভাগ শোধ হবে না। তুমি আমাকে নরঘাতকদের কাছ থেকে যেভাবে উদ্ধার করেছ তা আমি কখনো ভুলতে পারব না। টাকা দিয়ে তোমার ঋণ শোধের স্পর্ধা আমার নেই। তবে তোমার টাকার দরকার বলে সে দরকার মেটাতে চাই।

টারজন বলল, ঠিক আছে, কিন্তু আমি একটা কিছু করতে চাই। তাই একটা কাজ চাই। আর আমার উত্তরাধিকারের কথা যদি বলতে চাও তাহলে বলি আমার থেকে ক্লেটন এবিষয়ে বেশী যোগ্য। সে ভদ্র, শিক্ষিত। আমার মধ্যে পশুসুলভ ভাব ও বৃত্তি সুপ্ত হয়ে আছে এবং সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কিছুই জানি না। তাছাড়া আজ যদি ক্লেটনের কাছ থেকে সব সম্পত্তি ও পদমর্যাদা কেড়ে নিই তাহলে যে মেয়েটিকে আমি ভালবাসি এবং যে ক্লেটনকে বিয়ে করতে চলেছে তার অবস্থা কি হবে ভেবে দেখেছ? আমার কাছে বংশগৌরব বা পদমর্যাদার কোন দাম নেই।

দার্ণং বলল, কিন্তু ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যখন তুমি তোমার বংশমর্যাদা ফিরে পেয়ে আনন্দ লাভ করবে। অধ্যাপক পোর্টার ও মিস্টার ফিলাণ্ডার—একমাত্র তাঁরা দুজনেই সর্বসমক্ষে বলতে পারেন সেই কেবিনটার মধ্যে যে শিশুর কঙ্কালটা পাওয়া যায় তা কোন মানবশিশুর নয়, সেটা এক শিশু বাঁদর-গোরিলার কঙ্কাল। তাঁরা বৃদ্ধ, বেশী দিন বাঁচবেন না। আসল সত্য উদঘাটিত হলে মিস পোর্টারের মনের পরিবর্তন হবে।

টারজন বলল, তুমি মিস পোর্টারকে জান না। ক্লেটনের কিছু একটা না হলে ওর মনের পরিবর্তন কিছুতেই ঘটবে না। আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে এক

পরিবারে ওর জন্ম। জীবনে নিষ্ঠা আর বিশ্বস্ততাকে ওরা বড় করে দেখে।

সেই থেকে দু'সপ্তা ধরে দার্ণতের কাছে প্যারিসেই রয়ে গেল টারজন।

একদিন সন্ধ্যের পর থিয়েটার দেখার পর টারজনের হঠাৎ নজর পড়ল কোন এক অচেনা লোকের এক-জোড়া সন্ধানী দৃষ্টি তাকে লক্ষ্য করছে তার অগোচরে।

সেরাতে থিয়েটার হল থেকে বেরিয়ে অন্ধকার রাস্তাটা দিয়ে কিছুটা হেঁটে যেতেই টারজন দেখল একটা লোক ছুটে রাস্তাটা পার হয়ে অন্য দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই রাস্তার ধারের একটা তিনতলা বাড়ির দোতলার একটা ঘর থেকে নারী-কণ্ঠের আর্ত চীৎকার শুনতে পেল সে।

আর্ত নারীকণ্ঠের চীৎকার কানে যাওয়ামাত্র টারজন ঘরটা লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল। ঘরে ঢুকেই সে দেখল একজন নারী তার গলায় একটা হাত দিয়ে একধারে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর কয়েকজন পুরুষ ঘোরাফেরা করছে ঘরখানায়। টারজনকে দেখে পুরুষগুলো কেউ সরে গেল না। প্রায় তিরিশ বছর বয়সের সেই নারীটি টারজনকে বলল, আমাকে বাচান মঁসিয়ে, ওরা আমাকে খুন করতে এসেছে।

টারজন ঘরের স্বল্প আলোয় দেখল একটা লোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং সে হলো রোকোফ। রোকোফ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই একটা লোক একটা বড় দা হাতে টারজনের মাথায় মারার জন্য এগিয়ে এল। বাকি লোকগুলো এবার একযোগে আক্রমণ করল টারজনকে। টারজন প্রথমে যে লোকটা তার

মাথার উপর দা তুলে ধরেছিল সেই লোকটার মুখের উপর একটা জোর ঘুষি মারতেই সঙ্গে সঙ্গে মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা। টারজন এবার অন্য লোকগুলোকে মারতে লাগল। তার কাছে এটা যেন একটা খেলার ব্যাপার।

মেয়েটাও ভয়ে চীৎকার করে উঠল, হা ভগবান!

লোকগুলোর মধ্যে অনেকেরই হাড় ভেঙ্গে গেল। তারা সবাই ঘর থেকে কোনরকমে নিজেদের মুক্ত করে পালিয়ে গেল। রোকোফ এতক্ষণ বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। সে ভেবেছিল টারজন ওদের হাতে মারা যাবে। কিন্তু সে যখন দেখল টারজন সকলকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে ঘর থেকে তখন সে পুলিশকে টেলিফোন করল। বলল, একটা দুর্বৃত্ত কোথা থেকে এসে মারপিট করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ অফিসারবা এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখল ঘরের একধারে একজন যুবতী একটা নোংরা বিছানার উপর হাতে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে আর তিনজন আহত লোক মেঝের উপর শুয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। ঘরের মাঝখানে দৈত্যাকার এক ভদ্রলোক ধবধবে সাদা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

একজন পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে এখানে?

টারজন যা যা হয়েছিল সব কথা বুঝিয়ে বলল। কিন্তু সব কথা বলার পর মেয়েটির দিকে সমর্থনের আশায় তাকাতেই মেয়েটি বলল, ও মিথ্যা কথা বলছে। আসলে আমি যখন একা এই ঘরে ছিলাম, তখন ও অসদুদ্দেশ্যে এসে আমার শালীনতা নষ্ট করার চেষ্টা করে। আমি সাহায্যের জন্য চীৎকার করলে এই সব ভদ্রলোকরা ছুটে আসে। কিন্তু এই লোকটা তাদের প্রত্যেককে আহত করে শুধু তার হাত আর দাঁত দিয়ে। ও মানুষ নয়, একটা পশু।

কথাটা শুনে মনে দারুন আঘাত পেল টারজন। এবার সে রোকোফের চক্রান্তের কথাটা বুঝতে পারল।

পুলিশরা অবশ্যই মেয়েটি কি প্রকৃতির তা জানত। তার সঙ্গীদেরও চিনত। কিন্তু এক্ষেত্রে কে দোষী তা তারা ঠিক করতে না পেরে সকলকেই গ্রেপ্তার করতে চাইল।

টারজন বলল, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই মহিলার চীৎকার শুনে ছুটে আসি আমি। এর আগে কখনো দেখিনি এই মহিলাকে।

পুলিশ অফিসার বলল, আপনার যা বলবার আদালতে বলবেন। এখন আমাদের সঙ্গে চলুন, এই বলে টারজনের কাঁধের উপর হাত দিতেই টারজন ঘুষি মেরে ফেলে দিল তাকে। তার সাহায্যে অন্য পুলিশরা ছুটে যেতে তাদেরও এক এক ঘুষিতে ঘায়েল করে দিল টারজন। এরপর একজন অফিসার রিভলবার থেকে গুলি করতে যেতেই টারজন ঘরের বাতিটা নিভিয়ে দিলে ঘরখানা অন্ধকার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

এদিকে টারজন রাস্তার দিকে জানালাটা দিয়ে বেরিয়ে একটা লাফ দিয়ে টেলিগ্রাফের পোস্টটা ধরে তাই দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। পুলিশরা তার

আগেই চলে গেছে।

ফরাসী উপনিবেশ আলজিরিয়ার অন্তর্গত সিদি বেল আবেব নামক এক জায়গায় জনৈক আমেরিকান শিকারীর ছদ্মবেশে টারজনকে পাঠানো হলো। সেখানে লেফটন্যান্ট জার্নয় নামে এক অফিসার ফরাসী সরকারের সৈন্যবিভাগের অধিকর্তারূপে কাজ করছিল। ছদ্মবেশে তার উপর নজর রাখার জন্য টারজনের উপর ভার পড়ল। জার্নয়ের কাজকর্ম কিছুদিন ধরে ভাল লাগছিল না ফরাসী সরকারের। সে কিছু রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কাজে লিপ্ত আছে এমন সন্দেহও করা হয়। তাই তার কাজকর্মের উপর কড়া নজর রাখতে হবে টারজনকে।

আফ্রিকার নাম শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল টারজন। কিন্তু পরে দেখল এটা আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল এবং মধ্য আফ্রিকার বনাঞ্চল থেকে এর ভূপ্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। ওখানে পৌঁছে প্রথম দিনটা সে এখানে সেখানে ঘুরে কাটাল। পরদিন বেল আবেবে গিয়ে সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে তার পরিচয়পত্র দাখিল করল। সেখানকার ফরাসী ও আরব দেশীয় লোকদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথাবার্তা বলত টারজন। তবে কোন ইংরেজ দেখতে পেলে তার সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা বলত, পাছে সে যে একজন ইংরেজ এটা ধরা পড়ে যায়।

অল্প দিনের মধ্যে সেখানকার ফরাসী অফিসারদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল টারজন। জার্নয়ের সঙ্গেও দেখা করল। জার্নয়ের বয়স চল্লিশ। মুখটা সব সময় ভার করে থাকে এবং কারো সঙ্গে মেলামেশা করে না।

ক্যাপ্টেন জিরার্দ নামে একজন অফিসারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল টারজনের। একদিন জিরার্দ টারজনকে বলল, তাদের কিছুদিনের জন্য সাহারার কাছে বু সাদা নামে একটা জায়গায় যেতে হবে। তিনজন অফিসার-সহ একদল সৈন্য সেখানে যাবে। শিকারের অছিলায়

টারজনও জিরার্দের সঙ্গে যেতে চাওয়ায় কারো কোন সন্দেহ হলো না বা কেউ তাকে বাধা দিল না।

যাবার সময় বুইরা নামে একটা জায়গায় টারজন দেখল ইউরোপীয় পোশাকপরা একটি লোক তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করছে। টারজন কিন্তু ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিল না।

পরদিন প্রাতরাশ সেরে হোটেল থেকে আবদুল নামে আরবদেশীয় এক বিশ্বস্ত যুবককে পথ-প্রদর্শক ও দোভাষী হিসাবে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল টারজন। একসময় আবদুল টারজনকে বলল, ঐ দেখ মালিক, কালো আলখাল্লা আর সাদা পাগড়ীপরা একটা এদেশীয় লোক আমাদের অনেকক্ষণ ধরে পিছু নিয়েছে। লোকটার উদ্দেশ্য খারাপ, কারণ ওর মুখের নিচের দিকটা ঢাকা, শুধু চোখদুটো বার করা আছে।

টারজন বলল, আমি ত আজই এখানে এসেছি, আগে কখনো এদেশে আসিনি। সুতরাং এখানে আমার কোন শত্রু থাকতে পারে না। তবে যদি ডাকাত হয় তাহলে আমরা প্রস্তুত। যত পারে লুট-পাট করুক।

হোটেলে আবদুলের মাধ্যমে কাদুর বেন সাদেন নামে আরবদেশীয় এক মুসলমানের সঙ্গে আলাপ হলো টারজনের। লোকটি ভদ্র এবং একজন অশ্ব বিক্রেতা হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াত। টারজন শিকারী জেনে কাদুর তাকে তাদের দেশের অরণ্যে গিয়ে শিকার করার জন্য আমন্ত্রণ জানাল।

কাদুর চলে গেলে টারজন কিছু দূরে একটি

হোটেলের সামনে এক নাচের আসর দেখে সেখানে গিয়ে বসল। সেখানে আউলেদ নাইল নামে এক সুন্দরী তরুণী নাচছিল। টারজনকে দেখেই মেয়েটি তার কাছে এসে তার ঘাড়ের উপর একটা সিল্কের রুমাল নাড়তে লাগল। টারজন তাকে একটা মুদ্রা দিল। মেয়েটি নাচতে নাচতে একবার একটু সরে গিয়ে দুজন আরবের সঙ্গে ফিস ফিস করে কি কথা বলল। তারপর আবার টারজনের কাছে এল। এবারও সে তাকে একটা মুদ্রা দিল।

এবার মেয়েটি টারজনের কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসী ভাষায় বলল, তুমি এখনি চলে যাও এখান থেকে। বাইরে দুজন লোক তোমার ক্ষতি করার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমাকে ওদের হাতে ধরিয়ে দেব বলে প্রথমে কথা দিয়েছিলাম আমি। পরে দেখলাম তুমি দয়ালু এবং বড় ভদ্র। তাই বলছি, চলে যাও, ওরা দুষ্ট প্রকৃতির লোক।

টারজন বলল, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

কিন্তু সেখান থেকে চলে গেল না টারজন। আবদুলও তার পাশে বসে রইল। এমন সময় একজন গোমরামুখো আরব এসে তাদের ভাষায় গালাগালি করতে লাগল টারজনকে।

টারজন আবদুলকে বলল, ওকে বলে দাও, আমি ওর কোন ক্ষতি করিনি। ও যেন এখান থেকে চলে যায়।

আবদুল আরবী ভাষায় লোকটাকে তাই বললে সে টারজনকে কুকুর বলে গাল দিল। বলল, তার বাবা কুকুর আর তার মা হায়েনা। একথা শুনে উপস্থিত অন্যান্য আরবরা হাসতে লাগল।

যে লোকটা গালাগালি করছিল তার মুখে একটা জোর ঘুষি মেরে দিল টারজন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত আরবরা ছুটে এল শ্বেতাঙ্গ টারজনকে মারার জন্য।

টারজন আর আবদুলকে আক্রমণ করার জন্য একসঙ্গে অনেক লোক এসে তাদের সামনে ঝাঁক বেঁধে তেড়ে এল। হঠাৎ টারজন একটা আরব যুবককে ধরে তার হাত থেকে অস্ত্রটা কেড়ে নিয়ে তাকে ঢাল হিসাবে তুলে ধরে সামনে পথ করে দুজনে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তারপর অন্ধকার উঠোনটার এক প্রান্তে গিয়ে তারা দাঁড়াতেই ওরা দেখল দুজন আরব রিভলবার থেকে গুলি করতে করতে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই টারজন তাদের উপর লাফিয়ে পড়ল। একটা লোকের একটা হাতের কব্জি ভেঙ্গে যেতে সে পড়ে গেল। আর একটা লোকের পেটে ছুরি মেরে আবদুল তার নাড়ীভুঁড়ী বার করে দিল।

সহসা টারজনের পিছন থেকে আউলেদ নামে সেই নাচিয়ে মেয়েটি তাদের ডেকে ঘরের ভিতর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তিনতলার ছাদের ঘরের উপর নিয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল আরব সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসতে লাগল। কিন্তু একসঙ্গে অনেক লোক তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে পুরনো সিঁড়ি অত লোকের ভার সহ্য করতে না পেরে ভেঙে গেল। অনেক লোক পড়ে গিয়ে আহত হলো।

আউলেদ বলল, এখানে বেশীক্ষণ আমাদের থাকা

চলবে না। এখনি ওরা এসে পড়বে। ওরা ছাড়বে না। আমাকেও পালাতে হবে। কারণ ওরা জেনে গেছে আমি তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছি।

টারজন বলল, ভেবো না, তুমি যেখানে যেতে চাও, আমি পাঠিয়ে দেব নিরাপদে।

আউলেদ বলল, আসলে আমি বন্দী।

টারজন আশ্চর্য হয়ে বলল, বন্দী !

আউলেদ বলল, হ্যাঁ, এদেশের দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের বাড়ি। আমাকে দুর্বৃত্তরা বাড়ি থেকে চুরি করে এনে এই হোটেলওয়ালার কাছে বিক্রি করে দেয়। সেই এই হোটেলে নাচিয়ের কাজ করতে দেয় আমাকে। আমার বাবার নাম কাদুর বেন সাদেন।

টারজন বলল, তিনি ত এই শহরেই আছেন। কিছুক্ষণ আগে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

টারজন এবার ছাদে উঠে গিয়ে পাশের বাড়ির একটা ছাদে চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর টারজন সেই বাড়ির জানালা ও পাইপ বেয়ে আউলেদকে কাঁধে নিয়ে রাস্তায় নেমে এল। আবদুলও তার মত নামল।

এরপর টারজন আউলেদ আর আবদুলকে নিয়ে কাদুর যে হোটেলে ছিল সেই হোটেলে তার খোঁজে গেল। গিয়ে দেখল কাদুর বাইরে গেছে। কিছু পরে আসবে। তারা অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে কাদুর এসে তার হারানো মেয়েকে দেখেই তাকে জড়িয়ে ধরল। চোখে আনন্দাশ্রু বইতে লাগল। বলল, আল্লা কত দয়ালু।

তার মেয়ের কাছে তার উদ্ধারকর্তা টারজনের সব কথা শুনে কাদুর বলল, কাদুর বেন সাদেনের যথাসর্বস্ব, এমন কি তার জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেবে তোমার কাছে।

হোটেলে কিছুটা ঘুমিয়ে নিয়ে ওরা শেষ রাতের দিকে ঘোড়ায় করে বু সাদার পথে রওনা হলো। ভাবল সন্ধ্যার আগেই ওরা সেখানে গিয়ে পৌঁছবে।

টারজন আর আবদুল ছাড়া শেখ কাদুরের সঙ্গে চারজন সশস্ত্র সহচর ছিল। ওদের কাছে মোট সাতটা বন্দুক ছিল।

পথটা বড় খারাপ। বন্ধুর পাথুরে মাটি মাঝে মাঝে একটা করে ছোট পাহাড়। কোথাও কোন জনপদ বা লোকালয় নেই। চারদিকে শুধু দিগন্ত-জোড়া শূন্য প্রান্তর আর পাহাড়।

যেতে যেতে প্রায়ই পিছন ফিরে দেখছিল আবদুল। তার ধারণা শত্রুরা পিছু নিতে পারে তাদের। বিকেলের দিকে দেখা গেল তার ধারণাই ঠিক। দেখা গেল তাদের পিছনে অনেক দূরে একদল অশ্বারোহী আসছে।

বিপদের গন্ধ পেয়ে অনেক করে বুঝিয়ে শেখ কাদুর আর আউলেদকে পাঠিয়ে দিল টারজন। আবদুল তার সঙ্গ কিছুতেই ছাড়ল না। বু সাদা আর বেশীদূরের পথ নয়। টারজন আবদুলকে নিয়ে পথের ধারে একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

আরব অশ্বারোহীরা কাছে আসতেই টারজন চীৎকার করে উঠল, থাম, না হলে গুলি করব।

প্রথমে অশ্বারোহীরা একটু থেমে নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে টারজনদের ঘিরে ফেলল। তারপর গুলি করতে লাগল তাদের লক্ষ্য করে। টারজনরা পাথরের আড়াল থেকে গুলি চালাতে থাকায় তাদের গায়ে

একটা গুলিও লাগল না। কিন্তু টারজনদের গুলিতে ছয়জন মারা গেল। এমন সময় বু সাদার দিক থেকে একদল আরব অশ্বারোহী এসে আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকায় অবশিষ্ট চারজন অশ্বারোহী ভয়ে পালিয়ে গেল। আসলে কাদুর সাদেনই বু সাদা শহর থেকে তাদের দলের লোকদের নিয়ে আসে টারজনদের সাহায্যের জন্য।

টারজনদের গায়ে কোন আঘাত লাগেনি দেখে কাদুর খুশি হলো। তারা একসঙ্গে বু সাদার দিকে রওনা হলো। সেখানে দুদিন থাকার পর কাদুর তার মেয়েকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে একদিন যাত্রা করল। টারজনকে তাদের সঙ্গে যাবার জন্য অনেক করে অনুরোধ করল। কিন্তু টারজন বলল, তার কাজ আছে। কাদুরের মত আরবদেরও খুব ভাল লেগে গেল টারজনের।

কাদুরকে বিদায় দিয়ে টারজন সাহারায় হোটেল দু পেতিতে চলে এল সোজা। তার দলের লোকেরা তখন এই হোটেলেই ছিল। খাবার ঘরে ঢুকে টারজন দেখল জার্নয় একজন অপরিচিত আরবের সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা বলছে। টারজন দেখল আরবটা তার সাদা আলখাল্লার মধ্যে একটা ভাঙ্গা হাত ঝোলানো অবস্থায় লুকিয়ে রেখেছে। সেখানে না দাঁড়িয়ে থেকে হোটেলের অন্য দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল টারজন।

সেইদিনই দার্ণতের একখানা চিঠি পেল টারজন। চিঠিতে লেখা ছিল, প্রিয় জাঁ, তোমাকে আগের চিঠিখানি লেখার পর আমি একটি কাজে একবার লণ্ডনে গিয়েছিলাম। সেখানে তিনদিন ছিলাম। প্রথম দিনই হেনরিয়েটা স্ট্রীটে তোমার ফিলাণ্ডার নামে এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। তাঁর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে তাঁদের হোটেলে যাই। সেখানে গিয়ে আমি অধ্যাপক পোর্টার, জেন পোর্টার ও এসমারাল্ডাকে দেখতে পাই। পরে ক্লেটনও সেখানে এসে উপস্থিত হয়। ওদের বিয়ে হবেই এবং বিয়ের দিনটা যেকোন দিন ঘোষিত হবে।

আমি যখন ফিলাণ্ডারের সঙ্গে একা ছিলাম তখন ভদ্রলোক আমাকে কতকগুলো গোপন কথা বললেন। তিনি বললেন, মিস পোর্টার এর আগে তিনবার বিয়েটা স্থগিত রাখে। তাঁর মতে মিস পোর্টার আসলে ক্লেটনকে বিয়ে করতে মোটেই উৎসাহী নয়।

তাঁরা অবশ্য সকলেই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তবে আমি তোমার কথামত তোমার জন্মের ব্যাপারে কোন কথা বলিনি। শুধু বর্তমানে তুমি কোথায় আছ বা কি করছ সেই কথাই বলেছি। মিস পোর্টারকে অবশ্য তোমার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী দেখা গেল এবং তোমার সম্বন্ধে সে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করল। আমি তোমার জঙ্গলে ফিরে যাওয়ার বাসনার কথাও বললাম।

তোমার কথা আলোচিত হবার সময় দেখলাম ক্লেটন যেন ঘাবড়ে গেল। তবু তোমার প্রতি সে তার মমতার পরিচয় দেয় এবং তোমার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করে।

গত পরশু আমি প্যারিসে ফিরে এসেছি। গতকাল কাউন্ট ও কাউন্টপত্নীর সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁরা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। আমি সুযোগ পেলেই তোমাকে আবার চিঠি দিচ্ছি। ইতি তোমার বন্ধু — পল দার্ণৎ।

চিঠিটা শেষ করে টারজনের মনে এক সকরুণ আনন্দের অনুভূতি জাগল।

এরপর তিনটি সপ্তা ধরে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটল না। জার্নয় তাকে আগের থেকে বেশী করে এড়িয়ে চলত। সেই রহস্যময় অচেনা আরবটাকে দুদিন দেখতে পায়।

বু সাদার জঙ্গল এলাকায় শিকার করে বেড়াতে লাগল টারজন।

সেদিন জঙ্গলে একটা পাহাড়ের ধারে শিকার করতে গিয়ে অল্পের জন্য বেঁচে গেল টারজন। ঘোড়ায় চড়ে সে যখন একটা জায়গায় যাচ্ছিল তখন একটা গুলি হঠাৎ তার মাথার শিরস্ত্রানটাকে অল্প ছুঁয়ে চলে যায়।

সেই রাত্রিতে তার বন্ধু ক্যাপ্টেন জিরার্দ টারজনকে খাবার সময় বলল, বুঝেছি এখানে শিকার করে তোমার সুখ হচ্ছে না। আমি আর জার্নয় একশোজন সৈনিক নিয়ে দেলফা যাচ্ছি আগামীকাল। ওখানকার একটা জেলায় ব্যাপকভাবে শান্তিভঙ্গ হওয়ায় সরকার আমাদের সেখানে যাবার আদেশ দিয়েছে। তুমি সেখানে সিংহ শিকার করতে চাও ত যেতে পার আমাদের সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে সানন্দে রাজী হয়ে গেল টারজন। জার্নয় কাছেই ছিল। সে কিন্তু এতে মোটেই খুশি হতে পারল না।

পরদিন সকালে রওনা হবার সময় টারজন দেখল তাদের সেনাদলের সঙ্গে দুজন আরব ওদের সঙ্গ নিল। টারজনের এক প্রশ্নের উত্তরে জিরার্দ বলল, আমাদের সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই। ওরা এমনি সঙ্গে যাবে আমাদের।

টারজন আরবদের প্রকৃতি জানত। তারা বিদেশীদের মোটেই পছন্দ করে না। তারা কখনো বিনা কারণে ফরাসী সৈন্যদের সঙ্গে যাচ্ছে না। তার মনে সন্দেহ জাগায় সে তাদের উপর কড়া নজর রাখতে লাগল। আরবগুলো সেনাদলের শেষে অনেকটা

পিছনে পিছনে আসছিল। টারজনের মনে হলো ওরা ভাড়াটে হত্যাকারী। আলজিরিয়ার জঙ্গলে তাকে হত্যা করলে কারো মনে কোন সন্দেহ জাগবে না।

দেলফাতে শিবির স্থাপন করে দুদিন কাটানোর পর ঠিক হলো ওরা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে যাবে কারন সেখানে লুণ্ঠনকারীরা পাহাড়ের পাদদেশের অধিবাসী উপজাতিদেব ধনপ্রাণ হানি করছে। এই মর্মে খবর আসায় ক্যাপ্টেন জিরার্দ সেখানে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু যাবার সময় টারজন দেখল সেই দুজন আরব তাদের সঙ্গে যাচ্ছে না। অথচ আধঘণ্টা আগেও জার্নয় সেই সব আরবদের একজনের সঙ্গে কথা বলেছে।

সেখান থেকে আবার যাত্রা শুরু করে একটা শিবিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল। সেখানে ক্যাপ্টেন জিরার্দ তার সেনাদলকে দুদলে বিভক্ত করে দুদিকে যাবার আদেশ দিল। একটা দলের নেতৃত্ব করবে সে নিজে আর একটা দলের সঙ্গে থাকবে জার্নয়। টারজন কোন্ দলে যাবে তা জিজ্ঞাসা করলে জার্নয় বলল, মঁসিয়ে টারজন আমার সঙ্গে চলুন।

ওরা একটা উপত্যকায় এসে পড়ল। চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়। জার্নয় টারজনকে বলল, এবার আমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ব। আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই থাক।

টারজন বলল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। দরকার হলে লড়াই করব।

জার্নয় বলল, তুমি আমার অধীন। আমার আদেশ মেনে চলতে হবে তোমাকে।

এই বলে সে তার দলবল নিয়ে চলে গেল। টারজন একা সেখানে রয়ে গেল। তখন বিকেল হয়ে গেছে। টারজন একটা গাছের গুঁড়িতে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে নিজে দাঁড়িয়ে রইল। সে রাইফেলটা পরীক্ষা করে দেখল তাতে গুলি ভরা আছে। ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে গেলেও জার্নয় ফিরে এল না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল টারজন।

ভাবতে ভাবতে অল্প সময়ের মধ্যেই গাছে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল টারজন। কিন্তু হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল টারজনের। টারজন দেখল ঘোড়াটা দড়ির বাঁধন ছেঁড়ার জন্য ছটফট করছে এবং অদূরে একটা কালো সিংহ দাঁড়িয়ে রয়েছে। বহুদিন পর সামনাসামনি একটা সিংহ দেখে ভয়ের পরিবর্তে আনন্দের রোমাঞ্চ জাগল টারজনের মধ্যে। কিন্তু এখন কোন বর্শা বা বিষাক্ত তীর নেই তার হাতে। তাই রাইফেল নিয়ে তৈরী হলো সে।

একটা গুলি খেয়েই ভয়ঙ্করভাবে ঝাঁপ দিল সিংহটা। কিন্তু টারজনও এক আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সব বিপদকে কাটিয়ে পর পর তিন চারটে গুলি করল। অবশেষে সিংহটা মরে গেল। তখন মরা সিংহটার গায়ের উপর পা দিয়ে চাঁদের দিকে মুখ তুলে এমন জোরে বাঁদরগোরিলাদের মত গর্জন করে উঠল যে আধ মাইল দূরে একদল আরব তা শুনতে পেয়ে চমকে উঠল।

টারজন বুঝল জার্নয় আর আসবে না। এটা তার এক চক্রান্ত। তাই সে সেখান থেকে হাঁটতে লাগল। কারণ সিংহটা গুলি খেয়ে লাফ দেবার সময় ঘোড়াটা দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যায়।

সহসা একদল মানুষের চাপা পদশব্দ শুনে চমকে

উঠল টারজন। চাঁদের আলোয় সে দেখল সাদা আলখাল্লা পরা একদল আরব হাতে লম্বা লম্বা বন্দুক নিয়ে আসছে তার দিকে। টারজন ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল তারা কি চায়। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের একটা গুলি এসে তার কপালটা একটু ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল টারজন।

তখন তারা টারজনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে একটা ঘোড়ার উপর চাপিয়ে দিল। তারপর সেখান থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে সকলে যাত্রা শুরু করল। এইভাবে ছ' ঘণ্টা মরুভূমির উপর দিয়ে দ্রুতবেগে যাবার পর পরদিন দুপুরে ওরা একটা আরবদের বস্তীতে গিয়ে উঠল। বস্তীটা ছোট, মাত্র কুড়িটা তাঁবু আছে। একটা আরব সর্দারের বাড়িতে গিয়ে বন্দী টারজনকে নিয়ে উঠল ওরা।

এমন সময় একজন বুড়ো শেখ এসে সবাইকে বলল, কেউ বন্দীর গায়ে হাত দেবে না। আলি বেন আমেদ বলেছে, ও একজন বীর; একটা সিংহ

মেরে পাহাড়ের ধারে একা বসেছিল। বন্দী যেই হোক, একজন বীর পুরুষ এবং তাকে আমরা শ্রদ্ধা করব যতক্ষণ সে আমাদের এখানে থাকবে। ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরী একটা তাঁবুর মধ্যে বন্দী টারজনকে রেখে তাকে কিছু খাবার দেওয়া হলো। দরজার কাছে পাহারাদার বসিয়ে দেওয়া হলো। ওদের কথা শুনে টারজন বুঝল যেসব আরব ওকে ধরে এনেছে তারা তাকে একজন লোকের হাতে তুলে দেবে। সেই লোকটার দ্বারাই একাজে নিযুক্ত হয়েছে তারা।

গোধূলিবেলায় একদল আরব টারজনের তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে একজন টারজনের কাছে আসতেই টারজন তাকে চিনতে পারল। সে হচ্ছে নিকোলাস রোকোফ। রোকোফ বলল, কি মঁসিয়ে টারজন, ওঃ, আমাকে অভ্যর্থনা করো কুকুর কোথাকার!

এই বলে সে পর পর কয়েকটা লাথি মারল টারজনকে।

টারজন কোন কথা বলল না। তখন সেই বুড়ো শেখ সর্দার এগিয়ে এসে বলল, পরে যা করো করবে, আমার সামনে কোন বীর পুরুষকে মারতে বা অপমান করতে দেব না কাউকে। আমি তাহলে ওর বাঁধন খুলে দেব। তখন দেখব তুমি কেমন মার ওকে।

রোকোফ শেখকে চটাতে চাইল না। সে থেমে গেল। বলল, ঠিক আছে, পরে আমি ওকে খুন করব।

শেখ বলল, আমার বাড়ির সীমানার মধ্যে নয়। আগামীকাল সকালে তুমি একে নিয়ে মরুভূমিতে গিয়ে যা পার করবে। তবে যাই করো আমাদের গাঁয়ের সীমানা পার হবার আগে নয়।

রোকোফ তাতেই রাজী হয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

ক্রমে রাত বাড়তে লাগল। তাঁবুতে একা পড়ে রইল টারজন। হঠাৎ সিংহের ডাক শুনতে পেয়ে চমকে উঠল সে। বস্তীটার বাইরে কিছু দূরে একটা সিংহ গর্জন করছিল। ক্রমে সেই সিংহটা তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। টারজন ভাবতে লাগল সে ত আর মাত্র কয়েক ঘন্টা বাঁচবে। তাতে যদি সিংহের হাতে প্রাণ যায় ত যাবে।

তাঁবুর ভিতরটা ভীষণ অন্ধকার। সে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। সহসা টারজন বুঝতে পারল তাঁবুটা সরিয়ে এক পাশ থেকে কে ঢুকছে। ওর মনে হলো রাতের অন্ধকারে নির্জনে তাকে হত্যা করতে আসছে রোকোফ। কিন্তু এক নারীকণ্ঠ তার নাম ধরে ডাকতেই টারজন বলল, হ্যাঁ আমি। কিন্তু তুমি কে?

নারীকণ্ঠ উত্তর করল, আমি সিদি এইসার আউলেদ নাইল।

সঙ্গে সঙ্গে টারজন দেখল আউলেদ তার ছুরি দিয়ে তার বাঁধনগুলো কেটে দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেল টারজন।

টারজন বলল, তুমি কেন এখানে এলে? কি করে জানলে আমি এখানে বন্দী হয়ে পড়ে আছি?

আউলেদ বলল, আমি কাদুর বেন সাদেনের মেয়ে। আমাকে যে একদিন উদ্ধার করেছে তার জন্য আমার জীবনকে বিপন্ন করব সে আর বেশী কথা কি?

টারজন বলল, কিন্তু কেমন করে তুমি জানলে যে আমি বন্দী হয়েছি?

আচমেত তয়েব নামে আমার এক জ্ঞাতি ভাই তার কোন বন্ধুর সঙ্গে এখানে দেখা করতে এসেছিল। তোমাকে এখানে যারা ধরে এনেছিল তাদেরই একজন তার বন্ধু। সে গিয়ে আমাদের বলে একজন ফরাসীকে অন্য একজন ফরাসীর হাতে তুলে দেবার জন্য তারা বন্দী করে আনে। তার বিবরণ থেকে আমি বুঝতে পারি তুমিই সেই ফরাসী। তখন আমার বাবা বাড়িতে ছিল না। আমি দুটো ঘোড়া নিয়ে চলে আসি এখানে। কাল সকালে আমরা আমাদের বাড়ি গিয়ে পৌঁছব। তখন আমার বাবা এসে যাবে। তখন দেখব ওরা কেমন করে কাদুরের বন্ধুকে ছিনিয়ে আনে তার কাছ থেকে।

এক জায়গায় এসে আউলেদ সভয়ে বলল, আমি ত ঠিক এইখানে ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে রেখে যাই। কিন্তু এখানে নেই ত।

টারজন বলল, সিংহ দেখে ঘোড়া দুটো বোধহয় ছুটে পালিয়ে গিয়েছে।

অগত্যা আবার হাঁটতে লাগল ওরা। এখানকার পথঘাট আউলেদের সব চেনা।

সহসা একসময় একটা কালো সিংহ ওদের পথরোধ করে সামনে এসে দাঁড়াল। তার হলুদ চোখ দুটো জ্বলছিল। আউলেদ হতাশ হয়ে বলল, সব শেষ।

টারজন আউলেদের কাছ থেকে ছুরিটা নিয়ে তাকে বলল, তুমি চলে যাও। আমি দেখছি।

আউলেদ চলে গেল না। শুধু একটু সরে দাঁড়াল। সিংহটা এবার টারজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। সিংহের সঙ্গে কিভাবে লড়াই করতে হয় টারজন তা জানত। সে সিংহটার পিছন দিক দিয়ে এক আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার পিঠের উপর উঠে পড়ে তার কেশরগুলো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। তারপর তার হাতের ছুরিটা বারবার সিংহটার গলায় ও পাঁজরে আমূল বসিয়ে দিতে লাগল। অবশেষে সিংহটা নিষ্প্রাণ হয়ে মাটিতে

লুটিয়ে পড়লে তার মৃতদেহের উপর পা তুলে দিয়ে চাঁদের দিকে মুখ তুলে বাঁদর-গোরিলাদের ভঙ্গিতে এক বিকট গর্জন করে উঠল।

আউলেদ ভয় পেয়ে গেল। তার মনে হলো টারজন যেন পাগল হয়ে গেছে। আউলেদ বলল, কি ধরনের মানুষ তুমি। তুমি যেভাবে সিংহটাকে মারলে তা ভাবাই যায় না। এমন কথা কখনো শুনিনি আমি। কিন্তু ওভাবে চীৎকার করলে কেন তুমি?

টারজন বলল, যখন আমি কাউকে হত্যা করি তখন আমি যেন মানুষ থাকি না, আমি যেন পশু হয়ে যাই।

আবার তারা যাত্রা শুরু করল। পাহাড়ী পথ পার হয়ে মরুপথে গিয়ে পড়ল। কিছুদূর যাবার পর ওরা একটা ছোট্ট নদীর ধারে এসে দেখল ঘোড়া দুটো চরছে। সেই ঘোড়া দুটোতে দুজন চেপে ওরা যখন কাদুর বেন সাদেনের বাড়িতে পৌঁছল তখন বেলা ন'টা বাজে। কাদুর তখন বাড়ি ফিরে তার মেয়েকে দেখতে না পেয়ে পঞ্চাশজন সশস্ত্র লোক নিয়ে মেয়ের খোঁজে বার হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এমন সময় মেয়েকে দেখতে পেয়ে তার মুখ থেকে সব কথা শুনে টারজনের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল কাদুরের। টারজন শুধু একটা ছুরি দিয়ে একটা সিংহকে বধ করেছে একথা শুনে আরবরা সবাই টারজনকে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে দেখতে লাগল।

এক সপ্তাহ কাদুরের বাড়িতে অতিথি হিসাবে রইল টারজন। তারপর সে বিদায় নেবার সময়

কাহুর পঞ্চাশজন সশস্ত্র আরবকে সঙ্গে নিয়ে টারজনের সঙ্গে বু সাদা পর্যন্ত গেল। টারজন এখন ওখানে গিয়ে তার দলের সঙ্গে মিলিত হবে।

পরদিন সকালে টারজন একটা ঘোড়ায় চেপে বুইরা ও আলজিয়ার্সের পথে রওনা হলো। জার্নয় যে হোটেলে ছিল, তার সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখল হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জার্নয়। টারজন হাত তুলে নমস্কার করতে জার্নয়ও যন্ত্রচালিতের মত প্রতিনমস্কার জানাল। তার মুখে স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন ফুটে ছিল।

সিদি এইসাতে টারজন পৌঁছতেই এক ফরাসী অফিসারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল টারজনের। অফিসার তাকে জিজ্ঞাসা করল, আজ সকালেই বু সাদা ত্যাগ করেছ ? জার্নয়কে দেখেছিলে ?

টারজন বলল, হ্যাঁ, কি ব্যাপার ?

জার্নয় আজ সকাল আটটায় সময় গুলি করে আত্মহত্যা করেছে।

দুদিন পর সেখান থেকে আলজিয়ার্স শহরে গিয়ে পৌঁছল টারজন। এখান থেকে সে সরকারের নির্দেশে একটা জাহাজে করে কেপ টাউন শহরে যাবে। যাবার আগে সে কর্তব্যভার গ্রহণ করার পর থেকে যা যা ঘটেছে তার একটা পূর্ণ বিবরণ লিখল।

টারজন জাহাজে ওঠার সময় দেখল দুজন সৌখীন পোশাকপরা লোক তাকে লক্ষ্য করছে বিশেষভাবে। দুজনেরই মুখ দাড়ি কামানো। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এক ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিল টারজন। জাহাজে যাত্রাকালে তার নাম হবে কডওয়েল, লণ্ডন।

সেদিন রাত্রিতে জাহাজে এক তরুণীর সঙ্গে আলাপ হলো। তরুণীটির সঙ্গে তার মা ছিল। তরুণীর নাম হেজেল ষ্ট্রং। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল টারজনের এই হেজেল ষ্ট্রংকে উদ্দেশ্য করেই জেন পোর্টার একখানি চিঠি লিখেছিল তার কেবিনে থাকাকালে। হেজেল জেনের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু।

কয়েক মাস আগে টারজন যখন উইসকনসিন স্টেশানে জেনদের কাছ থেকে বিদায় নেয় তার কিছু পরে টারজনের কাছে পাঠানো দার্ণতের টেলিগ্রামটা পায় ক্লেটন। টেলিগ্রামটায় লেখা ছিল, 'তোমার আঙ্গুলের ছাপ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে তুমিই লর্ড গ্রেস্টোক।'

এই কথাগুলি পড়েই মুহূর্তে টারজনের জন্মরহস্যটা উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে ক্লেটনের কাছে। বুঝতে পারল সে নিঃস্ব। তার কিছু নেই। যে বিরাট ভূসম্পত্তি ও লর্ড উপাধি সে ভোগ করছে আসলে তা সব টারজনের।

জেনরা ক্লেটনকে ডাকতেই প্ল্যাটফরমে গাড়ি এসে গেল। ক্লেটন ওদের জিজ্ঞাসা করল, টারজন কোথায় ?

জেন বলল, ও তার গাড়িতে করে চলে গেছে। ও এখান থেকে নিউ ইয়র্ক যাবে।

ক্লেটন তখন টেলিগ্রামটার কথা কাউকে বলল না।

বাল্টিমোরে পৌঁছে ক্লেটন তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলতে চাইল। বলল, আমি লণ্ডনে ফিরে যাব। বিয়ের পর তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।

জেন বলল, এত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়। এখনো একমাস দেরী হবে।

বাবার সঙ্গে লণ্ডনে আসার পরেও জেনের মতের পরিবর্তন হলো না। বিয়েটা সে কিছুতেই সেরে ফেলতে চাইল না। এমন সময় টেনিংটন নামে এক

ভদ্রলোক অধ্যাপক পোর্টারের কাছে জলজাহাজে আফ্রিকা ভ্রমণের এক প্রস্তাব আনতেই রাজী হয়ে গেল জেন। জেন তখন একটা অজুহাত পেয়ে গেল। ক্লেটনকে বলল, আমাদের ফিরতে অন্তত একবছর লাগবে। তার আগে বিয়েটা সম্ভব নয়। টেনিংটনের জাহাজটা প্রথমে ভূমধ্য সাগর হয়ে লোহিত সাগরে যাবে। সেখান থেকে ভারত মহাসাগর। আফ্রিকার পূর্ব উপকূল বরাবর যাবার পথে বড় বড় বন্দরগুলোতে থামবে।

একদিন জিব্রাল্টার প্রণালী থেকে দুটো জাহাজ ছাড়ল। দুটোর গতিপথ একই দিকে। অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজটাতে বসে জেন তখন আফ্রিকার জঙ্গল আর জঙ্গলের সেই মানুষটার কথা ভাবছিল।

এদিকে বড় জাহাজটা যখন জেনদের ছোট জাহাজটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন তার ডেকে কডওয়েল নামধারী টারজন স্ট্রং-এর সঙ্গে কথা বলছিল।

কথা প্রসঙ্গে একসময় টারজন বলল, আমি আমেরিকা সত্যিই ভালবাসি। এই আমেরিকাতে আমার পরিচিত এমন দুজন আছেন যাঁদের কথা আমি কখনো ভুলব না। তাঁরা হলেন জেন পোর্টার আর অধ্যাপক পোর্টার।

হেজেল আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনি জেন পোর্টারকে চেনেন? সে ত আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে আমরা মানুষ হয়েছি বোনের মত। কিন্তু এখন আমি তাকে হারাতে বসেছি।

টারজন বলল, তার মানে ওঁর কি বিয়ে হয়ে গেছে?

হেজেল বলল, সবচেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন ও যাকে ভালবাসে তাকে ও বিয়ে করছে না। ও শুধু কর্তব্যের খাতিরে বিয়ে করছে অন্য একজনকে। আমি তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি এটা খুব খারাপ। য়ার জন্য আমি তার বিয়েতে যাবও না।

টারজন বলল, আমি তার জন্য দুঃখিত।

হেজেল বলল, আমি দুঃখিত সেই মানুষটির জন্য যাকে ও ভালবাসে এবং যে ওকে ভালবাসে। আমি তাকে জীবনে কখনো দেখিনি, কিন্তু জেনের কাছে শুনেছি সে এক অদ্ভুত মানুষ। আফ্রিকার জঙ্গলে তার জন্ম হয় এবং ভয়ঙ্কর বাঁদর-গোরিলাদের দ্বারা লালিত পালিত হয়। সে ওদের সকলকে কয়েকবার মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে এবং আরো কত উপকার করে। সে জেনের প্রেমে পড়ে যায় এবং জেনও যে তাকে ভালবাসে একথা সে ক্লেটনকে বিয়ে করার কথা দেওয়ার আগে পর্যন্ত জানতে পারেনি

হেজেলের মুখ থেকে জেনের কথা শুনতে ভাল লাগছিল টারজনের। কিন্তু যখন সে কথার মধ্যে তার নাম এসে পড়ল তখন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল টারজন। তাই প্রসঙ্গটা পাল্টে দেবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

একদিন টারজন দেখল মঁসিয়ে থুরান নামে জাহাজের এক যাত্রীর সঙ্গে কথা বলছে হেজেল। হেজেল তার সঙ্গে থুরানের পরিচয় করিয়ে দিল। থুরানকে দেখে টারজনের মনে হলো সে যেন কোথায় তাকে দেখেছে এর আগে। অথচ ঠিক মনে করতে পারছে না। থুরান বসবার চেয়ারটাকে সরাতে গেলে টারজন লক্ষ্য করল তার বাঁ হাতটা ভাঙ্গা; আর রোকোফই দাড়ি কামিয়ে থুরানের নাম ধরে বেড়াচ্ছে।

কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে রোকোফ সেখান থেকে চলে যেতে রোকোফের কাঁধে একটা হাত রেখে টারজন বলল, এখানে কি খেলা খেলছ রোকোফ?

রোকোফ বলল, আমি তোমার কথামতই ত ফ্রান্স ত্যাগ করেছি।

টারজন বলল, তা ত দেখছি। কিন্তু ছদ্মবেশ ধারণ করে এ জাহাজে নিশ্চয় বিনা মতলবে আসনি।

রোকোফ বলল, ছদ্মনাম তুমিও ত ধারণ করেছ। সুতরাং আমারও এতে অধিকার আছে।

এরপর ক'দিন রোকোফকে আর দেখতে পেল না টারজন। কিন্তু টারজন তাকে দেখতে না পেলেও চুপ করে বসে ছিল না রোকোফ। সে পলভিচের সঙ্গে সব সময় টারজনের উপর চরম প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবছিল।

সেদিন রাত্রিতে ডেকের উপর কোন লোক ছিল না। টারজন একা রেলিং ধরে আনমনে দাঁড়িয়েছিল। ডেকের উপরটা অন্ধকার দেখাচ্ছিল। টারজন আনমনে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকায় সে বুঝতে পারেনি দুজন লোক পা টিপে টিপে চুপিসারে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

রোকোফ আর পলভিচ দুজনে অতর্কিতে টারজনের দুটো পা পিছন থেকে ধরে টারজন কিছু বুঝতে পারার আগেই তাকে জলে ফেলে দিল।

জাহাজের যাত্রীরা কেউ জানতে পারল না ব্যাপারটা। একমাত্র হেজেল স্ট্রং তার কেবিন থেকে জলের উপর একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ শুনতে পেল। মনে হলো কে যেন জলে ঝাঁপ দিল। কিন্তু ব্যাপারটাকে তেমন কোন গুরুত্ব দিল না সে।

প্রতিদিন হেজেলের সঙ্গে প্রাতরাশ খেত টারজন। কিন্তু এই ঘটনার পরদিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে এল না টারজন।

এবার জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ব্যাপারটা জানাল হেজেল। ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে কডওয়েল নামধারী একজনকে খোঁজ করার হুকুম দিল। কিন্তু কোথাও কডওয়েলকে পাওয়া গেল না। হেজেল শুধু বলল, গতরাতে সে জলে ঝাঁপ দেওয়ার মত একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল। এর বেশী কিছু জানে না।

দু'দিন দুশ্চিন্তায় কেবিন থেকে বার হলো না হেজেল। তার চোখে মুখে গভীর উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। চোখের কোণে কোণে কালি পড়েছিল। একদিন সে ডেকের উপর বার হতেই মঁসিয়ে থুরান নামধারী রোকোফ এসে তাকে বলল, আমিও ব্যাপারটা মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছি না মিস স্ট্রং।

হেজেল ক্রমে জানতে পারল টেনিংটনের জাহাজে করে জেনরা আফ্রিকা ভ্রমণে বার হয়েছে। একসপ্তা কেপটাউনে থাকার পর জাহাজটা আবার রওনা হয়ে পশ্চিম উপকূল হয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাবে।

তখন দুই বান্ধবীতে ক'দিন ধরে খুব আনন্দে কাটাল।

অবশেষে ঠিক হলো হেজেলরাও একই জাহাজে জেনদের সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবে। ক্লেটন হেজেলদের তাদের বাড়িতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল।

কেপ টাউন ছাড়ার দুদিন পর জাহাজে একদিন হেজেলের কেবিনে জেন বসে কথা বলছিল হেজেলের

সঙ্গে। হঠাৎ একটা ছবি জেনকে দেখাতে গিয়ে হেজেল বলল, ইনি হচ্ছেন জন কডওয়েল। ইনি বলেছিলেন ইনি তোমাকে চেনেন। জাহাজে আসার পথে আলাপ হয়। ভদ্রলোক একদিন সমুদ্রের জলে পড়ে মারা যান।

ছবিটা দেখেই টারজনকে চিনতে পারল জেন। কাতরভাবে বলতে লাগল, মারা গেছে ওকথা বলো না হেজেল। বল, তুমি ঠাট্টা করছ আমার সঙ্গে।

এই কথা বলে মূর্ছিত হয়ে মেঝের উপর পড়ে গেল জেন। হেজেলের চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনের জ্ঞান ফিরে এলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তার মুখপানে তাকিয়ে রইল হেজেল। ব্যাপারটার কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মত বলল, তুমি জন কডওয়েলকে এমন অন্তরঙ্গভাবে ভালবাসতে তা আমি জানতাম না জেন।

জেন বলল, ও জন কডওয়েল নয় হেজেল। ও ছবি হচ্ছে টারজনের। ও ছবি আমার মনের মধ্যে গাঁথা রয়ে গেছে।

হেজেল বলল, উনি বলতেন, আফ্রিকায় ওঁর জন্ম, ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করেন।

জেন বলল, হ্যাঁ, তাই।

হেজেল বলল, তাহলে উনি জন কডওয়েল ছদ্মনাম নিয়ে জাহাজে ভ্রমণ করছিলেন। প্যারিসে কেনা ওঁর মালপত্রে জে. সি. টি. এই তিনটি অক্ষর লেখা ছিল। টি-টা টারজনের আদি অক্ষর।

চারদিন তার কেবিনে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রইল জেন। সে ঘর থেকে একবারও বার হত না। একমাত্র হেজেল আর এসমারাল্ডা ছাড়া তার ঘরে ঢুকতে পেত না কেউ।

জেনের অসুখের পর একটার পর একটা করে বিপর্যয় দেখা দিতে লাগল জাহাজে। প্রথমে জাহাজের এঞ্জিন খারাপ হয়ে গেল। এঞ্জিনের মেরামত চলাকালে দু'দিন জাহাজটা আপনা থেকে ভেসে বেড়াতে

লাগল মাঝ সমুদ্রে। আর একদিন দুজন নাবিক ঝগড়া ও মারামারি করতে লাগল। একজন অন্যজনকে ছুরি মারল। একজন আহত হলো আর একজনকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো। কোন এক রাত্রিতে একটা নাবিক সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে গেল। অনেক খুঁজেও তার মৃতদেহ পাওয়া গেল না।

তখন নাবিকরা বলাবলি করতে লাগল, জাহাজ ছাড়ার সময় ওরা কুলক্ষণ দেখতে পায়। কপালে আরো কষ্ট আছে ওদের।

সত্যিই সে কষ্টের জন্য বেশীদিন অপেক্ষা করতে হলো না ওদের। একদিন বেলা একটার সময় জাহাজের গায়ে একটা ফাটল দেখা দিল। জাহাজটা হঠাৎ কাৎ হয়ে গেল অনেকখানি। এমন সময় একজন নাবিক তলা থেকে ছুটে এসে খবর দিল, জাহাজে জল ঢুকছে, আর কুড়ি মিনিটের বেশী ভেসে থাকতে পারবে না জাহাজটা।

জাহাজের মালিক টেনিংটন ও সব যাত্রীরা তখন ডেকের উপর জড়ো হয়েছে। টেনিংটন সবাইকে সাহস দিয়ে বলল, ভয়ের কিছু নেই। মহিলারা জিনিসপত্র নিয়ে সব তৈরী হয়ে নিন। যে চারখানা নৌকো আছে তা প্রস্তুত করো।

চারখানা নৌকো যাত্রী বোঝাই হয়ে সমুদ্রে নেমে পড়ল। ওদের চোখের সামনে জাহাজটা ধীরে ধীরে ডুবে গেল।

নৌকোর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল জেন। পরদিন সকাল হবার অনেক পরে কড়া রোদ উঠতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল নৌকোর উপর রয়েছে সে, ক্লেটন, মঁসিয়ে থুরান আর তিনজন নৌকোর মাঝি। অন্য নৌকোগুলোর কোন চিহ্ন দেখতে পেল না কোথাও। চারিদিকে ধূ ধূ করছে শুধু আটলান্টিক মহাসাগরের অনন্ত জলরাশি।

সে রাতে জাহাজ থেকে জলে পড়ার পর টারজনের হুঁস হলো। বুঝল কত সহজে রোকোফের হাতে বোকা বনে গেছে সে। হাত দিয়ে জল কেটে সাঁতার কেটে যেতে লাগল সে। দেখল জাহাজের আলোটা ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল। একবারও সাহায্যের জন্য চীৎকার করল না। জীবনে কখনো সে সাহায্য চায়নি কারো কাছে।

সকালের আলো দিগন্তে ফুটে উঠতেই টারজন দেখল দূরে একটা ভাঙ্গা জাহাজের একরাশ কাঠ ভেসে যাচ্ছে। টারজন কোনরকমে তার উপর উঠে বসল যাতে সাঁতার না কেটেই বিনা আয়েসে বেশ কিছুক্ষণ যাওয়া যায়। সেই ভাঙ্গা কাঠগুলোর উপর চেপেই অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল টারজন।

ঘুম ভাঙ্গতেই দুটো জিনিস চোখে পড়ল তার। সে দেখল যে স্তূপাকৃত কাঠগুলো ভেসে চলেছিল পাশে তার মাঝখানে একটা লাইফবোট আছে। আর দূর দিগন্তে বনচাপে ঘেরা একটা উপকূল দেখা যাচ্ছে। তার খুব পিপাসা পেয়েছিল। সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশ দিয়ে লাইফবোটটাতে চেপে বসল। সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলে সে কিছুটা শীতল হলো। পিপাসাটা কিছু নিবারিত হলো।

নৌকোটা পরীক্ষা করে দেখল সেটা ঠিকই আছে। সেটাতে চেপে কূলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। বিকালবেলায় সে কূলের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল। কূলের গাছপালাগুলো তার অনেক দিনের চেনা মনে হলো। অনেকদিন পরে তার প্রিয় কেবিনটাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল টারজন।

সেখান থেকে অন্য এক জনবসতির সন্ধানে এগিয়ে চলল টারজন। পথে বাঁদর-গোরিলাদের মত পড়ে থাকা পচা কাঠের গায়ে গজিয়ে ওঠা কিছু ব্যাঙের ছাতা তুলে খেল সে। সে রাতটা গাছের উপর ঘুমিয়ে কাটাল টারজন। পরদিন দেখল বনটা পাতলা হয়ে অদূরে কয়েকটা পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে। পাহাড়ের মাঝখানে উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। সেখানে কত হরিণ আর জেব্রা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সহসা দূরাগত মানুষের গন্ধ পেল সে বাতাসে। টারজন একটা গাছের উপর ওৎ পেতে বসে রইল। দেখল একজন নিগ্রো যোদ্ধা বর্শা ও তীরধনুক হাতে সেইদিকেই আসছে। তার গলায় ফাঁস লাগাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল টারজন। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো, তাকে হত্যা না করেও তার অস্ত্রগুলো সে পেতে পারে।

এমন সময় একটা সিংহ সেই কৃষ্ণকায় লোকটাকে আক্রমন করতে উদ্যত হলো। কিন্তু সিংহটা লোকটাকে লক্ষ্য করে পা তুলে ঝাঁপ দিতেই তার গলাটায় টারজনের ফেলে দেওয়া ফাঁসটা আটকে

গেল। টারজন দড়ি ধরে সিংহটাকে তুলতে গিয়ে তার ভার সামলাতে না পেরে হঠাৎ পড়ে গেল গাছ থেকে। সিংহটা এবার এক নতুন শত্রু পেয়ে টারজনের উপর ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু নিগ্রোটা তখন তার হাতের বর্শাটা সজোরে ছুঁড়ে দিল সিংহটাকে লক্ষ্য করে। বর্শাটা সিংহের বাঁ দিকের ঘাড়টাকে বিদ্ধ করল। সময় পেয়ে টারজন তার হাতের দড়িটা গাছের গুঁড়িতে শক্ত করে বেঁধে নিল। নিগ্রোটা এবার এক বিষাক্ত তীর মারল সিংহটার পাঁজরে। টারজন তার হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে সিংহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বারবার সেটা বসিয়ে দিতে লাগল তার গায়ে। পরে সিংহটা মরে গেলে দুজনে দুজনের মুখপানে তাকাল। দুজনেই দুজনকে তাদের উদ্ধারকর্তা হিসাবে মেনে নিল। দুজনেই দুজনকে ধন্যবাদ দিল আপন আপন ভাষায়।

সিংহের সঙ্গে ওরা যখন লড়াই করছিল তখন সিংহের গর্জন শুনে গ্রামবাসীরা সেদিকে ছুটে আসতে থাকে। সিংহটা মরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ভিড় করে দাড়াল টারজন আর সেই শিকারীটার চারদিকে। তারা প্রথমে টারজনকে সেখানে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। কিন্তু নিগ্রোটা তার গ্রামবাসীদের সব কথা বুঝিয়ে বলার পর তারা মেয়ে পুরুষ সবাই মিলে টারজনকে প্রচুর খাতির করতে লাগল। তারা তাকে গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে অনেক উপহার দিল। টারজন অস্ত্র চাইলে তারা বর্শা তীর প্রভৃতি অনেক অস্ত্র দিল। সেই নিগ্রো শিকারীটি তার ছুরিটা টারজনকে উপহারস্বরূপ দিয়ে দিল।

সে রাতে টারজনের সম্মানে এক নাচগানের উৎসব করল গ্রামবাসীরা। নাচের সময় টারজন দেখল তারা নরখাদক নিগ্রো নয়। রাত্রিতে টারজনকে তাদের গাঁয়ের ভিতরে একটা বড় কুঁড়েতে থাকতে বলল। কিন্তু টারজন জঙ্গলে গিয়ে একটা গাছের উপর ঘুমিয়ে রাত কাটাল। পরদিন সকালে আবার সেই গাঁয়ে ফিরে এল টারজন। তখন গাঁয়ের লোকেরা

তাকে দেখে আনন্দে চীৎকার করতে লাগল। গাঁয়ের শিকারীদের সঙ্গে জঙ্গলে শিকার করতে গেল টারজন। শিকারে তার পারদর্শিতা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল গাঁয়ের শিকারীরা। তার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল।

টারজন তাদের কাছে সেই গাঁয়েই রয়ে গেল। ক্রমে সে তাদের ভাষায় কথা বলতে শিখল। গাঁয়ের সর্দার বাস্মুলি টারজনকে বন্ধুভাবে তাদের জাতির পূর্ব ইতিহাস সব শোনাল। বাস্মুলি বলল, বহু বছর আগে তারা উত্তরাঞ্চলে বাস করত। তারা তখন সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল। তারা ছিল এক শক্তিশালী উপজাতি। কিন্তু ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা বন্দুক নিয়ে ক্রমাগত আক্রমণ ও পীড়ন চালিয়ে তাদের শক্তি ও গৌরবের অনেকখানি নষ্ট করে দেয়।

টারজন বাস্মুলিকে বলল, আক্রমণকারীরা এখানে আসেনি কখনো ?

বাস্মুলি বলল, বছরখানেক আগে একবার একদল আরব এখানে আসে। কিন্তু আমরা লড়াই করে তাদের তাড়িয়ে দিই।

কথা বলার সময় টারজন লক্ষ্য করল বাস্মুলির বাঁ হাতে একটা সোনার তাগা রয়েছে। টারজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, এই হলুদ ধাতু কোথায় পাও তোমরা ?

আগে সোনা বা কোন মূল্যবান ধাতু সম্বন্ধে কোন আগ্রহ বা কৌতূহল ছিল না টারজনের। সভ্য জগতে যাওয়ার পর সে বুঝেছে এই সোনার কত দাম, কত শক্তি।

বাসুলি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এখান থেকে একপক্ষকালের পথ একটা জায়গায়।

টারজন বলল, সেখানে কখনো গেছ তুমি ?

বাসুলি বলল, আমি যাইনি। আমার যখন যুবক বয়স ছিল তখন আমাদের জাতির একদল লোক এখানে বসতি স্থাপন করার পর জনপদের সন্ধানে এক জায়গায় গিয়ে হাজির হয়। সেখানকার অধিবাসীরা এই হলুদ ধাতুর গয়না পরত। সে গাঁয়ের লোকগুলো তোমাদের মত শ্বেতকায় বা আমাদের মত কৃষ্ণকায় নয়। তারা অদ্ভুত রকমের। বাঁদর-গোরিলাদের মত বড় বড় লোম আছে তাদের গায়ে।

টারজন বলল, তোমাদের মধ্যে যারা তখন সেখানে গিয়েছিল তাদের কেউ আছে এখন ?

বাসুলি বলল, আমাদের বৃদ্ধ সর্দার ওয়াজিরি তখন বয়সে যুবক ছিল। সে তখন চৌআম্বির সঙ্গে গিয়েছিল সেখানে।

এবার ওয়াজিরিকে সেই গাঁয়ের কথা জিজ্ঞাসা করল টারজন।

ওয়াজিরি বলল সে অনেক দূরের পথ। তাছাড়া আমি এখন বৃদ্ধ। তবে যদি একান্তই যেতে চাও তোমাকে এই বর্ষাকালটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

পরের দিন একদল শিকারী এসে খবর দিল এক জায়গায় অনেকগুলো দাঁতওয়ালা হাতি চড়ে বেড়াচ্ছে বনের ভিতরে। এই সব হাতি শিকার করতে পারলে দাঁতগুলো পাওয়া যাবে।

পরদিন সকাল হতেই ওয়াজিরি ও বাসুলিসহ পঞ্চাশজন যোদ্ধা শিকারে বার হলো। তাদের মধ্যে টারজনও ছিল।

দু' ঘণ্টা হাঁটার পর ওরা বনের সেই জায়গাটাতে পৌঁছল গতকাল যেখানে হাতির পাল দেখা গিয়েছিল। ওরা এখানে সেখানে খোঁজ করে হাতির পাল দেখতে না পেলেও টারজন বাতাসে গন্ধ শুঁকে বলল, আর বেশী দূরে যেতে হবে না। কাছাকাছিই আছে হাতির পালটা।

ওরা তখন এগিয়ে গিয়ে দেখল দল থেকে আলাদা হয়ে দুটো দাঁতওয়ালা পুরুষ হাতি গাছের পাতা খাচ্ছে। তখন তীর ধনুক আর বর্শা নিয়ে ওরা হাতি দুটোকে আক্রমণ করল। টারজন গাছের উপর থেকে সব দেখতে লাগল। দরকার হলে ও নেমে সাহায্য করবে ওদের।

একটা হাতির গায়ে ও বুকে অস্ত্রগুলো লাগায় সে পড়ে মারা গেল। কিন্তু অন্য হাতিটার গায়ে তেমন অস্ত্র না লাগায় সে ক্ষেপে গিয়ে শুঁড় উঁচিয়ে তেড়ে গেল ওদের দিকে। হাতিরা পাগলা হয়ে গেলে বড় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তাই তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারল না ওরা। টারজন উপর থেকে দেখল আর একটু হলেই বাসুলিকে ধরে ফেলবে হাতিটা। তাই আর দেরী না করে বাসুলি আর হাতিটার মাঝখানে হঠাৎ গাছ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল টারজন।

হাতিটা এবার তার শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবার ফলে একবার থমকে দাঁড়িয়ে টারজনকেই আক্রমণ করল। কিন্তু তার আগেই টারজন একটু ঘুরে গিয়ে তার হাতের বর্শাটা হাতিটার বুকে বিঁধিয়ে দিল। বর্শার ফলকটা তার বুকে আমূল বসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল হাতিটা। তখন সব নিগ্রো শিকারীরা টারজনের চারদিকে ভিড় করে দাঁড়াল। টারজন হাতির মৃতদেহটার উপর দাঁড়িয়ে মুখ তুলে ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জন করে উঠল।

এরপর আবার ওরা হাতি শিকার শুরু করতেই টারজন ওদের পিছনে দূরে বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেয়ে ওদের বলল, বন্দুকের আওয়াজ। নিশ্চয় তোমাদের গাঁ কেউ আক্রমণ করেছে।

ওয়াজিরিরা তখন দলবল নিয়ে গাঁয়ের দিকে ছুটতে লাগল।

পরদিন সকালে টারজন তার দলের যোদ্ধাদের নিয়ে তাদের গাঁয়ের চারদিকে একটু দূরে দূরে থেকে গাছের আড়ালে লুকিয়ে আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগল।

টারজনের নির্দেশমত তার দলের যোদ্ধারা গাছের আড়াল থেকে তীর ছুঁড়তে থাকায় আরবরা ও তাদের নিগ্রো যোদ্ধাদের অনেকেই সেই তীরের আঘাতে ঘায়েল হতে লাগল। অথচ তারা তাদের শত্রুদের কাউকে দেখতে পেল না বা গুলি করতে পারল না।

আরবরা তখন গাঁ ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবছিল। তারা গাঁয়ের মধ্যে একটা কুঁড়ে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিল। এমন সময় টারজন একটা গাছ থেকে এমন জোরে ঘরটাকে লক্ষ্য করে একটা বর্শা ছুঁড়ল যে বর্শাটা খড়ের চাল ভেদ করে আরবদের একজনের মাথায় গিয়ে পড়ল। যন্ত্রণার একটা আর্তনাদ নিজের কানে শুনল টারজন।

এদিকে টারজনের দলের লোকেরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। তাদের যখন একজনও আহত হলো না তখন শত্রুদের অনেকেই তাদের তীরের ঘায়ে ঘায়েল হলো।

টারজন তাদের বলল, এবার তোমরা সেই শিবিরে চলে যাও। আজ আর কিছু করতে হবে না। ওরা কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে আর ভয়ে ভয়ে থাকুক। টারজনও ওদের সঙ্গে শিবিরে গেল। মরা হাতিটার মাংস খেয়ে দুপুর রাত পর্যন্ত ঘুমিয়ে একাই একসময় বেরিয়ে পড়ল সে।

আরবরা যে ঘরে শুয়েছিল সেই ঘরটা লক্ষ্য করে

টারজন আবার একটা গুলি ছুঁড়ল।

গুলির শব্দে আর চীৎকারে আরবরা ও তাদের ক্রীতদাসরা সব কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ছোটাছুটি করতে লাগল। কিন্তু কোথাও কোন শত্রু দেখতে পেল না। টারজন যখন দেখল তার গাছের তলায় রাস্তায় অনেক নিগ্রো ক্রীতদাস ভিড় করে গেটের দিকে একমনে তাকিয়ে আছে তখন সে গাছ থেকে একটা গুলি করল এবং তাতে একটা ক্রীতদাস মারা গেল।

বাকি ক্রীতদাসরা তাদের মালিকদের বলল, তারা আর এখানে থাকবে না। আরবরা তখন তাদের বুঝিয়ে বলল, তোমরা কোনরকমে আজকের রাতটা কাটিয়ে দাও। কাল সকালেই আমরা চলে যাব এখান থেকে।

পরদিন সকালে টারজন তার দলের যোদ্ধাদের নিয়ে গাঁয়ের কাছে বনটায় এসে দেখল আরবরা তাদের দলবল নিয়ে গাঁ ছেড়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

যাবার আগে গাঁয়ের সব কুঁড়েঘরগুলো পুড়িয়ে দিতে চাইল আরবরা। তাদের হুকুমে তাদের একজন ক্রীতদাস একটা মশাল নিয়ে একটা ঘরে আগুন ধরাতে গেলে টারজন দূরে গাছের আড়াল থেকে আরবী ভাষায় চীৎকার করে বলল, ঘর পুড়িও না। তাহলে তোমাদের খুন করব।

একথা শুনে ক্রীতদাসটা মশাল ফেলে দিল। তখন আরবরা চারদিকে তাকিয়ে কে একথা বলল তাকে খুঁজে পেল না। কোন মানুষকে দেখতে পেল না। তখন একজন আরব নিজে একটা জ্বলন্ত মশাল তুলে নিয়ে একটা ঘরে আগুন ধরাতে গেল। এমন সময় টারজনের একটা বিষাক্ত তীর দূর থেকে এসে তার বুকটাকে বিদ্ধ করল। এতে আরবরা ভয় পেয়ে আর ঘর পোড়াল না।

এরপর আরবদের নির্দেশে হাতির দাঁতের বোঝাগুলো ক্রীতদাসরা মাথার উপর একে একে তুলে নিতে গেলে টারজন আবার তাদের উদ্দেশ্যে বলল, হাতির দাঁতগুলো নিও না, মৃত লোকের হাতির দাঁতে কোন প্রয়োজন নেই।

পরদিন সকালে ক্রীতদাসরা বোঝা কাঁধে তুলতে অস্বীকার করলে আরবরা তাদের দুজনকে গুলি করে মারল। তখন সুযোগ বুঝে টারজন গাছের আড়াল থেকে ক্রীতদাসদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, তোমরা হাতির দাঁতের বোঝা তুলো না। তাহলে তোমরা মারা পড়বে। তোমরা তার থেকে তোমাদের নিষ্ঠুর মালিকদের হত্যা করো। তোমাদের প্রত্যেকের হাতেই বন্দুক আছে। আমরা তাহলে তোমাদের কোন ক্ষতি করব না। আমরা তাহলে আমাদের গাঁয়ে তোমাদের নিয়ে গিয়ে খাইয়ে তোমাদের দেশে পাঠিয়ে দেব।

বিদ্রোহের আভাস পেয়ে আরবরা এক জায়গায় জড়ো হলো। তাদের সর্দার যাত্রা শুরু করার জন্য হুকুম দিল ক্রীতদাসদের। কিন্তু ক্রীতদাসরা বোঝা তুলে যাত্রা শুরু না করায় সে রাইফেল তুলে গুলি করতে গেল ওদের লক্ষ্য করে। এমন সময় একজন ক্রীতদাস তার রাইফেলটা অতর্কিতে কেড়ে নিয়ে আরবদের লক্ষ্য করে গুলি করতে লাগল। তখন সব ক্রীতদাসরা একযোগে আক্রমণ করল আরবদের। দেখতে দেখতে সব আরবরা একে একে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

টারজন এবার গাছের আড়াল থেকে বলল, এবার হাতির দাঁতের বোঝাগুলো তুলে নিয়ে আমাদের গাঁয়ে নিয়ে চল।

ক্রীতদাসরা বলল. গাঁয়ে তোমরা আমাদের খুন করবে না তা কি করে জানব? তুমি কে কথা বলছ?

টারজন তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল, এই দেখ আমি। তোমরা আমাদের কথা শুনলে আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করবো না। আরবরাই আমাদের শত্রু।

যেদিন ক্রীতদাসরা হাতির দাঁতের সব বোঝা নিয়ে গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছল সেইদিন রাতেই গাঁয়ের লোকেরা নাচগানসহ এক বিজয়োৎসব করল। তারা সর্বসম্মতিক্রমে টারজনকে তাদের সর্দার নির্বাচিত করল।

জেন যে নৌকোটাতে ছিল তাতে যাত্রীরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে জেনেরই প্রথমে ঘুম ভাঙ্গল। চোখ খুলে জেন দেখল আর নৌকো তিনটের কোন দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।

ক্রমে ক্লেটনেরও ঘুম ভাঙ্গল। সে জেনকে বলল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমরা একসঙ্গে আছি।

জেন তখন বলল, দেখ অন্য নৌকোগুলো কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

ক্লেটন তখন মাঝিদের জিজ্ঞাসা করতে একজন মাঝি বলল, হয়ত পিছিয়ে পড়েছে।

কিন্তু মাঝিরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে লেগে গেল। দুজন নৌকো বাইতে বাইতে দাঁড় ছেড়ে বসে রইল। মাঝিরা ক্লেটনের কাছ থেকে খাবারের টিন আর জলের ফ্লাস্কগুলো চাইল। ক্লেটন তখন খাবারের টিনগুলো মাঝিদের হাতে দিয়ে দিল।

কিন্তু খাবারের টিনগুলো দেখা গেল তেলে ভর্তি। জলের ফ্লাস্কগুলো দেখা গেল গানপাউডারে ভর্তি। মাঝিরা এতে রেগে গেল।

ক্রমে অবস্থা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। মাঝিরা পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে চামড়া খেতে লাগল। তাতে ওরা অসুস্থ হয়ে পড়ল। টমকিন নামে এক মাঝি মারা গেল। তার মৃতদেহটা নৌকোর পাটাতনে পড়ে রইল সারাদিন। খিদে আর পিপাসায় ওরা প্রত্যেকেই কাতর হয়ে উঠল। ওদের গলা শুকিয়ে গেল। তার উপর সারাদিন ধরে কড়া রোদ ভোগ করে করে ওদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে উঠল।

জেন মৃতদেহটাকে আর সহ্য করতে পারছিল না। সে ক্লেটনকে বলল, ওটাকে জলে ফেলে দাও।

ক্লেটন মৃতদেহটাকে একা সরাতে পারছিল না। তাছাড়া সে সেটাকে সরাতে গেলে উইলসন নামে এক মাঝি তাকে বাধা দিল। রোকোফ বা মঁসিয়ে থুরান ক্লেটনের সাহায্যে এগিয়ে গেলে উইলসন বলল, ও ত মারা গেছে, আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। ওকে সরিও না।

এ কথার অর্থ বুঝতে পারল ক্লেটন। অর্থাৎ পেটের জ্বালায় ওরা নরমাংস খেতে চায়। অবশেষে অন্য এক মাঝি স্পাইডার ক্লেটনদের সঙ্গে একমত হলে উইলসন আর আপত্তি করল না। মৃতদেহটাকে ক্লেটন আর রোকোফ দু'জনে মিলে নৌকো থেকে তুলে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল।

রাত্রিতে ক্লেটনের চোখে যখন ঘুম জড়িয়ে ধরেছিল তখন সে একসময় দেখল উইলসন কেমন অদ্ভুতভাবে তার পানে তাকাচ্ছে। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে দেরী হলো না তার। ভয়ে গা শিউরে উঠল তার। কতক্ষণ ঘুমে অচেতন হয়ে ছিল সে তা সে জানে না। কিন্তু একটা খসখস আওয়াজ শুনে তার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। চাঁদের আলোয় সে চোখ মেলে দেখল উইলসন গুড়িমেরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। ক্লেটন তার মুখটা সরিয়ে নিল। তার মুখ থেকে জিবটা বেরিয়ে পড়ে ঝুলছিল। তার চোখগুলো জ্বলছিল।

জেনও জেগে উঠেছিল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সে ভয়ে চীৎকার করে উঠল। তার চীৎকারে থুরান ও স্পাইডারও জেগে উঠল। ততক্ষণে দুর্বল ক্লেটনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁত দিয়ে তার গলাটাকে ছেঁড়ার চেষ্টা করছে উইলসন। অবশেষে তিনজনে মিলে উইলসনকে টেনে সরিয়ে নৌকোর পাটাতনের উপর ফেলে দিল। উইলসন পাগলের মত হাসতে হাসতে নৌকো থেকে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিল।

পরদিন সকালে রোকোফ ওরফে থুরান ক্লেটনের কাছে তার একটা প্রস্তাব রাখল। বলল, আমাদের এখন ক'দিন এভাবে যেতে হবে তার ঠিক নেই। আরো চার পাঁচদিনের আগে কূল পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এভাবে চললে আমাদের সবাইকে

মরতে হবে। তার থেকে আমাদের মধ্যে যেকোন একজনকে মরতে হবে যাতে আর সবাই দিনকতক বাঁচতে পারে। তাই আমি ভাগ্যপরীক্ষা করতে চাই।

একথার মানে বেশই বুঝতে পারল ক্লেটন। এ কথায় জেন বা ক্লেটন কেউই রাজী হলো না। তখন সুচতুর রোকোফ বলল, মিস পোর্টার এই লটারী বা ভাগ্যপরীক্ষা থেকে বাদ, কারণ তিনি মেয়েমানুষ। বাকি তিনজনের মধ্যে বেশীর ভাগ যা চাইবে তাই হবে। তখন মাবি স্পাইডারও রোকোফের মতে সায় দিল। ক্লেটন নিরুপায়। রোকোফের কিছু তাস ছিল। সে তাসের খেলা জানত। একটা নম্বরের কথা জানিয়ে নিজে তোলার পর বাকি দুজনকে একে একে তাস তুলতে বলল রোকোফ। এই তাসের লটারীতে ক্লেটন হেরে গেল। রোকোফ হয়ত তাই চেয়েছিল।

জেন তখন অচেতন হয়ে পড়েছিল, তিনদিন সে কোন কথা বলেনি। ক্লেটন বলল, এখন বিকেল, সন্ধ্যে হোক [illegible] জেন যেন দেখতে না পায়।

রোকোফ [illegible] জামার পকেট থেকে একটা ছুরি বার করল [illegible] চোখদুটো ক্লেটনের উপর সদা সর্বদা নিবদ্ধ ছিল [illegible] না খেয়ে খেয়ে সেও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সন্ধ্যা হতেই দুর্বলতায় ক্লেটনও শুয়ে পড়ল। সে একপাও নড়তে পারছিল না। [illegible] কথা বলারও ক্ষমতা ছিল না।

রোকোফ ক্লেটনকে বলল, তুমি আমার কাছে এস।

ক্লেটন উঠে বসে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারল না। টলে পড়ল। টলতে টলতে অসার হয়ে শুয়ে পড়ল। রোকোফ বলল, তুমি তোমার দায় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ। আমার সঙ্গে ছলনা করছ।

ক্লেটন বলল, না ছলনা করছি না। তুমি এস. আমি প্রস্তুত।

রোকোফ ফিস ফিস করে বলল, হ্যাঁ, আমিই যাচ্ছি।

অবশেষে ক্লেটন বুঝতে পারল রোকোফ তার খুব কাছে এসে পড়েছে। সে রোকোফের ক্রুর হাসির শব্দ শুনতে পেল। কে যেন মুখটা তার চেপে ধরল। তারপরেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

ওয়াজিরিদের সর্দার হবার পর সোনার সন্ধানে এক অভিযানে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল টারজন। যারা তার সঙ্গে স্বেচ্ছায় যেতে চায় এমন শক্ত সমর্থ পঞ্চাশজন যোদ্ধাকে বেছে নিল সে। কত পাহাড়, প্রান্তর, বন, নদী পার হয়ে পঁচিশ দিন পর তারা এক পাহাড়ের ধারে এসে এক শিবির স্থাপন করল। সেই পাহাড়টার উপর থেকে সেই আশ্চর্য নগরটাকে দেখার আশায় পরদিন সকালেই ওরা পাহাড়টার চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক চেষ্টার পর টারজন একা পাহাড়টার চূড়ার উপর উঠে দাঁড়াল। সামনে দেখল এক বিরাট উপত্যকা প্রসারিত হয়ে আছে। সেই উপত্যকার শেষ প্রান্তে একটা উঁচু পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এক বিরাট নগরী রয়েছে মনে হলো।

পাহাড় থেকে নেমে এসে টারজন তার দলের লোকদের নিয়ে সেই নগরীর দিকে এগিয়ে চলল।

অবশেষে সেই নগরপ্রাচীরের বাইরে গিয়ে হাজির হলো ওরা। পাঁচিলটা পঞ্চাশ ফুট উঁচু। তার উপর ওঠা বা সেটা পার হওয়া সত্যিই এক কঠিন ব্যাপার।

সেই পাঁচিলটার বাইরেই রাতটা কাটাবার জন্য এক শিবির স্থাপন করল টারজন। শোবার সময় নগরীর ভিতর এক অদ্ভুত চীৎকার শুনে ভয় পেয়ে গেল ওয়াজিরিরা। চীৎকারটা মানুষের আর্তনাদের মত শোনালেও ঠিক বুঝতে পারল না তারা।

পাঁচিলটার এক জায়গায় একটু ফাঁক ছিল। সেইদিকে ঢুকে তারা দেখল ভিতরে সেই ধরনের আর একটা পাঁচিল রয়েছে। দুটো পাঁচিল পার হয়ে ভিতরে গিয়ে টারজনরা দেখল সামনে একটা ফাঁকা জায়গায় অনেক বড় বড় পাথর ও ভগ্ন সৌধমালার অনেক ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে। ফাঁকা মাঠটার ওদিকে মন্দিরের মত একটা বড় বাড়ি রয়েছে। ওদের মনে হলো আধো অন্ধকার সেই মন্দিরের মধ্যে ছায়ামূর্তির মত কারা ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতস্ততঃ।

টারজন তার লোকদের ডাক দিল, এস, ভিতরে কি আছে দেখা যাক।

কিন্তু তার দলের লোকেরা যেতে চাইছিল না তার সঙ্গে। তারা তখনি ফিরে যেতে চাইছিল নিজেদের দেশে। কিন্তু টারজন যখন নীরবে এগিয়ে গেল তখন তারা তার অনুসরণ না করে পারল না।

একটা বড় বাড়িতে ঢুকল টারজন। তার মনে হলো কারা যেন তাকে দেখছে। অথচ কোন জীবন্ত মানুষ দেখতে পেল না। তবু তাদের মনে হতে লাগল অসংখ্য ছায়ামূর্তি যেন নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওয়াজিরিরা টারজনকে একসময় বলল, ফিরে চল মালিক, কোন লাভ নেই এতে। এই শহরটা অনেকাদন আগে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু মৃত লোকদের প্রেতাত্মাগুলো ছেয়ে আছে গোটা শহরটাকে।

টারজন তার লোকদের বলল, বন্ধুগণ, তোমরা যদি চাও সূর্যালোকে বাইরের জগতে ফিরে যেতে পার, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব খুঁটিয়ে দেখব আমি। দেখব কোথায় সোনা আছে।

একসময় টারজনের দলের লোকেরা ইতস্ততঃ করতে লাগল। তারা কি করবে কিছু ভেবে পেল না। এমন সময় গতকাল রাতে যে অদ্ভুত চীৎকারটা শুনেছিল সেই চীৎকারটা তাদের কানের কাছে ধ্বনিত হয়ে উঠল তীক্ষ্ণভাবে। চীৎকারটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাসুলি সমেত দলের সবাই ছুটে পালিয়ে গেল। টারজন একা সেই শূন্য হল ঘরটায় দাঁড়িয়ে রইল।

টারজন একা তখন মন্দিরের আরো ভিতরে চলে গেল। একটা রুদ্ধদ্বার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করল টারজন। কিন্তু দরজাটা ঠেলার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই চীৎকারটা ধ্বনিত হয়ে উঠল। টারজন ভাবল এই ঘরটাই হয়ত সোনার ভাণ্ডার। তাই তাকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। হয়ত এবার অদৃশ্য শত্রুরা তার সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপরে।

তবু টারজন তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজাটা ফাঁক করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ভিতরটা দারুণ অন্ধকার। ঘরের মধ্যে কোন জানালা নেই। টারজন ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আপনা থেকে আর সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো হাত ধরে ফেলল টারজনকে।

যে হাতগুলো টারজনকে ধরেছিল প্রচুর লড়াই করে সেগুলোর থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেও তা পারল না টারজন। হাতগুলো সংখ্যায় ছিল অগণ্য এবং তারা টারজনকে বেঁধে ফেলল। কিন্তু

সেগুলো কাদের হাত, কারা তাকে বাঁধল তা বুঝতে পারল না টারজন।

টারজনের হাত পা শক্ত করে বেঁধে তারা তাকে তুলে ঘরগুলো পার করে একটা ফাঁকা উঠোনে নিয়ে গেল। সেখানে তাকে তারা চিৎ করে শুইয়ে রেখে দিল। টারজন দেখল জায়গাটা চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মাথার উপর নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। টারজন দেখল তাকে যারা বেঁধে এনেছিল সেই লোকগুলোর গায়ের রং সাদা। তাদের মাথার জটা বুকের উপর পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। পাগুলো ছোট এবং মোটা। হাতগুলো লম্বা লম্বা আর পেশীবহুল।

টারজন বাঁধনের দড়িগুলো পরীক্ষা করে দেখল কিন্তু সে তার থেকে নিজেকে মুক্ত করার কোন চেষ্টা করল না। তখন বেলা দুপুর।

কিছুক্ষণ পর টারজন দেখল কিছু লোক এসে পাঁচিলের ধারে গ্যালারীতে এসে বসে পড়ল। আর কুড়িজন লোক হাতে খাড়া নিয়ে এক ধর্মীয় গান গাইতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একজন নারী খাঁড়া হাতে এসে সেই লোকগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের বাধা দিয়ে কি বলতে তারা থেমে গেল।

সেই মেয়েটি এবার টারজনের সব বাঁধন কেটে দিল। তারপর তাকে উঠে দাঁড়াতে বলল ইশারায়। এরপর তার গলায় দড়ি বেঁধে তাকে সেখান থেকে মন্দিরের অভ্যন্তরে একটা বেদীর কাছে নিয়ে গেল।

টারজন দেখল বেদীর চার পাশে মানুষের রক্তের দাগ রয়েছে এবং দেওয়ালে অনেক মানুষের মাথার খুলি রয়েছে। সে বুঝতে পারল এই বেদীর সামনে তাকে বলি দেওয়া হবে।

এরপর বেদীর উল্টো দিকের একটি অন্ধকার পথ দিয়ে এক যুবতী পূজারিণী একা এসে হাজির হলো সেখানে। টারজন বুঝল সেই যুবতীই হলো প্রধানা পুরোহিত। তার গায়ের সোনার গয়নাগুলো হীরকখচিত ছিল। তার মুখটা ছিল বেশী বুদ্ধিদীপ্ত।

টারজন বুঝতে পারল এই সুন্দরী যুবতী কিভাবে একটু পরে রক্তপিপাসু ঘাতকীতে পরিণত হবে। প্রধানা পুরোহিত ছুরি হাতে তৈরী হচ্ছে। পূজারী ও পূজারিণীরা সারবন্দীভাবে কাপ হাতে দাঁড়াল। বন্দীর দেহে ছুরিকাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই তারা সবাই আপন আপন কাপে রক্ত নিয়ে পান করবে।

এমন সময় পূজারীদের মধ্যে একটা তর্কাতর্কি শুরু হলো। কে প্রথমে দাঁড়াবে কে পরে দাঁড়াবে এই নিয়ে বিবাদ বাঁধল। গোরিলার মত একটা বর্বর লোক একটা বেঁটে লোককে সরিয়ে তার জায়গায় দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। বেঁটে লোকটা তখন প্রধানা পুরোহিতের কাছে নালিশ জানাতে প্রধানা পুরোহিত লোকটাকে সবচেয়ে শেষে দাঁড়াবার হুকুম দিল।

এমন সময় সেই বিক্ষুব্ধ পূজারীটা কোন অনুশাসন না মেনে তার পাশের এক পূজারীকে একটা লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করল। তখন জোর গোলমাল শুরু হলো এবং টারজন শুয়ে শুয়ে সেদিকে তাকাল।

ক্রমে জনশূন্য হয়ে উঠল সমস্ত জায়গাটা। শুধু বেদীতে শায়িত টারজন, প্রধানা পুরোহিত আর সেই বিক্ষুব্ধ উন্মত্তপ্রায় পূজারীটা ছাড়া আর কেউ ছিল না সেখানে।

এমন সময় টারজন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তার

হাতের বাঁধন খুলে ফেলল। কিন্তু তখন দেখল সেই বিক্ষুব্ধ পূজারীটা প্রধানা পুরোহিতকে জোর করে ধরে টানতে টানতে কোথায় নিয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে নারীকণ্ঠের এক আর্ত চীৎকার শুনে পালাবার কথা ভুলে সেই চীৎকারের শব্দ শুনে একটা ঘরে গিয়ে হাজির হলো টারজন। সেই ঘরটায় গিয়ে টারজন দেখল প্রধানা পুরোহিতকে সেই বর্বর লোকটা দুহাতে তাকে গলা টিপে হত্যার চেষ্টা করছে। তার হলুদ বড় বড় দাঁতগুলো চকচক করছিল বাঁদর-গোরিলাদের মত।

টারজন এবার লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটা দুহাত দিয়ে সজোরে ধরে তাকে শ্বাসরোধ করে তার প্রাণহীন দেহটা মেঝের উপর ফেলে দিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে এক বিজয়সূচক চীৎকার করল। এদিকে প্রধান পুরোহিত তাদের দুজনের ধ্বস্তাধ্বস্তি দেখে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার আক্রমণকারী বর্বর লোকটা মরে যেতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল একটি দরজা দিয়ে। টারজন তার একটা হাত ধরে বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায় বলল, থাম।

প্রধানা পূজারিণী বলল, কে তুমি, আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলছ ?

টারজন বলল, আমি হচ্ছি বাঁদরদলের অধিপতি টারজন।

যুবতী বলল, কি চাও তুমি ? কেন তুমি আমাকে রক্ষা করলে ?

আমি নারীহত্যা চাইনি।

কিন্তু এখন কি চাও ?

যুবতী টারজনকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বলল, তুমি এক আশ্চর্য মানুষ। একটু আগে আমি তোমাকে বধ করতে গিয়েছিলাম নিজের হাতে আর এখন তুমিই আমাকে বাঁচালে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে।

টারজন বলল, আমি তোমাকে কোন দোষ দিই না, কারণ তুমি যা করছিলে তা তোমাদের ধর্মীয় প্রথার বশবর্তী হয়েই করছিলে।

যুবতী তখন বলতে লাগল, আমার নাম লা, আমি এখানকার প্রধানা পুরোহিত ও পূজারিণী। এই নগরীর নাম ওপার। আজ হতে প্রায় দশ হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা খনি থেকে সোনা তুলে এখানে সভ্যতার পত্তন করে এবং এক বিরাট নগরী গড়ে তোলে।

টারজন বলল, কিন্তু আমার কি হলো ? আমাকে পালাবার পথ দেখিয়ে দাও।

লা বলল, কিন্তু এখন সব পথ বন্ধ। এখন তোমাকে একটা ঘরে লুকিয়ে রাখব। সন্ধ্যা হলে আমি এসে তোমায় গুপ্ত পথ দিয়ে বাইরে নিয়ে যাব। আমি ওদের বলব, আমি অচৈতন্য হয়ে যাবার পর বন্দী পালিয়ে গেছে।

একটা অন্ধকার ঘরে টারজনকে লুকিয়ে রেখে লা চলে গেল।

সহসা জ্ঞান ফিরে পেয়ে ক্লেটন দেখল মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির জলে তার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। সে হাঁ করে কিছু বৃষ্টির জল পান করে একটু সুস্থ হলো। চোখ মেলে দেখল থুরান তার উপর অচেতন হয়ে পড়ে আছে। তার পায়ের কাছে জেন হতচেতন অবস্থায় নিথর হয়ে পড়ে আছে। তার মনে হলো জেন মারা গেছে।

ক্লেটন কোনরকমে একটু উঠে একটা চাদরের আঁচল জলে ভিজিয়ে জেনের ঠোটদুটো একটু ফাঁক করে তার মধ্যে একটু জল ঢেলে দিল। শুকনো গলাটা ভিজতেই চোখ মেলে তাকাল জেন।

জেন ভয়ে ভয়ে বলল, মঁসিয়ে থুরান কোথায়? সে তোমায় মারেনি?

ক্লেটন বলল, ঐ দেখ ঐখানে পড়ে আছে। না মরলে বৃষ্টির জল পেয়ে জ্ঞান ফিরে পাবে। দেখি ওকে বাঁচাতে পারি কি না।

কিন্তু জেন হাত বাড়িয়ে তাকে নিষেধ করল। বলল, না, ওকে বাঁচিও না। ও তোমাকে খুন করবে।

দ্বিধাগ্রস্ত মনে ভাবতে লাগল ক্লেটন। ভাবতে ভাবতে একসময় সামনে চোখ ফেলতেই আনন্দে চীৎকার করে উঠল সে, জেন, ঐ দেখ কূল।

ক্রমে নৌকোটা বেলাভূমির কাছে এসে ভিড়ল। ক্লেটন আগে নেমে পড়ে নৌকোর দড়িটা একটা গাছে বেঁধে দিল যাতে নৌকোটা স্রোতের টানে ভেসে যেতে না পারে। তারপর সে জঙ্গলে গিয়ে কিছু ফল নিয়ে এসে সবাই মিলে ভাগ করে খেল।

আধ ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করার পর থুরানের চেতনা ফিরিয়ে আনে ক্লেটন। ফল খেয়ে সবাই একটু সুস্থ হলে তারপর সবাই নৌকো থেকে নেমে বেলাভূমি পার হয়ে সেই গাছটার তলায় শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিল।

দিনকতক পর একদিন থুরানের কাছে জেনকে রেখে নদীতে জল আনতে যেতে বাধ্য হয়েছিল ক্লেটন। থুরান তখন জেনকে একা পেয়ে অসম্মান-সূচক কি একটা কথা বলতেই জেন বলল, আজ যদি টারজন থাকত তাহলে তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দিত।

থুরান রেগে গিয়ে বলল, সেই শুয়োরটাকে তুমি চেন?

জেন হাসতে লাগল থুরানের কথা শুনে। বলল,

যারা তোমাকে ও টারজনকে দেখেছে তারা তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।

ওরা যখন এইভাবে কথা বলছিল তখন ওরা কেউ জানত না ওদের এই বাসা থেকে উপকূলভাগের মাত্র পাঁচ মাইলের মধ্যে টারজনের কেবিন আর তারই কিছুদূরে বাকি তিনটি হারানো নৌকোর যাত্রীরা সবাই নিরাপদে উপকূলবর্তী জঙ্গলেই বাস করছে। তবে ডুবে যাওয়া জাহাজের মালিক টেনিংটনের নৌকোয় সব অস্ত্র থাকায় শিকারের বস্তু আর নিরাপত্তার কোন অভাব ঘটেনি তাদের। তাছাড়া তাদের নৌকো-গুলোও সোজা পথে অল্পদিনের মধ্যেই কূল পেয়ে যায়। ফলে ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালায় তাদের তেমন কষ্ট পেতে হয়নি।

একদিন কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে থুরান যখন মাচার উপর ঘাসের বিছানায় শুয়েছিল তখন ক্লেটন জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিল। জেন মাচার নিচে দাঁড়িয়ে কি করছিল। হঠাৎ ক্লেটন ছুটে এসে বলল, জেন, পালাও, মাচায় যাও।

জেন দেখল তার পিছনে একটা সিংহ। কিন্তু সে ছুটে পালাল না। নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগল। যখন দেখল সিংহটা ক্লেটনের উপর ঝাঁপ দেবার জন্য উদ্যোগ করছে তখন সে তাদের প্রাণের সব আশা ত্যাগ করল। থুরান তা দেখে ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। এমন সময় জেন দেখল বনের

ভিতর থেকে অদৃশ্য কোন এক মানুষের হাত থেকে ছোঁড়া বর্শা এসে সিংহটার বুকটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সিংহটা।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠার পর প্রধানা পূজারিণী লা টারজনের ঘরে ঢুকল। তার হাতে কোন আলো ছিল না। সে টারজনের জন্য কিছু খাবার এনেছিল। অন্ধকারের মাঝেই লাকে চিনতে পারল টারজন।

লা বলল, তারা ক্ষেপে উঠেছে তোমাকে না পেয়ে। তাই এরই মধ্যে পঞ্চাশজন লোক তোমার খোঁজ করতে বেরিয়ে গেছে। এই ঘরটা ছাড়া মন্দিরের সর্বত্র খুঁজে বেড়িয়েছে তোমায়।

টারজন বলল, কিন্তু এ ঘরে আসতে ভয় পায় কেন তারা?

লা বলল, কারণ এ ঘর মৃতদের ঘর। যেসব লোককে বলি দেওয়া হয় তাদের আত্মারা মৃত্যুর পর এ ঘরে এসে উপাসনা করে। জীবিত কোন লোক এ ঘরে এলে মৃতরা তাদের ধরে। যে বেঁচে রয়েছে তাকে বলি দেয় তারা। এইভাবে তারা তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়। এইজন্য এ ঘরে কেউ ঢোকে না।

টারজন বলল, কিন্তু তুমি ঢুকলে কি করে?

লা বলল, আমি প্রধানা পূজারিণী। আমি মৃতদের হাত থেকে নিরাপদ। এখন এস।

লা টারজনকে নিয়ে বলির বেদীর তলদেশে যে একটা অন্ধকার ঘর ছিল তার মধ্যে নিয়ে গেল। তারপর অনেকগুলো অন্ধকার বারান্দা পার হয়ে আবার একটা ঘরে রুদ্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। লা একটা চাবি বার করে তালাটা খুলে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, আগামীকাল রাত পর্যন্ত তুমি এই ঘরের মধ্যেই থাকবে।

টারজন দেখল একই মাপের বড় বড় পাথর দিয়ে

দেওয়ালগুলো তৈরী। সহসা হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে সে দেখল দরজার উল্টোদিকের দেওয়ালটা আলগা করে গাঁথা। একটু চেষ্টা করতেই পাথরখণ্ডগুলো একটা একটা করে খুলে যেতে লাগল। টারজনের দেহটা বার হবার একটা পথ হয়ে গেল।

ওপারে গিয়ে টারজন আবার পাথরখণ্ডগুলো যথাস্থানে বসিয়ে যেমন ছিল তেমনি করে দিল। টারজন দেখল মাথার উপর ছাদের মাঝখা ন এক জায়গায় গোলাকার একটা ফাঁক রয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে ঝরেপড়া এক ঝলক চাঁদের আলোয় টারজন দেখল সেখানে একটা জলের কুয়ো রয়েছে। কুয়োটার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে তার মনে হলো এই পথটা নিশ্চয় বাইরে যাবার একটা গোপন পথ। এপথে সে বাইরে যেতে শেষ পর্যন্ত না পারলেও অন্ততঃ একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাইল। এগিয়ে গিয়ে দেখল সামনের দেওয়ালে আগের দেওয়ালটার মত আলগা করে পাথর গাঁথা একটা পথ রয়েছে। ওপারে গিয়ে আগের মত পাথরগুলো ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিল। এরপর একটা সুড়ঙ্গপথ পেল সে। সেপথে কিছুদূর যাবার পর খিল আঁটা একটা কাঠের দরজা পেল সে। খিলটা জোর করে খোলার সময় একটা জোর আওয়াজ হলো। টারজন কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে দেখল এই শব্দের কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি না।

এরপর একটা বড় ঘরে গিয়ে দেখল সারা ঘরখানা তাল তাল ধাতুতে ভর্তি। তালগুলো অদ্ভুত আকারের কিন্তু একই মাপের। সেগুলো ভারী, কিন্তু সোনার কি না তা অন্ধকারে বুঝতে পারল না। একটা তাল নিয়ে উল্টো দিকের আর একটা দরজা দিয়ে ঘর হতে বেরিয়ে গেল টারজন।

ঘর থেকে বেরিয়ে অনেকটা পথ যাবার পর উপরে ওঠার পাথরের সিঁড়ি পেল। তারপর সেখান থেকে দেখল একটা বড় পাথর রয়েছে। তার ওপারেই নগরপ্রান্তের সেই বিরাট উপত্যকা। এবার মাথার উপর মুক্ত আকাশ থেকে চাঁদের আলো ঝরে পড়ছিল। সে আলোয় টারজন দেখল তার হাতের ধাতুর তালটা সোনার।

আপন মনে ভাবল টারজন, এই সেই প্রাচীন ওপার নগরী, সেই ভয়ঙ্কর সোনার দেশ। বিভীষিকা আর মৃত্যুর দেশ। উপত্যকার ওপারে সেই খাড়াই পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে যে পাহাড় হয়ে তারা গতকাল সকালে এখানে আসে। পা চালিয়ে উপত্যকাটা পার হয়ে সেই পাহাড়ের মাথায় উঠতে রাত কেটে গেল।

পাহাড় থেকে নেমে ধীরপায়ে সাবধানে এগিয়ে গেল টারজন। কিছুদূর গিয়ে গাছপালা দিয়ে তৈরী একটা ঝুপড়ি বা শিবির দেখতে পেল। তারপর পিছন থেকে তার দলের লোকদের চিনতে পারল।

ওয়াজিরিরা চমকে উঠে টারজনকে দেখতে পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বলল, আমরা তোমার কথাই ভাবছিলাম মালিক। ভাবছিলাম এখনি তোমাকে উদ্ধার করতে যাব ওখানে।

টারজন বলল, পঞ্চাশজন লোককে এদিকে দেখেছ? তারা আমায় খুঁজছে।

বাসুলি বলল, বাঁদর-গোরিলাদের মত দেখতে ছোট ছোট পায়ে হাঁটতে হাঁটতে পঞ্চাশজন লোকের একটা দল এই পথেই গেল। আমরা ওদের দেখা দিইনি।

দিনটা সেইখানে কাটিয়ে তার দলের সবাইকে নিয়ে রাত্রিতে আবার সেই গোপন পথটা দিয়ে সেই ঘরটায় গিয়ে পঞ্চাশজন লোকের প্রত্যেকের হাতে দুটো করে সোনার তাল তুলে দিল টারজন। তারপর তারা দেশের পথে রওনা হলো। প্রায় একমাস চলার পর ওরা ওদের দেশের সীমানায় এসে পৌঁছল। কিন্তু এবার উত্তর দিকে ওদের গাঁয়ে না গিয়ে পশ্চিম দিকের উপকূলভাগে যাবার মনস্থ করল। ওদের বলল, তোমরা সোনাগুলো বনের এক জায়গায় রেখে দিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাও।

ওরা জিজ্ঞাসা করল, তুমি?

টারজন বলল, আমি দিনকতক এখানে আমার বাসায় থাকব। পরে তোমাদের ওখানে যাব।

তার দলের লোকেরা চলে গেলে টারজন আগে যেখানে অধ্যাপক পোর্টারের সিন্দুকটা পুঁতে রেখেছিল মাটিতে এবং যেখানে কোদালটা পড়ে ছিল তখনো সেইখানে একটা বড় খাল করে সব সোনার তালগুলো পুঁতে রাখল।

রাতটা সেইখানে কাটিয়ে পরদিন সকালে কেবিনের পথে যাত্রা শুরু করল টারজন। কিছুদূর যাওয়ার পর বাতাসে মানুষের গন্ধ পেল। একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ আর সেই সঙ্গে একটা সিংহেরও গন্ধ পেয়ে গেল। একটা গাছের উপর থেকে টারজন

দেখল একটা মই লাগানো মাচার নিচে একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছে আর একজন ছেঁড়া ময়লা পোশাকপরা শ্বেতাঙ্গ পুরুষ হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। তার থেকে মাত্র তিরিশ হাত দূরে একটা ক্ষুধিত সিংহ তার উপর ঝাঁপ দেবার উদ্যোগ করছে। টারজন দেখল ধনুকে তীর লাগিয়ে ছোঁড়ার সময় নেই। একমুহূর্ত দেরী হলে লোকটাকে আর বাঁচানো যাবে না। তাই সে তার বর্শাটা দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সিংহটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। বর্শাটা সিংহটার পিঠের উপর দিয়ে ঢুকে পেট দিয়ে বেরিয়ে এল।

টারজন দেখল মেয়েটি জেন পোর্টার। সে যেন নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না। সে দেখল যে লোকটি ধীরে ধীরে চোখ মেলে মরা সিংহটার পানে তাকাল সে হচ্ছে ক্লেটন। টারজন কি মনে করে ওদের দেখা না দিয়ে ওয়াজিরিদের গাঁয়ের দিকে পা চালিয়ে যেতে লাগল।

এদিকে জেন ও ক্লেটন কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর জেন প্রথমে কথা বলল, কে এই বর্শাটা ছুঁড়ল?

ক্লেটন বলল, ঈশ্বর জানেন। তারপর জেনকে বলল, তুমি মাচায় চলে যাও। আমি ত তোমাকে রক্ষা করতে পারব না।

পরের দিন থুরানের অবস্থা আরো খারাপ হলো। ক্লেটন সিংহটার মৃতদেহ থেকে বর্শাটা তুলে নিয়ে জঙ্গলে শিকারের খোঁজে বেরিয়ে গেল। জেন মাচা থেকে নেমে গাছের নিচে ঘোরাফেরা করতে লাগল। সে জঙ্গলের দিকে পিছন ফিরে থাকায় দেখতে পায়নি বাঁদর-গোরিলাদের মত দেখতে কতকগুলো বর্বর-জাতীয় লোক চুপিসারে ঝোপের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ঘাসের খসখস শব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে ভয়ে চীৎকার করে উঠল। কিন্তু তার মুখ চেপে ধরে তাকে তুলে নিয়ে চলে গেল ওরা।

জেন চেতনা ফিরে পেয়েই দেখল সে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে। তখন রাত্রিকাল। কাছেই একটা বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিল। তাতে একটা পাত্রে মাংস সিদ্ধ হচ্ছিল। তার থেকে কিছু ঝোল তুলে জেনকে খেতে দিল ওরা। কিন্তু নাকে একটা দুর্গন্ধ আসতে ঘৃণায় চোখ বন্ধ করল জেন।

দিনের পর দিন ধরে বনপথের মধ্য দিয়ে জেনকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল ওরা।

অবশেষে একটা প্রাচীরঘেরা এক প্রাচীন নগরীতে গিয়ে ঢুকল। ওরা ঢুকতেই জেনকে দেখে নারী পুরুষ সবাই জেনকে ঘিরে দাঁড়াল। মেয়েগুলোকে দেখে জেনের একটু আশা হলো, কারণ তাদের মুখগুলোকে দেখে কম নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু মেয়েগুলো তাকে দেখে একটা সহানুভূতির কথাও বলল না। জেনকে মাটির তলায় একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। তাকে দুটো পাত্রে কিছু জল ও খাবার দেওয়া হলো। এই ঘরটাতেই এক সপ্তাহ রাখা হলো তাকে। রোজ একজন করে মেয়ে এসে তাকে খাবার আর জল দিয়ে যেত। এক সপ্তাহ এইভাবে যাবার পর গায়ে একটু বল পেল জেন। কিন্তু সে জানত না এরপর জ্বলন্ত দেবতা সূর্যের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হবে তাকে।

এদিকে বর্শা ছুঁড়ে সিংহটাকে মারার পর মনের দুঃখে ওয়াজিরিদের গাঁয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল টারজন। কিন্তু সে আর কোন মানুষের সমাজে ফিরে যাবে না। জঙ্গলের মাঝেই একা রয়ে যাবে সে।

একথা ভাবতে ভাবতে টারজন বনের মধ্যে আগে যেখানে তার দলের বাঁদরগুলো নাচগানের উৎসব করত সেইখানে থাকতে লাগল। একদিন সেখানে একদল বাঁদর গোরিলা ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হলো।

পুরনো দিনের কথা ভেবে বয়স্ক গোরিলারা টারজনকে তাদের দলের একজন হিসাবে মেনে নিল। ফলে টারজন সেই থেকে বাঁদরদলেই রয়ে গেল। একসঙ্গে শিকার করতে লাগল। শিকারে টারজনের দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে অবাক হয়ে গেল তারা। তার বুদ্ধির জন্য তাকেই তারা রাজা নির্বাচিত করল।

একদিন দলের একটা বাঁদর অন্য কোথায় চলে গিয়েছিল ঘুরতে। ফিরে এসে সে বলল, পঞ্চাশজন অদ্ভুত ধরনের লোক একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

টারজন আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করল, লোকগুলো বাঁদরের মত দেখতে আর তাদের চেহারাগুলো বেঁটে বেঁটে? তাদের পাগুলো বাঁকা-বাঁকা?

বাঁদর-গোরিলাটা বলল, হ্যাঁ।

তারা কি সিংহ আর চিতাবাঘের চামড়া পরেছিল?

হ্যাঁ, তাদের পরনে তাই ছিল।

তারা যে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তার গায়ের চামড়াটা খুব সাদা?

হ্যাঁ। তার মাথায় অনেক চুল ছিল। তাকে ওরা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

টারজন বলল, হা ভগবান! কোথায় দেখেছ?

গোরিলাটা দক্ষিণ দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে টারজন লাফ দিয়ে গাছে উঠে তীরবেগে দক্ষিণ দিকে চলে গেল।

ক্লেটন শিকার থেকে ফিরে এসে দেখল জেন মাচার উপর নেই।

জেনের কথা থুরানকে জিজ্ঞাসা করতে সে আশ্চর্য হয়ে বলল, আমি ত জানি না। কোন শব্দও শুনতে পাইনি।

ক্লেটন একাই বনের মধ্যে জেনের খোঁজ করে বেড়াতে লাগল। তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। কোথাও জেনের কোন সন্ধান না পেয়ে তার নাম ধরে বারবার ডাকতে লাগল। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পেল না। তার ডাক শুধু একটা সিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সিংহ দেখে কাছাকাছি একটা গাছের উপর উঠে পড়ল সে। সিংহটা চলে গেলেও অন্ধকারে ভয়ে গাছ থেকে নামল না।

পরদিন সকালে গাছ থেকে নেমে এসে দুজনের আহারের সন্ধানে বার হলো ক্লেটন। এদিকে থুরানের জ্বর ছেড়ে যাওয়ায় তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে লাগল সে। এমন সময় ক্লেটন হঠাৎ জ্বরে পড়ে গেল। দিনে দিনে তার জ্বর বাড়তে লাগল। কিন্তু থুরান এবার বাইরে বেরিয়ে তার জন্য আহার সংগ্রহ করতে পারলেও ক্লেটনকে সে কিছুই দিত না। প্রথম প্রথম

ক্লেটন কোনরকমে নিজেই উঠে নদী থেকে একটা পাত্র ভরে খাবার জল নিয়ে আসত। একদিন সে আর উঠতে পারল না। সে থুরানের কাছে একটু জল চাইল।

কিন্তু থুরান একপাত্র জল নিজে ক্লেটনের সামনে পান করে বাকি জলটা ফেলে দিল। ক্লেটনকে দিল না। বলল, তুমি জেনের সামনে আমাকে অপমান করতে।

ক্লেটন ক্ষীণকণ্ঠে বলল, সে আর বেঁচে নেই। তার কথা আর বলো না।

পরদিন থুরান তাকে একা ফেলে রেখে ক্লেটনের বর্শাটা নিয়ে জনপদের উত্তর দিকে রওনা হলো।

এদিকে টেনিংটন তার দলবল নিয়ে কেবিনটা থেকে মাইলকতক দূরে সমুদ্রের ধারেই একটা জায়গায় বাস করছিল। তারা রোজ বলত হারানো নৌকোটা একদিন তাদের কাছে কূলে এসে ভিড়বে।

সকলেই জেন, ক্লেটন আর থুরানের জন্য খুবই ভাবতে লাগল। টেনিংটন একদিন মিস হেজেল স্ট্রংকে বলল, আপনি কি থুরানকে বিয়ে করবেন বলে কথা দিয়েছেন?

হেজেল বলল, ভদ্রলোককে আমি পছন্দ করতাম। বড ভাল লাগত। কিন্তু বিয়ের কথা ভাবিনি।

একদিন যখন হেজেলের সঙ্গে কথা বলছিল তখন অদূরে একজন দাড়িওয়ালা ছেঁড়া ময়লা পোশাকপরা একটা লোককে আসতে দেখে রিভলবার থেকে গুলি করতে যাচ্ছিল টেনিংটন। কিন্তু লোকটা কাছে আসতে দেখল সে মঁসিয়ে থুরান। থুরানকে অন্যান্য যাত্রীদের সম্বন্ধে সবাই প্রশ্ন করতে সে বলল, আমরা পথ হারিয়ে নৌকোতে প্রচুর খাদ্যাভাব ও জলকষ্ট পাই। তিনজন নাবিক একে একে মারা যায়। তারপর কূলে উঠে একটা মাচা তৈরী করে বাস করছিলাম। আমি যখন একদিন জ্বরে বেহুঁস হয়ে ভুল বকছিলাম তখন এক বন্য জন্তু তুলে নিয়ে যায় জেনকে। ক্লেটন জ্বরে মারা যায়।

এদিকে জেন সেই অন্ধকার ঘরখানায় কতদিন বন্দী ছিল তা বলতে পারবে না সে। কারণ মাটির তলায় সেই অন্ধকার ঘরখানায় দিবারাত্রি সমান ছিল তার কাছে। দিনকতক পরে একদল মেয়ে এসে তাকে নিয়ে কি একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান করল। তারপর তাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে একটা ফাঁকা উঠোনে আনল। মন্দিরের বেদীর সামনে তাকে থামতে বলল। বেদীতে রক্তের দাগ দেখে ভয় পেল জেন।

এরপর জেনকে যখন বেদীর উপর শুইয়ে দেওয়া হলো এবং প্রধানা পূজারিণী তার বুকের উপর একটা ছুরি ধরে রইল তখন জেনের ভয় আরো বেড়ে গেল। ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

এদিকে টারজন বনটা পার হয়ে ওপার নগরীর দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। বনের ভিতরটা গাছে গাছে এসেছে। তারপর থেকেই ছুটতে শুরু করেছে। একে একে পাহাড় আর উপত্যকা পার হয়ে সে সামনের দিকে না গিয়ে গুপ্ত পথ দিয়েই প্রবেশ করল ওপার নগরীতে।

টারজন দেখল মন্দিরের কোন ঘরে কোন পূজারী বা পূজারিণী নেই। সবাই নরবলি দেখতে গেছে। বেদীর সামনে উঠোনটায় গিয়ে টারজন যখন অকস্মাৎ

এক উন্মত্ত সিংহের মত উপস্থিত হল তখন সকলেই ভয় পেয়ে গেল। প্রধানা পুরোহিত লা-এর হাত থেকে ছোরটা পড়ে গেল। এদিকে একজন পূজারীর হাত থেকে একটা খাড়া কেড়ে নিয়ে যাকে তাকে বধ করে যেতে লাগল টারজন। সকলেই ভয়ে পালাতে লাগল।

টারজন এবার লা-এর কাছে গিয়ে বলল, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আমি এই নারীকে নিয়ে যাব। একে উদ্ধার করার জন্য এসেছি। যদি তুমি আমাকে বাধা দাও তাহলে তোমাকেও হত্যা করব।

লা ভয়ে ভয়ে বলল, কে এই নারী ?

টারজন বলল, এ আমার স্ত্রী।

এই বলে অচৈতন্য জেনকে কাঁধে তুলে নিয়ে যে গুপ্তপথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়েই চলে গেল টারজন।

প্রথমে ভয়ে সবাই পালালেও পরে আবার দল বেঁধে পূজারীরা ফিরে এল। তারা বলাবলি করতে লাগল মন্দিরের পিছন দিকের যেপথ দিয়ে ওরা পালিয়েছে সেপথে ওরা পালাতে পারবে না। ওদের আবার এখানেই ফিরে আসতে হবে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেলেও টারজন যখন ফিরে এল না তখন ওরা আবার পঞ্চাশজন লোককে টারজনের খোঁজে পাঠাল।

ওপার নগরীটাকে পিছনে ফেলে এক মাইলের উপর উপত্যকাটা দিয়ে এগিয়ে যাবার পর টারজন পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল একদল লোক তার পিছনে আসছে। টারজন দ্রুত চোখের নিমেষে উপত্যকাটা পার হয়ে পাহাড়টার মাথার উপরে অবলীলাক্রমে উঠে গেল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়টার ওপারে।

পাহাড়টার উপরে ওরা উঠে ওদের দুজনকে আর দেখতে না পেয়ে ফিরে গেল তারা।

এদিকে টারজন যখন দেখল ওরা আর অনুসরণ করছে না ওরা তখন একটা নদীর ধারে গিয়ে জেনকে নামিয়ে তার চোখে মুখে জলের ছিটে দিল টারজন।

জেন এবার ধীরে ধীরে চোখ মেলে বলল, টারজন তুমি ?

টারজন বলল, হ্যাঁ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ঠিক সময়েই আমি গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। তাই তোমায় বাঁচাতে পেরেছি।

জেন বলল, ক্লেটন আর মঁসিয়ে থুরান যে বলল, মাঝ সমুদ্রে তুমি পড়ে গিয়ে মারা গেছ।

টারজন বলল, মঁসিয়ে থুরানই আমাকে অতর্কিতে জলে ফেলে দিয়েছিল। পরে তোমাকে সব কথা বলব।

জেন এবার পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, জাহাজডুবির পর থেকে ক'মাস ধরে এত কষ্ট পাবার পর আবার এত সুখ ভোগ করব। আমার মনে হচ্ছে আমি স্বপ্ন দেখছি।

জেন বলল, এখন কোথায় যাবে, কি করবে ?

টারজন বলল, বল কোথায় যেতে চাও তুমি ?

হঠাৎ ক্লেটনের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় টারজন বলল, তোমার স্বামী কোথায় ? তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

জেন বলল, ক্লেটনকে স্পষ্ট তোমার প্রতি আমার ভালবাসার কথা জানিয়ে দিই। আমি তাকে বিয়ে করতে পারব না।

এবার টারজনের মুখপানে তাকিয়ে জেন বলল, টারজন, তুমিই নিশ্চয় সেদিন সেই বর্শাটা ছুঁড়ে আমাদেব প্রাণ বাঁচাও।

লজ্জায় মুখটা নামাল টারজন।

জেন বলল. কেমন করে তুমি আমাকে ফেলে পালালে ?

টারজন বলল, ঈর্ষাজনিত এক রাগে ফেটে পড়ে আমি তখন চলে এসেছিলাম।

তারপর টারজন কিভাবে সমুদ্র থেকে ওয়াজিরিদের সঙ্গে মেশে এবং বাঁদর-গোরিলাদের দলে যোগ দেয় সে সব কথা একে একে বলল। ফ্রান্সে সে কি কবেছিল তাও সব খুলে বলল।

জেন বলল, আমি থুরানের কথা বিশ্বাস করিনি। ওঃ, লোকটা কি ভয়ঙ্কর !

একদিন টারজন গাছেব উপর থেকে তাদের দিকে অগ্রসরমান একদল মানুষের গন্ধ পেল বাতাসে। লোকগুলো কাছে এলে টারজন দেখল তারা তারই দলের লোক আর তাদের সঙ্গে বাসুলি রয়েছে। তাদের দেখে তাদের সামনে জেনকে নিয়ে নেমে পড়ল। বাসুলিরা তাদের নেতা টারজনকে ফিরে পেয়ে আনন্দে নাচতে লাগল। জেনকে তার সঙ্গে দেখে তার কথা বাসুলি জিজ্ঞাসা করায় টারজন বলল, এর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

তখন জেনকে ঘিরেও ওরা নাচতে লাগল। তারপর তার দলের ওয়াজিরিদের সঙ্গে নিয়ে টারজন জেনরা যেখানে থাকত সেই মাচাটায় গিয়ে হাজির হলো।

টারজন দেখল ক্লেটনের অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ। তার দেহটা বিছানায় মিশে গেছে। চোখগুলো কোটরে ঢুকে গেছে। বাসুলিকে নদী থেকে জল আনতে বলল। ক্লেটনের অবস্থা দেখে জেনের চোখে জল এল। টারজন বলল, আমাদের আসতে বড় দেরী হয়ে গেছে। যাই হোক দেখি কি করতে পারি।

বাসুলি জল নিয়ে এলে সেই জল ক্লেটনের চোখে মুখে ও কপালে দিয়ে কিছুটা জল তার মুখের ভিতর ঢেলে দিল। ক্লেটন এবার চোখ মেলে তাকিয়ে টারজনকে দেখতে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলো। টারজন বলল, আর ভয় নেই। আমরা তোমাকে আবার ভাল করে তুলব।

ক্লেটন বলল, আর আমি ভাল হব না। আমি মারা যাব। তবু তোমরা এসেছ ভালই হয়েছে।

জেন জিজ্ঞাসা করল, থুরান কোথায় ?

ক্লেটন বলল, শয়তানটা আমাকে একা ফেলে রেখে চলে গেছে। প্রবল জ্বরের ঘোরে তার কাছে আমি একটু পিপাসার জল চেয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার সামনে নিজে জল খেয়ে বাকি জলটা ফেলে দেয়।

সহসা উত্তেজনার বশে কনুই-এর উপর ভর দিয়ে উঠে বসল একবার ক্লেটন। বলল, হ্যাঁ বাঁচব। তাকে মেরে তবে মরব।

টারজন বলল, তার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। আমি তার সঙ্গে বোঝাপড়া করব।

ক্লেটন আবার বিছানায় ঢলে পড়ল।

সন্ধ্যের দিকে ক্লেটন জেনকে ডেকে বলল, আমি তোমাদের উপর অবিচার করেছি জেন। তোমার প্রতি আমার ভালবাসার খাতিরে আমার অন্যায় আশা করি ক্ষমা করবে তুমি। যেকথা অনেক আগে তোমায় বলা উচিত ছিল আমার সে কথা একটি বছর ধরে বলিনি তোমায়।

এই বলে সে তার কোটের পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করে জেনের হাতে দিল। তার খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। জেন তার মাথাটা তার হাতের উপর তুলে নিল। কিন্তু মাথাটা ঢলে পড়ল, তার দেহটা শক্ত ও স্থির হয়ে গেল।

ক্লেটনের মৃতদেহটার তুপাশে তুজনে নতজানু হয়ে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করল। তারপর তুজনেই উঠে দাঁড়াল। টারজনের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল। চোখে জল নিয়েই জেন কাগজটা খুলে দেখল সেটা একটা টেলিগ্রাম। দার্ণৎ সেটা ফ্রান্স থেকে টারজনকে পাঠিয়েছিল। তাতে লেখা আছে, তোমার আঙুলের ছাপগুলো এই কথাই প্রমাণ করে যে তুমিই লর্ড গ্রেস্টোক।—ইতি দার্ণৎ

কাগজটা টারজনের হাতে দিয়ে জেন বলল, কথাটা সে জানলেও তোমাকে বলেনি ?

টারজন বলল, আমি একথা জানতাম জেন। উইসকনসিনের স্টেশনেই আমি এই টেলিগ্রামটা পাই। আমি সেখানেই এটা ফেলে এসেছিলাম। পরে ক্লেটন এটা পায়।

জেন বলল, কিন্তু এটা জানার পর তুমি আমাদের বলেছিলে, এক বাঁদর-গোরিলা তোমার মা আর তুমি তোমার বাবা কে তা জান না।

টারজন বলল, বলেছিলাম কারণ তোমাকে ছাড়া পদমর্যাদা ও ভূসম্পত্তির কোন প্রয়োজন অনুভব করিনি আমি।

পরদিন সকালে তার কেবিনের পথে যাত্রা শুরু করল টারজন। চারজন ওয়াজিরি ক্লেটনের মৃত-দেহটাকে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল। টারজনের ইচ্ছা কেবিনের ধারে তার পিতার সমাহিত কঙ্কালের পাশে ক্লেটনকে সমাহিত করা হবে।

টারজনের মানবতাবোধ ও মমতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল জেন।

মাইল তিনেক পথ অতিক্রম করেই কেবিনের কাছাকাছি এসে পড়ল ওরা। সহসা টারজনের দলের লোকেরা একজন বুড়ো লোকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল টারজনের। ইতিমধ্যে জেন বুড়ো লোকটিকে চিনতে পেরে ছুটে গেল তার দিকে। 'বাবা' বলে চীৎকার করতে লাগল সে।

জেনের কণ্ঠস্বর শুনে তার পানে তাকালেন অধ্যাপক পোর্টার। হারানো মেয়েকে দীর্ঘদিন পরে ফিরে পেয়ে আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। তারপর টারজনকে সশরীরে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। তিনি বুঝতে পারলেন না তাঁর মাথা ঠিক আছে কি না। কারণ অনেক আগেই তিনি জেনের বনদেবতা টারজনের মৃত্যুসংবাদ শুনেছেন।

ক্লেটনের মৃত্যুসংবাদ শুনে সত্যিই তুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেন অধ্যাপক পোর্টার। তিনি বললেন, মঁসিয়ে থুরান অনেকদিন আগেই খবরটা দিয়েছিল আমাদের।

টারজন বলল, থুরান'কোথায় ?

অধ্যাপক বললেন, কেবিনে। সে-ই ত আমাদের কেবিনে নিয়ে যায়। সে তোমাদের দেখে খুব খুশি হবে।

টারজন বলল, চরম বিস্মিতও হবে।

এবার ওরা কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল সবাই মিলে। কেবিনে তখন অনেক লোক আনাগোনা করছে। টারজন সেখানে গিয়েই প্রথমে দার্ণৎকে

দেখে আশ্চর্য হয়ে বলল, পল, একি তুমি এখানে কি করছ?

দার্ণৎ বুঝিয়ে বলল, কিভাবে এই উপকূলভাগের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কেবিনটা দেখে নেমে পড়ে। কেবিনটাকে দেখার বড় ইচ্ছা হয় তার।

জেন টারজনকে একসময় বলল, মঁসিয়ে থুরান যাকে রোকোফ বলছ, মিস্টার টেনিংটনের সঙ্গে সে বেড়াতে গেছে, তোমাকে দেখে সে দারুণ বিস্মিত হবে।

টারজন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কিন্তু তার বিস্ময়টা বড়ই ক্ষণস্থায়ী হবে।

তার এই কণ্ঠস্বর শুনে ভয় পেয়ে গেল জেন। বলল, জঙ্গলের নিয়ম আর সভ্য জগতের নিয়মকানুন এক নয় প্রিয়তম। ওকে তুমি নিজে না মেরে ক্যাপ্টেন দাফ্রেনের হাতে তুলে দাও। আইনে ওর যা শাস্তি হয় হবে। তুমি নিজের হাতে ওকে মারলে সবাই তোমাকে দোষ দেবে গ্রেপ্তার করতে বলবে। আমি তোমাকে আর হারাতে পারব না।

জেনের কথাটা মেনে নিল টারজন। এমন সময় জঙ্গল থেকে টেনিংটন আর থুরান নামধারী রোকোফ বেড়াতে বেড়াতে ফিরছিল কেবিনের দিকে। টারজনকে প্রথম টেনিংটন দেখল। টারজনের চোখে চোখ পড়তেই রোকোফের মুখটা ভয়ে সাদা হয়ে গেল।

টেনিংটন কিছু বুঝতে পারার আগেই রোকোফ তার বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরে টারজনকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করল। তার হাতটা টলতে থাকায় গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে টারজনের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। দ্বিতীয়বার গুলি করার জন্য রোকোফ প্রস্তুত হতেই টারজন এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বন্দুকটা ছিনিয়ে নিল।

গুলির আওয়াজ শুনে কেবিন থেকে সবাই বেরিয়ে এল। টারজন নীরবে ক্যাপ্টেন দাফ্রেনের

হাতে রোকোফকে সমর্পণ করল। রোকোফের সব কথা আগেই ক্যাপ্টেনকে বলে রেখেছিল।

জেন এবার জাহাজমালিক লর্ড টেনিংটনের সঙ্গে টারজনের পরিচয় করিয়ে দিল। টারজনই লর্ড গ্রেস্টোক একথা শুনে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল লর্ড টেনিংটন। দার্ণৎ তাকে টারজনের পূর্বজীবনের সব কথা বুঝিয়ে বলল।

বিকেলের দিকে কেবিনের পাশে টারজনের বাবা জন ক্লেটনের সমাধির কাছে ক্লেটনকে সমাহিত করা হলো।

তারপর টারজন ক্যাপ্টেন দাফ্রেনকে দিনকতক অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করল। বলল, দূর বনের ভিতরে তার কিছু জিনিসপত্র আছে। সেগুলো সে ওয়াজিরিদের সাহায্যে নিয়ে আসবে।

এই বলে তখনি চলে গিয়ে পরদিন বিকালেই এসে পড়ল টারজন। ওয়াজিরিদের সাহায্যে সোনার তালগুলো সব মাটির তলা থেকে নিয়ে এসে জাহাজে তুলে দিল। খাঁটি সোনার তালগুলো দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। কিন্তু কোথা থেকে কি করে পেয়েছে তা কাউকে বলল না টারজন।

পরদিনই জাহাজ ছাড়ার কথা ছিল। দার্ণৎরা যে জাহাজে করে এসেছিল সেই সামরিক জাহাজটা করেই ওরা সবাই আপাততঃ ফ্রান্সে যাবে।

কিন্তু তার আগে টারজন জেনকে একসময় বলল, আমার বড় ইচ্ছা, কেবিনেই আমাদের বিয়েটা অনুষ্ঠিত হোক। এই কেবিনেই আমার জন্ম হয়, এখানেই আমার বাবা মা দুজনেই মারা যান। এখানেই আমার কৈশোর আর যৌবনের অনেকখানি কেটেছে। এটাই আমার বাড়ি।

জেন বলল, খুব ভাল হবে।

একথা শুনে সকলেই একবাক্যে সমর্থন করল তাদের।

টারজনের সঙ্গে জেনের বিয়েটা হয়ে যাবার পর টেনিংটনের একান্ত ইচ্ছানুসারে হেজেলের সঙ্গে তার বিয়েটাও হয়ে গেল।

অবশেষে প্রস্থানসময় উপস্থিত হলো। নব দম্পতিদের ও আর সকলকে নিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। ওয়াজিবিরা কূলে দাঁড়িয়ে বারবার হাত নাড়িয়ে তাদের মালিকদম্পতিকে বিদায় দিল। টারজনও জেনকে পাশে নিয়ে জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে তার বিশ্বস্ত ওয়াজিরিবন্ধু ও সহচরদের হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

— ॥ —

লর্ড গ্রেস্টোক একদিন যে 'বাঁদরদলের রাজা' নামে পরিচিত ছিল তখন প্যারিসে তার বন্ধু লেফটেন্যান্ট পল দার্ণতের বাড়িতে বসে ছিল। সে তখন ভাবছিল তার শত্রু রোকোফের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। তারই সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এই রোকোফের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

টারজন বলল, আমি নিজের জন্য ভাবি না পল। অতীতে তার অনেক কু-অভিসন্ধিই ব্যর্থ করেছি আমি। আমার যতদূর মনে হয় সে আমাকে কাবু করতে না পেরে আমার স্ত্রী পুত্রের মাধ্যমেই আমার উপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে এখন। তাই আমাকে ফিরে গিয়ে বাড়িতে থাকতে হবে রোকোফ আবার ধরা না পড়া পর্যন্ত।

টারজন যখন এইভাবে তার বন্ধুর সঙ্গে প্যারিসে বসে কথা বলছিল ঠিক সেই সময়ে লণ্ডনের এক বাড়িতে দুজন কুটিলদর্শন লোক কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। তাদের মধ্যে একজনের মুখে ছিল বড় দাড়ি আর একজনের মুখে ছিল মাত্র কয়েকদিনের অল্প দাড়ি।

কম দাড়িবিশিষ্ট লোকটি দাড়িওয়ালা লোকটিকে বলল, তোমার দাড়িটা কামিয়ে ফেলতে হবে এ্যালেক্সি। তা না হলে ওরা তোমায় চিনে ফেলবে।

এখন আমাদের এখানেই ছাড়াছাড়ি হবে। এরপর যখন আমাদের কিনসেড জাহাজে দেখা হবে তখন আমাদের সম্মানিত অতিথি দুজনও এসে পড়বেন যাদের জন্য আমাদের এই সমুদ্রযাত্রার পরিকল্পনা।

রোকোফ বলল, আমাদের চেষ্টা সফল হলে তাতে আমাদের লাভ আর আনন্দ দুই-ই হবে। ফরাসীরা কী বোকা! আমার পালিয়ে যাবার খবরটা জেল কর্তৃপক্ষ গোপন রেখেছে। তার ফলে আমার পরিকল্পনাটা কার্যকরী করার প্রচুর সুযোগ পেয়েছি আমি। এখন বিদায়।

এর তিন ঘণ্টা পরই প্যারিসে পল দার্ণতের বাসায় একখানা টেলিগ্রাম এসে হাজির হলো। টারজন সেটা পড়ে দার্ণতের হাতে দিয়ে বলল, পড়ে দেখ পল।

পল পড়ে দেখল, তাতে লেখা আছে, নতুন চাকরের যোগসাজসে কে আমাদের বাগানবাড়ি থেকে জ্যাককে চুরি করে নিয়ে গেছে। অবিলম্বে চলে এস।—জেন।

লণ্ডনের বাড়িতে গিয়ে টারজন তার স্ত্রীর সঙ্গে কিছুক্ষণ এখন কি করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ তাদের লাইব্রেরী ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠল।

ওদিক থেকে ফোনে বলে উঠল, কে লর্ড গ্রেস্টোক?

টারজন বলল, হ্যাঁ।

আপনার ছেলে চুরি হয়েছে? আমি আপনার ছেলের উদ্ধারের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি। আমি জানি কারা তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তবে একটা শর্তে আমি আপনার ছেলেকে উদ্ধার করে দেব। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে জড়াবেন না।

টারজন জিজ্ঞাসা করল, কোথায় এবং কখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

ওপার থেকে উত্তর এল, ডোভারের বন্দরের কাছে নাবিকদের বিশ্রামাগারে। আজ রাত্রেই দশটার

সময় চলে আসুন। আপনার ছেলে ততক্ষণ নিরাপদেই থাকবে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা বিভাগকে কোন কথা জানাবেন না এবং এবিষয়ে আমি লক্ষ্য রাখব। যদি আপনার সঙ্গে কেউ থাকে তাহলে আমি দেখা করব না আপনার সঙ্গে এবং তার ফলে আপনার সন্তানের উদ্ধারের শেষ আশাটিও নির্মূল হয়ে যাবে।

কথাটা তার স্ত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে জানাল টারজন। তার স্ত্রী জেন তার সঙ্গে যাবার জন্য জেদ ধরল। টারজন বলল, অচেনা লোকটি বারবার আমাকে একা যেতে বলেছে।

কথাটা বলেই তৎক্ষণাৎ ডোভারের পথে রওনা হলো টারজন। সে চলে যাওয়ার পর জেন তাদের লাইব্রেরী ঘরে চিন্তিত মনে পায়চারি করতে লাগল। তার কেবলি ভয় হতে লাগল ছেলে উদ্ধারের নাম করে টারজনকে আবার বিপদে ফেলবে না ত? বলা যায় না, তার স্বামী আর সন্তান একই সঙ্গে দুজনকেই শয়তান রোকোফের কবলে ফেলার চক্রান্ত চলছে না ত?

জেন আর স্থির থাকতে পারল না। সে ঠিক করল টারজনের পিছু পিছু সেও যাবে ডোভারে।

ডোভারে সমুদ্রের কাছে সেই নির্দিষ্ট বাড়িটায় গিয়ে টারজন যখন পৌঁছল তখন রাত্রি ন'টা পঁয়তাল্লিশ বাজে। দুর্গন্ধওয়ালা একটা ঘরে টারজন ঢুকতেই একটা লোক এসে টারজনকে বলল, আসুন স্যার।

লোকটাকে আগে কখনো দেখেছে বলে মনে হলো না টারজনের। লোকটা যে আসলে ছদ্মবেশী রোকোফের সহকারী ও সহচর পলভিচ সেকথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি টারজন।

টারজন বলল, আমার ছেলে কোথায়?

লোকটা বলল, ঐ যে একটা ছোট জাহাজে আলো দেখা যাচ্ছে ঐটাতে আছে। জাহাজটার নাম কিনসেড।

টারজন বলল, ঠিক আছে চল সেখানে।

টারজনকে সঙ্গে করে কিনসেড নামে ছোট জাহাজটাতে নিয়ে গিয়ে লোকটা বলল, ডেকের তলায় এই ঘরটাতে আছে। আপনি নেমে যান ঘরটার মধ্যে।

টারজন তার ছেলেকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরটার মধ্যে নেমে গেল আর মুহূর্তের মধ্যে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে শিকল দিয়ে দিল লোকটা। টারজন এবার বুঝতে পারল ছলনা করে তাকে ঘর থেকে টেনে এনে বন্দী করল রোকোফ।

এমন সময় টারজন দেখল জাহাজটা ছেড়ে দিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই নারীকণ্ঠের এক ভয়ার্ত চীৎকার শুনে টারজনের মত সাহসী লোকের বুকেও হিমশীতল ভয়ের একটা শিহরণ খেলে গেল।

টারজন সেই লোকটার সঙ্গে কিনসেড জাহাজে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেন একটা গাউন পরে আর মাথায় ওড়না দিয়ে নাবিকদের সেই বাড়িটাতে হাজির হলো। গিয়ে দেখল দশ বারোজন নাবিক সেখানে বসে জটলা পাকিয়ে গল্প করছে। জেন তাদের একজনকে বলল, ভাল পোশাকপরা লম্বা একজন ভদ্রলোক এখানে এসে একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন?

নাবিকটি বলল, হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগে তিনি একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঐ জাহাজটার দিকে চলে গেলেন।

জেন দেখল দুটো লোক একটা নৌকোয় করে জাহাজটায় গিয়ে উঠছে। তখন সে লোকটাকে বলল, তুমি আমাকে একটা নৌকোয় করে ঐ জাহাজটায় নিয়ে চল। তোমাকে আমি দশ পাউণ্ড দেব।

লোকটা তখন জেনকে নৌকোয় করে জাহাজে তুলে দিলে জাহাজটা ছেড়ে দিল। কিন্তু কোন কেবিনেই লোক দেখতে পেলো না। অবশেষে শেষ প্রান্তে একটা কেবিনের দরজা একটু ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। ভিতরে একজন লোক ছিল। সে জেনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জোর করে তাকে ধরে টেনে এনে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

জেন চিনতে পারল লোকটা নিকোলাস রোকোফ। জেনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, নিকোলাস রোকোফ! মঁসিয়ে থুরান!

সঙ্গে সঙ্গে জেন জোরে চীৎকার করে উঠল এবং সেই ভয়ার্ত চীৎকারটা টারজন তার ঘর থেকে শুনে চমকে উঠল।

রোকোফ বলল, এখন নয়, জাহাজটা কূল থেকে অনেকটা দূরে চলে গেলে তবে চীৎকার করবেন।

এই বলে সে জেনের ঠোঁটের উপর তার হাতটা চাপা দিল। মাথাটা নত করে বলল, আমি হচ্ছি আপনার ভক্ত এবং গুণগ্রাহী।

রোকোফের কথায় কান না দিয়ে জেন বলল, হায়, আমার ছেলে, সে কোথায়? এত নিষ্ঠুর তুমি কি করে হতে পারলে নিকোলাস রোকোফ? বল সে কোথায়? সে কি জাহাজেই আছে? আমাকে আমার ছেলের কাছে দয়া করে নিয়ে চল।

রোকোফ বলল, আমার কথামত আপনি যদি কাজ করেন তাহলে আপনার ছেলের কোন ক্ষতি হবে না।

এই কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা তালাবন্ধ করে দিল। এরপর পর পর দুদিন রোকোফকে দেখতে পায়নি জেন। এই সময়ের মধ্যে জেন শুধু একটা সুইডেনবাসী লোককে দেখতে পেল। লোকটা খাবার সময় তাকে খাবার দিয়ে যেত।

টারজন তখনো পর্যন্ত বুঝতে পারেনি জেনও এই জাহাজেই বন্দী হয়ে আছে। যে নাবিকটা জেনকে খাবার দিয়ে যেত, সেই নাবিকটাই টারজনকেও খাবার দিত। টারজন লোকটা তার ঘরে এলেই তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করত। কিন্তু কোনক্রমেই কোন কথা বলত না লোকটা।

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। কিন্তু বন্দীরা কেউ বুঝতে পারল না। তাদের কোথায় নিয়ে গিয়ে কি করা হবে।

জেনকে সেই ঘরটায় বন্দী করে তালাবন্ধ করে রাখার কয়েকদিন পর রোকোফ একদিন দেখা করল জেনের সঙ্গে। বলল, আমাকে যদি একটা মোটা অঙ্কের চেক দাও তাহলে তোমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে তোমায় ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।

কিন্তু জেন বলল, তুমি আমার ছেলে ও স্বামীকে যদি কোন সভ্য দেশের বন্দরে নামিয়ে দাও তাহলে তুমি যা চাইছ তার দ্বিগুণ স্বর্ণমুদ্রা তোমাকে দেব। তা করার আগে তোমাকে একটা কপর্দকও দেব না।

রোকোফ বলল, আমার কথামত যদি চেক না দাও তাহলে তুমি বা তোমার স্বামী বা সন্তান কেউ কোন সভ্য দেশে কোনদিন নামতে পারবে না।

জেন বলল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।

রোকোফ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তোমাকে যা বলছি তাই করো। মনে রেখো, তোমার ছেলে আমার হাতে। যদি তুমি তোমার ছেলের আর্ত চীৎকার শোন তাহলে বুঝতে পারবে তোমার গোঁড়ামির জন্যই তোমার ছেলে কষ্ট পাচ্ছে।

অবশেষে জেন একটা মোটা টাকার চেক লিখে রোকোফের হাতে দিল আর রোকোফ মুখে এক তৃপ্তির হাসি নিয়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

পরদিন পলভিচ টারজনের ঘরে গিয়ে দেখা করল তার সঙ্গে। সে টারজনকে বলল, লর্ড গ্রেস্টোক, আপনি দীর্ঘকাল ধরে রোকোফের সঙ্গে শত্রুতা করে আসছেন এবং তার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আপনার জন্যই তাকে অনেক টাকা খরচ করে এই জাহাজ ভাড়া করতে হয়েছে। সুতরাং এর খরচ আপনাকেই বহন করতে হবে। তাহলে আপনার স্ত্রী ও সন্তান তাদের অশুভ পরিণাম থেকে মুক্ত হবে এবং আপনাকেও মুক্তি দেওয়া হবে।

টারজন বলল, কত টাকা তোমরা চাও? তোমরা যে তোমাদের চুক্তি মেনে চলবে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? তোমাদের মত শয়তানকে বিশ্বাস করাও ত মুস্কিল।

পলভিচ বলল, আমাদের এভাবে অপমান করবেন না। আমরা কথা দিচ্ছি এটাই যথেষ্ট। আমরা আপনাকে এখনি হত্যা করতে পারি, কিন্তু তাতে আপনাকে শাস্তি দেওয়ার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

টারজন বল, একটা কথার উত্তর দাও। আমার ছেলে কি এই জাহাজেই আছে?

পলভিচ বলল, না, আপনার ছেলে অন্যত্র নিরাপদেই আছে। আপনি আমাদের দাবি মানতে অস্বীকার করলে আপনাকে হত্যা করা হবে আর আপনাকে হত্যা করা হলেই আপনার ছেলেকেও হত্যা করতে হবে। সুতরাং আমার কথামত চেকটা লিখে দিয়ে আপনার নিজের জীবন ও আপনার ছেলের জীবন রক্ষা করুন।

টারজন বলল, ঠিক আছে। কত টাকা চাও?

পলভিচ বিরাট একটা টাকার পরিমাণ বলল। টারজন তখন চেকে একটা মোটা টাকার অঙ্ক লিখে দিল। কিন্তু অত টাকা তার ব্যাঙ্কে ছিল না।

টারজন চেকটা পলভিচের হাতে দিয়ে বাইরে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল অদূরে জঙ্গলঘেরা তীর দেখা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে জাহাজটা উপকূলে গিয়ে ভিড়ল।

জঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে পলভিচ বলল, ওইখানে আপনাকে মুক্তি দেওয়া হবে।

পলভিচ টারজনের হাত থেকে চেকটা নিয়ে তাকে বলল, নাও, তোমার পোশাকটা খুলে ফেল। কারণ জঙ্গলে পোশাকের কোন দরকার হবে না।

জাহাজ থেকে একটা নৌকোয় করে টারজনকে নামিয়ে দেওয়া হলো। নাবিকরা টারজনকে কূলে রেখে জাহাজে ফিরে আসার জন্য নৌকোটা ছেড়ে দেবার সময় টারজনের হাতে একটা চিঠি দিয়ে গেল। নৌকোটা চলে গেলে টারজন কূলে দাঁড়িয়ে দেখল জাহাজের ডেকে রোকোফ তার ছেলেটাকে দুহাতে করে মাথার উপর তুলে ধরে টারজনকে দেখাচ্ছে। টারজন তখন বুঝল বিরাট ভুল করেছে সে। ভেবেছিল এ জাহাজে তার ছেলে নেই।

টারজনের পিছনে তখন কতকগুলো ছোট বাঁদর কিচমিচ করছিল। টারজন আপন মনে বলল, থাক, একটা সান্ত্বনা, জেন এখন লণ্ডনে আছে। এই সব শয়তানদের কবলে সে এখনো পড়েনি।

পরে সে চিঠিটা খুলে যতই পড়তে লাগল ততই রোকোফদের চক্রান্তের ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার কাছে। চিঠিটাতে লেখা ছিল, তোমার সম্বন্ধে আমার আসল মতলবটা কি তা এই চিঠিটা পড়ে বুঝতে পারবে। তুমি একদিন জঙ্গলে জন্তু জানোয়ারের মত নগ্নদেহে বাস করতে। কিন্তু তোমার সন্তান তা করবে না। সে প্রথম থেকে মানুষের সমাজে মানুষের মতই বেড়ে উঠত। কিন্তু তাকে সে সুযোগ দেওয়া হবে না। সে নরখাদক এক বর্বর আদিবাসীদের সমাজে পরনে কৌপীন, পায়ে তামার গয়না আর নাকে আংটি পরে তাদের মত বেড়ে উঠবে। আমি তোমাকে হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করতে পারতাম। কিন্তু তাতে যে শাস্তি তুমি ভোগ করেছ এতদিন আমার হাতে সে শাস্তি দীর্ঘায়িত হত না এতখানি। অথচ এমন একটা জায়গায় তোমাকে নির্বাসন দেওয়া হলো যেখান থেকে তুমি তোমার ছেলেকে উদ্ধার করার কোন চেষ্টাই করতে পারবে না। রোকোফের বিরুদ্ধে

যাওয়ার এই হলো শাস্তি। ইতি—নিকোলাস রোকোফ।

চিঠিটা পড়া শেষ করেই নিজের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল টারজন। সে ঘুরে দেখল এক দুর্ধর্ষ পুরুষ-গোরিলা তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়ে উঠেছে।

টারজন দেখল শুধু একটা নয় প্রায় ডজনখানেক বাঁদর-গোরিলা তার পিছনে রয়েছে। কিন্তু সে বুঝল সব বাঁদর-গোরিলাগুলো একসঙ্গে আক্রমণ করবে না। তাদের দলের রাজা হিসাবে একটা গোরিলাই তাকে আক্রমণ করবে।

আক্রমণকারী বাঁদর-গোরিলাটা তাকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসতেই টারজন আগের মত সরাসরি তাকে না ধরে সে তার তলপেটে একটা জোর ঘুষি মেরে দিল। গোরিলাটা ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে। সে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াতেই টারজন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টারজন এবার তার সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো গোরিলাটার লোমশ ঘাড়ের উপর বসিয়ে দিল। গোরিলাটা কামড়াতে এলে টারজন এমন একটা জোর ঘুষি মেরে দিল যে তার মুখটা ভেঙ্গে গেল।

অন্য গোরিলাগুলো টারজনদের চারপাশে দাঁড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ হৃদয়ে তাদের লড়াই দেখতে লাগল। অবশেষে টারজন যখন তাদের রাজার ঘাড়টা মটকে দিল তখন তার শব্দটা শুনতে পেল তারা। তখন তার নিস্পন্দ দেহটার উপর দাঁড়িয়ে উপর দিকে মুখ তুলে চীৎকার করে তার বিজয়-উল্লাস প্রকাশ করল টারজন।

টারজন বুঝল, এরপর গোরিলাদের মধ্য থেকে আর একজন তার কাছে এসে যুদ্ধের আহ্বান জানাবে। হলোও ঠিক তাই। একজন বলিষ্ঠ যুবক গোরিলা টারজনের দিকে এগিয়ে এসে গর্জন করতে থাকলে টারজন বলল, কে তুমি, বাঁদরদলের রাজা টারজনকে ভয় দেখাচ্ছ?
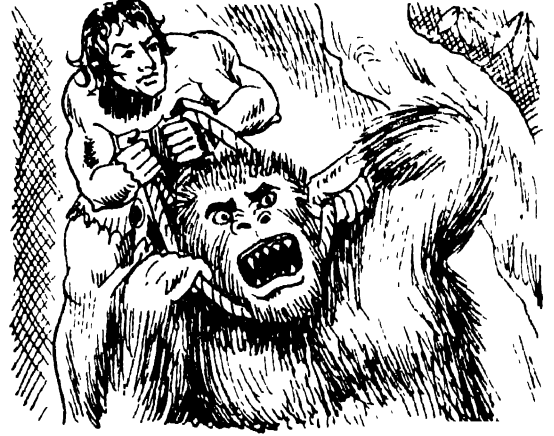
গোরিলাটা বলল, আমি হচ্ছি আকুৎ। মোনাক মারা গেছে। এখন আমিই হচ্ছি রাজা। এখান থেকে চলে যাও, তা না হলে খুন করব তোমায়।

টারজন বলল, তুমি দেখেছ কত সহজে আমি মোনাককে মেরেছি। আমি যদি রাজা হতে চাইতাম তাহলে আমি তোমাকেও মারতে পারতাম। কিন্তু টারজন আকুৎদের দলের রাজা হতে চায় না। আমি তোমাদের বন্ধু হয়ে শান্তিতে এদেশে বাস করতে চাই।

আকুৎ বলল, তুমি আকুৎকে মারতে পারবে না। আকুতের সমান শক্তিশালী কেউ নেই।

একথার কোন উত্তর না দিয়ে টারজন আকুতের একটা হাতের কব্জি ধরে হাতটা জোরে ঘুরিয়ে তাকে ফেলে দিল। টারজন তাকে প্রাণে বধ না করে হার মানাতে চাইল শুধু। তাই সে ঘাড়টার উপর চাপ দিয়ে বলল, কা গোদা? অর্থাৎ হার মানছ?

আর একটু চাপ দিলেই আকুতের ঘাড়টা ভেঙ্গে যেত। আকুৎ বলল, কা গোদা অর্থাৎ হার মেনেছি।

টারজন তার ঘাড়টা এবার ছেড়ে দিয়ে বলল, যাও, আমি রাজা হব না, তুমিই হবে রাজা। যদি তোমাকে কেউ বাধা দেয় তাহলে তোমাকে সাহায্য করব।

আকুৎ ধীরে ধীরে উঠে তার দলের কাছে চলে গেল।

এবার টারজন দেখল তার একটা অস্ত্র চাই।

এরপর দিনকতক ধরে অস্ত্র তৈরীর কাজে মন দিল টারজন। মরা হরিণের চামড়া দিয়ে তার ধনুকের ছিলা তৈরী করল আর তার কৌপীন তৈরী করতে লাগল। সেই সঙ্গে শুকনো ঘাস দিয়ে একটা লম্বা দড়ি তৈরী করল। সে একটা তূণ আর বেল্টও তৈরী করল।

একদিন পথে যেতে যেতে টারজন গাছের উপর বসেছিল কিছুক্ষণের জন্য। হঠাৎ সে বাতাসে একদল বাঁদর-গোরিলার গন্ধ পেল। আবার দেখল যে গাছটায় সে বসে আছে সেই গাছেরই নিচের ডালে একটা চিতাবাঘও আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে টারজন দেখল বাঁদর-গোরিলাদের দলটা সেই গাছটার কাছে এসে পড়েছে এবং তাদের নেতা আকুৎ সেই গাছের তলায় গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। ঠিক সেই সময় চিতাবাঘটা আকুতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত হচ্ছে।

কিন্তু চিতাটা সামনের পা দুটো তুলতেই টারজন তার পাথরের ছুরিটা তার গায়ে বসিয়ে দিয়ে তার ঘাড়ে একটা জোর কামড় দিল। আকুৎ উপর দিকে তাকাতেই বুঝতে পারল ব্যাপারটা। এখন চিতাটা আর টারজন দুজনেই গাছ থেকে মাটিতে পড়ে গেল। টারজন তখন তার পাথরের ছুরিটা বারবার বসাতে লাগল চিতাটার গায়ে। অবশেষে লুটিয়ে পড়ে গেল চিতাটা। তার উপর দাঁড়িয়ে টারজন বিজয়গর্বে একটা বিকট চীৎকার করে উঠল।

টারজন এবার আকুৎকে লক্ষ্য করে বলল, আমি হচ্ছি বাঁদরদলের টারজন। বিরাট শক্তিশালী যোদ্ধা। কিছুদিন আগে আকুতের প্রাণ নিতে নিতে বাঁচিয়ে দিই। আজ চিতার কবল থেকে তাকে রক্ষা করলাম। তোমরা বিপদে পড়লে টারজনকে ডাকবে। আর টারজন যদি কখনো বিপদে পড়ে তোমাদের ডাকে তাহলে তোমরা সবাই ছুটে আসবে। বুঝলে ত?

আকুৎ ও তার দলের সবাই একযোগে বলল, হুঁ।

এরপর তখনকার মত ওদের সঙ্গেই রয়ে গেল টারজন। একযোগে সকলে মিলে শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

একদিন পথে যেতে যেতে টারজন দেখল একটা বিরাট গাছ পড়ে গেছে আর তার একটা বড় ডালের নিচে একটা চিতাবাঘ চাপা পড়ে যন্ত্রণায় চীৎকার করছে।

টারজন ইচ্ছা করলেই চিতাটাকে মেরে ফেলতে পারত তখনি। কিন্তু সে ভাবল সে যখন একটু চেষ্টা করলেই তাকে তার জীবন আর স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে পারে তখন কেন সে তা করবে না? টারজন কাছে যেতেই মুক্তির আশায় তার পানে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল চিতাটা। টারজনের চেষ্টায় ডালটা তার দেহের উপর থেকে উঠে যাওয়ায় সে এবার মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

টারজন ভেবেছিল, চিতাটা মুক্ত হয়েই হয়ত আক্রমণ করবে তাকে দাঁত বার করে। কিন্তু টারজন তার পাশ দিয়ে যখন চলে যাচ্ছিল তখন সে কিন্তু তাকে কামড়াতে এল না। উল্টে তার পিছু পিছু পোষা কুকুরের মত আসতে লাগল।

বিকালের দিকে চিতাটা টারজনের কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে বসেছিল শিকারের আশায়। টারজন ছিল একটা গাছের ডালে বসে। গাছের তলায় একটা হরিণকে আসতে দেখেই টারজন তার ঘাসের দড়ির ফাঁসটা হরিণটার

গলায় আটকে দিল। তারপর 'শীতা শীতা' বলে চিতাবাঘটাকে ডাকতে লাগল। বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায় চিতাবাঘকে শীতা বলে।

টারজনের ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঝোপঝাড় ভেঙ্গে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল চিতাটা। ঝাঁপিয়ে পড়ল হরিণটার উপর। হরিণটা মরে গেলে টারজন গাছ থেকে নেমে এসে দুজনে মিলে তার মাংস খেতে লাগল। এরপর থেকে তাদের দুজনের একজন কোন শিকার পেলেই আর একজনকে তা না দিয়ে খেত না।

একদিন টারজন আর তার সঙ্গী চিতাবাঘটা পথে যেতে যেতে আকুতের গোরিলাদলটার কাছে এসে পড়ল। চিতাবাঘটাকে দেখেই আকুৎরা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু টারজন তাদের সাহস দিয়ে ডাকতেই কাছে এল তারা।

একদিন একদিকে চিতাবাঘটা আর একদিকে আকুৎ তার দলবল নিয়ে শিকার করতে গিয়েছিল। টারজন তখন একা একা সমুদ্রের ধারে বেলাভূমির উপর চিৎ হয়ে শুয়েছিল। সে একমনে কি ভাবছিল।

এমন সময় কোথা থেকে একদল নিগ্রো যোদ্ধা টারজনের কাছে এসে পড়ে তাকে লক্ষ্য করতে থাকে। তারা খুব কাছে এসে পড়ায় তাদের পদশব্দ শুনে চমকে উঠে পড়ে সে। নিগ্রো যোদ্ধারাও তাকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হয়ে ওঠে।

টারজন উঠেই তার হাতের লাঠিটা দিয়ে মাথায় জোর আঘাত করে একজন নিগ্রোকে মেরে ফেলল। তখন অন্যান্য নিগ্রোরা ভয়ে বিহ্বল হয়ে সরে গেল কিছুটা। কিন্তু এরপর ওরা টারজনকে তিন দিক হতে ঘিরে ফেলে তার উপর একসঙ্গে অনেকগুলো বর্শা ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল।

টারজন দেখল তার পিছনেই সমুদ্র এবং একমাত্র এই দিকটা দিয়েই পালাতে পারে সে। কিন্তু হঠাৎ

তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে জোরে অদ্ভুত একটা শব্দ করে কাদের ডাকতে লাগল।

এমন সময় কোথা থেকে ঝোপঝাড় ভেঙ্গে একদল বাঁদর-গোরিলা আর একটা চিতাবাঘ ছুটে এসেই একযোগে আক্রমণ করল নিগ্রোদের। নিগ্রোদের বর্শার ঘায়ে কয়েকটা বাঁদর-গোরিলা মারা গেল। কিন্তু ক্ষতি হলো নিগ্রোদেরই বেশী।

টারজন অবশেষে দেখল, মাত্র একজন নিগ্রো যোদ্ধা নিরাপদে পালিয়ে গেল সমুদ্রের কূলের দিকে। সেখানে একটা নৌকো ছিল। বাকি সব নিগ্রো যোদ্ধা মারা গেছে। তাদের মৃতদেহগুলো চিতাটা আর বাঁদর-গোরিলাগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছিল।

টারজনের কি মনে হতে পলাতক নিগ্রোযোদ্ধাটার পিছু পিছু গিয়ে অনুসরণ করতে লাগল তাকে। লোকটা নৌকোটার কাছে যেতেই পিছন থেকে টারজন বলল, আমি তোমাকে মারব না যদি তুমি আমাকে এই দ্বীপটা থেকে অন্যত্র চলে যেতে সাহায্য করো।

মুগাম্বি বলল, হ্যাঁ, সাহায্য করব। কিন্তু তুমি আমার দলের সব লোকদের মেরে ফেলেছ। দাঁড় বাইবার কোন লোক নেই। কি করে নৌকো নিয়ে যাব ?

টারজন দেখল, লোকটার স্বাস্থ্যটা খুবই বলিষ্ঠ এবং দৈত্যের মত। তাকে হাতে রাখতে পারলে অনেক কাজ হবে তাকে দিয়ে। সে তাকে বলল, এখন এস আমার সঙ্গে।

মুগাম্বি যখন দেখল টারজন তাকে সেই ভয়ঙ্কর জন্তুগুলোর দিকে নিয়ে যাচ্ছে তখন সে ভয়ে পিছু হটতে লাগল।

কিন্তু টারজন তাদের সকলকে শান্ত করে মুগাম্বির ভয় ভাঙ্গিয়ে দিল।

সেদিন টারজন, মুগাম্বি, শীতা আর আকুৎ এই চারজনে মিলে একটা হরিণ শিকার করল। মুগাম্বি আগুন জ্বেলে তার ভাগের মাংস পুড়িয়ে খেল। কিন্তু টারজন ও আর সকলে কাচা মাংস খেল। তারপর মুগাম্বিকে নিয়ে এখান থেকে মূল মহাদেশে যাবার একটা পরিকল্পনা খাড়া করল টারজন।

টারজনের কথায় মুগাম্বির হুঁস হলো। সে বুঝতে পারল, এ জায়গাটা আসলে একটা ছোট দ্বীপ। সারা দ্বীপটাই জঙ্গলে ভরা। তবে মূল মহাদেশটা এই দ্বীপটা থেকে খুব বেশী দূরে নয়।

টারজন ঠিক করে ফেলল মুগাম্বি আর তার কিছু পশু অনুচরদের সঙ্গে করে নৌকোটা করে মূল মহাদেশে চলে যাবে।

অবশেষে একদিন সে মুগাম্বি, আকুৎ, তার বারো-জন বাঁদর-গোরিলা আর শীতা বা চিতাবাঘটাকে সঙ্গে করে নৌকোটা ভাসিয়ে দিল সমুদ্রে।

এইভাবে ক্রমাগত দশ ঘণ্টা যাওয়ার পর ওরা বনভূমি ঘেরা কূল দেখতে পেল। কিন্তু তখন সন্ধ্যার অন্ধকার অনেকটা ঘন হয়ে ওঠায় ওরা উগাম্বি নদীর মোহানাটা দেখতে পেল না।

নৌকোটা কূলে ভিড়তেই ওরা নেমে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল নৌকোটাকে।

টারজন কিন্তু চুপ করে বসে থাকতে পারল না। সে মুগাম্বিকে সঙ্গে নিয়ে উগাম্বি নদীটা খুঁজতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা একটা বড় নদী দেখতে পেল। সেখান থেকে মাইলখানেক গিয়ে ওরা সেই মোহানাটা দেখতে পেল যেখানে নদীটা সমুদ্রে পড়েছে।

মোহানার কাছে গিয়ে টারজন গতকালকার সেই নৌকোটা দেখতে পেল যেটাকে স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মুগাম্বি বলল, এইটাই আমাদের উগাম্বি নদী। নদীতে তখন ভাটা চলছিল। তবু ওরা নৌকোটাতে উঠে উজান বেয়ে অতি কষ্টে মোহানার উল্টো দিকে এগিয়ে গেল। টারজন ভাবল আগে প্রথমে ওর দলের কাছে গিয়ে দলের সবাইকে নৌকোয় উঠাবে। তারপর মুগাম্বিকে নিয়ে ওদের গাঁয়ে গিয়ে রোকোফের খোঁজ করবে। তার ধারণা রোকোফ বেশীদূর জাহাজে করে তার ছেলেকে নিয়ে যাবে না।

যাই হোক, সকলকে নিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠল টারজন। দুপুরের দিকে আহার আর বিশ্রামের জন্য বনের ধারে নদীতীরে এক জায়গায় নৌকো থামানো হলো। তখন কিছুটা দূরে গাছের আড়াল থেকে একটা নগ্ন আদিবাসী ওদের দেখেই ছুটে ওদের গাঁয়ে গিয়ে খবর দেয়। বলে, আবার একজন শ্বেতাঙ্গ একটা নৌকোয় করে কয়েকজন যোদ্ধা নিয়ে আমাদের গাঁয়ের দিকে আসছে।

ওদের গাঁয়ের নেতার নাম ছিল কাভিরী। এই গাঁয়েই কিছুদিন আগে দাড়িওয়ালা এক শ্বেতাঙ্গ অর্থাৎ রোকোফ এসে খুব খারাপ ব্যবহার করে যায়। তাই আর কোন শ্বেতাঙ্গকে ওদের গাঁয়ে আসতে দিতে চায় না কাভিরী। সে ঢাক বাজিয়ে গাঁয়ের যোদ্ধাদের ডাক দিতে বলল। তারপর বড় বড় বর্শা আর

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যোদ্ধারা সাতটা ডিঙ্গিতে গিয়ে উঠল। কাভিরী উঠল অন্য একটা ডিঙ্গিতে।

কিছুদূর নদীপথে যাওয়ার পর কাভিরী তার নৌকো থেকে যখন টারজন আর তার পশুসঙ্গীদের দেখল তখন সে ভয় পেয়ে গেল।

দেখতে দেখতে কাভিরীদের নৌকোগুলো চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল টারজনদের নৌকোটাকে।

নিগ্রোদের নৌকোগুলো টারজনের নৌকোটার খুব কাছে আসতেই টারজন আকুৎ আর শীতাকে কি বলল। সঙ্গে সঙ্গে তারা নিগ্রোদের দুটো নৌকোতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা কয়েকজন নিগ্রো যোদ্ধাকে কামড়ে ঘায়েল করে দিল। কয়েকজন মারা গেল।

টারজন বুঝতে পারল কাভিরীই নিগ্রো যোদ্ধাদের দলনেতা। সে তাই তাকে প্রাণে মারতে চাইল না। সে বেঁচে থাকলে তার থেকে কিছু খবরাখবর পাওয়া যেতে পাবে। কাভিরী আহত ও অচেতন হয়ে নৌকোর পাটাতনের উপর পড়ে গেলে সে তার হাত পা বেঁধে ফেলল। যে কয়জন নিগ্রো যোদ্ধা বন্দী হয়েছিল তাদেরও হাত পা বেঁধে দিল।

কাভিরীর চেতনা ফিরে এলে সে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল তার পাশে দৈত্যাকার এক নগ্নপ্রায় শ্বেতাঙ্গ আর একটা বিরাট আকারের চিতাবাঘ থাবা গেড়ে বসে আছে। টারজন তাকে বলল, তোমার লোকদের কাছ থেকে জানতে পারলাম তোমার নাম কাভিরী।

কাভিরী বলল, হ্যাঁ।

টারজন বলল, কেন তুমি আমাদের আক্রমণ করতে এলে ?

কাভিরী বলল, কিছুদিন আগে অন্য এক শ্বেতাঙ্গ আমাদের গাঁয়ে আসে। আমরা তাকে অনেক উপহার দিয়ে খাতির করলেও সে তার বন্দুক দিয়ে আমাদের কিছু লোককে হত্যা করে আমাদের গাঁয়ের কয়েকজন পুরুষ ও নারীকে ধরে নিয়ে যায়।

টারজন জিজ্ঞাসা করল, তার সঙ্গে একটা ছেলে ছিল ?

কাভিরী বলল, না মালিক। একটা শ্বেতাঙ্গ ছেলে ছিল অন্য দলে।

টারজন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, অন্য দল। কোন্ দল ?

কাভিরী বলল, দুর্বৃত্ত শ্বেতাঙ্গটা আসার তিনদিন আগে আর একটা দল এসেছিল। সেই দলে ছিল একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা, একটা ছেলে আর দু'জন মুসলমান নাবিক। তারা মনে হয় সেই দুর্বৃত্ত শ্বেতাঙ্গটার দল থেকে পালিয়ে আসে। তাই দুর্বৃত্ত শ্বেতাঙ্গটা তাদের খোঁজ করছিল। এই দলটা একটা নৌকো করে এই নদী দিয়ে পালিয়ে যায়।

টারজন বুঝতে পারল পলাতক দলটির মধ্যে যে ছেলেটি ছিল সে-ই জ্যাক, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও মহিলা কে তা বুঝতে পারল না।

টারজন আর কাভিরীর নৌকো দুটো কাভিরীদের গাঁয়ের কাছে এসে পড়তেই নৌকো থেকে নেমে পড়ল তারা। কাভিরীদের গাঁয়ে এসে টারজন কিছু খাবার খেয়ে কাভিরীর কাছ থেকে তার নৌকো চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ডজনখানেক লোক চাইল।

কাভিরী বলল, লোক দেব কি বাওনা, আমি ছাড়া গাঁয়ে আর একটি লোকও নেই।

কাভিরী টারজনের সব কথা মেনে নিতে রাজী ছিল, কারণ সে ভাবছিল টারজন তার যত সব ভয়ঙ্কর সঙ্গীদের নিয়ে যত তাড়াতাড়ি তাদের গাঁ থেকে চলে যায় ততই ভাল। কিন্তু টারজনের পশুসঙ্গীদের দেখে গাঁয়ের সবাই জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল গাঁ ছেড়ে। যে দু'চারজন কাভিরীর কাছে ছিল তারাও টারজনের কথা শুনে জঙ্গলে পালিয়ে গেল।

টারজন বলল, ঠিক আছে কাভিরী, আমি তোমার পাশে লোকদের সব এনে দিচ্ছি।

এই বলে সে মুগাম্বিকে কাভিরীর কাছে রেখে শীতা আর বাঁদর-গোরিলাদের নিয়ে জঙ্গলে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল টারজন পালিয়ে যাওয়া লোকদের ভেড়ার পালের মত তাড়িয়ে নিয়ে এল। এবার কাভিরীর সামনে টারজন দাঁড়িয়ে বলল, তোমার সব লোক এসে পড়েছে। এবার তুমি আমার সঙ্গে কারা যাবে তাদের বাছাই করে দাও।

কাভিরী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে তার লোকদের ডাকল। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না তার ডাকে।

টারজন তখন কাভিরীকে বলল, তোমার কথায় কেউ রাজী না হলে ওদের বলে দাও আমি আবার জন্তুদের লেলিয়ে দেব তাদের পিছনে।

এই কথা শুনে গাঁয়ের অনেক লোক কাভিরীর চারপাশে এসে দাঁড়াল। কাভিরী তাদের মধ্যে থেকে বারোজন লোককে বাছাই করে তাদের যেতে বলল টারজনের সঙ্গে। লোকগুলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও টারজনের নৌকোয় গিয়ে বসল।

একদিন নৌকো থেকে নদীর ধারে নেমে টারজন মুগাম্বি আর আকুৎকে তার পরিকল্পনার কথাটা বুঝিয়ে বলল। বলল, একজন শ্বেতাঙ্গ নৌকোয় করে এই পথেই পালাচ্ছে। তাকে ধরতে চায় সে। কিন্তু আদিবাসীরা তাদের দেখে পালাচ্ছে বলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না। তাই সে একাই ওদের গাঁয়ে গিয়ে খোঁজ করতে চায়।

ওদের কূলের উপর রেখে টারজন বলল, দু-একদিনের মধ্যেই তোমাদের কাছে ফিরে আসব আমি।

এই বলে বনের মধ্যে দিয়ে একাই চলে গেল টারজন।

টারজন ভেবে পেল না কিভাবে গাঁয়ে গিয়ে যোগাযোগ করবে লোকগুলোর সঙ্গে। অবশেষে সে একটা বুদ্ধি খাটাল। গাছের উপর পাতার আড়াল থেকে চিতাবাঘের মত জোর একটা গর্জন করল সে। তখন গাঁয়ের লোকেরা গেটের কাছে ছুটে এসে গাছটার দিকে তাকাতে লাগল। টারজন তখন গাছ থেকে নেমে আদিবাসীদের ভাষায় বলল, আমাকে তোমাদের গাঁয়ের মধ্যে ঢুকতে দাও। আমি একজন শ্বেতাঙ্গ, তোমাদের বন্ধু। অন্য যে একজন শ্বেতাঙ্গ এখানে এসে তোমাদের অত্যাচার করেছিল তাকে ধরে আমি শাস্তি দিতে চাই।

গাঁয়ের লোকগুলো গেটটা খুলে দিতেই টারজন ভিতরে ঢুকে গাঁয়ের সর্দারকে রোকোফের কথা জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু সে যা বলল তার সঙ্গে কাভিরীর কথা মিলল না। গাঁয়ের সর্দার বলল, রোকোফ নামে শ্বেতাঙ্গটা তাদের গাঁয়ে একমাস

ছিল। তবে দ্বিতীয় দলটার কথা দুজনেরই এক হলো। রোকোফের আগেই একটা দল আসে। সে দলে এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, এক শ্বেতাঙ্গ মহিলা, এক শিশু আর কয়েকজন মুসলমান মালবাহী কুলী ছিল।

গাঁয়ের সর্দার রাতে শোবার জন্য একটা কুঁড়ে ঘর ছেড়ে দিতে চাইল। কিন্তু টারজন বলল, আমি গাঁয়ের বাইরে ঐ গাছতলাটায় ঘুমোব। তবে আমার দলের লোকরা আগামীকাল নৌকোয় করে এখানে এসে পড়বে। দলে কতকগুলো জন্তু থাকলেও তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না। সঙ্গে মুগাম্বি নামে একজন নিগ্রো আদিবাসীও থাকবে।

টারজন কিন্তু ঘুমোল না গাছতলাটায়। সেই রাতেই উগাম্বি নদীর ধারে ধারে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল। পথে দু-একটা আদিবাসী বস্তী দেখতে পেল। তাদের কাছ থেকে জানতে পারল রোকোফ এই পথেই গেছে।

দুদিন এইভাবে যাওয়ার পর উগাম্বি নদীর ধারে একটা বড় গাঁয়ে এসে উঠল টারজন। কিন্তু সে গাঁয়ের সর্দারকে দেখে নরখাদক বলে মনে হলো তার। লোকটাকে দেখে ভাল না লাগলেও অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ায় কিছু আহার ও বিশ্রামের জন্য কয়েক ঘণ্টা কাটাতে চাইল সে সেখানে। তবে সে বুঝল সর্দারটা মুখে তাকে খাতির করলেও ভিতরে ঘৃণা অনুভব করছে তার প্রতি।

টারজন অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা কুঁড়ে ঘরের পাশের ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সর্দার টারজনের এই উপস্থিতির ব্যাপারটা একেবারে গোপন রাখল গাঁয়ের লোকদের কাছে। তারপর সে গোপনে জনকতক লোককে রোকোফকে খবর দেবার জন্য নদীর ধার দিয়ে পুব দিকে পাঠিয়ে দিল।

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই কতকগুলো ডিঙ্গি এগিয়ে আসতে লাগল গাঁয়ের ঘাটের দিকে। একটা নৌকোতে ছিল রোকোফ আর তার পাঁচজন শ্বেতাঙ্গ সহচর।

রোকোফ নৌকো থেকে নেমেই সর্দারকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার লোকরা যার কথা বলল, সেই শ্বেতাঙ্গ কোথায় ?

সর্দার বলল, আমাদের গাঁয়েতেই আছে। ঘুমোচ্ছে। সে তোমার বন্ধু না শত্রু জানি না। তবে সে তোমার খোঁজ করছিল।

সর্দারের পিছু পিছু রোকোফ আর তার দলের লোকেরা পা টিপে টিপে টারজন যেখানে ঘুমোচ্ছিল সেখানে গিয়ে হাজির হলো। সর্দার গিয়ে দেখল টারজন তখনো ঘুমোচ্ছে। রোকোফ দেখেই চিনতে পারল টারজনকে। এক কুৎসিত শয়তানি হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সর্দার যখন বুঝতে পারল ঘুমন্ত টারজন রোকোফের শত্রু তখন সে তার লোকদের টারজন জেগে ওঠার আগেই তার হাত পা বেঁধে ফেলার হুকুম দিল। টারজনকে রোকোফ বলল, শুয়োর কোথাকার! রোকোফের পথ থেকে দূরে সরে দাঁড়াবার মত সুবুদ্ধি এখনো আসেনি তোমার মাথার মধ্যে ?

এই কথা বলে টারজনের মুখে একটা লাথি মারল রোকোফ।

টারজন বলল, তোমাকে অভ্যর্থনা করার জন্যই সে বুদ্ধি আমার মাথায় আসেনি।

রোকোফ বলল, ঠিক আছে, আজ রাতে আমার নরখাদক ইথিওপ বন্ধুরা তোমাকে খেয়ে ফেলার আগেই তোমার স্ত্রী ও ছেলের কি অবস্থা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কি হবে বলবে তাকে।

যে গাঁটায় হাত পা বাঁধা অবস্থায় বন্দী ছিল টারজন সেই গাঁয়ের দিকে অন্ধকার বনভূমি নিঃশব্দ পদক্ষেপে পার হয়ে একটি চিতাবাঘ তার জ্বলন্ত চোখ দুটো নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। গন্ধ শুঁকে শুঁকে সে একটা কুঁড়ে ঘরের বাইরে এসে হাজির হলো। তারপর ঘরটার চালের উপর উঠে খড়পাতার ছাউনি সরিয়ে কিছুটা ফাঁক করে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

টারজনও এতক্ষণ একটা পরিচিত গন্ধ পেয়ে সচকিত হয়ে ওঠে। মেঝের উপর লাফিয়ে পড়ার পর টারজনের গা-টা শুঁকতে লাগল শীতা।

এমন সময় একজন নিগ্রো যোদ্ধা বাইরে উৎসবের জায়গাটা থেকে টারজনকে সেখানে তুলে নিয়ে যাবার জন্য ঘরে এসে ঢুকল। বাইরে তখন উৎসবের জন্য এক বিরাট প্রস্তুতি চলছিল গ্রাম-বাসীদের।

অন্ধকারে সে চিতা বাঘটাকে দেখতে পায়নি। সে বর্শা দিয়ে টারজনের গায়ে একটা আঘাত করতেই টারজন চীৎকার করে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে চিতাটা আদিবাসীটার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটা কামড়ে ধরল। লোকটা রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর। চিতাটার গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আহত লোকটার আর্তনাদ শুনতে পেয়ে উৎসব ছেড়ে বাইরের লোকরা ছুটে আসতে লাগল।

প্রথমে রোকোফের দলের দুজন শ্বেতাঙ্গ একটা টর্চ নিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখতে লাগল। আদি-বাসীরা ঘরের ভিতর তাদের একজনকে রক্তাক্ত ও ছিন্ন-ভিন্ন দেহে মরে পড়ে থাকতে দেখে দারুণ ভয় পেয়ে গেল। তারা ভয়ে ঘরের ভিতর কেউ ঢুকল না। এদিকে ঘরের দরজার সামনে অনেক লোক দেখে চিতাটা গর্জন করতে করতে লাফ দিয়ে চালের উপর উঠে সেই ফাঁকটা দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

রোকোফ তখন সর্দারকে বলল, এস, ওকে এবার বাইরে নিয়ে গিয়ে আমাদের কাজ শেষ করে ফেলি। তা না হলে আবার কোন বিপদ ঘটতে পারে।

চারজন নিগ্রো যুবক টারজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেই নাচের জায়গাটায় একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিল দাঁড় করিয়ে। রোকোফ এবার একজন আদিবাসীর হাত থেকে একটা বর্শা নিয়ে টারজনের দেহে আঘাত করতে গেল। কিন্তু সর্দার তার হাত থেকে বর্শাটা কেড়ে নিয়ে বলল, আমাদের প্রথামত নাচ না হওয়া পর্যন্ত কিছু করা চলবে না। তাছাড়া বন্দীকে আমরা মারব। আমাদের বিধিমত না চললে তোমারও ঐ অবস্থা করব।

রোকোফ সরে গেল। সে টারজনকে বলল, ঠিক আছে, নাচ হয়ে গেলে আমি নিজে তোমার হৃৎপিণ্ডটা খাব।

এবার নরখাদক আদিবাসীদের নাচ শুরু হলো। নাচ শেষ হয়ে এলে ওদের সর্দার প্রথমে তার বর্শার ফলা দিয়ে একটা খোঁচা দিল টারজনের গায়ে। সেই সময় জঙ্গলের ভিতর থেকে কার একটা চীৎকার শুনে টারজনও সাড়া দিল সেইভাবে।

আদিবাসীরা ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগল চারদিকে।

কিনসেড জাহাজ থেকে টারজনকে যখন নামিয়ে নৌকোয় করে জঙ্গলাকীর্ণ সেই দ্বীপটায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন একটা কেবিনের জানালা দিয়ে তা দেখতে পায় ক্লেটন। কিন্তু জায়গাটার নাম কি, কোথায়

নিয়ে যাওয়া হয় তা সে জানতে পারল না কোন-ক্রমেই। একমাত্র সেভেন এ্যাণ্ডারসন নামে একজন সুইডেনবাসী রাঁধুনী ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না। এ্যাণ্ডারসন রোজ দুবার করে খাবার দিয়ে যেত জেনের কেবিনে। তাকে জেন কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে সে শুধু ইংরিজিতে একটা কথাই বলত, 'আমার মনে হয় এরা শীগগির একটা অঘটন ঘটাবে।'

টারজনকে সেই দ্বীপটায় নামিয়ে দেবার তিন দিন পর কিনসেড জাহাজটা সমুদ্র থেকে উগাম্বি নদীর মুখে গিয়ে পড়ল।

সেইদিনই সেখানে জাহাজটাকে থামিয়ে রোকোফ জেনের কেবিনে এসে বলল, আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে এসে পড়েছি। এবার তোমাকে সহজেই মুক্তি আর নিরাপত্তা দুইই দেব। আর আমি তোমাকে ভালবাসি জেন। তুমি শুধু একবার হ্যাঁ বললেই তোমার ছেলেকে ফিরিয়ে দেব।

এবার জেন রোকোফকে বলল, আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি তোমার কথা শুনে। এতদিন তোমাকে একজন কাপুরুষ আর শয়তান বলে ভাবতাম, কিন্তু এখন দেখছি তুমি নির্বোধ।

রোকোফের চোখদুটো ছোট হয়ে গেল। রাগে আর লজ্জায় লাল হয়ে উঠল তার মুখখানা। সে জেনের দিকে কিছুটা এগিয়ে ভীতি প্রদর্শনের সুরে বলল, শেষে দেখা যাবে কে বোকা। তোমার সামনে যখন তোমার ছেলের বুকের ভিতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা উপরে নেওয়া হবে তখন বুঝবে নিকোলাস রোকোফকে অপমান করার অর্থ কি।

জেন বলল, তুমি ভয় দেখিয়ে আমাকে বশীভূত করতে পারবে না।

জেনের অনমনীয় মনোভাব দেখে আরো রেগে গেল রোকোফ।

কিন্তু রোকোফ দমে গেল না। উত্তেজনায় কাঁপছিল সে। জেনের দিকে সে ভয়ঙ্করভাবে এগিয়ে গিয়ে তার দুহাত দিয়ে গলাটা টিপে ধরল।

এমন সময় কেবিনের দরজাটা ঠেলে এ্যাণ্ডারসন জেনের খাবার নিয়ে ভিতরে ঢুকল। রোকোফ তাকে দেখেই বাধা পেয়ে চীৎকার করে উঠল, বিনা অনুমতিতে কেন তুমি ঘরে ঢুকলে? এখনি বেরিয়ে যাও, তা না হলে তোমাকে জলে ফেলে দেব।

এই কথা বলে রোকোফ ভয়ঙ্করভাবে এগিয়ে যেতেই এ্যাণ্ডারসন তার পোশাকের ভিতর লুকিয়ে রাখা ছুরিটা তার একটা হাত দিয়ে ধরতে গেল।

রোকোফ তা দেখে জেনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাকে আগামীকাল পর্যন্ত সময় দিলাম ভেবে দেখার জন্য। পলভিচ আর আমি ছাড়া এ জাহাজে ইতিমধ্যে কেউ থাকবে না। সকলকেই কূলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমরা ছাড়া এ জাহাজে থাকবে তুমি আর তোমার ছেলে।

রোকোফ কথাগুলো বলল ফরাসী ভাষায়। ভাবল এ্যাণ্ডারসন তা বুঝতে পারবে না। কথাটা বলেই কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল রোকোফ। এ্যাণ্ডারসন তখন জেনকে বলল, ও ভাবে আমি বোকা। কিন্তু আসলে ও-ই বোকা।

জেন আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি ওর কথা বুঝতে পেরেছ?

এ্যাণ্ডারসন বলল, হ্যাঁ। আমি বাইরে থেকেও ওর সব কথা শুনেছি। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। ও আমাকেও কুকুরের মত জ্ঞান করে। আমি আপনাকে সাহায্য করব।

কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে না পারলেও লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ জাগল জেনের। এত সব শত্রুদের মাঝে অন্ততঃ সহানুভূতিশীল একটা বন্ধুকে এতদিনে খুঁজে পেল সে।

সেদিন আর রোকোফের দেখা পেল না জেন। সন্ধ্যের সময় সেভেন এ্যাণ্ডারসন খাবার দিতে এল। তার উদ্ধারের ব্যাপারে জেন তার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাইলে সেভেন জেনকে বলল, আপনি আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখবেন, আমি এলেই বেরিয়ে পড়বেন।

জেন বলল, কিন্তু আমার ছেলে? তাকে ছাড়া আমি ত যেতে পারব না।

সেভেন বলল, আমি আপনাকে সাহায্য করছি। এর বেশী কিছু জানতে চাইবেন না।

কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা ঠেলে সেভেন এসে হাজির হলো। তার হাতে একটা পুঁটলি আর এক হাতে কাপড় ঢাকা কি একটা জিনিস। সেভেন সেটা জেনের হাতে দিয়ে বলল, এই নিন আপনার ছেলে। কোন শব্দ করবেন না।

কাপড়ঢাকা ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরল জেন। আনন্দে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার চোখ থেকে। আর দেরী না করে কেবিন থেকে বেরিয়ে মই বেয়ে জাহাজ থেকে নেমে নৌকোতে উঠে পড়ল। নৌকোতে উঠেই নৌকো ছেড়ে দিল সেভেন। নৌকোটা তীরবেগে ছুটে চলল উগাম্বি নদীর উপর দিয়ে।

রাত তিনটের সময় নদীর ধারে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় কতকগুলো কুঁড়ে ঘরের একটা আদিবাসী বস্তী দেখে সেইখানে নৌকো ভেড়াল এ্যাণ্ডারসন। জেনকে নৌকো থেকে নামিয়ে নৌকোটা একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল। তারপর দুজনে ঘরগুলোর দিকে এগিয়ে এল।

এ্যাণ্ডারসন বারকতক ডাকাডাকি করতেই সর্দার আর তার স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গাঁয়ের গেট খুলে দিল। এ্যাণ্ডারসন আদিবাসীদের ভাষায় সর্দারের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল। সর্দারের স্ত্রী তাদের থাকার জন্য একটা ঘর দিতে চাইল। কিন্তু ঘরটা নোংরা হবে ভেবে সে বলল, তারা বাইরেই শোবে।

সকালে ঘুম ভাঙ্গলে জেন দেখল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। আদিবাসী মেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে তার চারদিকে।

সর্দারের নির্দেশে আদিবাসীরা সবাই সরে গেল জেনের কাছ থেকে। এ্যাণ্ডারসন কিছুটা দূরে কথা বলতে লাগল সর্দারের সঙ্গে। জেন বুঝল এ্যাণ্ডারসনকে এর আগে যতখানি অযোগ্য ভেবেছিল ততখানি অযোগ্য সে নয়। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে তার যোগ্যতা আর বিচক্ষণতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছে। জেন দেখল ইংরিজি, ফরাসী আর পশ্চিম উপকূলের আদিবাসীদের ভাষায় ভালভাবেই কথা বলতে পারে এ্যাণ্ডারসন।

এমন সময় জেনের কোলে ছেলেটা কেঁদে উঠতেই কাপড়টা সরিয়ে তার মুখটা দেখল জেন। কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার মত চমকে উঠল ভয়ে। তারপরই সেখানে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

নিগ্রো যোদ্ধারা তখন সবাই ঘরটার পানে তাকিয়ে দেখল একটা চিতাবাঘ গর্জন করতে করতে এইদিকে আসছে। তার উপর টারজনের গলার স্বর

শুনে একদল বাঁদর-গোরিলা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের দিকে আসছে। গাঁয়ের সর্দারই প্রথমে গোরিলাদের নেতা আকুৎকে দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজে জঙ্গলের দিকে ভয়ে ছুটে পালাতে থাকে। তার দেখাদেখি গাঁয়ের অন্য সব লোকেরাও প্রাণভয়ে ছুটতে থাকে।

আকুৎ তার দলের গোরিলাদের নিয়ে টারজনের পাশে ছুটে এসে দাঁড়াল। তখন শীতাও এসে পড়েছে। টারজন তখন তার দুই পায়ের বাঁধনগুলো থেকে মুক্ত হতে চাইছিল। কিন্তু ওর কথা বাঁদর-গোরিলারা বা শীতা বুঝতে পারছিল না কেউ।

সারাটা রাত এইভাবে কেটে গেল। টারজন হাত পা বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে। গাঁ থেকে সব লোক পালিয়ে জঙ্গলে চলে গিয়েছিল। সকাল হতেই তারা আবার গাঁয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে মুগাম্বি এসে হাজির হলো। মুগাম্বি এসেই ছুরি দিয়ে টারজনের সব বাঁধন কেটে দিল। টারজন তখন মুগাম্বিকে সঙ্গে নিয়ে একটা মৃত আদিবাসীর বর্শাটা নিয়ে আদিবাসীদের তেড়ে গেল। আদিবাসীরা আগের থেকে আরো বেশী ভয় পেয়ে গেল। কয়েকজন আদিবাসী বন্দী হলো টারজনের হাতে।

তাদের কাছে টারজন জানতে পারল রোকোফ আগের দিন রাত্রিবেলাতেই তার শ্বেতাঙ্গ সহচরদের নিয়ে নৌকোয় করে পালিয়ে গেছে।

টারজন আর বৃথা লড়াই করল না। সে তার দলের সবাইকে নিয়ে নৌকোয় করে রোকোফের খোঁজে চলে গেল।

এবারেও টারজন দেখল কোন গাঁয়ে গেলে পশু-সঙ্গীদের ভয়ে কোন আদিবাসী কথা বলছে না তার সঙ্গে। সে তাই এক জায়গায় তার দলের সবাইকে মুগাম্বির হাতে ছেড়ে রেখে একাই বেরিয়ে পড়ল রোকোফের খোঁজে।

একদিন বনপথে যেতে যেতে একটা দৃশ্য দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল টারজন। একটা ঝোপের মধ্যে একজন অসুস্থ ও রুগ্ন শ্বেতাঙ্গ শুয়ে ছিল আর একজন নিগ্রো যোদ্ধা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল।

টারজন নিগ্রোটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার হাতের বর্শাটা কেড়ে নিল। নিগ্রোটা আত্মসমর্পণ না করায় টারজন তাকে মেরে ফেলল। তারপর দেখল এই শ্বেতাঙ্গটাই রোকোফের কিনসেড জাহাজে রাঁধুনীর কাজ করত। টারজন তাই ভাবল এও নিশ্চয় রোকোফের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিল এবং সব খবর জানে। লোকটার নাম সেভেন এ্যাণ্ডারসন।

টারজন তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, আমার স্ত্রী আর ছেলে কোথায় ?

সেভেন কাশছিল। তার বুকে তীরটা তখনো বিঁধে ছিল। তার বুক থেকে রক্ত ঝরছিল। কাশিটা থামলে সেভেন বলল, আমি তোমার স্ত্রী আর ছেলেকে রোকোফের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য পালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু রোকোফ এসে আমাদের ধরে ফেলে। আমাকে এইখানে ফেলে রেখে তারা চলে যায়। তোমার স্ত্রী ও ছেলে আবার ধরা পড়েছে তার হাতে। তুমি তার খোঁজে চলে যাও।

একটু আগে রাগের মাথায় তাকে হত্যা করতে যাচ্ছিল টারজন। কিন্তু এখন এবার সব কথা শুনে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তার কাছে ক্ষমা চাইল। কিন্তু সেভেন একবার জোর কেশে তখনি মারা গেল।

সেদিন সন্ধ্যা হতেই প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো। সাতদিন ধরে ঝড়বৃষ্টি সমানে চলতে লাগল।

সাতদিনের দিন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য উঠল আকাশে। কিন্তু টারজন কোন দিকে বোকোফের খোঁজে যাবে তা ঠিক করতে পারল না।

অনেক ভাবার পর অবশেষে উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। পরের দিন সে একটা আদিবাসী গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের লোকেরা ছুটে পালাতে লাগল। কিন্তু টারজনও ছাড়ল না। সে তাড়া করে একজন যুবককে ধরে ফেলল। যুবকটা তাকে দেখে এতখানি ভয় পেয়ে গেল যে সে তার হাত থেকে সব অস্ত্র ফেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল টারজনের পায়ের কাছে।

টারজনের অনেক প্রশ্নের উত্তরে নিগ্রো যুবকটি যা যা বলল তার থেকে বুঝতে পারল টারজন দিনকতক আগে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ এসেছিল। তারা বলে গেছে এক ভয়ঙ্কর শ্বেতাঙ্গ শয়তান পরে তাদের গাঁয়ে আসবে। তার সঙ্গে থাকবে একদল হিংস্র জন্তু।

কিন্তু টারজনের সঙ্গে কোন হিংস্র জন্তু জানোয়ার না দেখে সাহস হলো যুবকটির।

টারজন যুবকটিকে সঙ্গে করে তাদের গাঁয়ে চলে গেল।

ওদের সর্দারকে ডেকে আনাল। সে দেখল সর্দার লোকটা বেঁটে এবং বলিষ্ঠ চেহারার। তার মুখটা কুটিল প্রকৃতির। টারজন বুঝল এরাও নরখাদক। টারজনের প্রশ্নের উত্তরে সর্দার যা বলল তার থেকে বোঝা গেল একজন শ্বেতাঙ্গ দিনকতক আগে তাদের গাঁয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে কোন নারী বা শিশু ছিল না। এতে টারজনের সন্দেহ হলো সর্দার ঠিক বলছে না। তবু টারজন সে রাতটা তাদের গাঁয়েই কাটাবার কথা বলল।

সর্দার এ কথায় উৎসাহিত হয়ে তার একটা ঘর ছেড়ে দিল। কিন্তু সে ঘরে তার এক বুড়ী স্ত্রী ছিল। বুড়ীকে রাত্রিতে ঘর থেকে বার করে দিলে ঠাণ্ডায় কষ্ট হবে তার একথা ভেবে টারজন সেই ঘরে রইল না। সে অন্য ঘরে থাকার জন্য জেদ ধরলে তাকে অন্য একটা ঘর দেওয়া হলো।

সন্ধ্যাব পর যখন ওদের নাচ শুরু হলো এবং গাঁয়ের সবাই যখন উৎসবে মেতে ছিল তখন টারজন সেই কুঁড়ে ঘরটার মধ্যে একা বসে ভাবছিল। এমন সময় একটা বুড়ী চুপি চুপি সেই অন্ধকার ঘরটায় ঢুকে টারজনকে চুপি চুপি বলল, আমার নাম তম্বুদজা। আমি সর্দার মগনওয়াসামের প্রথমা স্ত্রী। আমার কথা শোন। ওরা তোমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়লেই ওরা তোমাকে হত্যা করবে।

মূর্ছিত জেন চেতনা ফিরে পেয়ে দেখল, ছেলেটাকে কোলে করে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এ্যাণ্ডারসন। তার মুখখানা বিষাদে ভরা।

জেন বলল, আমার ছেলে কোথায়? এ ছেলে

আমার নয়। তুমি তা জানতে। তুমিও রোকোফের মতই শয়তান।

এ্যাণ্ডারসন আশ্চর্য হয়ে বলল, তা ত জানি না। তাহলে নিশ্চয় দুটো ছেলে ছিল। কিন্তু আমি তার কিছুই জানতাম না।

তার কথা শুনে জেন বুঝতে পারল আসলে এ্যাণ্ডারসনের সততায় কোন সংশয় নেই। সে ঠিকই বলেছে।

এমন সময় এ্যাণ্ডারসনের কোলের মধ্যে শিশুটা কেঁদে উঠল। হাত বাড়িয়ে এ্যাণ্ডারসনের কাছ থেকে সেই অসহায় শিশুটাকে নিজের কোলে তুলে নিল জেন। হতাশার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটা আশা জাগল, হয়ত বা শেষ মুহূর্তে তার ছেলে জ্যাককে কেউ উদ্ধার করেছে রোকোফের হাত থেকে।

এ্যাণ্ডারসন বলল, এখন তাহলে কি করব আমরা? আমি কিনসেড জাহাজে ফিরে গেলে রোকোফ আমাকে গুলি করে মারবে। কিন্তু আপনি সেখানে ফিরে যেতে পারেন।

জেন বলল, না, আমি মৃত্যুবরণ করব, তবু তার কাছে আর ফিরে যাব না। তার থেকে এই অসহায় শিশুটাকে নিয়ে চল আমাদের সঙ্গে।

আবার তারা এগিয়ে যেতে লাগল।

পথে দু-একজন পথচারীর কাছ থেকে ওরা জানতে পারল একদল লোক তাদের সন্ধানে তাদের পিছনে পিছনে আসছে। তবে এখনো দূরে আছে।

যেতে যেতে এ্যাণ্ডারসন জেনকে বলল, মাইলখানেকের মধ্যেই একটা গাঁ আছে। আপনি সেখানে ছেলেটাকে নিয়ে চলে যান। গাঁয়ের সর্দারকে আপনি সব কথা বলবেন। সে আপনাকে জাহাজের ব্যবস্থা করে দেবে যাতে আপনি সভ্য জগতে চলে যেতে পারেন। আমি এইখানে থাকব। রোকোফকে বলব, আপনি মারা গেছেন। তাহলে ও আর আপনার খোঁজ করবে না। বিদায়, আপনি চলে যান। আমার এই রাইফেলটা আর গুলিগুলো নিয়ে যান।

এই বলে রোকোফের হাতে ধরা দেবার জন্য সেখান থেকে চলে গেল সেভেন এ্যাণ্ডারসন।

আধ ঘণ্টা পরে গাঁটায় পৌঁছল জেন। তাকে দেখে ঘিরে ধরল গাঁয়ের মেয়েরা। ছেলেটা হঠাৎ দারুণ অসুস্থ হওয়ায় সেকথা তাদের কোনরকমে বোঝাল জেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মাঝরাতের দিকে জেনের কোলের মধ্যেই মারা গেল শিশুটা।

এমন সময় গাঁয়ের সর্দার মগনওয়াজাম এসে জেনকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। লোকটাকে দেখে কুটিল প্রকৃতির বলে মনে হলো জেনের।

জেন শুনতে পেল গাঁয়ের গেটের কাছে কারা যেন এসেছে বাইরে থেকে। কথাবার্তার শব্দ আসছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনের কাছে এসে তার নাম ধরে কে ডাকল।
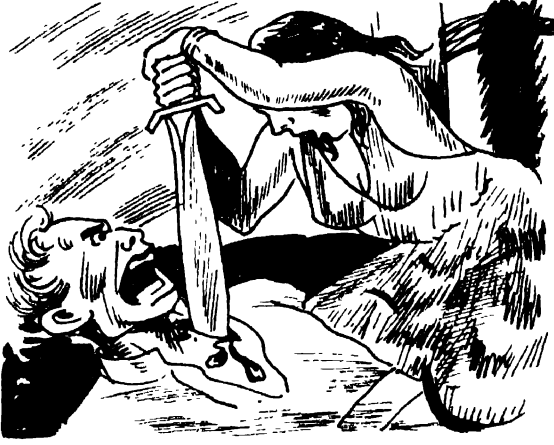
মুখ তুলে আগুনের আলোয় দেখল জেন, তার সামনে রোকোফ দাঁড়িয়ে আছে।

রোকোফ এসেই বলল, ছেলেটাকে এখানে আনার জন্য এত কষ্ট করে এখানে এলে কেন? তার থেকে আমাকে বললেই ত হত। এখন দাও ওকে আমার হাতে।

জেন নীরবে তার হাত থেকে ছেলেটাকে তুলে দিল রোকোফের হাতে। বলল, ও তোমাদের সব পীড়নের বাইরে চলে গেছে।

ছেলেটার মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে রোকোফ দেখল, সত্যি সত্যিই ছেলেটা মারা গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড রাগে জ্বলে উঠল রোকোফ।

তার রাগ দেখে জেন বুঝল এটা যে তার ছেলে নয় রোকোফ তা জানে না। না জানাটাই ভাল, তাহলে তার ছেলে যেখানেই থাক নিরাপদে থাকতে পারবে।

রোকোফ বলল, আমার কাছ থেকে ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিয়েছ। তা নাও, এবার তোমার পালা। তোমাকে নরখাদক মগনওয়াজামের হাতে তুলে দেব। তুমি হবে নরখাদকের স্ত্রী।

তারপর রোকোফ জেনকে সঙ্গে করে একজন আদিবাসীকে নিয়ে গাঁ পার হয়ে তার শিবিরের পথে যেতে লাগল।

শিবিরে গিয়ে জেন দেখল সেখানে কিসের গোলমাল চলছে। রোকোফ গিয়ে শুনল, তার দলের আরো কিছু লোক তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পালিয়ে গেছে শিবির থেকে। কথাটা শুনে রাগে চেঁচামিচি করতে লাগল রোকোফ। পরে জেনের হাত ধরে টানতে টানতে তার ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল রোকোফ। জেন বাধা দিলে তার মুখে একটা ঘুষি মারল রোকোফ।

হঠাৎ এই সময় ঘরের বাইরে কিসের গোলমাল হতে রোকোফ জেনের উপর থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে বাইরে সেই দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। সেই অবসরে জেন চোখের পলকে রোকোফের বন্দুকটা টান মেরে হাতে নিয়ে তার বাঁট দিয়ে রোকোফের মাথায় সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল রোকোফ। জেন তখন রোকোফের কোমর থেকে লম্বা ছুরিটা দিয়ে তাই নিয়ে তাঁবুর পিছনের খানিকটা কেটে তার পালাবার পথ করে নিল।

এদিকে বুড়ী তম্বুদজা টারজনকে সঙ্গে করে রোকোফের তাঁবুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। রোকোফের তাঁবুতে গিয়ে দেখল সেখানে খুব গোলমাল চলছে।

সেইদিন সকালে জেন চলে যাওয়ার পর রোকোফের জ্ঞান ফিরে এলে সে দেখে সে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল এতক্ষণ এবং জেন পালিয়ে গেছে শিবির থেকে। এমন সময় মগনওয়াজামের গাঁ থেকে দূত মারফৎ খবর আসে টারজন ঐ গাঁয়ে আটক ছিল এবং আজ রাতেই তাকে হত্যা করা হত, কিন্তু সে পালিয়ে যায় এবং হয়ত এই শিবিরেই সে আসবে রোকোফের সন্ধানে।

এই খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোকোফের নিগ্রো ভৃত্যরা সব টারজনের আসার খবর পেয়েই শিবির থেকে অনেক জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে গেল।

শিবিরে রয়ে গেল শুধু রোকোফ আর তার সাতজন শ্বেতাঙ্গ নাবিক।

এই সব অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য রোকোফ কিন্তু তার শ্বেতাঙ্গ নাবিকদের দায়ী করতে লাগল। এতে নাবিকরা সবাই বিদ্রোহী হয়ে ওঠায় রোকোফ শিবির ছেড়ে পালিয়ে যাবে ঠিক করে ফেলল। শিবির থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় সে দেখতে পায় শিবিরের সামনে দিয়ে টারজন তারই খোঁজে আসছে। তাতে তার ভয় আরো বেড়ে যায়।

এদিকে বুড়ী তম্বুদজার সঙ্গে শিবিরে এসে টারজন দেখল রোকোফ বা জেন কেউই সেই শিবিরে নেই। নাবিকদের কাছ থেকে জানতে পারল, বন্দিনী মহিলাটি আগেই পালিয়ে যায়। রোকোফ পালায় তার পরে।

টারজন তখন যেপথে তারা পালিয়েছে সেই পথ ধরে বেরিয়ে পড়ল তাদের খোঁজে।

টারজন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেপথে যাচ্ছিল সেই পথেই তার সামনে অনেক দূরে জেন তখন একা উগাম্বি নদীর ঘাটের দিকে এগিয়ে চলছিল।

নদীর ঘাটে গিয়ে জেন দেখল একটা নৌকো কাছেই একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। দড়িটা খুলে নৌকোতে উঠতে গিয়ে হঠাৎ তার চোখ পড়ল রোকোফ নদীর পাড়ে এসে পড়েছে এবং সে তাকে থামতে বলছে এবং ভয় দেখাচ্ছে না থামলে তাকে গুলি করে মারবে। অথচ জেন দেখল সে একা এবং তার কাছে কোন অস্ত্র নেই।

নৌকোটা নদীর স্রোতের টানে ছুটে যেতে শুরু করতেই জেন দেখতে পেল রোকোফ কোথা থেকে একটা ছোট ডিঙি নৌকো বার করল ঘাটের পাশ থেকে। জেন বুঝতে পারল রোকোফ ঐ নৌকোটা করে ধরতে আসবে তাকে। রোকোফের হাতে আবার ধরা পড়ার ভয়েতে প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড় বাইতে লাগল জেন।

রোকোফের শিবির থেকে বেরিয়ে বনপথে উগাম্বি নদীর দিকে আসতে আসতে মাঝপথে তার দলের সঙ্গে দেখা হলো টারজনের। কিন্তু তারা জেন বা রোকোফের কথা কিছু বলতে পারল না। অথচ টারজন বাতাসের গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারল কিছু আগে জেন আর রোকোফ দুজনেই এই পথে নদীর দিকে গেছে।

তখন টারজন ওদের সঙ্গে করে নদীর ধারে এল। নদীর পারে একটা গাছের উপর চড়ে টারজন দেখতে পেল দূরে একটা ছোট নৌকোয় রোকোফ একা দাঁড় বাইছে। টারজন তখন নদীর ধারে ধারে রোকোফকে লক্ষ্য করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। রোকোফের কাছাকাছি এসে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। তার দলের সবাই নদীর ধারে ধারে এগিয়ে চলল।

এদিকে টারজনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত মনে হতে লাগল রোকোফের। সে দেখল টারজনের সঙ্গে সেই সব ভয়ঙ্কর জন্তুগুলোও রয়েছে।

নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে রোকোফের নৌকোর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল টারজন। নৌকোর কাছে গিয়ে নৌকোটাকে হাত বাড়িয়ে ধরতেই রোকোফ দাঁড়ের কাঠটা দিয়ে টারজনের মাথায় জোর একটা ঘা দিল আর এমন সময় একটা কুমীর টারজনের একটা পা ধরে তাকে জলের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। রোকোফ দেখল টারজন হঠাৎ জলে ডুবে গেল। সে তখন নৌকোটাকে জোরে চালাতে লাগল। তবু তার ভয় গেল না।

ক্রমে রোকোফের নৌকোটা কিনসেড জাহাজের কাছে এসে পড়ল। জাহাজটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে দেখে আশা হলো তার।

ক্ষিপ্ত হাতে দাঁড় বেয়ে জাহাজের কাছে এসে নৌকোর উপর থেকে ডাকতে লাগল পলভিচকে। কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিল না। মনে হলো জাহাজে কোন লোক নেই। এদিকে নদীর পাড়ে সেই ভয়ঙ্কর জন্তুগুলো তখনো গর্জন করছিল। তার ভয় হলো নিগ্রোটা হয়ত কোন নৌকো যোগাড় করে জাহাজে গিয়েও তাকে ধরবে।

কিন্তু কোথায় গেল পলভিচ? তবে কি ওরা জাহাজে কেউ নেই।

তবু সাহসে ভর করে জাহাজের কাছে দাঁড় বেয়ে গিয়ে জাহাজের গায়ে লাগানো মইটাকে ধরে ফেলল রোকোফ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের ডেকের উপর থেকে রাইফেল হাতে জেন চীৎকার করে বলল, খবরদার, জাহাজে ওঠার চেষ্টা করলেই গুলি করে মারব। রোকোফ এবার জেনকে কোনরকম ভয় না দেখিয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করল। কিন্তু তাকে কিছুতেই জাহাজে উঠতে দিল না জেন।

রোকোফ তখন কোন উপায় না দেখে নৌকো-টাকে কোনরকমে জাহাজের কাছে ফেলে রেখে কূলের দিকে চলে গেল।

এর আগে রোকোফ জেনের নৌকোটা ধরার জন্য খুব জোরে দাঁড় বাইতে থাকলেও জেন তার থেকে দু ঘণ্টা আগেই অপেক্ষমান কিনসেড জাহাজটাতে গিয়ে ওঠে। সেও জাহাজটাকে দেখে আশান্বিত হয়ে ওঠে। ভাবে রোকোফ এখন সে জাহাজে না থাকায় নাবিকদের টাকা দিয়ে বশ করে সে জাহাজটাকে সভ্যজগতের কোন বন্দরে নিয়ে যেতে বলবে।

তখন নৌকো থেকেই জাহাজের গায়ে ঝুলতে থাকা শিকলটা ধরে ফেলল জেন। তারপর নৌকো-টাকে ছেড়ে দিয়ে কোনরকমে মইটাতে উঠে পড়ল। সোজা ডেকের উপর উঠে গিয়ে জেন দেখল সারা জাহাজটার মধ্যে দুজন নাবিক ছাড়া আর কেউ নেই। তারা মদ খেয়ে নেশার ঘোরে একটা কেবিনের মধ্যে ঘুমোচ্ছিল। জেন দরজায় শিকল তুলে দিয়ে ডেকের উপর বসে রাইফেল হাতে পাহারা দিতে লাগল।

একঘণ্টা নিরাপদে কেটে গেল। কিন্তু এমন সময় জেন দেখল কিনসেড জাহাজের যেসব নাবিক কয়লা আনার জন্য কূলে গিয়েছিল তারা কূল থেকে একটা নৌকোয় করে উজান বেয়ে জাহাজের দিকে আসছে। তাদের দলে পলভিচও ছিল। জেন এবার ভয় পেয়ে গেল।

জেন আরও দেখল নদীর অপর পার হতে একটা নৌকোয় করে পাঁচটা ভয়ঙ্কর বাঁদর-গোরিলা, একটা চিতা বাঘকে সঙ্গে করে একটা নিগ্রো যোদ্ধা এদিকেই আসছে।

এখানে আর থাকা যুক্তিসঙ্গত নয় ভেবে নাবিক দুটোকে কেবিন থেকে মুক্ত করে জাহাজ ছেড়ে দেবার কথা বলল। তার কথা না শুনলে তাদের গুলি করবে বলে ভয় দেখাল। তারা জাহাজ ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলে জেন আবার ডেকে এসে পাহারা দিতে লাগল।

এদিকে নাবিকদুটো যখন জাহাজের উপর থেকে

দেখল তাদের মালিক আর অন্য নাবিকরা একটা নৌকোয় করে জাহাজের দিকে আসছে তখন তারা সাহস পেল। তখন তারা অতর্কিতে জেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিল।

টারজন যখন দেখল একটা কুমীরে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখন সে তার পাথরের ছুরিটা কুমীরের পেটটার নরম অংশ দেখে তার মধ্যে বারবার ঢুকিয়ে দিতে লাগল।

টারজন দেখল কুমীরটা তার ছুরির আঘাতে হাঁপাচ্ছে এবং কিছু পরেই তার দেহটা শক্ত হয়ে গেল। সে যখন বুঝল কুমীরটা মারা গেছে তখন টারজন নদীর ধারে যে গাছের একটা ডাল জলের উপর ঝুলে পড়ে ছিল সেটা ধরে সেই গাছটার উপর উঠে পড়ল।

গাছটার উপর কিছুক্ষণ বসে থেকে বিশ্রাম করতে লাগল টারজন। সে দেখল নদীর যে পার থেকে সে ঝাঁপ দিয়েছিল জলে সেই পারেই সে উঠেছে। তবে রোকোফের নৌকোটাকে আর দেখতে পেল না। গাছ থেকে নেমে কিছু ঘাস থেঁতো করে পায়ের ক্ষতস্থানটায় লাগিয়ে দিল।

নানারকমের চিন্তা হচ্ছিল তখন তার মনে। তম্বুদজা তাকে কথায় কথায় একসময় বলেছিল তাদের গাঁয়ে জেনের কোলে যে একটা বাচ্চা ছেলে ছিল সেটা মারা যায়। টারজন ভাবল সেটা হয়ত তারই ছেলে। আবার ভাবল আসলে হয়ত সে জেন নয় এবং ছেলেটাও তার নয়। জেন হয়ত রোকোফের হাতে ধরা পড়েনি এবং সে এখনো লণ্ডনের বাড়িতেই আছে।

নদীর পার ধরে বরাবর মোহানার দিকে এগিয়ে চলল টারজন। এইভাবে অনেক দূর যাওয়ার পর সন্ধ্যা হয়ে এল। কূল থেকে টারজন দেখল সমুদ্রের কাছে নদীর বুকের উপর রোকোফের কিনসেড জাহাজটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। সে বেশ বুঝতে পারল রোকোফ এতক্ষণে নিশ্চয় জাহাজটায় উঠে গেছে।

এমন সময় পর পর দুটো গুলির শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের এক আর্ত চীৎকার শুনে থাকতে পারল না টারজন। সে কুমীরের কথা ভুলে গিয়ে নদীর জলে আবার ঝাঁপ দিল।

এদিকে রোকোফ যখন তার দলবল নিয়ে নৌকোয় করে কিনসেড জাহাজের দিকে আসছিল তখন সে অন্য একটা নৌকোতে মুগাম্বি আর তার ভয়ঙ্কর পশু সঙ্গীগুলোকে দেখতে পায়। নৌকোদুটো কাছাকাছি হলে চিতাবাঘটা আবার হাঁ করে তাদের নৌকোয় ঝাঁপ দেবার চেষ্টা করে। রোকোফ তখন গুলি করতে বলে। গুলিটা অবশ্য কারো গায়ে লাগেনি। তবে নৌকোর ভিতর যে একজন আদিবাসী মেয়ে ছিল সে চীৎকার করে ওঠে ভয়ে। এই চীৎকারটা আর গুলির শব্দ শুনতে পায় টারজন।

বিদ্রোহী নাবিকদুটো যখন জেনের কাছ থেকে রাইফেলটা কেড়ে নেবার জন্য ধ্বস্তাধস্তি করছিল তখন টারজন মই বেয়ে জাহাজের উপর উঠে পড়ে। সে গিয়ে সরাসরি নাবিক দুটোকে বলে 'এ সব কি হচ্ছে?'

এই বলে সে নাবিক দুটোকে ধরে ডেকের উপর থেকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। তারপর জেনকে দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রোকোফ, পলভিচ আর জনাছয়েক নাবিক সেখানে গিয়ে হাজির হলো। রোকোফ টারজনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করার হুকুম দিল। টারজন জেনকে পাশের একটা কেবিনে

ঢুকিয়ে দিয়ে রোকোফকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে গেল। রোকোফের পিছনে তার লোকেরা ছিল। রোকোফের দুজন লোক গুলি করল তাদের রাইফেল থেকে। কিন্তু তাদের হাত তখন কাঁপছিল ভয়ে। কারণ তাদের পিছন দিক থেকে একদল ভয়ঙ্কর জন্তু এগিয়ে আসছিল তাদের দিকে। প্রথমে এল পাঁচজন বাঁদর-গোরিলা, তারপর একটা চিতাবাঘ আর সবশেষে এক দৈত্যাকার নিগ্রোযোদ্ধা। রোকোফের লোকরা গুলি করার কোন অবকাশ পেল না।

রোকোফ ভয়ে পালিয়ে গিয়ে সামনের দিকে একটা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল। টারজনের বাঁদর-গোরিলারা মুগাম্বির নেতৃত্বে রোকোফের লোকদের আক্রমণ করল।

টারজন রোকোফকেই খুঁজছিল। পরে সে দেখল রোকোফ তার নাবিকদের তাড়া খেয়ে বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে।

কিন্তু তাকে দেখতে পেয়ে টারজন তার দিকে এগিয়ে যাবার আগেই শীতা ছুটে গেল তার দিকে। তার উপর শীতা ঝাঁপিয়ে পড়তেই রোকোফ চিৎ হয়ে পড়ে গেল। এক ভয়ঙ্কর প্রতিশোধবাসনায় সর্বাঙ্গ জ্বলছিল টারজনের। কিন্তু সে যখন দেখল শীতা তাকে সে প্রতিশোধ গ্রহণের কোন সুযোগ না দিয়ে রোকোফকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে, তখন সে শীতাকে বারকতক ডাকল। কিন্তু শীতা তার প্রভুর কথা শুনল না। শীতা রোকোফের মুখে একটা জোর কামড় বসিয়ে তার বুকটা কামড়াচ্ছিল।

আকুতের বাঁদর-গোরিলাগুলো তখন ভয়ঙ্করভাবে ঘোরাঘুরি করছিল জাহাজে। তারা জেনকে চিনতে না পেরে তার দিকেও দাঁত বার করে এগিয়ে আসছিল। টারজন তখন তাদের জেনের পরিচয়টা দিতে তারা শান্ত হলো।

রোকোফের দলের মধ্যে শুধু পলভিচকে পাওয়া গেল না। যে চারজন ঘরের মধ্যে ঢুকে ছিল তাদের প্রাণে না মেরে বন্দী করে রাখল টারজন। তারা নাবিক, জাহাজ চালনার কাজে লাগতে পারে। বাকি সবাই লড়াইয়ে নিহত হয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যায় জেন আর টারজন যখন কিনসেড জাহাজের ক্যাপ্টেনের কেবিনের মধ্যে বসে পরস্পরের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিল তখন তাদের অলক্ষ্যে অগোচরে কূলের উপর দাঁড়িয়ে একটা লোক এক উন্মত্ত প্রতিহিংসায় জাহাজটার পানে তাকিয়েছিল। লোকটা হলো পলাতক পলভিচ।

সকাল হওয়ার কিছু পরে ঘুম থেকে জেগে উঠল টারজন। সে দেখল ঝড় থেমে গেছে। আকাশ পরিষ্কার সুতরাং জাহাজ ছাড়ার পথে আর কোন বাধা নেই।

টারজন নাবিকদের জাহাজ ছাড়ার নির্দেশ দিল। জাহাজটা অবশেষে চলতে শুরু করল। উগাম্বি নদীর মোহানা পার হয়ে সেটা আটলান্টিক মহাসাগরে পড়ল। টারজন আর জেনের মনে তখন শুধু একটাই দুঃখ, তাদের ছেলেটার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

এমন সময় হঠাৎ একটা প্রবল বিস্ফোরণে একটা কেবিনের ছাদ উড়ে গেল। সবাই আশ্চর্য হয়ে তাকাল সেইদিকে। কিন্তু এই বিস্ফোরণের কারণ কি তা বুঝতে পারল না। কিন্তু সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ছোটা-ছুটি করতে লাগল। একমাত্র টারজনই সাহস দিতে লাগল সকলকে' একমাত্র একটা নাবিক বুঝতে

পারল এ হলো শয়তান পলভিচের কাজ। রাত্রি-বেলায় পলভিচ লুকিয়ে তার কেবিনে ঢুকে জিনিসপত্র নেবার সময় কোন বিস্ফোরক পদার্থ রেখে যায়। কিন্তু সেকথা ভয়ে আর প্রকাশ করতে পারল না নাবিকটা।

টারজন দেখল তাদের বিপদ কাটেনি। জাহাজের কাঠে আগুন ধরে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা জাহাজটাই পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। পাম্প করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা গেল আগুন কমার থেকে বেড়ে যাচ্ছে আরো। এঞ্জিনঘরেও আগুন ধরে গেছে।

তখন টারজন নাবিকদের বলল, জাহাজটাকে আর বাঁচানো যাবে না। সুতরাং এখানে থেকে আর লাভ নেই। আর যে দুটো নৌকো আছে জাহাজে তা নামিয়ে দাও। এখান থেকে কূল বেশী দূরে নয়।

দুটো নৌকোয় করে সকল মালপত্র নিয়ে বেলা-ভূমির দিকে এগিয়ে গেল ওরা। মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকুতের দলের বাঁদর-গোরিলারা আর শীতা ছুটে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল।

টারজন তাদের লক্ষ্য করে বলল, বিদায় বন্ধু, তোমরা ছিলে আমার বিশ্বস্ত বন্ধু। তোমাদের ভুলতে পারব না জীবনে কখনো।

জেন বলল, ওরা কি আবার ফিরে আসবে?

টারজন বলল, আসতে পারে, আবার নাও আসতে পারে।

উপকূলের উপর নেমে দেখল কিনসেড জাহাজটা তখন সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলছে। এইভাবে দুঘন্টা জ্বলার পর জাহাজটা ডুবে গেল একেবারে।

দ্বীপের মধ্যে টারজনের প্রথম কাজ হলো ভাল জলের জায়গার কাছাকাছি শিবির স্থাপন করা। কোথায় জল আছে তা সে জানত এবং সেই জায়গায় শিবির স্থাপন করল। দলের নাবিকরা যখন শিবির স্থাপনের কাজ করছিল টারজন তখন মুগাম্বি আর সেই আদিবাসী মেয়েটিকে জেনের কাছে রেখে বনের মধ্যে শিকার করতে গেল।

দলের মধ্যে কে কি কাজ করবে তা সব ভাগ করে দিল টারজন। ঠিক হলো সারাদিন শিবিরের কাছে একটা বড় পাথরের উপর থেকে একজন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকবে, কোন জাহাজ আসছে কি না তা দেখবে। কোন জাহাজ দেখতে পেলেই পাহারাদার নাবিকদের কাছ থেকে নেওয়া একটা লাল জামা উড়িয়ে সংকেত দেখাবে। রাত্রিতে সেইখানে শুকনো ডালপালা দিয়ে একটা আগুন জ্বালিয়ে রাখা হলো।

কিন্তু কয়েক দিন কেটে গেলেও দিগন্তে সমুদ্রের উপর কোন জাহাজ দেখতে পাওয়া গেল না। টারজন তখন বলল, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে একটা বড় নৌকো তৈরী করতে হবে। তাই দিয়ে ওরা এই দ্বীপ থেকে মূল মহাদেশে গিয়ে উঠবে। সেখানে কোন জাহাজের দেখা পাওয়া যেতে পারে। টারজন নৌকো তৈরী কিভাবে করতে হয় তা জানে। কিন্তু তাকে সাহায্য করার জন্য লোকের দরকার। একাজে প্রচুর পরিশ্রম আর লোকের দরকার। এ ব্যাপারে সারাদিন প্রচুর পরিশ্রম করতে গিয়ে বন্দী নাবিকরা ক্রমে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল।

টারজনদের শিবিরে যখন এইরকম গোলমাল চলছিল তখন তাদের উত্তরপূর্ব দিকে কিছু দূরে কাউরি নামে একটা ছোট জাহাজ উপকূলভাগের একটা খাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকতে শুরু করে। কারণ

এই জাহাজের দশজন নাবিক কিছু মুক্তোর লোভে সহসা বিদ্রোহী হয়ে উঠে অফিসারদের হত্যা করে। অফিসারদের পক্ষে কিছু অনুগত নাবিক যোগদান করলে তাদেরও হত্যা করা হয়। বিদ্রোহী নাবিকদের নেতা ছিল তিনজন, গাণ্ট নামে এক সুইডিশ, মমুলা মাওরি নামে এক নিগ্রো আর কাইশাং নামে একজন চীনদেশীয় লোক।

যেদিন এই জঙ্গলদ্বীপের উপকূলভাগের খাড়ির মধ্যে কাউরি জাহাজটাকে ওরা লুকিয়ে রাখে তার আগের দিনই ওরা দক্ষিণ দিগন্তে একটা যুদ্ধজাহাজের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উড়তে দেখে। যুদ্ধজাহাজটাকে দেখে ওদের ভয় হয়। ওরা ভাবে ওদের বিদ্রোহ ও অফিসার হত্যার খবর পেয়েই হয়ত যুদ্ধজাহাজটা খোঁজ করছে ওদের।

কাইশাং আর মাওরি গাণ্টকে তাদের জাহাজটা ছেড়ে দিতে বলল ধরা পড়ার ভয়ে। কিন্তু গাণ্ট বলল, ও জাহাজ আমাদের ধরতে আসবে কেন? আমাদের বিদ্রোহের কথা কেউ জানে না।

একদিন টারজন দুপুরের দিকে হরিণ শিকার করতে যায় মুগাম্বিকে শিবিরে রেখে। মুগাম্বির সঙ্গে জোনস আর সালিভান নামে দুজন অনুগত নাবিকও ছিল।

টারজন বেরিয়ে যেতেই কাইশাং ও তার দলের পাঁচজন লোককে শিবিরের কাছে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে স্নাইদার হঠাৎ একসময় ব্যস্ত হয়ে শিবিরে গিয়ে মুগাম্বিকে বলে তার সঙ্গী স্মিথকে বাঁদর-গোরিলারা ধরেছে। তাকে মেরে ফেলবে। তুমি এখনি জোনস আর সালিভানকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে যাও।

কথাটা শুনে মুগাম্বি শিবির ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই স্নাইদার কাইশাং-এর কাছে চলে গেল। বলল, চলে এস, শিবির ফাঁকা।

কাইশাং গিয়ে প্রথমে জেনকে বলল, চলে এস আমাদের সঙ্গে।

জেন কিছু বুঝতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। জেন উঠেই স্মিথসকে দেখতে পেল। বুঝল একটা দারুণ ষড়যন্ত্র চলছে। সে স্মিথসকে বলল, এর মানে কি?

স্মিথস বলল, আমরা একটা জাহাজ পেয়েছি। এখন আমরা এখান থেকে মুক্তি পেতে পারি।

জেন স্নাইদারকে বলল, তুমি তাহলে মুগাম্বিকে কোথায় পাঠালে?

স্নাইদার বলল, তারা আসবে না।

তখন কাইশাং-এর লোকজনরা জেন আর আদিবাসী মেয়েটিকে তুলে নিয়ে কাউরি জাহাজটার দিকে চলে গেল। কিছুটা দূরে থেকে গাণ্ট সব দেখল।

এদিকে মুগাম্বি যখন স্নাইদারের কথামত নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দেখল স্মিথস বা কোন বাঁদর-গোরিলা নেই, তখন সে বুঝতে পারল এর পিছনে কোন একটা চক্রান্ত আছে। তখন সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে শিবিরে ফিরে এসে দেখল শিবির শূন্য।

এমন সময় হরিণ না পেয়ে টারজন ফিরে এলে তার ভ্রুদুটো কুঁচকে উঠল।

টারজন বলল, কিন্তু জঙ্গলে ওরা জেনকে নিয়ে যাবে কোথায়? পালাবার জাহাজই বা পাবে কোথায়? এখন এস, ওদের খোঁজ করা যাক।

ওরা শিবির থেকে বার হতেই গাণ্ট এসে টারজনের সামনে দাঁড়াল।

গাণ্ট সরাসরি টারজনকে বলল, তোমাদের মেয়েদের ওরা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। যদি তাদের ধরতে চাও ত তাড়াতাড়ি এস আমার সঙ্গে। তা না হলে কাউরি জাহাজটা এখনি ছেড়ে দেবে।

টারজন বলল, কে তুমি ? আমার স্ত্রীর অপহরণের কথা তুমি কি করে জানলে ?

গাণ্ট বলল, আমি নিজে দেখেছি আমাদের দলের কাইশাং আর মমুলা মাওরি তোমাদের দলের দুজন লোকের সঙ্গে চক্রান্ত করছিল। তাদের কথা আমি সব শুনেছি। কাইশাং আর মাওরি আমাকে তাদের শিবির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তারা আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। আমি পালিয়ে এসেছি শিবির থেকে।

গাণ্ট তাদের পথ দেখিয়ে উপকূলের কাছে নিয়ে গেল। কিন্তু সামান্য একটুর জন্য দেরী হয়ে গেছে। কাউরি জাহাজটা এইমাত্র ছেড়ে দিয়েছে। ওরা দেখল জাহাজটা পূব দিকে এগিয়ে চলেছে ধীর গতিতে। জীবনে কখনো কোন ক্ষেত্রে হার মানেনি, আশা হারায়নি টারজন। কিন্তু জীবনে আজ প্রথম যেন হতাশার বেদনা অনুভব করল সে।

টারজন যখন তার শিবিরে ফিরে গেল সবার সঙ্গে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে।

হঠাৎ অন্ধকার বনভূমির মধ্যে একটা চিতাবাঘের ডাক শুনতে পেল ওরা। সে ডাক শুনে টারজনও জন্তুদের মত অদ্ভুতভাবে চীৎকার করে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শীতা এসে হাজির হলো টারজনের সামনে। টারজন তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

হঠাৎ সমুদ্রের উপর উপকূলভাগের কাছাকাছি একটা আলো দেখতে পেয়ে বলল, দেখ দেখ, আলো। নিশ্চয় ও আলোটা কাউরি জাহাজের। জাহাজটা এখন দাঁড়িয়ে আছে শান্ত হয়ে। একটা নৌকো যোগাড় করো কোনরকমে। আমরা ও জাহাজে হানা দিয়ে জাহাজটা দখল করে নেব।

গাণ্ট বলল, কিন্তু ওদের সকলের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র আছে। কিন্তু আমরা মাত্র পাঁচজন।

টারজন তার চিতাবাঘটার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার এই শীতা কুড়িটা সশস্ত্র লোকের সমান। এরপর যারা আসবে তারা সব একশোজন লোকের কাজ করবে।

এই বলে টারজন দাঁড়িয়ে মুখ তুলে বাঁদর-গোরিলাদের মত একটা জোর আওয়াজ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকুতের সঙ্গে ভয়ঙ্কর একদল বাঁদর-গোরিলা সেখানে এসে গেল। গাণ্ট তাদের ভয়ে কাঁপতে লাগল।

একটু খুঁজতেই বেলাভূমির উপর কিছু দূরে সরে যাওয়া নৌকো দুটো পেয়ে গেল তারা। আকুৎ ও তার দলের সবাই আর শীতা নৌকোতে গিয়ে উঠল। এছাড়া ছিল গাণ্ট, টারজন, মুগাম্বি, সানিভাল আর জোনস। সমুদ্রের শান্ত জলের উপর দিয়ে কাউরি জাহাজের আলোটা লক্ষ্য করে তীরবেগে ছুটে যেতে লাগল নৌকো দুটো।

টারজন যা ভেবেছিল ঠিক তাই। কাউরি জাহাজটাই তখন দাঁড়িয়ে ছিল। ডেকের উপর একটা নাবিক ঝিমোচ্ছিল।

জাহাজের নিচের তলায় একটা কেবিনে তখন স্নাইদার জেনকে বশীভূত করার চেষ্টা করছিল। যে ঘরে জেনকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেই ঘরের একটা টেবিলের ড্রয়ারে একটা রিভলবার পেয়ে গিয়েছিল জেন। স্নাইদারের হাতে তখন কোন অস্ত্র না থাকায় স্নাইদারকে গুলি করার ভয় দেখিয়ে বেকায়দায় ফেলেছিল জেন।

এমন সময় ডেকের উপর থেকে একটা গোলমালের আওয়াজ আসতেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে জেন আর সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারটা কেড়ে নেয় স্নাইদার।

ডেকের উপর যে লোকটা পাহারা দিচ্ছিল সে ঝিমোতে ঝিমোতে একটা অচেনা লোককে জাহাজের মই বেয়ে উঠতে দেখে চীৎকার করে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি করে তার রিভলবার থেকে। এই শব্দ শুনেই চমকে ওঠে জেন।

কিন্তু প্রহরীর গুলিটা কারো গায়ে লাগেনি বলে সে ভয়ে চীৎকার করে জাহাজের লোকজনদের ডাকতে থাকে। কিন্তু তার আগেই টারজন আর তার জন্তু-জানোয়ারগুলো ডেকের উপর উঠে ঘুরে বেড়াতে থাকে ভয়ঙ্করভাবে।

কাউরি জাহাজের সশস্ত্র নাবিকরা জন্তুজানোয়ার-গুলোকে দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তারা কম্পিত হাতে গুলি ছুঁড়লেও সে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে স্বাভাবিকভাবে। আকুতের বাঁদর-গোরিলাগুলো তাদের দু-একজনের গলা টিপে ধরতেই তারা ভয়ে পালিয়ে সামনের ঘরটাতে গিয়ে আশ্রয় নিল।

কাইশাং ছুটে পালাচ্ছিল। কিন্তু শীতা একটা নাবিককে শেষ করার পর কাইশাংকে ধরল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেহের সব মাংস খেয়ে ফেলল সে।

এদিকে স্নাইদার যখন নিচের তলার কেবিনটার মধ্যে জেনের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে জেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার রিভলবারটা কেড়ে নিতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে

পড়ল টারজন। আদিবাসী মেয়েটি তখন ভয়ে নতজানু হয়ে জেনের কাছে বসেছিল।

কিছু না বলে পিছন থেকে স্নাইদারের গলাটা টিপে ধরল টারজন। স্নাইদার মুখ তুলে টারজনকে দেখেই ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। টারজন এত জোরে গলাটা তার টিপে ধরেছিল যে কোন কথা বলার সুযোগ পেল না সে। তার জিবটা বেরিয়ে আসতে লাগল। মুখটা নীল হয়ে গেল।

স্নাইদারের নিষ্প্রাণ দেহটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জেন আর আদিবাসী মেয়েটিকে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল টারজন। এসে দেখল সব লড়াই শেষ। মাত্র চারজন ছাড়া শত্রুদের সবাই খতম হয়েছে। তারা হলো স্মিথ, মাওরি আর তাদের দলের দুজন নিগ্রো নাবিক।

টারজন তাদের বলল, হয় জাহাজে নাবিকের কাজ করো, না হয় মৃত্যুবরণ করো।

তারা সবাই নাবিকের কাজ করতে লাগল।

টারজনের নির্দেশমত জাহাজটাকে আবার জঙ্গল-দ্বীপের উপকূলে একবার আনা হলো। ঐ উপকূলে জন্তুগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হলো। তারা আবার জঙ্গলে চলে গেল। এবার জাহাজ চলল লণ্ডনের পথে।

তিনদিন পর শোরওয়াটার নামে একটা বৃটিশ যুদ্ধজাহাজের সংস্পর্শে এল কাউরি। সেই জাহাজের বেতারের মাধ্যমে লর্ড গ্রেস্টোক তার লণ্ডনের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করল। জানল, তার ছেলেকে রোকোফ নিয়ে আসতে পারেনি। মোটা টাকার লোভে ছেলেটাকে রোকোফের হাতে তুলে না দিয়ে পলভিচ অন্য একজনের কাছে রাখে ছেলেটাকে। ঠিক করে মোটা টাকার ঘুঁষ নিয়ে ছেলেটাকে ফিরিয়ে দেবে। তাই সে জ্যাকের পরিবর্তে একই রকমের অন্য একটি ছেলেকে জাহাজে নিয়ে গিয়ে তুলে দেয় রোকোফের হাতে। আফ্রিকার কোন এক আদিবাসীদের গাঁয়ে জেনের কোলে মারা যায় সেই ছেলেটি।

টারজন আর জেন বাড়ি গিয়ে দেখল বুড়ী নিগ্রো নার্স এসমারাল্ডাই জ্যাককে মানুষ করছে পরম যত্নের সঙ্গে।

টারজনের সঙ্গে ছিল তার বিশ্বস্ত সহচর মুগাম্বি আর সেই আদিবাসী তরুণীটি যাকে একদিন একটা নৌকোর পাটাতনে শুয়ে থাকতে দেখে। মেয়েটি পরিষ্কার বলে দেয় সে আর বাড়ি ফিরে যাবে না। সে টারজনদের বাড়িতেই থেকে যাবে।

টারজনের এখন একমাত্র জীবিত শত্রু পলভিচ যে এখন আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

টারজনের পুত্র

দি সন অফ টারজন
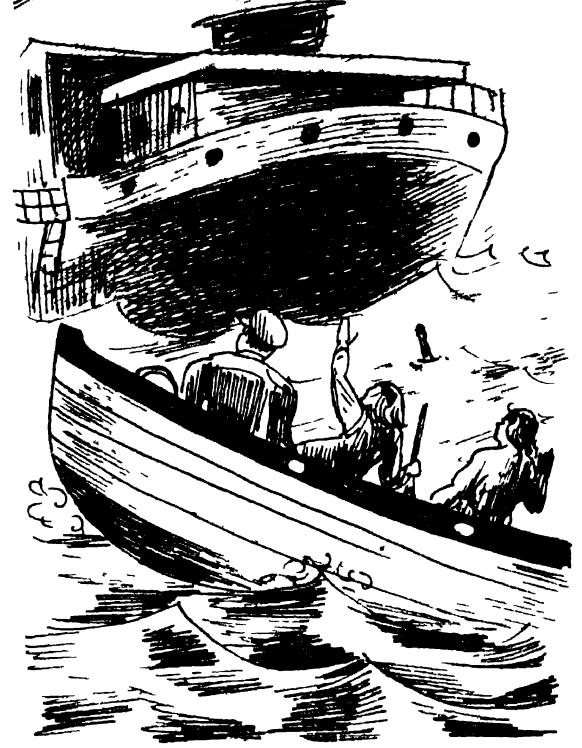
সেদিন একটা লম্বা নৌকো উগাম্বি নদীর উপর দিয়ে ভাঁটার টানে মোহানার দিকে ভেসে চলেছিল।

এমন সময় মাঝিরা দেখল নদীর পাড় থেকে ভূতের মত অস্থিচর্মসার একটা লোক হাত বাড়িয়ে তাদের ডাকছে। তার ডাক শুনে মাঝিরা লোকটাকে নৌকোয় তুলে নিয়ে আবার মোহানার দিকে এগিয়ে চলল। সেখানে সমুদ্রের মুখে ম্যাজোরি নামে একটা জাহাজ অপেক্ষা করছে নৌকারোহীদের জন্য।

আসলে লোকটা তার আসল নাম গোপন করে উদ্ধারকারীদের কাছে। সে হলো নিকোলাস রোকোফের সহচর পলভিচ। দশ বছর আগে রোকোফ যখন টারজনের হাতে ধরা পড়ে তখন পলভিচ জঙ্গলের গভীরে পালিয়ে যায়।

ম্যাজোরি জাহাজে আশ্রয় পেয়ে ও ওদের সেবাযত্ন লাভ করে কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠল পলভিচ। এখন আর তার মনে কারো প্রতি কোন প্রতিশোধবাসনা নেই।

ম্যাজোরি জাহাজটা ভাড়া নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে এসে এক বিশেষ কাঁচা মালের সন্ধান করতে থাকে একদল ধনী ব্যবসায়ী।

পলভিচকে নিয়ে ম্যাজোরি জাহাজটা অবশেষে সেই দ্বীপের কূলে গিয়ে ভিড়ল। দ্বীপটা নানারকম সারবান গাছের জঙ্গলে ভরা।

একদিন পলভিচ বনে শিকারীদের সঙ্গে গিয়ে একটা গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সময় কার স্পর্শে জেগে উঠে দেখে একটা বিরাট বাঁদর-গোরিলা তার পাশে বসে তার মুখটা খুঁটিয়ে দেখছে। পলভিচ ভয় পেয়ে গেল। পলভিচ দেখল বাঁদর-গোরিলাটা তার কোন ক্ষতি করছে না। তাই সে ভাবল একে যদি কোন শহরে নিয়ে যাওয়া যায় তবে তাকে বিক্রি করে অথবা খেলা দেখিয়ে অনেক টাকা পাওয়া যাবে।

নাবিকরা পলভিচের সঙ্গে একটা বিরাটকায় বাঁদর দেখে তাদের দিকে ছুটে এল।

নাবিকরা পলভিচকে বাঁদরটা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করতে লাগল।

কিন্তু পলভিচ শুধু সব সময় একটা কথা বলতে লাগল, বাঁদরটা আমার।

এরপর জাহাজের সবাই মিলে বাঁদরটার নাম দিল 'এ্যাজাক্স।'

তারা দেখল এ্যাজাক্সের বয়স হয়েছে। কিন্তু বয়সে বুড়ো হলেও তার গায়ে তখনো প্রচুর শক্তি।

অবশেষে ইংলণ্ডে গিয়ে জাহাজ ভিড়তেই বাঁদরটার প্রশিক্ষণের জন্য একজন ওস্তাদের কাছে গেল পলভিচ।

হ্যারল্ড মূর নামে এক গৃহশিক্ষক কোন এক বৃটিশ

লর্ডের বাড়িতে তার ছেলেকে পড়াত। কিন্তু শত চেষ্টাতেও সে ছেলেটির পড়ার কোন উন্নতি ঘটাতে পারছিল না। তাই সে একদিন ছেলেটির মার কাছে তার সম্বন্ধে অভিযোগ করল।

সে বলল, ওর আসল আগ্রহের বস্তু হলো দৈহিক শক্তির চর্চা আর আফ্রিকার জঙ্গলের আবিষ্কার সম্বন্ধে কোন বই পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নিবিষ্ট মনে পড়ে যাবে।

ছেলের মা বলল, আপনি নিশ্চয় এসব বই পড়তে দেন না?

কিন্তু ওরা যার সম্বন্ধে আলোচনা করছিল সেই ছেলেটি ঘরের পাশে একটি গাছের ডালে চেপে বাঁদরের মত 'হুপ' করে একটা শব্দ করে উঠল। তার মা ও গৃহশিক্ষক তাকে দেখে জানালার কাছে যেতে না যেতে সে গাছ থেকে বারান্দায় লাফিয়ে পড়ে ঘরে চলে এল।

এরপর সে নাচতে নাচতে বলল, শহরের মিউজিক হলগুলোতে একটা আশ্চর্য বাঁদর-গোরিলাকে দেখানো হচ্ছে। কথা বলা ছাড়াও সে মানুষের মত অনেক কিছুই করতে পারে। আমি আজ গিয়ে দেখব মা? দয়া করে আমাকে যাবার অনুমতি দাও।

মা ছেলেটির গাল ধরে আদর করে বলল, না জ্যাক, তুমি ত জান, এসব প্রদর্শনীতে যাবার অনুমতি আমি কখনো দিই না।

হঠাৎ দরজা খুলে ছেলেটির বাবা এসে ঘরে ঢুকল। ছেলেটির বাবা বলল, কোথায়?

মা বলল, ও একটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঁদর-গোরিলা দেখতে একটা মিউজিক হলে যেতে চায়।

ছেলেটির বাবা বলল, কে এ্যাজাক্স?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

তার বাবা বলল, চল আমিও যাব তোমার সঙ্গে। জেন, তুমিও চল না।

জেন ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে গৃহশিক্ষক মুরকে স্মরণ করিয়ে দিল, এখন তাকে পড়ার ঘরে গিয়ে জ্যাককে আবৃত্তি শেখাতে হবে।

মুর আর জ্যাক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে জেন তার স্বামী টারজনকে বলতে লাগল, দেখ জন, যেমন করে হোক জ্যাকের মন থেকে তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রবৃত্তিগুলো দূর করে ফেলতে হবে যাতে বন্যজীবনের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা দানা বেঁধে উঠতে না পারে।

টারজন বলল, বন্যজীবনের প্রতি একটা আসক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়ার মধ্যে কোন সত্যিকারের বিপদ আছে বলে আমি মনে করি না।

সন্ধ্যের সময় জ্যাক আবার তার বাবার কাছে এ্যাজাক্সকে দেখতে যাবার কথাটা তুলল। কিন্তু টারজন বলল, তোমার মা যখন ওটা চায় না, তখন আমি তোমাকে যেতে দিতে পারি না।

সন্ধ্যের পর একসময় হঠাৎ মুর জ্যাকের ঘরের পাশ থেকে দেখল জ্যাক পোশাক পরে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। মুর তার কাছে গিয়ে বলল কোথায় যাচ্ছ জ্যাক।

জ্যাক বলল, আমি এ্যাজাক্সকে দেখতে যাচ্ছি।

মুর বলল, আমি তোমার ব্যবহারে লজ্জিত।

মুর একথা বলতে না বলতেই জ্যাক তাকে জোর করে তুলে নিয়ে তার বিছানার উপর শুইয়ে দিল। তারপর একটা বিছানার চাদর দিয়ে দড়ি করে মুরের হাত পা বেঁধে ফেলল খাটের সঙ্গে। তারপর দরজায় ভিতর থেকে তালাবন্ধ করে দিয়ে জানালা দিয়ে পাইপ বেয়ে নিচে নেমে গেল।

কিছু পরে টারজন ও জেন এসে দরজায় ঘা দিয়ে জ্যাককে ডাকতে লাগল। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে টারজন দরজা ভেঙ্গে ফেলল। ঘরে ঢুকে দেখল হাত পা বাঁধা অবস্থায় মূর্চ্ছিত হয়ে ঘরের মেঝের উপর পড়ে আছে মুর।

মুখে চোখে জল দিতেই মুর চেতনা ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকাল। তাকিয়েই বলে উঠল, আমি গৃহশিক্ষকতার পদ থেকে অব্যাহতি চাইছি। আমি আপনার ছেলেকে আর পড়াতে পারব না।

টারজন বলল, কিন্তু জ্যাক কোথায়?

মুর বলল, সে আমাকে এইভাবে বেঁধে রেখে এ্যাজাক্সকে দেখতে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার গাড়ি বার করতে বলল টারজন। তারপর সোজা মিউজিক হলের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

মিউজিক হলে টারজনকে দেখে তার মনের মানুষকে খুঁজে পেয়ে তাদের ভাষায় আনন্দ প্রকাশ

করতে করতে এ্যাজাক্স ছুটে গেল তার দিকে। টারজনও তাকে চিনতে পেরে স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ থেকে শুধু একটা কথা বেরিয়ে এল, আকুৎ তুমি ?

আকুৎ বলল, দীর্ঘদিন ধরে তোমাকেই খুঁজছি টারজন। তোমাকে যখন পেয়ে গেছি তখন আমি তোমাকে নিয়ে আবার জঙ্গলে গিয়ে বাস করব তোমার সঙ্গে।

টারজন নীরবে আকুতের মাথায় হাত বোলাতে লাগল। আফ্রিকার জঙ্গলের সব ঘটনা মনে পড়ল তার একে একে। টারজন আকুৎকে বলল, তুমি আজ ওদের সঙ্গেই যাও আকুৎ। কাল আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব।

বাড়ি যাবার পথে তার পূর্বজীবনের সব কথা সংক্ষেপে বলল টারজন জ্যাককে।

পরদিন পলভিচ আর আকুৎ যেখানে ছিল সেখানে গিয়ে দেখা করল টারজন। টারজন আকুৎকে টাকা দিয়ে কিনতে চাইল। পলভিচ তার উত্তরে বলল, কথাটা ভেবে দেখব।

টারজন বাড়ি ফিরে জেনকে বলল, আমি ভাবছি আকুৎকে কিনে নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে পাঠিয়ে দেব।

জ্যাক বলল, ওকে কিনে আমাদের বাড়িতে রেখে দাও। আমার বন্ধু হিসাবে থাকবে ও এখানে।

একথা জেন বা টারজন কেউই সমর্থন করতে পারল না।

জ্যাক তখন আকুৎকে দেখতে যাবার অনুমতি চাইল। কিন্তু সে অনুমতি তার বাবা মা কেউ দিল না।

তখন জ্যাক একদিন কোনরকমে ঠিকানা যোগাড় করে খুঁজে খুঁজে শহরের একপ্রান্তে পলভিচের আস্তানায় চলে গেল। সেখানে গিয়ে পলভিচকে কিছু টাকা দিয়ে জ্যাক বলল, আমার বাবাকে একথা

বলো না। আমি মাঝে মাঝে এখানে এসে ওকে দেখে যাব। ওর জন্য আমি তোমাকে কিছু করে টাকা দেব।

জ্যাক যখন বলল সে টারজনের ছেলে তখন পলভিচের মাথায় ষড়যন্ত্রের একটা পরিকল্পনা খেলে গেল। সে ভাবল টারজন রোকোফকে হত্যা করেছে, তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তাই তার ছেলের মধ্য দিয়ে টারজনের উপর প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করল মনে মনে।

দিন দুইয়েকের মধ্যেই টারজনের কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে আকুৎকে বিক্রী করতে রাজী হয়ে গেল পলভিচ। ঠিক হলো দুদিন পর ডোভার থেকে আফ্রিকাগামী একটা জাহাজে তুলে দেবে আকুৎকে পলভিচ।

এই ঘটনার কিছু পরেই জ্যাক এসে কিছু টাকা পলভিচের পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল, তোমাকে আর কষ্ট করে ডোভারে যেতে হবে না। আমিই আকুৎকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আজই সন্ধ্যায় আমার স্কুলবোর্ডিং-এ যাবার কথা। সুতরাং আমি ওভাবে গেলে তাতে যাবার কোন সন্দেহ হবে না। ডোভারে আকুৎকে পৌঁছে দিয়েই আমি স্কুলে চলে যাব।
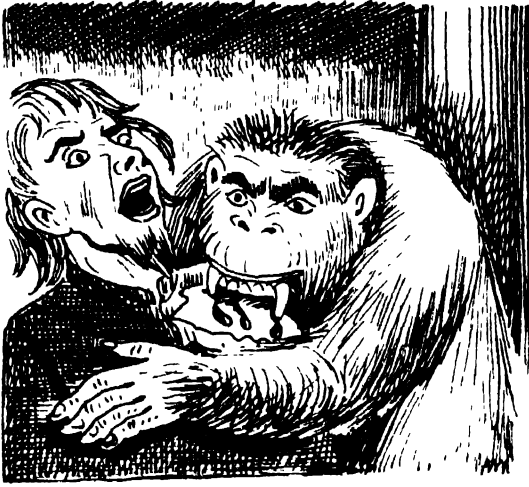
পলভিচ মনে মনে শয়তানির হাসি হেসে রাজী হয়ে গেল জ্যাকের কথায়।

কিন্তু তার বাবা মা স্টেশান ছেড়ে চলে গেলেই জ্যাক ট্রেন থেকে নেমে সোজা পলভিচের বাসায় চলে গেল। গিয়ে দেখল আকুংকে মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে বিছানার উপর ফেলে রাখা হয়েছে। পলভিচ ঘরের মধ্যে অশান্তভাবে পায়চারি করছে।

পলভিচ এবার জ্যাককে বলল, তুমি আমার কাছে এসে পিছন ফিরে দাঁড়াও।

জ্যাক তখন তার সামনে এসে পিছন ফিরে দাঁড়াতেই পলভিচ তার পিছন থেকে একটা মোটা দড়ির ফাঁস তার দুটো হাতের কব্জিতে শক্ত করে লাগিয়ে দিল। মুহূর্তমধ্যে পলভিচের মুখের চেহারা অন্য রকম হয়ে গেল। সে ভয়ঙ্করভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে অতর্কিতে জ্যাককে মেঝের উপর চিৎ করে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর বসল। তারপর দুটো হাত দিয়ে তার গলাটা টিপে ধরে বলল, তোর বাবা আমার সর্বনাশ করেছে। এইভাবে আমি তার প্রতিশোধ নেব।

জ্যাক কিন্তু চীৎকার করল না। সে হাত নাড়তেও পারল না। অসহায়ভাবে শুয়ে রইল সে আর তার গলাটা ধরে টিপতে লাগল পলভিচ।

এদিকে আকুং হাত পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে সবকিছু দেখছিল। সে এবার তার বন্ধুর অবস্থা দেখে গর্জন করতে লাগল। টানাটানি করতে করতে সে বাঁধনগুলো খুলে যেতেই পলভিচের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে ভয়ে সাদা হয়ে গেল পলভিচ। আকুং একঝটকায় জ্যাকের উপর থেকে পলভিচকে ফেলে দিয়ে নখ দিয়ে তার গাটাকে চিরে দিয়ে তার গলায় দাঁত বসিয়ে এক সাংঘাতিক কামড় দিল। সঙ্গে সঙ্গে পলভিচের প্রাণটা বেরিয়ে গেল।

অনেক কষ্টে জ্যাকের হাতের বাঁধনগুলো খুলে দিল আকুং। জ্যাক উঠে দাঁড়িয়ে আর অপেক্ষা না করে আকুংকে সঙ্গে করে ডোভারের পথে চলে গেল।

মাসখানেক পর টারজন খবর পেল স্কুল থেকে জ্যাক সেখানে যায়নি। খোঁজ নিয়ে একটা কথা শুধু জানতে পারল তারা জ্যাককে স্কুলে যাওয়ার জন্য ট্রেনে তুলে দেওয়ার পর ট্রেন ছাড়ার আগেই সে ট্রেন থেকে নেমে একটা গাড়ি ভাড়া করে পলভিচের বাসায় আসে।

পলভিচের মৃত্যুর পরদিনই ডোভার থেকে একটি ছেলে তার অসুস্থ বুড়ী ঠাকুরমাকে রোগীর গাড়িতে করে জাহাজে চাপিয়ে একসঙ্গে যাত্রা করল।

যাত্রীদের মধ্যে কণ্ডন নামে একজন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বড় বড় শহরগুলোতে অপরাধমূলক কাজ করে বেড়াত। লোকটা দুষ্ট প্রকৃতির। সে একদিন জ্যাকের হাতে বড় একতাড়া নোটের গোছা দেখে তা চুরি করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

এমন সময় জাহাজটা আফ্রিকার জঙ্গলবর্তী এক ছোটখাটো বন্দরে দু-একদিনের জন্য নোঙর করে। এই সময় জ্যাকের বাড়ির জন্য সহসা মন খারাপ করে ওঠে। সে তাই সেই বন্দরে নেমে ইংলণ্ডগামী একটা জাহাজে করে বাড়ি ফিরে যাবে ঠিক করে।

বুড়ী ঠাকুরমাবেশী আকুংকে চেয়ারে করে জাহাজ

থেকে নামাবার সময় জ্যাকের পকেট থেকে নোটের তাড়াটা কখন পড়ে যায় তা সে দেখতেই পায়নি। ছোটখাটো একটা হোটেলে একটা ঘরভাড়া নিয়ে জ্যাক ইংলণ্ডে জাহাজে করে যাবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

সে রাত্রিতে জ্যাক আকুংকে বুঝিয়ে বলল, তুমি জঙ্গলে চলে যাও আকুং, আমি বাড়ি ফিরে যাব এখান থেকে।

আকুং নীরবে মেনে নিল জ্যাকের কথাটা। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল বিছানায়। আকুং মেঝের উপর শুল।

জ্যাকরা ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকল কণ্ডন। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জ্যাকের প্যান্টের পকেট থেকে নোটগুলো বার করে নেওয়া। কিন্তু কোথাও কোন নোট পেল না। এবার সে গলাটা টিপে ধরতেই জ্যাক জেগে উঠে চোখ মেলে তাকাল। সেও তখন উঠে বসে কণ্ডনের হাতের কব্জিটা চেপে ধরল।

এদিকে কণ্ডন এতক্ষণ বুঝতে পারেনি ঘরের মধ্যে অন্ধকারে কে খুব নিঃশব্দে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল অশান্তভাবে। এবার তার লোমশ হাতদুটো কণ্ডনের ঘাড়ের উপর পড়তেই সে চমকে উঠল।

কণ্ডন এবার তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে জ্যাকের মুখের উপর একটা ঘুষি মারল। সঙ্গে সঙ্গে আকুং তাকে বিছানা থেকে টেনে এনে মেঝের উপর ফেলে দিল। কণ্ডন একটা অদ্ভুত গর্জন শুনতে পেল। তার গলাটা কে এক হাতে ধরে তার মুণ্ডুটা ঘোরাচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে না বুঝতেই চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে সব চেতনা হারিয়ে ফেলল সে আর তার প্রাণহীন দেহটা মেঝের উপর ঢলে পড়ল।

এবার বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল জ্যাক।

মহা বিপদে পড়ল জ্যাক। একে ঘরের মধ্যে মৃতদেহ। মাথার উপর ঝুলছে খুনের দায়। তার উপর নোটের বাণ্ডিলটাও খুঁজে পেল না। হোটেলের ভাড়া মেটাবে তারও কোন উপায় নেই। বাড়ি ফিরবে তার জাহাজ ভাড়াও নেই। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জ্যাক দেখল ঘরের পাশে একটা গাছ রয়েছে, তার ওপাশ থেকেই জঙ্গল শুরু হয়েছে। সে আকুংকে তার অনুসরণ করতে বলে জানালা থেকে বিড়ালের মত লাফ দিয়ে গাছটার ডালে গিয়ে উঠে জঙ্গলে চলে গেল।

ফরাসী সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন আর্মন্দ জ্যাকং নামে একজন অফিসার মরুভূমির মাঝখানে একটা তালগাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসেছিল। সেনাদলের কাছে সাদা পোশাকপরা পাঁচজন আরবদস্যু বন্দী অবস্থায় বসেছিল। বন্দীদের মধ্যে তাদের সর্দার আচমেত বেন হুদিনও ছিল। এই দস্যুদের ধরবার জন্য একসপ্তাহ ধরে প্রচুর বেগ পেতে হয়েছে আর্মন্দ জ্যাকংকে।

সহসা একদল আরব ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা ফরাসী সেনাদলের শিবিরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। একজন ফরাসী সার্জেন্ট এগিয়ে গিয়ে আগন্তুক দলের প্রধানকে ক্যাপ্টেন আর্মন্দের কাছে নিয়ে এল। আগন্তুকের নাম শেখ অমর বেন খাতুর।

আর্মন্দ বলল, বল কি ব্যাপার।

খাতুর বলল, আচমেত বেন হুদিন আমার বোনের ছেলে। তুমি যদি তাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও ত হলে সে আর কখনো এ কাজ করবে না।

ক্যাপ্টেন বলল, তা সম্ভব নয়। তাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে মরতেই হবে।

যাবার সময় শেখ বলে গেল, মনে রেখ আজ রাতেই আমার বোনের ছেলে পালাবে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে সার্জেন্টকে ডাকল আর্মন্দ। বলল, এই কালো কুকুরটাকে নিয়ে যাও এখান থেকে। আর রাত্রিবেলায় শিবিরের কাছে কোন আরবকে দেখামাত্র গুলি করবে।

এই ঘটনাটা ঘটে তিন বছর আগে। তখন আচমেত হুদিনের বিচার হয় এবং তাতে তার প্রাণদণ্ড কার্যকরী হয়। আর তার একমাস পরেই ক্যাপ্টেন আর্মন্দের সাত বছরের মেয়ে জাঁ জ্যাকং রহস্যজনকভাবে অন্তর্হিত হয়। আরবরা তাকে চুরি করে নিয়ে যায়।

একটি উপনদীর ধারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে তালপাতার ছাউনিওয়ালা কুড়িটি কুঁড়ে ঘরে ভরা একটি গাঁ ছিল। সেই কুঁড়েগুলোর মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গায় আধডজন চামড়ার তাঁবুতে কতকগুলো আরব অস্থায়ীভাবে বাস করত।

আরবদের সেই তাঁবুগুলির একটিতে সেদিন দশ বছরের একটি মেয়ে তার পুতুলের জন্য ঘাসের একটি জামা তৈরী করছিল। তার চোখদুটি এবং মাথার চুলগুলি ছিল কালো এবং গায়ের রংটা ছিল ফর্সা। তার নাম ছিল মিরিয়েম।

জীবনে প্রথম আফ্রিকার জঙ্গলে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতাটা কখনো ভুলতে পারবে না জ্যাক।

সকালে সূর্য উঠতে তার মনে আশা জাগল নতুন করে। রাত্রিতে একটা গাছের ডালে আকুতের গায়ে গা দিয়ে রাত কাটিয়েছে। সকাল হতেই জ্যাক আকুৎকে ডেকে বলল, ওঃ, আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। কিছু খাবারের সন্ধান করতে হবে।

একদিন নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তারা একটা আদিবাসীদের গাঁয়ের সামনে এসে হাজির হলো। কতকগুলো ছেলেমেয়ে গাঁয়ের সামনেই ফাঁকা জায়গাটায় খেলা করছিল। কিন্তু ছেলেগুলো জ্যাককে দেখেই ভয়ে গাঁয়ের ভিতর পালিয়ে গেল। তাদের ভয়ার্ত চীৎকার শুনে গাঁয়ের পুরুষ যোদ্ধারা অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এল।

ব্যাপার দেখে আকুৎ একটা গাছের উপর উঠে পড়েছে। সে জ্যাককে পালাতে বলল, জ্যাকও হতাশ হয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে পালাতে লাগল। নিগ্রো যোদ্ধারাও তাকে তাড়া করল। কিন্তু জ্যাক গাছের উপর উঠেই আকুতের সঙ্গে গাছের ডালে ডালে জঙ্গলের গভীরে চলে গেল। নিগ্রোরা জঙ্গলের ভিতরে অনেক দূর গিয়ে তাদের খোঁজ করতে লাগল। জ্যাক আকুতের সঙ্গে না গিয়ে গাছে গাছে তাদের অনুসরণ করতে লাগল। সে যখন দেখল নিগ্রো যোদ্ধারা অনেকটা এগিয়ে পড়েছে এবং তাদের একজন একা পিছিয়ে পড়েছে তখন সে গাছের উপর থেকে হঠাৎ লোকটার ঘাড়ের উপর অতর্কিতে লাফিয়ে পড়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার গলাটা জোরে টিপে ধরল। শ্বাসরোধ হয়ে লোকটা মারা গেলে সে তার সবকিছু কেড়ে নিয়ে আবার গাছের উপর উঠে পড়ল। তার বর্শাটা হাতে নিল। পরনের চামড়ার কৌপীনটা পরল। ছুরিটা কোমরে গুঁজে নিল। তারপর আকুতের কাছে সেই বেশে গিয়ে হাজির হয়ে গর্বের সঙ্গে বলল, আমি শুধু আমার হাত আর দাঁত দিয়ে একটা লোককে খুন করেছি।

আকুতের সঙ্গে জ্যাক কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ কিসের গন্ধ পেল বাতাসে। গন্ধ শুঁকে জ্যাক বুঝতে পারল একদল মানুষ আসছে। তার মনে হলো শ্বেতাঙ্গরা নিশ্চয় কোন বন্দরের দিকে যাচ্ছে। আনন্দে অন্তরটা লাফিয়ে উঠল জ্যাকের।

ধীর গতিতে এগিয়ে আসা দলটাকে জ্যাকই প্রথমে দেখতে পেল। গাছের উপর থেকে সে দেখল সামনে একদল নিগ্রো যোদ্ধা আসছে আর তাদের পিছনে একদল পিঠে মালের বোঝা নিয়ে ধীরগতিতে পথ হাঁটছে। মালবাহী লোকগুলোর দুধারে দুজন ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ হাতে চাবুক নিয়ে তাদের সঙ্গে হাঁটছে আর মাঝে মাঝে চারদিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে।

জ্যাক এগিয়ে গেল শ্বেতাঙ্গদের লক্ষ্য করে। জ্যাককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভীতিসূচক এক চীৎকারে ফেটে পড়ল একজন শ্বেতাঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে সে রাইফেল উঁচিয়ে জ্যাককে লক্ষ্য করে গুলি করল। গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটা গাছের ডালে লাগল।

ব্যাপার দেখে জ্যাক গাছের আড়ালে সরে গিয়ে গাছের উপরে উঠে পড়ল। আসলে ঐ দুজন ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ হলো কার্ল জেনসেন আর সেভেন মলবিন। ওরা হাতির দাঁতের অনেক বোঝা নিয়ে আরবদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পথ হাঁটছিল।

শেখদের গাঁ থেকে কার্ল জেনসেন আর মলবিন শিবির গুটিয়ে চলে যাবার পর থেকে দুবছর কেটে গেছে। তখন শেখ বাড়িতে ছিল না। কি একটা কাজে বিদেশে গেছে।

এদিকে জ্যাক আর আকুৎ ক্রমাগত বাঁদর-গোরিলাদের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল বনের মধ্যে। জ্যাক বর্শা ছোঁড়া শিখে বর্শা দিয়ে চিতাবাঘ, হরিণ, জেব্রা প্রভৃতি শিকার করতে লাগল। পথে যেতে যেতে এইভাবে শিকারের অভিজ্ঞতা বেড়ে যেতে লাগল তার।

একদিন রাত্রিবেলায় একটা বিরাট গাছের উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল ওরা দুজনে। এমন সময় জয়ঢাকের শব্দে দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেল, আকুৎ বলল, বাঁদর-গোরিলাদের ঢাকের শব্দ। ওরা দমদম নাচ নাচছে। এস কোরাক, আমাদের জাতির লোকদের কাছে এস।

কিছুদিন হলো জ্যাকের এক নতুন নাম রেখেছে আকুৎ। জ্যাককে আজকাল কোরাক বলে ডাকে। আকুৎদের ভাষায় 'কোরাক' শব্দের মানে হলো হত্যাকারী। ওরা দমদম নাচের বাজনার শব্দ অনুসরণ করে এগোচ্ছিল। কিছুটা গিয়ে ওরা আবার গাছের উপর উঠে ডালে ডালে যেতে লাগল।

নাচের জায়গাটার কাছাকাছি গিয়ে আকুৎ একটা শব্দ করতেই বাঁদর-গোরিলাদের রাজা এগিয়ে এল। আকুৎ বাঁদরদলের রাজাকে বলল, আমি হচ্ছি আকুৎ, বাঁদরদলের রাজা ছিলাম। আর এর নাম কোরাক, এর বাবা টারজন বাঁদরদলের রাজা ছিল। আমরা তোমাদের দলেই থাকব, তোমাদের সঙ্গে শিকার করে বেড়াব, শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করব।

বাঁদরদলের নবনির্বাচিত রাজা আকুৎ ও কোরাককে একবার দেখে নিল। ওদের দেখে মনে মনে ভয় হলো রাজার। সে গর্জন করতে করতে বলল, তোমরা চলে যাও, তা না হলে তোমাদের মেরে ফেলব।

কোরাকের মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে আকুতের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সে চীৎকার করে বলল, আমি কোরাক। আমি হচ্ছি মহা হত্যাকারী। আমি চলে যাব ঠিক, তবে যাবার আগে আমি দেখিয়ে দিয়ে যাব আমি আমার পিতা টারজনের মতই শক্তিশালী এবং আমি তোমাদের বা তোমাদের রাজাকে ভয় করি না।

বাঁদর-গোরিলাদের রাজা কোরাকের কথা শুনে বিস্ময়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কোরাকের দিকে গর্জন করতে করতে এগিয়ে এল। কোরাক একটা জোর লাফ দিয়ে বাঁদররাজাকে আক্রমণ করল। সে হাত দুটো বাড়িয়ে কোরাকের গলাটা ধরতে এলে দুটো হাতের ঘুষি সজোরে এক-সঙ্গে রাজার তলপেটে মারল। যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে সে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব বাঁদর-গোরিলাগুলো তাদের রাজাকে মারার জন্য কোরাককে একযোগে আক্রমন করার জন্য এগিয়ে আসতে লাগল। আকুৎ তখন কোরাককে কাঁধে চাপিয়ে একটা গাছের উপর উঠে পড়ল। তারপর ডালে ডালে লাফিয়ে বনের গভীরে চলে গেল। বাঁদর-গোরিলাগুলো কিছুক্ষণ ধরে তাদের পিছু পিছু তাড়া করে গেলেও তাদের ধরতে পারল না।

যেতে যেতে কোরাক দেখল একটা তাঁবুর সামনে একটি শ্বেতাঙ্গ বালিকা বসে একটা পুতুল নিয়ে খেলা করছে আপন মনে। তা দেখে মুখে হাসি ফুটে উঠল কোরাকের, হাতের উদ্যত বর্শাটা নামিয়ে নিল।

হঠাৎ কোরাক দেখল গাঁয়ের বাইরে কিসের গোলমাল শোনা যাচ্ছে। দেখল গাঁয়ের সর্দার একজন বুড়ো আরব শেখ লোকজন ও উটসমেত দীর্ঘদিন পর গাঁয়ে ফিরল বলে গাঁয়ের লোকরা সবাই ছুটে দেখতে যাচ্ছে তাকে।

কোরাক দেখল, একজন বৃদ্ধ শেখ কড়োর দিকে এগিয়ে আসছে। তার মনে হলো ঐ শেখই হয়ত মেয়েটির বাবা।

শেখ এসেই মেয়েটিকে লাথি মেরে ফেলে দিল। তারপর তার অভ্যাসমত সে মেয়েটিকে আবার ধরে হাত উঁচিয়ে মারতে গেল। কোরাক আর স্থির থাকতে পারল না। গাছ থেকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে শেখের পাশে এসে দাঁড়াল। তার বাঁ হাতে বর্শা থাকা সত্ত্বেও সে শুধু তার ডান হাত দিয়ে সজোরে একটা ঘুষি মারল শেখের মুখে। অচৈতন্য ও রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শেখ।

এবার মেয়েটির দিকে তাকাল কোরাক। মেয়েটি কোরাককে বলল, ও চেতনা ফিরে পেলেই আমাকে মেরে খুন করবে।

সে আরবী ভাষায় কথাটা বলল। কোরাক তা বুঝতে পারল না। মেয়েটি তখন কোরাকের কাছে এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল। মেয়েটির চোখে জল দেখে বিচলিত হয়ে সে মেয়েটির গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, এস আমাদের সঙ্গে। তুমি আমাদের সঙ্গে জঙ্গলেই বাস করবে।

আকুৎ একটু দূরে ছিল। আকুৎ দেখল কোরাক একটা মেয়েকে কাঁধে করে বয়ে আনছে। কোরাক আকুতের কাছে এসে বলল, এ আমাদের সঙ্গে যাবে।

কিন্তু আকুতের কাছে এসেই ভয় পেয়ে গেল

মিরিয়েম। কিন্তু যখন দেখল আকুং তার কোন ক্ষতি করছে না তখন আর ভয় করল না তাকে। ওরা মিরিয়েমকে সঙ্গে নিয়ে চলতে লাগল।

এরপর কয়েক মাস ওদের তিনজনের জীবনে বিচিত্র কোন কিছু ঘটল না। প্রথম প্রথম অসুবিধা হলেও মিরিয়েম আজকাল বন্যজীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে।

মিরিয়েম যাতে কিছুটা আরামে ও নিরাপদে ঘুমোতে পারে তার জন্য কোরাক একটা মাচা তৈরী করেছিল একটা গাছের উপর।

ওরা দিনের বেলায় যখন শিকার করতে যেত তখন মিরিয়েম তার পুতুলটাকে নিয়ে একা একা খেলা করত আর বনের যত সব ছোট ছোট বাঁদরগুলো তার চারদিকে কিচিরমিচির করত।

একদিন কোরাক আর আকুং যখন শিকার করতে গিয়েছিল তখন সে একা একাই খেলা করছিল বাঁদরগুলোর সঙ্গে। দিনের শেষে তার মনে হলো কোরাক আর আকুং আসছে। সে ভাবল আজ ঘুমিয়ে থাকার ভান করে সে ঠকাবে কোরাককে।

মিরিয়েম তাই চুপচাপ শুয়ে রইল চোখ বন্ধ করে। কিন্তু চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে মিরিয়েম দেখল একটা বাঁদর-গোরিলা তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে আসছে। তার পিছনে আর একটা বাঁদর-গোরিলা। সে তখন লাফ দিয়ে উপরের ডালে উঠে গিয়ে এডাল ওডাল করে বেড়াতে লাগল। বাঁদর-গোরিলা দুটোও তাকে ধরার জন্য পিছু পিছু তাড়া করল।

এইভাবে এডাল ওডাল করে ধরতে গিয়ে একবার একটা সরু ডাল মিরিয়েম ধরতেই ডালটা ভেঙ্গে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মিরিয়েম মাটিতে পড়ে গেল।

তখন বড় গোরিলাটা মিরিয়েমের অচেতন দেহটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে চলে গেল।

শিকার থেকে ফিরে এসে কোরাক দেখল গাছের মাচার উপর মিরিয়েম নেই। আর চারদিকে বাঁদর-গুলো কিচিরমিচির করছে। কতকগুলো বাঁদর বনের একটা দিকে ছোটাছুটি করছে। কোরাক বুঝল বাঁদরগুলো মিরিয়েমের বন্ধু। তারা যেদিকে ছুটছে সেইদিকে নিশ্চয় কেউ মিরিয়েমকে নিয়ে পালিয়েছে।

কোরাকও সেইদিকে গাছে গাছে তীরবেগে যেতে লাগল। কিছু দূর গিয়ে দেখল একটা বাঁদর-গোরিলা মিরিয়েমের অচেতন দেহটা কাঁধের উপর তুলে নিয়ে পালাচ্ছে।

কোরাককে দেখে বাঁদর-গোরিলাটা বুঝল কোরাক তার শিকার ছিনিয়ে নিতে এসেছে। সে তাই মেরিয়েমের অচেতন দেহটাকে মাটির উপর নামিয়ে রেখে কোরাককে আক্রমণ করল। কিন্তু তার আগেই কোরাক অতর্কিতে তাকে ধরে তার ঘাড়ে একটা জোর কামড় বসিয়ে দিয়েছে।

সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ঘাড়ে কামড় আর কয়েকটা ঘুষি খেয়ে ঘায়েল হয়ে পড়েছিল বাঁদর-গোরিলাটা। এমন সময় মিরিয়েম চেতনা ফিরে পেয়ে কোরাককে দেখেই চীৎকার করে উঠল আনন্দে। বলল, কোরাক, আমার কোরাক, ওকে মেরে ফেল। ও আমাকে নিয়ে পালাচ্ছিল।

কোরাক বর্শাটা তুলে নিয়ে তার ফলাটা তার গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে গোরিলাটার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। বাঁদর-গোরিলাটা আগেই ঘায়েল হয়েছিল। এবার সে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

কোরাক মিরিয়েমকে কি বলতে যাচ্ছিল। এতক্ষণে আকুৎও চলে আসে সেখানে কিন্তু আকুৎ তাকে ইশারায় কোন শব্দ করতে বারণ করল। ওরা কাদের পদশব্দ শুনতে পেল। প্রথমে দেখল একটা বাঁদর-গোরিলা অদূরে একট ঝোপের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি মেরে কি দেখছে। তারপর আর একটা গোরিলাও তাই করল। এইভাবে প্রায় চল্লিশটা পুরুষ ও মেয়েগোরিলা একে একে তাদের কাছে এসে দাঁড়াল। কোরাক বুঝল যে বাঁদর-গোরিলাটাকে ও মেরেছে এরা তারই দলের।

আকুৎ ওদের লক্ষ্য করে বলল, শক্তিশালী কোরাক তোমাদের রাজাকে হত্যা করেছে। এখন সে-ই তোমাদের রাজা। তোমাদের দলে তার থেকে শক্তিশালী আর কে আছে?

একথা শুনে বাঁদর-গোরিলারা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করতে লাগল। তারপর এক যুবক শক্তি-শালী বাঁদর-গোরিলা এগিয়ে এল কোরাকের কাছে।

বাঁদর-গোরিলাটাই প্রথমে আক্রমণ করল। কোরাক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। গোরিলাটা তার কাছে হাত বাড়িয়ে তার গলাটা ধরতে এলেই কোরাক জোরে তার মুখে আর একটা জোর ঘুষি মারল। তার চোয়াল থেকে রক্ত ঝরতে লাগল এবং সে পড়ে গেল মাটিতে। এরপর গোরিলাটা যতবার উঠতে চেষ্টা করতে লাগল ততবারই কোরাক একটা করে ঘুষি মারতে লাগল। অবশেষে একেবারে কায়দা হয়ে পড়লে তার ঘাড় ধরে কোরাক বলল, 'কাগোদা' অর্থাৎ হার মেনেছ?

এবার বাঁদর-গোরিলাটা বলল, কাগোদা। অর্থাৎ হ্যাঁ, হার মেনেছি।

কোরাক তখন বলল, তাহলে উঠে চলে যাও। যারা আমাকে একবার দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তাদের দলে গিয়ে আর রাজা হতে চাই না আমি।

কোরাক আকুতের দিকে তাকিয়ে ওদের বলল, তবে এই হবে তোমাদের রাজা।

আকুৎ দীর্ঘদিন পর তার মনের মত এক দল খুঁজে পেয়ে তাদের দলের সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু সে বলল, কোরাককে ছেড়ে কোথাও যাবে না। সে কোরাককে ঐ দলের সঙ্গে থাকতে বলল। কিন্তু কোরাক মিরিয়েমের কথা ভেবে রাজী হলো না।

কোরাক তাই বলল, তুমি ওদের সঙ্গে যাও আকুৎ। আমি তোমাদের কাছাকাছি থাকব। তোমরা যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব। তবে দলে থাকব না।

ফলে আকুৎই ওদের দলের রাজা হলো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আকুৎ তার দলের সঙ্গে ধীরে ধীরে চলে গেল। কিন্তু এমন সময় কোরাকের পিছনে একদল মানুষের চীৎকার শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল একদল সশস্ত্র কৃষ্ণকায় মানুষ তাকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে। মিরিয়েমের হাতে তখনো বর্শাটা ধরা ছিল।

যে গাঁ থেকে কোরাক আর আকুৎ পালিয়ে আসে এই নিগ্রোরা হলো সেই গাঁয়েরই লোক। এদের সর্দার ছিল কভুণ্ডু। মিরিয়েমকে দেখে কভুণ্ডু তার লোকদের বলল, আমি যখন একদিন আরব বস্তীতে এক শেখের ক্রীতদাস ছিলাম তখন শেখের বাড়িতে এই মেয়েটাকে দেখেছি। একে ধরে শেখকে দিতে পারলে সে মোটা পুরস্কার দেবে।

এই বলে সে পর পর দুটো তীর মারল কোরাককে লক্ষ্য করে। তীরদুটো তার ঘাড়ে আর একটা পায়ে লাগল। কোরাক পড়ে যেতেই নিগ্রোদের

সর্দার কভুণ্ডু কোরাককে বধ করে মিরিয়েমকে নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে এল।

কিন্তু এমন সময় তাদের চীৎকার ও হৈ চৈ শুনে আকুৎ তার দলবলকে নিয়ে ছুটে এল। বাঁদর-গোরিলাদের এক বিরাট দল দেখে কভুণ্ডু কোরাককে ছেড়ে দিয়ে শুধু মিরিয়েমকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

একটু সুস্থ হয়ে উঠে মিরিয়েমের খোঁজে অবশেষে কোরাক যখন কভুণ্ডুদের গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। একটা ঘরের কাছে গিয়ে সে বুঝল এই ঘরেই বন্দী আছে মিরিয়েম।

অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ঘরটার সামনের দিকে এসে কোরাক দেখল ঘরখানার ভিতরে হাত পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে মিরিয়েম আর ঘরের দরজার উপর একটা নিগ্রো বসে পাহারা দিচ্ছে।

কোরাক নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে অতর্কিতে লোকটার গলাটা জোরে টিপে ধরল। ক্রমে তার দেহটা অসাড় হয়ে ঢলে পড়ল। কোরাক তখন ঘরে ঢুকেই মিরিয়েমের হাত-পায়ের সব বাঁধন কেটে দিল।

কিন্তু কোরাক নিঃশব্দে মিরিয়েমকে কাঁধের উপর তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই একটা কুকুর কোরাককে দেখেই ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তখন সেই শব্দে গাঁয়ের লোকেরা সচকিত হয়ে ছুটে এল ঘরখানার দিকে। ততক্ষণে কোরাক মিরিয়েমকে কাঁধে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

এরপর তারা কোরাক যেপথে গিয়েছিল সেই পথে তাড়া করল তাকে। কভুণ্ডুর লোকেরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেলল তাদের। তখন কভুণ্ডু তাদের লোকদের বলল, আমাদের দরকার শুধু মেয়েটাকে, ওকে কেড়ে নিয়ে লোকটাকে তাড়িয়ে দাও। ওকে মারার দরকার নেই।

মিরিয়েমের হাত পা বেঁধে আবার ওকে ওরা গাঁয়ের ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাদের সর্দার কভুণ্ডুর

ঘরের মধ্যে রেখে দিল।

কিন্তু মিরিয়েম জানত না কভুণ্ডু তাকে আর গাঁয়ের মধ্যে বেশী দিন রাখতে চায় না। সে শেখের কাছে দূত পাঠিয়েছে। মিরিয়েমকে তার হাতে তুলে দিলে সে কি পুরস্কার তাদের দেবে একথা জানতে চেয়েছে।

এদিকে কভুণ্ডু জানতে পারেনি তার দূত কার্ল জেনসেন আর মলবিনের হাতে ধরা পড়ে। কার্লদের ক্রীতদাসদের কাছে কভুণ্ডুর দূতটা মিরিয়েমের কথাটা ফাঁস করে দেয়। এরপর কার্লরা মিরিয়েমকে পাবার জন্য কভুণ্ডুদের গাঁয়েব দিকে রওনা হলো।

কিন্তু ওদের গাঁয়ে গিয়ে বন্দিনী মিরিয়েম সম্পর্কে কিছু বলল না কার্লরা। তবে কভুণ্ডুর সঙ্গে একথা সেকথা বলতে গিয়ে মলবিন শেখের মৃত্যুর খবরটা দিয়ে ফেলল। কভুণ্ডু আশ্চর্য হয়ে মাথা চুলকাতে লাগল। মলবিন বলল, সেকি! তুমি জান না?

কভুণ্ডু তখন দেখল বন্দিনী মেয়েটার আর দাম নেই। শেখের হাতে মোটা পুরস্কারের বিনিময়ে তুলে দেবার জন্যই ও রেখেছিল মেয়েটাকে। সে তাই কার্লদের বলল, তোমরা কিনবে মেয়েটাকে?

জেনসেন বলল, পথে ওকে নিয়ে যেতে আমাদের কষ্ট হবে, তাছাড়া মেয়েটা বুড়ী।
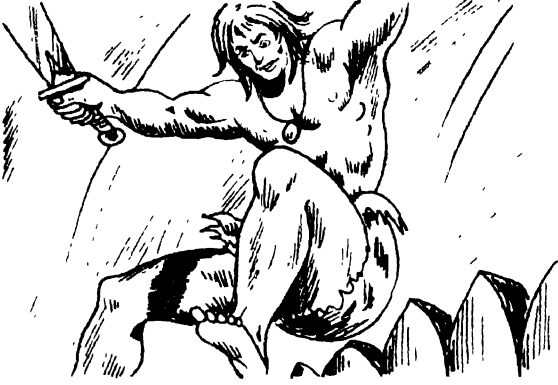
কভুণ্ডু বলল, আমি তোমাদের দেখাব। ও মোটেই বুড়ী নয়, তরুণী এবং সুন্দরী।

এই বলে কভুণ্ডু ওদের ঘরটার মধ্যে নিয়ে গিয়ে মিরিয়েমকে দেখাল। তার বাঁধন খুলে দিল।

তারপর কভুণ্ডু মিরিয়েমকে বিক্রি করে ওদের শিবিরে পাঠিয়ে দিল।

ওদের কথাবার্তা মিরিয়েম বুঝতে না পারলেও একটা কথা বুঝতে পারল। বুঝল মলবিন লোকটা খারাপ এবং তার কবল থেকে জেনসেন তাকে উদ্ধার করেছে। জেনসেন তাকে বলল, যদি ও কখনো তোমার কোন ক্ষতি করতে যায় তাহলে আমাকে চীৎকার করে ডাকবে।

মিরিয়েম তখন জেনসেনকে বন্ধু ভেবে বলল, আমাকে মুক্ত করে দাও, আমি কোরাকের কাছে যাব।

কিন্তু জেনসেন বলল, তুমি নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলে শাস্তি পাবে।

রাত্রিটা শিবিরে কাটিয়ে পরদিন সকালে যাত্রা শুরু করল ওরা। এইভাবে তিন দিন কেটে গেল।

একদিন মিরিয়েমকে রেখে জেনসেন ও মলবিন শিকার করতে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মলবিন শিকার না করেই ফিরে এল। তাকে দেখে ভয়ে চমকে উঠল মিরিয়েম। মলবিন তাকে ধরতে গেলে জেন-সেনের নির্দেশমত সে জেনসেনকে ডাকতে লাগল চীৎকার করে।

এমন সময় কার্ল জেনসেন শিকার থেকে ফিরল। মিরিয়েমের আর্ত চীৎকার সে শুনতে পেয়েছিল।

জেনসেনকে দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মলবিন। সে তার রিভলবারটা বার করে গুলি করল জেনসেনকে লক্ষ্য করে। জেনসেন লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর ভিতর এক লম্বা চেহারার অচেনা শ্বেতাঙ্গ ঢুকেই মলবিনের ঘাড়ের উপর হাত রাখল। শ্বেতাঙ্গ লোকটি বনের মধ্যে শিকার করতে থাকাকালে মিরিয়েমের আর্ত চীৎকার শুনে এই তাঁবুতে এসে হাজির হয়। সে মিরিয়েমকে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপারটা কি?

মিরিয়েম আরবী ভাষায় বলল, এরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

এরপর মলবিনকে দেখিয়ে মিরিয়েম বলল, এই লোকটা আমার ক্ষতি করতে যাচ্ছিল। যে লোকটা এইমাত্র মারা গেছে সে এই লোকটাকে বাধা দিতে গেলে তাকে হত্যা করে এই বদ লোকটা।

অপরিচিত শ্বেতাঙ্গ লোকটি মলবিনকে বলল, মৃত্যুই তোমার যোগ্য শাস্তি। অবশ্য আমি তোমায় এখন মারব না। তবে তোমাকে এখনি আমাদের এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। না গেলে এর পর বুঝবে আমি কে।

মলবিন বলে গেল সেই অপরিচিত শ্বেতাঙ্গ মিরিয়েমকে বলল, তুমি একা এই জঙ্গলে কোথায় খুঁজবে তোমার সাথীকে। তার চেয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে আমার বাড়িতে চল। সেখানে আমার স্ত্রীর কাছে থাকবে। সে তোমাকে পেয়ে খুশি হবে।

রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহে কোরাক জঙ্গলের মধ্যে এসে বেবুনদের খোঁজে এগিয়ে যেতে লাগল।

বেবুনদের রাজা কোরাককে চিনতে পেরে বলল, তুমি কোরাক। এস আমরা একসঙ্গে শিকার করব। আমি তোমার বন্ধু।

কোরাক বলল, আমি এখন শিকার করতে পারব না। গোমাঙ্গানী অর্থাৎ নিগ্রোরা আমার মিরিয়েমকে চুরি করে নিয়ে গেছে। চল আমরা একযোগে গোমাঙ্গানীদের গাঁ আক্রমণ করে মিরিয়েমকে উদ্ধার করি। তারা তাকে সাহায্য করতে রাজী হলো।

তখন একযোগে তারা সকলে মিলে কভুণ্ডদের গাঁয়ের দিকে যাত্রা শুরু করল। পার্বত্য বেবুনদের সংখ্যা প্রায় দু'তিন হাজার হবে। ওরা যখন কভুণ্ডদের গাঁয়ের কাছে গিয়ে পৌঁছল তখন ভর দুপুর।

বেবুনদের চীৎকার শুনে কভুণ্ডদের গাঁয়ের নিগ্রোরা বেরিয়ে এল। মেয়েরা তাদের ছেলেদের নিয়ে গাঁ ছেড়ে ভয়ে পালাতে লাগল।

কোরাক তখন প্রতিটা ঘর খুঁজে দেখল। কিন্তু মিরিয়েমকে কোথাও পাওয়া গেল না।!

বেবুনরাও তখন ক্লান্তদেহে এক জায়গায় বসে বিশ্রাম করতে লাগল। অবশেষে মিরিয়েমকে না পেয়ে হতাশ হয়ে কিছু নিগ্রোকে বন্দী করে তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল।

নতুন বাড়িতে এসে মিরিয়েমের দিনগুলো ভালই কাটতে লাগল। বাড়ির মালিক যে তাকে উদ্ধার করেছে তাকে সে আরবী ভাষায় 'বাওনা' বলে ডাকত। মালিক ও তার স্ত্রী ইংরিজিতে কথা বলত। কিছুদিন পরে মরিসন বেনেস নামে এক ইংরেজ যুবক তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে জঙ্গলে শিকারের আশায়। মিরিয়েমের বেশ ভাব হয়ে যায় তার সঙ্গে।

সেদিন মিরিয়েম আর বাওনা বাংলোর বারান্দাতে বসেছিল। এমন সময় দূরে একজন শ্বেতাঙ্গ অশ্বারোহী বাংলোর গেটের কাছে এসেই বাওনাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, আমি দক্ষিণ থেকে আসছি। শিকার আর ব্যবসার জন্য আফ্রিকার এ অঞ্চলে এসেছি আমি। আমার লোকজন দক্ষিণাঞ্চলে এক শিবিরে আছে। আমি আপনার নাম শুনেছি। আপনার অনুমতি ছাড়া এখানে কেউ শিকার করতে পায় না। আমি কয়েক সপ্তাহ এ অঞ্চলে শিবির স্থাপন করে শিকার করতে চাই।

বাওনা বলল, আপনি তাহলে নদীর ধারে আমার খামারের কাছাকাছি শিবির স্থাপন করতে পারেন এবং সেখান থেকে শিকার করে বেড়াতে পারেন।

আগন্তুক বলল, আমার শিবির যেখানে আছে সেখানেই থাক, কারণ আমার লোকরা বড় ঝগড়াটে।

আগন্তুক তার নাম বলল, হ্যানসন।

ক্রমে হ্যানসন পরিবারের বন্ধু হয়ে দাঁড়াল।

হ্যানসন প্রায়ই বাংলোর ফুলবাগানে এসে একা একা বেড়াত। বলত সে খুব ফুল ভালবাসে।

একদিন রাত্রিবেলায় ঘুম আসছিল না মিরিয়েমের। আজ সন্ধ্যার সময় মরিসন বেনেস তার কাছে তার প্রেমের কথাটা আবার তোলে। ফলে সেকথা ভাবতে গিয়ে ঘুমোতে পারেনি সে। সে তাই একা একা বাগানে চলে আসে। এসে দেখে হ্যানসন বাগানে এক জায়গায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেল মিরিয়েম। দেখল বেনেস ঘোড়ায় চেপে তার দিকে এগিযে আসছে। মিরিয়েম বলল, আমার ঘুম আসছে না। চল জঙ্গলে গিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি।

ফাঁকা মাঠ পার হয়ে জঙ্গলের ধারে গিয়ে মিরিয়েম বলল, চল বনের ভিতর যাই, বনের এদিকটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা, কোন অসুবিধা হবে না।

বেনেসের ভয় লাগলেও সে বলল, হ্যাঁ, তাছাড়া এ অঞ্চলে মানুষখেকো সিংহেব বড একটা দেখা পাওয়া যায় না।

কোরাক দেখল একজন শ্বেতাঙ্গ একজন শ্বেতাঙ্গ মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু মেয়েটি যে মিরিয়েম এটা সে বুঝতে পারল না। তবে দেখতে পেল ঝোপের উপর একটা সিংহ ওং পেতে আছে। সে যাই হোক, মেয়েটিকে ক্ষুধার্ত সিংহের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য হাতি নিয়ে অপেক্ষা করছিল সে। এবার সিংহটা হঠাৎ গর্জন করে উঠতেই তার উপর চোখ পড়ল তাদের।

মিরিয়েম ছুটে গিয়ে তার ঘোড়াটার উপর চাপতেই সিংহটা লাফ দিল তাকে ধরার জন্য আর সঙ্গে সঙ্গে কোরাকও হাতির পিঠ থেকে একটা বর্শা ছুঁড়ে সিংহের একটা কাঁধ বিদ্ধ করল। মিরিয়েম ততক্ষণ ঘোড়ার পিঠ থেকে একলাফে একটা গাছের উপর উঠে পড়েছে। বেনেসও তার ঘোড়ার উপর চড়ে তীর বেগে পালিয়ে গেল। কোরাক বর্শাটা ছুঁড়েই হাতির পিঠে চড়ে চলে গেছে।

এদিকে সিংহটা আহত হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করল মিরিয়েমকে। কিন্তু সে গাছের উপর উঠে যাওয়ায় তার আর নাগাল পেল না। সিংহটা তবু আবার লাফ দিতেই তার পিছন থেকে হ্যানসন তার রাইফেল থেকে একটা গুলি করল সিংহটাকে লক্ষ্য করে। সিংহটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে পড়ে মরে গেল।

হ্যানসন তখন মিরিয়েমের নাম ধরে ডাকতেই মিরিয়েম গাছের উপর থেকে সাড়া দিল। বলল, এই যে, আমি এখানে। সিংহটা মরেছে?

হ্যানসন বলল, হ্যাঁ, নেমে এস। খুব বেঁচে গেছ। রাত্রিতে জঙ্গলে আর বেড়িও না। তোমার এতে শিক্ষা হওয়া উচিত।

সিংহটা মরে যেতে বেনেস ওদের কাছে এগিয়ে এল। তখন তিনজনে বাংলোর পথে রওনা হলো।

এদিকে ওদের জন্য বাংলোর বারান্দাতে তখন বাওনা অধীর আগ্রহে এবং গভীর উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছিল। হ্যানসনের রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনে তার হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। উঠে দেখে বাড়িতে মিরিয়েম বা মরিসন কেউ নেই। তাদের ঘোড়াদুটোও নেই। বাংলোর গেট খোলা।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা তিনজন বাংলোতে এসে পড়ল। হ্যানসন ঘটনার যে বিবরণ দিল তাতে সন্তুষ্ট হলো না বাওনা। মিরিয়েম দেখল বাওনা খুব রেগে গেছে। বাওনা তাকে বলল, তোমার ঘরে যাও মিরিয়েম

তারপর বেনেসকে বাওনা বলল, আমার পড়ার ঘরে এস, একটা কথা আছে।

এই বলে বাওনা হ্যানসনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি কোথায় এবং কি করে দেখলে হ্যানসন?

হ্যানসন বলল, আমি রাত্রিতে মাঝে মাঝে ফুলবাগানে এসে বসে থাকি। আজও ছিলাম। এমন সময় দেখি ওরা ঘোড়ায় চেপে দুজনে বেরিয়ে গেল। এত রাতে এভাবে বেড়াতে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয় ভেবে আমিও ঘোড়ায় করে অনুসরণ করতে লাগলাম ওদের। তারপর ওরা যখন বনের ধারে একজায়গায় বসে গল্প করছিল তখন হঠাৎ একটা সিংহ ওদের আক্রমণ করে। আমি তখন সিংহটাকে গুলি করে মারি।

হ্যানসন আরও বলল, সন্ধ্যের সময় প্রায়ই বাগানে আসায় ওদের অনেক কথাই শুনতে পাই। বেনেস

মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে যাবার একটি পরিকল্পনা করছিল। আমি বলি কি, আগামীকাল সকালে আমি যখন এখান থেকে উত্তরাঞ্চলে চলে যাচ্ছি তখন আপনি ওকেও আমার সঙ্গে যেতে বলুন।

বাওনা বলল, শুধু এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে বেনেসের উপর আমি কোন অভিযোগ আনতে পারি না। সে আমার অতিথি।

এরপর পড়ার ঘরে গিয়ে বেনেসকে বাওনা বলল, কাল সকালে হ্যানসন উত্তর দিকে রওনা হচ্ছে। সে বলছিল তুমি যদি তার সঙ্গে যাও ত সে খুশি হবে।

পরদিন হ্যানসন যখন বেনেসকে সঙ্গে করে তার শিবিরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন বেনেস এক নীরব গাম্ভীর্যে স্তব্ধ হয়ে ছিল।

একসময় হ্যানসন বলল, আমি হলে মেয়েটাকে কিছুতেই ছাড়তাম না। তবে এ ব্যাপারে আমার সাহায্যের যদি দরকার হয় তাহলে বলবে। মেয়েটি যদি তোমাকে ভালবাসে তাহলে অবশ্যই সে তোমার সঙ্গে যাবে।

বেনেস বলল, এখানে তা সম্ভব নয়। চারদিকে ওর লোকজন পাহারায় আছে। ধরে ফেলবে আমাদের।

হ্যানসন বলল, না, ধরতে পারবে না। আমিও এ অঞ্চলে দশ বছর ধরে ব্যবসা করছি। আমারও

জানাশোনা কম নেই এখানে। আমি বলছি তুমি একটা চিঠি লিখে দাও। আমি একটা লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি মেয়েটিকে লিখে দাও ও এসে পত্রপাঠ যেন দেখা করে তোমার সঙ্গে।

কথাটা মানতে মন চাইছিল না বেনেসের। তবু সে বুঝল হ্যানসন ঠিকই বলেছে। সে তখন একটা চিঠি লিখল মিরিয়েমকে। একটা লোক মারফৎ চিঠিটা পাঠিয়ে দিল হ্যানসন। তারপর আবার এগিয়ে চলল ওরা।

পথের ধারে একটা গাছ থেকে ওদের দেখে চিনতে পারল কোরাক। সে বুঝতে পারল বেনেস নামে ইংরেজ যুবকটাকে মিরিয়েমের মত দেখতে সেই মেয়েটির সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে সে। মেয়েটা দেখতে ঠিক মিরিয়েমের মত। তাকে দেখলেই মিরিয়েমকে মনে পড়ে যায় তার। কোরাক তাই ভাবল এই যুবকরা কোথায় শিবির স্থাপন করে তা সে লক্ষ্য রাখবে।

এদিকে মিরিয়েম সেদিন সন্ধ্যায় বাংলোর বারান্দাতে অশান্তভাবে পায়চারি করছিল আর বেনেসের কথা ভাবছিল।

চাঁদের আলোয় বাগানে বেড়াতে বেড়াতে বেড়ার কাছে চলে গেল। সহসা কার চাপা পদশব্দ শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। সে চাঁদের আলোয় দেখতে পেল একটা নিগ্রো বেড়ার ওধার থেকে একটা চিঠি দিয়ে চলে গেল। চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে সেটা পড়ে দেখল মিরিয়েম। তাতে বেনেস লিখেছে, তোমার সঙ্গে একবার দেখা না করে আমি যেতে পারছি না। কাল সকালে বনের ধারে ফাঁকা জায়গাটায় এস। একা আসবে।

পরদিন সকাল না হতেই শিবির থেকে বেরিয়ে পড়ল বেনেস ঘোড়ায় করে। বেলা ন'টার সময় সে সেই ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছল। এদিকে কোরাকও তাকে গাছে গাছে অনুসরণ করে সেই জায়গায় পৌঁছল। অনেকক্ষণ ধরে সেখানে অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল বেনেস। কোরাকও গাছের উপর সমানে বসে রইল।

অবশেষে মিরিয়েমের ঘোড়াটা দেখা গেল বাংলোর গেটের কাছে। ক্রমে সে এগিয়ে এল। তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে দুটি মানুষ।

মেয়েটি কাছে এলে তাকে চিনতে পারল কোরাক। সে-ই মিরিয়েম। তার বুকটাকে যেন কে বিদ্ধ করল। মিরিয়েম তাহলে বেঁচে আছে, মরেনি। একবার ভাবল একটা বিষাক্ত তীর মেরে ইংরেজ যুবকটির প্রাণনাশ করবে সে। কিন্তু আবার ভাবল মিরিয়েম যাকে ভালবাসে তাকে হত্যা করবে না সে কখনো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেনেস ঘোড়া ছুটিয়ে তার শিবিরের দিকে চলে গেল। কোরাকও তাকে অনুসরণ করে শিবিরের কাছে একটা গাছের উপর উঠে বসে রইল। সে ভাবল নিশ্চয় আজ রাতে বেনেস আবার সেই ফাঁকা জায়গাটায় মিরিয়েমকে আনতে যাবে। কিন্তু সন্ধ্যে হতেই সে দেখল বেনেসের পরিবর্তে অন্য এক শ্বেতাঙ্গ এক নিগ্রো ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো।

রাত্রি প্রায় ন'টার সময় মিরিয়েম তার ঘোড়ায় চেপে হ্যানসনের কাছে এল। বেনেসকে দেখতে না পেয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল সে। হ্যানসন বলল, বেনেস ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত পেয়েছে। আজ রাতটা সে বিশ্রাম করবে। তাই আমাকে পাঠিয়ে দিল। নাও, তাড়াতাড়ি করো, তা না হলে আমরা ধরা পড়ে যাব।

পরের দিন দুপুরের দিকে ওরা বন পার হয়ে একটা নদীর ধারে এসে পৌছল। নদীর ওপারে একটা শিবির দেখা গেল। শিবিরটা দেখে মনে আশা হলো মিরিয়েমের। নদীটা পার হয়ে মিরিয়েম বলল, বেনেস কোথায়?

হ্যানসন শিবিরের একটা ঘর দেখিয়ে বলল, ঐ ঘরে।

কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে বেনেসকে দেখতে না পেয়ে ভয় পেয়ে গেল মিরিয়েম। হ্যানসনের মুখে এক ক্রুর হাসি ফুটে উঠল।

মিরিয়েম বুঝতে পারল হ্যানসন তাকে ঠকিয়েছে। হ্যানসন ক'দিন ধরে দাড়ি কামায়নি বলে তার মুখে

বেশ দাড়ি গজিয়ে উঠেছে। এবার তার মুখপানে তাকিয়ে মিরিয়েম বেশ বুঝতে পারল আসলে এই হ্যানসনই শয়তান মলবিন।

যে নিগ্রো ভৃত্যটিকে বনের প্রান্তে দাঁড় করিয়ে রেখে মিরিয়েমের সঙ্গে দেখা করতে যায় মলবিন সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। রাত গভীর পর্যন্ত অপেক্ষা করেও সে যখন দেখল তার মালিক হ্যানসন ফিরে এল না তখন সে একটা গাছের উপর উঠে পড়ল।

এদিকে মরিসন বেনেস সারারাত একটুও ঘুমোতে পারেনি। বেনেস বুঝতে পারল মেয়েচুরির জন্য বাওনা অবশ্যই তাদের খোঁজ করবে। তাই সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিবির তুলে দিয়ে রওনা হলো।

দুপুরের দিকে হ্যানসনের সঙ্গী সেই নিগ্রো ভৃত্যটি ঘর্মাক্ত দেহে ওদের কাছে এসে হাজির হলো। এসেই সে অন্যান্য নিগ্রো ভৃত্যদের হ্যানসনের শয়তানির কথা সব বলল।

তার কথা শুনে সবাই হ্যানসনের উপর রেগে গেল। বেনেস সব কথা শুনে হ্যানসনের বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা বুঝতে পারল। বুঝল তাকে এতখানি বিশ্বাস করা উচিত হয়নি।

সেই নিগ্রো ভৃত্যটিকে ডেকে বেনেস বলল, তোমার মালিক কোথায় গেছে তা তুমি জান? সেখানে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?

ভৃত্যটি বলল, হ্যাঁ, পারব মালিক। অনেক দূরে একটা বড় নদীর ধারে সে তার কিছু লোককে পাঠিয়ে দিয়ে এক নতুন শিবির গড়ে তুলেছে।

এরপর বেনেস সর্দারকে বলল, তোমরা উত্তর দিকে যাও। আমি পরে ফিরে যাব।

এদিকে কোরাক যখন গাছের উপর উঠে দেখল ইংরেজ যুবক বেনেস সকালবেলায় উল্টো দিকে যাত্রা করল তখন সে একাই মিরিয়েমকে দেখার জন্য সেই বনের ধারে ফাঁকা জায়গাটার কাছে গিয়ে হাজির হলো। কিন্তু সেখানে মিরিয়েমকে দেখতে পেল না।

মিরিয়েম মলবিনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে হঠাৎ তার রিভলবারটা হাতে পেয়ে যায়। কিন্তু রিভলবারে কোন গুলি ছিল না। তখন মলবিন তাকে আবার ধরে ফেলে। কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মলবিনের রাইফেলটা তুলে নিয়ে তার বাঁট দিয়ে মাথায় সজোরে আঘাত করতেই অচেতন হয়ে পড়ে যায় সে।

সঙ্গে সঙ্গে শিবির থেকে বেরিয়ে বনের দিকে ছুটতে থাকে মিরিয়েম। সে ভাবল আবার তার বাওনার কাছে ফিরে যাবে। কিন্তু সে অনেক দূরের ও অনেক দিনের পথ।

এই ভেবে সে আবার শিবিরের কাছাকাছি গিয়ে গাছ থেকে দেখল মুখ থেকে রক্ত মুছতে মুছতে মলবিন তার সব লোক নিয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে গেল। শিবিরে কেউ নেই দেখে সে সোজা শিবিরের মধ্যে চলে গেল। তাঁবুর কোণে একটা বাক্সের মধ্যে কিছু গুলি, একটি বাচ্চা মেয়ের ফটো আর কিছু খবরের কাগজের কাটা টুকরো পেল। এইসব কিছু তার পকেটে ভরে নিল সে। কিন্তু তার এই ছেলেবেলাকার ফটোটা মলবিনের কাছে কিকরে এল, কি করেই বা তা খবরের কাগজে ছাপা হলো তা সে বুঝতে পারল না।

এমন সময় মলবিনের গলা শুনতে পেল। ও তাঁবুর দিকে ফিরে আসছে। তখন মিরিয়েম তাঁবুর পিছন থেকে ত্রিপলটা উঠিয়ে গুঁড়ি মেরে বাইরে চলে গেল। তারপর ভৃত্যদের ঘরের পাশে যে একটা বড় গাছ ছিল তার উপর উঠে পড়ল।

সেখান থেকে লক্ষ্য করল মিরিয়েম নদীর ঘাটে দু-তিনটে ছোট ডিঙ্গি নৌকো রয়েছে। নদীর ওপারে ঘন বন। নদীটা পার হয়ে সেই বনে যেতে পারলে সে অনেকটা নিরাপদ হবে। ভাবল এখন দিনের শেষ। অন্ধকার হলেই নদীটা পার হবে সে।

সে দেখল মলবিন আর একবার তার খোঁজ করে তার লোকদের নিয়ে দুটো নৌকোয় করে ওপারে চলে গেল। একটা নৌকো রয়ে গেল।

ওদিকে মলবিন ওপারে গিয়ে লক্ষ্য রাখছিল নৌকোটার উপর। সে জানত আজ হোক কাল হোক ঐ নৌকোটা করে মিরিয়েম নদী পার হয়ে পালাবে। হঠাৎ সে দেখল সত্যিই মিরিয়েম নৌকোয় করে নদীর প্রায় মাঝখানে এসে পড়েছে।

তখনি মলবিন তার লোকদের নিয়ে নৌকোয় চেপে মিরিয়েমের নৌকোটাকে ধরতে গেল। মিরিয়েমের নৌকোটা কূলের কাছাকাছি যেতেই নৌকো থেকে নেমেই মিরিয়েম জঙ্গলের দিকে ছুটতে লাগল। মলবিন যখন দেখল মিরিয়েমকে ধরার আর কোন উপায় নেই তখন সে তার রাইফেলটা নিয়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করল। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। মিরিয়েম জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে বেনেস সেই ভৃত্যকে নিয়ে নদীটার ধারে এসে পড়ল। ভৃত্যটি বলল, আমরা এসে পড়েছি মালিক। কিছুক্ষণ আগেই তারা মলবিনের রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। নদীর ধারে এসে বেনেস বলল, নদীটা পার হব কি করে?

নিগ্রো ভৃত্যটি তখন নদীর কোলের কাছে একটা গাছের তলায় একটা ছোট ডিঙ্গি নৌকো দেখতে পেল। ওরা দুজনে নৌকোটায় উঠতেই নৌকোটা তীর বেগে ছুটে যেতে লাগল ওপারের দিকে। নদীর মাঝখানে গিয়ে বেনেস দেখতে পেল ওপারের ঘাটে একটা নৌকো থেকে কয়েকজন লোক নামছে। প্রথমে যে নামল সে হলো মলবিন।

এবার মলবিনও দেখতে পেল মাঝ নদীতে একটা নৌকোতে করে বেনেস ও একজন নিগ্রো লোক তাদের দিকে আসছে।

তাই মলবিন চীৎকার করে বলল, কি চাও?

বেনেস উত্তরে বলল, শয়তান কোথাকার, কি চাই?

এই বলে সে রিভলবার থেকে গুলি করল মলবিনকে লক্ষ্য করে। মলবিনও তার রাইফেল থেকে গুলি করল বেনেসকে লক্ষ্য করে। মলবিনের একটা গুলি বেনেসের নিগ্রো ভৃত্যটির কপালে বিদ্ধ হওয়ায় সে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। বেনেসের নৌকোটা স্রোতের টানে ভেসে চলল। বেনেস আবার গুলি করল এবং তার আঘাতে নদীর ঘাটে পড়ে গেল মলবিন।

ক্রমে নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল বেনেসের নৌকোটা।

গাঁয়ের পথ অর্ধেকটা পার হবার আগেই কতকগুলো সাদা পোশাকপরা নিগ্রো পাশের কুঁড়েগুলো থেকে অকস্মাৎ লাফিয়ে উঠল। মিরিয়েম পালাবার চেষ্টা করতেই একজন তাকে ধরে ফেলল। মুখ ঘুরিয়েই মিরিয়েম দেখল তার সামনে সেই বুড়ো শেখ দাঁড়িয়ে আছে। ভূত দেখে যেন চমকে উঠল মিরিয়েম।

শেখ বলল, তাহলে আবার ফিরে এসেছ তুমি আমার কাছে। এসেছ খাদ্য আর আশ্রয়ের সন্ধানে।

মিরিয়েম বলল, না, আমি কিছুই চাই না।

আমি শুধু আমার বড় বাওনার কাছে ফিরে যেতে চাই।

শেখ বলল, বড় বাওনার কাছেই তুমি তাহলে এতদিন ছিলে? বড় বাওনাই নদী পার হয়ে এখন তোমাকে খুঁজতে আসছে।

মিরিয়েম বলল, না, যে সুইডিস লোকটাকে তুমি একদিন গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে এবং যে একদিন আমাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য মবিদার সঙ্গে চক্রান্ত করেছিল ও হচ্ছে সেই।

সঙ্গে সঙ্গে শেখ তার লোকদের হুকুম দিল তারা যেন নদীর ধারে মলবিনকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে মেরে ফেলে।

কিন্তু শেখ সদলবলে নদীর দিকে যাবার আগেই মলবিন পালিয়ে যায়। সে মরেনি। বেনেসের নৌকোটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সে উঠেই শেখকে দেখতে পায়। শেখকে সে দারুণ ভয় করত। তাই মুহূর্তের মধ্যে গা-ঢাকা দেয়।

মলবিনকে না পেয়ে শেখ মিরিয়েমকে বন্দী করে তার গাঁয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

দুদিন ক্রমাগত পথ চলার পর শেখ তার গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছল।

গাঁয়ে যেতেই অনেক লোক ভিড় করে এল মিরিয়েমকে দেখার জন্য। মিরিয়েম এখন অনেকটা বড় হয়েছে।

অচৈতন্য বেনেসকে নিয়ে নৌকোটা স্রোতের টানে ভেসে চলছিল। চেতনা ফিরে পেয়ে বেনেস দেখল তখন রাত্রিকাল। আহত অবস্থায় নৌকোতে সে সম্পূর্ণ একা।

সে কোনরকমে একটু বসে হাত দিয়ে জল কেটে নৌকোটাকে কূলের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু বনের কাছে কোনরকমে যেতেই একটা সিংহের গর্জন শুনতে পেল সে। তার মনে হলো সিংহটা নদীর পারে যেন তারই জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কূলের কাছে একটা গাছের ডাল দেখতে পেয়ে নৌকোর উপর থেকে ডালটা ধরে ফেলল বেনেস। কিন্তু নৌকোটা থেকে পা দুটো তুলতেই নৌকোটা স্রোতের টানে চলে গেল। সে ঝুলতে লাগল। একবার ভাবল নদীতেই সে ঝাঁপ দেবে। কিন্তু পায়ের কাছে একটা কুমীরের হাঁ দেখে ভয়ে হিম হয়ে গেল সে। এমন সময় তার হাতের উপর একটা মাংসল বস্তু অনুভব করল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তাকে ধরে গাছের উপর তুলে নিল।

এদিকে কোরাক বনের মাঝে হাতির দল নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সেই গাছটার উপর শুয়েছিল। সেদিন সে এই গাছটার উপর যখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন একটা সিংহের ডাকে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে দেখতে পায় নদীর পাড়ে একটা সিংহ গর্জন করছে আর নদীর উপর সেই গাছটার একটা ডাল ধরে একটা লোক ঝুলছে। লোকটা অসহায় ভেবে সে তাকে গাছের উপর তুলে নেয়।

বেনেস ভাবল একটা উলঙ্গ গোরিলা তাকে ধরেছে। সে রিভলবারটা খাপ থেকে বার করে গুলি করতে যাচ্ছিল এমন সময় কে তাকে মানুষের ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি?

বেনেস বলল, হা ভগবান! তুমি মানুষ? আমি ত ভেবেছিলাম তুমি গোরিলা।

কোরাক বলল, তুমি কে?

বেনেস বলল, আমি এক ইংরেজ। নাম বেনেস। কিন্তু তুমি কে?

কোরাক বলল, আমাকে ওরা কোরাক বলে, তার মানে হত্যাকারী। আচ্ছা তুমিই কি সেই লোক যে বনের ধারে ফাঁকা জায়গাটায় একটি মেয়েকে নিয়ে গল্প করছিলে আর ঠিক তখনি একটা সিংহ তোমাদের আক্রমণ করে?

বেনেস বলল, হ্যাঁ।

এখানে কি করছিলে?

মেয়েটিকে চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছি।

কোরাক আশ্চর্য হয়ে বলল, কে তাকে চুরি করেছে?

কোরাককে তখন সব কথা খুলে বলল বেনেস। হ্যানসনের শিবিরটা কোথায় তাও বলল।

কোরাক তখন বলল, আমি তার শিবিরে যাচ্ছি।

এই বলে কোরাক রওনা হয়ে পড়ল গাছ থেকে নেমে। কোরাক অনেক দূর চলে গেলে বেনেস তার পিছু পিছু যেতে লাগল। বেনেস হঠাৎ তার পিছনে একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে পাশের একটা ঝোপে লুকিয়ে রইল। আড়াল থেকে দেখল সাদা আলখাল্লা পরা একটা আরব ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল উত্তর দিকে। কিছুক্ষণ পর আবার অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। কিন্তু এবার আর পথের ধারে লুকোবার কোন ঝোপ বা আড়াল পেল না।

বেনেস যখন পথ থেকে সরে যাচ্ছিল তখন আরবরা ঘোড়া থেকে নেমে তাকে ধরে ফেলল। তারা আরবী ভাষায় বেনেসকে কি বলল। কিন্তু বেনেস তা বুঝতে পারল না। তখন আরবদের সর্দার দুজনকে হুকুম দিল তারা যেন বেনেসকে বেঁধে শেখের বাড়িতে নিয়ে যায়। বাকী আরব অশ্বারোহীরা কোরাকের খোঁজে চলে গেল।

ততক্ষণে বেনেসের নির্দেশমত কোরাক সেই নদীটার ধার দিয়ে চলতে চলতে হ্যানসনের শিবিরটার উল্টো দিকে এসে পড়েছে। কিন্তু নদীটা পার হবে কি করে? এমন সময় একটা হাতির ডাক শুনতে পেয়ে তাকে ডাকল কোরাক।

হাতিটা কাছে এলে কোরাক বলল, আমাকে নদীটা পার করে ঐ শিবিরে নিয়ে চল।

কোরাককে শুঁড় দিয়ে পিঠে তুলে সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে শিবিরে গিয়ে হাজির হলো হাতিটা।

হ্যানসন তখন আহত অবস্থায় বাইরে শুয়েছিল। হাতিটা তার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে সে ভয় পেয়ে গেল।

কোরাক হাতিটাকে সেখানে থামতে বলে পিঠের উপর থেকে হ্যানসনকে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটি কোথায়?

হ্যানসন শুয়ে শুয়েই বলল, এখানে কোন মেয়ে নেই।

কোরাক বলল, শ্বেতাঙ্গ মেয়েটি কোথায়? মিথ্যা কথা বলো না। তুমি তাকে তাদের বন্ধুদের কাছ থেকে ভুলিয়ে এনেছ।

মলবিন বলল, আমি নই, বেনেস নামে একজন ইংরেজ তাকে চুরি করে লণ্ডনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

কোরাক বলল, আমি তার কাছ থেকেই আসছি। মেয়েটি তার কাছে নেই। সে আমাকে পাঠিয়েছে মেয়েটিকে নিয়ে যাবার জন্য। মিথ্যা কথা বলো না।

এই বলে হাতির পিঠ থেকে নেমে মলবিনের কাছে এগিয়ে গেল ভীতিবিহ্বল ভঙ্গিতে।

মলবিন বলল, আমার কোন ক্ষতি করো না, আমি তোমাকে সব কথা খুলে বলছি। মেয়েটিকে আমি এখানেই এনেছিলাম। কিন্তু সে নদী পার হয়ে পালিয়ে যায়। পরে শেখের হাতে ধরা পড়ে। আমি তাকে উদ্ধার করতে গেলে শেখ আমাকে তাড়িয়ে দেয়।

কোরাক আশ্চর্য হয়ে বলল, সে তাহলে শেখের মেয়ে নয়? তাহলে কার মেয়ে?

মলবিন বলল, তুমি তাকে আগে খুঁজে বার করো। তারপর আমি সব বলব। কিন্তু আমাকে যদি মেরে ফেল তাহলে তার কথা কিছুই জানতে পারবে না।

কোরাক বলল, আমি এখন শেখের গাঁয়ে যাব। সেখানে সে না থাকলে ফিরে এসে তোমাকে হত্যা করব।

মলবিনকে দেখার পরই হাতিটার মনে সন্দেহ জাগে। তখন সে তার দেহটা শুঁকে বুঝতে পারল এই লোকটাই কয়েক বছর আগে তার সাথীকে হত্যা করে। হাতিরা কখনো তাদের শত্রুকে ভোলে না, সে তাই একবার রাগে গর্জন করে মলবিনের দেহটা শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে তুলে নিল। মলবিন ভয়ে চীৎকার করে কোরাককে বলল, আমাকে বাঁচাও, মেরে ফেলল।

কোরাক ছুটে এসে হাতিটাকে বিরত করার চেষ্টা করলেও হাতিটা তার শুঁড় থেকে মলবিনকে মাটিতে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল। তারপর তার রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডটা তাঁবুর উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।

শেখের বাড়িতে বেনেসকে বেঁধে তার লোকেরা ধরে নিয়ে গেলে শেখ বেনেসকে ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি?

বেনেস বলল, আমি লণ্ডনের মরিসন বেনেস.
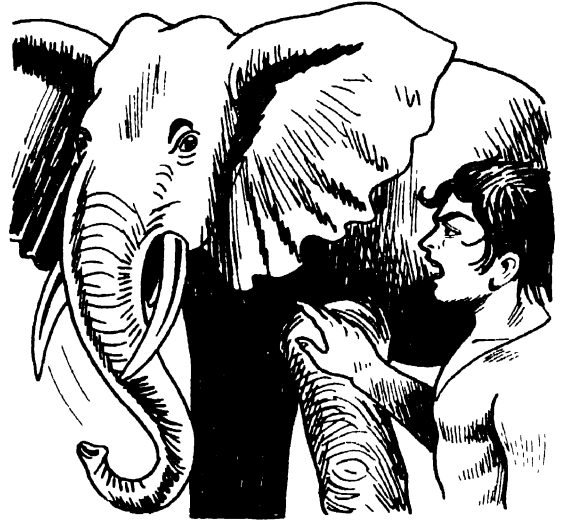
শেখ বলল, তুমি আমার দেশে কি করছিলে?

বেনেস বলল, তার বাড়ি থেকে অপহৃতা এক তরুণীর খোঁজ করছিলাম আমি। পথে তোমার লোকরা আমাকে ধরে।

শেখ বলল, তরুণী? তবে কি এই মেয়েটা?

মিরিয়েম তখন তাদের পিছনের সেই তাঁবুরই একদিকে বসেছিল। তাকে চিনতে পেরে বেনেস ডাকল, মিরিয়েম।

মুখ ঘুরিয়ে মিরিয়েম বলল, মরিসন!

বেনেস বুঝতে পারল না মিরিয়েম হানসনের কাছ থেকে এখানে কিভাবে এল।

শেখ তখন তার লোকদের বেনেসকে একটা ঘরে বন্দী করে রাখার হুকুম দিল। তারা হাত দুটো বেঁধে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে মেঝের উপর ফেলে দিল।

এমন সময় বেনেস শুনতে পেল পাশের ঘরে একজন পুরুষের সঙ্গে মিরিয়েমের জোর কথা-কাটাকাটি আর ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে। তা শুনে আর থাকতে পারল না বেনেস। সে অনেক চেষ্টা করার পর একটা হাতের বাঁধন খুলে ফেলল। পাশের ঘরে যাবার জন্য ঘর থেকে বার হতেই একটা নিগ্রো প্রহরী তার পথরোধ করে দাঁড়াল।

এদিকে কোরাক তার সেই হাতির পিঠে চেপে মিরিয়েমের খোঁজে শেখের গাঁয়ের কাছে এসে হাতির পিঠ থেকে নেমে পড়ল। তার কাছে একটা লম্বা দড়ি আর একটা ছুরি ছাড়া আর কিছু ছিল না। তারপর মিরিয়েমের খোঁজে আরবদের তাঁবুগুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল। তখন অনেক আরব খাওয়ার পর তামাক খাচ্ছিল তাঁবুর ভিতরে বসে।

শেখ তখনও ঘুমোয়নি। খাওয়ার পর মিরিয়েমকে ডাকল শেখ।

শেখ মিরিয়েমকে বলল, আমি বুড়ো হয়েছি। আর বেশীদিন বাঁচব না। আমি তাই তোমাকে আমার ভাই আলি বেন কাদিনের হাতে তুলে দিচ্ছি। তুমি এবার থেকে তারই কাছে থাকবে।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আলি বেন মিরিয়েমকে টানতে টানতে তার ঘরে নিয়ে গেল। মিরিয়েম প্রাণপণে তাকে বাধা দিচ্ছিল।

বেনেস তার ঘর থেকে বার হতেই একজন নিগ্রো প্রহরী তাকে বাধা দিল। বেনেস তাঁর গলাটা টিপে ধরতেই সে একটা ছুরি দিয়ে বেনেসের কাঁধে আঘাত করে। বেনেস তখন হাতের কাছে একটা পাথর পেয়ে তাই দিয়ে প্রহরীটার মাথায় আঘাত করতে থাকায় সে পড়ে গেল। তারপর মিরিয়েম যে তাঁবুতে ছিল সেইদিকে এগিয়ে গেল।

কোরাক তার আগেই সেই তাঁবুতে ঢুকে পড়েছে। আলি বেন তখনো মিরিয়েমের হাতটা ধরে ছিল। মিরিয়েম কোরাককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল।

কোরাক নীরবে আলি বেনের গলাটা ধরে বুকের উপর ছুরি মারল। আলি বেনের নিষ্প্রাণ দেহটা লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর। এমন সময় রক্তাক্ত দেহে টলতে টলতে বেনেস ঘরে ঢুকল। তখন শেখের লোকজন খবর পেয়ে তাঁবুর দিকে ছুটে আসছিল।

কোরাক বেনেসকে দেখে চিনতে পারল। বলল, তোমরা পালিয়ে যাও।

মিরিয়েম বলল, আর তুমি?

কোরাক বলল, পরে যাব আমি।

এই বলে যারা তাঁবুতে আসছিল তাদের সঙ্গে একা লড়াই করতে লাগল কোরাক। বেনেস মিরিয়েমকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে আরবরা এসে ঘিরে ধরল কোরাককে। সে একা অনেকক্ষণ ধরে লড়াই করল অনেকের সঙ্গে। কিন্তু ক্রমে সংখ্যায় ওরা অনেক বেড়ে যাওয়ায় আর পেরে উঠল না। তখন ওরা ওর হাত পা বেঁধে শেখের কাছে ধরে নিয়ে গেল।

শেখ তার লোকদের বলল, ওকে পুড়িয়ে মার।

একজন আরব শেখকে খবর দিল গাঁয়ের বাইরে গেটের কাছে একটা হাতি ঘোরাফেরা করছে। এমন সময় কোরাক একবার চীৎকার করল অদ্ভুতভাবে এবং হাতিটাও তার উত্তর দিল। ওরা কেউ কিন্তু এর মানে বুঝতে পারল না। গাঁয়ের মাঝখানে একটা খুঁটি পোঁতা ছিল।

কোরাককে সেই খুঁটিতে বেঁধে তার পাশের কাঠের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কোরাক আবার চীৎকার করে হাতিটাকে সঙ্কেত জানাল। হাতিটা ততক্ষণে প্রবল গর্জন করতে করতে কাঠের গেটটা জোরে ঠেলা দিতে গেটটা ভেঙ্গে গেল। তারপর উন্মত্তভাবে কোরাকের কাছে ছুটে গেল। তারপর শুঁড় দিয়ে খুঁটিটাকে জড়িয়ে ধরে তাকে পিঠের উপর তুলে নিয়ে ছুটে এসে গাঁ থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল। শেখ একটা রাইফেল তুলে হাতিটার সামনে পথের উপর দাঁড়িয়ে গুলি করল হাতিটাকে। কিন্তু গুলিটা লাগল না। তখন হাতিটা রেগে গিয়ে শেখকে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে গেল।
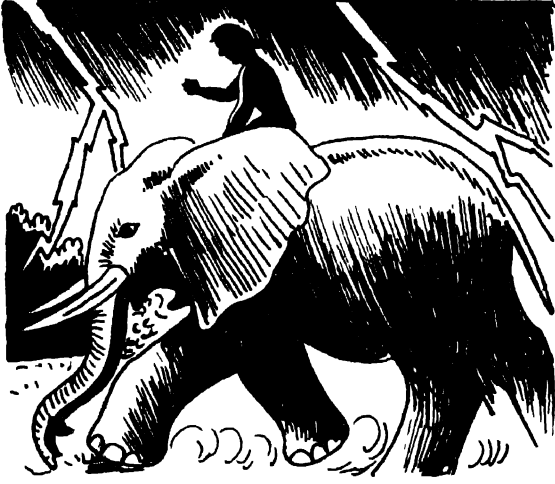
বেনেস আর মিরিয়েম গাঁয়ের বাইরে গিয়ে কোরাকের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা একসময় দেখল হাতিটা কোরাককে পিঠে চাপিয়ে ছুটে পালাচ্ছে আর গাঁয়ের লোকগুলো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। এই অবসরে তারা সুযোগ বুঝে দুটো ঘোড়া নিয়ে তার উপর চেপে সোজা বড় বাওনার বাংলোর দিকে যেতে লাগল।

ওরা উত্তরদিকে ক্রমাগত সারারাত ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল। সকাল হতেই দেখল বড় বাওনা নিজেই একদল নিগ্রো যোদ্ধা নিয়ে তাদের খোঁজে এগিয়ে আসছে। বেনেসকে দেখেই রাগে কুঞ্চিত হয়ে উঠল বাওনার ভ্রূকুটো। কিন্তু মিরিয়েমের মুখ থেকে সব কথা না শোনা পর্যন্ত মুখে কিছু বলল না।

মিরিয়েমের কাছ থেকে সব কথা শুনে বাওনা কোরাকের জন্য চিন্তিত হয়ে উঠল।

বাওনা তখন তার প্রধান ভৃত্যকে বলল, মিরিয়েম আর বেনেসকে বাংলোতে নিয়ে যাও। আমার ঘোড়াটাও নিয়ে যাও। আমি জঙ্গলে যাচ্ছি।

মিরিয়েম প্রথমে তার ঘোড়ায় করে বাওনার লোকদের সঙ্গে বাংলোর দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু কোরাকের কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারল না সে। সে নিগ্রো ভৃত্যদের সর্দারকে বলল, আমি বাওনার সঙ্গে জঙ্গলে যাচ্ছি।

কিন্তু সর্দার আপত্তি জানালে মিরিয়েম ঊর্ধ্বশ্বাসে শেখের গাঁয়ের দিকে গাছে গাছে যেতে লাগল। অনেক দূর যাওয়ার পর সে বাতাসে হাতির গন্ধ পেল।

মিরিয়েম দেখল কোরাক হাতির পিঠে চেপে তার পথেই আসছে। কাছে আসতে গাছের উপর থেকে ডাকল কোরাককে। কোরাক নামতেই মিরিয়েম তার দিকে ছুটে গেল তার বাঁধন খোলার জন্য। কিন্তু হাতিটা শত্রু ভেবে শুঁড় উচিয়ে তেড়ে এল মিরিয়মকে। কোরাক চীৎকার করে বলল, চলে যাও মিরিয়েম, ও তোমাকে মেরে ফেলবে।

কোরাক আবার বলল, তুমি এখন চলে যাবার ভান করো। আমি হাতিটাকে নদী থেকে জল আনতে পাঠাব। তখন তুমি এসে আমার বাঁধন খুলে দেবে।

হাতিটা প্রথমে চলে গেল। কিন্তু ওরা ভীষণ চালাক। কিছুটা যাওয়ার পর দেখল মিরিয়েম গাছ থেকে নেমে কোরাকের কাছে এল। হাতিটা যেতে যেতে হঠাৎ থেমে একবার অপেক্ষা করল। তারপর মিরিয়েমের দিকে ছুটে গেল। মিরিয়েম প্রাণভয়ে গাছটার দিকে ছুটে যেতে লাগল। কিন্তু হাতিটা উন্মত্ত হয়ে ছুটতে লাগল। কোরাক দেখল মিরিয়েমকে এখনি ধরে ফেলবে হাতিটা। তার বাঁচার আর কোন আশা নেই।

এমন সময় একটা গাছ থেকে এক দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গ হাতিটার সামনে নেমে পড়ে হাত বাড়িয়ে থামতে বলল তাকে। হাতিটা মন্ত্রমুগ্ধের মত থেমে গেল। মিরিয়েম নিরাপদে গাছে উঠে পড়ল। মিরিয়েম শ্বেতাঙ্গকে চিনতে পেরে বলে উঠল, বাওনা!

বাওনা এবার কোরাকের দিকে মুখ করে বলল, জ্যাক!

কোরাক বলল, বাবা! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি এসে পড়েছিলে। তুমি ছাড়া আর কেউ হাতিটাকে থামাতে পারত না।

এবার টারজন নিজের হাতে জ্যাকের হাত পায়ের বাঁধন কেটে মুক্ত করে দিল।

হঠাৎ হাতিটা চীৎকার করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ওরা সবাই দেখল বনের একদিক থেকে কতকগুলো বাঁদর-গোরিলা টারজনের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের সকলের সামনে আছে আকুৎ। আকুৎ অভিবাদন জানাল টারজনকে। তাদের ভাষায় বলল, জঙ্গলের রাজা টারজন আবার ফিরে এসেছে।

বাংলোর কাছাকাছি সেই মাঠটায় পৌঁছতে ওদের দুদিন লেগে গেল।

বাংলোতে গিয়ে টারজন তার স্ত্রী জেনকে সুখবরটা দিয়ে বলল, ছেলে আর মেয়ে দুটোকেই পাওয়া গেছে।

হারানো ছেলে আর মেয়ের মত মিরিয়েমকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল জেন

কোরাক আর মিরিয়েম আসতে দুহাত দিয়ে দুজনকে জড়িয়ে ধরল জেন। তারপর মিরিয়েমকে বলল, একটা দুঃখের বিষয় বেনেস সেই অসুখেই মারা গেছে।

জেন একবার তার ছেলের দিকে তাকাল। তার ছেলেই একদিন লর্ড গ্রেস্টোক হবে। মিরিয়েমের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই তার। সে শুধু জানতে চায় জ্যাক মিরিয়েমকে সত্যিই ভালবাসে কি না।

কিন্তু জ্যাকের চোখেই এ কথার উত্তর খুঁজে পেল জেন।

জেন বলল, আজ আমি আমার সত্যিকারের মেয়েকে পেলাম। ২৯৫

নিকটবর্তী কোন চার্চে বিয়েটা সারার পরই ওরা দেশে ফিরল। ওরা লণ্ডনের বাড়িতে ফিরলে পর টারজনের বন্ধু দার্ণতের চিঠি নিয়ে একদিন জেনারেল আর্মন্দ জ্যাকং এসে দেখা করল টারজনের সঙ্গে।

জেনারেল জ্যাকং একটা ফটো দেখিয়ে টারজনকে তার মেয়ে চুরি যাওয়ার ঘটনার কথা সব বলল। তারপর বলল, সপ্তাহখানেক আগে আবদুল কামাক নামে এক আরব তার কাছে গিয়ে বলে তার মেয়েকে মধ্য আফ্রিকার এক আরব শেখ তার ঘরে বন্দিনী করে রেখেছে। তাই আমার মেয়ের উদ্ধারের ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।

ফটোটা দেখে টারজন মিরিয়েমকে তাদের কাছে ডেকে পাঠাল।

মিরিয়েম তাদের কাছে এলে জ্যাকং তাকে চিনতে পারল। বলল, কিন্তু ও হয়ত আমায় চিনতে পারবে না।

এই বলে মিরিয়েমকে বলল, আমার মেয়ে, তুই আমার মেয়ে।

মিরিয়েমও এবার তার বাবাকে চিনতে পেরে বলল, আমার বাবা। এবার আমি চিনতে পেরেছি। সব কথা মনে পড়েছে আমার।

এই বলে সে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরল। মিরিয়েম তার বাবা মাকে ফিরে পাওয়ায় তারা সবাই খুশি হলো।

টারজন ও ওপারের ধনরত্ন

টারজন এ্যাণ্ড দি জুয়েলস অফ ওপার

লর্ড গ্রেস্টোক, ওরফে টারজন একদিন তার আফ্রিকার বিরাট জমিদারী তদারক করে ফিরে আসার পরই বাংলো থেকে দেখতে পেল একদল লোক জঙ্গলপ্রান্তের ফাঁকা মাঠটা পার হয়ে তার বাংলোর দিকেই এগিয়ে আসছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে মঁসিয়ে ফ্রেকুলত্ নামে একজন ভদ্রলোক টারজনের বাংলোতে এসে বলল, আমি জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমার ভাগ্যবলে আমি ঈশ্বরের বিধানে এখানে এসে পড়েছি।

ঠিক হলো মঁসিয়ে ফ্রেকুলত্ তার লোকজন নিয়ে কিছুদিন এই বাংলোতে থাকবে। তারপর টারজনের লোকেরা তাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে আসবে। এইভাবে একজন ভদ্র শিকারীর ছদ্মবেশে টারজনকে ঠকিয়ে ওয়ারপার আশ্রয় পেয়ে গেল তার বাংলোতে।

ওয়ারপার আসার পর থেকে এক সপ্তাহ কেটে গেল। কিন্তু তার পরিকল্পনা কার্যকরী করার কোন উপায় খুঁজে পেল না। কিন্তু একদিন একটা ঘটনা ঘটল যাতে সে একটা আশার আলো খুঁজে পেল।

সেদিন বিকালে টারজন জেনের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগল তার পড়ার ঘরে বসে। ওয়ারপার বারান্দা থেকে তাদের কথাবার্তা শুনতে পেল।

টারজন বলল, এত সহজ পথ আর নেই। এখন ওপারে গিয়ে সেখানকার গুপ্তভাণ্ডার থেকে কিছু সম্পদ আনতেই হবে। তবে খুবই সাবধানে একাজ করব। ওপারের অধিবাসীরাও আমার যাওয়ার ব্যাপারটা জানতে পারবে না।

পরদিন সকালে ওয়ারপার টারজনকে বলল, সে এবার ফিরে যাবে। টারজন তাতে রাজী হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

পরদিন ওয়ারপার তার দলবল আর একজন ওয়াজিরি পথপ্রদর্শক নিয়ে রওনা হয়ে গেল বাংলো থেকে। কিছুদূর যাওয়ার পরই ওয়ারপার অসুস্থতার ভান করে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করে রয়ে গেল। তারপর টারজনের ওয়াজিরি পথপ্রদর্শককে বলল, এখন তুমি যাও। আমি সুস্থ হলে তোমাকে ডেকে পাঠাব।

ওয়ারপার তখন আচমেতের একজন বিশ্বস্ত নিগ্রো ভৃত্যকে ডেকে বলল, তুমি টারজনের গতিবিধি লক্ষ্য করে এস।

পরের দিন দূত ফিরে এসে ওয়ারপারকে বলল, টারজন তার পঞ্চাশজন ওয়াজিরি অনুচর নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যাত্রা করেছে সেইদিনই সকালে।

কথাটা শোনার পর আচমেত জেককে একটা চিঠি লিখে লোক মারফৎ আচমেত জেকের কাছে পাঠিয়ে দিল। তারপর ছয়জন কুলি আর ছয়জন সাহসী বলবান যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে গোপনে টারজনের পিছু পিছু তাকে অনুসরণ করে যেতে লাগল একটু দূর থেকে।

সেদিন রাত্রিতে টারজন পথের ধারে লতাপাতা ও কাঁটাগাছের একটা শিবির তৈরী করে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে যখন টারজন তার দলবল নিয়ে যাত্রা শুরু করল তখন ওয়ারপারও রাত্রির বিশ্রামের পর তার শিবির থেকে তাকে অনুসরণ করার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর বনের প্রান্তে এক শূন্য উপত্যকায় এসে উপনীত হলো টারজন। সেই উপত্যকাটার ওপারে অনেক সোনার গম্বুজওয়ালা ওপার নগরী। টারজন ঠিক করল রাত্রিবেলায় সে একা গিয়ে কোথায় সোনা আছে তার সন্ধান করে আসবে।

রাত্রি হতেই টারজন তার দল নিয়ে একটা পাহাড়ে উঠে পাহাড়টার ওপারে চলে গেল।

ওয়ারপার লক্ষ্য করল টারজন একটা খাড়াই উঁচু পাথরের উপর উঠে পড়ল। পরে ওয়ারপার অতি কষ্টে উঠল সেখানে।

ওয়ারপার দেখল বড় পাথরটার ওদিকে কতকগুলো পাথরের সিঁড়ি রয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গিয়ে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মুখ দেখতে পেল।

এদিকে টারজন সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গপথটা ধরে অনেকটা এগিয়ে যাবার পর একটা কাঠের দরজার সামনে এসে হাজির হল। দরজাটা চাপ দিয়ে খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ধনাগারটা পেয়ে গেল সে। টারজন দেখল ঘরটার চারদিকের দেওয়ালে অসংখ্য সোনার তাল সারবন্দীভাবে সাজানো আছে থরে থরে।

টারজন তার লোকদের ডাকার জন্য একবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওয়ারপার তাকে দূর থেকে লক্ষ্য করে অন্ধকারে সরে গেল।

সুড়ঙ্গপথ পার হয়ে পাহাড়টার উপরে উঠে সিংহের গর্জনের মত জোর চীৎকার করে তার ওয়াজিরি লোকদের ডাকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই

দূর থেকে ওয়াজিরি সর্দার বাসুলি চীৎকার করে সাড়া দিল তার ডাকে।

টারজন আবার সেই ধনাগারে ফিরে এসে সোনার তালগুলো বয়ে নিয়ে গিয়ে সুড়ঙ্গপথের প্রান্তে সেই পাথরটার উপর রাখল। সে ভাবল বাসুলিরা এসে পৌঁছবার আগে যতদূর সম্ভব কাজ এগিয়ে রাখবে।

বাসুলি নগরপ্রাচীরের ওধারে এসে পড়লে টারজন দড়ি দিয়ে তাদের পাথরের উপর তুলে নিল। তারপর তাদের সকলকেই ধনাগারে নিয়ে গেল। এবার টারজন ওয়াজিরিদের প্রত্যেকের হাতে সোনার তাল দিয়ে শেষবারের মত ধনাগারটা একবার ভাল করে দেখে নিল। তারপর যে বাতিটা সে হাতে করে এই ঘরে জ্বেলেছিল সে বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

এদিকে টারজন ধনাগার থেকে বার হয়ে সুড়ঙ্গ-পথে কিছুটা এগোতেই পিছন দিক থেকে অদৃশ্যভাবে ওয়ারপার ধনাগারে ঢুকে সেই সোনার তালগুলোকে আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগল।

এমন সময় অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত জোর একটা শব্দ হলো। টারজন তখন সুড়ঙ্গপথে যাচ্ছিল। সহসা সেই জোর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছাদ ভেঙ্গে একটা পাথর তার মাথার উপর পড়ায় তার মাথার কিছুটা কেটে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল মাটির উপর।

আসলে তখন অল্প সময়ের মধ্যে জোর একটা ভূমিকম্প হয়।

ওয়ারপার প্রথমে টারজনের রেখে যাওয়া মোমবাতিটা জ্বালল। তারপর বাতিটা হাতে ধরে দরজার বাইরে আসতেই দেখল টারজনের অচৈতন্য দেহটা পড়ে রয়েছে সামনে। বাতির আলোতে আরও দেখল ভূমিকম্পের ফলে সুড়ঙ্গপথে অনেক বড় বড় পাথর পড়ে থাকায় পথ একেবারে বন্ধ।

তখন ওয়ারপার নিরুপায় হয়ে ধনাগারের মধ্যে ঢুকে অন্য কোন দরজা আছে কি না তার খোঁজ করতে লাগল। হঠাৎ দেখতে পেল ঘরটার পিছন দিকের দেওয়ালে একটা দরজা আছে। সেই দরজাটা খুলে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ পেল সে। সেই পথে যেতেই সামনে একটা পাঁচিল পেল। পাঁচিলটার ওপারেও এই পথটা নিশ্চয় চলে গেছে। এই ভেবে বাতির আলোয় ওয়ারপার দেওয়ালটা পরীক্ষা করে দেখল পাথরের কতকগুলো ইঁট সাজানো আছে দেওয়ালটাতে। ওয়ারপার কতকগুলো ইঁট সরিয়ে তার ওপারে যাবার মত পথ করে নিল।

আবার এগিয়ে চলল ওয়ারপার। অল্প কিছুটা গিয়েই সে দেখল তার সামনে একটা ঠাকুরের বেদী রয়েছে। বেদীটা পাথরের এবং তার উপরে রক্তের দাগ রয়েছে। বুঝল এখানে অতীতে অনেক মানুষকে বলি দেওয়া হয়েছে। সে আরও দেখল বেদীর পিছন দিকে কয়েকটা দরজা রয়েছে।

কিন্তু একটা দরজা খুলে ওয়ারপার বাইরে বেরোতে যেতেই একসঙ্গে প্রায় একডজন দরজা খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো বেঁটে বেঁটে ভয়ঙ্কর আকৃতির লোক বাইরে থেকে ঢুকে পড়ল উঠোনটায়।

ভয়ে চীৎকার করতে করতে যেপথে এসেছিল সেই পথে পালাবার চেষ্টা করল ওয়ারপার। কিন্তু তার মতলব বুঝতে পেরে সেই সব ভয়ঙ্কর চেহারার পুরোহিতরা ধরে ফেলল তাকে। তারা ওয়ারপারকে বেঁধে ফেলে মন্দিরের ভিতরের দিকের ঘরটার মেঝের উপর ফেলে দিল। এরপর প্রধানা পূজারিণী লা খড়্গ হাতে বেদীর সামনে এসে দাঁড়াল। ওয়ারপার বুঝতে পারল একটু পরেই তার দেহনিঃসৃত রক্ত ওদের অমানবিক রক্ত পিপাসা নিবৃত্ত করবে।

এমন সময় একটা ভয়ঙ্কর গর্জন শুনে চমকে উঠল ওয়ারপার। অনেকে ভয়ে পালিয়ে গেল। প্রধানা পূজারিণীর হাত থেকে খড়্গটা পড়ে গেল, সে ওয়ার-পারের পাশে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। ওয়ারপার কোন-রকমে পাশ ফিরে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল মন্দিরের মাঝখানে কোথা থেকে একটা সিংহ এসে একজন পুরোহিতকে ধরেছে।

ছাদ থেকে ধসে পড়া পাথরের আঘাতে টারজন অনেকক্ষণ মরার মত শুয়ে রইল। মাথায় জোর আঘাত লাগায় মাথা থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল তার। আর অতীতের কথা সব ভুলে গিয়েছিল সে।

ধীরে ধীরে উঠে বসল টারজন। কিন্তু এখানে কখন কিভাবে এল, সে কে তার কিছুই মনে করতে পারল না।

টারজনের কোমরে একটা থলি ছিল। সেই থলিটাতে যতগুলো পারল রং বেরঙের মণি-মাণিক্য ভরে নিল। তারপর সেই ঘরটা পেরিয়ে আবার সুড়ঙ্গ পথটা ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। সুড়ঙ্গপথটা যেখানে শেষ হয়েছে টারজন সেখানে গিয়ে কয়েকটা সিঁড়ি পেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতেই একটা সিংহের গর্জন শুনতে পেল সে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক-গুলো নর-নারীর সমবেত ভয়ার্ত চীৎকার কানে এল তার। টারজন তার বর্শাটা হাতে শক্ত করে ধরল।

টারজন দেখল একটা সিংহ মন্দিরের মাঝখানে

বেদীর উপর শোয়ানো হাত পা বাঁধা এক হতভাগ্য বন্দীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর মন্দিরের পুরোহিত ও পূজারিণীরা প্রাণভয়ে ছোটাছুটি করছে। টারজন দেখল তার সামনে বেদীর ধারে একজন মহিলা পূজারিণী দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে যে প্রধানা পূজারিণী লা তার স্মৃতিবিভ্রম ঘটায় সে বুঝতে পারল না।

ওয়ারপার হাত পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে শুয়ে দেখল সিংহটা তার উপর ঝাঁপ দেবার জন্য উদ্যত হয়েছে। টারজনও সঙ্গে সঙ্গে তার বর্শাটা সিংহের বুকটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। সিংহটা গর্জন করতে করতে বর্শার ফলাটা নিয়ে কামড়াকামড়ি করতে করতে তার নতুন শত্রু টারজনকে আক্রমণ করল। এবার টারজন সিংহের উপর উঠে তার ঘাড়টা জড়িয়ে ধরে ছুরিটা বারবার ওর পাঁজরে বসিয়ে দিতেই সিংহটা লুটিয়ে পড়ল।

ওয়ারপার এবার টারজনকে চিনতে পারল।

টারজন একে একে লা ও ওয়ারপারকে খুঁটিয়ে দেখল। কিন্তু সে কাউকে চিনতে পারল না।

এদিকে প্রধানা পূজারিণী লা টারজনের পানে ভাল করে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলল, টারজন তুমি? তুমি অবশেষে আমার কাছে ফিরে এসেছ?

টারজন বলল, আমি টারজন? ঠিক আছে নামটা ভালই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি তোমাকে চিনি না। আমি তোমার জন্য এখানে আসিনি। কেন আমি এখানে এসেছি তা আমি জানি না। কোথা থেকে এসেছি তাও জানি না।

ওয়ারপার এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল। বুঝল টারজনের মাথায় আঘাত লাগায় পূর্বস্মৃতি তার একেবারে লোপ পেয়েছে।

ওয়ারপার তাই টারজনের প্রশ্নের উত্তরে বলল, কোথা থেকে তুমি এসেছ তা ত আমি বলতে পারব না। তবে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে এখান থেকে আমরা যদি এখনি বেরিয়ে না যাই তাহলে আমাদের দুজনকেই মরতে হবে।

তখন টারজন ওয়ারপারের বাঁধন কেটে দিয়ে বলল, চল তাহলে আমরা এখনি পালিয়ে যাই।

এই বলে একটা দরজা দিয়ে টারজন বার হতেই প্রতিটা দরজার মুখেই কয়েকজন করে ভয়ঙ্কর চেহারার বেঁটে বেঁটে পুরোহিত পথ আগলে দাঁড়াল। টারজনের সামনে যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল পথরোধ করে টারজন তার বর্শা দিয়ে তার মাথায় জোর একটা আঘাত করতে তার মাথাটা ভেঙ্গে গেল। এরপর যেই কাছে আসতে লাগল টারজন তাকেই বধ করতে লাগল।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর নগরপ্রাচীরের মধ্যে একটা বার হবার পথ পেল টারজন। স্মৃতিবিভ্রমটা তখনো কাটেনি টারজনের। সে কে এবং কোথা থেকে এসেছে, কোথায় তাকে যেতে হবে কিছুই জানে না সে। ওয়ারপার তাকে কোনরকমে বুঝিয়ে বাংলোর পথে নিয়ে যেতে লাগল।

সেদিন রাত্রিতে তাদের ছোট্ট শিবিরে আগুনের আলোয় টারজন তার থলিটা খুলে সেই রত্নগুলো আবার দেখতে লাগল। ওয়ারপার তাকে জিজ্ঞাসা করল সে কোথায় ওগুলো পেয়েছে। টারজন তার উত্তরে বলল, ওপার নগরীর মন্দিরের তলায় একটা ঘরে সে এগুলো পেয়েছে। কিন্তু ওগুলো রংবেরঙের কতকগুলো পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়।

ওয়ারপার দেখল টারজন ঐসব রত্নগুলোর দাম জানে না। এবিষয়ে তার কোন ধারণা নেই। ফলে সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া সহজ হবে। ওয়ারপার টারজনকে বলল, আমাকে ওগুলো একবার দেখতে দাও।

টারজন তখন সেগুলোর উপর একটা হাত চাপা দিয়ে পশুর মত দাঁত বার করে তেড়ে এল ওয়ারপারকে।

ওয়ারপার ভাবল, সে যেমন করে হোক টারজনের দৃষ্টি এড়িয়ে আচমেত জেকের কাছে চলে যাবে। দুটো কারণে সে যেতে পারছিল না। প্রথম কথা, তার হাতে মাত্র একটা খড়্গ ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই। এই ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বিনা আগ্নেয়াস্ত্রে পথ চলা অসম্ভব। তাছাড়া মূল্যবান ধাতুগুলো ছেড়ে যেতে মন সরছিল না তার।

ওপার থেকে বার হবার পর তিন দিনের দিন টারজন পথে যেতে যেতে তাদের পিছন দিক থেকে আসতে থাকা কিছু লোকের পায়ের শব্দ শুনতে পেল।

ঝোপের আড়াল থেকে তারা দেখল পঞ্চাশজন কৃষ্ণকায় নিগ্রো দুটো করে হলুদ রঙের সোনার তাল বয়ে নিয়ে আসছে। ওয়ারপার তাদের দেখে বুঝতে পারল এই লোকগুলোকেই টারজনের সঙ্গে ওপার নগরীর পথে যেতে দেখেছে সে। কিন্তু সে দেখল টারজন বাসুলি ও ওয়াজিরিদের চিনতে পারল না।

ওয়ারপার ভাবল, ওয়াজিরিরা ঠিক টারজনের বাংলোর দিকে যাবে এবং সোনার তালগুলো বাংলোর

কাছাকাছি কোথাও রাখবে। সেই জায়গাটা ও দেখে নেবে। তাহলে আচমেত জেককে নিয়ে এসে সেই সোনা সহজেই উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারবে।

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে অনুসরণ করে বাংলোটার কাছে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল ওয়ারপার। বাংলোটার এখানে সেখানে কিছু ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না সে। বিরাট খামারবাড়িরও কোন চিহ্ন নেই। সে যেন নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু টারজন কিছুই চিনতে পারল না।

বাংলোর কাছে গিয়ে তার অবস্থা দেখে বাসুলি আর ওয়াজিরিরাও হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

বাসুলি তার লোকদের বলল, আরবরাই নিশ্চয় একাজ করেছে।

একজন ওয়াজিরি বলল, আমাদের লেডী কোথায়?

টারজনের স্ত্রী লেডী গ্রেস্টোককে তারা লেডী বলত। বাসুলি বলল, আমাদের মালিকের স্ত্রী ও আমাদের স্ত্রীদের ধরে নিয়ে গেছে আরবরা।

ওয়াজিরিরা তখন প্রতিশোধ বাসনায় উন্মত্ত হয়ে উঠল।

বাসুলি বলল, এখন কাজের সময় বৃথা চীৎকার করে লাভ নেই। এখন কিছু খাওয়ার পর আরবদের সন্ধানে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের। নইলে আমাদের স্ত্রীদেরও উদ্ধার করতে পারব না।

বনের আড়ল থেকে টারজন আর ওয়ারপার দেখল বাংলোর কাছে একটা বড় খাল কেটে সোনার তাল-গুলো সব পুঁতে রাখল ওয়াজিরিরা। তারপর একটা অস্থায়ী শিবির গড়ে তুলে বিশ্রাম করতে লাগল।

টারজন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর যখন বুঝল ওয়ারপার সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন মাটি খুঁড়ে তার মধ্যে রত্নভরা থলিটা রেখে মাটি চাপা দিয়ে দিল। ওয়ারপার তা দেখল।

অনেকক্ষণ পর ওয়ারপার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল টারজন ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন সে তার খড়্গটা দিয়ে সেই জায়গার মাটি খুঁড়ে থলিটা বার করে নিয়ে নিজের পকেটে ভরে রাখল।

ওয়ারপার একবার ভাবল যাবার আগে তার হাতের খড়্গটা দিয়ে ঘুমন্ত টারজনের গলাটা কেটে দিয়ে যাবে।

এই ভেবে ঘুমন্ত টারজনের গলার উপরে তুলে ধরল তার হাতের খড়্গটা।

এদিকে মুগাম্বিও আরবদের খোঁজে পথ চলে চলে শিবিরের কাছে এসে দেখে ওয়ারপার ছেঁড়া ময়লা পোশাক পরে হাঁপাতে হাঁপাতে সেই গাছের তলা দিয়ে শিবিরের দিকে যাচ্ছে। প্রথমে সে ওয়ারপারকে দেখেই চিনতে পারে। এই শ্বেতাঙ্গই তাদের মালিক বড় বাওনার বাড়িতে একদিন অতিথি হিসাবে ছিল। তাকে দেখে ডাকতে যাচ্ছিল সে।

কিন্তু মুগাম্বি যখন দেখল ওয়ারপার স্বচ্ছন্দে আরবদের শিবিরে ঢুকে গেল এবং শিবিরের সবাই তাকে চেনে তখন সে বুঝতে পারল আসলে সে বিশ্বাসঘাতক। সে খবর দেওয়াতেই বড় বাওনার অনুপস্থিতিতে আরবরা বাংলো আক্রমণ করে তাদের প্রভুপত্নীকে ধরে নিয়ে আসে এবং বাংলো আর খামারটা পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।

আচমেত জেকের তাঁবুতে ওয়ারপার ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল আচমেত। বলল, কি ব্যাপার,?

ওয়ারপার টারজনের কাছ থেকে যে মুক্তোর থলিটা চুরি করে আনে তার কথা ছাড়া যা যা ঘটেছিল সব বলল। থলিটা সে সাবধানে লুকিয়ে রেখেছিল। সোনার তালগুলো বাংলোর পাশে ওয়াজিরিরা পুঁতে রেখেছে শুনে আচমেতের লোভ বেড়ে গেল। ওয়ারপার আরো জানাল ওয়াজিরিরা তার শিবির আক্রমণ করতে আসছে।

আচমেত বলল, আগে ওরা আসুক। ওদের সবাইকে হত্যা করার পর সোনাগুলো তুলে আনার কাজ খুবই সহজ হবে।

ওয়ারপার বলল, টারজনের স্ত্রীকে কি করবে?

আচমেত বলল, ওকে উত্তরাঞ্চলের কোন দেশে বিক্রি করে দেব। মোটা দাম পাওয়া যাবে।

ওয়ারপার ভাবল আচমেতকে বলে তার মত করিয়ে সে লেডী গ্রেস্টোককে নিয়ে উত্তরের দিকে রওনা হয়ে তার মুক্তির পথ করে নেবে।

সে তাই আচমেতকে বলল, কে তাকে নিয়ে যাবে উত্তর দিকে?

আচমেত জেক ভেবে বলল, তুমিই লেডী গ্রেস্টোককে নিয়ে রওনা হয়ে যাও। আমি নিজে যাব গুপ্তধনের সন্ধানে। আমাদের সকলেরই আপন আপন কাজ হয়ে গেলে এখানেই আবার দেখা হবে।

একসময় তাঁবুতে কেউ নেই দেখে কোমর থেকে মুক্তোর থলিটা বার করে সেগুলো গুণতে লাগল ওয়ারপার। এমন সময় দেখল দরজার বাইরে থেকে আচমেত জেক তাকে দেখছে। ওয়ারপার এবার ভয় পেয়ে গেল। বুঝতে পারল আর তার পরিত্রাণ নেই। আচমেত জেক যখন মুক্তোগুলো দেখতে পেয়েছে তখন সে সেগুলো কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করবে তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। তাই রাতের অন্ধকারে শিবির থেকে গোপনে বেরিয়ে গেল ওয়ারপার।

এদিকে গভীর রাতে আচমেত একটা ছুরি নিয়ে ওয়ারপারের তাঁবুতে ঢুকে বারবার বিছানাটার উপর তার ছুরিটা বসাতে লাগল। কিন্তু যখন সে দেখল ওয়ারপার বিছানায় নেই, পালিয়ে গেছে, তখন সে সবাইকে ডেকে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়ল ওয়ারপারের খোঁজে।

মুগাম্বি শিবিরের কাছে একটা গাছের উপর পাতার আড়াল থেকে সবকিছু দেখছিল। আরবরা সবাই বেরিয়ে পড়লে গাছ থেকে নেমে শিবিরে গিয়ে তাদের প্রভুপত্নী জেনের খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু লেডী জেনকে কোথাও দেখতে পেল না।

ঘুমন্ত টারজনের গলা কাটার জন্য ওয়ারপার উদ্যত হতেই অদূরে একটা সিংহের শব্দ পেয়ে পালিয়ে গেল। ঝোপঝাড় ভেঙ্গে সিংহটা যখন এগিয়ে আসছিল তখন তার শব্দে টারজন জেগে ওঠে ঘুম থেকে।

কিন্তু সিংহটা কি মনে করে পিছন ফিরে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। টারজন এবার খেয়াল করে দেখল তার সঙ্গী কাছে নেই। সে একবার ভাবল তার সঙ্গী ওয়ারপার হয়ত সিংহের ভয়ে পালিয়ে গেছে।

পরদিন টারজন যখন একটা গাছের উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল তখন তারই সন্ধানে ওপার নগরীর মন্দিরের

প্রধানা পূজারিণী লা পুরোহিতদের এক সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে সেইখানে চলে আসে।

পুরোহিতদের প্রত্যেকেরই হাতে একটা করে ছুরি আর একটা করে খাঁড়া ছিল। লা-এর দলে যে ক'জন বাঁদর-গোরিলা ছিল তাদের মধ্যে একজন বাতাসে গন্ধ শুঁকে বলল, সেই বড় শ্বেতাঙ্গ বাঁদরটা একটা গাছে ঘুমোচ্ছে, আমরা তাকে মেরে ফেলতে পারি।

এই বলে ওরা পা টিপে টিপে বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখল সেই গাছের একটা ডালে টারজন তখনো ঘুমোচ্ছিল। তিনটে বাঁদর-গোরিলা গাছের উপর উঠে গিয়ে টারজনকে ধরে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর সকলে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজনের উপর। তখন লা এসে হুকুম করল, ওকে মেরো না, বেঁধে ফেল। তারপর আমার কাছে নিয়ে এস।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল বনভূমিতে। শিবিরের ভিতরে হাত পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে থাকা টারজনের সামনে ছুরি হাতে পায়চারি করতে লাগল লা। লা একবার বড় গলায় টারজনকে বলল, আমাদের দেবতার খড়্গ নিয়ে পালিয়ে এসেছ তুমি। সে খড়্গ কোথায়? টারজন বলল, আমার সঙ্গে যে লোকটা ছিল সে তা নিয়ে পালিয়েছে। আমাকে ছেড়ে দিলে আমি তাকে ধরে আনতে পারি এবং খড়্গটাকে ফিরিয়ে দিতে পারি। সেকথা শুনে লা হেসে উঠল হো হো করে।

সন্ধ্যে হতেই লা টারজনের পাশে ছুরি হাতে পায়চারি করতে করতে একসময় বসে ছুরির তীক্ষ্ণ ডগাটা টারজনের পাঁজরের উপর ঠেকিয়ে অল্প অল্প করে চাপ দিতে লাগল। কিন্তু তাকে মারতে গিয়েও মারতে পারল না।

পরদিন সকালে পুরোহিতদের সমবেত স্তোত্রগানের শব্দ কানে আসতে ঘুম ভেঙ্গে গেল টারজনের। পরে লা-এর ঘুম ভাঙ্গল। ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে লা

চীৎকার করে তার লোকদের ডাকল, কই, জ্বলন্ত দেবতার পুরোহিতরা এস। বলিদানের জন্য প্রস্তুত হও।

আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অদ্ভুত চেহারার পুরোহিতগুলো লা-এর শিবিরের মধ্যে ঢুকে টারজনকে ধরে বাইরে নিয়ে এল।

ছুরিটা হাতে তুলে এগিয়ে এল লা। টারজন নীরবে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

এমন সময় জঙ্গলে একটা হাতির শব্দ শোনা গেল। টারজনও জোরে অদ্ভুতভাবে একটা চীৎকার করল। এবার সবাই দেখল জঙ্গলের ঝোপঝাড় ভেঙ্গে একটা হাতি গর্জন করতে করতে ক্রমশই এগিয়ে আসছে। এবার লা টারজনের মুখপানে তাকিয়ে বুঝতে পারল টারজনই চীৎকার করে হাতিটাকে ডেকেছে এবং তাকে উদ্ধার করার জন্য হাতিটা আসছে।

টারজন বলল, হাতিটা আসছে। প্রথমে ভেবেছিলাম ও আমাকে উদ্ধার করতে আসছে। কিন্তু এখন ওর ডাক শুনে বুঝছি ও পাগলা হয়ে গেছে। এখন ও আমাকে বা যাকে পাবে তাকেই মেরে ফেলবে।

লা বুঝল, টারজন ঠিকই বলেছে। সে অসহায়-ভাবে পাথরের প্রতিমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। টারজন বলল, দেখ লা, এখনো সময় আছে, তুমি আমার বাঁধন খুলে দাও। আমি তোমাকে বাঁচাব।

লা দেখল উন্মত্ত হাতিটা ডালপালা ভেঙ্গে ক্রমশই তীব্র বেগে এগিয়ে আসছে।

লা তার পুরোহিতদের বলল, তোমরা সবাই পালাও।

এই কথা বলেই লা টারজনের বাঁধনগুলো সব কেটে দিল। সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতরা চীৎকার করে উঠল। তারা সবাই ছুটে এল লা-এর দিকে।

প্রধান পুরোহিত তার হাতের খাঁড়া উঁচিয়ে লাকে বলল, বিশ্বাসঘাতক, নাস্তিক, অধর্মাচারী বন্দীকে তুমি ছেড়ে দিলে। এর জন্য তোমাকেও মরতে হবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এল টারজন। সে প্রধান পুরোহিতের হাত থেকে খাঁড়াটা কেড়ে নিয়ে তাকে শূন্যে তুলে ধরে সজোরে পুরোহিতদের মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এমন সময় পাগলা হাতিটা সেখানে এসে হাজির হলো। টারজন সঙ্গে সঙ্গে লাকে তুলে নিয়ে শূন্যে লাফ দিয়ে আর একটা গাছে চলে গেল। এইভাবে গাছে গাছে অনেকটা দূরে চলে গেল।

হাতিটা তখন আর কাউকে না পেয়ে চলে গেল।

হাতিটা অনেক দূরে চলে গেলে টারজন লাকে নিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়ল। বলল, তোমার পুরোহিতদের ডাক।

লা বলল, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

টারজন বলল, আমি যতক্ষণ আছি কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পারবে না। ওদের ডাক, আমি কথা বলব ওদের সঙ্গে।

লা পুরোহিতদের ডাকতেই তারা টারজনের কাছে এসে দাঁড়াল। টারজন তখন ওদের বলল, তোমাদের প্রধানা পূজারিণী লা এখন নিরাপদ। সে আমাকে হত্যা করলে সে বাঁচতে পারত না এবং তোমাদের অনেকেই মারা যেত। আমিই তাকে বাঁচিয়েছি। এবার তাকে নিয়ে তোমরা দেশে ফিরে যাও। আমি আবার জঙ্গলে ফিরে যাব। তাছাড়া তোমরা তোমাদের রাণীর আদেশ অবশ্যই মেনে চলবে। তাকে নিয়ে ওপারে চলে যাও। যদি একথায় রাজী না হও তাহলে আমি জঙ্গলের সব জন্তুদের ডাকব। তারা এসে তোমাদের সকলকেই মেরে ফেলবে।

পুরোহিতরা টারজনের কথায় রাজী হয়ে গেল, কারণ তারা সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

ওরা চলে যেতেই টারজন গাছের উপর উঠে দূরে চলে গেল।

ওয়ারপার টারজনের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার দুদিন পর মুক্তোর থলিটার কথা মনে পড়ল টারজনের। তার মনে পড়ল সেটা সে এক জায়গায় মাটির ভিতর পুঁতে রেখেছে। তখন সেখানে গিয়ে ঠিক সেই জায়গাটা ছুরি দিয়ে খুঁড়ল কিন্তু থলিটা পেল না টারজন। সে বুঝতে পারল ওয়ারপারই তার থলিটা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেছে। তাই সে আর অপেক্ষা না করে সোজা পলাতক চোর ওয়ারপারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

যেতে যেতে এক আরব শিবিরের সন্ধান পেল। টারজন যখন আরবদের শিবিরের কাছে গিয়ে পৌঁছল তখন শিবিরের কাছাকাছি একটা গাছ থেকে বাতাসে গন্ধ শুঁকে বুঝল সে যার খোঁজ করছে সেই ওয়ারপার এই শিবিরেই আছে।

গাছের উপর পাতার আড়ালে বসে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করল টারজন। তারপর যখন রাত গভীর হল, শিবিরে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেল, তখন গাছ থেকে নেমে পড়ল টারজন।

একটা ঘরের সামনে এসে ওয়ারপারের কিছুটা গন্ধ পেল সে। কিন্তু টারজন তাঁবুর একটা দিক তুলে ভিতরে প্রবেশ করে দেখল ঘরের মধ্যে কেউ নেই।

তখন সেই কুঁড়েটা থেকে বেরিয়ে টারজন শিবির সংলগ্ন আদিবাসীদের বস্তীতে চলে গেল। সেখানে একটা ঘরের কাছে এসে আবার পলাতক ওয়ারপারের কিছুটা গন্ধ পেল সে। গুঁড়ি মেরে ঘরটার মধ্যে ঢুকে দেখল ঘরটার পিছন দিকে একটা লোক বার হবার মত ফাঁক রয়েছে। বুঝল ঐ ফাঁকটা দিয়ে কিছু আগে ওয়ারপার পালিয়ে গেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে আবার সে গন্ধের সূত্র ধরে ওয়ারপারের খোঁজে এগিয়ে যেতে লাগল।

ওয়ারপার সেদিন রাতে তাঁবু থেকে বেরিয়েই জেন যে কুঁড়েটাতে বন্দী হয়ে ছিল সেই কুঁড়েটার সামনে সোজা চলে যায়। কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকেই ওয়ারপার দেখল সেখানে জেন নেই। ওয়ারপার বুঝল লেডী জেন পালিয়ে গেছে।

লেডী জেন চলে যেতে ওয়ারপারের আশা নির্মূল হয়ে গেল। সে ভেবেছিল লেডী জেনের মত এক সম্ভ্রান্ত বৃটিশ মহিলা কাছে থাকলে পূর্ব উপকূলভাগে বৃটিশ উপনিবেশগুলোর সাহায্যে পূর্ব ইউরোপে চলে যাবে।

যাই হোক, ঘর থেকে বেরিয়ে ওয়ারপার বনে যাবার পথ ধরল। তাবপর বনে গিয়ে পুব দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ওয়ারপার যেতে যেতে একসময় পিছন ফিরে দেখল একজন আরব অশ্বারোহী তার খোঁজ করতে আসছে। আরবটাকে দেখেই একটা গাছের উপর উঠে ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

পথের ধারে যে গাছটার উপর বসে ছিল ওয়ারপার সেই গাছটার উল্টো দিকে দেখল ঝোপের ধারে একটা সিংহ শিকারের আশায় ওৎ পেতে বসে আছে। কিন্তু হঠাৎ একজন অশ্বারোহী কাছে এসে পড়ায় তার নজর পড়ল সেই অশ্বারোহী আরবটার উপর।

সিংহটা আরবটার উপর লাফ দিতেই ঘোড়াটা লাফিয়ে ওয়ারপারের কাছাকাছি চলে এল। ওয়ারপার তখন সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটার শূন্য পিঠে উঠে তীরবেগে ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে চলে গেল।

এদিকে যেপথে মুগাম্বি আর ওয়ারপার যাচ্ছিল সেই পথের ধারে এক জায়গায় আবদুল মুবাকের নেতৃত্বে একদল আবিসিনীয় সৈন্য শিবির খাটিয়ে বিশ্রাম করছিল। ওয়ারপার না জেনে ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা সেই শিবিরে গিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে বন্দী করে শিবিরে রেখে দেওয়া হলো।

আবিসিনীয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় মেনেলেক নামে যে সম্রাট ছিল আবদুল মুরাক ছিল তারই অধীনস্থ এক সামরিক অফিসার। আচমেত জেক মাস দুয়েক আগে মেনেলেকের রাজ্যে তার আদেশ অমান্য করে ক্রীতদাস ধরতে গিয়েছিল বলে তাকে ধরার জন্য মুরাকের অধীনে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দেয় মেনেলেক।

ওয়ারপার বন্দী হবার পর মৃগাম্বি শিবিরের কাছাকাছি বনের ভিতরে এক জায়গায় 'লেডী' 'লেডী' বলে চীৎকার করে উঠতেই কয়েকজন সৈনিক তার ডাক শুনে তাকে ধরে নিয়ে আসে, মৃগাম্বি মুরাককে বলে সে এক স্থানীয় আদিবাসী এবং শিকারের জন্য বনে এসেছে। সুতরাং ছেড়ে দেওয়া হোক। কিন্তু মুরাক দেখল মৃগাম্বির মত এক শক্ত সমর্থ নিগ্রোকে ধরে নিয়ে গিয়ে সম্রাটের হাতে তুলে দিলে সে খুশি হবে তার উপর। এই ভেবে মৃগাম্বিকেও বন্দী করে রেখে দেবার হুকুম দিল। মৃগাম্বি ওয়ারপারকে দেখে তাকে মঁসিয়ে ফ্রেকুলত্ হিসাবে চিনতে পারল। কিন্তু কোন কথা বলল না।

এদিকে ওয়ারপার যখন কথায় কথায় মুরাকের মুখ থেকে জানতে পারল আচমেত জেক তাদের শত্রু তখন সে বলল, সে আফ্রিকার জঙ্গলে শিকারে এসেছিল দলবল নিয়ে। কিন্তু পথে আচমেত জেকের লোকেরা তার দলের লোকদের অনেককে হত্যা করে বাকি লোকদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে।

তবু ওকে ছাড়ল না মুরাক। ওয়ারপার মুরাককে বলল, আচমেত জেকের কাছে অনেক আরবসৈন্য আছে আর সে তার সেনাদল নিয়ে এই দিকেই আসছে। সেকথা শুনে মুরাক তার লোকদের পরদিন সকালেই শিবির গুটিয়ে দেশে রওনা হতে হুকুম দিল। সঙ্গে ওয়ারপার আর মৃগাম্বিকেই বন্দী অবস্থায় নিয়ে যাবে ঠিক করল।

পরদিন সকালে রওনা হবার সময় মুরাক দেখল তার শিবির থেকে গতরাতে পালিয়ে গেছে মৃগাম্বি। ওয়ারপার তার পকেটে হাত দিয়ে দেখল তার মুক্তোর থলিটা ঠিকই আছে।

আচমেত জেক তার দুজন সহচরকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ওয়ারপারের খোঁজ করতে করতে বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার ধারে চলে এসেছিল। তার মন মেজাজ মোটেই ভাল ছিল না। ওয়ারপার তাকে ফাঁকি দিয়ে তার চোখে ধূলো দিয়ে চলে গেছে। তার উপর তার মুক্তোর থলিটাও নিয়ে গেছে।

জঙ্গলে কিসের একটা খস্ খস্ শব্দ শুনে আচমেত জেক তার সহচরদের একটা ঝোপের আড়ালে লুকোতে বলে নিজেও লুকিয়ে রইল।

সহসা দেখল গাছের আড়াল থেকে এক নারীমুখ বেরিয়ে এল। আচমেত জেক আশ্চর্য হয়ে দেখল এই নারীই তার বন্দিনী যে আজও তার শিবিরে বন্দী অবস্থায় আছে বলে সে একটু আগে ভাবছিল। সে নিজেকে কখন মুক্ত করে পালিয়ে এসেছে বনে তার কিছুই জানে না সে।

হঠাৎ জেন তার পিছনে কিসের শব্দ পেয়ে পিছন ফিরে দেখল একটা বাঁদর-গোরিলা তার পিছু পিছু আসছে। জেন তাই ঘুরে অন্য দিকে পালাবার চেষ্টা করতেই আচমেত জেক আর তার দুজন সহচর তাকে ধরে ঘোড়ার উপর ওঠাবার চেষ্টা করতে লাগল।

এমন সময় দেখা গেল কোথা থেকে টারজন কতকগুলো বাঁদর-গোরিলাকে সঙ্গে করে সেইদিকে ছুটে আসছে। জেন টারজনকে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে বলল, জন, ঠিক সময়েই এসে পড়েছ।

কিন্তু টারজন তাকে দেখে চিনতে পারল না। তার স্মৃতিবিভ্রম তখনো কাটেনি। তবু তার মনে হলো মুখটা যেন তার কত চেনা এবং তাকে যেমন করেই হোক উদ্ধার করতে হবে।

এই ভেবে আরবদের হাত থেকে জেনকে উদ্ধার

করার জন্য তার বাঁদর-গোরিলাদের নিয়ে ছুটে গেল টারজন। কিন্তু আচমেত জেক নিজে টারজনকে লক্ষ্য করে তার রাইফেল থেকে একটা গুলি করে তার সহচরদেরও গুলি করতে বলল। তাদের গুলিতে টারজন পড়ে গেল।

এই অবসরে আরবরা জেনকে ঘোড়ায় চাপিয়ে চলে গেল। তাদের শিবিরে নিয়ে গিয়ে জেনকে এবার সেই কুঁড়ে ঘরটায় হাত পা বেঁধে রেখে দিল। ঘরের দরজায় এবার দুজন পাহারাদার রাখল।

এদিকে আচমেত জেকের যেসব আরব অনুচরেরা ওয়ারপারকে খুঁজতে গিয়েছিল তারা একে একে ফিরে এল বিফল হয়ে। তারা এসে জানাল ওয়ার-পারের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না কোথাও। এই খবর শুনে আচমেত জেকের রাগ আরো বেড়ে গেল।

আরবরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলে টারজন বাঁদব-গোরিলাদের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আমি আবার বাঁদর-গোরিলাদের রাজ্যে ফিরে এসেছি। আমার সঙ্গে চল তোমরা। আরবদের হাত থেকে মেয়েটাকে উদ্ধার করতে হবে।

বাঁদর-গোরিলারা বলল, এখন আমরা পুব দিকে শিকার করতে যাব। দিনকতক পরে শিকার থেকে এসে আরব শিবিরে যাব।

তখন টারজন চুলুক ও তাগলৎ নামে দুজন বাঁদর-গোরিলা নিয়ে আরব শিবিরের দিকে রওনা হয়ে পড়ল।

শিবিরের কাছে গিয়ে টারজন দেখল একজন আরব অশ্বারোহী শিবির থেকে বেরিয়ে এই দিকেই আসছে। টারজন ঠিক করল আরবটাকে মেরে পোশাকটা নিয়ে নেবে।

আরবটা ঘোড়ায় চেপে গাছটার তলায় আসতেই আচমকা গাছ থেকে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজন। তারপর আরবটার গলাটা দুহাত দিয়ে টিপে তাকে বধ করল। তার পোশাকটা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার গাছে উঠে পড়ল টারজন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখল আরবদের পোশাকপরা দুজন কৃষ্ণকায় লোক গাছের তলা দিয়ে শিবিরের দিকে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টারজন ঐ দুজন নিগ্রোকেও হত্যা করে তাদের আরবী পোশাকগুলো খুলে নিল। গাছের উপর উঠে তারা তিনজনেই তিনটে আরবী পোশাক পরল।

তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলে টারজন তার সঙ্গীদের নিয়ে শিবিরের গেটের কাছে গিয়ে হাজির হলো। তারা যখন বাতাসে গন্ধ শুঁকে বুঝল জেন সেই ঘরটাতেই বন্দী অবস্থায় আছে তখন তারা আগে সেখানে না গিয়ে আচমেত জেকের তাঁবুটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারা শুনতে পেল ভিতরে আচমেত তার সহকারীদের সঙ্গে কথা বলছে।

টারজনের সঙ্গে চুলুক তাঁবুর ভিতরে ঢুকলেও তাগলাৎ তাদের সঙ্গে গেল না। সে একা চলে গেল জেন যে কুঁড়েটাতে বন্দিনী অবস্থায় ছিল সেইখানে। দেখল একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা হাত পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে মেঝের উপর। অন্ধকারে ঘরের মধ্যে কিছু দেখা না গেলেও সে দেখতে পাচ্ছিল। জেন দেখল আরবী পোশাকপরা একটা লোক তাকে তার কাঁধের উপর তুলে নিল। পোশাকটায় তার সর্বাঙ্গ ঢাকা ছিল বলে সে তাকে চিনতে পারল না।

বাকি রাতটা গাছেই কাটাল টারজন। সকালে দেখল একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী সেই গাছটার তলায় বনপথটা ধরে কোথায় যাচ্ছে। সেই দলের সামনেই পলাতক ওয়ারপারও একটা ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল। টারজন তাকে দেখেই চিনতে পারল।

দলটা চলে যেতে টারজন তাদের অনুসরণ করতে লাগল গাছের উপর দিয়ে। কারণ সে বুঝল ঐ সশস্ত্র সেনাদলের ভিতর থেকে পলাতক ওয়ারপারকে ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

দুদিন ক্রমাগত এইভাবে যাওয়ার পর ওরা একটা ফাঁকা সমতলভূমিতে এসে পৌছল। জায়গাটা টারজনের অনেকদিনের চেনা চেনা মনে হলো। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু মনে করতে পারল না। সে দেখল অশ্বারোহী সেনাদলটা একটা ভাঙ্গা বাড়ির পাশে একটা জায়গার মাটি খুঁড়ে অনেকগুলো হলুদ রঙের এক ধাতুর তাল বার করল। ঝোপের আড়ালে বসে সবকিছু দেখতে লাগল টারজন।

আবদুল মুরাকের আবিসিনীয় সৈন্যরা সোনার তালগুলো নিয়ে যেমনি ঘোড়ায় উঠতে যাবে এমন সময় আচমেত জেক একদল আরব অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে সেইদিকে আসতে দেখা গেল। ওয়ারপার ভয় পেয়ে মুরাককে বলল, আরবরা এই সোনা নেবার জন্য আসছে।

মুরাক তার লোকদের ঘোড়ায় চেপে লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হতে বলল।

আচমেত জেক ওয়ারপারকে দেখেই সব বুঝতে পারল। আচমেত জেক সবাইকে ছেড়ে ওয়ারপার-এর দিকে ছুটে গেল। ওয়ারপার বেগতিক দেখে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল।

একসময় লড়াই করতে করতে টারজন যে ঝোপের ধারে লুকিয়েছিল সেই ঝোপের কাছে এক আবিসিনীয় সৈন্য ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে টারজন সেই ঘোড়াটার উপর লাফ দিয়ে উঠেই ঘোড়াটা তীর বেগে ছুটিয়ে বনের দিকে চলে গেল।

এদিকে দেখতে দেখতে সব আবিসিনীয় সৈন্যরা মারা গেল। আরবরা ঠিক করল সোনাগুলোকে এইখানে রেখে তারা আচমেতের খোঁজে বনে যাবে। পরে তার দেখা পেলে এগুলো এসে নিয়ে যাবে।

আরবরা সোনার তালগুলো মাটির উপর সেই-খানে রেখে চলে যেতে নদীর ধারে লুকিয়ে থাকা একদল নিগ্রো যোদ্ধা সেখান থেকে উঠে এল ধীরে ধীরে।

ওয়ারপার পিছন ফিরে যখন দেখল আচমেত নিজে তাকে ধরতে আসছে তখন সে ঘোড়াটার গতি-বেগ আরো বাড়িয়ে দিল। কিন্তু সরু বনপথে ঘোড়াটা ছুটতে পারছিল না ভালভাবে। একসময় পথের ধারে একটা গাছের ডালে পড়ে গেল ওয়ারপারের ঘোড়াটা। এদিকে আচমেত তার অনেক কাছে চলে এসে ওয়ারপারকে লক্ষ্য করে গুলি করতে গেল।

তখন ওয়ারপার আচমেত জেককে বলল, শোন আচমেত জেক, এই মারামারিতে আমাদের মধ্যে কার মৃত্যু হবে তা কেউ বলতে পারে না। তুমি ত আমার মুক্তোর থলিটা চাও। সুতরাং এটা আমি আমার ঘোড়ার উপর রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছি। আমি এই মুক্তোর বিনিময়ে শুধু আমার মুক্তি চাই। তুমি এতে রাজী হলে তোমার রাইফেলটা তোমার ঘোড়ার উপর রেখে এসে নিয়ে যাও এটা।

এই বলে তার থলিটা ঘোড়ার উপর রেখে চলে গেল ওয়ারপার।

আচমেত জেক থলিটা খুলে দেখল তাতে মুক্তো নেই, আছে শুধু কতকগুলো নদীর ধারে পাওয়া ছোট ছোট পাথর। সেগুলো রেগে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল আচমেত।

বনের মধ্যে তাগলাৎ যখন অচেতন জেনের হাত পায়ের বাঁধন খুলছিল তখন একটা সিংহ তার খুব কাছ থেকে গর্জন করে উঠল সহসা। তাগলাৎ দেখল সিংহটা তার উপর ঝাঁপ দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে। সে দেখল পালাবার আর উপায় নেই। তাই সে সিংহটার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। সিংহটা তাগলাতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই তাগলাৎ তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সিংহটার কেশর ধরে তার গায়ের বিভিন্ন জায়গায় দাঁতগুলো বসিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠল না। সিংহটা তার পেটের মধ্যে দাঁত বসিয়ে সব নাড়ীভুঁড়ী বার করে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাগলাৎ মারা গেল।

জেন তখন গড়িয়ে গড়িয়ে গাছের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। এইভাবে কিছুটা যাওয়ার পর জেন একসময় লাফ দিয়ে উঠেই গাছটার একটা ডাল ধরল। সিংহটাও সঙ্গে সঙ্গে একটা লাফ দিল জেনকে ধরার জন্য। কিন্তু ধরতে পারল না।

এমন সময় দেখল আচমেত জেক নামে যে আরবটা তাকে ধরতে গিয়েছিল সে একটা রাইফেল হাতে কাকে খুঁজছে। জেন গাছের উপর লুকিয়ে থেকে দেখতে লাগল সব। কিছু পরে দেখল মঁসিয়ে ফ্রেকুলত্ নামে যে ফরাসী ভদ্রলোক কিছুদিন আগে তাদের বাংলোতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিল কিছুদিনের জন্য সে তার রাইফেলটা তুলে আরবটাকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করল। আচমেত জেক হাত পা ছড়িয়ে সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেল।

এবার আচমেত মারা যেতে জেন আনন্দের

আবেগে গাছ থেকে নেমে আচমেত জেকের হাতে বন্দী হওয়ার পর থেকে যা যা ঘটেছিল তা ওয়ারপারকে সব বলল।

তা শুনে ওয়ারপার কপট সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আপনি আমার উপর অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখতে পারেন।

যাই হোক, আরবদের শিবিরের দিকে জেনকে সঙ্গে করে তখনি রওনা হয়ে পড়ল ওয়ারপার। তার শয়তানির কথা কিছুই জানতে পারল না জেন।

পরদিন বিকালের দিকে ওরা আরবদের শিবিরের কাছাকাছি এসে পড়ল। ওয়ারপার জেনকে বলল, আমি যা যা বলব আপনি তাই করবেন। আমি ওদের বলব, আপনি ওদের থেকে পালিয়ে যাবার সময় আমার হাতে ধরা পড়েন। আমি তখন আপনাকে আচমেত জেকের কাছে নিয়ে যাই। সে সোনাগুলোর দখল নিয়ে জোর লড়াই করছে বলে আসতে পারল না। আমাকে বলল, একে শিবিরে নিয়ে যাও। তারপর সেখান থেকে লোক নিয়ে উত্তরাঞ্চলে গিয়ে এক ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেবে।

ওয়ারপার জেনের হাত ধরে শিবিরের দিকে সোজা চলে গেল। শিবিরের লোকরা ওয়ারপার আর তার সঙ্গে বন্দিনী জেনকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।

আচমেতের অনুপস্থিতিকালে শিবিরের ভার ছিল মহম্মদ বেজের হাতে।

মহম্মদ বেজ ওয়ারপারকে বলল, আমার যতদূর বিশ্বাস আচমেত জেক মারা গেছে। তা না হলে তুমি আসতে না। তুমি সত্যি কথা বল। আচমেত জেক যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে চল আমরা দুজনেই মহিলাটিকে নিয়ে উত্তরাঞ্চলে গিয়ে তাকে বিক্রি করে সেই বিক্রির টাকাটা দুজনে ভাগ করে নিই। তাছাড়া তোমার কাছে সেই মুক্তোর থলিটাও ত আছে।

ওয়ারপার রাজী হয়ে গেল মহম্মদের কথায়। তার কাছে মুক্তোর থলিটা আর নেই একথা প্রকাশ করল না সে। কারণ তাতে সন্দেহ দেখা দিতে পারে মহম্মদের মনে।

অবশেষে আসল কথাটা খুলে বলল ওয়ারপার। বলল, আচমেত জেক সত্যিই সোনার জন্য লড়াই করতে গিয়ে মারা গেছে। আমি পালিয়ে এসেছি। তবে আবিসিনীয়রা এই শিবিরেও এসে পড়বে।

মহম্মদ বলল, আমি কাল সকালেই শিবির তোলার হুকুম দিচ্ছি।

ওয়ারপার বলল, সব লোককে সঙ্গে নিয়ে লাভ নেই। কিছু সাহসী ও সুযোগ্য যোদ্ধাকে বাছাই করে নাও।

পরদিন সকালেই রওনা হলো ওরা। জেনের হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে কিছু রুটি খেতে দিয়ে একটা ঘোড়ার উপর তোলা হলো। পথে ওয়ারপার কোন কথা বলল না জেনের সঙ্গে।

রাত্রি হতেই এক জায়গায় তাঁবু গেড়ে শিবির স্থাপন করল ওরা। জেনের থাকার ব্যবস্থা হলো মহম্মদ আর ওয়ারপারের তাঁবুর মাঝখানে একটা তাঁবুতে। তাতে সামনে পিছনে দুজন প্রহরী ছিল। তারপর খাওয়ার পর শুয়ে পড়ল তার বিছানায়।

জেন ঘুমিয়ে পড়লে মহম্মদ প্রহরীর কানে কানে কি বলতেই জেনের তাঁবু থেকে প্রহরীরা সরে গেল। মহম্মদ তখন সোজা জেনের কাছে চলে গেল।

এদিকে ওয়ারপারের চোখে ঘুম ছিল না। বিছানা থেকে উঠে পড়ল ওয়ারপার। সে সোজা জেনের তাঁবুতে চলে গেল।

তাঁবুর ভিতরটা অন্ধকার। শুধু কিছুটা চাঁদের আলো ভিতরে এসে পড়ায় কিছু কিছু দেখা যাচ্ছিল। ওয়ারপার দেখল জেনের বিছানার উপর ঝুঁকে পড়ে কে কথা বলছে। সে বেশ বুঝতে পারল মহম্মদ ছাড়া সে আর কেউ নয়। মহম্মদ জেনকে কি বলতেই জেন উঠে বসল। তাকে ঘৃণার সঙ্গে কি বলল। মহম্মদ তখন জেনের গলাটা টিপে ধরে তাকে আবার বিছানায় শুইয়ে দিল।

এমন সময় ওয়ারপার গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মহম্মদের উপর।

কিন্তু মহম্মদ তার ছোরাটা ধরে এগিয়ে যেতেই ওয়ারপার তার রিভলবারটা বার করে তার বুক লক্ষ্য করে গুলি করল। মহম্মদ ধড়াস করে পড়ে গেল মেঝের উপর।

জেন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ওয়ারপারের কাছে এসে বলল, হে বন্ধু, কিভাবে ধন্যবাদ দেব আপনাকে?

বাইরে গুলির শব্দ পেয়ে আরবরা এই তাঁবুর দিকে ছুটে এল।

ওয়ারপার তাঁবুর বাইরে অপেক্ষমান আরবদের বলল, বন্দিনী বাধা দিতে গেলে মহম্মদ তাকে গুলি করে। তবে মারা যায়নি। আমি আর মহম্মদ দুজনে মিলে ব্যাপারটা সামলে নেব। তোমরা গিয়ে শুয়ে পড়।

তার এই কথা শুনে আরবরা যে যার তাঁবুতে চলে গেল।

ওয়ারপার জেনকে বলল, আমি একটা পরিকল্পনা খাড়া করেছি, আপনার পক্ষ থেকে শুধু কিছু সাহস দরকার। আপনি মৃতের ভান করবেন। আমি আপনার দেহটা বয়ে নিয়ে যাব। বলব, মহম্মদ আপনাকে ভালবাসত, তাই নিজের হাতে আপনাকে মারায় সে দুঃখিত। সে তাই শুয়ে আছে শোকে দুঃখে অভিভূত হয়ে। সে আমাকে আপনার মৃতদেহটা জঙ্গলে বয়ে নিয়ে যেতে বলেছে।

জেন হাসিমুখে বলল, কিন্তু একথা ওরা বিশ্বাস করবে ?

ওয়ারপার বলল, আপনি ওদের চেনেন না। দেহে ওদের যতই শক্তি থাকুক, মগজে বুদ্ধি নেই সেই পরিমাণে।

এরপর জেনকে একটা বাড়তি রিভলবার আর কিছু গুলি দিয়ে বলল, আপনাকে আমি বনের ভিতরে রেখে এখনি চলে আসব। কাল সকালে আমি আপনার কাছে ফিরে যাব।

এইভাবে জেনকে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ল ওয়ারপার। শিবিরের শেষ প্রান্তে রক্ষীরা আগুন জ্বালিয়ে রেখে পাহারা দিচ্ছিল সিংহের ভয়ে। ওয়ারপার সেখানে গিয়ে জেনের মুখ থেকে কাপড়টা তুলে বলল, মহম্মদ মেয়েটাকে মেরে ফেলেছে। সে আমাকে মৃতদেহটাকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসতে বলল।

তখন আর কেউ কিছু বলল না। জেন ভয়ে কাঠ হয়ে ছিল। ভাবছিল ওরা হয়ত ওয়ারপারের কথা বিশ্বাস করবে না।

ওয়ারপার সোজা চলে গিয়ে একটা গাছের উপর তুলে দিল জেনকে। তারপর বলল, রাতটা এখানে কাটান কোনরকমে। সকাল হলেই আমি ফিরে আসব।

শিবিরে এসে ওয়ারপার সোজা মহম্মদ বেজের মৃতদেহটা মহম্মদের তাঁবুতে বয়ে নিয়ে গেল। তার বিছানায় মৃতদেহটা শুইয়ে তার হাতে তারই রিভলবারটা গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল ওয়ারপার। নিশ্চিন্তে ঘুমোতে লাগল।

পরদিন সকালেই একজন আরব ঘুম থেকে জাগাল ওয়ারপারকে। বলল, মহম্মদ বেজ আত্মহত্যা করেছে তার ঘরে।

ওয়ারপার ঘর থেকে বেরিয়ে সমবেত আরবদের মাঝখানে গিয়ে প্রথমে রাগের সঙ্গে বলল, কে হত্যা করেছে মহম্মদকে ?

আরবরা বলল, আমরা কেউ না, ও নিজেকেই নিজে হত্যা করেছে।

আচমেত জেক ও মহম্মদের মৃত্যুতে নেতাশূন্য হয়ে পড়ল আরবরা। তারা ঠিক করল উত্তরাঞ্চলে গিয়ে তারা যে যার পথ বেছে নেবে। ওয়ারপার বলল, আমিও এখান থেকে যেখানে খুশি চলে যাব।

এই বলে সে তার ঘোড়াটায় চেপে বনের দিকে চলে গেল।

কিন্তু বনে গিয়ে যে গাছে জেনকে রেখে এসেছিল সে গাছে দেখল আশেপাশে কোথাও জেনের কোন চিহ্ন নেই।

সোনার তালগুলোর কথা মনে পড়তে টারজন আবার তার বিধ্বস্ত বাংলোর দিকে চলে গেল। গিয়ে দেখল সেখানে কেউ নেই। যুদ্ধরত দুপক্ষই চলে গেছে। সোনার তালগুলোরও কোন চিহ্ন নেই। সে তাই হতাশ হয়ে বনে ফিরে এল আবার।

বনে এসেই একটা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনে গাছে উঠে লুকিয়ে রইল। আড়াল থেকে দেখল যাকে সে অনেকদিন ধরে খুঁজছে সেই চোর পলাতক লোকটাই ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। গাছের তলায় ওয়ারপারের ঘোড়াটা আসতেই তার উপর গাছ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজন। তারপর তার বুকের উপর বসে বলল, আমার মুক্তোর থলিটা কোথায় বল, তা-না হলে তোকে মেরে ফেলব।

ওয়ারপার বলল, থলিটা আচমেত জেক আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।

টারজন বলল, মিথ্যা কথা, বলেই তার গলাটা টিপে ধরতেই ওয়ারপার কোনরকমে বলল, সামান্য ক'টা পাথরের জন্য আপনার মত লোক হয়ে আমাকে হত্যা করবেন লর্ড গ্রেস্টোক?

টারজন বিস্ময়ে অবাক হয়ে বলল, কে লর্ড গ্রেস্টোক?

ওয়ারপার বলল, কেন আপনিই জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোক।

টারজন এবার ওয়ারপারকে ছেড়ে দিয়ে নিজে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবার হারানো স্মৃতি ফিরে পেয়েছে সে। অতীতের সব কথা মনে পড়ছে তার একে একে।

হঠাৎ সে বলল, জেন, আমার স্ত্রী কোথায়? আমার খামার আর বাড়ি সব ভস্মীভূত হয়েছে তুমি তা জান। এতে তোমারও হাত আছে। তুমি আমায় অনুসরণ করে ওখানে গিয়েছিলে। তুমিই আমার মুক্তো চুরি করেছিলে। তুমি কুটিল প্রকৃতির এক শয়তান।

তার থেকেও খারাপ।

সহসা টারজনের পিছন থেকে কে একজন কথাটা বলে উঠল। টারজন দেখল সামরিক পোশাকপরা এক অফিসার কয়েকজন নিগ্রো সৈন্যসহ ওয়ারপারকে ধরতে এসেছে।

সামরিক অফিসার টারজনকে বলল, ও একজন খুনী মঁসিয়ে। উপরওয়ালা এক অফিসারকে খুন করে পালিয়ে এসেছে ও। এর বিচারের জন্য ওকে খুঁজছি আমি। আমি ওকে নিয়ে যাব।

টারজন বলল, কিন্তু আমার কাজ এখনো মেটেনি।

ওয়ারপার টারজনের কানে কানে বলল, তুমি আমাকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করো। আমি গতরাতে তোমার স্ত্রীকে যেখানে দেখেছিলাম সেই জায়গাটা দেখিয়ে দেব তোমাকে।

টারজন তখন ওয়ারপারকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে একজন নিগ্রো সৈনিক রাইফেলের বাঁট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করল। টারজন পড়ে গেল। তখন তাকে নিগ্রো সৈনিকরা বেঁধে ফেলল। তারপর তাদের যাত্রা শুরু করল।

সন্ধ্যার সময় একটা নদীর ধারে রাত্রির মত একটা শিবির তৈরী করল ওরা। টারজন দেখল সে আর ওয়ারপার হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে একটা তাঁবুর ভিতরে।

জেনকে বনে একা রেখে ওয়ারপার আরবশিবিরে চলে গেলে জেনের চোখে একটুও ঘুম এল না। কখন ওয়ারপার ফিরে আসবে সেই চিন্তাই বারবার করতে লাগল সে।

ভোরের দিকে আরবী পোশাকপরা এক অশ্বারোহীকে সেইদিকে আসতে দেখে গাছ থেকে নামতেই জেন দেখল সেই অশ্বারোহীর পিছনে আরও অনেক অশ্বারোহী আসছে এবং তাদের মধ্যে ওয়ারপার নেই।

ভয়ে আবার গাছে উঠতে যেতেই আবদুল মুরাক তার লোকদের ধরে ফেলতে বলল জেনকে।

সন্ধ্যের সময় পথের মাঝে যেখানে একটা শিবির খাড়া করল মুরাকরা সে জায়গাটায় সিংহের উৎপাত খুবই বেশী।

শিবিরের চারদিকে আগুন জ্বালানো সত্ত্বেও অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠার পর কতকগুলো সিংহ গর্জন করতে করতে ঘোরাফেরা করতে লাগল শিবিরটার চারদিকে।

শিবিরের সকলে তখন আপন আপন প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ায় জেনের দিকে নজর দিতে পারেনি কেউ।

এদিকে সেই রাতে টারজন আর ওয়ারপার যখন ফরাসী সৈনিকদের শিবিরে বন্দী ছিল তখন গভীর রাতে শিবিরের কাছে একটা গাছ থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ আসে। শিবিরে মাত্র দুজন সৈনিক পাহারা দিচ্ছিল। বাকি সবাই ঘুমোচ্ছিল। পাহারাদার ছাড়া আর যারা জেগে ছিল তারা হলো টারজন আর ওয়ারপার।

গাছ থেকে আসা সেই শব্দটার মানে বুঝতে পারল টারজন। সেও তেমনি একটা শব্দ করে জবাব দিল। রক্ষী দুজন সেই শব্দ শুনে দারুণ ভয় পেয়ে গেল।

এমন সময় গাছ থেকে একটা বাঁদর-গোরিলা

নামতেই তার পিছু পিছু আরো অনেকগুলো গোরিলা নেমে এসে সোজা শিবিরে ঢুকে পড়ল। টারজনের নির্দেশমত তারা টারজন আর ওয়ারপারকে তুলে নিয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে এল।

ততক্ষণে রক্ষীদের চীৎকারে শিবিরের সবাই জেগে উঠেছে। তখন ফরাসী অফিসার গুলি করল আর সেই গুলিটা চুলুকের গায়ে লাগল।. তবু সে ওয়ারপারকে বয়ে নিয়ে রাতের মধ্যে তার দলের সকলের পিছু পিছু ছুটতে লাগল। তারপর একসময় পড়ে গেল ওয়ারপারকে নিয়ে।

হঠাৎ চুলুকের হাতে হাত পড়তেই তার হারানো মুক্তোর আসল থলিটা পেয়ে গেল ওপারপার। টারজনরা তখন কিছুটা এগিয়ে পড়েছিল। ওয়ারপার দেখল এগুলো ওপারের আসল মুক্তো, যে থলিটা তার জামার তলায় লুকিয়ে রেখেছিল।

এবার টারজন ছুটে এসে দেখল চুলুক মারা গেছে গুলির আঘাতে। তখন সে ওয়ারপারকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

টারজন এবার ওয়ারপারকে বলল, তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো। আমি তোমাকে উদ্ধার করেছি।

ওয়ারপার তখন পথ দেখিয়ে তাকে জেনকে যেখানে রেখে এসেছিল সেই দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

যেতে যেতে একসময় সিংহের সমবেত গর্জন আর ঘোড়া ও মানুষের আর্ত চীৎকার শুনতে পেল। সে ওয়ারপারকে বলল, কারা বিপদে পড়েছে, দেখি একবার। তুমি এখানেই থাক। আমি এখনি ফিরে আসব।

তখন ওয়ারপারকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে টারজন সেই গোলমালের শব্দ লক্ষ্য করে চলে গেলে ওয়ারপার উল্টোদিকে তীরবেগে পালিয়ে গেল।

শিবিরের কাছে গিয়ে একটা গাছের উপর থেকে টারজন দেখল সেই গাছের নিচে এক মহিলা একটা মরা ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর একটা সিংহ তাকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হচ্ছে।

এদিকে জেন দেখল সিংহটা সত্যি সত্যি পা তুলে ঝাঁপ দিচ্ছে আর সেই সঙ্গে গাছ থেকে বাদামী রঙের এক দৈত্যাকার প্রেতমূর্তি সিংহটার উপর ঝাঁপ দিল। মৃত স্বামীকে জীবন্ত দেখে ভয়ের কথা ভুলে গেল জেন।

জেন দেখল টারজনের হাতে কোন অস্ত্র নেই। টারজন দেখল একটা মৃত সৈনিকের একটা রাইফেল পড়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে টারজন সিংহটার মাথায় এত জোরে মারল যে সিংহের মাথার খুলিটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

টারজন চারদিকে দেখে আর সময় নষ্ট না করে জেনকে তুলে নিয়ে গাছের উপর উঠে পড়ল। মুরাকের সৈন্যরা তখন সিংহদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য এতই ব্যস্ত ছিল যে টারজন তাদের বন্দিনীকে নিয়ে গেলেও তারা কোনভাবে হস্তক্ষেপ করল না।

টারজন জেনকে সঙ্গে করে যেখানে ওয়ারপারকে ছেড়ে এসেছিল সেইখানে গেল। কিন্তু ওয়ারপারকে দেখতে পেল না।

টারজন বলল, ও পালিয়ে গিয়েই প্রমাণ করল যে ও দোষী। যাক, ও নিজের কবর নিজের হাতে খুঁড়ল।

এবার দুজনে তাদের খামারবাড়ির দিকে রওনা হলো। টারজন বলল, ওপারের ধনরত্ন গেল, বাড়ি গেল, খামার গেল, সব গেল। কিন্তু তোমাকে আজ আমি ফিরে পেয়েছি এটাই আমার আজ সবচেয়ে বড় লাভ। আবার আমরা আমাদের অনুগত ও বিশ্বস্ত ওয়াজিরিদের কাছে যাব।

টারজন যখন ওয়াজিরিদের বস্তীতে গিয়ে হাজির হলো তখন ওদের নেতা বাসুলি আর মুগাম্বি দুজনেই ছিল। তারা আরবদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। দীর্ঘকাল পরে তাদের প্রিয় প্রভু আর প্রভুপত্নীকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল তারা। সঙ্গে সঙ্গে নাচগান শুরু করে দিল। তার আগে বাসুলি টারজনকে জানাল কিভাবে সোনার তালগুলো উদ্ধার করে আরবদের হাত থেকে।

টারজন দেখল ওপার নগরীর ধনাগার থেকে যেসব সোনার তাল সে ওয়াজিরিদের হাতে দিয়েছিল তা সবই আছে।

যেসব ঘটনার কথা তার বিশ্বস্ত ওয়াজিরিদের কাছ থেকে শুনল টারজন তার থেকে বুঝতে পারল মঁসিয়ে ফ্রেকুলত্ নামধারী বেলজিয়ান ওয়ারপারই এই সব কিছু করিয়েছে। সমস্ত অঘটনের মূলে আছে সে।

কয়েকমাস ধরে ওয়াজিরিরা দিনরাত খেটে টারজনের ভস্মীভূত বাংলো-বাড়িটা আবার আগের মত করে গড়ে তুলল। ওয়াজিরিদের শ্রম আর ওপারের সোনায় আবার সবকিছু ফিরে পেল টারজন।

টারজনের জঙ্গল জীবন

জাঙ্গল টেলস অফ টারজন

সেদিন জঙ্গলের ঘন ছায়ার তলায় আরামে বিশ্রাম করছিল বাঁদর-গোরিলা টিকা। অদূরে একটা গাছের ডালের উপর বসে দোল খাচ্ছিল টারজন।

টিকা ছিল তার ছেলেবেলাকার খেলার সাথী। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বও বেড়ে যায়।

কিন্তু আজ সহসা টারজন যখন গাছের উপর থেকে দেখল টগ টিকার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার ঘাড়ের উপর একটা পা তুলে দিয়ে আদর করছে তাকে তখন মনটা বিগড়ে গেল টারজনের।

টারজন দাঁতগুলো বার করে গর্জন করে উঠল। তার পানে তাকাল টগ। টিকা মুখ তুলে তাকাল টারজনের পানে। সে এর কারণ কিছু বুঝতে পারল না। এবার সে টগের আদরের বিনিময়ে তার পিঠটা চুলকে দিচ্ছিল।

এই দৃশ্যটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঘুরে গেল টারজনের। তার মনে হলো এই মুহূর্তে টিকাকে সারা জগতের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বস্তু বলে মনে হচ্ছিল।

টারজন এগিয়ে এসে টগকে বলল, টিকা আমার।

টগ বলল, টিকা টগের, আর কারো নয়।

দুজনেই এবার লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হলো। দুজনেই দাঁত বার করে তেড়ে এল দুজনকে। কিন্তু হঠাৎ সেখানে একটা চিতাবাঘ এসে পড়ায় টগ পালিয়ে গিয়ে একটা গাছের উপর উঠে পড়ল। টিকা তখনো গাছের তলায় মাটির উপরেই ছিল। কিন্তু চিতাবাঘটা তাকে সামনে পেয়ে তাকেই তাড়া করল। অন্য সব বাঁদর-গোরিলাগুলোও গাছের উপর উঠে এক নিরাপদ আশ্রয় থেকে ঘটনাটা দেখে মজা পাচ্ছিল।

একা টারজন এগিয়ে গিয়ে চিতাবাঘটার সামনে দাঁড়াল। গর্জন করে চিতাবাঘটার দৃষ্টি টিকার উপর থেকে সরিয়ে তার নিজের উপরে নিবদ্ধ করার চেষ্টা করল। তার ঘাসের দড়ির ফাঁসটা চিতাবাঘটার গলায় ঠিক সেই মুহূর্তে আটকে না দিলে টিকাকে ধরে ফেলতো সে। চিতাবাঘটা গলার ফাঁসটা নিয়ে টানাটানি করতে থাকলে সেই অবসরে একটা গাছের উপর উঠে পড়ল টিকা।

সুযোগ পেয়ে টারজনও কাছাকাছি একটা গাছের উপর উঠে পড়ল। বাঘটা এবার দাঁত আর নখ দিয়ে

ঘাসের দড়িটা ছিঁড়ে বনের ভিতর পালিয়ে গেল। চিতাবাঘটা পালিয়ে যেতেই বাঁদর-গোরিলাগুলো সব একে একে নেমে এল গাছ থেকে। টিকা দেখল টগ নয় টারজনই তার উদ্ধারকর্তা। তাই সে ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার বশে টারজনের কাছে সরে এল।

টারজন এরপর সোজা গাছে গাছে মবঙ্গাদের গাঁয়ের কাছে চলে গেল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দেখল শিকারীরা বনপথের উপর পশু শিকারের জন্য একটা বড় খাঁচা পেতে রেখে সব গাঁয়ে ফিরে এসেছে।

রাতটা মবঙ্গাদের গাঁয়ের কাছে একটা গাছে কাটিয়ে সকাল হতেই সেখান থেকে ফিরে আসতে লাগল টারজন। ফেরার পথে দূর থেকে বাঁদর-গোরিলার ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেল সে।

এদিকে সকাল হতেই মবঙ্গাদের গাঁয়ের যেসব শিকারী খাঁচাটা পেতে রেখে গিয়েছিল তারা তাতে কোন জন্তু ধরা পড়েছে কি না তা দেখতে এল। এসে তারা দেখল একটা বিরাটকায় বাঁদর-গোরিলা ধরা পড়েছে তাতে। তাদের দেখে গোরিলাটা ছটফট করছে বার হবার জন্য। তা দেখে বেশ মজা পেল তারা। টারজন সেখানে এসে গাছের উপর থেকে সবকিছু দেখে তার দলের কাছে ফিরে এল।

টিকা বলল, টগ কোথায় ?

টারজন বলল, তাকে গোমাঙ্গানীরা ধরেছে। তারা তাকে বধ করবে।

একথা শুনে এক অব্যক্ত বিষাদ ফুটে উঠল টিকার চোখে মুখে।

তা দেখে আর বসে থাকতে পারল না টারজন। লাফ দিয়ে গাছের উপর উঠে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়।

সোজা মবঙ্গাদের গাঁয়ের দিকে চলে গেল টারজন। গাঁয়ের কাছাকাছি গিয়ে দেখল শিকারী যোদ্ধারা ক্লান্ত হয়ে সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু একজন পাহারাদার খাঁচাটার কাছে বসে পাহারা দিচ্ছে।

টারজন তখন গাছ থেকে নেমে খাঁচাটার কাছে চলে গেল। তারপর পাহারাদারটার গলাটা দুহাত দিয়ে টিপে ধরল। পাহারাদারটা মরে গেলে খাঁচার কাঠ খুলে টগকে মুক্ত করল টারজন। তারপর খাঁচার ভিতর পাহারাদারের মৃতদেহটা ভরে রেখে টগকে নিয়ে গাছে উঠে পড়ল।

টারজন এবার টগকে বলল, তুমি টিকার কাছে চলে যাও। সে তোমার। টারজন তাকে চায় না।

টারজন গাছের উপর থেকে দেখল, একদল নিগ্রো যোদ্ধা একটা বড় রকমের গর্ত খুঁড়ছে। গর্তটা খোঁড়া শেষ হয়ে গেলে তার ফাঁকটায় কতকগুলো পাতা আর কিছু ঘাস চাপিয়ে দিল।

যোদ্ধারা সেখান থেকে চলে যেতেই টারজন গাছ থেকে নেমে গর্তটার চারদিকে ঘুরে সেটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। উপর থেকে দেখে সেটাকে গর্ত বলে চেনাই যায় না। তারপর গাছে গাছে তার দলের বাঁদর-গোরিলাদের কাছে চলে গেল।

এইভাবে কিছুটা যাওয়ার পর টারজন তার নাকের মধ্যে এক বিরাটকায় জন্তুর গন্ধ পেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখল একটা হাতি এগিয়ে আসছে সেই দিকে। টারজন গাছের উপর একটা ডা

ভাঙ্গতে তার শব্দে হাতিটা শুঁড় তুলে উপর দিকে তাকাল।

টারজন হাসতে লাগল। একটা নিচু ডালে নেমে এসে সে হাতিটাকে 'ট্যান্টর, ট্যান্টর' বলে ডাকতে লাগল।

এরপর হাতিটা শুধু মুখে একটা শব্দ করল। টারজন এবার গাছের ডাল থেকে হাতিটার পিঠের উপর নেমে পড়ল। হাতিটা টারজনের অনেক দিনের চেনা। ছেলেবেলা থেকে খেলা করে আসছে তার সঙ্গে।

টারজনের খিদে পাওয়ায় সে হাতিটার পিঠ থেকে আবার গাছের উপর উঠে পড়ল। তারপর শিকারের সন্ধানে চলে গেল।

শিকারের সন্ধানে প্রায় একঘণ্টা ঘুরে বেড়াল টারজন। তারপর হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়ে গেল। কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো যোদ্ধারা কি কারণে বনের মধ্যে পথের ধারে সেই বিরাট গর্তটা খুঁড়ে রেখেছে। সে বুঝল তার প্রিয় বন্ধু ট্যান্টরকে ফাঁদে ফেলার জন্য সে খালটা করেছে তারা। হাতিটা ঘুরতে ঘুরতে এতক্ষণে হয়ত সেই খালে এসে পড়েছে। সে জানে মূল্যবান দাঁত আর বেশী মাংসের লোভে হাতি শিকার করে নিগ্রোরা।

গাছের ডালে ডালে তীর বেগে যেতে লাগল টারজন।

কিছুটা এগিয়ে টারজন দেখল হাতিটা শিকারীদের তাড়া খেয়ে এই দিকেই ছুটে আসছে। টারজন তখন গাছ থেকে নেমে হাতিটার সামনে দাঁড়িয়ে হাত দেখিয়ে বলল, থাম।

হাতিটা তাকে এবার চিনতে পেরে থামল। টারজন তখন চোরা গর্তটার উপরকার লতাপাতাগুলো তাড়াতাড়ি সরিয়ে হাতিটাকে গর্তটা দেখিয়ে দিয়ে তাকে সরে যেতে বলল। হাতিটা তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সরে গেল সেখান থেকে।
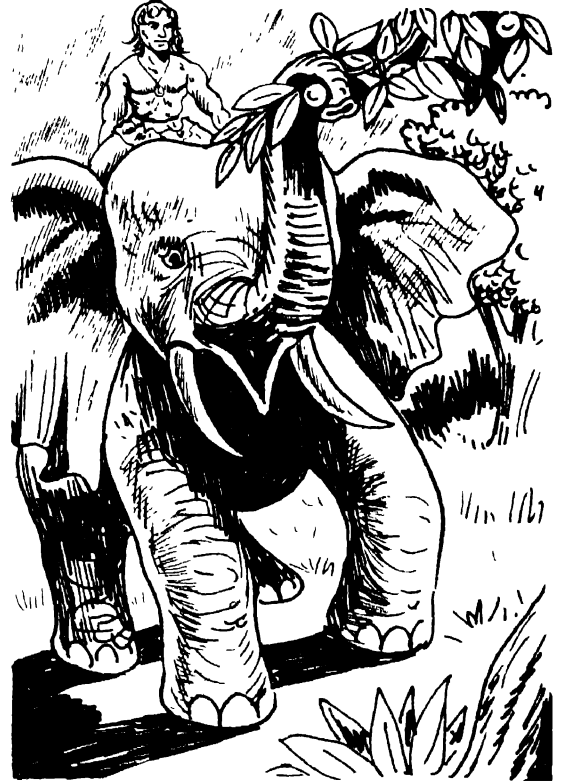
টারজন তখন তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে যেতে গিয়ে পড়ে গেল গর্তটার মধ্যে। হঠাৎ পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত লাগায় সে অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

এদিকে নিগ্রো শিকারীরা হাতিটার লোভে গর্তের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে হাতিটাকে দেখতে পেল না। দু-তিনজন শিকারী গর্তের মধ্যে নেমে টারজনকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। তারা টারজনকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে এসে তার হাত পা বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে ওরা গাঁয়ের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

মবঙ্গার নির্দেশে কয়েকজন যোদ্ধা টারজনকে একটা কুঁড়েঘরের দিকে নিয়ে গেল। টারজনের দূরে জঙ্গল থেকে একটা শব্দ কানে এল। টারজন সে শব্দ শুনতে পেয়ে মুখ তুলে জোরে অদ্ভুতভাবে একটা চীৎকার করল। টারজন বুঝতে পারল তার প্রিয় হাতিটা তাকে ডাকছে।

একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে টারজনকে বন্দী করে রাখল ওরা।

সারাটা বিকেল ধরে টারজন তার হাত পায়ের বাঁধনগুলো খোলার চেষ্টা করতে লাগল। বাঁধনগুলো ক্রমে আলগা হয়ে এল। সন্ধ্যে হতেই একজন যোদ্ধা এসে টারজনকে তুলে ওদের উৎসবের মাঝখানে নিয়ে গেল। কিন্তু টারজনের হাত পায়ের বাঁধনগুলো তখন খুলে যাওয়ায় টারজন একটা লাফ দিয়ে যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল খালি হাতে। সে ঘুষি মেরে অনেক যোদ্ধাকে ঘায়েল করল। একজন যোদ্ধা একটা বর্শা উঁচিয়ে টারজনের বুকটা লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে থাকলে গাঁয়ের প্রান্তে বনের ধারে ডালপালা ভাঙ্গার শব্দ হলো। টারজন বুঝতে পারল তার প্রিয় ট্যান্টর এতক্ষণে মুক্ত করতে আসছে তাকে।

হাতিটা তীরবেগে এসে টারজনের চারপাশে ঘিরে থাকা যোদ্ধাদের একে একে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে দূরে ফেলে দিতে লাগল। দুই-একজন হাতিটার পায়ের তলায় পড়ে মরল। অনেকে প্রাণভয়ে ছুটে পালাল। অবশেষে টারজনকে শুঁড় দিয়ে তার পিঠের উপর চাপিয়ে হাতিটা গাঁয়ের গেট পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল।

কিছুদিন পর টারজন যখন ঘাস দিয়ে একটা দড়ি তৈরী করছিল, টিকার ছেলে গজন তখন তাকে প্রায়ই বিরক্ত করছিল।

নতুন দড়িটা তৈরী হয়ে গেলে টারজন সেটা নিয়ে একা শিকারে বেরিয়ে যেতেই সেদিন কিন্তু অদ্ভুত এক খেয়াল চাপল তার মাথায়। সে মনে মনে ঠিক করল এবার থেকে সে এক মানব সন্তানকে কাছে রেখে তাকে পালন করবে, তাতে সে কৃষ্ণকায় হলেও চলবে। টিকার ছেলে তার মত মানুষ নয়, এক জন্তু। সে তার মনের কথা ঠিক বুঝতে পারে না। তাই এক কৃষ্ণাঙ্গ শিশুর খোঁজে মবঙ্গাদের গাঁয়ের পথে রওনা হলো সে।

মবঙ্গাদের গাঁয়ের কাছে নদীর ঘাটে এক নিগ্রো যুবতী মাছ ধরছিল। তার বয়স তিরিশ। নদীর পারে তার বছর দশেকের একটা ছেলে দাঁড়িয়েছিল।

গাছ থেকে নেমে পাশের একটা ঝোপ থেকে লক্ষ্য করল টারজন, ছেলেটা কালো হলেও দেখতে ভাল। টারজন তার দড়ির ফাঁসটা ছেলেটার গায়ের উপর ছুঁড়ে দিল। তারপর দড়িটা ধরে টান দিতেই ফাঁসটা ছেলেটার দুটো হাত সমেত গাটাতে আটকে গেল। এবার সে ছেলেটাকে টানতে টানতে গাছের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। ছেলেটার জোর চীৎকারে তার মা মাছধরা ফেলে ছুটে এল।

কিন্তু ততক্ষণে ছেলেটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে মুহূর্তমধ্যে গাছের মধ্য দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল টারজন।

ছেলেটাকে নিয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে টারজন তাকে বলল, শোন, কেঁদো না। আমার নাম টারজন। আমি তোমার ক্ষতি করব না। আমি একজন বড় শিকারী।

কিন্তু টারজনের কোন কথা বুঝতে পারল না ছেলেটা। সে টারজনকে বনদেবতা মনে করে ভয় করছিল।

টারজন কিন্তু ছেলেটাকে সোজা তার দলের বাঁদর-গোরিলাদের কাছে নিয়ে গেল। তারা নিগ্রো আদিবাসীদের শত্রু বলে ভাবত বলে নিগ্রো ছেলেটাকে 'গোমাঙ্গানী' বলে দাঁত বার করে তেড়ে এল। তখন টারজন তাদের সাবধান করে দিয়ে বলল, এ হচ্ছে টারজনের ছেলে। এর কোন ক্ষতি করো না তোমরা। তাহলে তোমাদের মেরে ফেলব। এ টিকার ছেলে গজনের সঙ্গে খেলা করবে। এর নাম টিবো।

টারজন টিকার ছেলে গজনকে এনে টিবোর সঙ্গে খেলা করতে দিল। কিন্তু টিবো কিছুতেই সহজ হতে পারছিল না।

এদিকে টিবোর মা মোমায়া তার ছেলেকে টারজন নিয়ে যাওযার পর সে তাদের গাঁয়ের যাদুকর পুরোহিতকে ডেকে তার ছেলেকে ফিরিয়ে আনার জন্য তুকতাক করতে বলে। তাকে তার জন্য দুটো ছাগল দেয। কিন্তু কোন কাজ না হওয়ায় তার থেকে বড যাদুকর বুকাবাইয়ের কাছে যাবার কথা ভাবে। কিন্তু গাঁয়ের সর্দার মবঙ্গা মোমায়াকে বুকাবাই-এর কাছে যেতে নিষেধ করল। বুকাবাই সেখান থেকে অনেক দূরে একটা পাহাড়ের গায়ে একটা গুহার মধ্যে থাকে। তার কাছে সব সময় দুটো হায়েনা থাকে। তাছাড়া সেখানে যেতে গেলে পথে বিপদ ঘটতে পারে।

কিন্তু মোমায়া একদিন সন্ধ্যের সময় সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বুকাবাইয়ের গুহার সামনে এসে হাজির হলো। গুহার ভিতর থেকে হায়েনাদের অট্টহাসির শব্দ আসতে থাকায় ভিতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছিল না সে। অবশেষে বুকাবাইয়ের নাম ধরে বারকতক ডাকতে বুকাবাই বেরিয়ে এল গুহা থেকে। বয়সে বৃদ্ধ হলেও বুকাবাইয়ের দেহে শক্তি ছিল প্রচণ্ড।

মোমায়া বলল, বনদেবতা আমার ছেলেকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।

বুকাবাই বলল, এর জন্য পাঁচটা ছাগল, একটা শোবার মাদুর আর একটা তামার তার দিতে হবে আগে।

মোমায়া বলল, এত কোথায় পাব আমি ?

শেষে ঠিক হলো তিনটে ছাগল আর একটা মাদুর দেবে মোমায়া। বুকাবাই বলল, আজ রাতেই ছাগল আর মাদুর নিয়ে আসবে।

মোমায়া বলল, তুমি আগে আমার টিবোকে এনে দাও।

কিন্তু তাতে কিছুতেই রাজী হলো না বুকাবাই। হতাশ হয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের পথে রওনা হলো মোমায়া।

এদিকে তখন বুকাবাই যেখানে থাকত সেই পাহাড়টার কাছাকাছি জঙ্গলের এক জায়গায় টারজন ঘুরতে ঘুরতে শিকার করতে এসেছিল। একসময় সে টিবোকে একটা ঝোপের ধারে রেখে কিছুটা দূরে চলে যায়। এমন সময় হঠাৎ ঝোপের ওধারে কার পায়ের শব্দ পেয়ে ভয় পেয়ে গেল টিবো। কাছে এসে মোমায়া তার ছেলেকে চিনতে পেরে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

এতক্ষণ একটা সিংহ ওদিকে একটা ঝোপের পাশ থেকে লক্ষ্য করছিল তাদের। এবার সিংহটা তাদের

সামনে কিছুদূর এসে থমকে দাঁড়াতেই মোমায়া তার হাতের বর্শাটা সজোরে সিংহটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। বর্শাটা সিংহের গায়ের কিছুটা বিদ্ধ করে পড়ে গেল। তার গায়ের খানিকটা মাংস ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল. সিংহটা তাদের আক্রমণ করার জন্য সামনের পা তুলে উদ্যত হলো।

টিবোদের আর্ত চীৎকার কানে যেতে ছুটে এল টারজন। এসেই সে পিছন থেকে তার ছুরিটা সিংহটার পাঁজরে বসিয়ে দিল। এবার টারজনের ছুরির আঘাতে সিংহটা লুটিয়ে পড়তেই টারজনের ভয়ে ভীত হয়ে উঠল মোমায়া। সে টিবোকে বুকের উপর জড়িয়ে ধরল। ভাবতে লাগল টারজন হয়ত আবার তার ছেলেকে ছিনিয়ে নেবে তার কাছ থেকে। কিন্তু টারজন সেধরনের কোন ভাব দেখাল না।

টিবো অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগল, টারজন, তুমি আমাকে আমার মার সঙ্গে যেতে দাও। তোমার কথা আমরা কোনদিন ভুলব না। তুমি খুব ভাল লোক।

টারজন বলল, যাও। তবে আমি তোমাদের দুজনকে তোমাদের গাঁ পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসব, কারণ পথে কোন বিপদ ঘটতে পারে।

টারজনের কথাটা শুনে খুশি হলো মোমায়া। ওরা তিনজনে তখনি রওনা হয়ে পড়ল ওদের গাঁয়ের পথে। এদিকে বুকাবাই তার গুহা থেকে বেরিয়ে মোমায়া কোন্ পথে যায় তা লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখল বনদেবতা টারজন মোমায়ার ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিয়েছে এবং তারা বাড়ি চলে যাচ্ছে। তবু সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, মোমায়াকে যে ছাগল আর মাদুরের কথা বলেছে তা সে আদায় করে ছাড়বেই।

প্রায় দুদিন পর মবঙ্গাদের গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছল ওরা। মোমায়া আর তার ছেলেকে গাঁয়ে পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে চলে এল টারজন।

কিন্তু বাঁদর-গোরিলাদলের মাঝে ফিরে গেল না। প্রায় তিন দিন তার নিঃসঙ্গ জীবনটা খুব একঘেঁয়ে লাগায় সে বিকালের দিকে মবঙ্গাদের গাঁয়ের পথে রওনা হলো। সে ঠিক করল সন্ধ্যের দিকে একটা কি দুটো নিগ্রোযোদ্ধাকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারবে।

গাঁয়ের প্রান্তে বনের ধারে একটা গাছের উপর বসে লক্ষ্য করতে লাগল। সহসা এক নারীকণ্ঠের কান্না শুনে চমকে উঠল টারজন। সে ভাল করে দেখল একটা গাঁয়ের ভিতর একটা কুঁড়েঘর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসছে মোমায়া।

টারজন এই কান্না দেখে ব্যাপারটা জানার জন্য নির্ভীকভাবে গাঁয়ের মধ্যে সেই কুঁড়েগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তাকে দেখে মোমায়া চিনতে পারল। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, কে তার ছেলে টিবোকে আবার চুরি করে নিয়ে গেছে। তুমি মানুষ নও, দেবতা, একমাত্র তুমিই তাকে খুঁজে আনতে পারবে।

মোমায়ার ভাষা বুঝতে না পারলেও তার বক্তব্যটা মোটামুটি বুঝতে পারল টারজন। সে সেখানে আর না দাঁড়িয়ে গাঁ থেকে বেরিয়ে বনে চলে গেল। টিবোকে সে সত্যিই ভালবাসত। তাকে সে তার মার কাছে এনে দেবেই।

গাছে গাছে কিছুদূর যাবার পর টারজন দেখল পাহাড়ের দিকে যে মাটির পথটা চলে গেছে সেপথে একটা ছেলে আর একটা বয়স্ক লোকের পায়ের ছাপ রয়েছে।

সেই ছাপ অনুসরণ করে সোজা বুকাবাই-এর গুহার সামনে যেতেই ছুটো হায়েনা তাকে তেড়ে এল। টারজন গন্ধ শুকে বুঝল এই গুহার মধ্যেই টিবো আছে। টিবোকে ছুটো হায়েনার পাহারায় রেখে বুকাবাই তার ছাগল আদায় করার জন্য মবঙ্গাদের গাঁয়ে মোমায়ার কাছে গিয়েছিল।

বুকাবাই-এর আগে আর একদিন ঐ গাঁয়ে গিয়ে মোমায়াকে বলে, আমার তুকতাকের জোরেই তুমি তোমার ছেলেকে ফিরে পেয়েছ। আমার জন্যই বনদেবতা ফিরিয়ে দিয়েছে তোমার ছেলেকে। অতএব আমাকে পাঁচটা ছাগল দিয়ে দাও। আর একটা শোবার মাতুর আর তামার তার।

মোমায়া বলে, তুমি ত আমার জন্য কিছুই করোনি। তুমি ত বললে ছাগল না দিলে কিছুই করবে না।

বুকাবাই তবু শুনল না। কিন্তু মোমায়া কিছু দিতে না চাইলে সে রেগে চলে আসে। পরদিন সে গাঁয়ের বাইরে লুকিয়ে গিয়ে টিবোকে একলা পেয়ে জোর করে তুলে এনে তার গুহায় বন্দী করে রাখে।

তারপর আবার একদিন টিবোকে গুহার ভিতর হায়েনাত্নটোর পাহারায় রেখে মবঙ্গাদের গাঁয়ে চলে আসে বুকাবাই। সে মোমায়াকে বলে, আমি তোমার ছেলে যাতে ফিরে আসে তার ব্যবস্থা করব। আমাকে ছাগলগুলো দিয়ে দাও।

মোমায়া বলে, তুমিই আমার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে গেছ।

বুকাবাই বলে, তোমার ছেলেকে আমি চুরি করে নিয়ে যাইনি। আমি জানি সে একজায়গায় ভালই আছে। তবে দেরী হলে তার বিপদ ঘটতে পারে।

মোমায়া তখন তার ঘরে তার স্বামীকে ডাকতে গেল। সেখানে মবঙ্গা আর গাঁয়ের যাত্নকর পুরোহিত রাব্বা কেগাও ছিল।

মবঙ্গা, মোমায়ার স্বামী ইবেতো আর যাত্নকর কেগা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বুকাবাইকে বলল, তুমি যাত্নর কি জান? কি ওষুধ তৈরী করবে? কোন যাত্ন এখনি দেখাতে পারবে?

বুকাবাই বলল, হ্যাঁ পারব। আমাকে কিছুটা আগুন এনে দাও।

মোমায়া একটা পাত্রে করে বেশকিছুটা আগুন আনল। বুকাবাই সেই আগুন থেকে কিছুটা নিয়ে মাটিতে ফেলে তার কোমরে বাঁধা একটা থলে থেকে কিছু পাউডারজাতীয় একটা বস্তু আগুনটায় ছড়িয়ে দিল। তার থেকে প্রচুর ধোঁয়া বার হতে লাগল। তখন বুকাবাই চোখ বন্ধ করে কি বিড় বিড় করে বকতে বকতে মূর্ছিত হয়ে পড়ার ভান করল। মবঙ্গা ও উপস্থিত সকলে তা দেখে অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেল।

রাব্বা কেগা তা দেখে ঘাবড়ে গেল। সে তখন তার নিজের কৃতিত্ব দেখানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। যে পাত্রটাতে আগুন ছিল তার উপর গোটাকতক শুকনো পাতা ফেলে দিল সে। তার থেকে ধোঁয়া বার হতে লাগল। কেগা তখন চোখ বন্ধ করে মুখটা পাত্রের উপর নামিয়ে অপদেবতাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

বুকাবাই এবার তার ভান করা মূর্চ্ছা ভেঙ্গে উঠে একবার গর্জন করে উঠল। তারপর সে হাতদুটো শক্ত করে টান করে ছড়িয়ে বসে বলল, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। তবে শয়তান বনদেবতা তাকে ধরতে পারেনি। আমাকে দশটা ছাগল দিলে এখনো উদ্ধার করা যাবে তাকে।

এবার কেগা বলল, আমিও তাকে দেখতে পাচ্ছি। তবে সে এখন মৃত। সে এখন নদীর তলায় পড়ে রয়েছে।

এদিকে টারজন বুকাবাই-এর গুহার মধ্যে ঢুকে দেখল টিবো কাঁদছে আর তার দুদিকে দুটো ক্ষিপ্ত হায়েনা তাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য উদ্যত হয়েছে। টারজন ঢুকতেই হায়েনাদুটো টিবোকে ছেড়ে টারজনকে তেড়ে এল। টারজন একে একে হায়েনা-দুটোর ঘাড় ধরে ছুঁড়ে দিতে লাগল। হায়েনাদুটো তখন ছুটে পালাল। টারজন এবার টিবোকে কাঁধে তুলে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে বনে চলে গেল। তারপর গাছে গাছে তাদের গাঁয়ের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে চলল।

মবঙ্গাদের গাঁয়ে যখন দুজন যাদুকর তাদের আপন আপন যাদুর খেলা দেখিয়ে গ্রামবাসীদের মন জয় করার চেষ্টা করছিল ঠিক তখনি টারজন টিবোকে নিয়ে তাদের সামনে গিয়ে হাজির হলো। টিবোর কাছে তার মা মোমায়া ছুটে যেতেই টিবো তাকে সব কথা বলল। এবার মোমায়া বুকাবাই-এর শয়তানির কথা জানতে পেরে তাকে ধরবার জন্য ছুটে গেল। কিন্তু তার আগেই বুকাবাই সরে পড়েছে। মোমায়া তখন কেগাকে রেগে বলল, আমার ছেলে নদীর তলায় মরে আছে? এই তোমাদের যাদু? ভণ্ড কোথাকার!

টারজন মবঙ্গাদের শত্রু হলেও টারজনের প্রতি কোন শত্রুতার ভাব দেখাল না মবঙ্গা। বরং তার উদারতা দেখে তারা সবাই খুশি হলো। কিন্তু টারজন টিবোকে তার মার হাতে তুলে দিয়েই সেখানে আর না দাঁড়িয়ে চলে গেল।

বুকাবাই দেখল এখন তার একমাত্র শত্রু হলো শয়তান বনদেবতা টারজন। তার জন্যই আজ তার এই অপমান। তার জন্যই সে কোন ছাগল পেল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল সে টারজনের উপর প্রতিশোধ নেবেই।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে টারজন যখন আনমনে বুকাবাই-এর গুহার কাছে এসে পড়ল তখন সমস্ত আকাশটা মেঘে ঢেকে গিয়েছিল। একটু পরেই বৃষ্টি নামল।

টারজন একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিল। পরে ঝড় শুরু হলে আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না টারজন। প্রচণ্ড ঝড়ের আঘাতে বিরাট একটা গাছ পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে টারজনও ডাল-পালাগুলোর তলায় চাপা পড়ে গেল। তার আঘাত তেমন গুরুতর না হলেও জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

ঝড় বৃষ্টি থামলে বুকাবাই তার হায়েনা দুটো

নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কিছুটা এগিয়ে যেতেই একটা ভেঙ্গেপড়া গাছের তলায় একটা লোককে মড়ার মত পড়ে থাকতে দেখে হায়েনাত্নটো তাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য ছুটে গেল। বুকাবাই তার হাতে হাড়ের যে একটা লাঠি ছিল তা দিয়ে হায়েনাগুলোকে মেরে তাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখল যার উপর প্রতিশোধ নেবার কথা আজ সে দিনরাত ভাবছে এ সেই শয়তান বনদেবতা। সে টারজনের বুকের উপর কান পেতে দেখল এখনো জীবিত আছে টারজন। সে ভাঙ্গা গাছের ডালপালাগুলো সরিয়ে অচৈতন্য টারজনকে তুলে নিয়ে তার গুহার বাইরে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিল।

এরপর একটা পাহাড়ের ধারে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মোটা দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখল বুকাবাই। কিন্তু তার হাতত্নটো বাঁধল না।

এবার গুহার ভিতরে গিয়ে একপাত্র জল নিয়ে এসে টারজনের চোখে মুখে ছিটিয়ে দিতেই চেতনা ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকাল টারজন। বুকাবাই ঠিক করল সে হায়েনাত্নটোকে এনে ছেড়ে দেবে টারজনের কাছে। তারা জীবন্ত টারজনের মাংস ছিঁড়ে খাবে। এইভাবে সে প্রতিশোধ নেবে টারজনের উপর।

বুকাবাই টারজনকে বলল, আমি হচ্ছি এক বিরাট যাত্নকর বৈদ্য। আমার ওষুধ খুবই জোরাল। তোমার ওষুধের কোন জোর নেই। তোমার ওষুধের যে কোন জোর নেই তার প্রমাণ হলো এই যে তুমি এখন এখানে বলির ছাগলের মত বাঁধা আছ।

কিন্তু তার ভাষা টারজন বুঝতে না পারায় সে গুহায় চলে গেল হায়েনাগুলো আনার জন্য।

এবার বুকাবাই তার গুহার ভিতরে গিয়ে হায়েনাত্নটোকে তাড়িয়ে নিয়ে এল টারজনের কাছে। তারপর সে গিয়ে গুহার মুখে পাতা মাত্নরের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ভাবল হায়েনাগুলোর খুব ক্ষিদে না পেলে তারা টারজনের মাংস ছিঁড়ে খাবে না।

এই অবসরে সে তাই কিছুটা ঘুমিয়ে নেবে।

হায়েনাত্নটো টারজনের কাছে এসে তার পা ত্নটো শুঁকতে লাগল। টারজন তার ছাড়া হাত দিয়ে হায়েনাত্নটোকে সরিয়ে দিল। টারজন এদিকে গাছের গুঁড়ির গায়ে বাঁধনের দড়িগুলো ঘষতে ঘষতে সেগুলো আলগা করে ফেলল।

অবশেষে বিকালের দিকে হায়েনাগুলো ক্ষুধিত হয়ে উঠল। একটা হায়েনা টারজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টারজন তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে টান দিতেই আলগা বাঁধনগুলো ছিঁড়ে গেল। সে তখন একটা হাত দিয়েই একটা হায়েনার গলা টিপে ধরল। আর একটা হাত বাড়িয়ে অন্য হায়েনাটাকে ধরতে গেল, এমন সময় বুকাবাই জোর চীৎকার শুনে ঘুম থেকে উঠে এল। টারজন তখন ত্নটো হায়েনাকে ত্নহাতে ধরে একে একে বুকাবাই-এর মাথার উপর ছুঁড়ে দিল। একটা হায়েনা বুকাবাই-এর মুখটা কামড়ে দিল। আর একটা হায়েনা লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে পালিয়ে গেল।

হায়েনার কামড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল বুকাবাই। এবার উঠে টারজনের দিকে এগিয়ে গেল তাকে আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু টারজন একধাক্কায় ফেলে দিল তাকে। তারপর তাকে তুলে নিয়ে যে গাছটায় তাকে বেঁধে রেখেছিল সেই গাছের সঙ্গে খুব শক্ত করে বেঁধে রাখল।

টারজন আপন মনে বলল, একসময় না একসময় হায়েনাগুলো ফিরে আসবে।

সে জানত, হায়েনাগুলো খিদের জ্বালা অনুভব করলেই বুকাবাইকে এইভাবে বাঁধা অবস্থায় দেখলেই তাকে জীবন্ত ছিঁড়ে খাবে। সত্যিই ফিরে এসেছিল তারা। একসময় ক্ষুধার জ্বালায় তারা তাদের প্রভু জীবন্ত বুকাবাই-এর দেহটা ছিঁড়ে খুড়ে খেতে লাগল।

আজ প্রায় একপক্ষকাল হলো টারজন মোটেই শিকার পাচ্ছে না। দিনকতক হলো সে একরকম না খেয়ে আছে। সে তাই খাবার পাবার আশায় মবঙ্গাদের গাঁয়ের কাছে গিয়ে দেখল মবঙ্গাদের গাঁয়ের মধ্যে খাওয়াদাওয়ার এক জোর উৎসব চলছে। একটা বিরাট হাতির মাংস তারা সব লোক মিলে আগুনে ঝলসিয়ে খাচ্ছে। তাই দেখে খিদের জ্বালায় সেই মাংস খাবার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল টারজনের। টারজন দেখল যে বিরাট পাত্রটাতে হাতির মাংস সিদ্ধ করা ছিল তার চারদিকে গাঁয়ের যোদ্ধারা ভিড় করে ছিল। তারা সেই পাত্রটা থেকে মাংস নিয়ে খাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে একচুমুক করে তাদের দেশী মদ পান করছিল।

খিদের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে গাছের উপর নীরবে বসে রইল টারজন। সে দেখল একে একে যোদ্ধারা সব মাংস আর মদ প্রচুর খাওয়ার পর ঘুমে কাতর হয়ে চলে যাচ্ছে। সবাই চলে গেলে একটা বুড়ো তখনো সেখানে মাংসের পাত্রটার পাশে বসে মাংস খাচ্ছিল। টারজন তাই আর অপেক্ষা না করে গাছ থেকে নেমে সোজা সেখানে চলে গেল। বুড়োটার গলাটা দুহাত দিয়ে টিপে ধরে তাকে হত্যা করে পাত্রটা থেকে বেশকিছু মাংস নিয়ে বনের মধ্যে চলে এল সে।

বনের মধ্যে যেতে যেতে গাঁ থেকে মাইলখানেক দূরে একজায়গায় থেমে কিছুটা মাংস খেল সে। এবার একটা গাছের উপর ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল টারজন। ঘুম ভাঙলে দেখল অনেক আগেই সকাল হয়ে গেছে, রোদ উঠেছে। গাছের তলায় একটা সিংহ দাঁড়িয়েছিল।

সিংহটা টারজনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর গাছে উঠতে লাগল।

টারজন ক্রমশঃ যত উঁচু ডালে উঠতে থাকে সিংহটাও তাকে ধরার জন্য তত উপরে উঠতে থাকে। অবশেষে গাছের মাথায় শেষ ডালটায় উঠে টারজন ভাবল, এবার তার মৃত্যু সুনিশ্চিত। কারণ আর কোন দিকে এগোন সম্ভব নয়।

এমন সময় অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল। একটা বিরাটকায় পাখি কোথা থেকে উড়তে উড়তে এসে গাছটার মাথায় না বসেই টারজনের কাছে এসে ঠোঁট দিয়ে ঘাড়ে একটু ঠুকরে দিল আর টারজন সঙ্গে সঙ্গে সিংহের কবল থেকে বাঁচার জন্য পাখিটার পা দুটো দুহাত দিয়ে ধরল শক্ত করে। পাখিটা টারজনকে নিয়েই উড়তে লাগল। এত বড় পাখি বইয়ে দেখলেও জীবনে কখনো চোখে দেখেনি সে।

এইভাবে পাখিটা অনেকদূর উড়ে যাবার পর টারজন একটা গাছের মাথা লক্ষ্য করে পাখিটার পা দুটো ছেড়ে দিয়ে সেই গাছটার উপর পড়ল।

টারজন দেখল আজ কয়েক দিন ধরে তার শরীরটা ভাল নেই। তাই বিশ্রামের আশায় সমুদ্রোপকূলে তার সেই কেবিনটায় চলে গেল। তারপর আপন মনে বই পড়তে লাগল।

সহসা তার মনে হলো কে যেন ঘরে ঢুকল। টারজন দেখল একটা বিরাট বাঁদর-গোরিলা ঘরে ঢুকে এগিয়ে আসছে তার দিকে। টারজন তার ছুরিটা শক্ত করে ধরে তৈরী হতে না হতেই গোরিলাটা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কেবিন থেকে কিছুটা দূরে যেতেই নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে টারজন তার ছুরিটা অতর্কিতে গোরিলার পেট ও বুকের উপর বসিয়ে দিল। তখন টলতে টলতে ধড়াস করে পড়ে গেল গোরিলাটা।

এরপর আবার কেবিনে ফিরে এল।

সেদিন তাদের দল থেকে একটু দূরে জঙ্গলের এক জায়গায় টিকা একা একা আহার সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত ছিল। তার ছেলে গজন তার কাছে খেলা করছিল। এমন সময় টুগ নামে অন্য এক দলের বাঁদর-গোরিলা এসে হাজির হলো সেখানে।

টিকা তাকে দেখেই দাঁত বার করে তেড়ে এল। টিকা গজনকে সাবধান করে দিয়ে বলল, তুমি গাছে উঠে পড়।

টুগ টিকাকে ধরতে গেলে গজন গাছের উপর থেকে গালাগালি দিতে লাগল। টুগ তখন টিকাকে ছেড়ে দিয়ে গাছের উপর উঠে গজনকে ধরতে গেল। গজন উপরডালে উঠে গেলে টুগ সেই ডালটা ধরে জোর নাড়া দিতে লাগল। তখন গজন গাছ থেকে মাটিতে টিকার পায়ের কাছে পড়ে গেল। সে জোর আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। টুগ এবার টিকাকে জোর করে ধরে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল।

এদিকে টগ ঘুরতে ঘুরতে একটা গাছের উপর থেকে দেখতে পেল একটা হায়েনা একটা ঘুমন্ত ছেলের বুকের উপর মুখ লাগিয়ে শুঁকছে। সে এবার তার ছেলে গজনকে চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে লাফ দিয়ে নেমে ছুটে সেখানে চলে গেল। হায়েনাটাকে ধরে তার গলাটা টিপে তাকে বধ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল তার প্রাণহীন দেহটাকে। তারপর চীৎকার করে তার দলের লোকদের ডাকতে লাগল।

তাদের চীৎকার শুনতে পেয়ে কেবিন থেকে ছুটে এল টারজন। টারজন গজনের দেহটা পরীক্ষা করে দেখল তার দেহে তখনো প্রাণ আছে। সে বলল, একাজ কে করেছে? টিকা কোথায়?

টগ বলল, আমি তার কিছুই জানি না।

টারজন মাটিটা পরীক্ষা করে গন্ধ শুঁকে বলল, অন্য দলের একটা বাঁদর-গোরিলা এই কাজ করেছে।

বাঁদর-গোরিলারা শত্রুর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য টিকার খোঁজে যেতে চাইল। কিন্তু টারজন বলল, আমি টগকে নিয়ে যাব। একটামাত্র বাঁদর-গোরিলা এসে টিকাকে নিয়ে গেছে।

এই বলে টারজন টগকে সঙ্গে করে ঝড়ের বেগে চলে গেল। বাতাসে টুগ আর টিকার গন্ধ পাচ্ছিল সে। তাই ঠিক পথ ধরে এগোতে লাগল সে।
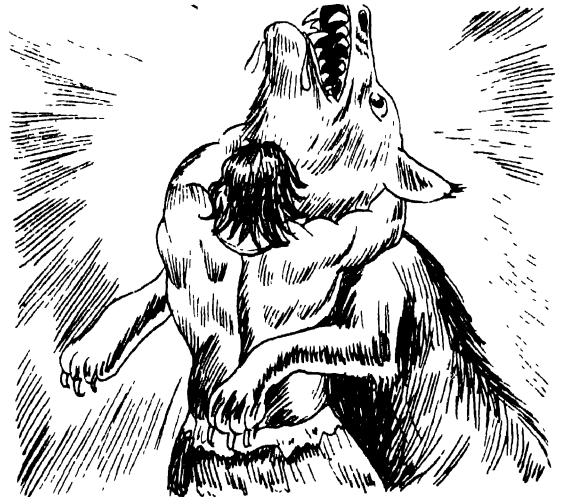
টুগ টিকাকে কাঁধে করে তার দলের কাছে যাচ্ছিল। পথে সে টিকাকে বশ করার অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু টিকা প্রতিবারই তাকে কামড়াতে থাকে। টুগও তাকে আঘাত করে। এইভাবে যেতে যেতে পথে টুগ তার দলের দুজন বাঁদর-গোরিলার সঙ্গে দেখা পেয়ে যায়।

এমন সময় একটা ছোট বাঁদর টারজনদের সেই-দিকে এগিয়ে আসতে দেখে টুগদের সাবধান করে দেয়। টুগরা তখন একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু টারজন বাতাসে গন্ধ শুঁকে ঠিক জায়গাতেই এসে পড়ে। টিকা চীৎকার করে তাদের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দেয়। টুগ তখন তাকে জোর একটা ঘুষি মেরে ফেলে দেয়।

টারজন আর টগ এবার শত্রু গোরিলাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টগ একা টুগ আর অন্য একজন গোরিলার সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। টারজন শুধু সবচেয়ে বড় গোরিলাটার সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। পরে একসময় টারজন ছুরিটা বার করে গোরিলাটার বুকে আমূল বসিয়ে দিতেই সে পড়ে গেল। টারজন তখন টগের সাহায্যে এগিয়ে গেল।

টারজনের হাতে একটা গোরিলা মারা যায়। এবার টুগ আর অন্য গোরিলাটা টারজনের জোর ঘুষি খেয়ে রক্তাক্ত দেহে অবসন্ন হয়ে হাঁপাতে লাগল। তারা আর লড়াই করতে পারছিল না।

এবার টুগ তাদের ভাষায় চীৎকার করে তাদের দলের গোরিলাদের ডাকতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় কুড়িজন গোরিলা এসে টারজন আর টগকে আক্রমণ করল। টিকা একটা গাছের উপর উঠে পড়ল। কিন্তু সে যখন দেখল টারজন আর টগ দুজনে এতগুলো গোরিলার সঙ্গে পেরে উঠবে না তখন গাছ থেকে নেমে সে টারজনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

হঠাৎ টিকার কি মনে হলো সে টারজনের কোমর থেকে বাজীর থলেটা নিয়ে নিল। থলেটার মধ্যে ছোট ছোট কতকগুলো বিস্ফোরক বোমার মত বস্তু ছিল।

টিকা এবার থলে থেকে সেই ছোট ছোট বোমা-গুলো একটা একটা করে বার করে শত্রু গোরিলাদের লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল। জোর আওয়াজ শুনে আর ধোঁয়া দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল শত্রুরা। তারা এ জিনিস কখনো দেখেনি। তাই দারুণ ভয় পেয়ে গেল।

একদিন টারজন যখন তার কেবিনের দিকে যাচ্ছিল তখন বাতাসে একদল নিগ্রো শিকারীর গন্ধ পেল।

টারজন গাছের উপর দেখল মবঙ্গার গাঁয়ের একদল শিকারী একটা বড় বড় চাকাওয়ালা খাঁচা টেনে টেনে নিয়ে আসছে। টারজন বুঝল সিংহ শিকারের জন্য খাঁচাটা এক জায়গায় রেখে যাবে তারা। তারপর পরদিন সকালে শিকারসমেত খাঁচাটা নিয়ে যাবে তাদের গাঁয়ে। খাঁচার ভিতরে একটা ছাগল ছিল। ছাগলটা প্রাণভয়ে ক্রমাগত চীৎকার করছিল।

শিকারীরা চলে গেলে টারজন গাছ থেকে নেমে খাঁচার কাছে চলে গেল। সে তার ছুরি দিয়ে ছাগলটাকে মেরে কিছুটা মাংস খেল। তারপর সে শিকারীরা যেপথে গেছে সেই পথে গাছে গাছে এগিয়ে যেতে লাগল।

এইভাবে মাইল দুয়েক যাবার পর টারজন দেখল শিকারীর দল তাদের গাঁয়ের কাছে চলে গেছে। শুধু যাদুকর ডাক্তার রাব্বা কেগা দল থেকে পিছিয়ে পড়েছে। সে একটা গাছের তলায় বসে গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করছিল।

ভণ্ড কেগাকে ঘৃণা করত টারজন। টারজন দেখল তাকে হত্যা করার এই হলো সুবর্ণ সুযোগ। তারপর কেগার গলা টিপে ধরে তাকে খাঁচার কাছে নিয়ে গিয়ে খাঁচাতে ঢুকিয়ে তাকে বেঁধে রেখে খাঁচাটা বন্ধ করে দিল। কিন্তু এর ভয়ঙ্কর পরিণতি কি হবে তা বুঝতে পারল কেগা।

এরপর দূরে একটা গাছের উপর উঠে রাতটা কাটাল টারজন। রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে একবার একটা সিংহের গর্জন শুনেছিল সে। সকালে উঠে খাঁচার কাছে টারজন গিয়ে দেখল খাঁচার মধ্যে সত্যিই একটা সিংহ আটকে পড়েছে। সিংহটা কেগার দেহটাকে ক্ষতবিক্ষত ও বিকৃত করে তাকে বধ করে ফেলে রেখেছে। সিংহটা ছটফট করতে করতে গর্জন করছিল মাঝে মাঝে।

টারজন দেখল শিকারীরা এসে দূর থেকে খাঁচার মধ্যে সিংহ আটকে পড়তে দেখে আনন্দে উল্লাস করছিল। কিন্তু কাছে এসে কেগার মৃতদেহ দেখে বিমর্ষ ও নীরব হয়ে গেল। যাই হোক, খাঁচাটা তারা টেনে টেনে গাঁয়ের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

খাঁচাটা গাঁয়ে গেলে কি প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখার জন্য টারজনও তাদের পিছু পিছু গাছের ডালে ডালে যেতে লাগল। তারপর গাঁয়ের কাছে একটা গাছ থেকে দেখল, গতকাল শিকারীরা গাঁয়ে গেলে তাদের সঙ্গে কেগা না ফেরায় মবঙ্গা বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। কিন্তু কোথাও না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। আজ সকালে খাঁচাটা গাঁয়ে গেলে তার মধ্যে একটা সিংহের সঙ্গে কেগার বিকৃত মৃতদেহটা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। এবার তারা উৎসবের জন্য তৈরী হতে লাগল। খাঁচাটার কাছে থেকে দুজন যোদ্ধা পাহারা দিতে লাগল।
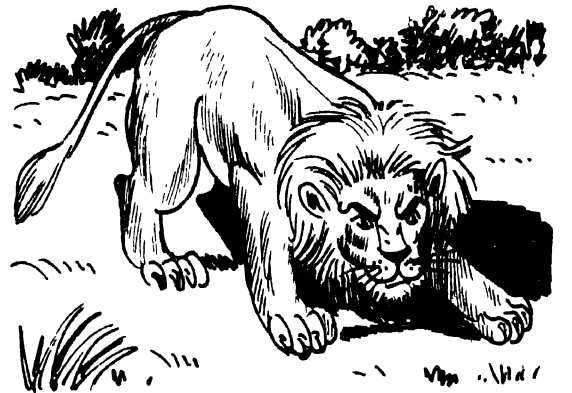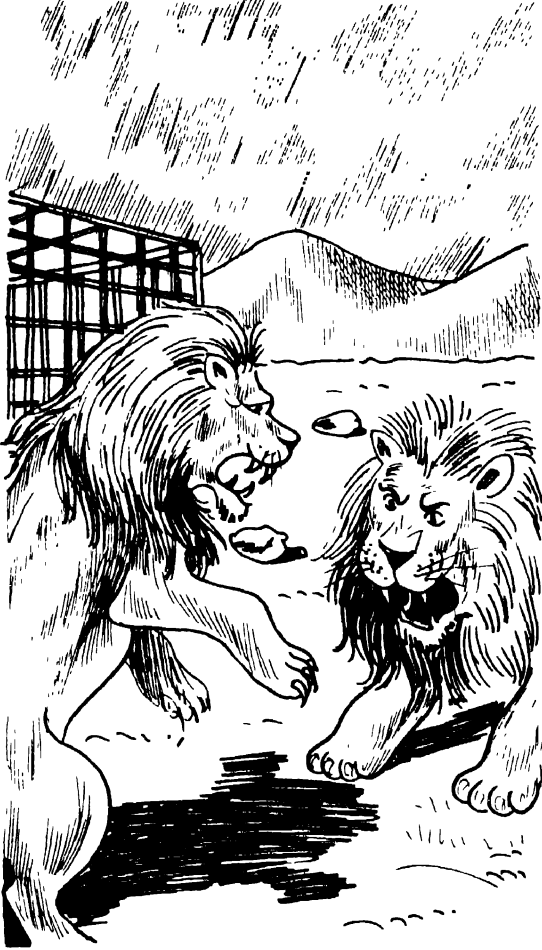
টারজন তখন মনে মনে সিংহটাকে খাঁচা থেকে মুক্ত করার এক ফন্দী আঁটতে লাগল। ও জানে সন্ধ্যে হলেই ওরা সিংহটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারবে। ও ঠিক করল সন্ধ্যে হলেই ও সিংহের চামড়াটা গায়ে পরে সিংহ সেজে ওদের সামনে গিয়ে হাজির হয়ে খাঁচাটা খুলে দেবে।

অন্ধকার হয়ে উঠতেই টারজন সিংহের চামড়া পরে সিংহ সেজে খাঁচাটার কাছে চলে গেল। সিংহের ছদ্মবেশে টারজন সিংহের মত গর্জন করতে করতে খাঁচার কাছে চলে গেল। অন্ধকারে একটা সিংহ দেখে উৎসব ছেড়ে সবাই ছোটাছুটি করতে লাগল। খাঁচার সামনে টারজন মানুষের মত দাঁড়িয়ে খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়েই গাছে উঠে পড়ল।

মেয়েরা লক্ষ্য করল বনদেবতা টারজনই সিংহের বেশ ধরে এসে খাঁচা খুলে দেয়। তারা সে কথা যোদ্ধাদের বলতেই তারা টারজনের খোঁজ করতে থাকে। কিন্তু ততক্ষণে খাঁচা থেকে আসল সিংহটা বেরিয়ে গাঁয়ের মধ্যে ছোটাছুটি করে যাকে তাকে আক্রমণ করতে লাগল। যোদ্ধারা হঠাৎ আসল সিংহের গর্জন শুনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ভয়ে তারা ঠিকমত বর্শা চালাতে পারল না। দশ বারোজন লোককে মেরে ফেলল সিংহটা। এদিকে টারজন তখন গাঁ থেকে অনেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছে।

সেদিন রাত্রিতে একটা গাছের উপর শুয়ে আকাশে চাঁদের পানে তাকিয়েছিল টারজন। হঠাৎ কাদের ভয়ার্ত চীৎকার শুনে উঠে বসল টারজন। দেখল অদূরে ছয়জন নিগ্রো আগুন জ্বালিয়ে বসে আছে আর একটা সিংহী তাদের কাছে গিয়ে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হয়ে উঠেছে। মাত্র একজন বাদে সব নিগ্রোগুলো ভয় পেয়ে কাছাকাছি গাছের উপর উঠে পড়ল। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র একজন নিগ্রো জ্বলন্ত আগুন থেকে একটা কাঠ নিয়ে সিংহটার দিকে ছুঁড়ে মারতেই সিংহটা তার সাথীকে নিয়ে পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার এল সিংহটা। কিন্তু

এবার নিগ্রোটা জ্বলন্ত কাঠটা এমনভাবে সিংহের মুখে ছুঁড়ে দিল যে সে সিংহটা আর ফিরে এল না।

গোটা ঘটনাটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখল টারজন। তার কাছে আর একটা ডালে টগ শুয়েছিল। টারজন টগকে জাগিয়ে বলল, ঐ যে গোরো দেখছ না, তার মাঝে কালো দাগ রয়েছে। আসলে ঐ দাগগুলো নুমা বা সিংহের চোখ। নুমা গোরোর দিকে তাকিয়ে আছে। গোরোর চারপাশে আগুন জ্বলছে, ঐ আগুনটা নিবে গেলেই নুমা গোরোকে খাবে।

কথাটা পরে টগ তাদের দলের সবচেয়ে বুড়ো ও বুড়ী গাণ্টো আর মুমগাকে বলল। তারা দুজনেই বলল, নুমা নয়, টারজনই একদিন গোরোকে খাবে। সে আমাদের মত বাঁদর নয়, মানুষ। সে সিংহ মেরে আমাদের খাওয়াবার জন্য নিয়ে আসে। সে তেমনি সিংহকে গোরোর কাছে এনেছে। ঐ সিংহই গোরোকে খাবে। টারজনকে বধ করা উচিত। আমরা ওকে বধ করব।

টিকা আর টগ দুজনেই ছিল টারজনের পক্ষে। টগ বলল, টারজন আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। প্রথম প্রথম আমি তাকে সন্দেহ করতাম। ভাবতাম সে টিকাকে কেড়ে নিতে চায় আমার কাছ থেকে। কিন্তু পরে দেখলাম আমার সন্দেহ ভুল। টারজনের মত এমন বন্ধু আমি পাব না।

তবু অন্য সব বাঁদর-গোরিলারা টারজনকে হত্যা করার এক ষড়যন্ত্র করতে লাগল। গাণ্টো এই ষড়যন্ত্রকে জোরালো করে তুলতে চাইল। টারজন কিন্তু কিছুই জানত না এই ষড়যন্ত্রের।

সেদিন টারজন তার পশু বন্ধু ট্যাণ্টরের চওড়া পিঠের উপর পা ছড়িয়ে শুয়েছিল। হঠাৎ তার কি মনে হলো সে শুয়ে শুয়েই হাতিটাকে বলল, ট্যাণ্টর, তুমি কার্চাকের সেই বাঁদর-গোরিলাদের কাছে আমাকে নিয়ে চল।

দলের কাছাকাছি গিয়ে একটা গোলমালের শব্দ শুনতে পেল টারজন। সে হাতির পিঠ থেকে গাছে চড়ে ডালে ডালে চলে গেল ঘটনাস্থলে। গিয়ে দেখল, একটা নিগ্রো যোদ্ধাকে ঘিরে বাঁদর-গোরিলারা উত্তেজিতভাবে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। টারজন ভিড় ঠেলে ভিতরে যেতেই একজন গোরিলা বলল, এ গোমাঙ্গানীটা আমাদের দলের মধ্যে এসে পড়েছে।

টারজন বুঝল সেদিন রাতে এই নিগ্রোটাই একা জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে সিংহগুলোকে তাড়ায়। এ অত্যন্ত সাহসী। সে দলের বাঁদর-গোরিলাদের বলল, একে ছেড়ে দাও। এ খুব সাহসী বীর। এ আমাদের কোন ক্ষতি করেনি।
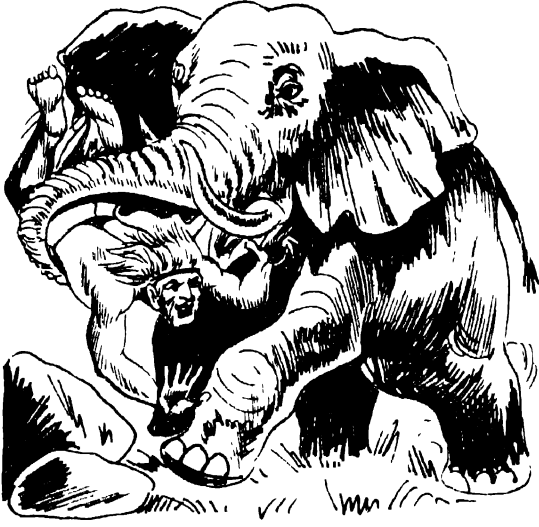
কিন্তু গান্টো ও দলের সবাই বলল, না, গোমাঙ্গানীরা আমাদের শত্রু। ওকে ছাড়া হবে না। ওর সঙ্গে টারমাঙ্গানী টারজনকেও মারা হবে।

এই বলে ওরা টারজনকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হলো। নিগ্রো যোদ্ধাটি মবঙ্গার দলের একজন যোদ্ধা। সে বনদেবতা টারজনের নামে অনেককিছু শুনেছিল। আজ টারজনকে এত কাছ থেকে এই প্রথম দেখল। সে দেখল টারজন যেই হোক, সত্যিই খুব ভাল। সে তার ভাষা বুঝতে না পারলেও বুঝতে পারল সে তাকে বাঁচাবার জন্য লড়াই করতে যাচ্ছে। তাই সেও বর্শা হাতে টারজনের সাহায্যে এগিয়ে গেল।

একমাত্র টগ ছাড়া সব পুরুষ বাঁদর-গোরিলাগুলো টারজনকে মারার জন্য উদ্যত হলো। টারজন, টগ, আর সেই নিগ্রো যোদ্ধাটি তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। টারজন জোরে একটা শব্দ করল।

এমন সময় গোলমাল শুনে টারজনের হাতিবন্ধু গাছপালা ভেঙ্গে ছুটে এল। হাতিটা ক্ষিপ্রগতিতে আসতেই সব বাঁদর-গোরিলারা ছুটে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল। টারজন হাতিটাকে বলল, আমাকে তোমার পিঠের উপর চাপিয়ে সমুদ্রের ধারে আমার কেবিনটায় নিয়ে চল।

হাতিটা শুঁড় দিয়ে টারজনকে তার পিঠে চাপালে টারজন বাঁদর-গোরিলাদের বলল, একমাত্র টগ আর টিকা ছাড়া তোমরা কেউ আমার কাছে যাবে না কখনো। আমি তোমাদের দল ছেড়ে চলে যাচ্ছি চিরদিনের মত।

দুর্দমনীয় টারজন

টারজন দি আন্‌টেম্‌ড্‌

হাউট্‌ম্যান ফ্রিজ স্নাইডার ক্লান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে অন্ধকার অরণ্যের গা ঘেঁসে। লেফ্‌টেন্যান্ট হাঁটছে তার পাশাপাশি, আর আণ্ডার লেফ্‌টেন্যান্ট ভন গস জনকয়েকমাত্র আস্কারিকে সঙ্গে নিয়ে ক্লান্ত তল্পিবাহকদের পিছন পিছন হাঁটছে।

হাউট্‌ম্যানের সামনে দলের অর্ধেক লোক, আর বাকি অর্ধেক তার পিছনে—এই ভাবেই অসভ্য মানুষদের বাসভূমি এই জঙ্গলে জার্মান ক্যাপ্টেনটি তার বিপদকে যথাসম্ভব কমিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু গাইড হু'জন পুরো দলটাকে ভুল পথে নিয়ে চলেছে। আফ্রিকার অধিকাংশ গাইডরা তাই করে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই অপ্রত্যাশিতভাবে একটি দৃশ্য তাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল। খুশির হাসি হেসে ফিল্ড-গ্লাসটা চোখে লাগিয়ে সে দূরে তাকাল। বলল, আমাদের কপাল ভাল। দেখতে পাচ্ছ?

লেফ্‌টেন্যান্টও তার গ্লাস চোখে লাগিয়ে বলল, হ্যাঁ, একটা ইংরেজ গোলাবাড়ি। ওটা নিশ্চয় গ্রেস্টোকের গোলাবাড়ি, কারণ বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকার এই অঞ্চলে আর কোন গোলাবাড়ি নেই।

খুশি মনেই সকলে এগিয়ে চলল লর্ড গ্রেস্টোক জন ক্লেটনের ছিমছাম গোলাবাড়িটা লক্ষ্য করে। কিন্তু হায় কপাল! টারজন বা তার ছেলে কেউ বাড়িতে নেই।

বৃটেন ও জার্মানির যুদ্ধের কোন খবরই লেডী জেন রাখে না। কাজেই সে অফিসারদের সাদরে গ্রহণ করল।

সুদূর পূর্বাঞ্চলে অরণ্যরাজ টারজন দ্রুতপায়ে নাইরোবি থেকে ফিরছে তার গোলাবাড়ির দিকে। নাইরোবিতেই সে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার খবর পেয়েছে। জার্মানরা যে কোন সময় বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকা আক্রমণ করতে পারে এই আশংকা করে স্ত্রীকে কোন নিরাপদ অঞ্চলে সরিয়ে নিতেই সে বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে। সঙ্গে জনবিশেক কালো যোদ্ধা।
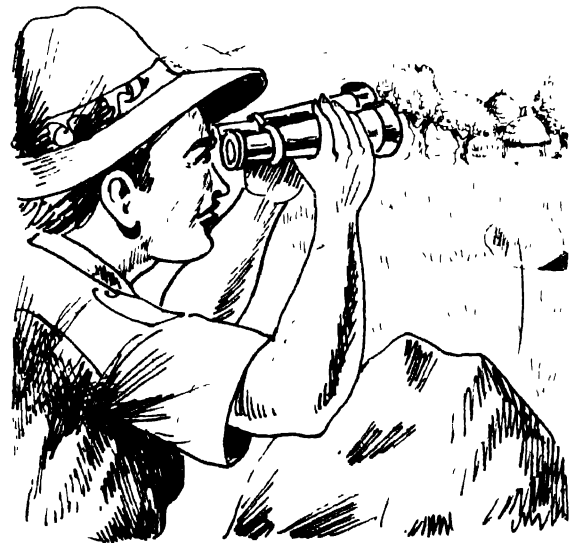
দূর থেকে গোলাবাড়ির উপর নজর পড়তেই টারজনের চোখ ছুটি কুঁচকে গেল। গোলাটার চিহ্ন-মাত্র নেই; সেখান থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠছে।

বাড়িতে ঢুকেই টারজন আতংকে শিউরে উঠল। শোবার ঘরের দেওয়ালে ক্রুশবিদ্ধ করে মারা হয়েছে প্রভুভক্ত মুভিরোর দৈত্যসদৃশ পুত্র ওয়াসিম্বুকে। এক বছরের বেশী কাল ধরে সে ছিল লেডী জেনের দেহরক্ষী।

ঘরের আসবাবপত্র ইতস্তত ছড়ানো। মেঝেতে চাপ চাপ জমাট রক্ত। সব কিছুতেই এক ভয়ংকর যুদ্ধের স্বাক্ষর।

ঘরের দরজা বন্ধ। নতমুখে বিবর্ণ চোখে টারজন নীরবে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ঘরের এক পাশে ছোট কোচটায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটি নিষ্প্রাণ দেহ। দেহটা এমনভাবে পুড়ে গেছে যে টারজন তাকে চিনতে পারল না। মৃতদেহকে উল্টে ধরতেই মৃত্যুর সেই ভয়ংকর রূপ দেখে শোকে, আতংকে ও ঘৃণায় সে আর্তনাদ করে উঠল।

টারজনের বুকের মধ্যে বোবা জানোয়ারের অসহ্য যন্ত্রণা। তার মস্তিষ্ক জুড়ে শুধু একটিই অব্যক্ত বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল: সে নেই। সে নেই। সে নেই!

টারজন পথে নামল।

দু'দিন পরে কিলিমাঞ্জারোর দক্ষিণ সানুদেশ থেকে বহুদূর পূবে কামানের শব্দ শুনতে পেল। বুঝতে পারল, সেখানে জার্মানদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বেঁধেছে। সারাদিন ভেসে এল গুলি-গোলার শব্দ। টারজন লক্ষ্য করল, গুলি-গোলা সবচাইতে বেশী চলে ভোরে আর সন্ধ্যার দিকে; রাতে প্রায় থাকেই না সে শব্দ।

সন্ধ্যা নাগাদ সে পৌঁছে গেল পর্বতমালার সানুদেশে একটা বড় গুপ্ত ঘাঁটিতে। সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকিয়ে একটা তাঁবুর কাছে পৌঁছতে টারজনের কানে এল একজন বলছে: ওয়াজিরিরা দানোর মতই লড়াই করল; কিন্তু আমাদের বাঘা-বাঘা যোদ্ধারা তাদের একেবারে কচুকাটা করে ফেলল। শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন এসে মেয়েটাকে খতম করল।

টারজন তখন শিকারী জানোয়ারের মত ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল তাঁবুটার আরও কাছে। কথা শেষ করে সৈনিকটা উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে কি যেন বলে শিবিরের পিছন দিকে এগিয়ে চলল। শিকারী চিতার মত টারজন নিঃশব্দে একটা ঝোপের ছায়ায় পৌঁছেই সে লাফিয়ে পড়ল লোকটার ঘাড়ে।

তারপর টানতে টানতে তাকে একটা ঝোপের মধ্যে নিয়ে গিয়ে টারজন ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, যে অফিসার বাংলোতে মেয়েটিকে খুন করেছে তার নাম কি?

লোকটি মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করে জবাব দিল, হাউট্‌ম্যান স্নাইডার।

সে কোথায়?

এখানেই আছে। হয়তো হেডকোয়ার্টারে গেছে।

টারজন আদেশ করল, আমাকে সেখানে নিয়ে চল।

ঝোপের আড়ালে বেশ কিছুটা এগিয়ে দূরে একটা দো-তলা বাড়ি দেখিয়ে লোকটি বলল, ওটাই হেডকোয়ার্টার।

টারজন বলল, ওয়াজিরি ওয়াসিম্বুকে ক্রুশাবদ্ধ করার কাজে কে হুকুম দিয়েছিল?

আণ্ডার লেফ্‌টেন্যাণ্ট ভন গস! সেও এখানে আছে।

টারজন দৃঢ়কণ্ঠে বলল, তাকে আমি খুঁজে পাবই।

আর একটি কথাও না বলে টারজন আবার তার গলা ধরে টেনে তুলল। দুই হাতে তাকে মাথার উপরে তুলে ধরে এক, দুই, তিন পাক ঘুরিয়ে সবেগে তাকে ছুঁড়ে দিল। তারপর এগিয়ে গেল জেনারেল ক্রাউটের হেডকোয়ার্টারের দিকে।

জানালা দিয়ে টারজনের চোখে পড়ল, সামনে একটা বড় ঘর—সেখানে বেশ কয়েকজন অফিসারের জটলা; পিছনের ছোট ঘরটায় টেবিলের পিছনে বসে আছে একটি লাল-মুখো লোক। একজন এড্‌-ডি ঘরে ঢুকে স্যালুট করে জানাল, ফ্রলিন কিব্‌চার এসে গেছে স্যার।

ভিতরে আসতে বল, জেনারেল হুকুম করল।

ফ্রলিন ঘরে ঢুকল। মেয়েটি খুব সুন্দরী। উনিশের বেশী বয়স হবে না।

জেনারেলের টেবিলের কাছে গিয়ে কোটের ভিতরের পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা কাগজ বের করে তার হাতে দিল।

জেনারেল বলল, বস ফ্রলিন। একজন অফিসার একটা চেয়ার এনে দিল। জেনারেল কাগজটা খুলে পড়তে লাগল।

ঘরের সবগুলো লোকের উপর চোখ বুলিয়ে নিল টারজন। দুই ক্যাপ্টেনের একজন তো হাউটম্যান স্নাইডার হতে পারে। মেয়েটি নিশ্চয় গোয়েন্দা বিভাগের লোক—গুপ্তচর।

জেনারেল মুখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, খুব ভাল। এড্-ডিকে বলল, মেজর স্নাইডারকে ডেকে পাঠাও।

এড্-ডি ফিরে এল। সঙ্গে মাঝারি আকারের একজন অফিসার। জেনারেল ঘাড় কাত করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, ফ্রলিন কিরচার, ইনি মেজর স্নাইডার—"

বাকিটা শোনার ধৈর্য হল না। জানালার গোবরাটে একটা হাত রেখে একলাফে টারজন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কাইজারের অফিসাররা তো হতভম্ব। আর একলাফে টেবিলের কাছে পৌঁছে এক ঘুষিতে টারজন টেবিল-ল্যাম্পটাকে ছিটকে ফেলে দিল জেনারেলের মোটা ভুঁড়ির উপর। দুই এড্-ডি ধেয়ে গেল টারজনের দিকে। সেও পাল্টা একজনকে তুলে ধরে ছুঁড়ে দিল অপর এড্-ডির মুখের উপর। মেয়েটি চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্য অফিসাররা সাহায্যের জন্য চেঁচামেচি শুরু করে দিল। মুহূর্তের মধ্যে মেজর স্নাইডারকে ধরে মাথার উপর তুলে এত দ্রুত জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল যে উপস্থিত কেউ ব্যাপারটা বুঝতেই পারল না।

অসীম ধৈর্যের সঙ্গে টারজন জার্মানদের শেষ ঘাঁটিটা পার হয়ে গেল। বন্দীকে আগে আগে হাঁটতে বাধ্য করে সে তাকে ঠেলে নিয়ে চলল পশ্চিম দিকে।

বর্শার খোঁচায় খোঁচায় স্নাইডারের দেহ রক্তাক্ত হল। দীর্ঘ রাত এইভাবে কেটে গেল।

তৃতীয় দিন ছুপুরে পাহাড় বেয়ে কিছুটা হেঁটে চড়ায় উঠে একটা খাড়া খাদের সামনে ছু'জন থামল। স্নাইডার নীচে তাকিয়ে দেখল, সংকীর্ণ খাদের অনেক নীচে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে একটিমাত্র গাছ।

টারজন বলল, আমিই লর্ড গ্রেস্টোক। ওয়াজিরিদের দেশে আমার স্ত্রীকে তুমিই খুন করেছ। এবার বুঝতে পারছ কেন আমি তোমার খোঁজে এসেছি। নেমে যাও!

জার্মানটি নতজানু হয়ে বলে উঠল, তোমার স্ত্রীকে আমি খুন করিনি। দয়া কর। এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না—

নেমে যাও! টারজন বর্শা উঁচিয়ে হুকুম করল। স্নাইডার একটু একটু করে নামতে লাগল। পিছনে টারজন। এক ঠেলায় স্নাইডারকে নীচে ফেলে দিয়ে বলল, এবার ছুট লাগাও।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জার্মানটি গাছ লক্ষ্য করে ছুটল। প্রায় গাছটার কাছে পৌঁছে গেছে এমন সময় ভয়ঙ্কর গর্জন করে ক্ষুধার্ত সিংহটা খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

চূড়ায় উঠে টারজন একবার নীচে তাকাল। জার্মানটি আপ্রাণ চেষ্টায় গাছের একটা ডালকে আঁকড়ে ধরে আছে। তার নীচে নুমা অপেক্ষমান।

টারজন সূর্য কুড়ুর দিকে মুখ তুলল। তার প্রশস্ত বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা বন্য গোরিলার বিজয়-হুংকার।

রাতের অন্ধকারে ছুই বিবদমান পক্ষকেই পাশ কাটিয়ে টারজন হাজির হল অনেক দূরে বৃটিশ শিবিরে। কেউ তাকে দেখতে পেল না। তার উপস্থিতিটাও টের পেল না।

শত্রুপক্ষের দৃষ্টির আড়ালে সুবিধাজনক দূরত্বে গড়ে উঠেছে দ্বিতীয় রোডেশীয় বাহিনীর হেড-কোয়ার্টার। একটা ফিল্ড-টেবিলের সামনে বসে আছে কর্নেল ক্যাপেল। সঙ্গে কয়েকজন অফিসার। মাথার উপর একটা বড গাছ। টেবিলের উপর একটা লণ্ঠন জ্বলছে।

গাছের ডালে খস্-খস্ আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামনে নেমে এল একটা কঠিন বাদামী দেহ। সকলেরই হাত পড়ল পিস্তলের উপর। তারা বিস্মিত। কে এই প্রায় নগ্নদেহ শ্বেতকায় মানুষটি!

একজন অফিসার বলল, কে হে তুমি মহাশয়?

অরণ্যরাজ টারজন, নবাগত জবাব দিল।

ও হো, গ্রেস্টোক! বলে মেজর সাহেব হাতটা বাড়িয়ে দিল।

টারজন হেসে কর্নেলের দিকে ফিরে বলল, তোমাদের আলোচনা কিছুটা শুনেছি। জার্মান শিবিরের পিছন থেকেই আমি আসছি। হয়তো তোমাদের কিছুটা সাহায্য করতে পারব।"

কর্নেল প্রশ্ন করল, তুমি তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছ?

টারজন জবাব দিল, নিয়মিতভাবে নয়। আমি লড়ব আমার নিজের মত করে। সংক্ষেপে নিজের সব কথাই সে খুলে বলল।

একটু চুপ করে থেকে ক্যাপেল শুধাল, তুমি কার সঙ্গে এসেছ?

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে টারজন বলল, আমি একাই এসেছি। আচ্ছা, এখনকার মত চলি। দ্বিতীয় রাতে আবার দেখা হবে।

টারজন মুচকি হেসে পা চালিয়ে দিল। কিছুদূর এগোতেই অফিসারের ভারী ওভারকোটে গা ঢেকে একটি ছোটখাট লোককে পাশ দিয়ে যেতে দেখল। কোটের কলার তোলা, আর সামরিক টুপিটা চোখ পর্যন্ত টেনে নামানো। কিন্তু টারজনের মনে হল, মুখটা তার চেনা। হয়তো লণ্ডনে পরিচিত কোন অফিসার। টারজন এগিয়ে গেল।

পূর্ব আফ্রিকার ছোট বৃটিশ বাহিনীটি প্রাথমিক বিপর্যয়ের পরে এখন ধীরে ধীরে পায়ের নীচে মাটি ফিরে পাচ্ছে। জার্মাণ আক্রমণে ভাটা পড়েছে; হুনরা ক্রমেই পিছু হটে যাচ্ছে রেলপথ বরাবর টাঙ্গার দিকে।

প্রচণ্ড মার খাবার পরে জার্মানরা বাঁ দিককার ট্রেঞ্চগুলি ছেড়ে চলে গেছে, আর দ্বিতীয় রোডেশীয় রেজিমেণ্ট সেগুলি দখল করে নিয়েছে।

তারপর বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে। আণ্ডার লেফ্‌টেন্যাণ্ট ভন গসের মৃত্যু হয়েছে টারজনের হাতে। তারপর থেকে টারজনের আর কোন হদিসই নেই। অনেকেই মনে করছে জার্মানদের হাতে তার মৃত্যু ঘটেছে।

কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটে নি। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি জার্মান গুপ্তচরকে জীবিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করে সে বৃটিশদের হাতে তুলে দিতে চায়। গুপ্তচর মেয়েটিকে সে প্রথম দেখেছে জার্মান জেনারেলের হেডকোয়ার্টারে। তারপর দেখেছে বৃটিশ শিবিরে একজন বৃটিশ অফিসারের ছদ্মবেশে। তার সন্ধানেই টারজন বার বার হানা দিয়েছে জার্মান হেডকোয়ার্টারে।

একদিন রাতে দেখা গেল সে ছুটে চলেছে ছোট্ট শৈলশহর উইলহেলমস্টলের দিকে—জার্মান পূর্ব আফ্রিকা সরকারের সেটাই গ্রীষ্মাবাস।

ফ্রলিন বার্থা কিব্‌চার পথ হারিয়ে ফেলেছে। বিনা দানা-পানিতে তার ঘোড়াটা সারাদিন পথ চলেছে। রাত নেমে আসছে। কোনমতে কিছু শুকনো কাঠ-খড় যোগাড় করে একটা ধুনি জ্বালাল। পাশেই বড় বড় ঘাসে ঢাকা খানিকটা জমি দেখতে পেয়ে সেখানে ঘোড়াটাকে ঘাস খেতে দিল। আর নিজে একটা বিছানার মত তৈরী করে ধুনির পাশে শুয়ে পড়ল।

সেই রাতেই অরণ্যরাজ টারজনের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। টারজনই তাকে রক্ষা করল সিংহ নুমার হাত থেকে।

একটু সুস্থ বোধ করে সে বলল, মৃত্যুর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। এখন ভাল বোধ করছি। তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব।

মেয়েটির একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এতক্ষণে সে তাকে ভালভাবে দেখার সুযোগ পেল। মেয়েটি খুব সুন্দরী—। কিন্তু তাতে টারজনের মন গলল না। সে যে একজন জার্মান—জার্মান গুপ্তচর।

হঠাৎ টারজনের চোখ পড়ল মেয়েটির খোলা বুকের উপর। বিস্ময়ে ও ক্রোধে সে আঁতকে উঠল। মেয়েটির সাদা বুকের উপর ঝুলছে একটা হীরকখচিত সোনার লকেট—যে লকেট তার প্রথম প্রণয়-উপহার—যা তার সঙ্গিনীর বুক থেকে চুরি করেছিল হুন স্নাইডার। মেয়েটির হাত চেপে ধরে হারটা ছিনিয়ে নিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, এটা তুমি কোথায় পেয়েছ?

তা দিয়ে তোমার কি দরকার ?

এটা আমার। বল কে তোমাকে এটা দিয়েছে, নইলে আবার তোমাকে নুমার মুখে ছুঁড়ে দেব। তুমি তো গুপ্তচর, আর গুপ্তচরের শাস্তি মৃত্যু।

মেয়েটি জবাব দিল, আমাকে ওটা দিয়েছে হাউট্‌ম্যান ফ্রিজ স্নাইডার।

টারজন গম্ভীর গলায় বলল, বুঝলাম। এবার হেডকোয়ার্টারে চল।

ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এক সময় কির্‌চার বলল, তুমি কি করে বুঝলে যে আমি গুপ্তচর ?

টারজন বলল, তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম জার্মান হেডকোয়ার্টারে, তারপর বৃটিশ শিবিরে।

বার্থা কির্‌চার পকেটের পিস্তলটা স্পর্শ করল। কোন মতেই সে বৃটিশ শিবিরে ফিরে যাবে না। তার জন্য দরকার হলে পিস্তলের আশ্রয়ই নেবে। পর-মুহূর্তেই এক অন্ধ আবেগে পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে তার কুঁদো দিয়ে সজোরে আঘাত হানল টারজনের মাথায়। টারজনের দেহটা ছিন্নমুণ্ড ষাঁড়ের মত সেখানেই লুটিয়ে পড়ল।

টারজন ধীরে ধীরে চোখ মেলল। জঙ্গলের মধ্যে একটা সরু পথের উপর সে পড়ে আছে। ক্রমে সব কথাই মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল তার চোখে। উইল্‌হেল্‌ম্‌স্টলে পৌঁছবার আগেই তাকে ধরতে হবে।

টারজন উঠে দাঁড়াল। বার্থা কির্‌চারের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে হাঁটতে শুরু করল।

টারজন যখন ছোট পার্বত্য শহর উইল্‌হেল্‌ম্‌স্টলে পৌঁছল তখন রাত হয়েছে। সৈনিকরা চলাফেরা করছে। শহরটি সুরক্ষিত।

অতর্কিতে একটি জার্মান অফিসারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে গলা টিপে তাকে মেরে ফেলল। তারপর তাড়াতাড়ি তার পোশাকটা পরে নিজের ভোল পাল্টে নিল। এবার হোটেলটা খুঁজে বের করতে হবে। তার অনুমান মেয়েটিকে সেখানেই পাওয়া যাবে। তার সঙ্গেই পাওয়া যাবে হাউট্‌ম্যান ফ্রিজ স্নাইডারকে। আর সেখানেই পাবে তার মূল্যবান লকেটটা।

অনেক খুঁজে হোটেলটা পাওয়া গেল। একটা নীচু দোতলা বাড়ি। উপরে-নীচে আলো জ্বলছে।

অনেক অফিসারের মেলা। লাফ দিয়ে সে উঠে গেল বারান্দার ছাদে। কোণের একটা ঘরের শার্সি নামানো। ভিতরে আলো জ্বলছে। কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। টারজন দরজায় কান পাতল।

প্রথমে শুনতে পেল একটি নারী-কণ্ঠ: আমার অভিজ্ঞান হিসাবে লকেটটা আমি নিয়ে এসেছি। জেনারেল ক্রাউটের সঙ্গে তোমার তো সেই রকমই কথা হয়েছিল। এবার কাগজপত্রগুলো আমাকে দিয়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি।

পুরুষটি নীচু গলায় কি বলল টারজন তা ধরতে পারল না। আবার নারীকণ্ঠ—তাতে ঘৃণা ও ভয়ের আভাষ।

এত স্পর্ধা ভাল নয় হাউট্‌ম্যান স্নাইডার। আমাকে স্পর্শ করো না। হাত সরিয়ে নাও।

এবার অরণ্যরাজ টারজন দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। দরজা খোলা ও বন্ধ হবার শব্দ শুনে স্নাইডার ঘুরে দাঁড়াল।

এভাবে এ ঘরে ঢোকার অর্থ কি লেফ্‌টেন্যান্ট? এখনই ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।

টারজন দৃঢ়কণ্ঠে শুধাল, তুমিই হাউট্‌ম্যান স্নাইডার?

তাতে তোমার কি? জেনারেল গর্জে উঠল।

আমি অরণ্যরাজ টারজন। এবার বুঝতে পারছ কেন আমি এঘরে ঢুকেছি।

কোটটাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টারজন ট্রাউজারটাও খুলে ফেলল। এখন তার পরিধানে একটিমাত্র কটি-বস্ত্র। এবার মেয়েটি তাকে চিনতে পারল।

টারজন চীৎকার করে বলল, পিস্তলে হাত দিও না। মেয়েটির হাত সোজা নেমে গেল।

এবার এদিকে এস।

মেয়েটি এগিয়ে গেল। টারজন তার অস্ত্রটা তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

স্নাইডার ভয়ে-ভয়ে বলল, আমার কাছে কি চাও তুমি?

টারজন বলল, ওয়াজিরিদের দেশে একটা ছোট বাংলোতে যে অপকর্ম তুমি করে এসেছ তারই দামটা মিটিয়ে নিতে চাই।

একলাফে এগিয়ে টারজন লোকটির গলা টিপে ধরে শিকারী-ছুরিটা টেনে বের করল। সেটাকে আমূল বসিয়ে দিল স্নাইডারের তলপেটে। ভয়ংকর গলায় হিস্‌হিসিয়ে বলল, এইভাব তুমি হত্যা করেছিলে আমার সঙ্গিনীকে। এইভাবেই তুমিও মরবে।

মেয়েটির দিকে মুখ ফিরিয়ে হাতটা বাড়িয়ে টারজন বলল, আমার লকেটটা দাও।

মৃত অফিসারকে দেখিয়ে মেয়েটি বলল, ওর কাছে আছে। লকেটটা খুঁজে পেয়ে টারজন বলল, এবার কাগজপত্রগুলো দিয়ে দাও।

বিনা বাক্যব্যয়ে মেয়েটি ভাঁজ-করা দলিলগুলো টারজনের হাতে তুলে দিল।

জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে শার্সিটা তুলে মুহূর্তের মধ্যে টারজন বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ফ্রলিন বার্থা কির্‌চার অতি দ্রুত মেঝের উপর পড়ে-থাকা মৃতদেহটার কাছে গিয়ে তার জামার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটা ছোট কাগজের বাণ্ডিল বের করে নিজের কোমরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। তারপর জানালার কাছে গিয়ে সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে লাগল।

রয়্যাল এয়ার সার্ভিসের লেফ্‌টেন্যান্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইক অনুসন্ধানে বেরিয়েছে। জার্মান পূর্ব আফ্রিকার বৃটিশ হেডকোয়াটারে একটা খবর এসেছে—বরং বলা যায় যে একটা গুজব ছড়িয়েছে—যে শত্রুপক্ষ সসৈন্যে এসে পশ্চিম উপকূলে নেমেছে এবং ঔপনিবেশিক বাহিনীকে জোরদার করতে অন্ধকার মহাদেশের ভিতরেও ঢুকে পড়েছে। এমন কি তারা দশ বারো দিনের মত এগিয়েও গেছে।

তাই লেফ্‌টেন্যান্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইক বিমানপথে পশ্চিম দিকেই চলেছে—কোন হুন বাহিনী সেদিকে এসেছে কি না সে দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। নীচে দূর বিস্তার ঘন অরণ্য। পাহাড়, উপত্যকা, মরুভূমি—সব মিলিয়ে চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিন্তু জনমানুষের চিহ্নমাত্র নেই।
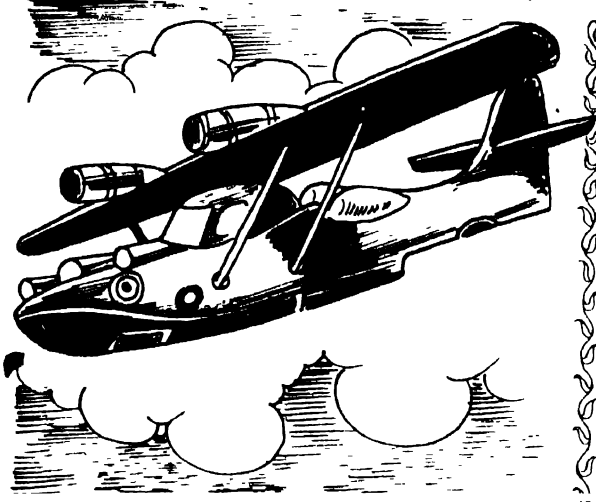
উড়ে চলতে চলতে বিকেল হয়ে এল। গাছপালার ভিতর দিয়ে একটা নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথ চোখে পড়ায় সেখানেই রাতের মত তাঁবু খাটাবার সিদ্ধান্ত নিল। আর তখনই ইঞ্জিনটা থেমে গেল। কাজেই কাছের একটা খোলা মাঠের মধ্যে নেমে মোটরটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে গুন গুন করে একটা গানের সুর ভাঁজতে লাগল। পাশের জঙ্গলেই যে কোন বিপদ ওঁৎ পেতে থাকতে পারে তা সে ভাবতেও পারে নি। বিশ জোড়া বর্বর চোখের দৃষ্টি যে আড়ালে থেকে তার উপর নজর রেখেছে তা সে বুঝবে কেমন করে। ঠিক সেই মুহূর্তে ওয়ামাবো-সর্দার মুমাবো সঙ্গীদের নিয়ে হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে তার দিকে ধেয়ে এল।

অসভ্য লোকগুলি চারদিক থেকে তাকে ঘিরে বর্শাগুলিকে ঘুরিয়ে ধরে হাতল দিয়ে তাকে সমানে পেটাতে শুরু করল। আঘাতে-আঘাতে জর্জরিত হয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল। সকলে তাকে ধরাধরি করে তুলে দুই হাত পিছ-মোড়া করে বেঁধে ঠেলতে ঠেলতে জঙ্গলের দিকে নিয়ে চলল। অসহায় স্মিথ-ওল্ডউইক বুঝতে পারল কোন অসভ্য রাজশক্তির খেয়ালখুশির উপরেই নির্ভর করছে তার জীবন-মরণ।

জঙ্গল পার হয়ে একটা খোলা জায়গায় পৌঁছে সে দেখতে পেল, দূরে একটা কুটিরের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে একদল নিগ্রো। তাদের পরনে জোড়াতালি দেওয়া জার্মান ইউনিফর্ম। তাদের মধ্যে একটি গাট্টাগোট্টা লোকের গায়ে ছিল সার্জেন্টের পোশাক। বৃটিশ অফিসারটির উপর চোখ পড়তেই সে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল। অন্য সকলের কণ্ঠে উঠল তার প্রতিধ্বনি।

কালা সার্জেন্ট উসাঙ্গা সর্দার মুমাবোকে জিজ্ঞাসা করল, এই ইংরেজকে কোথায় পেলে? তার সঙ্গে কি আরও অনেকে আছে?

সর্দার বলল, ও তো আকাশ থেকে নেমেছে এমন একটা আজব বস্তুতে চড়ে যা পাখির মত আকাশে ওড়ে। তা দেখে প্রথমে আমরা ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। পরে যখন বুঝলাম ওটা কোন জীবিত প্রাণী নয়, তখন সাহস করে এগিয়ে গেলাম, আর এই লোকটাকে ধরে ফেললাম।

উসাঙ্গা চোখ বড় বড় করে শুধাল, ও কি মেঘের ভিতর দিয়ে উড়ে এসেছিল?

উমাবো বলল, হ্যাঁ। বস্তুটা দেখতে পাখির মত। এখনও জঙ্গলের ওপারেই পড়ে আছে, অবশ্য যদি এর মধ্যে উড়ে গিয়ে না থাকে।

উসাঙ্গা বলল, সে ভয় নেই; এই লোকটা না চালালে সেটা উড়তে পারবে না। ওকে ধরে এনে খুব ভাল করেছ। এই ইংরেজগুলো খুব খারাপ সাদা আদমি।

তখন উমাবো ইংরেজ অফিসারটিকে ঠেলতে ঠেলতে গ্রামের একটা কুটিরে ঢুকিয়ে দিয়ে দুজন সাহসী যোদ্ধাকে পাহারায় রেখে দিল।

জঙ্গলের ফাঁক-ফোকর সম্পর্কে অরণ্যরাজ টারজনের জ্ঞান প্রায় অলৌকিকতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তবু তার সব বিচার-বিবেচনা নির্ভুল হতে পারে না। গাছের বেশ মোটা ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতেই সে চলছিল। একসময়ে যে ডালটা ধরে সে ঝুল দিল সেটাও বেশ মজবুত ও তাজা। সে কেমন করে জানবে যে বাকলের নীচে সে ডালটাকে পোকায় কেটে একেবারে ঝাঁঝরা করে রেখেছে।

তার দেহের ভারে হঠাৎ ডালটা সশব্দে ভেঙে পড়ল। নীচে কোন মোটা ডাল ছিল না যে জাপ্‌টে ধরবে। হেট-মুণ্ড ঊর্দ্ধ-পদ হয়ে সে সপাটে ছিটকে পড়ল গ্রামের পথটার একেবারে মাঝখানে। ডাল ভাঙার মড্‌-মড্‌ শব্দে ও পড়ন্ত দেহের ছব্‌-ছরাৎ আওয়াজে চমকে ওঠে গ্রামবাসীরা। এসে দেখল, একটি প্রায় নগ্নদেহ সাদা মানুষ গাছ থেকে যেখানে পড়েছিল সেখানেই চুপচাপ পড়ে আছে। সর্দার মুমাবো বলল, ওকে বেঁধে ফেল। আজ রাতে ভোজটা জমবে ভাল।

শক্ত করে টারজনের হাত-পা বেঁধে তাকে নিয়ে হাজির করল সেই কুটিরে যেখানে লেফ্‌টেন্যান্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইক আসন্ন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে আছে। তারও হাত-পা বাঁধা।

ধীরে ধীরে টারজনের জ্ঞান ফিরে এল। চোখ মেলে তাকাল। অনেক কষ্টে পাশ ফিরে উঠে বসল। সামনেই ইংরেজ যুবকটিকে পিছ-মোড়া করে বাঁধা অবস্থায় দেখে ম্লান-হেসে বলল, দেখছি আজ রাতে ওরা পেট ভরে খাবে।

যুবকটি বলল, তুমি কেমন করে ধরা পড়লে ?

টারজন আক্ষেপের সুরে বলল, নিজের দোষে। আরে ভাই, ডালটা যে পোকায় খাওয়া তা কেমন করে জানব।

যুবক বলল, পালাবার কোন পথ কি নেই ?

টারজন হেসে বলল, মরতে তোমার এত ভয় কেন ? একদিন তো মরতে হবেই। আজ রাতে হোক, কাল রাতে হোক, আর এক বছর পরে হোক—তাতে তফাৎটা কি হবে ?

যুবক বলল, এ সব দার্শনিক কথাবার্তা শুনতেই ভাল গো দাদা, কিন্তু আমার ওতে সায় নেই। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। দেখাই যাক।

অরণ্যরাজ টারজন ও লেফ্‌টেন্যান্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইককে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে পাশাপাশি তুটো দণ্ডের সঙ্গে। ইংরেজ যুবকটি মুখ ঘুরিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল। টারজন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে ভয় বা ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। পরিপূর্ণ উদাসীনতা।

যুবক লেফ্‌টেন্যান্ট ফিস্‌ফিস্ করে বলল, বিদায় গো দাদা।

টারজনও মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, বিদায়।

চারদিক থেকে তাদের তুজনকে ঘিরে যোদ্ধারা গোল হয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। কাছে—আরও কাছে।

নুমাবোর হাতের বর্শা টারজনের বুক স্পর্শ করল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্তের ছোট ধারা গড়িয়ে পড়ল তার বাদামী বুক বেয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই কৌতূহলী দর্শকদের পিছন দিক থেকে ভেসে এল নারী-কণ্ঠের আর্ত চীৎকার আর বহুকণ্ঠের বীভৎস হুংকার ও গর্জন। গোলমালটা কিসের তা তুজনের কেউই দেখতে পেল না। কিন্তু কিছু না দেখেই কেবল শব্দ শুনেই টারজন বুঝতে পারল ওটা কাদের গর্জন ও হুংকার।

কিন্তু সে ভেবেই পেল না কেমন করে গোরিলারা এখানে এল, আর তাদের এই আক্রমণের উদ্দেশ্যই বা কি। ওরা যে তাকেই উদ্ধার করতে এসেছে তা সে ভাবতেই পারল না।

যুবক গোরিলা জু-টাগ প্রচণ্ড তুই থাবায় আছাড় মেরে, থাবড়ে, কামড়ে সমবেত জনতাকে ছিন্নভিন্ন করে এগিয়ে এল। পিছন পিছন ধেয়ে এল তার কদাকার দলবল। টারজন সবিস্ময়ে দেখল, তাদের চালিয়ে এনেছে বার্থা কিরচার।

সে চীৎকার করে বলল, জু-টাগ, আগে সর্দারের দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। কির্‌চারকে বলল, তুমি আমার বাঁধন খুলে দাও। তাড়াতাড়ি।

বার্থা কির্‌চারের চেষ্টায় নিজেকে মুক্ত করে টারজন বলল, এবার এই ইংরেজের বাঁধন খুলে দাও। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে গেল জু-টাগের পাশে। মুমাবো ও তার দলের সঙ্গে তখন গোরিলা দলের তুমুল যুদ্ধ চলেছে। আর্তনাদ করতে করতে নিগ্রোরা পালিয়ে গিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। মুমাবো অনেক চেষ্টা করেও তাদের ফেরাতে পারল না।

ততক্ষণে মেয়েটি ইংরেজ বৈমানিককে মুক্ত করে দিয়েছে। নিগ্রোদের পরিত্যক্ত বর্শা হাতে নিয়ে এবার তিন ইওরোপীয় মানুষ ও অবশিষ্ট গোরিলারা গ্রামের ফটক পার হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

টারজন সম্পূর্ণ নির্বাক। তার পাশেই চলেছে গোরিলা জু-টাগ। পিছনে বাকি গোরিলারা। সকলের শেষে ফ্রলিন বার্থা কির্‌চার ও লেফ্‌টেন্যান্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইক।

হরিণ শিকার করে কাঁধে ঝুলিয়ে গাছের ডালে ডালে ফিরছিল টারজন। হঠাৎ থেমে নীচের বেড়া-ঘেরা কুটিরের দিকে এগিয়ে-চলা তুটি মনুষ্যমূর্তির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তাদের একজন যুবক—পরনে বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর শতছিন্ন ইউনিফর্ম; অপরজন যুবতী—পরনে একদা পরিচ্ছন্ন অশ্বারোহণ-পোশাকের এক শোচনীয় সংস্করণ।

ভাগ্যের খেয়ালে তিনটি ভিন্ন চরিত্রের মানুষ এক সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। একজন প্রায় নগ্নদেহ বর্বর, একজন ইংরেজ অফিসার, অপর জন এক ঘৃণিত জার্মান গুপ্তচর। এই তুটি প্রাণীকে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত তাদের হাত থেকে টারজনের মুক্তি নেই। কিন্তু তা করতে হলে তাকে যে নিজের স্বপ্নের দেশ থেকে অনেক অনেক দূরে সরে যেতে হবে। অথচ না গিয়েও তো উপায় নেই। এই

তুটি যুবক-যুবতী তার সাহায্য ছাড়া এত দূরের অজ্ঞাত পথ কিছুতেই পার হতে পারবে না।

শিকার নিয়ে তিনজন কুটিরে ফিরে গেল। টারজন হরিণটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে কিছুটা নিজের জন্য রেখে বাকিটা তুজনকে দিয়ে বলল, তোমরা তো আবার রান্না না করে খেতে পার না। টারজনের ওসব বালাই নেই।

যুবকটি আগুন জ্বালিয়ে দিল। যুবতীটি মাংস রান্নার কাজে মন দিল।

একটু দূরে বসে স্মিথ-ওল্ডউইক টারজনকে বলল, আশ্চর্য মেয়ে! কি বল?

টারজন উত্তর দিল, ও জার্মান এবং গুপ্তচর।

কি বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি। মেয়েটা জার্মান গুপ্তচর।

আমি বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস করো না? তোমার বিশ্বাসে আমার কি যায়-আসে। আমি ভাল করেই জানি সে জার্মান গুপ্তচর। তবু সে একটি নারী, তাই আমি তাকে শেষ করে দিতে পারি নি।

তরুণ লেফ্‌টেন্যান্টটি বলে উঠল, হা ঈশ্বর! আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। মেয়েটি এত মিষ্টি, এত সাহসী, আর এত ভাল।

টারজন দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, মেয়েটি সাহসী সে কথা ঠিক। কিন্তু আমি তাকে ঘৃণা করি। তোমারও উচিত তাকে ঘৃণা করা।

লেফ্‌টেন্যান্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইক দুই হাতে মুখ ঢাকল। পরে বলল, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ওকে ঘৃণা করতে পারব না।

তীব্র ঘৃণার চোখে তার দিকে তাকিয়ে টারজন উঠে দাঁড়াল। বলল, টারজন আবার শিকারে যাচ্ছে। যে মাংস আছে তাতে তোমাদের দু'দিন চলে যাবে। ততক্ষণে সে ফিরে আসবে।

দু'জন একদৃষ্টিতে তার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। একলাফে একটা গাছের ডাল ধরে সে ডালপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুটিরে বসে দু'জন তাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগল।

স্মিথ-ওল্ডউইক বলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা সাদা মানুষদের বস্তির সন্ধানে আমাদের বেরিয়ে পড়া উচিত।

বার্থা কিব্‌চার বলল, কিন্তু সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা তো যেতে পারি না।

কিন্তু চলে যেতেই হবে, যুবকটি জোর দিয়ে বলল, সে চায় না যে আমরা এখানে থাকি। বিশেষ করে তুমি।

মেয়েটি বলল, আমা'কে বল সে কি বলেছে। সব কথা জানবার অধিকার আমার আছে।

মেয়েটির চোখে চোখ রেখে স্মিথ-ওল্ডউইক বলল, সে বলেছে তোমাকে ঘৃণা করে। তুমি একটি নারী বলেই কেবল কর্তব্যবোধে সে তোমাকে সাহায্য করছে।

মেয়েটির মুখ ম্লান হয়ে গেল। পরক্ষণেই হয়ে উঠল রক্তিম। দৃঢ় গলায় বলল, এই মুহূর্তেই আমি যাবার জন্য প্রস্তুত। কিছুটা মাংস সঙ্গে নিতে হবে। আবার কতদিনে জুটবে কে জানে।

নদীর ভাটির পথে তারা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল। যুবকটি হাতে নিল টারজনের ছোট বর্শাটা। মেয়েটির হাতে একটা লাঠিমাত্র। বার্থার কথামত যাবার আগে যুবকটি একটা চিরকুটে টারজনকে ধন্যবাদ ও বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে সেটাকে কুটিরের দেয়ালে সেঁটে দিল।

স্মিথ-ওল্ডউইককে মুমাবোর গ্রামে নিয়ে যাবার পরেই উর্সাঙ্গা বেরিয়ে পড়েছিল তার বিমানটার খোঁজে। কিন্তু সেটাকে খুঁজে পাবার পরে তার মনোভাব পাল্টে গেল। সেটাকে কাজে লাগাবার ধান্দা ঢুকল তার মাথায়। বিমানটির এটা-ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একদিন তার মনে বাসনা জাগল—আহা, সে যদি যন্ত্রটাকে চালাতে পারত! গাছের মাথার অনেক উপর দিয়ে যদি পাখির মত উড়তে পারত!

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বিমানটাকে চালাতে পারল না। অবশ্য আশা ছাড়ল না। তখন ভাবল, সাদা চালকটি যখন মুমাবোর গ্রাম থেকে পালিয়েছে তখন একদিন না একদিন সে তার বিমানের খোঁজে

আসবেই। তখন তার কাছ থেকেই সে বিমানে ওড়ার কৌশলটা জেনে নিতে পারবে। সেই আশায়ই সে যখন-তখন এসে বিমানটির চারদিকে ঘুর-ঘুর করে।

অবশেষে তার প্রতীক্ষার অবসান হল। উত্তর দিক থেকে মানুষের স্বর ভেসে আসতেই উসাঙ্গা দলবল নিয়ে ঘন গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। দেখা দিল বহু প্রত্যাশিত বৃটিশ অফিসারটি। সঙ্গে সেই সাদা মেয়েটি।

দুই যুবক-যুবতী জঙ্গল পেরিয়ে একটা খোলা জায়গায় পড়তেই তাদের চোখের সামনে দেখা দিল বহু-বাঞ্ছিত যন্ত্রটি। গভীর স্বস্তি ও আনন্দের উচ্ছ্বাস বেরিয়ে এল তাদের মুখ থেকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই উসাঙ্গা তার নিগ্রো যোদ্ধাদের নিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে তাদের দুজনকে ঘিরে ফেলল।

দিনের পর দিন যায়। উসাঙ্গা একটু একটু করে বিমান চালানোর বিদ্যা আয়ত্ত করে। ক্রমে তার ধারণা হল যে সে একাই বিমান চালাতে পারবে।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিন্তা উসাঙ্গার মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠল। একবার যদি সে নিজে নিজে উড়তে পারে তাহলে আর তাকে পায় কে। সে সোজা উড়ে যাবে পাশের রাজ্যে। সেখানকার রাজা তাকে যন্ত্রটা থেকে নামতে দেখেই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। সেখানে সে রাজা হয়ে সিংহাসনে বসবে। পাশে থাকবে তার চব্বিশটি বৌ রাণীর সাজে সেজে। আর সকলের মধ্যমণি হয়ে পাটরাণী সেজে বসবে নবাগতা শ্বেতাঙ্গিনী।

আহ্লাদে উসাঙ্গা একেবারে আত্মহারা। ফন্দি-ফিকির তৈরী করতেও বিলম্ব হল না।

সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু কালা যোদ্ধা এসে স্মিথ-ওল্ডউইককে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। সেই অবস্থায় সে দেখতে পেল,

কিছু দূরে বার্থা কিবচারও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উসাঙ্গার পাশে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ডভাবে মাথা নেড়ে কি যেন বলছে।

উসাঙ্গার হুকুমে কালা আদমিরা মেয়েটিকে বিমানে তুলে দিল। সেখানে তার হাতের বেড়ি খুলে দিয়ে আসনে বসিয়ে উসাঙ্গা তাকে পেটি দিয়ে ভাল করে বেঁধে দিল। তারপর নিজে বসল সামনের আসনে।

মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে তাকাল ইংরেজ যুবকটির দিকে। চেঁচিয়ে বলল, বিদায়!

যুবকটি ভারী গলায় বলল, বিদায়! ঈশ্বর তোমার সহায় হোন!

উসাঙ্গা বোধহয় বিমান-চালানোটা ভালই শিখেছে। একটা ধাক্কা খেয়ে বিমানটা মাটি ছাড়ল। বেশ ভালভাবেই উঠে গেল।

দু'দিন ধরে শিকার করে টারজন ফিরে এল।

কুটির ও তার চারদিকের বেড়া যেমন ছিল তেমনই আছে। কিন্তু ভিতরে জনমানবের চিহ্নও নেই। ভাল করে চারদিকটা শুঁকেই সে বুঝতে পারল, দু'দিন আগেই তারা চলে গেছে। বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই ঘরের দেওয়ালে আঁটা এক-টুকরো কাগজের উপর তার চোখ পড়ল। তাতে লেখা:

মিস্ কিব্‌চার সম্পর্কে তুমি আমাকে যা বলেছ তারপরে এবং তুমি যে তাকে অপছন্দ কর সেটা বুঝতে পেরে আমার মনে হয়েছে যে আর বেশীদিন তোমার ঘাড়ে চেপে বসে থাকা তার বা তোমার কারও পক্ষেই উচিত হবে না। আমি জানি, আমাদের জন্যই তুমি তোমার লক্ষ্যস্থল পশ্চিম উপকূলের দিকে অগ্রসর হতে পারছ না। তাই একটা কোন সাদা মানুষদের বসতি খুঁজে বের করার চেষ্টায় আমরা তুজনই বেরিয়ে পড়লাম। যে স্নেহের আশ্রয় তুমি আমাদের দিয়েছিলে সে জন্য আমরা তুজনই তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

চিরকুটের নীচে লেফ্‌টেন্যান্ট হ্যারল্ড, পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইকের স্বাক্ষর।

টারজন কাঁধ ঝাঁকাল; চিরকুটটাকে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল। একটা অজানা প্রেরণায় হঠাৎ ছুটতে শুরু করল। অনেক পথ পার হয়ে দক্ষিণ পথে কয়েক মাইল এগিয়ে হঠাৎ তার কানে একটা গুড়-গুড় শব্দ এল। ভাল করে কান পেতে হঠাৎ সে বলে উঠল, একটা বিমানের শব্দ!

দ্রুতগতিতে ছুটতে ছুটতে সেই মাঠের প্রান্তে গিয়ে সে হাজির হল যেখানে মাটিতে নেমেছিল স্মিথ-ওল্ডউইকের বিমান। দ্রুত দৃষ্টি চালিয়ে চারদিকে যা দেখতে পেল তাতেই পরিস্থিতিটা বুঝতে পারলেও নিজের চোখকেই যেন সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। হাত-পা বাঁধা অসহায় অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে ইংরেজ অফিসারটি। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে জার্মান পক্ষত্যাগী একদল কালা আদমি। একটা বিমান তার দিকেই এগিয়ে আসছে। বিমানের চালক কালা উসাঙ্গা, আর তার পিছনের আসনে সাদা মেয়ে বার্থা কিরচার। এই অশিক্ষিত বর্বর মানুষটা কেমন করে বিমান চালাবার কৌশল শিখল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তখন নেই। শুধু এইটুকু সে বুঝতে পারল যে কালা সার্জেন্ট উসাঙ্গা সাদা মেয়েটিকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে।

ততক্ষণে বিমানটা মাটি ছাড়বার উপক্রম করেছে। মুহূর্তের মধ্যেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। মেয়েটিকে উদ্ধার করার একটিমাত্র উপায় আছে—কিন্তু সে চেষ্টায় বিফল হলে তার নিজের মৃত্যু অনিবার্য। তবু সেই পথটাই টারজন অনুসরণ করল।

অনভ্যস্ত বিমান-চালানোর কাজে ব্যস্ত থাকায় উসাঙ্গা টারজনকে দেখতে পায়নি; কিন্তু একদল কালা আদমির চোখের সামনে সে দ্রুতগতিতে ছুটে গেল বিমানটার দিকে। কাঁধ থেকে লম্বা ঘাসের দড়িটা তুলে নিয়ে তার ফাঁস-কল বসানো দিকটাকে সজোরে মাথার উপর ঘোরাতে লাগল।

ছুটন্ত লোকটির মাথার বিশ ফুট উঁচু দিয়ে বিমান তখন উড়ে চলেছে। দড়ির ফাঁস-কলটা বিমানের কাছে যেতেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বার্থা কিরচার তুই হাতে সেটাকে লুফে নিল। সঙ্গে সঙ্গে টারজনের পা তুটো মাটি থেকে উপরে উঠে গেল, আর তার ভারে বিমানটা বাঁ দিকে কাৎ হয়ে পড়ল। উসাঙ্গা বেপরোয়াভাবে চাকাটাকে ঘুরিয়ে দিতেই বিমানটা খাড়া হয়ে উপরে উঠে গেল। দড়ির অপর প্রান্ত ধরে টারজন ঝুলতে লাগল ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত।

ইংরেজ যুবকটি চিং হয়ে পড়ে সব কিছুই দেখল। টারজনের দোদুল্যমান অবস্থা দেখে তার বুকের রক্ত

স্থির হয়ে গেল। লম্বা গাছগুলিতে ধাক্কা খেয়ে লোকটির শরীর যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটল না। বিমানটি গাছের মাথা ছাড়িয়ে আরও উপরে উঠে গেল। ফাঁস-কলটাকে দুই হাতে চেপে ধরে মেয়েটি প্রাণপণ শক্তিতে অপর প্রান্তের ভারী দেহটাকে টেনে রেখেছে। আর টারজনও দড়ি বেয়ে একটু একটু করে বিমানের দিকে উঠে যাচ্ছে।

উসাঙ্গা কিন্তু এসব কিছুই জানতে পারেনি। সে বিমানটিকে উঁচুতে—আরও উঁচুতে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় এক হাতে বিমানটির একপাশ আঁকড়ে ধরে টারজন ভিতরে উঠে এল। এক পলকে উসাঙ্গার দিকে তাকিয়ে মেয়েটির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, কখনও বিমান চালিয়েছ কি? মেয়েটি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

ঐ লোকটাকে ঝাপটে ধরে তুমি ওর পাশে উঠে যেতে পারবে কি?

উসাঙ্গার দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় মেয়েটি বলল, পারব, কিন্তু আমার পা দুটো যে বাঁধা।

খাপ থেকে শিকারী-ছুরিটা টেনে বের করে টারজন মেয়েটির পায়ের বেড়ি কেটে দিল। পর-মুহূর্তেই একলাফে সে জায়গা করে নিল উসাঙ্গার পাশে। বেচারি কিছু বুঝবার আগেই ইস্পাতকঠিন আঙুল চেপে বসল তার গলায়। একটা বাদামী হাতে ঝলসে উঠল তীক্ষ্ণ ছুরি। কোমরের ফিতেটা দুই খণ্ড হয়ে গেল। পেশীবহুল দুটো হাতে তাকে তুলে ধরে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

নীচে ভূমি-শয্যায় শুয়ে লেফ্‌টেন্যান্ট স্মিথ-ওল্ডউইক যখন দেখল যে একটা মানুষের দেহ সবেগে নীচে নেমে আসছে তখন আতংকে সে শিউরে উঠল। শূন্যে পাক খেতে খেতে এসে দেহটা মাটিতে ছিটকে পড়ে একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেল।

বিমানটি স্বচ্ছন্দে নীচে নেমে এল। একলাফে বিমান থেকে নেমে টারজন ছুটে গেল যুবক লেফ্‌টেন্যান্টটির কাছে। কালা যোদ্ধারা কেউ সেখানে নেই। অলৌকিক সব কাণ্ড-কারখানা দেখে সকলেই পালিয়েছে।

টারজন যুবকটির বাঁধন খুলে দিল। ততক্ষণে মেয়েটিও নেমে এসেছে। মুখে ধন্যবাদের কথা উচ্চারণ করতেই টারজন ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে দিয়ে যুবকটির দিকে ঘুরে বলল, এখনই যাত্রা কর। তোমরা কেউই জঙ্গলের লোক নও। তার মুখে ঈষৎ হাসি ফুটল।

স্মিথ-ওল্ডউইক বলল, আমাদের তো নয়ই, এই জঙ্গল কোন সাদা মানুষেরই বাসস্থান নয়। তুমিও কেন আমাদের সঙ্গে সভ্য জগতে ফিরে চল না।

টারজন মাথা নাড়ল। আমি জঙ্গলই ভালবাসি। তাছাড়া তুমি যা বলতে চাইছ তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তার দরকার হবে না। কি জান, জঙ্গলেই আমি জন্মেছি। সারাটা জীবন জঙ্গলেই কাটিয়েছি। জঙ্গলেই মরতে চাই। আর কোথাও বাঁচতে বা মরতে চাই না।

দুজনেই মাথা নাড়তে লাগল। এই মানুষটিকে তারা বুঝতে পারে না।

টারজন বলল, চলে যাও। যত তাড়াতাড়ি যাবে, তত তাড়াতাড়ি নিরাপদ হবে।

দু'জন একসঙ্গে বিমানের দিকে গেল। স্মিথ-ওল্ডউইক টারজনের হাতটা চেপে ধরে দ্রুতপায়ে বিমানে উঠে গেল। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বার্থা কিরচার বলল, বিদায়।

লেফ্‌টেন্যান্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইক চালিত বৃটিশ বিমানটা যখন বার্থা কিব্‌চারকে সঙ্গে নিয়ে বহুবিপদসংকুল জঙ্গলের অনেক উপরে উঠে গেল তখন হঠাৎই মেয়েটির মন খারাপ হয়ে গেল। এমন একটা মানুষকে সে পিছনে ফেলে যাচ্ছে যার প্রতি তার মনের টানের বুঝি অন্ত নেই।

লেফ্‌টেন্যান্ট স্মিথ-ওল্ডউইক কিন্তু তখন সপ্তম স্বর্গে। সে ফিরে পেয়েছে প্রিয় বিমানটিকে, দ্রুত উড়ে চলেছে সহকর্মীদের কাছে, সঙ্গে ভাল-লাগা মেয়েটিও রয়েছে।

নীচে ঘন অরণ্য; সম্মুখে দূর-বিস্তার অনুর্বর মরুভূমি। একটা পাহাড়ের চূড়াকে পার হবার পরক্ষণেই তাদের পথ আটকে উড়ে এল শকুন স্কা। সবেগে এসে শকুনটা বিমানের উপর পড়তেই প্রপেলারের আঘাতে স্কার ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ দেহটা পালকের মত ছিটকে পড়ল মাটিতে। একটা ভাঙা টুকরো আঘাত করল চালকের কপালে। সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। আর বিমানটা গোত্তা খেয়ে খাড়া ঝাঁপ দিল পৃথিবীর বুকে।

পাইলট মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিল; কিন্তু ক্ষতি যা হবার তার মধ্যেই হয়ে গেছে। জ্ঞান ফিরে আসতেই পাইলট বুঝতে পারল মোটরটা থেমে গেছে। বিমান সঞ্চারিত হয়েছে তীব্র গতিতে পৃথিবীর বুকে।

নীচে চোখে পড়ল একটা সংকীর্ণ গিরি-খাত। অনেকটা সমতল ও বালুকাময়। মুহূর্তের মধ্যে স্মিথ-ওল্ডউইক মনস্থির করে ফেলল: ওই গিরি-খাতে অবতরণই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। তাই সে করল; অবশ্য তাতেও বিমানটির বেশ ক্ষতি হল, আর দু'জনে ঝাঁকি খেল প্রচণ্ড।

সৌভাগ্যবশতঃ দুজনের কেউই সেরকম আঘাত পেল না, কিন্তু তাদের অবস্থা দাঁড়াল শোচনীয়।

মেয়েটি শুধাল, তুমি কি যন্ত্রটা মেরামত করতে পারবে না?

চেষ্টা করে দেখতে হবে। আশা করি গুরুতর ক্ষতি কিছু হয় নি। টাঙ্গা রেলপথ তো এখান থেকে অনেক—অনেক দূরে।

দু'দিন ধরে স্মিথ-ওল্ডউইক বিমানটাকে মেরামতের অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু তার সব চেষ্টাই বিফল হল।

স্মিথ-ওল্ডউইক বিমানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েটি তাকিয়েছিল নীচের গিরি-খাতের দিকে। হঠাৎ সে যুবকটির হাত চেপে ধরল। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, ওই দেখ।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দূরে পাহাড়ের বাঁকের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যুবক দেখতে পেল একটা বড় সিংহের মাথা।

সিংহ নুমা একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। বিমানের একেবারে কাছে এসে উপরের দিকে তাকিয়েই সে একটা লাফ দিল। পাইলটও পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ল।

আর ঠিক সেই ক্ষণে অরণ্যরাজ টারজনের প্রবেশ ঘটল সেই দৃশ্যে। তাকে দেখেই নুমা মুখ ফিরিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল।

টারজন বর্শা হাতে তৈরীই ছিল। কিন্তু সে চিনতে পারল, এটা তার পরিচিত নুমা।

নুমাও তাকে চিনতে পেরেছে। গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে এসে সিংহটা টারজনের পাশে দাঁড়াল বিশ্বস্ত ভৃত্যের ভঙ্গীতে।

মুহূর্তের মধ্যে অরণ্যরাজ টারজন রূপান্তরিত হল লর্ড গ্রেস্টোক জন ক্লেটন-এ। বিমানের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, তোমাদের খুঁজে পাবার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। বড় ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। বিমানটা কি একেবারেই অকেজো হয়ে গেছে?

হ্যাঁ: কোন আশা নেই, স্মিথ-ওল্ডউইক বলল।

টারজন শুধাল, তাহলে এখন কি করবে কিছু ভেবেছ?

মেয়েটি উত্তর দিল, আমরা উপকূলে পৌঁছতে চাই। কিন্তু এখন তো সেটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

টারজন বলল, কিছুক্ষণ আগে হলে আমিও তাই মনে করতাম। কিন্তু নুমাকে যখন এখানে পেয়েছি তখন জলভাগ নিশ্চয় খুব দূরে হবে না। তোমরা নেমে এস।

যুবক-যুবতী দুটি ভয়ে-ভয়ে বিমান থেকে নেমে এল। আগে আগে চলল নুমা। তার পিছন-পিছন বাকিরা। অন্ধকার নেমে আসার আগেই হঠাৎ টারজন দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই সঙ্গী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে সে আঙুল বাড়িয়ে সামনের পথটা দেখাল। ভাল করে নজর করতেই মেয়েটি চেঁচিয়ে বলে উঠল, মানুষের পায়ের ছাপ।

টারজন মাথা নাড়ল।

মেয়েটি আঙুল বাড়িয়ে বলল, কিন্তু পায়ের আঙুলের কোন ছাপ নেই।

পায়ে নরম স্যাণ্ডেল ছিল, টারজন বুঝিয়ে বলল।

তাহলে তো নিশ্চয় কাছাকাছি কোন গ্রাম আছে। স্মিথ-ওল্ডউইক বলল।

টারজন বলল, তা আছে; কিন্তু আফ্রিকার এই সব অঞ্চলে যে সব মানুষ বাস করে তারা তো পায়ে স্যাণ্ডেল পড়ে না।

তার মানে তুমি মনে কর যে এগুলো কোন সাদা মানুষের পায়ের ছাপ?

সেইরকমই তো মনে হচ্ছে, বলেই টারজন হঠাৎ মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে পথটা শুঁকতে শুরু করল।

যৎসামান্য খাবারে নৈশভোজন শেষ করে টারজন মেয়েটিকে একটা গুহার ভিতরে ঢুকতে বলল।

বলল, তুমি ভিতরে ঘুমবে। লেফ্‌টেন্যান্ট ও আমি শোব বাইরে গুহার মুখে।

সেই রাতেই একদল মানুষ এসে তাদের আক্রমণ করল। এতগুলি মানুষের বিরুদ্ধে একা কিছুই করতে পারবে না জেনেও টারজন রুখে দাঁড়াল। কিন্তু তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়ে মাথায় আঘাত পেয়ে সে জ্ঞান হারাল।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন ভোরের আলো ফুটেছে। টারজন ধীরে ধীরে চোখ মেলল।

গুহার ভিতরে তাকিয়ে দেখল, স্মিথ-ওল্ডউইক ও বার্থা কির্‌চার কেউই সেখানে নেই। তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে দেখে টারজন তীব্র রোষে মাথাটা ঝাঁকি দিল। যেমন করেই হোক এবার খুঁজে বের করতে হবে বার্থা কির্‌চার ও স্মিথ-ওল্ডউইককে। পথে

অনেক স্যাণ্ডেল-পরা পায়ের ছাপ এবং একদল বিচিত্র মানুষের গন্ধ পেল। চলতে চলতে তার নাকে এল মেয়েটির গন্ধ ; একটু পরে স্মিথ-ওল্ডউইকের গন্ধ। পথ ক্রমেই সরু হয়ে এল। মেয়েটি ও ইংরেজটির পায়ের ছাপও স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আর একবার ভাল করে শুঁকে টারজন মেয়েটি ও তার অপহরণকারীদের পথের সন্ধান পেয়ে সেই পথে চলতে শুরু করল। চলতে চলতে একসময় হঠাৎ তার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দেখা দিল গম্বুজ ও মিনারে শোভিত একটি প্রাচীর-ঘেরা নগর। প্রাচীর ছাড়িয়ে আকাশে মাথা তুলেছে কয়েকটি গম্বুজ ও অসংখ্য মিনার ; কেন্দ্রস্থ গম্বুজটি সোনালী রং করা ; বাকিগুলি লাল, নীল বা হলুদ।

সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকারে ঢেকে গেল প্রাচীর-ঘেরা নগর। জানালায় জানালায় আলো জ্বলে উঠল। টারজন আগেই ভেবে রেখেছিল, কিছুটা দূরে পূব দিকের প্রাচীর যেখানে দ্রাক্ষালতায় ছেয়ে গেছে সেখান দিয়ে প্রাচীর টপকে নগরে ঢুকবে। জঙ্গল ও প্রাচীরের মাঝখানে প্রায় সিকি মাইলের ব্যবধান। নীচের খোলা জায়গাটায় হিংস্র পশুর অবাধ চলাফেরা। তার ভিতর দিয়ে ছুটে গিয়ে দ্রাক্ষালতা বেয়ে প্রাচীরের উপরে উঠতে হবে।

লোকগুলো যখন তার সঙ্গী দু'জনের উপর দিয়ে ছুটে এল তখন বার্থা কিরচার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গুহার এক কোণে কুঁকড়ে সরে গেল। গুহার অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। কয়েকটা হাত এসে তাকে চেপে ধরল। তাকে টানতে টানতে গুহার বাইরে টেনে আনা হল। খাদের বালুময় পথে পা দিয়েই সে দেখতে পেল, কয়েকজন মিলে একটা লোককে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। বুঝল, এ লোক স্মিথ-ওল্ডউইক ছাড়া অন্য কেউ নয়।

জঙ্গল পার হতেই সামনে চাষের ক্ষেত ও একটা প্রাচীর-ঘেরা নগর দেখতে পেয়ে তারা অবাক হয়ে গেল।

স্মিথ-ওল্ডউইক বলে উঠল, আরে, এ যে রীতিমত ইঞ্জিনীয়ারের হাতের কাজ।

মেয়েটি দূরে তাকিয়ে বলে উঠল, আর ঐ গম্বুজ ও মিনারগুলি দেখ। প্রাচীরের ওপাশে নিশ্চয় সভ্য মানুষরা বাস করে। হয়তো ভাগ্যক্রমেই আমরা তাদের হাতে পড়েছি।

স্মিথ-ওল্ডউইক মাথা নেড়ে বলল, হয়তো তাই। তবু আমার কেমন যেন ভাল বোধ হচ্ছে না। নিশ্চয় কিছু একটা গোলমাল আছে।

খিলান-দেওয়া ফটক পার হয়ে তারা ভিতরে ঢুকল। সরু সরু পথ। দু'দিকে সারি সারি বাড়িঘর। অধিকাংশই দোতলা।

একদল রক্ষী এসে বার্থা কির্‌চারকে ইসারায় তাদের অনুগমন করতে বলল। স্মিথ-ওল্ডউইককে সঙ্গে নিল না। কিছুক্ষণ পরে আর দুজন রক্ষী এসে তাকে নিয়ে গেল।

বার্থা কির্‌চারকে নিয়ে যাওয়া হলো নগরের সব চাইতে বড় ও বেশী জাঁকজমকপূর্ণ বাড়িটাতে।

পর পর অনেকগুলো দরজা পার হয়ে তারা একটা হলে ঢুকল। মেঝেতে পায়চারি করছে লাল পোশাকে সজ্জিত একটি মানুষ। তার বুক ও পিঠের উপর প্রকাণ্ড দুটো কাকাতুয়ার মূর্তি, আর শিরস্ত্রাণের উপর বসানো একটা খড়ভর্তি কাকাতুয়া।

ঘরের চারদেয়ালে শত শত, হাজার হাজার কাকাতুয়ার মূর্তি কাপড়ের উপর সেলাই করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

লোকটি ঘরময় হাঁটছে তো হাঁটছেই। একটি মেয়েকে সেখানে আনা হয়েছে সে খেয়ালই নেই। হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে ছুটে এল মেয়েটির দিকে। তাকে ছুটে আসতে দেখে মেয়েটি তাকে রুখবার ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সভয়ে পিছনে হটে গেল।

লোকটি কিন্তু খুব কাছে এসেও তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করল না। চোখ ঘুরিয়ে তাকে দেখতে লাগল, আর তার চুল, চামড়া, পোশাক, বিশেষ করে তার দাঁতগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

তারপর আবার পায়চারি শুরু করল। এইভাবে পনেরো মিনিট কাটবার পরে রক্ষীদের কি যেন হুকুম করতেই তারা মেয়েটিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অনেকগুলি বারান্দা ও ঘর পার হয়ে তারা সিঁড়ি বেয়ে আরও একতলা উপরে উঠে গেল। সেখানে একটা ছোট ঘরে তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে রক্ষীরা দরজায় তালা লাগিয়ে চলে গেল।

এক কোণে একটা নীচু আসনে বসে আছে একটি নারী। তার উপর চোখ পড়তেই বার্থা কিরচার চমকে উঠল। এ যে তারই মত এক শ্বেতাঙ্গিনী। বৃদ্ধ বয়স, বিবর্ণ নীল চোখ, তোবড়ানো দন্তহীন মুখ বলীরেখায় আকীর্ণ।

দুর্বলদেহ বৃদ্ধা দুই হাতে লাঠিতে ভর দিয়ে স্খলিত পায়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল। তাকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, তুমি কি বাইরের জগৎ থেকে এসেছ? ঈশ্বর করুন, তুমি যেন আমার এই ভাষা বুঝতে ও বলতে পার।

বার্থা কিরচার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, তুমি একজন ইংরেজ? কত বছর এখানে আছ?

ষাট বছর আমি এই প্রাসাদের বাইরে যাইনি। হাড়-জিরজিরে হাতটা বাড়িয়ে বলল, এস। এই আসনে আমার পাশে বস।

মেয়েটিকে নিয়ে আসনে বসে বৃদ্ধা বলল, এবার বল, তুমি কেমন করে এদের খপ্পরে পড়লে?

মেয়েটি সংক্ষেপে সব কথাই বলল। সব শুনে বৃদ্ধা শুধাল, তাহলে তোমার সঙ্গে একটি ছেলেও আছে?

হ্যাঁ, কিন্তু সে যে কোথায় আছে, তাকে নিয়ে এরা কি করেছে, কিছুই আমি জানি না।

বৃদ্ধা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটু পরে মেয়েটি শুধাল, এরা কারা? এরা তো আমাদের মত নয়। আর তুমিই বা এখানে এলে কেমন করে?

আসনে দুলতে দুলতে বৃদ্ধা বলতে শুরু করল: সে অনেক দিন আগেকার কথা। আমার বয়স তখন মাত্র বিশ বছর। খুবই সুন্দরী ছিলাম। বাবা ছিল মধ্য আফ্রিকার একজন মিশনারী। একদিন সেখানে হানা দিল একদল আরব ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী। ছোট গ্রামের অন্য নারী-পুরুষের সঙ্গে তারা আমাকেও নিয়ে গেল।

তারপর নদী, নালা, প্রান্তর, পাহাড় পেরিয়ে সে এক দীর্ঘ যাত্রা। ক্রমে তাদের হাবভাবে ও কথা-বার্তায় বুঝলাম, তারা পথ হারিয়েছে।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বন্দী নিগ্রোরা একে একে পথের মাঝখানেই মরতে লাগল। ক্ষিধে মিটতে লাগল ঘোড়ার মাংস কেটে খেয়ে। শেষ পর্যন্ত এই দেশে এসে পৌঁছলাম মাত্র দু'জন—আমি ও আরব সর্দার আর পৌঁছেই বন্দী হলাম এদের হাতে—ঠিক যে ভাবে তুমি বন্দী হয়েছ।

তোমার মতই আমাকেও তারা এই প্রাসাদে নিয়ে এল। তখন রাজা ছিল পঞ্চবিংশতি আগো। তারপর থেকে অনেক রাজা দেখলাম। কি জান, এরা সকলেই ভয়ংকর।

কিন্তু এদের হয়েছে কি? মেয়েটি শুধাল।

বৃদ্ধা বলল, এরা এক পাগল জাত। তুমি কি তা বুঝতে পারনি?

এরা সব পক্ষীকে ভক্তি করে, কিন্তু এদের প্রধান দেবতা কাকাতুয়া। এই প্রাসাদের একটা খুব সুন্দর ঘরে একটি কাকাতুয়া আছে। সেই এদের দেবাধিপতি।

কিছুক্ষণ দুজনই চুপ।

প্রথম কথা বলল বার্থা কিবচার, এখান থেকে পালাবার কি কোন পথ নেই?

গরাদে-দেওয়া জানালার দিকে আঙুল বাড়িয়ে রাণী বলল, দেখতেই তো পাচ্ছ। দরজার বাইরে আছে সশস্ত্র খোজা। তাকে পার হয়ে রাস্তায় যাবে কেমন করে? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না, এখান থেকে পালাবার কোন উপায় নেই।

ঠিক সেই সময় একটি পীতবসনধারী সৈনিক ঘরে ঢুকে বৃদ্ধাকে কি যেন বলল।

বৃদ্ধা বার্থাকে বলল, রাজার হুকুম হয়েছে তোমাকে ভালভাবে সাজিয়ে তার কাছে পাঠাতে হবে।

স্নান সেরে সাজ-পোশাক পরে রক্ষীদের সঙ্গে বার্থা কিব্চার চলল রাজদর্শনে।

সকলে যখন পাশের ঘরে রাজার জন্য অপেক্ষা করছে তখন আর একটি ঘর থেকে ঢুকল একটি সুন্দর যুবক। পরিধানে রাজকীয় পোশাক। তাকে দেখেই সৈনিকরা উঠে দাঁড়াল।

জনৈক সঙ্গী অস্ফুট স্বরে বলল, যুবরাজ মেটাক।

দরবার কক্ষের দিকে দু'পা এগোতেই যুবরাজের চোখ পড়ল বার্থা কিব্চারের দিকে। হঠাৎ থেমে সে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াবার জন্য বার্থা মুখটা ফিরিয়ে নিতেই হঠাৎ মেটাকের সমস্ত শরীর থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। তীব্র স্বরে হুংকার দিয়ে একলাফে এগিয়ে এসে মেয়েটিকে কাছে টেনে নিল।

শুরু হয়ে গেল হট্টগোল। যে রক্ষীরা মেয়েটিকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে এসেছিল তারা খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে যুবরাজকে ঘিরে নৃত্য শুরু করে দিল। বাকি সব রক্ষীরাও পাগলা যুবরাজের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে এল।

পাগলের কবল থেকে নিজেকে ছাড়াবার জন্য বার্থা প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু যুবরাজের বাহুর দৃঢ় বন্ধনে সে তখন শিশুর মত অসহায়। অনায়াসে তাকে বয়ে নিয়ে মেটাক উল্টো দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সেইদিনই সন্ধ্যার ঠিক আগে একজন ক্লান্ত বৈমানিক দ্বিতীয় রোডেশীয় বিমান বাহিনীর কর্নেল ক্যাপেলের হেডকোয়ার্টারে ঢুকে স্যালুট করে দাঁড়াল।

কর্নেল জিজ্ঞাসা করল, আরে টম্পসন, কি খবর? অন্য সকলেই তো ফিরে এসেছে। ওল্ডউইক বা তার বিমানের কোন পাত্তাই করতে পারে নি। মনে হচ্ছে, তোমারও যদি সেই দশা হয়ে থাকে তাহলে এ প্রচেষ্টা ছেড়েই দিতে হবে।

যুবক অফিসার বলল, তা করতে হবে না। আমি বিমানটির দেখা পেয়েছি।

কর্নেল ক্যাপেল বলে উঠল, বল কি হে! কোথায়? ওল্ডউইকের কোন হদিস পেয়েছ?

সে অনেক ভিতরে একটা জঘন্য গিরি-খাতের মধ্যে। বিমানটা দেখতে পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু সেখানে নামতে পারিনি। একটা সিংহ অনবরত সেটাকে চক্কর মারছে। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত চলে এসেছি।

তোমার কি মনে হয় ওল্ডউইক সিংহের পেটে গেছে?

লেফ্‌টেন্যান্ট টম্পসন বলল, না, সে রকম মনে হল না। বিমানের কাছাকাছি কোথাও সিংহটা শিকার ধরে খেয়েছে এমন কোন চিহ্ন দেখতে পাইনি। যখন দেখলাম কিছুতেই নীচে নামা সম্ভব নয় তখন গিরি-খাতের এদিক থেকে ওদিকে বার কয়েক উড়ে ভাল করে দেখলাম। একটা আশ্চর্য জিনিস দেখে এলাম। কয়েক মাইল দক্ষিণে একটা ছোটখাটো উপত্যকা—গাছপালায় ঢাকা, আর তারই ঠিক মাঝখানে—আমার মাথা খারাপ হয়েছে বলে মনে করবেন না—একটা সুন্দর শহর: রাস্তাঘাট, বড় বড় বাড়ি, গম্বুজ, মিনার—সব কিছু।

শহরে লোকজন ছিল? কর্নেলের প্রশ্ন।

হ্যাঁ। রাস্তায় লোকজন দেখেছি।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বড় ভকসল গাড়ি হেড-

কোয়ার্টারের সামনে এসে থামল। আর এক মিনিট পরেই জেনারেল স্মাট্‌স্ গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে ঢুকল।

জেনারেল বলল, এই পথেই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম নেমে একটু গল্প করে যাই। ভাল কথা, লেফ্‌টেন্যান্ট ওল্ডউইকের খোঁজ-খবর কতদূর এগোল? এই তো টম্পসন দাঁড়িয়ে আছে। সেও তো অনুসন্ধানের কাজে গিয়েছিল বলে শুনেছি।

ক্যাপেল বলল, ঠিকই শুনেছেন। সেই ফিরেছে সকলের শেষে। লেফ্‌টেন্যান্টের বিমানটাকে সে দেখেছে। তারপর টম্পসনের দেওয়া বিবরণ সবই তাকে শোনানো হল। তখন দুই অফিসার ও বৈমানিক মিলে টম্পসন-বর্ণিত শহরটার অবস্থানের একটা নক্সা তৈরী করে ফেলল।

স্মাট্‌স্ বলল, এ দেশটা যেমন বিশাল তেমনি দুরধিগম্য। তবু একটা ছোট বাহিনীকে সেখানে পাঠাতে হবে। খাদ্য ও জলসহ বেশ কয়েকটা মোট লরিসহ একটা বা দুটো কোম্পানি পাঠাও। পশ্চিমে যতদূর পর্যন্ত লরি চলে সেখানে একটা 'বেস-ক্যাম্প' বসাও। গোটা দুই বিমানও পাঠাবে সেই সঙ্গে। তারাই 'বেস-ক্যাম্পে'র সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। তোমার বাহিনীকে কখন পাঠাতে পারবে?

ক্যাপেল জবাব দিল, আজ রাতেই লরি বোঝাই করা হবে, আর কাল সকাল একটা নাগাদ যাত্রা শুরু হবে।

একলাফে দ্রাক্ষালতাটা ধরে ঝুলে পড়েই টারজন বুঝতে পারল যে একটা সিংহও কাছাকাছিই আছে, আর তার জীবন নির্ভর করছে লতাটার শক্তির উপরে।

মাত্র কয়েক ফুট নীচেই বাড়ির ছাদটা দেখতে পেয়ে তার উপর লাফিয়ে পড়ামাত্রই একটি ভারী দেহ পিছন থেকে তার উপর লাফিয়ে পড়ে বাদামী দুই বাহু দিয়ে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরল।

অসুবিধাজনক অবস্থায় ধরা পড়ে প্রথমে টারজন খুবই অসহায় বোধ করল। কিন্তু বিপদে ভড়কে যাবার পাত্র সে নয়। হঠাৎ সে এমনভাবে একটা ঝটকা মারল যে পিছনের লোকটা পাল্টি খেয়ে সামনে ছিটকে পড়ল, আর সেই ফাঁকে টারজন নিজেকে মুক্ত করে তার বুকের উপর বসে বাঁ হাতে চেপে ধরল তার তরবারিশুদ্ধ কব্জিটা আর ডান হাতে চেপে ধরল তার কণ্ঠনালী। গোঁ গোঁ করতে করতে লোকটির জিভ বেরিয়ে এল, চোখের মণি ঠেলে উঠল। তার ভবলীলা সাঙ্গ হল।

যুবক অফিসার ও মেয়েটিকে খুঁজতে হলে তাকে শহরের পথে পথে ঘুরতে হবে। কিন্তু এ রকম প্রায় ন্যাংটো হয়ে পথে নামলে সে তো অচিরেই ধরা পড়ে যাবে। কাজেই একটা ছদ্মবেশ দরকার। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধৃত রক্ষীর কাকাতুয়া মার্কা পোশাকটা গায়ে চড়িয়ে কোমরবন্ধটা কোমরে জড়িয়ে নিল। অবশ্য পোশাকের তলে ছুরিটাকে লুকিয়ে রাখল। এইভাবে বেশ ভাল রকম ছদ্মবেশে টারজন শহরের পথে নামল।

রাতের অন্ধকারে এ-পথ সে-পথ ঘুরতে ঘুরতে একসময় হঠাৎ তার চোখে পড়ল, রাস্তার পুব দিকের বাড়ির ছাদ থেকে একটি মনুষ্যমূর্তি নীচে নামবার চেষ্টা করছে। তা দেখে টারজনের মনে কৌতূহল জাগল।

স্মিথ-ওল্ডউইককে যে গুপ্ত ঘরে রেখে রক্ষীরা চলে গেল তার দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে স্মিথ-ওল্ডউইক একটা কাঠের দরজা পেয়ে গেল। খুব সাবধানে নিঃশব্দে দরজার খিল খুলতেই চোখে পড়ল, বাইরে শুধু চাপ চাপ অন্ধকার।

অন্ধকারে একটা সরু বারান্দা ধরে এগিয়ে কয়েক গজ যেতেই সে ধাক্কা খেল মইয়ের মত একটা বস্তুতে। সামনের পথ দেয়ালে অবরুদ্ধ। অগত্যা সে মই বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। মইয়ের দু'তিনটে ধাপ পার হতেই মাথায় একটা জোর ঠোক্কর খেয়ে একটা হাত মাথার উপর তুলেই বুঝতে পারল, ছাদের একটা চাপ দরজার সঙ্গে তার মাথা ঠুকে গেছে। অল্প চেষ্টাতেই দরজাটাকে ঠেলে একটু উঁচু করতেই তার ফাঁক দিয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠল রাতের আফ্রিকার তারায় ভরা আকাশ।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুকের ভিতর থেকে। ধীরে ধীরে পাল্লাটাকে একপাশে সরিয়ে দ্রুত চারদিকে তাকিয়ে বুঝল, ধারে-কাছে কেউ কোথাও নেই।

প্রাচীর বেয়ে একটা খিলানের নীচে নেমে গেল। আর তখনই পিছনে সামান্য শব্দ শুনে ফিরে তাকাতেই দেখল, একটি সৈনিক তার একেবারে সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

স্মিথ-ওল্ডউইকের প্রথম চিন্তাই হল, একটা গুলিতে সৈনিককে সাবার করে দিয়ে দুই পা যেদিকে যায় সেই দিকে ছুটে পালাবে, কারণ এর হাতে পড়া মানেই আবার বন্দী হওয়া। সেই কথা ভেবে পিস্তলের জন্য পাশ-পকেটে হাত ঢোকাতেই একটা কঠিন মুঠি তার কব্জিটাকে চেপে ধরল, আর একটি নিম্নকণ্ঠ ইংরেজিতে বলে উঠল, লেফ্‌টেন্যান্ট, আমি অরণ্যরাজ টারজন।

স্মিথ-ওল্ডউইক বলে উঠল, তুমি? তুমি? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি মরে গেছ!

টারজন বলল, না, মরিনি। দেখছি তুমিও মরনি। কিন্তু মেয়েটির খবর কি?

ইংরেজ যুবক উত্তর দিল, এখানে আসার পর থেকে আর তাকে দেখিনি। শহরে আনার পরেই আমাদের আলাদা করে দিয়েছে।

টারজন বলল, তাকে তো খুঁজে বের করতেই হবে। হতে পারে সে একটি জার্মান গুপ্তচর, তবু সে নারী—শ্বেতাঙ্গিনী—তাকে আমরা এখানে ফেলে যেতে পারি না।

শেষ পর্যন্ত ফেলে যেতেও হল না। টারজনের সঙ্গে সংঘর্ষে মেটাকের মৃত্যু হল। সেই সুযোগে তাদের সঙ্গে পরিচয় হল নিগ্রো ক্রীতদাস ওটোবুর সঙ্গে। তাকে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হবে এই শর্তে টারজন তাকেও দলে টেনে নিল। তিন-জনের মিলিত আক্রমণে মেটাক পরাভূত হল।

একবার সুযোগ পেয়ে টারজন মেটাকের গলাটা চেপে ধরল। ধীরে ধীরে দৈত্যের মুঠি বসে গেল তার গলায়। তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এল। টারজন তখন তার মৃতপ্রায় দেহটাকে দুই হাতে মাথার উপর তুলে সবেগে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল নীচের সিংহের আস্তানার মধ্যে।

বিজয়গর্বে সঙ্গীদের দিকে ফিরে তাকিয়ে টারজন দেখল সকলে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

টারজন ওটোবুকে বলল, তুমি যদি ওয়ামাবো দেশে ফিরে যেতে চাও তাহলে নিরাপদ পথ ধরে আমাদের শহরের বাইরে নিয়ে চল।

নিগ্রো বলল, নিরাপদ পথ তো নেই। তবে সকলের গায়েই এ দেশী পোশাক আছে। তাই ফটক পর্যন্ত আমরা নির্বিঘ্নেই যেতে পারব। তবে বিপদ দেখা দেবে সেখানেই, কারণ রাতের বেলা কাউকে শহর ছেড়ে যেতে দেওয়া হয় না।

টারজন বলল, সে দেখা যাবে। এখন তো চল।

দুটি পুরুষ, একটি নারী ও একটি কালা ক্রীতদাস এ শহরের পথে কোন অসাধারণ দৃশ্য নয়। তাছাড়া এই গভীর রাতে পথও জনবিরল।

দুটো মোড় ঘুরতেই ফটকটা চোখে পড়ল। সেখানে অন্তত বিশজন সশস্ত্র সৈনিক তাদের বন্দী করতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

টারজন ইংরেজ যুবকের দিকে ফিরে বলল, তোমার সঙ্গে কত গুলি আছে?

স্মিথ-ওল্ডউইক উত্তর দিল, পিস্তলে আছে সাতটা, আর পকেটে আছে আরও একডজন।

টারজন বলল, ওটোবু, তুমি থাক এই মেয়ের পাশে। ওল্ডউইক, তুমি আর আমি এগিয়ে যাব।

শুরু হল আক্রমণ। স্মিথ-ওল্ডউইকের পিস্তল গর্জে উঠল। অনেকেই থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে

ধরাশায়ী হল। সেই সুযোগে টারজন তার দলবল নিয়ে ফটক পার হয়ে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগল।

একটা গিরি-খাতে ঢোকার পরে দিনের আলো ফুটল। টারজন ছাড়া বাকি সকলেই ক্লান্ত; তবু তারা বুঝতে পারছে খাতের খাড়া পাহাড়ি দিকটা বেয়ে উপরের মালভূমিতে না ওঠা পর্যন্ত যে ভাবে হোক তাদের এগিয়ে যেতেই হবে।

ক্রমে তুপুর হ'ল। সারাটা পথ টারজন হয় কাঁধে করে নয়তো গলা জড়িয়ে ধরে স্মিথ-ওল্ডউইককে সঙ্গে নিয়ে চলেছে। কিন্তু এবার যে বার্থা কির্চারের পাও টলতে শুরু করেছে।

তার অবস্থা দেখেই তুপুরের পরে ইংরেজ যুবক হঠাৎ বালির উপর বসে পড়ে বলল, আমি আর হাঁটতে পারছি না। মিস কির্চারও ক্রমেই তুর্বল হয়ে পড়ছে। আমাকে ফেলেই তোমাদের এগোতে হবে।

মেয়েটি বলল, না, তা হতে পারে না। এত বিপদ-আপদের মধ্যেও আমরা একসঙ্গে আছি, আর কপালে যাই থাকুক, একসঙ্গেই থাকব। টারজনের দিকে মুখ তুলে বলল, অবশ্য তুমি যদি আমাদের এখানে রেখে এগিয়ে যাও সেটা স্বতন্ত্র কথা।

ঈষৎ হেসে টারজন বলল, তুমি এখনও মরনি; লেফ্‌টেন্যান্ট বা ওটোবু, বা আমিও মরিনি। হয় মরব না হয় বাঁচব, তবু যতদিন না মরি ততদিন বাঁচার চেষ্টাই করব। এতদিন যখন আসতে পেরেছি তখন এগিয়েই যাব। আপাততঃ এখানেই বিশ্রাম করা যাক, কারণ তোমরা একটু সুস্থ হলে আবার আমরা পথ চলব।

কিন্তু এক্‌জার লোকরা—? বার্থা প্রশ্ন করল, তারা কি আমাদের তাড়া করে এখানে আসতে পারে না?

টারজন বলল, তা আসতে পারে। সে যখন আসে তখন দেখা যাবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পরে টারজন হঠাৎ উঠে বসল। ইসারায় সকলকে চুপ করতে বলে কান পাতল।

বার্থা বলল, কি হল?

ওরা আসছে। এখনও অনেক দূরে আছে। কিন্তু তাদের স্যাণ্ডেল-পরা পায়ের শব্দ ও সিংহের চলার শব্দ আমার কানে আসছে।

স্মিথ-ওল্ডউইক বলল, আমরা কি করব? আরও এগোব? মনে হচ্ছে এবার আমি কিছুক্ষণ হাঁটতে পারব।

বার্থা বলল, আমিও পারব।

টারজন বুঝল এরা কেউই সত্যি কথা বলছে না। এত তাড়াতাড়ি এত বেশী ক্লান্তি কাটতে পারে না।

তবু বলল, ওটোবু, তুমি লেফ্‌টেন্যান্টকে ধর। আমি মিস কির্চারের ভার নিলাম।

তার আপত্তি সত্ত্বেও টারজন মেয়েটিকে বগল-দাবা করে হাঁটতে শুরু করল। পিছনে চলল ওটোবু ও ইংরেজ যুবক।

সামনেই বালির পথ থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে একটা পাথরের চাঙর ভেঙে পড়ে গুহার মত সৃষ্টি হয়েছে। তার ভিতর দিয়ে একটা সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ চলে গেছে পিছনের পাহাড় পর্যন্ত। গুহাটার তু'দিক খোলা হলেও ওরা সকলে একসঙ্গে আক্রমণ করতে পারবে না।

সকলে সেখানে উঠে দেখল গুহাটা তু'ফুট চওড়া

আর দশ ফুট লম্বা। তাড়াতাড়ি সকলে সেখানে লুকিয়ে পড়ল।

টারজন পিস্তলসহ স্মিথ-ওল্ডউইককে রাখল গুহার উত্তর মুখে। ওটোবুকে বলল বর্শা হাতে তার পাশে দাঁড়াতে। নিজে নিল দক্ষিণ মুখের দায়িত্ব। দু'য়ের মাঝখানে মেয়েটিকে শুইয়ে দিয়ে বলল, ওরা বর্শা ছুঁড়লেও এখানে তুমি নিরাপদে থাকবে।

মিনিটের পর মিনিট কাটতে লাগল। বার্থা কিব্‌চারের মনে হল, এ প্রতীক্ষা বুঝি অনন্তকালের।

প্রথম আক্রমণে এক্সুজার লোকরা সুবিধা করতে পারল না। স্মিথ-ওল্ডউইকের গুলির মুখে তারা পিছু হটল। কিন্তু একটু পরেই তারা আবার এল। এবার আধা ডজন মানুষ আর আধা ডজন সিংহ।

মেয়েটি বলল, এই কি আমাদের শেষ ?

না, টারজন চীৎকার করে বলল, এখনও আমরা বেঁচে আছি !

আক্রমণকারীরা এবার দু'দিক থেকে বর্শা ছুঁড়তে লাগল। মেয়েটিকে আড়াল করতে গিয়ে একটা বর্শা সজোরে এসে বিঁধল টারজনের কাঁধে। তার প্রচণ্ড ধাক্কায় সে সপাটে মাটিতে পড়ে গেল। স্মিথ-ওল্ডউইক দু'বার গুলি ছুঁড়ল ; কিন্তু একটা বর্শা এসে বিঁধল তার উরুতে। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। হাতের পিস্তলটা খসে পড়ল। শত্রুর মোকাবিলা করতে রইল শুধু ওটোবু।

টারজন ওঠার চেষ্টা করতেই একটি সৈনিক ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকের উপর। তার হাতের খোলা তলোয়ার ঝিলিক দিয়ে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বার্থা কিব্‌চার পিস্তলটা তুলে নিয়ে শয়তানটার বুক লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণকারী ও আক্রান্ত উভয় দলের কানেই ভেসে এল গুলির শব্দ—গিরি-খাতের দিক থেকে। আকাশ থেকে বুঝি ভেসে এল দেবদূতের মধুর কণ্ঠস্বর—শ্বেতাঙ্গদের কানে বাজল

একজন নন-কমিশণ্ড ইংরেজ-অফিসারের হুকুমের চীৎকার।

টারজন অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল। বর্শাটা তখনও তার কাঁধে বিঁধে রয়েছে। একটানে সেটাকে খুলে ফেলে টারজন বাইরে এসে দাঁড়াল। পিছনে বার্থা কিব্‌চার।

গিরি-খাতের ভিতরে যে খণ্ড-যুদ্ধ বেঁধেছিল তা শেষ হয়েছে। এক্সুজার সৈনিকরা সবাই মারা পড়েছে। টারজন ও বার্থাকে ভাল করে দেখে নিয়ে একটি বৃটিশ টমি হাতের রাইফেলটা তাক করল টারজনের দিকে। চোখের পলকে বার্থা বুঝে নিল, টারজনের গায়ের পীতবসনই এই বিভ্রান্তির কারণ। একলাফে দু'জনের মাঝখানে পৌঁছে সে হাত তুলে চীৎকার করে বলল, গুলি করো না ; আমরা দুজনই বন্ধু।

টমি তখন টারজনকে হুকুম করল, তাহলে হাত তুলে দাঁড়াও। হলুদ তক্‌মাধারীদের বিশ্বাস নেই।

এই সময় টমি দলের অধিনায়ক বৃটিশ সার্জেন্টটি সেখানে হাজির হল। টারজন ও বার্থা ইংরেজিতে তাকে বুঝিয়ে বলল তাদের ছদ্মবেশের কারণ ও অন্য সব বিবরণ। সার্জেন্ট সহজেই তাদের কথা বিশ্বাস করল। স্মিথ-ওল্ডউইক ও টারজনের ক্ষতস্থান বেঁধে দেওয়া হল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সকলে যাত্রা করল উদ্ধারকারী দলের শিবিরের দিকে।

রাতে স্থির হল, পরদিন স্মিথ-ওল্ডউইক ও বার্থা কিরচারকে বিমানযোগে পাঠানো হবে উপকূলবর্তী বৃটিশ হেডকোয়ার্টারে। সেজন্য দুটো বিমানের ব্যবস্থাও করা হল। বৃটিশ ক্যাপ্টেন প্রস্তাব করল, ফিরতি-যাত্রায় তার বাহিনীর সঙ্গে স্থলপথেই যাবে টারজন ও ওটোবু। কিন্তু টারজন আপত্তি জানিয়ে বলল, তার ও ওটোবুর দেশ পশ্চিম দিকে; কাজেই তারা দু'জন একসঙ্গে সেইদিকেই যাবে।

বার্থা বলল, তাহলে তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ না?

না। আমার বাড়ি পশ্চিম উপকূলে। আমি সেখানেই যাব।

মিনতি-ভরা চোখ তুলে মেয়েটি বলল, সেই ভয়ংকর জঙ্গলেই ফিরে যাবে? আর কোনদিন তোমার দেখা পাব না?

নীরবে তার দিকে তাকিয়ে থেকে টারজন বলল, কোন দিন না। আর একটি কথাও না বলে সেখান থেকে চলে গেল।

সকালে কর্নেল ক্যাপেল বেস-ক্যাম্প থেকে বিমানযোগে এসে নামল। টারজন একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল। সে দেখল, হাসি মুখে দুই হাত বাড়িয়ে কর্নেল বার্থা কিরচারের দিকে এগিয়ে গেল। টারজন তো অবাক। একটি জার্মান গুপ্তচরের সঙ্গে এত মাখামাখি কেন? দূর থেকে তাদের কথাবার্তা কানে না এলেও সে বুঝতে পারল, দু'জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব।

বার্থা কিরচার বিমানে ওঠার আগে টারজনের সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি। স্মিথ-ওল্ডউইকের সঙ্গেও সেখানেই দেখা হল। যথারীতি বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সে তাকে বার বার ধন্যবাদ দিল। ছোট হতে হতে তাদের বিমান পূর্ব দিগন্তের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মালপত্র কাঁধে ফেলে অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে টমিরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেল ক্যাপেলও স্থির করেছে তাদের সঙ্গেই যাবে। টারজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলল, তুমিও আমাদের সঙ্গে গেলে খুব খুশি হতাম গ্রেস্টোক। আমার কথায় মন না গললেও হয়তো স্মিথ-ওল্ডউইক ও তরুণীটির কথা তুমি রাখবে। তারা আমাকে বার বার তোমাকে সভ্যজগতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলে গেছে।

টারজন বলল, না, আমি আমার পথেই যাব। মিস্ কিরচার ও লেফ্টেন্যান্ট স্মিথ-ওল্ডউইক আমার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতই আমার ভালর জন্যে ওকথা বলেছে।

মিস্ কিরচার? ক্যাপেলের বিস্মিত প্রশ্ন। পরক্ষণেই হেসে উঠে সে বলল, তাহলে তুমি তাকে জার্মান গুপ্তচর বার্থা কিরচার বলেই জান?

টারজন এক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, হ্যাঁ, আমি জানি সে বার্থা কিরচার—একজন জার্মান গুপ্তচর।

বাস্—শুধু এইটুকুই জান? ক্যাপেলের প্রশ্ন।

হ্যাঁ—এইটুকুই, টারজনের উত্তর।

তিনি হচ্ছেন মাননীয়া প্যাট্রিসিয়া ক্যান্বি; পূর্ব আফ্রিকা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের একজন মূল্যবান কর্মী। ওর বাবা ও আমি ভারতবর্ষে একসঙ্গে কাজ করেছি। জন্মের পর থেকেই ওকে আমি চিনি। আরে! এই তো দেখ একবাণ্ডিল কাগজপত্র যা সে জনৈক জার্মান অফিসারের কাছ

থেকে হাতিয়ে নিয়েছিল আর অনেক বিপর্যয়ের মধ্যেও হাতছাড়া করেনি—এমনি অবিচল তার কর্তব্যবোধ। এগুলো ভাল করে দেখার মত সময় এখনও পাইনি, কিন্তু এর মধ্যে আছে একখানি সামরিক মানচিত্র, একবাণ্ডিল প্রতিবেদন, আর কে এক হাউটম্যান ফ্রিজ স্নাইডারের দিনপঞ্জী।

চাপা গলায় টারজন বলল, হাউটম্যান ফ্রিজ স্নাইডারের দিনপঞ্জী! একবার ওটা দেখতে পারি ক্যাপেল? সেই তো লেডি গ্রেস্টোককে খুন করেছে।

ক্যাপেল বিনা বাক্যব্যয়ে একটা ছোট বই টারজনের হাতে দিল। খুব দ্রুত পাতা উল্টে টারজন একটা বিশেষ তারিখ খুঁজতে লাগল—যে তারিখে ঘটেছিল একটি ভয়ংকর ঘটনা। সেই তারিখটা পেয়েই পড়তে শুরু করে দিল। হঠাৎ অবিশ্বাসের একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল তার ঠোঁট থেকে। ক্যাপেল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

টারজন বলে উঠল, ঈশ্বর! এ কি সত্যি? শোন। ঠাসাঠাসি লেখা একটা পাতা থেকে সে পড়তে লাগল :

ইংরেজ শুয়োরটার সঙ্গে একটু মস্করা করা গেল। বাড়ি ফিরে স্ত্রীর শোবার ঘরে তার অগ্নিদগ্ধ দেহটাই সে দেখতে পাবে—কিন্তু তাকে সে স্ত্রী বলেই ভুল করবে। আসলে একটা নিগ্রো রমণীর মৃতদেহকে পুড়িয়ে ভন গস্ তার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিল লেডি গ্রেস্টোকের আংটি—জার্মান হাই কম্যাণ্ডের কাছে মৃত অপেক্ষা জীবিত লেডি জি-র মূল্য অনেক বেশী।

সে বেঁচে আছে? টারজন চীৎকার করে বলল।

ক্যাপেল বলল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এখন তুমি কি করবে?

অবশ্যই তোমার সঙ্গে ফিরে যাব। মিস্ ক্যান্বির প্রতি কী অবিচারই না করেছি! কিন্তু আমি জানব কেমন করে? স্মিথ-ওল্ডউইক তাকে ভালবাসে। তাকেও তো আমি বলেছি যে সে একটি জার্মান গুপ্তচর। স্ত্রীর খোঁজে আমাকে তো ফিরে যেতেই হবে। মিস্ ক্যান্বির প্রতি এই অবিচারের প্রতিকারও আমাকে করতেই হবে।

ক্যাপেল বলল, ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। মিস্ ক্যান্বি নিশ্চয় তার প্রেমিককে বোঝাতে পেরেছে যে সে শত্রুর গুপ্তচর নয়, কারণ আজ সকালে আকাশে উড়বার আগে স্মিথ-ওল্ডউইক আমাকে বলে গেছে, মেয়েটি তাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে।

টারজন ও সোনালী সিংহ

টারজন এ্যাণ্ড দি গোল্ডেন লায়ন

বাংলো বাড়িতে ফেরার পথে টারজন, তার স্ত্রী জেন আর তাব ছেলে কোরাক বনপথে দেখল একটা মরা সিংহীর পাশে তার একটা জীবন্ত বাচ্চা ঘুমিয়ে আছে।

হাত বাড়িয়ে প্রথমে বাচ্চাটাকে ধরতে যেতেই সে গর্জন করে মুখটা সবিয়ে নিল। তার হাতটা আঁচড়ে দিতে গেল।

জেন বলল, অনাথা বেচারী, কিন্তু কি সাহস!

কোরাক বলল, এখনো ওর চার পাঁচ মাস মার দুধ দরকার। ওকে আর বাঁচানো যাবে না।

টারজন বলল, ওকে মরতে দেওয়া হবে না।

জেন বলল, তুমি তাহলে ওকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে লালন পালন করবে?

টারজন বলল, হ্যাঁ, তাই করব।

এই বলে সে বাচ্চাটার ঘাড়ে ধরে তার গায়ে হাত বুলিয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি বলতেই বাচ্চাটা চুপ করে রইল শান্ত হয়ে। তাকে বুকে তুলে নিল।

জেন আশ্চর্য হয়ে বলল, কি করে সম্ভব হলো এটা?

টারজন বলল, সভ্য জগতের মানুষরা এসব বুঝতে পারে না। বনেই আমার জন্ম।

টারজন সিংহশাবকটাকে সঙ্গে নিয়ে দুধের খোঁজে একটা আদিবাসী গাঁয়ে গেল।

সর্দার বলল, তার অনেক ছাগল আছে। ছাগলের দুধ এনে দেবে।

এমন সময় টারজনের চোখে পড়ল একটা মাদী কুকুর শুয়ে আছে। তার সম্প্রতি বাচ্চা হয়েছিল। কিন্তু বাচ্চাগুলো মারা যাওয়ায় তার দুধের বাঁটগুলো দুধে ভর্তি। টারজন দেখল ঐ কুকুরটার দুধ সিংহের বাচ্চাটাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে পারলে আর ভাবনা থাকবে না।

টারজন বলল, কুকুরটাকে আমি কিনে নিয়ে যাব।

সর্দার বলল, কিনতে হবে না মালিক। ওকে আপনি নিয়ে যান। দরকার হলে আরো কুকুর নিয়ে যান।

সে রাতটা আদিবাসীদের গাঁয়েই কাটাল টারজনরা।

পরদিন সকাল হলেই বাংলোবাড়ির দিকে রওনা হলো ওরা। বাংলোটা আর ওয়াজিরি বস্তীটা আর বেশী দূরের পথ নয়।

টারজন, জেন আর কোরাক বন পার হয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটায় এসে দেখল তাদের বাংলো বাড়িটা ঠিকই চারপাশের গাছপালা আর ওয়াজিরিদের বস্তীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। টারজন ভেবেছিল জার্মানদের দ্বারা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বাড়িটা।

টারজনরা বাংলোটার কাছে যেতেই ওয়াজিরি সর্দার বুড়ো মুভিরো এগিয়ে এসে প্রথমে অভ্যর্থনা জানাল তাদের।

টারজনদের আসার খবর পেয়ে বিশ্বস্ত ওয়াজিরিরা ছুটে এসে তাদের ঘিরে আনন্দে নাচতে লাগল।

এদিকে দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগল সিংহশাবক জাদ-বাল-জা। টারজন তাকে এরই মধ্যে অনেককিছু শিখিয়েছে। টারজনের কথামত তার সঙ্গে চলাফেরা করে, কোন জিনিস হারিয়ে গেলে গন্ধসূত্র ধরে খুঁজে বার করে আনতে পারে। কোন জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

সিংহের বাচ্চাটাকে খাওয়াবার জন্য এক অদ্ভুত পদ্ধতি অবলম্বন করে টারজন। একটা মানুষের ডামি বা প্রতিমূর্তি করে তার গলায় মাংস বেঁধে দিত খাবার সময়। ডামিটার গলায় মাংস বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত। তারপর টারজন তাকে মাংস খাবার হুকুম দিতেই সিংহবাচ্চাটা লাফ দিয়ে ডামিটার গলা থেকে মাংস ছিনিয়ে নিত।

সেদিন বিকালে টারজন জেন আর কোরাককে সঙ্গে নিয়ে বাংলো থেকে কিছুদূরে জঙ্গলের মধ্যে এমন একটা জায়গায় গিয়ে উঠল যেখানে হরিণ পাওয়া যায়। তাদের সঙ্গে চারজন নিগ্রো শিকারীও ছিল। কোরাক একশো পাউণ্ড বাজী রেখেছিল। সিংহশাবকটা যদি কাছে মাংস থাকা সত্ত্বেও টারজনের কথা মত চলে তাহলে সে তার বাবাকে একশো পাউণ্ড দেবে। জাদ-বাল-জা টারজনের ঘোড়ার পিছনে পিছনে বনে আসতে লাগল।

ওরা চুপি চুপি একটা ঝোপের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একদল হরিণ চরে বেড়াচ্ছিল। এদিক থেকে সিংহবাচ্চা জাদ-বাল-জাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। জাদ-বাল-জাকে দেখে হরিণরা দলবেঁধে ছুটে পালাল। শুধু একটা হরিণ পালাতে পারল না। জাদ-বাল-জা তাকে ধরে ফেলল সে পালাবার আগেই।

কোরাক বলল, এবার ওর আসল পরীক্ষা।
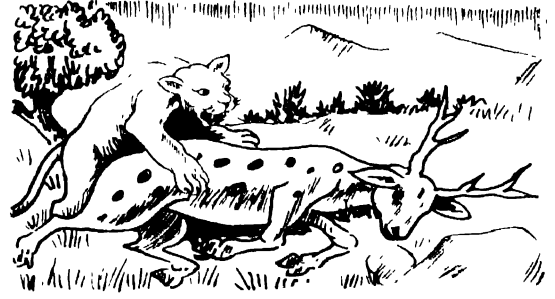
টারজন বলল, ও শিকারকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।

জাদ-বাল-জা প্রথমে মরা হরিণটাকে নিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল। একবাব ক্ষোভে গর্জন করে উঠল। তারপর ঘাড়টা ধরে টারজনের সামনে টেনে আনল মৃতদেহটাকে। টারজন এবার জাদ-বাল-জার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে প্রশংসা করে নিচু গলায় তার কানে কানে কি বলল।

জেন ও কোবাক বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল।

জাদ-বাল-জাব বয়স মাত্র বছর দুই হলেও তখনই সাধারণ সিংহশাবকের থেকে আকারে অনেক বিরাট হয়ে উঠল সে। তার বুদ্ধিও সাধারণ সিংহের থেকে অনেক বেশী হয়ে উঠল। তাকে দেখে একই সঙ্গে গর্ব আর আনন্দবোধ করত টারজন। সে তাকে নিজের হাতে সব কিছু শেখাতে থাকে।

এক বছর পর্যন্ত জাদ-বাল-জা টাবজনের বাংলো বাড়িতে ছাড়া অবস্থায় সর্বত্র ঘুরে বেড়াত। টারজনের বিছানার নিচে এক জায়গায় শুত। কিন্তু তার বয়স এক বছর পূর্ণ হতেই একটা বড় খাঁচার ভিতর তাকে রাখার ব্যবস্থা করল টারজন। মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে শিকার করতে যেত সে জঙ্গলে।

এমন সময় টারজন খবর পেল তার জমিদারীর পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকে একদল লুণ্ঠনকারী অনেক আদিবাসী অধ্যুষিত গাঁ আক্রমণ করে হাতির দাঁত লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে এবং আদিবাসীদের উপর

পীড়ন চালাচ্ছে। শেখ আমুর বেন খাতুরের পর থেকে এই ধরনের ঘটনা আর ঘটেনি।

কথাটা শুনে টারজন রেগে গেলেও একমাস কেটে গেল এবং এর মধ্যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার কথা শোনেনি।

এদিকে জার্মান আক্রমণের ফলে টারজনের অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়। বাংলো মেরামত আর ওয়াজিরি বস্তীর উন্নয়নের জন্য অনেক টাকা খরচ হয়। অনেক ফসল ও মজুত শস্য নষ্ট হয়। তাই বাংলোতে ফিরে আসার পর থেকে অর্থাভাব দেখা দেয় টারজনের সংসারে।

একদিন রাত্রিতে টারজন জেনকে বলল, আমার মনে হচ্ছে আবার আমাকে একবার ওপার নগরীতে যেতে হবে।

জেন বলল, আমার কিন্তু ভয় লাগছে। তুমি দুবার গিয়ে কোনরকমে ফিরে এসেছ। তৃতীয়বার গেলে কোন বিপদ ঘটতে পারে। এমন কিছু অভাব হয়নি আমাদের। আমাদের এখনো যা আছে তাতে আমাদের খাওয়া পবার কোন অভাব হবে না।

টারজন বলল, এর আগের বারে ওয়ারপার আমার পিছু নিয়েছিল। তাছাড়া ভূমিকম্পের ফলে আটকে পড়ি আমি। এবার এ ধরনের কোন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নেই।

জেন বলল, তাহলে কোরাক বা জাদ-বাল-জাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

টারজন বলল, না, ওরা থাক। কোরাক বাংলোর নিরাপত্তা রক্ষা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে বিপদ ঘটতে পারে। জাদ-বাল-জাকে সঙ্গে করে সে শিকার করে নিয়ে আসবে। তাছাড়া আমি বেশীর ভাগ পথ দিনের বেলায় হাঁটব। কিন্তু সিংহটা রোদে গরমে মোটেই হাঁটতে পারবে না। আমার সঙ্গে যাবে পঞ্চাশজন ওয়াজিরি যোদ্ধার একটা দল।

কিছুদিনের মধ্যে বাংলো থেকে ওপার নগরীর পথে রওনা হয়ে পড়ল টারজন।

টারজনের বাংলো থেকে ওপার নগরী পঁচিশ দিনের পথ। টারজন একা হলে সে গাছে গাছে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারত। কিন্তু ওয়াজিরি যোদ্ধারা বেশী দ্রুত পথ চলতে না পারায় দেরী হচ্ছিল টারজনের। প্রতিদিন রাত্রি হলেই পথের ধারে লতাপাতা ডালপালা দিয়ে একটা করে শিবির তৈরী করত।

একদিন টারজন শরাহত এক হরিণকে দেখে ছুটে গেল তার দিকে। মরা হরিণটার পাশে একটা পায়ের ছাপ দেখতে পেল টারজন। সেটা পরীক্ষা করে শুঁকে দেখল ছাপটা কোন শ্বেতাঙ্গের পায়ের।

ওয়াজিরিরা তখন শিবিরে তার জন্য অপেক্ষা করছে ভেবে মরা হরিণটা কাঁধে করে শিবিরে ফিরে গেল টারজন। পরদিন সকালে আবার রওনা হলো ওরা ওপারের পথে। টারজন ওয়াজিরিদের এগিয়ে যেতে বলে অদৃশ্য শিকারীর পায়ের ছাপ অনুসরণ করে তার খোঁজ করতে লাগল।

পথে একদল বাঁদর-গোরিলার সঙ্গে দেখা হলো। তারা টারজনকে বলল, গতকাল তুমি আমাদের গোরিলাযুবক গোবুকে বধ করেছ। তুমি চলে যাও, তা না হলে আমরা তোমাকে হত্যা করব।

টারজন বলল, আমি তোমাদের গোবুকে হত্যা করিনি।

সে বুঝল যার পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছে সেই শ্বেতাঙ্গই হয়ত গোবুকে বধ করেছে। তাই ওরা ভুল করে শ্বেতাঙ্গ টারজনকে গোবুর হত্যাকারী ভাবছে।

ওপার নগরীর কথা আর তার মূল উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়ে সেই হত্যাকারী শ্বেতাঙ্গের খোঁজ করে যেতে লাগল। এইভাবে ওপার নগরীর উপত্যকার এধারে পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে হাজির হলো টারজন। সেখানে গিয়ে কতকগুলো পায়ের ছাপ দেখতে পেল।

টারজন পরীক্ষা করে দেখল সে ছাপগুলো কতকগুলো কৃষ্ণকায় নিগ্রো আর কতকগুলো শ্বেতাঙ্গের। তাদের মধ্যে একজন নারীও আছে। দলটাকে ধরার জন্য এগিয়ে যেতে লাগল টারজন।

কিছুদূর গিয়ে একটা শিবির দেখতে পেল সে।

টারজন বাংলো থেকে চলে গেলে কোরাকরা নির্বিঘ্নেই দিন কাটাচ্ছিল।

এইভাবে এক সপ্তাহ কেটে যাবার পর একদিন নাইরোবি থেকে এক পিওন একখানা টেলিগ্রাম নিয়ে এল। তাতে জানা গেল লণ্ডনে জেনের বাবার দারুণ অসুখ; জেনকে সেখানে যেতে হবে। ঠিক হলো জেন সেইদিনই রওনা হবে লণ্ডনের পথে। কোরাক তাকে নাইরোবিতে দিয়ে আসবে। সেখান থেকে সে লণ্ডনগামী জাহাজে চাপবে।

কোরাক আর জেন দুজনেই যখন বাড়িতে ছিল না তখন একদিন বাড়ির এক নিগ্রোভৃত্য জাদ-বাল-জার খাঁচা পরিষ্কার করার সময় অসাবধানতাবশতঃ খাঁচার দরজাটা খোলা রেখেছিল। এই অবসরে জাদ-বাল-জা বনে পালিয়ে যায়।

এদিকে সেই রাত্রিতে অচেনা বিদেশীদের খোঁজে

এগিয়ে যেতে যেতে একটা অস্থায়ী শিবিরের সামনে এসে পড়ল টারজন। শিবিরের সামনে একটা গাছের উপর উঠে পাতার আড়াল থেকে শিবিরের লোকজনদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। দেখল শিবিরে মোট চারজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আছে আর একটি ঘরে একজন মহিলা আছে বলে মনে হলো। শ্বেতাঙ্গ চারজনের মধ্যে দুজন ইংরেজ, একজন জার্মান, একজন রুশদেশীয়।

টারজন দেখল শিবিরের কাছে একটা সিংহের গর্জন শুনে ব্লুবার নামে জার্মান লোকটা ভয়ে উল্টে পড়ে গেল।

এমন সময় টারজন গাছ থেকে নেমে শিবিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শিবিরের সামনে যে আগুন জ্বলছিল তার আভায় টারজনের গোটা দৈত্যাকার চেহারাটা প্রকট হয়ে উঠল সকলের কাছে। একটা তাঁবুর ঘরের মধ্যে ফ্লোরা কার্লের সঙ্গে কথা বলছিল। সে ঘরের ভিতর থেকে টারজনকে দেখেই চিনতে পারল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে গেল ফ্লোরা, কারণ সে টারজনের লণ্ডনের বাড়িতে বেশ কিছুদিন কাজ করেছে এর আগে। তার কাছ থেকে ভাল ব্যবহারও পেয়েছে। টারজন আর জেনের মধ্যে ওপার নগরীর ধনরত্ন নিয়ে যে সব কথাবার্তা হত তা শুনেই উচ্চাভিলাষ জাগে তার মনে। সে তখন একটা দলের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে ওপার নগরীতে গিয়ে সেই ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করে।

ফ্লোরা গোপনে কার্লকে বলল, আমাদের পথে এখন একমাত্র বাধা হলো এই টারজন। ও যেন আমাদের আসল উদ্দেশ্যের কথা কখনই জানতে না পারে। আমিও ওকে দেখা দেব না। ওকে এখন হত্যা করাও যাবে না। কারণ ওর বিশ্বস্ত ওয়াজিরি আদিবাসীরা তাহলে আমাদের মেরে ফেলবে। তার থেকে এক কাপ কফির সঙ্গে কিছু বিষ মিশিয়ে ওকে অচেতন করে ফেলে রেখে আমাদের পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো।

টারজন শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের প্রশ্ন করল, কে তোমরা? আমার বিনা অনুমতিতে আমাব বনরাজ্যে প্রবেশ করে কি করছ? আমি হচ্ছি এ বনের রাজা টারজন।

এস্তেবানের চেহারাটা অনেকটা টারজনের মত দেখতে। সে তখন বাইরে কোথায় গিয়েছিল। তাই ওরা হঠাৎ টারজনকে দেখে ভাবল এস্তেবান টারজন সেজে এসে ভয় দেখাচ্ছে তাদের। কিন্তু ফ্লোরার কথায় ভিতর থেকে কার্ল এসে সরাসরি টারজনের কথার উত্তরে বলল, আসুন আসুন, আমরা সত্যিই ভাগ্যবান যে আপনার দর্শন পেলাম এবং নিজে থেকে এসে দেখা দিলেন আপনি। আপনার নাম আমরা শুনেছি, কিন্তু দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আমরা পথ হারিয়ে কষ্ট পাচ্ছি এখানে। আপনি যদি পথটা আমাদের দেখিয়ে দেন ত ভাল হয়। এখন একটু দয়া করে বসুন, এক কাপ কফি খান।

এদিকে কফি তৈরী করার সময় টারজনের কফিব কাপে ওষুধ ঢেলে দিল কার্ল, টারজন তার কিছুই জানতে পারল না।

টারজন যখন শিবিরে কফি খাচ্ছিল তখন ওপার নগরীর বাইরেকার পাঁচিলের সবচেয়ে উঁচু জায়গাটার উপর দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল একটা লোক। লোকটা বেঁটে এবং বিকৃত ধরনের। তার মাথায় জটা আর মুখে দাড়ি ছিল। গায়ে ছিল বাঁদরদের মত লোম। তার চোখদুটো ছিল ছোট ছোট, দাঁতগুলো বড় বড় আব পাদুখানা বাঁকা বাঁকা।

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত কাদিজ তখন মন্দিরের পাশে একটা পুরনো গাছের তলায় বসেছিল। তার সঙ্গে ছিল বারোজন তার অধীনস্থ পুরোহিত।

পাহারাদার সোজা কাদিজের সামনে গিয়ে বলল, অচেনা একদল বিদেশী ওপার নগরীর দিকে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে আসছে।

তখন কাদিজ তার দলের পুরোহিতদের নিয়ে মন্দিরসংলগ্ন বাগান থেকে নগরপ্রাচীরের দিকে চলে গেল। পাঁচিলের উপর থেকে দেখল সত্যিই একদল লোক এগিয়ে আসছে। দলটা তখন অনেকটা এগিয়ে এসেছে এবং তাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

একজন পুরোহিত প্রধান পুরোহিতকে বলল, সেই টার্মাঙ্গানী যে নিজেকে টারজন বলে পরিচয় দেয়। দলের বাকি সবাই কৃষ্ণকায় নিগ্রো।

কাদিজ বলল, তুমি ঠিক বলছ? টারজন আসছে?

অন্য একজন পুরোহিত বলল, হ্যাঁ, টারজনই বটে।

টারজনকে চিনতে পারাব সঙ্গে সঙ্গে কাদিজ চীৎকার করে উঠল, ওকে ঢুকতে দিও না। ওকে ঢুকতে দিও না। যাও, এখনি একশোজন যোদ্ধা নিয়ে এস। ওদের সবাইকে মেরে ফেলব নগর-প্রাচীরে ঢোকার আগেই।

একজন পুরোহিত বলল, কিন্তু কাদিজ, প্রধানা পুরোহিত লা ত টারজনকে আসতে বলেছিল। কাবণ টারজন তাকে হাতির কবল থেকে বাঁচিয়েছিল। ও তাই টারজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল।

কাদিজ তাকে ধমক দিয়ে বলল, চুপ করো। ওদেব ওপারে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ওদের আমি হত্যা করব। যে আমার বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে বা আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেবার কথা বলবে তাকে আমি নিজের হাতে খুন করব।

এদিকে পাঁচিল পার হয়ে নগরসীমানার বাইরে টারজনের বা তার দলেব কোন চিহ্ন দেখতে পেল না কাদিজ। তখন সকাল হয়ে গেছে। সে ক্রমাগত উপত্যকার উপর দিয়ে টারজনেব সন্ধানে হেঁটে যেতে লাগল। এইভাবে অনেকটা দূর যাওয়ার পর ডালপালার এক পরিত্যক্ত শিবির দেখতে পেল কাদিজ।

শিবিরটা পরিত্যক্ত হলেও ভিতরটায় ঢুকে খোঁজ করতে লাগল কাদিজ। একসময় তার এক যোদ্ধা টারজনের অচেতন দেহটাকে পড়ে থাকতে দেখে চীৎকার করে উঠল।

পুরোহিত ছুটে গিয়ে টারজনের বুকের উপর কান পেতে দেখে বলল, না মরেনি, বেঁচে আছে।

কাদিজ তখন বলল, ওর হাত পা বেঁধে ফেল। যে ব্যক্তি একদিন বেদী থেকে পালিয়ে এসে সূর্যদেবতার বেদীকে কলুষিত করেছে আজ তাং উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য সূর্যদেবতাই তাকে তুলে দিয়েছেন আমাদের হাতে। ওকে টেনে রোদের আলোয় নিয়ে এস। সূর্যদেবতা চোখ মেলে তাকিয়ে ওকে দেখুন।

এই কথা বলে সে তার কোমর থেকে ছুরিটা খুলে সূর্যের দিকে মুখ তুলে টারজনকে বলি দেবার জন্য উদ্যত হলো।

পুরোহিতদের মধ্যে একজন কাদিজের এই কাজেব প্রতিবাদ করে বলল, কাদিজ, তুমি বলি দেবার কে? এ কাজ হলো প্রধানা পুরোহিত লা-এর। আমাদের রাণী লা-ই একমাত্র সূর্যদেবতাব কাছে কাউকে বলি দিতে পারে।

কাদিজ তাকে ধমক দিয়ে বলল, চুপ করো ডুথ। আমি হচ্ছি প্রধানা পুরোহিত লা-এর স্বামী। আমার কথাই হলো আইন। যদি বাঁচতে চাও ত আমার উপব কোন কথা বলবে না।

ডুথ বেগে গিয়ে বলল, তুমি যদি লা এবং সূর্যদেবতাকে রুষ্ট কবে তোল তাহলে তোমাকেও অন্যদেব মত শাস্তি পেতে হবে।

কাদিজ বলল, সূর্যদেবতা আমাকে বলেছে মন্দির অপবিত্র করার অপরাধে একে বলি দিতে হবে আমাকে।

এই বলে সে টারজনের পাশে নতজানু হয়ে বসে তার বুকটা লক্ষ্য করে ছুরিটা ধরল।

এমন সময় একটা বড় মেঘ এসে আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্যটাকে ঢেকে দিল। কাদিজের মনে হঠাৎ সন্দেহ দেখা দিল। তবে কি সূর্যদেবতা তার এই কাজ সমর্থন করছেন না? তাই ভয় পেয়ে ছুরিটা টারজনের বুকে বসাতে গিয়েও বসাল না।
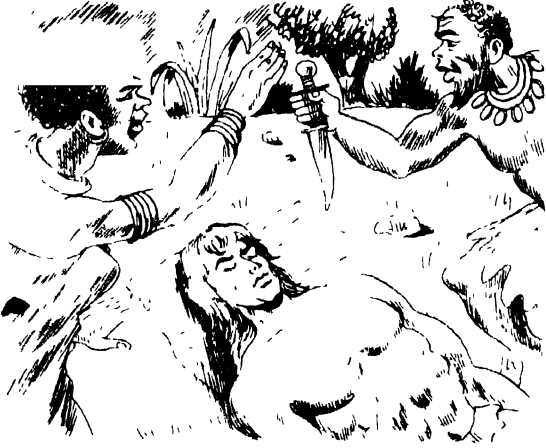
উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেঘটা না কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল। ভাবল আবার সূর্য দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে বলির কাজটা সেরে ফেলবে।

কাদিজ যখন দেখল মেঘটা কেটে আসছে এবং মেঘের প্রান্ত থেকে সূর্য এখনি বেরিয়ে আসবে তখনি সে আবার বসে ছুরিটা উপরে তুলে ধরল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে নারীকণ্ঠে কে তার নাম ধরে ডাকল, কাদিজ।

মুখ ঘুরিয়ে কাদিজ দেখল, ওপারের প্রধানা পুরোহিত লা তার পিছনে দাঁড়িয়ে আর তার পিছনে ডুথ আর বারো তেরোজন পুরোহিত তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

লা বলল, এর মানে কি কাদিজ?

কাদিজ বলল, সূর্যদেবতা এই নাস্তিক অধর্মাচারীর জীবন নিতে চাইছে।

লা ক্রুদ্ধভাবে বলল, মিথ্যা কথা। সূর্যদেবতার কিছু বলার থাকলে তা তাঁর প্রধানা পুরোহিতের মাধ্যমেই বলবেন। মনে রাখবে অতীতে এই ধরনের ঔদ্ধত্যের জন্য অনেক প্রধান পুরোহিতকে মন্দিরের বেদীতে বলি দেওয়া হয়েছে।

কাদিজ এবার নীরবে খাপের মধ্যে ছুরিটা ঢুকিয়ে রেখে ডুথের দিকে একবার ক্রুদ্ধভাবে তাকিয়ে চলে গেল সেখান থেকে। সে বুঝল ডুথই ছুটে গিয়ে লাকে খবর দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু লা এবার মুস্কিলে পড়ল। সে তার পদাধিকারবলে কাদিজের হাত থেকে বাঁচাল টারজনকে কিন্তু অন্য সব পুরোহিতদের ইচ্ছা সে নিজের হাতে টারজনকে বলি দেয়। এর আগে সে টারজনকে বেদী থেকে দু-দুবার ছেড়ে দিয়েছে।

অথচ টারজনকে সে কিছুতেই বলি দিতে পারবে না নিজের হাতে। এই টারজনই তাকে দু-দুবার সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে।

লা তার লোকদের হুকুম দিল, একটা পাল্কি এনে টারজনকে ওপারের মন্দিরে নিয়ে চল।

টারজনের যখন জ্ঞান ফিরল সে দেখল তখন রাত্রিকাল। একটা অন্ধকার ঘরে সে মেঝের উপর শুয়ে আছে। পরে সে হাত দিয়ে মেঝেটাকে পরীক্ষা করে ও গন্ধ শুঁকে বুঝল সে ওপারের মন্দিরের নিচের তলায় একটা ঘরে আছে।

এদিকে টারজন যে ঘরে ছিল সেই ঘরেরই উপরতলায় একটা ঘরে প্রধানা পূজারিণী লা ছটফট করছিল তার বিছানায়। যে তার জীবনের সবচেয়ে প্রিয়জন, যে তার একমাত্র ভালবাসার বস্তু তাকে নিজের হাতে কিভাবে বলি দেবে তা বুঝে উঠতে পারল না সে।

রাত্রি তখন গভীর। হঠাৎ একজন পূজারিণী এসে লাকে বলল, ডুথ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

ডুথকে ডেকে পাঠিয়ে তার কথা শুনতে চাইল লা। ডুথ বলল, কাদিজ আপনার বিরুদ্ধে ওয়া নামে এক পূজারিণী ও কয়েকজন পুরোহিতের সঙ্গে চক্রান্ত করছে। ওরা চারদিকে চর পাঠিয়ে লক্ষ্য রাখছে আপনি টারজনকে মুক্তি দান করছেন কি না। আপনি কোনভাবে টারজনকে মুক্তি দিলেই ওরা আপনার জীবন নাশ করবে। তখন ওয়া প্রধানা পূজারিণীর পদ পাবে এবং কাদিজের সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

এদিকে একজন পুরোহিত কাদিজকে একটা

পরামর্শ দিল। বলল, আমরা যাকে পাঠিয়েছিলাম লার কাছে তার কথা শোনেনি লা। এখন আমাদের একজন লোককে পাঠাও টারজনের কাছে। সে বলবে আমি লা'র কাছ থেকে আসছি। আমি তোমাকে তার নির্দেশমত ওপারনগরীর বাইরে দিয়ে আসব। সেখান থেকে তুমি তোমার গন্তব্যস্থলে চলে যাবে। তারপর টারজনকে নিয়ে লোকটা গুপ্ত পথে বেরিয়ে যেতে গেলেই আমাদের প্রহরীরা তাদের ধরে ফেলবে। তখন আমরা গোপনে হত্যা করব টারজনকে। তারপর লা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলব লা-ই নিশ্চয় বন্দীকে ছেড়ে দিয়েছে এবং এটা সম্পূর্ণ অধর্মাচরণ। ফলে তাকেও বলি দেওয়া হবে।

কাদিজ বলল, তাহলে আগামী কাল সূর্য অস্ত যাবার আগেই ওয়া প্রধানা পূজারিণীর আসনে বসবে।

সে রাতে হঠাৎ কার স্পর্শে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল টারজনের। সে বুঝল কোন এক অদৃশ্য নারীর হাত তার দেহটাকে স্পর্শ করে তাকে ঘুম থেকে জাগাচ্ছে। সে জেগে উঠতেই নারীটি বলল, এখনি আমার সঙ্গে এস। তোমার জীবন বিপন্ন।

টারজন জিজ্ঞাসা করল, কে পাঠিয়েছে তোমায় ?

নারীকণ্ঠ উত্তর দিল, লা আমায় পাঠিয়েছে তোমাকে ওপার নগরীর বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়ার জন্য।

আর কালবিলম্ব না করে সেই নারীর পিছু পিছু বেরিয়ে পড়ল টারজন। ওরা এগিয়ে চলল ওপার নগরীর পিছনের দিকের এক গোপন সুড়ঙ্গপথ ধরে। সারারাত ওরা একটানা পথ চলার পর ভোরবেলায় নগরসীমানার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছল।

এবার সেই নারীর দিকে তাকিয়ে টারজন আশ্চর্য হয়ে গেল। দেখল তার সামনে লা নিজে দাঁড়িয়ে আছে।

টারজন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল, লা তুমি !

লা বলল, ওপারে ফিরে যাবার আর কোন পথ নেই আমার।

টারজন বলল, নগরসীমানা যেখানে শেষ হয়েছে তার পর থেকেই শুরু হয়েছে অন্তহীন এক বিরাট জঙ্গল। এ পথের কোথায় কি আছে তার ত কিছুই জান না তুমি। অথচ এ ছাড়া ত এখান থেকে বেরিয়ে যাবার অন্য পথ নেই আমাদের।

লা বলল, শুনেছি এই বনটাতে অনেক বড় বড় বাঁদর গোরিলা আর সিংহ আছে। তুমি কি এই পথেই যাবে বলে মনে করছ ?

টারজন বলল, মরতে ত একদিন হবেই। তবে বৃথা ভয় করে কি হবে বলতে পার। তার থেকে চল, এই বনের ভিতর দিয়েই এগিয়ে যাব আমরা।

এই বলে লাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল টারজন। তারপর একটা গাছের উপর বাঁদরের মত উঠে পড়ে গাছে গাছেই এগিয়ে চলল। টারজনের গায়ের শক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল লা।

গাছের উপর থেকে লা দেখল অদূরে বনের ধারে কতকগুলো কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কুঁড়েগুলো অদ্ভুত ধরনের। কুঁড়েগুলো একই মাপের—অর্থাৎ সাত ফুট করে চওড়া আর ছয় ফুট করে উঁচু। কিন্তু কুঁড়েগুলো মাটির উপরে ছিল না; এক একটা গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় শূন্যে দোতলার মত ঝুলছিল মাটি থেকে ঠিক তিন ফুট উপরে।

কুঁড়েগুলোর গায়ে কোন দবজা দেখা গেল না ; তবে হাওয়া ও আলো ঢোকার জন্য তিন চার ইঞ্চির একটা কবে ফাঁক ছিল।

সহসা সমস্ত বনভূমি কাঁপিয়ে গর্জন করতে করতে একটা গোরিলা এসে গাঁয়েব ফটকেব সামনে দাঁড়াল।

বোলগানি বা গোবিলাটা গাঁয়েব ভিতবে ঢুকেই একজন গ্রামবাসীকে বলল, তোমাদেব মেয়ে ও শিশুবা কোথায়? ডাক তাদের। নিয়ে এসো তাদের এখানে।

একজন গ্রামবাসী সাহস করে কোনরকমে ক্ষীণ প্রতিবাদেব স্বরে বলল, কিন্তু আমবা ত একপক্ষ-কালেব মধ্যেই একজন নারীকে তোমাব হাতে তুলে দিয়েছি। এখন অন্য গাঁয়েব পালা।

কিন্তু বোলগানি এ কথায় বেগে গিয়ে বলল, থাম, থাম। আমাদের সম্রাট নুমার নামে দাবি জানাচ্ছি। আমার হুকুম তামিল কবো অথবা মবো।

আব কোন কথা না বাড়িয়ে গ্রামবাসীবা নাবী ও শিশুদের ডাকতে লাগল। কিন্তু কুঁড়ে থেকে কেউ বার হলো না। অবশেষে গাঁয়ের যোদ্ধারা গুপ্তস্থান থেকে মেয়েদের ধবে নিয়ে এল। মেয়েবা ভয়ে কাঁপতে লাগল।

একজন গ্রামবাসী বলল, হে মহান বোলগানি, তোমাদের সম্রাট নুমা যদি শুধু আমাদের গাঁ থেকেই মেয়ে ধরে নিয়ে যায় তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের গাঁয়ে যোদ্ধাদেব জন্য আর কোন মেয়ে থাকবে না। তার ফলে শিশুও উৎপন্ন হবে না।

গোরিলাটা বলল, তাতে কি হয়েছে। সারা জগতে অনেক গোমাঙ্গানী বা কৃষ্ণকায় লোক বেড়ে গেছে। তোমাদের কাজই ত হলো আমাদের সম্রাট নুমার সেবা করা।

এই কথা বলতে বলতে গোবিলাটা মেয়েগুলোর গায়ে আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে কি দেখতে লাগল। অবশেষে সে একটি মেয়েকে বাছাই করল। মেয়েটাব কোমরে একটা শিশু বাঁধা ছিল।

গোরিলাটা বলল, আজ এই মেয়েটা হলেই চলবে।

এই বলে সে মেয়েটাব কোল থেকে ছেলেটাকে টান মেবে নিয়ে মাটিব উপব ছুঁড়ে ফেলে দিল। যুবতী মেয়েটি তখন তার ছেলেটাকে মাটি থেকে কুড়োতে গেলে গোবিলাটা তাব লম্বা ছুটো হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল মেয়েটাকে। আর এমন সময় গাঁয়েব ধাবে একটা গাছেব উপব এক বাঁদর-গোরিলার মত কে ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করে যুদ্ধে আহ্বান জানাল গোবিলাটাকে।

সঙ্গে সঙ্গে গোরিলাটা তার ভয়ঙ্কর মুখ তুলে তাকাল পিছন ফিবে। গ্রামবাসীরাও ভয় পেয়ে গেল। তারা দেখল এক দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গ গাছ থেকে নেমে এগিয়ে আসছে। সহসা সে চোখের নিমেষে তার হাতের বিরাট বর্শাটা সজোরে ছুঁড়ে গোরিলাটার বুকটাকে বিদ্ধ করল। গোরিলাটা তৎক্ষণাৎ পড়ে গিয়েই মারা গেল।

টারজনকে শত্রু ভেবে গ্রামবাসীরা তাদের বর্শা উঁচিয়ে ধরল। টারজন গোরিলাটার বুক থেকে বর্শাটা তুলে নিয়ে বলল, আমি তোমাদের বন্ধু, বর্শা নামাও। কে এই গোরিলা যে তোমাদের গাঁ থেকে

এইভাবে নারী ও শিশুদের ধরে নিয়ে যায় অথচ তোমরা কোন ব্যবস্থা নিতে পার না তার বিরুদ্ধে ?

গ্রামবাসীদের একজন বলল, ও একটা গোরিলা, মুমার প্রেরিত পুরুষ।

টারজন কৌতূহলী হয়ে বলল, কিন্তু মুমা কে ?

গ্রামবাসীরা বলল, মুমা হচ্ছে সম্রাট যে বোলগানিদের সঙ্গে হীরের প্রাসাদে থাকে। সে হচ্ছে রাজার রাজা।

গোরিলাটা টারজনের বর্শার আঘাতে মরে গেলে সেই যুবতী মেয়েটি তার ছেলেকে কুড়িয়ে নিয়ে দেখল ছেলেটা বেঁচে আছে, তার গায়ে শুধু একটু আঘাত লেগেছে। সে যখন দেখল টারজন তার কোন ক্ষতি করতে চাইছে না, তখন সে আশ্বস্ত হলো।

অবশেষে গ্রামবাসীরা বলল, আমরা তোমাকে বধ করব না, তোমার কোন ক্ষতি করব না। আমরা শুধু তোমাকে আমাদের সম্রাট মুমার কাছে নিয়ে যাব।

টারজন বলল, তাহলে তারা ত আমায় খুন করবে।

গ্রামবাসীরা বলল, তাহলে আমরা কিছু করতে পারব না।

টারজন বলল, কিন্তু তারা জানবে কি করে যে এই বোলগানিটা তোমাদের গাঁয়ে মরেছে ? আমি যদি মৃতদেহটা নিয়ে গিয়ে দূর জঙ্গলে ফেলে দিই তাহলে তারা এটা দেখতে পাবে না।

গ্রামবাসীরা বলল, সেটা হতে পারে।

টারজন বলল, আমি বিদেশী। পথ হারিয়ে ফেলেছি। তোমরা আমাকে এই উপত্যকা থেকে বার হবার পথটা দেখিয়ে দেবে যাতে আমি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যেতে পারি। ও পথে কি আছে তা জান তোমরা ?

গ্রামবাসীরা বলল, না, তা ত জানি না, শুধু জানি ঐ পথ দিয়ে বোলগানিরা আমাদের গাঁয়ে আসে।

টারজন বুঝতে পারল এর বেশী খবরাখবর তাদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। সে বলল, আমার একটা কথা শোন। আমার একজন সাথী আছে। আমি তাকে তোমাদের কাছে রেখে ঐ পথে গিয়ে কিছুটা দেখে আসব। আমি কোন্ পথে কোন্ দিকে যাব তা ঠিক করতে পারব তাহলে। আমি না আসা পর্যন্ত আমার সাথী তোমাদের এই গাঁয়েই থাকবে। দেখবে যেন কোন ক্ষতি না হয় তার।

গ্রামবাসীরা বলল, তোমার সাথী কোথায় ?

টারজন বলল, তার জন্য একটা কুঁড়ে ঠিক করে দাও। তাকে আনছি।

এই বলে টারজন যে গাছের উপর লাকে রেখে এসেছিল সেই গাছে গিয়ে লাকে ডেকে নিয়ে এল।

লাকে কথাটা বুঝিয়ে বলল টারজন।

তারপর টারজন গোরিলার মৃতদেহটা অবলীলাক্রমে কাঁধের উপর চাপিয়ে নিয়ে গাঁয়ের ফটক পার হয়ে বনের মধ্যে চলে গেল। কিভাবে টারজন গোরিলার বিরাট ও এত বড় ভারী দেহটা কাঁধের উপর এমন অনায়াসে তুলে নিল তা দেখে অবাক হয়ে গেল গ্রামবাসীরা।

টারজন চলে গেলে লা গ্রামবাসীদের বলল, আমার থাকার জন্য একটা কুঁড়ে ঠিক করে দাও।

ওপারের উত্তর-পূর্ব দিকে বনের ধারে একটা শিবিরে তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে সবেমাত্র। সেখানে

ছয়জন শ্বেতাঙ্গ আর একজন নিগ্রোভৃত্য তখন রাতের খাবার খাচ্ছিল। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে একজন মেয়ে ছিল, তার নাম ফ্লোরা।

ফ্লোরা বলল, আমাদের দলের মধ্যে এ্যাডলফ ব্লুবার আর এস্তেবান অপদার্থ। ব্লুবার কুঁড়ে আর কৃপণ আর এস্তেবানের শুধু বড় বড় কথা আছে।

তাছাড়া ব্লুবার টাকার ভয়ে বেশী কুলি নিয়োগ করতে চায়নি। পঞ্চাশজন লোক আশী পাউণ্ড ওজনের সোনার তালগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাকি কিছু কুলি শিবিরের জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর বাড়তি কুলি একটাও নেই। এরা সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

পরদিন সকালে ওরা একসঙ্গে শিকারে বার হলো। শিকার করতে গিয়ে এস্তেবান দল থেকে অনেকটা দূরে সরে পড়েছিল একা একা।

হঠাৎ পঞ্চাশজন ওয়াজিরির একটা দল এস্তে-বানকে ঘিরে ধরল। তাদের সর্দার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজিতে বলল, ও বাওয়ানা, ও বাওয়ানা, তুমিই বাঁদরদলের টারজন। বনের রাজা' তোমাকে হারিয়ে আমরা কত খুঁজেছি তোমায়। আমরা ভাবলাম তুমি একাই ওপারে গেছ। আমরা তাই সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ওপারে যাচ্ছিলাম।

এস্তেবান প্রথমে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিল পরমুহূর্তে। তার মাথায় একটা কুবুদ্ধি খেলে গেল। সে নিজের পরিচয় গোপন রেখে নিজেকে টারজন বলে স্বীকার করে নিল। তাকে দেখতে অনেকটা টারজনের মত। এজন্য সে নিজেও টারজনের মত বেশভূষা ধারণ করত।

ওয়াজিরি সর্দারের নাম উস্‌লা। এস্তেবান জানত এখন তাদের শিবিরে দুই চারজন নিগ্রোভৃত্য ছাড়া আর কেউ নেই। এই অবসরে সোনাগুলো নিয়ে পালিয়ে আসতে হবে।

শিবিরের কাছে গিয়ে এস্তেবান ওয়াজিরিদের বলল, শিবিরটাকে ঘেরাও করে ফেল।

এরপর এস্তেবান শিবিরের সামনে একা গিয়ে নিগ্রোভৃত্যদের বলল, আমি হচ্ছি টারজন। তোমা-দের শিবির আমার লোকরা ঘিরে ফেলেছে। কোন শব্দ করবে না বা গুলি ছোঁড়ার চেষ্টা করবে না।

এস্তেবান এবার হাত দিয়ে উস্‌লাকে আসার জন্য ইশারা করল। উস্‌লা এসে শিবিরের নিগ্রো-ভৃত্যদের বলল, আমরা হচ্ছি ওয়াজিরি যোদ্ধা, টারজন হচ্ছে আমাদের মালিক। আমরা তোমাদের এই চুরি করা সোনাগুলো উদ্ধার করতে এসেছি। আমরা তোমাদের কিছু করব না যদি তোমরা শান্তি-পূর্ণভাবে আমাদের এই দেশ ছেড়ে চলে যাও।

এস্তেবান নিগ্রোভৃত্যদের বলল, তোমরা চলে যাও, তোমাদের মালিকদের বলবে, দয়া করে টারজন তোমাদের জীবনভিক্ষা দিয়েছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওয়াজিরিরা সব সোনার তালগুলো শিবির থেকে বয়ে নিয়ে গেল।

এদিকে শিকার শেষে ফ্লোরা'রা শিবিরের দিকে এগিয়ে এলেই যেসব নিগ্রোভৃত্যরা শিবিরে পাহারা-রত ছিল তারা ফ্লোরাকে বলল, টারজন এসেছিল তার ওয়াজিরি যোদ্ধাদের নিয়ে। তারা সব সোনা নিয়ে গেছে।

ব্লুবার বলল, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল।

দূর থেকে টারজন প্রাসাদের মত যে একটা বাড়ি

দেখেছিল সেই বাড়িটা লক্ষ্য করে বনের ভিতর দিয়ে যেতে লাগল।

কাছে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে টারজন দেখল বাড়িটা সত্যিই প্রাসাদের মত আর চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির সীমানার মধ্যে কতকগুলো গোরিলা ঘোরাফেরা করছে। কিছু নিগ্রো নগ্নদেহ ক্রীতদাসও কাজ করছে। টারজন একসময় সবার অলক্ষ্যে বাড়িব ফটকের সামনে গোরিলার মৃতদেহটা নামিয়ে দিয়ে এল।

দীর্ঘ সময় গাছের উপর অপেক্ষা করেও টারজন যখন বাড়ির ভিতরে ঢোকার কোন সুযোগ বা অবকাশ পেল না তখন লা-কে যে গাঁয়ে রেখে এসেছিল সেই গাঁয়ে ফিরে গেল। কিন্তু গাঁয়ে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। দেখল গাঁয়ের মধ্যে একটা লোকও নেই। টারজন সারা গাঁটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াল। কিন্তু কোথাও একটা লোককেও দেখতে পেল না।

হঠাৎ দেখল একটা কুঁড়েব পাশে একরাশ কাঠের আড়ালে লুকিয়ে আছে একটা মেয়ে। টারজন তাকে অনেকবার ডাকলেও ভয়ে সে এল না। অবশেষে টারজন তার হাত ধরে টেনে তাকে বার করে নিয়ে এসে বলল, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না, বল, গাঁয়ের লোকেরা আর আমার সাথী কোথায় গেল?

মধ্যবয়সী আদিবাসী মেয়েটি বলল, বোলগানিরা সেই মৃতদেহটা দেখতে পায়। তারা তখন দলবেঁধে এসে গাঁয়ের সব লোককে ধরে নিয়ে গেছে। তোমার সাথীকেও নিয়ে গেছে।

টারজন বলল, তোমার কি মনে হয় ওরা এই গাঁয়ের সবাইকে হত্যা করবে?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ। ওরা কাউকে ক্ষমা করে না। আমি লুকিয়েছিলাম বলে আমাকে দেখতে পায়নি।

টারজন আবার সেই বোলগানিদের বাড়িটার

কাছে ফিরে গেল। সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। সে দেখল প্রাসাদের একটা ঘণ্টা বাজতেই সমস্ত আদিবাসী ভৃত্যরা কাজ থামিয়ে উঠোনে এসে সারবন্দীভাবে দাঁড়াল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব গোরিলারা শোভাযাত্রা সহকারে সোনাব শিকল গলায় একটা সিংহকে ধরে নিয়ে এল উঠোনে। সিংহটা যে পথে আসছিল সেই পথের দুধারে অনেকে জোড়হাত করে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভ্রমে মাথা নত করছিল সবাই। সিংহটা এসে নিগ্রোভৃত্যদের গাগুলো একবার শুঁকে শুঁকে চলে যেতে লাগল। নিগ্রোগুলো ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রাত্রি হওয়ার পর একসময় দেখল সকলেই শুতে চলে গেল। কোথাও কোন পাহারাদার নেই। রাত্রি গভীর হলে টারজন তার কাছে যে দড়ি ছিল তার সাহায্যে গেটের উপর দিয়ে প্রাসাদের ভিতর দিকে গিয়ে পড়ল। গোটা প্রাসাদটাকে সে খুঁজে বেড়াল। কয়েকটা ঘর খোলা দেখল। সেখানে দু একটা গোরিলা ঘুমোচ্ছে। কিন্তু লা-এর কোন খোঁজ পেল না।

সহসা টারজনের মনে হলো তার পিছনে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে। পিছন ফিরেই সে দেখল একজন নগ্ন শ্বেতাঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে।

টারজন সেই হীরের প্রাসাদে রাতের অন্ধকারে একজন নগ্ন শ্বেতাঙ্গকে দেখতে পেয়ে তার খাপ থেকে

ছুরি বার করতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে লোকটা ছিল নিরস্ত্র ; তার উপর তার মুখের হাবভাব দেখে টারজন সামলে নিল নিজেকে। লোকটার মুখে সাদা দাড়ি ছিল। তার গায়ে কিছু সোনা ও হীরের গয়না ছাড়া গোটা গাটাই ছিল নগ্ন।

টারজন দেখল লোকটা ইংরিজি ভাষা জানে। তবু বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায় টারজন তাকে প্রশ্ন করল, কে তুমি ? কি চাও ?

বৃদ্ধ বলল, আমি কিশোর বয়স থেকে এখানে আছি। আমি ইংলণ্ড থেকে একটা জাহাজে করে স্ট্যানলির সঙ্গে পালিয়ে আসি। আমি আফ্রিকার জঙ্গলের গভীরে একটা শিবিরের কাছে থাকতাম। একদিন তার সঙ্গে শিকার করতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলি। ঘুরতে ঘুরতে একদল আদিবাসী আমায় ধরে তাদের গাঁয়ে নিয়ে যায়। সেখান থেকে পালিয়ে এসে আমি উপকূলে যাবার পথে এদিকে চলে আসি পথ না জানায়। তখন এই গোরিলারা আমায় ধরে আটকে রাখে এখানে। সেই থেকে আমি বন্দী আছি এখানে। দেশে ফিরে যাবার কথা আজও ভাবি আমি। কিন্তু কোন উপায় নেই।

টারজন বলল, এখান থেকে বেরিয়ে যাবার কোন পথ নেই ?

বৃদ্ধ বলল, এখান থেকে বাইরের উপত্যকা পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে। কিন্তু সেখানে আছে কড়া পাহারা।

টারজন বলল, এ রাজ্যে কত নিগ্রো আদিবাসী আর কত গোরিলা আছে ?

বৃদ্ধ বলল, এ রাজ্যে প্রায় পাঁচ হাজার আদিবাসী আর এক হাজার থেকে এগারোশো গোরিলা আছে।

টারজন আশ্চর্য হয়ে বলল, কিন্তু সংখ্যায় এত বেশী থাকা সত্ত্বেও আদিবাসীরা ওদের কবল থেকে মুক্ত করতে পারে না কেন নিজেদের ?

বৃদ্ধ বলল, বোলগানিদের তুমি চেন না। ওরা ভীষণ বুদ্ধিমান। আদিবাসীদের অত বুদ্ধি নেই।

টারজন বলল, বড় মজার ব্যাপার। কিন্তু যে সুন্দরী মেয়েটিকে ওরা ধরে এনেছে সে এখানে কোথায় আছে ?

বৃদ্ধ বলল, আমি বলে দিতে পারি কোথায় আছে সে, কিন্তু তাকে তুমি উদ্ধার করতে পারবে না।

টারজন বলল, তবু তুমি দেখিয়ে দাও।

বৃদ্ধ তাকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বলল, ঐ বাড়িটার কোন না কোন ঘরে তাকে রাখা হয়েছে। তাছাড়া তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার। আমি যতটা পারি সাহায্য করব। কারণ আমি গোরিলাদের ঘৃণা করি।

টারজন চলে গেল সেখান থেকে। সে বড় বাড়িটার মধ্যে গিয়ে এক একটা ঘরে ঢুকে তাকে খুঁজতে লাগল। একটা ঘরে কৃষ্ণকায় এক আদিবাসী নিগ্রোকে দেখতে পেল টারজন। লোকটার চেহারাটা দৈত্যের মত।

নিগ্রোভৃত্যটি টারজনকে বলল, কি চাও তুমি ? তুমি কি সেই মহিলাকে খুঁজছ যাকে ধরে আনা হয়েছে ?

টারজন বলল, হ্যাঁ। তুমি জান কোথায় সে আছে ?

নিগ্রোভৃত্য বলল, হ্যাঁ, আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি।

টারজন বলল, তুমি কেন আমার এ উপকার করবে ?

নিগ্রো বলল, ওরা আমাকে তোমাকে একটা ঘরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে বলেছে। সে ঘরে তুমি ও আমি ঢুকলেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। আমরা দুজনেই বন্দী হয়ে থাকব চিরকাল। তুমি যদি সেখানে আমাকে হত্যা করো তাহলেও ওরা তা গ্রাহ্য করবে না।

টারজন বলল, তুমি যদি আমাকে ফাঁদে ফেলে বন্দী করো তাহলে তোমাকে হত্যা করব আমি। কিন্তু যদি তুমি সেই বন্দিনী মহিলার ঘরে আমাকে নিয়ে যাও তাহলে তোমাকে মুক্তি দেব।

নিগ্রো বলল, কিন্তু এখান থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় মোটেই।

ওরা দুজনে সেই বড় বাড়িটার একটা বড় হলঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজাটা বন্ধ ছিল। নিগ্রোভৃত্যটি বলল, এই ঘরে তোমার সাথী আছে।

নিগ্রোটি হাত দিয়ে চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল। টারজন নিগ্রোটার হাতটা ধরে রইল যাতে সে পালিয়ে যেতে না পারে। সে দেখল একটা বিরাট হলঘরের একপ্রান্তে একটা উঁচু মঞ্চের উপর কালো কেশরওয়ালা এক বিরাটকায় সিংহ বসে আছে। তার গলায় একটা সোনার শিকল লাগানো আছে এবং সেই শিকলটা দুদিকে দুজন করে বসে থাকা নিগ্রো ক্রীতদাস ধরে আছে। সিংহটার পিছনে একটা সোনার বড় সিংহাসনে তিনজন গোরিলা বসেছিল। তাদের গায়ে অনেক সোনার আর হীরের গয়না ছিল। সেই ঘরটার নিচে এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল লা। তার দুদিকে দুজন নিগ্রো প্রহরী ছিল।

টারজন বুঝল, এই সিংহটাকে ওরা সম্রাট নুমা বলে। সম্রাট নুমার নামে গোরিলারা রাজ্য শাসন করে। মঞ্চটার নিচে দুদিকে পাতা দুটো বেঞ্চিতে পঞ্চাশজন গোরিলা বসেছিল। তারা ছিল এক একজন সামন্ত।

টারজন একসময় ঘরটার বাইরে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে সেই নিগ্রোভৃত্যটিকে বলল, এই ঘরের মধ্যে যে সব নিগ্রো ক্রীতদাস রয়েছে তারা সবাই গোরিলাদের কবল থেকে চিরদিনের মত মুক্তি পেতে চায় ত ? ওদের সঙ্গে ওদের ভাষায় কথা বলে দেখ। বল, আমার সঙ্গে ওরা যদি গোরিলাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাহলে আমি ওদের মুক্তি দেব।

নিগ্রোটি বলল, কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করবে না তারা।

টারজন বলল, ওদের বল, আমাকে সাহায্য না করলে ওদের মরতে হবে।

এমন সময় সিংহাসন থেকে একজন গোরিলা গম্ভীরভাবে বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, হে রাজা নুমার সামন্তগণ, নুমা বন্দিনীর সব কথা শুনেছেন। তাঁর ইচ্ছা বন্দিনী মৃত্যুদণ্ড লাভ করুক। সম্রাট নিজে এখন ক্ষুধার্ত। তাই নিজে বন্দিনীকে তার সামন্তদের ও ঊর্ধ্বতন রাজ্য পরিষদের তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতে ভক্ষণ করবেন। আগামী দিন এই বন্দিনী মহিলার সাথীকে বিচারের জন্য সম্রাট নুমার সামনে আনা হবে।

অবশেষে সে নুমার সামনে লাকে নিয়ে আসার জন্য হুকুম দিল।

এই সময় অশান্ত হয়ে উঠল নুমা। সে তার মুখ বাব করে গর্জন কবতে লাগল। নিগ্রো ক্রীত-দাসরা যখন লাকে জোর করে নুমা বা সেই সিংহ-সম্রাটের মুখের কাছে জোর করে ঠেলে দিতে উদ্যত হলো তখন টারজন তার হাতের বর্শাটা সিংহের বুকটা লক্ষ্য করে সজোবে ছুঁড়ে দিল।

বর্শাটা সিংহটার বুকটা বিদ্ধ করায় লুটিয়ে পড়ল সিংহটা।

এদিকে টারজনের বাড়ি থেকে ছাড়া পাওয়া পোষা সিংহ জাদ-বাল-জা তার প্রভুর খোঁজে বহু বনপথ পার হয়ে প্যালেস অফ ডায়মণ্ড বা হীরের প্রাসাদ সংলগ্ন এক উপত্যকায় এসে পড়ে। সে বাতাসে গন্ধ শুঁকে শুঁকে এই প্রাসাদে এসে পড়ে। কিন্তু তখনো সে টারজন যেখানে ছিল সেখানে আসতে পারেনি।

সম্রাট নুমা টারজনের বর্শার আঘাতে লুটিয়ে পড়লে টারজনের সঙ্গী সেই নিগ্রোভৃত্যটি ঘরের সব নিগ্রো ক্রীতদাসদের বলতে লাগল, তোমরা যদি মুক্তি পেতে চাও তাহলে এই বিদেশীকে সাহায্য করো। বোলগানিদের সব হত্যা করো।

নিগ্রোরা তখন একযোগে সিংহাসনে বসে থাকা সেই তিনজন গোরিলাকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়তে লাগল। টারজন এবার মঞ্চের উপর উঠে গিয়ে মরা সিংহের বুকটা থেকে তার গেঁথে যাওয়া বর্শাটা তুলে নিয়ে ঘরে অন্য যেসব গোরিলা ছিল তাদের প্রতি আক্রমণ চালাতে লাগল। প্রথমে সে সামনের দিকে যে পঞ্চাশজন সামন্ত গোরিলা ছিল তাদের সম্বোধন করে বলল, থাম তোমরা, আগে আমার কথা শোন। আমি হচ্ছি বাঁদরদলের টারজন। আমি তোমাদের সঙ্গে কোন ঝগড়া বিবাদ করতে চাই না। আমি শুধু তোমাদের দেশ থেকে বাইরে যাবার একটা পথ খুঁজে পেতে চাই। আমাকে শুধু এই মহিলার সঙ্গে শান্তিতে চলে যেতে দাও এখান থেকে।

টারজনের কথা শুনে গোরিলাগুলো গর্জন করতে করতে কি সব বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে। এমন সময় তাদের মধ্যে সেই বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গ ইংরেজকে দেখে রাগ হয়ে গেল টারজনের। সে তাকে চীৎকার করে বলল, শয়তান বিশ্বাসঘাতক কোথাকার। তুই এখানে এসে এদের আমার কথা বলে দিয়েছিস তাই এরা একজন নিগ্রোভৃত্যকে আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্য পাঠিয়েছিল।

বৃদ্ধ বলল, না, আমি এই বন্দিনী মহিলার কি হয় তা দেখার জন্যই এখানে এসেছিলাম, তোমাকে ধরাতে আসিনি।

টারজন বলল, ঠিক আছে, তুমি তাহলে এখন আমার দলে চলে এসো। তোমার আনুগত্যের পরিচয় দাও আমার প্রতি। সারাজীবন দাসত্ব করার থেকে মৃত্যু অনেক ভাল।

নিগ্রো ক্রীতদাসরা সংখ্যায় ছিল মোট সাতজন। তারা সবাই টারজনের দলে এসে বর্শা, খড়গ আর কুড়ুল নিয়ে লড়াই করতে লাগল।

বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গকে নিয়ে ওরা ছিল সংখ্যায় মাত্র নয়জন; কিন্তু গোরিলাদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ। প্রথমদিকে গোরিলারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেও তারা এতক্ষণে নিজেদের সামলে নিয়ে একযোগে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

এমন সময় দরজার সামনে একটা সিংহের গর্জন

শুনে চমকে উঠল সবাই। টারজন দেখল জাদ-বাল-জা কোথা থেকে এসে ঘরে ঢুকছে। সে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে চীৎকার করে ডাকল, জাদ-বাল-জা, মার বোলগানিদের।

সে আঙ্গুল দিয়ে গোরিলাদের দেখিয়ে দিল। জাদ-বাল-জার আক্রমণে কয়েকজন গোরিলা মারা গেল আর বাকি কয়েকজন পালিয়ে গেল ঘর থেকে। টারজন তখন জাদ-বাল-জাকে মঞ্চের উপর নিয়ে গিয়ে বসিয়ে নিগ্রোদের বলল, এই হচ্ছে আসল সম্রাট তোমাদের।

লা বলল, চল, আমরা এখনি পালিয়ে যাই।

বৃদ্ধ বলল, যে সব গোরিলারা চলে গেছে তারা আবার দলবল নিয়ে আসবে। ওরা সহজে ছেড়ে দেবে না। ঐ দেখ প্রাসাদসংলগ্ন বাগানে কত গোরিলা রয়েছে।

এই সময় এক বিরাট গোরিলাকে বারান্দা দিয়ে সেই হলঘরটায় ঢুকতে দেখেই টারজন জাদ-বাল-জাকে ছেড়ে দিল। জাদ-বাল-জা একলাফে গিয়ে আবার কয়েকজন গোরিলার গলা কামড়ে কেটে দিল। ফলে আর কোন গোরিলা ঘরে ঢোকার চেষ্টা করল না। যে সব গোরিলারা ঘরের মধ্যে ঢুকে লড়াই করতে এসেছিল তাদের মধ্যে থেকে পনেরজন গোরিলাকে বন্দী করে পাশের একটা ঘরে বন্দী করে রাখল টারজন।

এমন সময় উপর থেকে জ্বলন্ত কি একটা জিনিস পড়তেই লা টারজনকে দেখাল সেটা। টারজন দেখল ঘরের উপর ছাদের নিচে ব্যালকনির মত যে সব জায়গা ছিল তাতে কোথা থেকে অনেক গোরিলা এসে বসে আছে আর তেলেভেজানো কাপড়ে আগুন লাগিয়ে নিচে ফেলছে।

ইতিমধ্যে টারজন তিনজন নিগ্রোকে তাদের গাঁয়ের বস্তীতে পাঠিয়ে দিয়েছে যাতে তারা গ্রামবাসীদের সংগঠিত করে নিয়ে আসতে পারে।
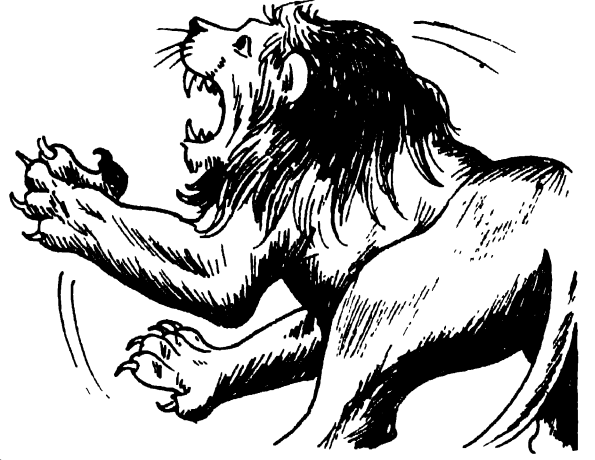
গোরিলারা উপর থেকে ক্রমাগত তেলেভেজানো জ্বলন্ত কাপড়ের টুকরো ফেলতে থাকায় সমস্ত হলঘরটা ধোঁয়ায় ভরে গেল। এতে লা বলল, আর থাকতে পারছি না, এখান থেকে পালিয়ে চল।

বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গ বলল, ধোঁয়াটা আর একটু গভীর হলে আমরা এক গোপন পথ দিয়ে চলে যাব। তাহলে গোরিলারা আর আমাদের দেখতে পাবে না।

টারজন বলল, সে পথে কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের?

বৃদ্ধ বলল, এই প্রাসাদের বাইরে উপত্যকায়।

ক্রমে সত্যিই ধোঁয়াটা আরো ঘন হয়ে উঠল। বৃদ্ধ তখন মঞ্চের পিছন দিক দিয়ে একটা পথ দিয়ে ওদের নিয়ে যেতে লাগল। টারজন, লা, জাদ-বাল-জা আর সেই নিগ্রোভৃত্যটি বৃদ্ধের পিছু পিছু যেতে লাগল। বৃদ্ধ সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা সুড়ঙ্গপথ ধরল কতকগুলো অন্ধকার বারান্দা পার হয়ে।

বৃদ্ধ তাদের একটি বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে টারজনকে ঘরের তাকের দিকে দেখতে বলল। টারজন দেখল ঘরের চারদিকে তাকের উপর অনেক চামড়ার প্যাকেটে মোড়া কি সব জিনিস ভরা আছে। বৃদ্ধ একটা প্যাকেট টেনে নিয়ে সেটা খুলে টারজনকে দেখাল। ওরা দেখল প্যাকেটটা হীরেয় ভর্তি। বৃদ্ধ একটা বাতি জ্বালল অন্ধকারে।

বৃদ্ধ বলল, এক একটা প্যাকেটে পাঁচ পাউণ্ড করে হীরে আছে।

এরপর সে টারজনের হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে বলল, এটা নিয়ে যাও।

সেই ঘর থেকে বেরিয়ে ওরা আবার অন্ধকারে সুড়ঙ্গপথ ধরল। পথে এক জায়গায় আর একটা রুদ্ধদ্বার ঘর পেল ওরা। দরজাটায় বৃদ্ধ চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল। সেই ঘরের পিছনের দিকের দরজাটা খুলে ওরা প্রাসাদের বাইরে চলে গেল। ওরা প্রাসাদের পূবদিকের ফটকের বাইরে চলে এল। বৃদ্ধ বলল, চল আমরা জঙ্গলের দিকে চলে যাই।

টারজন বলল, দাঁড়াও, নিগ্রোরা আসুক। ওরা এখনি এসে পড়বে।

দরবার ঘরে গোরিলারা ধোঁয়া কমে গেলে যখন জানতে পারল বিদেশীরা পালিয়েছে তখন তারা প্রাসাদের সব গোরিলাদের জড়ো করে প্রাসাদের সব গেটগুলোতে খোঁজ করতে লাগল।

হঠাৎ টারজন বলল, ঐ দেখ, গোরিলারা দল বেঁধে আমাদের দিকে আসছে। না, তুমি পালাও ওপারের পথে। আমি পরে যাব। নিগ্রোরা আসুক।

লা বলল, তুমি আমার জন্য যা করেছ তা আমি কখনো ভুলব না। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। তাতে মরতে হয় মরব।

এমন সময় সেই নিগ্রোভৃত্যটি ওদের দেখাল, ঐ দেখ, ওরা এসে গেছে।

টারজন দেখল সত্যিই পিছনের বন থেকে হাজার হাজার নিগ্রো আদিবাসী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডায়মণ্ড প্রাসাদের দিকে আসছে। টারজন তাদের গোরিলাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগল। ওদের মেরে ফেল। ওরা তোমাদের যুগ যুগ ধরে ক্রীতদাস করে রেখে অত্যাচার করে এসেছে। আজ তার প্রতিশোধ নাও।

আদিবাসীরা ক্ষেপে গিয়ে বোলগানিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাদ-বাল-জাও বোলগানিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেককে ঘায়েল করল। এই-ভাবে অনেকক্ষণ লড়াই করার পর বহু গোরিলা মারা গেল। কিছুসংখ্যক গোরিলা বন্দী হলো আর কিছু পালিয়ে গেল।

লড়াই শেষ হয়ে গেলে টারজন লা আর বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গকে নিয়ে প্রাসাদের উপরতলায় দরবার ঘরে চলে গেল। আদিবাসী নিগ্রোদের সব সর্দারদের ডাকা হলো।

টারজন তাদের বলল, এখানে এমন একজন বিদেশী আছেন যিনি এখানে তোমাদের সঙ্গে দীর্ঘ-কাল বাস করে আসছেন। যিনি তোমাদের রীতি-নীতি ও আশা আকাঙ্খার কথা সব জানেন। এই শ্বেতাঙ্গই হবেন তোমাদের রাজা।

বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গ বলল, কিন্তু আমি এখান থেকে সভ্য জগতে চলে যেতে চাই।

টারজন বলল, কিন্তু আপনি এতদিন পর সভ্য সমাজে গিয়ে কি করবেন? এই অসহায় নিগ্রোরা আপনার সাহায্য চায়। এরা সরল প্রকৃতির এবং বড় অনুগত।

অবশেষে টারজনের কথায় রাজী হয়ে বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গ বলল, ঠিক বলেছ তুমি। আমি আর যাব না কোথাও।

পরদিন সকালেই টারজন তিন হাজার নিগ্রো

যোদ্ধা, একশো গোরিলা আর লাকে নিয়ে ওপারের পথে রওনা হলো।

টারজন নিজের হাতে কাদিজকে শাস্তি দেবার জন্য পাঁচিলের উপর উঠে গেল। কাদিজের যোদ্ধারা হেরে যেতে লাগল নিগ্রোযোদ্ধা আর গোরিলাদের হাতে। কাদিজ সুড়ঙ্গপথ দিয়ে কয়েকজন যোদ্ধা আর পুরোহিতকে নিয়ে ছুটে পালাতে লাগল। টারজন একাই তাদের পিছু পিছু ছুটতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে একসময় অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল টারজন।

কাদিজের পুরোহিতরা টারজনের হাত পা বেঁধে তাকে নিয়ে মন্দিরের উপরে গিয়ে বেদীর উপর তাকে শুইয়ে দিল।

কাদিজ বলল, আজ আমি তোমাকে নিজের হাতে বলি দেব। আর আমি অপেক্ষা করব না কারো জন্য।

কাদিজ তার বলির খাঁড়াটা টারজনের গলার উপর উঁচিয়ে ধরল, এমন সময় মন্দিরের পাঁচিলের উপর একটা সিংহের গর্জন শুনে চমকে উঠল কাদিজ। ভয়ে তার হাত থেকে খাঁড়াটা পড়ে গেল।

টারজন চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল জাদ-বাল-জা তার সন্ধানে এখানে এসে পড়েছে।

টারজন চীৎকার করে ডাকল জাদ-বাল-জাকে। বলল, ওকে মেরে ফেল জাদ-বাল-জা।

সঙ্গে সঙ্গে জাদ-বাল-জা এক লাফে পাঁচিল থেকে নেমে কাদিজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাদিজের সারা দেহ কামড়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিয়ে সেটাকে একতাল মাংসে পরিণত করে ফেলল।

টারজন তেমনি হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রইল বেদীর উপর। কাদিজের অনুগত পুরোহিতরা কে কোথায় পালিয়ে গেছে ভয়ে।

ঘণ্টাখানেক পর লা তার বিজয়ী যোদ্ধাদের নিয়ে

টারজনের খোঁজ করতে করতে মন্দিরে এসে হাজির হলো। সে টারজনকে বেদীর উপর পড়ে থাকতে দেখে ছুটে গিয়ে তার হাত পায়ের বাঁধন কেটে তাকে মুক্ত করে দিল।

এরপর সব পুরোহিত আর পূজারিণীরা লাকে তাদের রাণী আর প্রধানা পূজারিণী হিসাবে অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিল।

পরদিন সকালেই টারজন জাদ-বাল-জাকে নিয়ে লা-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার দেশের বাড়ির পথে রওনা হয়ে পড়ল।

ওয়াজিরিরা যখন লেডী গ্রেস্টোককে হারিয়ে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহমনে তাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছিল তখন টারজন তার সোনালী সিংহটা নিয়ে অন্য পথ দিয়ে এসে তাদের দেখতে পেল।

ওয়াজিরি সর্দার উসুলা টারজনের পায়ে পড়ে সব কথা বলল। জেনকে কিভাবে হারিয়েছে সেকথা কাঁদতে কাঁদতে বলার পর শাস্তি চাইল তার মালিকের কাছ থেকে।

কিন্তু টারজন বলল, তোমরা এখন বাড়ি ফিরে যাও। তোমাদের কোন দোষ নেই। তোমরা বাড়ি গিয়ে কোরাককে বাড়িতেই থাকতে বলবে।

এই কথা বলে জাদ-বাল-জাকে সঙ্গে নিয়ে আবার জঙ্গলের গভীরে চলে গেল জেনের খোঁজে।

টারজন যেপথে জেনের খোঁজে যাচ্ছিল সেই পথেই ফ্লোরার দলের চারজন শ্বেতাঙ্গ অর্থাৎ ব্লুবার, কার্ল, পীবল, আর থ্রক ক্ষুধার্ত আর ক্লান্ত অবস্থায় আসছিল। তাদের পাগুলো ফুলে গিয়েছিল। ক্ষিদের জ্বালা আর সহ্য করতে পারছিল না তারা।

হঠাৎ একসময় পাশের ঝোপ থেকে একটা তীর এসে একজনের হাতে লাগল। ওরা অবাক হয়ে গেল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। কিছুক্ষণ পর আবার একটা তীর এসে একজনের পায়ে লাগল। এবার ওরা ঝোপের মাঝে কয়েকজন আদিবাসীকে দেখতে পেয়ে গুলি করতে লাগল রাইফেল থেকে। আদিবাসীরা ভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল।

টারজন একটা গাছের উপর উঠে সব দেখে গর্জন করে উঠল, গুলি থামাও, আমি তোমাদের উদ্ধার করব।

ওরা গুলি থামালে গাছ থেকে নেমে এল টারজন। ওদের দেখে সে বলল, আমি চিনেছি তোমাদের। তোমরাই কফির সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে দিয়ে আমাকে অচেতন করে ফেলেছিলে। তবু এভাবে তোমাদের এখানে মরতে দিতে চাই না। তোমরা বিপন্ন, তোমাদের উপর কোন প্রতিশোধ নেব না আমি। তোমরা কোথায় যেতে চাও?

কার্ল বলল, আমরা উপকূলের দিকে যেতে চাই। সেখান থেকে দেশে ফিরে যাব।

টারজনের সঙ্গে একটা গাঁয়ে গেল তারা। টারজন ওদের জন্য খাবার এনে দিল। পরে সে বলল, তোমাদের দলে লুভিনি নামে এক নিগ্রোভৃত্য ছিল। আমার লোকরা বলেছে সে আমার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। আমি তাকে খুঁজছি।

কার্ল বলল, ওই লোকটাই আমাদের নিগ্রোভৃত্যদের ক্ষেপিয়ে তোলে। সে আমাদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। আমাদের দলের ফ্লোরা নামে মেয়েটিকেও পাচ্ছি না আমরা। সে লেডী গ্রেস্টোকের কাছেই ছিল, আরবদের সঙ্গে লুভিনিরা লড়াই করছিল।

রাত্রিতে গাঁয়ের সামনে একটা ফাঁকা জায়গায় শুয়ে পড়ল ওরা। টারজন ওদের কাছাকাছি এক-জায়গায় শুয়ে পড়ল। বলল, তোমাদের কোন ভয় নেই, জাদ-বাল-জা আমার পাশেই থাকবে।

কার্ল শুয়ে পড়েছিল, কিন্তু তখনো ঘুমোয়নি। হঠাৎ সে দেখল টারজন যখন শুতে যাচ্ছিল তখন তার কোমর থেকে চামড়ার মোড়ক দেওয়া একটা প্যাকেট মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু টারজন সেটা বুঝতে পারল না। সে শুয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে কার্ল লোভে পড়ে শুয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে প্যাকেটটা নিয়ে নিল। তারপর সেটা ধীরে ধীরে খুলে দেখল প্যাকেটটা অসংখ্য হীরের টুকরোয় ভর্তি। সারারাত জেগে থেকে ভোর হতেই কার্ল পালিয়ে গেল শিবির ছেড়ে।

পরদিন সকালে উপকূলের দিকে রওনা হবার সময় ব্লুবার দেখল কার্ল শিবির ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। টারজন সকাল হতেই চলে গেছে জাদ-বাল-জাকে নিয়ে।

এদিকে কার্ল বনের মধ্যে একা পথ চলতে

চলতে অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগল। বুকফাটা তৃষ্ণায় জল পর্যন্ত পায়নি একটু। তার উপর কোথা থেকে একধরনের অসংখ্য পিঁপড়ের রাশ তার জামার ভিতরে ঢুকে পড়ে তার গাটাকে কুরে কুরে খেতে শুরু করে দিয়েছে।

একসময় সে অতিষ্ঠ হয়ে জামা প্যাণ্ট সব ছিঁড়ে ফেলে দিল। শুধু রাইফেল আর সেই হীরের প্যাকেটটা ছাড়া আর কিছুই রইল না তার কাছে।

এইভাবে যেতে যেতে সামনে একটা শিবির দেখতে পেল সে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এস্তেবানের গলার স্বর শুনতে পেল সে। শুধু এস্তেবানের নয়, তার সঙ্গে ফ্লোরার গলাও শুনতে পেল। শিবিরের সামনে এগিয়ে গিয়ে এস্তেবানের নাম ধরে ডাকতে লাগল।

কিন্তু এস্তেবান বেরিয়ে এসে তাকে দেখে চিনতেই পারল না যেন।

কার্ল বলল, এস্তেবান, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি কার্ল। আমি উপকূলের দিকে যাচ্ছিলাম।

এস্তেবান কড়া গলায় বলল, এখানে কি চাই? তুমি ঐ পথে যাও।

এমন সময় ফ্লোরা বেরিয়ে এসে বলল, কার্ল তুমি! আমাকে বাঁচাও, এস্তেবান আমাকে জোর করে ধরে এনে আটকে রেখে দিয়েছে।

কার্ল একটু জল চাইলে এস্তেবান বলল, জল আছে নদীতে। সেখানে চলে যাও।

এবার আর থাকতে না পেরে তার রাইফেল থেকে একটা গুলি করল কার্ল এস্তেবানকে লক্ষ্য করে। কিন্তু গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। তখন এস্তেবান, কার্ল আবার গুলি করার আগেই তার হাতের বর্শাটা কার্লের বুকের মধ্যে আমূল ঢুকিয়ে দিল। রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ল কার্ল।

এদিকে মৃত কার্লের কৌপীনের মধ্যে হীরের প্যাকেটটা পেয়ে আনন্দে লাফাতে লাগল এস্তেবান।

সে আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল, এখন আমি ধনী।

কার্লের মৃতদেহটা সেখানেই ফেলে রেখে তারা শিবির ছেড়ে রওনা হয়ে পড়ল তখনি।

এদিকে পীবলস, থ্রুক আর ব্লুবার যখন আদিবাসীদের দেখিয়ে দেওয়া পথে উপকূলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ টারজন তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। টারজনের চোখ মুখের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেল তারা।

টারজন কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, আমার হীরের প্যাকেটটা কোথায়? তোমরা সেটা নিয়েছ। আমি চলে যাবার সময় খেয়াল ছিল না। পরে বুঝতে পারি ব্যাপারটা।

ওরা তিনজন বলল, আমরা ত নিইনি।

টারজন বলল, তোমাদের মধ্যে আর একজন কোথায়?

ওরা বলল, কার্লকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে ভোরবেলায় আমরা ওঠার আগেই পালিয়ে গেছে। এবার বুঝতে পারছি, সে-ই তাহলে সেটা নিয়ে পালিয়ে গেছে।

টারজন ওদের সবকিছু খুঁজে দেখল কিন্তু প্যাকেটটা কারো কাছে পাওয়া গেল না।

টারজন আবার জাদ-বাল-জাকে সঙ্গে নিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে।

এদিকে এস্তেবান ফ্লোরাকে বলল, আমি এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করে মরব না। তোমাকে আর আমার কোন প্রয়োজন নেই।

এই বলে সে ফ্লোরাকে পথের উপর রেখেই চলে গেল। ফ্লোরা পথের উপরেই মৃতপ্রায় অবস্থায় শুয়ে পড়ল।

সেই রাতে একটা নদীর ধারে ছোটখাটো একটা শিবির তৈরী করল। তারপর আগুন জ্বালাল এস্তেবান।

টারজনের অভিনয় করতে করতে নিজেকে সব সময় টারজন বলে ভাবত সে।

আগুন জ্বেলে তার পাশে বসেছিল এস্তেবান। হঠাৎ তার মনে হলো তার সামনে নদীর বাঁধের উপর থেকে সাদা পোশাক পরা এক অনিন্দ্যসুন্দরী শ্বেতাঙ্গ নারীমূর্তি এগিয়ে আসছে তার দিকে।

এস্তেবান অবাক হয়ে গেল।

এদিকে বাতাসে কার্লএর গন্ধসূত্র খুঁজে খুঁজে এগিয়ে চলেছিল টারজন। হঠাৎ সে দেখল পথের উপর এক শ্বেতাঙ্গ নারী জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে।

টারজনকে দেখে ফ্লোরা এস্তেবান ভেবে বলল, অবশেষে আমাকে বাঁচাতে এসেছে এস্তেবান?

টারজন আশ্চর্য হয়ে বলল, এস্তেবান! আমি এস্তেবান নই।

এবার টারজনকে চিনতে পেরে ব্যস্ত হয়ে উঠল ফ্লোরা, লর্ড গ্রেস্টোক আপনি?

টারজন বলল, হ্যাঁ আমি। কিন্তু তুমি কে?

ফ্লোরা বলল, আমি ফ্লোরা হকস্। একদিন লেডী গ্রেস্টোকের কাছে কাজ করতাম।

টারজন বলল, হ্যাঁ, মনে আছে আমার। তুমি এখানে কি করে এলে?

ফ্লোরা বলল, আমরা ওপার নগরী থেকে সোনা চুরি করতে এসেছিলাম।

টারজন বলল, আমি তার কিছুই জানি না। তবে কি তুমি সেই ইউরোপীয়দের সঙ্গে ছিলে যারা একদিন আমার কফিতে ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল?

ফ্লোরা বলল, হ্যাঁ, আমরা সোনা পেয়েওছিলাম। কিন্তু আপনি একদিন ওয়াজিরিদের সঙ্গে এসে আমাদের শিবির থেকে তা নিয়ে যান।

টারজন আশ্চর্য হয়ে বলল, আমি ত কখনো আসিনি। আমি ত বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

ফ্লোরা টারজনের কথায় আশ্চর্য হয়ে গেল। সে জানত টারজন কখনো মিথ্যা কথা বলে না। সে বলল, আমাদের নিগ্রোভৃত্যরা বিদ্রোহী হয়ে উঠলে এস্তেবান আমাকে চুরি করে নিয়ে যায়। পরে কার্ল এক প্যাকেট হীরে নিয়ে আমাদের কাছে এসে পড়ে। কিন্তু এস্তেবান তাকে খুন করে হীরের প্যাকেটটা নিয়ে নেয়।

টারজন বলল, তাহলে তুমি এস্তেবানের কাছেই ছিলে?

ফ্লোরা বলল, সে আমায় ত্যাগ করে চলে গেছে। আমি এখানে মরতে বসেছি।

টারজন বলল, এসো আমার সঙ্গে, তাকে খুঁজে বার করব।

ফ্লোরা বলল, আমি হাঁটতে পারব না।

টারজন তখন ফ্লোরাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল।

কিছুদূর গিয়েই একটা আলো দেখতে পেল টারজন। কারা কথা বলছে সেখানে।

একজন নারীর কণ্ঠস্বর শুনে চিনতে পেরেই টারজন ডাক দিল, জেন! জেন তুমি!

জেন অবাক হয়ে একবার টারজনের পানে তাকাবার পর এস্তেবানের পানে তাকাতে গিয়ে দেখল তার আগেই সে পালিয়ে গেছে সেখান থেকে।

জেন হতবুদ্ধি হয়ে বলল, তুমি যদি টারজন হও তাহলে ও কে? এর মানে কি?

টারজন বলল, আমিই ত টারজন।

ফ্লোরা বলল, ইনিই হচ্ছেন লর্ড গ্রেস্টোক, আর ও হচ্ছে ভণ্ড প্রতারক।

টারজন এবার জেনের দিকে এগিয়ে এল। জেন বলল, তাকে দেখে আমার অন্তর বিশ্বাস করতে চায়নি, শুধু সে তোমার মত দেখতে।

টারজন বলল, যাক ওকে যেতে দাও। সে আমার হীরে চুরি করে নিলেও তোমাকে এখানে ফেলে আমি যেতে পারব না।

এরপর সে জাদ-বাল-জাকে ডেকে বলল, লোকটাকে ধরে আন।

জেন বলল, ও ওকে খেয়ে ফেলবে।

টারজন বলল, না, আমার কাছে ধরে নিয়ে আসবে।

কিছুক্ষণ পর টারজন জেনকে বলল, আচ্ছা জেন, উস্থুলা বলছিল তুমি মারা গেছ। তোমাকে লুভিনি যে ঘরে বন্দী করে রেখেছিল সে ঘরটা পুড়ে যায় এবং ছাইএর গাদার মধ্যে একটা মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং ওরা সেটা তোমার মৃতদেহ ভাবে। সেখান থেকে এখানে অক্ষতদেহে এলে কি করে? আমি তোমার মৃত্যুর জন্য লুভিনিকে দায়ী করে তার উপর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে সারা জঙ্গল খুঁজে বেড়াই।

জেন বলল, আর তাকে কোনদিন খুঁজে পাবে না তুমি। লুভিনি যখন আমাকে বশ করার জন্য

ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল তখন সহসা তার ছুরিটা কোমর থেকে নিয়ে তার বুকে আমূল বসিয়ে দিই। লুভিনি মারা যায়। গোটা গাঁটা তখন জ্বলছে। আমি পালিয়ে যেতেই সেই ঘরেও আগুন লেগে যায়। আমি তখন একটা আরবের সাদা আলখাল্লা তুলে নিয়ে তাই পরে জঙ্গলে পালিয়ে আসি।

ফ্লোরা বলল, এস্তেবানই ওয়াজিরিদের ভুলিয়ে তাদের সাহায্যে আমাদের শিবির থেকে সোনার তালগুলো চুরি করে নিয়ে যায়।

টারজন বলল, লোকটা এক পাকা শয়তান।

এমন সময় জাদ বাল-জা এস্তেবানের পরনে যে চিতাবাঘের ছালটা ছিল সেই ছালটা মুখে করে নিয়ে এল।

টারজন তখন জাদ-বাল জাকে নিয়ে সেই জায়গাটায় গেল যেখান থেকে সে এস্তেবানের ছালটা তুলে এনেছিল। টারজন দেখল নদীর ধারে কিছুটা রক্তের দাগ রয়েছে।

সে ফিরে এসে জেনদের বলল, সিংহটা ওকে ধরেছিল। তাই রক্তের দাগ রয়েছে। পরে সে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেয়। নদীতে ওকে নিশ্চয় কুমীরে খাবে।

ফ্লোবা বলল, এতকিছুর জন্য আমিই একমাত্র দায়ী। আমার কুটিল লোভলালসা তাদের এই আফ্রিকার জঙ্গলে টেনে আনে। আমি তাদেব ওপারেব ধনরত্নের কথা বলেছিলাম এবং এস্তেবানেব মত এমন একজন লোককে বাছাই কবেছিলাম যে দেখতে অবিকল লর্ড গ্রেস্টোকের মত।

টাবজন বলল, এর জন্য তোমাকে অনেক কষ্ট ভোগ কবতে হয়েছে। তুমি প্রচুর শাস্তি পেয়েছ।

ফ্লোবা টারজনেব সামনে নতজানু হয়ে বলল, আপনাব এত দয়াব জন্য কি বলে ধন্যবাদ দেব আপনাকে? আমি কিন্তু আর কোথাও যাব না। আমি আপনাদের কাছে থেকে গিয়ে সারা জীবন ধরে আপনাদের সেবা করে যাব।

টারজন বলল, ঠিক আছে, তুমি আমাদের কাছেই থেকে যেতে পার ফ্লোবা।

ওরা তিনজন জাদ-বাল-জাকে সঙ্গে নিয়ে পবদিন সকালে রওনা হয়ে ক্রমাগত তিনদিন ধবে বাড়িব পথে এগিয়ে যেতে লাগল। তিনদিন পব এক জায়গায় টারজন দেখতে পেল তার ওয়াজিরি যোদ্ধারা তাদের খোঁজেই এদিকে আসছে।

টাবজন জেনকে বলল, ওদের বাড়ি যেতে বললাম আর ওরা আমাদের খোঁজ করতে আসছে।

কিছুক্ষণেব মধ্যেই ওয়াজিরি যোদ্ধারা ওদের সামনে এসে পড়ল। টারজন আর জেনকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে আনন্দের আবেগে নাচতে লাগল ওরা। অনেক কথার পর টাবজন উস্থলাকে জিজ্ঞসা করল, সেই সোনার তালগুলো কোথায় রেখেছ?

উস্থলা বলল, সেগুলো তুমি যেখানে রাখতে বলেছিলে তোমাব কথামত সেখানেই পুঁতে রেখেছি।

টারজন বলল, আমি নই, আমার মত দেখতে অন্য একটা লোক তোমাদের ঠকিয়েছিল।

উস্থলা আশ্চর্য হয়ে বলল, ওঃ মালিক, তাহলে সে আপনি নন!

জেন বলল, সোনা হীরে যাক, আমরা ফিরে এসেছি এবং বাড়িতে কোরাক আছে, এটাই যথেষ্ট।

জঙ্গলের রাজা টারজন

টারজন লর্ড অফ দি জাঙ্গল

সেদিন ভরতপুরে জঙ্গলের ছায়াঘেরা গভীরে টারজনের প্রিয় বন্ধু টান্টর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার শুঁড়টা দোলাচ্ছিল। এই বিশাল জঙ্গলের মধ্যে বহু বছর ধরে নুমা, শীতা, ডাঙ্গো প্রভৃতি কত সব হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের কাছাকাছি বাস করে আসছে হাতিটা। কিন্তু এদের কাউকে ভয় করে না সে। কেউ তাকে অকারণে মারতে আসে না বা লড়াই করতে আসে না তার সঙ্গে। একমাত্র মানুষই তার শত্রু। কালো সাদা সব মানুষই তার দাঁতের লোভে তাকে মারতে আসে।

মানুষদের মধ্যে একমাত্র টারজনই হলো ব্যতিক্রম। সে সাদা চামড়ার মানুষ হয়েও তাকে কোনদিন মারতে আসেনি। ছেলেবেলা থেকে সে খেলা করে আসছে তার সঙ্গে।

একদিন ফাদ ও মতলগ নামে দুজন আরব ফেজুয়ান নামে এক নিগ্রো ক্রীতদাসকে সঙ্গে নিয়ে শিকার করতে করতে উত্তর দিকে চলে আসে।

হাতিটাকে দূর থেকেই গুলি করে আরবরা। ফেজুয়ান প্রথমে দেখতে পায়। কিন্তু গুলিটা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়ে হাতিটার পাশ দিয়ে চলে যায়। হাতিটা ছুটে পালিয়ে যায়। টারজন তখন হাতিটার পিঠের উপর শুয়েছিল। হাতিটা ডালপালা ভেঙ্গে সেখান দিয়ে পথ করে পালিয়ে যেতে গেলে একটা গাছের ডালে মাথায় জোর আঘাতের ফলে টারজন মাটিতে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়।

ফেজুয়ান ফাদকে বলল, তোমার গুলিটা লাগেনি মালিক।

ফাদ বলল, গুলিটার মধ্যে শয়তান ছিল। চল দেখি হাতিটার গায়ে হয়ত লেগেছে।

ফাদ বলল, একটা হাতি শিকার করতে গিয়ে একটা শ্বেতাঙ্গকে মারলাম?

মতলগ বলল, একটা খৃস্টান কুকুর, আবার প্রায় উলঙ্গ। গুলিটা ওর কোথায় লেগেছে?

ওরা টারজনের দেহটা পরীক্ষা করে দেখল তার দেহে কোথাও কোন ক্ষতচিহ্ন নেই। শুধু মাথায় একটা ক্ষতচিহ্ন আছে।

ফেজুয়ান বলল, ও এখনো মরেনি। হাতিটা পালিয়ে গেছে। হাতিটা যখন পালিয়ে যাচ্ছিল তখন ওর মাথায় আঘাত লাগে।

ফাদ কোমর থেকে তার ছোরাটা বার করে বলল, আমি ওকে শেষ করব।

মতলগ বাধা দিয়ে বলল, আল্লার নামে বলছি তোমার ছোরাটা রেখে দাও। আমরা ওকে শেখের

কাছে বেঁধে নিয়ে যাব। শেখ যা করার করবে।

ফাদ বলল, তাহলে ওকে বেঁধে ফেল।

টারজনের হাতদুটো পেটের উপর জড়ো করে উটের চামড়ার দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল ওরা। টারজন তখন চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল। সে আরবদের দেখে চিনতে পারল। সে তাদের বলল, তোমরা আমায় বাঁধছ কেন? আমার বাঁধন খুলে দাও বলছি।

ফাদ হেসে বলল, তুমি যে দেখছি শেখের মত হুকুম চালাচ্ছ। নিজেকে শেখ ভাবছ নাকি?

টারজন বলল, লোকে আমাকে টারজন বলে। আমি হচ্ছি শেখের শেখ।

টারজন!

চমকে উঠল মতলগ। গলার স্বর নিচু করে বলল, আমাদেব দুর্ভাগ্য যে এই লোকটার সঙ্গে আমাদেব দেখা হয়ে গেল। গত দু সপ্তার মধ্যে যে গাঁয়েই গিয়েছি সেখানেই ওব নাম শুনেছি। গ্রামবাসীবা একবাক্যে বলেছে, থাম, টাবজন আসছে। তাব দেশ থেকে ক্রীতদাসদেব ধবে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাদেব হত্যা কববে সে।

ফাদ বলল, তুমি বাধা দিলে আমায়। ওকে মেবে ফেলাই ভাল ছিল।

মতলগ বলল, পরে একথা প্রচাব হয়ে গেলে আমাদেব আর জীবন্ত দেশে ফিরে যেতে হবে না। আমাদের ক্রীতদাসরাই পালিয়ে গিয়ে প্রচার করে বেড়াবে একথা।

ফাদ বলল, ঠিক আছে। শেখের কাছেই নিয়ে চল ওকে।

শেখ ইবন জাদের মঞ্জিলে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। মঞ্জিলেব ভিতরে একটা তাঁবুর ঘরের ভিতরে টারজন হাত পা বাঁধা অবস্থায় শুয়েছিল। বাঁধনগুলো খোলাব জন্য অনেক চেষ্টা কবল। কোনভাবে ছিঁড়তে বা খুলতে পাবল না।

টারজন শুনতে পেল তাঁবুর বাইরে কারা ফিসফিস করে কথা বলছে।

হঠাৎ ওরা কিসের একটা শব্দ শুনে চমকে উঠল। সে শব্দ শুনে সবাই চমকে উঠল। ক্রীতদাসরা তাঁবুর বাইরে এসে দেখতে লাগল। আরবরা বন্দুক তুলে নিল হাতে।

ইবন জাদ বলল, তাঁবুর ভিতর থেকে শব্দটা আসছে। মনে হচ্ছে একটা পশু গর্জন করছে। বন্দীটা ত মানুষ।

ফাদ বলল, ও মানুষ হলেও ওর মধ্যে শয়তান আছে।

ইবন জাদ হাতে বন্দুক আর কাগজেব লণ্ঠন নিয়ে টারজনের ঘরে গিয়ে উঁকি মেবে দেখল টারজন ঠিকই আছে। সে জিজ্ঞাসা করল, তুমি একটা শব্দ শুনেছ? ওটা কিসের শব্দ?

টারজন বলল, এক পশুব প্রতি অন্য এক পশুব ডাক। জঙ্গলের ডাক শুনে বেদুইনরা ভয় পায়।

ইবন জাদ বলল, বেদুইনরা ভয় পায় না। আমবা ভেবেছিলাম বাড়িব মধ্যে হয়ত বা কোন জন্তু জানোয়াব ঢুকছে। যাই হোক, আগামীকাল তোমাকে মুক্তি দেব।

টারজন বলল, কিন্তু আজ নয় কেন?

ইবন জাদ বলল, সিংহ অধ্যুষিত এই নৈশ জঙ্গলে একা তোমাকে ছাড়া ঠিক হবে না।

টারজন হাসল। হাসিমুখে বলল, রাত্রির জঙ্গলে টারজন নিরাপদ। কোন সময়েই জঙ্গলকে ভয় করে না টারজন।

এদিকে টারজনের ডাকটা জঙ্গলের মধ্যে দূরে একজন শুনতে পেয়েছিল এবং সে সাড়াও দিয়েছিল। সে হলো টারজনের বন্ধু ট্যান্টর। শেখের মঞ্জিলের সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল এবং গোটা বাড়িটা স্তব্ধ হয়ে গেল তখন হাতিটা শুঁড় তুলে জ্বলন্ত লাল চোখদুটো নিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হুড়মুড় করে আসতে লাগল।

এদিকে শেখের বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও শেখ তার ঘরের সামনে বসে তার ভাইএর সঙ্গে বসে ধূমপান করছিল। শেখ একসময় তার ভাই তোলোগকে বলল, কোন ক্রীতদাসকে জানাবে না যে তুমি টারজনকে হত্যা করছ। কাজটা হয়ে গেলে কবর খোঁড়ার জন্য দুজন বলিষ্ঠ ক্রীতদাসকে জাগাবে। তাদের মধ্যে একজন হবে ফেজুয়ান আর একজন অন্য কেউ।

তোলোগ বলল, আব্বাস আর ফেজুয়ান— দুজনেই বিশ্বস্ত।

শেখ বলল, তাহলে যাও। এখন সবাই ঘুমিয়েছে।

এই কথা বলে শেখ তার শোবার ঘরে চলে গেল। এদিকে হাতিটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ভয়ঙ্করভাবে ছুটে আসতে লাগল। তার পথের সামনে কোন সিংহ বা চিতাবাঘ দাঁড়াতে পারল না। সবাই একপাশে সরে যেতে লাগল।

অন্ধকারে পা টিপে টিপে তোলোগ টারজনের তাঁবুর ভিতরে চলে গেল। টারজন তখন মাটিতে কান পেতে কিসের শব্দ শোনার চেষ্টা করছিল। তোলোগ তার ঘরে ঢুকতেই টারজন খাড়া হয়ে উঠে

বসল। সে আবার সেই আগের মত চীৎকার করে উঠল। গোটা শিবিরটা কেঁপে উঠল সেই চীৎকারের শব্দে।

তোলোগ বলল, এখানে কোন্ জন্তু আসেনি ত?

সে দেখল তাঁবুর মধ্যে কোন জন্তু নেই। সে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে একটা কাগজের লণ্ঠন নিয়ে এল। তোলোগ দেখল টারজন তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে বলল, তুমি আমাকে হত্যা করতে এসেছ?

তোলোগ টারজনের বুকে ছুরিটা বসাবার জন্যে এগিয়ে এলে টারজন তার বাঁধা হাতদুটো দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল। তোলোগ আবার এলে টারজন তার মাথায় হাতদুটো দিয়ে এমনভাবে আঘাত করল যে সে পড়ে গেল। কিন্তু তোলোগ উঠেই এবার টারজনের পেছন থেকে আঘাত করতে গেল। টারজন হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বাধা দিতে গেলে সে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। তোলোগ এবার সুযোগ পেয়ে ছুরিটা টারজনের বুকে বসাতে গেলেই সে আশ্চর্য হয়ে দেখল গোটা তাঁবুটা উপর থেকে কে তুলে নিল। তারপর দেখল একটা বিরাট হাতি শুঁড় দিয়ে তার দেহটা জড়িয়ে ধরে তাকে তুলে একটা তাঁবুর মাথায় ফেলে দিল।

হাতিটা এবার টারজনকে শুঁড় দিয়ে তার পিঠের উপর চাপিয়ে বেগে ছুটে পালাতে লাগল।

শেখের লোকজন ছুটে এসে দেখল বন্দী নেই। হাতিটা তখন জঙ্গলে পালিয়ে গেছে।

তোলোগ শেখকে বলল, বন্দীর একটা পোষা শয়তান আছে। সে হাতির রূপ ধরে এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

সব কিছু শুনে অনেক ভেবে শেখ বলল, কাল সকালেই আমরা শিবির গুটিয়ে উত্তর দিকে রওনা হব।

পরদিন সকালে কোনরকমে প্রাতরাশ সেরেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শিবির গুটিয়ে ফেলল ওরা। আরবরা ঘোড়ায় চাপল। ক্রীতদাসরা মালপত্র নিয়ে হেঁটে যেতে লাগল। আতিজা আর জায়েদ ঘোড়ায় চড়ে পাশাপাশি যাচ্ছিল।

তিন দিন ধরে আরবরা উত্তর দিকে হাবাসের পথে এগিয়ে যেতে লাগল ধীর গতিতে। এদিকে টারজনও তিন দিন ধরে জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রইল। হাতিটা সর্বক্ষণ তার পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল। তিন দিন কোন খাদ্য বা একটু জল পর্যন্ত খেতে পায়নি টারজন।

এই ক'দিনের মধ্যে মনু বা ছোট ছোট বাঁদরদের ডেকেছিল তার বাঁধনগুলো খুলে দেবার জন্য কিন্তু তারা কেউ তা পারেনি।

চতুর্থ দিন সকাল হতেই হাতিটা অশান্ত হয়ে উঠল। হাতিটা এই ক'দিন টারজনকে ফেলে দূরে কোথাও যায়নি। কাছাকাছি ঘাস পাতা যা পেয়েছে তাই খেয়েছে। আজ সে তাই টারজনকে নিয়ে দূরে কোথাও যেতে চাইল।

কিন্তু টারজন সেখান থেকে যেতে চাইল না। কারণ সে ভাবল, বাঁদর গোরিলারা যেখানে থাকে এই জায়গাটা হলো তাব কাছাকাছি। নিশ্চয় এই পথে একদল বাঁদর-গোরিলা আসবে এবং তাদের মধ্যে দু-একজন ঠিক টারজনকে চিনবে এবং দাঁত দিয়ে তার বাঁধনগুলো কেটে দেবে।

হাতিটা টারজনকে পিঠের উপর চাপিয়ে নিতেই টারজন বলল, আমাকে নামিয়ে দাও টান্টর। তুমি আমাকে দূরে নিয়ে গেলে আমার বাঁধন খোলার কাউকে পাব না।

তার কথা বুঝে হাতিটা তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

টারজন যা ভেবেছিল তাই হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল বাঁদব-গোরিলা ঘুরতে ঘুরতে টারজন যেখানে হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিল সেখানে হাজির হলো।

টারজন বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায় তাদের বলল, আমি হচ্ছি বাঁদরদলের টারজন। তোমাদের বন্ধু। টারমাঙ্গানীরা আমাকে ধরে আমার হাত পা বেঁধে রেখে দেয়। তোমরা এসে আমার বাঁধন খুলে দাও।

একটা গোরিলা বলল, তুমি হচ্ছ টারমাঙ্গানী।

টারজন আবার বলল, না, আমি বাঁদরদলের রাজা টারজন।

গাছের উপর থেকে একটা মনু বা ছোট বাঁদর বলল, হ্যাঁ, ও টারজনই বটে। গোমাঙ্গানী আর টারমাঙ্গানীরা মিলে ওকে ধরে নিয়ে বেঁধে ফেলে। আজ চারদিন হলো ও এইভাবে বাঁধা আছে।

সহসা গাছের আড়াল থেকে একটা গোরিলা এগিয়ে এসে বলল, আমি জানি টারজনকে।

টারজন বলল, আগে আমার বাঁধনগুলো খুলে দাও।

মোয়ালাৎ টারজনের হাত ও পায়ের বাঁধনগুলো খুলে দিল। মুক্ত হয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল টারজন। এমন সময় বাঁদর গোরিলা দলের রাজা তোয়াৎ এসে হাজির হলো সেখানে। সে টারজনকে দেখেই মাটিতে ঘুষি মেরে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তার শক্তির আস্ফালন করতে লাগল। দলের রাজা হিসাবে যুদ্ধে আহ্বান করতে লাগল টারজনকে। মোয়ালাৎ বলল, ও হচ্ছে মাঙ্গানীদের বন্ধু।

তোয়াৎ বলল, না, ও হচ্ছে টারমাঙ্গানী ও মাঙ্গানীদের শত্রু। ওকে মেরে ফেলো।

গয়াৎও মোয়ালাতের দলে এসে বলল, আমি যখন ছোট ছিলাম এই টারজনই আমাকে সিংহের কবল থেকে বাঁচায়। ও আমাদের বন্ধু।

বাঁদর-গোরিলারা একটা বিষয় নিয়ে বেশীক্ষণ মাথা ঘামায় না। তোয়াৎ যখন দেখল অনেক গোরিলা এক এক করে টারজনের দলে এল তখন সে আহারের সন্ধানে অন্যত্র চলে গেল। টারজন সেই বাঁদরদলেই রয়ে গেল তাদের বন্ধু হিসাবে।

জেমস হাণ্টার ব্লেক নামে এক ধনী আমেরিকান যুবক উইলবার স্টিম্বল নামে এক বয়স্ক ব্যক্তিকে সঙ্গে করে অভিযানে বার হয় আফ্রিকা জঙ্গলে। আফ্রিকার যত সব ভয়ঙ্কর জীবজন্তুগুলোকে যতদূর সম্ভব চলচ্চিত্রের ক্যামেরায় ধরে রাখাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

তাদের সঙ্গে কিছু নিগ্রো আদিবাসী ছিল, তারা মালপত্র বহন করত, যাবতীয় কাজকর্ম করত। তারা সবাই স্টিম্বলের নির্দেশে চলত। কিন্তু স্টিম্বলের মেজাজটা ছিল বড় রুক্ষ। কথায় কথায় সে ঝগড়া করত যার তার সঙ্গে। একদিন তার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে চলচ্চিত্রের ক্যামেরাম্যান দল ছেড়ে চলে যায়। ফলে আফ্রিকার অরণ্য-জীবনের সচিত্র ছবি তোলার কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

দুপুরে এক যায়গায় শিবির স্থাপন করতে বলল ব্লেক। ঠিক হলো ব্লেক শিবিরেই থাকবে আর স্টিম্বল একদল নিগ্রো যোদ্ধাকে নিয়ে শিকারে যাবে।

স্টিম্বল শিকারে চলে গেল। মাইলখানেক যাবার পর একটা বিরাটকায় বাঁদর গোরিলা দেখতে পেল সে। গোরিলাটা সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু স্টিম্বল তাকে পিছন থেকে গুলি করল। গুলিটা লাগল না তার গায়ে। গোরিলাটা গাছের আড়ালে আড়ালে পালাতে লাগল। কিন্তু তাকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করতে লাগল স্টিম্বল। সে তার নিগ্রো যোদ্ধাদের জিজ্ঞাসা করল, ওটা কি জন্তু?

তারা বলল, গোরিলা।

স্টিম্বল বলল, ওটাকে আমি ধরে নিয়ে যাব।

এদিকে টারজন তখন কাছাকাছি একটা গাছের উপর স্টিম্বলের গুলির আওয়াজ শুনতে পায়। সে গাছের উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখল, একটা বাঁদর-গোরিলা গুলির ভয়ে গাছপালা ভেঙ্গে ছুটে পালাচ্ছে আর তার পিছনে বন্দুক হাতে একজন শ্বেতাঙ্গ তাকে মারতে যাচ্ছে।

টারজন দেখল বোলগানি বা গোরিলাটা যে পথে ছুটছিল সেই পথের ধারে একটা গাছে একটা বড় অজগর রয়েছে। প্রাণভয়ে পালাতে গিয়ে সাপটাকে দেখতে পায়নি গোরিলাটা। এখন গোরিলাটা ডালপালা ভেঙ্গে ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করতে করতে ছুটতে থাকায় অজগরটা তাকে কাছে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরল। গোরিলাটা তার কুণ্ডলি থেকে নিজেকে মুক্ত করার যতই চেষ্টা করতে লাগল সাপটা ততই জোরে চেপে ধরল তার দেহটাকে।

এমন সময় স্টিম্বল আর টারজন একই সময়ে হাজির হলো সেখানে। টারজন দেখল একজন শ্বেতাঙ্গ শিকারী রাইফেল তুলে ধরে একই সঙ্গে গোরিলা আর অজগর সাপটাকে মারতে যাচ্ছে।

টারজন যখন দেখল শ্বেতাঙ্গ শিকারী স্টিম্বলই গোরিলাটার এই অবস্থার জন্য দায়ী তখন সে স্টিম্বলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ফেলে দিল মাটিতে। স্টিম্বল উঠে দাঁড়াবার আগেই টারজন তার ছুরিটা কেড়ে নিয়ে সাপটার কাছে গিয়ে আঘাত করতে লাগল তাই দিয়ে। সাপটার গায়ে ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিতেই সাপটা গোরিলাটাকে ছেড়ে টারজনকে জড়িয়ে ধরতে লাগল। টারজন সাপটার গলাটা টিপে ধরে ক্রমাগত তার গায়ের বিভিন্ন জায়গায় ছুরিটা বসাতে লাগল। অবশেষে তার মাথাটা কেটে দিল।

গোরিলাটা জোর আঘাত পেয়েছিল। সে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। টারজন তাকে বলল, আমি বাঁদরদলের টারজন। তোমাকে হিস্তা অর্থাৎ সাপের কবল থেকে বাঁচালাম।

গোরিলাটা ভেবেছিল টারজন এবার তাকে মারবে। সে ভয়ে ভয়ে টারজনকে বলল, তুমি আমাকে বধ করবে না?

টারজন বলল, না আমরা এখন বন্ধু।

গোরিলাটা তখন বলল, আমাদের পিছনে যে টার্মাঙ্গানীটা রয়েছে সে আমাদের দুজনকেই ঐ বজ্র ভরা লাঠিটা দিয়ে হত্যা করবে।

টারজন বলল, না, ওকে আমি এখান থেকে তাড়িয়ে দেব।

স্টিম্বল এতক্ষণ সবকিছু দেখছিল দাঁড়িয়ে। গোরিলাটার সঙ্গে টারজনের যে সব কথা হচ্ছিল তা সে বুঝতে পারছিল না। টারজন তার কাছে ফিরে এলে সে বলল, তুমি সরে যাও, এবার আমি গোরিলাটাকে বধ করব।

স্টিম্বল আর গোরিলাটার মাঝখানে এসে দাঁড়াল টারজন। বলল, তোমার রাইফেল নামাও।

স্টিম্বল বলল, মোটেই না, আমি কি শুধু শুধুই এতক্ষণ ওকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিলাম? তুমি জান আমি কে? আমি হচ্ছি উইলবার স্টিম্বল। স্টিম্বল

এ্যাণ্ড কোম্পানী, নিউ ইয়র্কএর মালিক।

টারজন বলল, আমার এই দেশে কি করছ?

স্টিম্বল বলল, তোমার দেশ! তুমি কে?

টারজন তখন স্টিম্বলের নিগ্রো যোদ্ধাদের পানে তাকিয়ে বলল, আমি হচ্ছি টারজন। এই শ্বেতাঙ্গ এদেশে কি করছে? এরা সংখ্যায় কত?

নিগ্রোরা তখন বলল, আমরা তোমাকে চিনি বড় বাওয়ানা। এরা সংখ্যায় আছে দুজন। আমরা এদের কাছে কাজ করি। এরা শিকার করে বেড়ায়। এই লোকটা বড় খারাপ ব্যবহার করে আমাদের সঙ্গে। এখানে শিকার পাওয়া যাচ্ছে না। কালই ওরা চলে যাবে এখান থেকে।

টারজন আবার জিজ্ঞাসা করল, এদের শিবিরটা কোথায়?

নিগ্রোরা বলল, এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়।

টারজন এবার স্টিম্বলকে বলল, তোমাদের শিবিরে ফিরে যাও। আমি সন্ধ্যের সময় তোমাদের শিবিরে গিয়ে কথা বলব তোমাদের সঙ্গে। এখন শুধু খাবার মত শিকার করে নিয়ে চলে যাও।

স্টিম্বলের যেতে মন চাইছিল না। কিন্তু টারজনের ব্যক্তিত্ব আর তার কথা বলার ভঙ্গিমা দেখে ভয় হলো তার। টারজন চলে গেলে সে তার লোকদের বলল, আজ সারা দিনটাই মাটি হয়ে গেল। লোকটা কে?

নিগ্রোরা বলল, মালিক, ও হচ্ছে টারজন, এই বনের রাজা। ওর কথাই হলো আইন। ওকে রাগিও না।

শিবিরে ফিরে এসে স্টিম্বল বলল, কিন্তু সেই বাঁদর লোকটা যখন আমার স্বরূপটা বুঝতে পারবে তখন আর সে উইলবার স্টিম্বলের ব্যাপারে নাক গলাতে আসবে না।

ব্লেক বলল, সে আমাদের এখানে আসবে। তাই হবে, তার সঙ্গে দেখা হবে। তার কথা আমি অনেক শুনেছি।

স্টিম্বল বলল, এই যে আমাদের লোকরা এসে গেছে।

সে তখন নিগ্রো কুলীদের লক্ষ্য করে বলতে লাগল, আমরা এবার থেকে দুজনে ভাগ হয়ে যাচ্ছি। আমাদের মালপত্র সব ভাগ হয়ে গেছে। আমি পশ্চিম দিকে গিয়ে কিছুদিন শিকার করার পর সমুদ্র উপকূলে যাব। ব্লেক কোন দিকে যাবে তা আমি জানি না। তোমাদের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক লোক ব্লেকের সঙ্গে যাবে আর বাকি অর্ধেক আমার সঙ্গে যাবে। যারা ব্লেকের সঙ্গে যেতে চাও তারা তার কাছে গিয়ে দাঁড়াও।

এমন সময় হঠাৎ টারজন সেখানে এসে উপস্থিত হলো। শিবিরে যে আগুন জ্বলছিল তার আভায় ব্লেক টারজনের চেহারাটা দেখতে পেল।

স্টিম্বল বলল, সেই বুনো মানুষটা এসেছে।

ব্লেক টারজনকে বলল, তুমিই বাঁদরদলের টারজন ত?

টারজন বলল, হ্যাঁ, তুমি?

ব্লেক বলল, আমি হচ্ছি নিউ ইয়র্কের জিম ব্লেক।

টারজন বলল, শিকার করে বেড়াচ্ছ?

ব্লেক বলল, আমার সঙ্গে সচল ছবি তোলার একটা ক্যামেরা আছে। আফ্রিকার বন্য জীবনের কিছু চলমান ছবি তুলতে চাই'।

টারজন বলল, তোমার সঙ্গী একটা রাইফেল ব্যবহার করছিল।

ব্লেক বলল, তার কাজের জন্য আমি দায়ী নই।

টারজন বলল, আমি তোমাদের কথাবার্তা শুনেছি। নিগ্রোরা তোমার সঙ্গী সম্বন্ধে আমাকে কিছু কথা বলেছে। তোমরা দুজনে একমত হতে পারছ না বলেই পৃথকভাবে যেতে চাইছ। তাই নয় কি?

ব্লেক বলল, হ্যাঁ।

টারজন বলল, তোমরা কে কোনদিকে যেতে চাও?

স্টিম্বল বলল, আমি পশ্চিম দিকে গিয়ে উপকূলে পৌঁছতে চাই।

ব্লেক বলল, আমি উত্তর দিকে গিয়ে কিছু সিংহের ছবি তুলতে চাই। এখন যদি স্টিম্বলের সঙ্গে কোন লোক না যায় তাহলে আমাদের একসঙ্গেই যেতে হবে এবং তাহলে ছবি না তুলেই সোজা উপকূলে চলে যাব।

টারজন স্টিম্বলের কথায় কান না দিয়ে বলল, আগামীকাল রওনা হবে তোমরা। আমি ঠিক সময়ে আসব। সঙ্গের লোকরা যাতে দুদলে ভাগ হয়ে ঠিক-মত যায় আমি তার ব্যবস্থা করব। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না।

এই কথা বলে বনের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল টারজন।

পরদিন সকালে মালপত্র গুছিয়ে যাবার জন্য রওনা হতেই টারজন এসে পড়ল।

টারজন নিগ্রোভৃত্যদের এক জায়গায় ডেকে বলল, আমি হচ্ছি টারজন, এই বনের অধিপতি। তোমরা এই শ্বেতাঙ্গদের আমার দেশে আমার লোকজনদের মধ্যে নিয়ে এসেছ। তারা আমার লোকজনদের মারে, বনের জীবজন্তু মেরে বেড়ায়। যাই হোক, তোমরা যদি নিরাপদে গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে যেতে চাও তাহলে আমার কথা শোন।

এরপর নিগ্রোভৃত্যদের সর্দারকে টারজন বলল, তুমি ব্লেকের সঙ্গে যাবে। তাকে বনের জীবজন্তুদের কিছু ছবি তোলার অনুমতি দিচ্ছি আমি। তোমার দল থেকে অর্ধেক লোক বাছাই করে দাও। তারা যাবে স্টিম্বলের সঙ্গে। তবে স্টিম্বল একমাত্র আহার ছাড়া কোন প্রাণী বধ করতে পাবে না।

এরপর ব্লেকের দিকে ফিরে বলল, তুমি আমার অতিথি। সুতরাং ইচ্ছা করলে শিকার করতে পার।

স্টিম্বল রেগে গিয়ে ব্লেককে বলল, তুমি এই বোকা শ্বেতাঙ্গ লোকটাকে বলে দাও আমি কে এবং আমি কিছুতেই তার এই সব হুকুম মেনে চলব না।

সেদিকে কান না দিয়ে টারজন স্টিম্বলের দলের লোকদের বলল, দেখবে এই ব্যক্তি যেন আমার আদেশ মত চলে। না চললে ওর দলে তোমরা থাকবে না।

এই কথা বলে টারজন জঙ্গলের ভিতরে চলে গেল।

অন্ধকার নেমে এল সারা বনভূমি জুড়ে মুষল-ধারে বৃষ্টি নামল। টারজন যে গাছটার তলায়

দাঁড়িয়েছিল সেই গাছটা হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে যেতে তার ডালপালায় আঘাত লেগে চাপা পড়ে গেল। সে অচেতন হয়ে পড়ল। অদূরে সেই বোলগানিটা দাঁড়িয়েছিল।

টারজনের বুকের উপর কান পেতে স্টিম্বল দেখল তার দেহে প্রাণ আছে, সে মরেনি। তখন টারজনকে হত্যা করার জন্য তার ছুরিটা বার করল। বোলগানি বা গোরিলাটা এতক্ষণ দেখছিল ব্যাপারটা। স্টিম্বল ছুরিটা টারজনের বুকের উপর তুলতেই বোলগানি একলাফে সেখানে গিয়ে স্টিম্বলের গলার উপর একটা হাত রাখল। সে তার গলা টিপে হত্যা করতে যাচ্ছিল তাকে।

এমন সময় চেতনা ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকাল টারজন। মুহূর্তমধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরে বোলগানিকে বলল, ওকে যেতে দাও।

টারজন স্টিম্বলকে বলল, আমি এখানে ছিলাম ছুটো কারণে। আমি লক্ষ্য করছিলাম তুমি আমার আদেশ মেনে চলছ কি না। আর দেখছিলাম তোমরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে আমার কোন ক্ষতি করছ কি না। কিন্তু তুমি আমায় হত্যা করতে যাচ্ছিলে। তোমাকে হত্যা করাই উচিত। তবু আমি তোমাকে মারব না।

এবার স্টিম্বলের নিগ্রো মালবাহকদের বলল, এই শ্বেতাঙ্গ যতক্ষণ আমার আদেশ মেনে চলবে ততক্ষণ এর সঙ্গে থাকবে। তবে দেখবে এ যেন কোন শিকার না করে।

এই কথা বলে চলে গেল টারজন।

স্টিম্বল যখন বুঝল টারজন আর আসবে না তখন সাহস পেয়ে আবার খারাপ ব্যবহার করতে লাগল তার নিগ্রোভৃত্যদের সঙ্গে। সে টারজনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে একটা হরিণ শিকার করল অকারণে। তবে তার নিগ্রোভৃত্যরা রেগে গেল।

স্টিম্বল ভাবল সে এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর ব্লেকের সন্ধানে বার হবে। সে একটা সিগারেট ধরাল।

স্টিম্বল একটা গাছে ঠেস দিয়ে বসে ছিল। সহসা একটা শব্দ শুনে চমকে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ঝোপের ওপারে কালো কেশরওয়ালা একটা সিংহ দেখতে পেল। স্টিম্বল ভয়ে একটা গাছের উপর চড়ল। সিংহটা লাফ দিয়ে স্টিম্বলকে ধরতে গেল, কিন্তু পারল না। স্টিম্বল গাছে ওঠার সময় রাইফেল আর খাবারের মোটটা গাছের তলায় ফেলে যায় কিন্তু স্টিম্বলকে না পেয়ে সিংহটা রেগে গিয়ে খাবারের পুঁটলিটা ছিঁড়ে খুঁড়ে সব খাবার নষ্ট করে দিল। তারপর মুখে করে রাইফেলটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

স্টিম্বল গাছের উপর থেকে চীৎকার করতে লাগল।

কিন্তু সিংহটা রাইফেলটা মুখে করে সোজা একটা ঝোপের মধ্যে চলে গেল।

সে রাতটা গাছেই কাটাল স্টিম্বল। পরের দিন সকালে সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নেমে এল গাছ থেকে। তারপর ধীর পায়ে সে যখন ব্লেকের পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল তখন তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে।

এদিকে ব্লেক সেদিন তার একজন নিগ্রোভৃত্যকে নিয়ে সিংহের ছবি তোলার জন্য মূল দল থেকে

কিছুটা দূরে চলে গিয়েছিল। বনে ইতস্তত: ঘুরতে ঘুরতে তারা এক জায়গায় একটা বুড়ো সিংহ, একটা সিংহী আর চার পাঁচটা বাচ্চা দেখতে পেল। কিন্তু তাদের দেখতে পেয়ে সিংহগুলো সরে গেল। তখন আকাশে কালো মেঘ থাকায় উপযুক্ত আলো না পেয়ে ছবি তুলতে পারল না ব্লেক।

তখন জনপদের আশায় আরো কিছুটা এগিয়ে গেলে পথের ধারে পাথরের আড়াল থেকে দুজন নিগ্রো এগিয়ে এসে তার পথরোধ করে দাঁড়াল।

তাদের কথাবার্তা থেকে ব্লেক জানতে পারল তাদের দুজনের মধ্যে একজনের নাম পিটার আর অন্যজনের নাম পল বোদকিন। পল বোদকিন তার সঙ্গীকে বলল, এই লোকটাকে দেখে সারাসীন জাতীয় বলে মনে হচ্ছে। এর ভাষা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। একে আমাদের ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে চল।

পিটার বলল, পল, তুমি একে নিয়ে যাও ক্যাপ্টে-নের কাছে, আমি এখানে পাহারায় থাকি। তুমি না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকব আমি।

পল ব্লেককে নিয়ে এগিয়ে চলল। ক্রমে তারা একটা পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়ার পর সুঁড়ঙ্গপথ ধরল।

অনেকক্ষণ যাওয়ার পর ওরা এক প্রাচীন প্রাসাদের সামনে এসে পৌঁছল। গেটে ব্লেককে দেখতে পেয়ে রিচার্ডের কাছে এসে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল মেয়ে ও পুরুষরা।

রিচার্ড তাদের বলতে লাগল, ইনি হচ্ছেন স্যার জেমস হান্টার ব্লেক। ইনি একজন নাইট।

এবার ওদের রাজার কাছে ব্লেককে নিয়ে গেল রিচার্ড। রাজার চেহারাটা লম্বা এবং দামী পোশাক পরা। রাজা ব্লেককে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। ব্লেকের ভিজে ও ছিন্নভিন্ন পোশাক দেখে তাকে নাইট বলে মনে হলো না তার।

রাজকন্যা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, ওঁকে কিন্তু শত্রু বলে মনে হচ্ছে না বাবা।

ব্লেক বলল, আমি একজন আমেরিকাবাসী।

রিচার্ড রাজাকে বলল, না ও শত্রু নয়। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। ওকে কোন না কোন একটা কাজ দিন

রাজা ব্লেককে বলল, তুমি কাজ করবে?

ব্লেক একবার রাজকন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ করব।

স্টিম্বল ব্লেকের সন্ধানে পথ চলতে চলতে একসময় শেখের শিবিরের কাছে এসে পড়ল। ফেজুয়ান নামে একটা ক্রীতদাস তখন বাইরে পাহারা দিচ্ছিল। সে স্টিম্বলকে দেখতে পেয়েই তাকে ধরে নিয়ে গেল শেখ ইবন জাদের কাছে। বলল, একজন শ্বেতাঙ্গ বিদেশীকে বন্দী করে এনেছি।

শেখ স্টিম্বলকে প্রশ্ন করল, কে তুমি?

স্টিম্বল বলল, আমি খেতে না পেয়ে মরতে বসেছি। আগে আমাকে কিছু খাবার দাও।

শেখ খাবার আনতে বলল। শেখের কথা স্টিম্বল বুঝতে না পারায় ফাদ ফরাসী ভাষায় স্টিম্বলকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে বিদেশী? কোথা থেকে আসছ?

স্টিম্বল ফরাসী ভাষা বুঝতে পেরে বলল, আমি একজন আমেরিকান। জঙ্গলে পথ হারিয়ে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছি। ৪৬৪

শেখ ভাবল স্টিম্বলকে আটকে রেখে পরে মুক্তিপণ হিসাবে মোটা রকমের টাকা আদায় করা যাবে। সে তাই ফাদকে বলল, একে তোমার তাঁবুতে বন্দী করে রাখ।

ফাদ স্টিম্বলকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, শেখ তোমায় মেরে ফেলত। ফাদ তোমায় রক্ষা করেছে।

স্টিম্বল বলল, আমি তোমায় অনেক টাকা দেব। ধনী করে দেব তোমায়।

কয়েক দিনের মধ্যে ফাদের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হয়ে উঠল স্টিম্বল। সে ফাদকে বুঝিয়ে দিল আমেরিকায় তার অনেক বিষয়সম্পত্তি আছে। ফাদও ভাবল তাকে দিয়ে তার অনেক উপকার হবে। ফাদ স্টিম্বলকে বুঝিয়ে দিল শিবিরের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে।

ফাদ রাতের বেলায় প্রায়ই লক্ষ্য করত, রাতের খাওয়ার পর কাজকর্ম সেরেই আতিজা গোপনে জায়েদের সঙ্গে দেখা করতে যায়।

একদিন রাত্রিবেলায় ফাদ দেখল খাওয়ার পর তার তাঁবুর সামনে শেখ বসে বিশ্রাম করছে। সে আরও দেখল শিবিরের বাইরে একা একা আতিজার জন্য অপেক্ষা করছে জায়েদ। এই অবসরে সে জায়েদের তাঁবুর ভিতরে গিয়ে তার গুলিভরা বন্দুকটা এনে জায়েদের কাছে দাঁড়িয়ে শেখকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করল।

কিন্তু গুলিটা শেখের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় পড়ল। গুলি করেই বন্দুকটা জায়েদের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল ফাদ। তারপর চেঁচামেচি করতে লাগল। শেখ ও অন্যান্য সকলে ছুটে এলে ফাদ বলল, আল্লার নামে বলছি শেখ, জায়েদ তোমাকে গুলি করেছিল। আমি ওকে ধরে ফেলেছি।

জায়েদ আশ্চর্য হয়ে বলল, ও মিথ্যা কথা বলছে শেখ। আমি একাজ করিনি।

ফাদ বলল, দেখুন এ বন্দুকটা কার।

সকলে পরীক্ষা করে দেখল বন্দুকটা জায়েদেরই। কেউ জানত না ওটা ফাদ লুকিয়ে জায়েদের ঘর থেকে নিয়ে আসে।

শেখ হুকুম দিল, আজ জায়েদকে বেঁধে এক জায়গায় রেখে দাও। কাল সকালেই ওকে গুলি করে হত্যা করা হবে।

আতিজা শেখকে অনেক করে বলল। জায়েদের জন্য বারবার প্রাণভিক্ষা চাইল। কিন্তু কোন ফল হলো না।

রাত্রিতে সবাই শুয়ে পড়লে আতিজা চুপি চুপি জায়েদের কাছে চলে গিয়ে তার হাতের বাঁধন কেটে তাকে মুক্ত করে বলল, বাইরে একটা ঘোড়া রেখেছি, তুমি এই মুহূর্তে এখান থেকে পালিয়ে যাও।

জায়েদ কোন কথা না বলে চলে গেল। তিন দিন ধরে সমানে ঘোড়ায় করে বনের মধ্য দিয়ে যেতে লাগল জায়েদ।

হঠাৎ ঘোড়াটা বনপথে যেতে যেতে একটা সিংহ দেখে একটা লাফ দিতেই জায়েদ পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে। মাটি থেকে উঠেই জায়েদ দেখল একটা সিংহ তার উপর ঝাঁপ দেবার জন্য উদ্যত হয়েছে।

এমন সময় জায়েদ দেখল কোথা থেকে এক দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গ এসে সিংহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঘাড় ধরে তার উপর একটা ধারাল ছোরা বসাতে লাগল। এবার জায়েদ চিনতে পারল এই দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গই টারজন যে একদিন শেখের শিবিরে বন্দী ছিল।

জায়েদ ভাবল টারজন তাকে শেখের লোক ভেবে মারতে পারে। তাই সে অনুনয় বিনয় করে বলল, আমাকে মেরো না, শেখ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

টারজন বলল, শেখ আমার দেশে কি করছে? কি চায় সে, ক্রীতদাস না হাতির দাঁত?

জায়েদ বলল, এ দুটোর কোনটাই চায় না সে। সে চায় নিমুরের ধনরত্ন।

টারজন বলল, কিন্তু তুমি একা কেন? শেখ কেনই বা তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে?

জায়েদ বলল, আমি শেখের মেয়ে আতিজাকে ভালবাসতাম। তাই ফাদ চক্রান্ত করে একটা খুনের ব্যাপারে আমাকে জড়িয়ে দেয়। সে নিজে গুলি করে বলে শেখকে আমি গুলি করেছিলাম। শেখ তাই আমাকে গুলি করে হত্যা করার আদেশ জারি করে। সেইদিন রাত্রিবেলাতেই আতিজা আমার বাঁধন কেটে দিয়ে মুক্ত করে আমাকে পাঠিয়ে দেয়।

টারজন বলল, এখন যাবে কোথায়?

জায়েদ বলল, আমার দেশ সুদানের অন্তর্গত একটা জায়গায়।

টারজন বলল, তুমি সেখানে একা যেতে পারবে না। আমি তোমাকে একটা গাঁয়ে নিয়ে যাব। সেখান থেকে আর একটা গাঁয়ে। এইভাবে তোমাকে তোমার দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করব।

টারজন যখন এইভাবে কথা বলছিল জায়েদের সঙ্গে তখন শেখের মঞ্জিলে চলছিল দারুণ গোলমাল। তোলোগ আর ফাদ চক্রান্ত করছিল দুজনে মিলে শেখের বিরুদ্ধে। ফাদের সঙ্গে স্টিম্বল চক্রান্ত করছিল। ক্রীতদাস ফেজুয়ান ভাবছিল মুক্তির কথা। আর আতিজা জায়েদের জন্য চোখের জল ফেলছিল নীরবে।

শেখ শুধু ভাবছিল নিমুরে যাবার কথা। কিন্তু কোথায় কিভাবে যাবে সেখানে তার কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না।

একদিন ফেজুয়ানকে ডেকে শেখ বলল, তুমি ছেলেবেলায় তোমার গাঁয়ের লোকদের কাছ থেকে নিমুরের গল্প অনেক শুনেছ। তারা নিশ্চয় সেখানে যাবার পথ বলে দিতে পারবে। তোমাকে আপা-

ততঃ মুক্তি দিচ্ছি। তুমি তোমার গাঁয়ে চলে যাও। তারপর গাঁয়ের লোকদের কাছ থেকে সব জেনে আমাকে জানিয়ে যাবে তাহলে তোমাকে অনেক ধনরত্ন দেব।

ফেজুয়ান বলল, কখন যাব তাহলে?

শেখ ইবন জাদ বলল, কাল সকাল হলেই রওনা হবে তুমি।

পথ চলতে চলতে ফেজুয়ান যে তার গাঁয়ের কাছে চলে এসেছে তা বুঝতে পারেনি সে। তার ছেলেবেলায় আরব বেদুইনরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। তাই তার গাঁয়ের পথটা নিজেই ভুলে গেছে সে।

গাঁয়ের কাছে আসতেই একদল নিগ্রো যোদ্ধার সামনে পড়ে গেল।

নিগ্রোরা ফেজুয়ানকে বলল, তুমি আরব হয়ে আমাদের দেশে কি করছ?

ফেজুয়ান বলল, আমি আরব নই, আমিও তোমাদের মত নিগ্রো। তবে আরবরা আমার ছেলেবেলায় আমাকে চুরি করে নিয়ে যায়। সেই থেকে তারা আমায় আটকে রাখে।

নিগ্রোযোদ্ধাদের মধ্যে একজন বলল, তোমার নাম কি?

ফেজুয়ান বলল, আমার আসল নাম উলালা। আরবরা ফেজুয়ান বলে ডাকত।

এবার সেই নিগ্রোটি আনন্দে লাফিয়ে উঠে ফেজুয়ানকে জড়িয়ে ধরল। বলল, উলালা আমার ভাই। আমার নাম তাহো। চল গাঁয়ে নিয়ে যাই। আমরা ভাবতাম তোকে সিংহতে ধরে নিয়ে গেছে। তুই আর বেঁচে নেই।

গাঁয়ে যেতেই সবাই এসে ভিড় করে দাঁড়াল। বাবা মা তাদের হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে আনন্দে চোখের জল ফেলতে লাগল।

উলালা বলল, এক যাদুকর বলেছে প্রাচীন নগরী নিমুরে অনেক ধনরত্ন আছে, আর এক পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে। সেখানে যাবার পথ জানার জন্য আমাকে এক আরব সর্দার আমার গাঁয়ে পাঠিয়েছে। সে পথ বলে দিলে তারা আমাদের মোটা রকমের পুরস্কার দেবে।

গাঁয়ের সর্দার বাতান্দো বলল, তাহলে আমরা সেখানে যাবার পথটা দেখিয়ে দিতে পারি।

উলালা সর্দারকে বলল, তুমি বলেছিলে আরবদের নিষিদ্ধ নগরী নিমুরের পথ দেখিয়ে দেবে।

বাতান্দো বলল, তাদের সঙ্গে আর তাহলে লড়াই করতে হবে না। উত্তর দিকে যে পাহাড় আছে সেই পাহাড়ী পথ দিয়ে নিমুরে প্রবেশ করা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না।

উলালা বলল, কি ধরনের লোক বাস করে নিমুরে তা জান?

বাতান্দো বলল, কেউ তা বলতে পারে না। যারা যায় তারা আর ফেরে না। কেউ বলে সেখানে প্রেতাত্মারা বাস করে। কেউ বলে সেখানে শুধু চিতাবাঘ আছে।

উলালা বলল, তাহলে আমি এখন কি করব?

বাতান্দো বলল, তুমি এখন আরবসর্দার শেখকে গিয়ে বল, আমরা তাদের নিমুরের উপত্যকায় নিয়ে গিয়ে সেখানে যাবার পথ দেখিয়ে দেব। তাদের সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। তবে তাদের হাতে যে সব নিগ্রো ক্রীতদাস আছে তাদের সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে।

উলালা যথাসময়ে চলে গেল শেখের শিবিরে। গিয়ে সব কথা শেখকে বলল। শেখ প্রথমে তার নিগ্রো ক্রীতদাসদের ছেড়ে দিতে রাজী হলো না। কিন্তু উলালা যখন বলল তাদের ছেড়ে না দিলে অন্যান্য নিগ্রোযোদ্ধারা শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠবে তখন বাধ্য হয়ে রাজী হলো শেখ। তবে সে ভাবল আপাততঃ সে রাজী হলেও পরে সুযোগ পেলেই সে মত পরিবর্তন করবে।

উলালার কথামত শেখ ইবন জাদ তিনদিন অপেক্ষা করল।

এদিকে টারজন জায়েদকে একটা আদিবাসী গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে সর্দারকে বলল, একে তোমাদের গাঁয়ে রেখে দেবে।

সর্দার রাজী হয়ে গেল। জায়েদ তখন নির্জনে টারজনকে ডেকে বলল, আমার একটা কথা আছে বন্ধু। আমি একবার আতিজাকে শুধু চোখের দেখা দেখতে চাই। আমার বিশ্বাস ইবন জাদ তার দলবল নিয়ে এই পথেই নিমুরে যাবে। আমার অনুরোধ, শেখের দল না আসা পর্যন্ত তুমি আমার এই গাঁয়েই থাকার ব্যবস্থা করে দাও।

টারজন বলল, ঠিক আছে, তাই হবে। তুমি আজ হতে দুমাস এই গাঁয়ে থাকবে। এর মধ্যে শেখ যদি আসে তাহলে আমি তোমাকে আমার গাঁয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। সেখান থেকে তোমার দেশ সুদান যাবার ব্যবস্থা করে দেব।

জায়েদ টারজনকে কথায় কথায় বলেছিল শেখের শিবিরে একজন বন্দী আছে। টারজন ভাবল সে শ্বেতাঙ্গ হবে হয় স্টিম্বল না হয় ব্লেক।

এদিকে নিমুরের রাজপ্রাসাদে মলাদ নামে একজন নাইটের সঙ্গে ব্লেকের শত্রুতা ক্রমশই বেড়ে চলতে লাগল। ব্লেক সব সময় হাসিখুশিতে মেতে থাকলেও তাকে একেবারেই সহ্য করতে পারল না মলাদ। রাজার কাছে ব্লেকের নামে প্রায়ই নিন্দা করত নানারকম। রিচার্ড অবশ্য ব্লেককে তরোয়াল খেলা, ঘোড়ায় চাপা প্রভৃতি নাইটদের নানারকম কার্যকলাপ ও আদবকায়দায় কুশলী করে তোলার চেষ্টা করে যেতে লাগল।

একদিন মলাদের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ ও বিরক্ত হয়ে পরদিন তার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে চাইল ব্লেক।

ডুয়েলের আগে ব্লেকের পরম বন্ধু রিচার্ড কতকগুলো সৎ পরামর্শ দিল।

রিচার্ড বলল, সে যদি তোমার রক্তপাত ঘটিয়ে ক্ষান্ত হতে চাইত তাহলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে সে তোমার মৃত্যু ঘটাতে চায়। তার প্রথম কারণ তুমি তাকে পাঁচজনের সামনে অপমান করেছ। দ্বিতীয় কারণ সে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চায় এবং এজন্য সে তোমার প্রতি ঈর্ষান্বিত। কারণ সে জানে রাজকন্যার প্রতি তোমার দুর্বলতা আছে।

ব্লেক হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল রিচার্ডের কথাটা।

পরদিন সকাল সাতটা বাজতেই ওরা রাজপ্রাসাদের সামনের প্রাঙ্গণে গিয়ে উপস্থিত হলো। ব্লেক আর মলাদ দুজনেরই সঙ্গে একজন করে নাইট থাকবে। ব্লেকের সঙ্গে থাকবে রিচার্ড। রাজা এক জায়গায় বসল। রাণী ও রাজকন্যা জিনালদা তার পাশেই বসেছিল। দর্শকরা সব চারদিকে ঘিরে বসল। দুপক্ষেরই প্রচুর সমর্থক ছিল।

ডুয়েল শুরু হয়ে গেল। জয়ঢাক বাজতে লাগল। ব্লেক আর মলাদ দুজনেই ঘোড়ায় চড়ে এসে দুজনের মুখোমুখি হলো।

ব্লেক মলাদের সামনে এলেই তার ঢালটা ফেলে দিল মাটিতে। মলাদ তার তরবারি দিয়ে ব্লেকের মাথায় আঘাত করতে এলেই ব্লেক ঘোড়াটা সরিয়ে নিয়ে তার লক্ষ্য ব্যর্থ করে দিল। তারপর অকস্মাৎ তার তরবারি দিয়ে মলাদের পাঁজরের উপর এক জায়গায় আঘাত করল। জায়গাটা ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। মলাদের কোন আঘাতই লাগল না ব্লেকের গায়ে। একমাত্র মলাদের হাত থেকে তরবারিটা পড়ে গেল। এক্ষেত্রে নিয়ম অনুসারে মলাদকে ব্লেকের কাছে প্রাণভিক্ষা করতে হবে। কিন্তু অহঙ্কারের বশে তা করল না মলাদ। তা না করলেও উদারতাবশতঃ ব্লেক মলাদের সহযোগী নাইটকে আর একটি তরবারি দিতে বলল মলাদকে।

মলাদকে আবার তরবারি দেওয়া হলে আবার লড়াই শুরু হলো। দর্শকরা সবাই বুঝতে পারছিল ব্লেকই জিতছে। এবার মলাদ জয়লাভের জন্য জোর চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ব্লেকের তরবারির এক প্রচণ্ড আঘাত মলাদের মাথায় লাগতেই মলাদ ঘোড়া থেকে সোজা মাটিতে পড়ে গেল।

ব্লেক তখন ঘোড়া থেকে নেমে মলাদের বুকের উপর একটা পা রেখে তার গলার উপর তরবারির মুখটা ঠেকিয়ে রাজাকে বলল, হে রাজন, আমি লড়াইয়ে জয়ী হলেও আমার প্রতিপক্ষ এই নাইটকে হত্যা করব না। এ আপনার কাজে নিযুক্ত থেকে আপনার সেবা করে যেতে পারবে।

এই বলে সে রিচার্ডের সঙ্গে সেখান থেকে তার বাসায় চলে গেল। সকলেই ব্লেককে নিমুরের সর্বশ্রেষ্ঠ নাইট বলে অভিনন্দন জানাতে লাগল।

ব্লেক বলল, আমি যে দেশের মানুষ সে দেশের এটাই হলো রীতি। শত্রু পরাজিত বা নিরস্ত্র হলে তাকে আঘাত করা উচিত নয়।

রাজা নিজে স্বীকার করল ব্লেকের কাছে, সত্যিই তোমার উদারতা ও বীরত্ববোধের তুলনা হয় না। তুমি যে দেশের মানুষ সে দেশের রীতিনীতি আমার জানতে ইচ্ছা করছে।

সেদিন শেখের মঞ্জিলে ফেজুয়ানের কথামত বাতান্দোরা না আসায় ইবন জাদ খুব ভাবছিল। এমত অবস্থায় কি করা যায় তা নিয়ে যুক্তি করছিল তোলোগের সঙ্গে। তখন রাত্রিকাল।

এমন সময় হঠাৎ টারজন তাদের সামনে এসে হাজির হতেই চমকে উঠল সবাই। ইবন জাদ বলল, টারজন এসে গেছে। আল্লার অভিশাপ নেমে আসুক ওর মাথায়।

আরবদের মধ্যে স্টিম্বলকে দেখেই টারজন প্রথমে তাকে বলল, ব্লেক কোথায়?

স্টিম্বল বলল, আমি জানি না। সেত অন্য দিকে গেছে।

টারজন বলল, তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

এরপর শেখ ইবন জাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে টারজন বলল, তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলেছ। তুমি বলেছিলে ব্যবসার খাতিরে তোমরা এখানে আছ। অথচ তোমরা একটা প্রাচীন নগরীতে গিয়ে ধনরত্ন লুণ্ঠন করে আনার জন্যই এখানে আছ।

শেখ ব্যস্ত হয়ে বলল, কে বলেছে তোমাকে একথা ? এটা মিথ্যা কথা। বল কে বলেছে ?

টারজন বলল, যে বলেছে সে মিথ্যাবাদী নয়। যে বলেছে সে হলো জায়েদ।

টারজন এবার শেখকে বলল, কালই তোমাদের এখান থেকে রওনা হতে হবে। তোমরা সোজা তোমাদের দেশে চলে যাবে। তোমাদের মনের মধ্যে কুমতলব না থাকলে কেন তোমরা এর আগে আমাকে বন্দী করে আমার জীবন-নাশের চেষ্টা করো ?

তোলোগ সঙ্গে সঙ্গে বলল, না না, আমি ঠাট্টা করছিলাম তোমার সঙ্গে। আমি মারতে চাইনি।

টারজন বলল, যাই হোক, আমার শোবার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দাও। এবার যেন কোন চক্রান্ত করো না।

এদিকে সবাই শুয়ে পড়লে শেখ তার ভাই তোলোগের সঙ্গে যুক্তি করতে লাগল। শেখ ঘুমন্ত টারজনকে ছুরি মেরে হত্যা করার কথা বলল তোলোগকে।

শেখ বলল, যেমন করে হোক ওকে সরানো চাই। আমরা এতদিন এখানে বসে থেকে ধনরত্ন না নিয়ে শুধু হাতে ফিরে যেতে পারব না। এক কাজ করো, স্টিম্বলকে ডেকে আন।

স্টিম্বল এলে শেখ বলল, টারজন বলেছে তুমিই ব্লেককে হত্যা করেছ। তার জন্য আগামীকাল হত্যা করবে টারজন তোমায়।

স্টিম্বল বলল, তুমি আমাকে বাঁচাও। তোমাকে অনেক ধনরত্ন দেব আমি।

শেখ বলল, আমি কোন কিছু করতে পারব না। তুমি নিজেই নিজেকে উদ্ধার করতে পার। তুমি ঘুমন্ত টারজনকে ছুরি মেরে হত্যা করতে পার। তোমাকে আমি এই সুযোগ দিতে পারি।

স্টিম্বল বলল, আমি কখনো কাউকে হত্যা করিনি জীবনে।

শেখ বলল, হয় হত্যা কর না হয় নিহত হও।

স্টিম্বল একটা ছুরি হাতে নিয়ে টারজনের ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

স্টিম্বল চলে গেলে তোলোগ শেখকে বলল, স্টিম্বল টারজনকে হত্যা করলে টারজনের লোকরা এলে আমরা বলব আমাদের কোন দোষ নেই। তাকে আমরা রাতের মত আশ্রয় দিয়েছিলাম কিন্তু স্টিম্বল তাকে হত্যা করেছে।

এদিকে আতিজা ঘুমোয়নি। কান পেতে সব কথা শুনে সে টারজনকে সর্তক করে দেবার জন্য তার ঘরে গেল। কিন্তু ঘরে ঢুকতে যেতেই তোলোগ তাকে ধরে ফেলল। বলল, এই বিদেশী জায়েদের বন্ধু বলে তাকে বাঁচাতে যাচ্ছিস ? চলে যা এখান থেকে।

কিন্তু আতিজা সেখান থেকে চলে আসতেই পিছন থেকে টারজন ধরে ফেলল তোলোগকে। তার গলাটা টিপে ধরল এমনভাবে যে সে চীৎকার করতে পারল না। তারপর তাকে হত্যা করে তার বিছানায় শুইয়ে রেখে ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল বনের মধ্যে।

এদিকে স্টিম্বল ঘরে ঢুকে কাপড় ঢাকা তোলোগের মৃতদেহটাকে ঘুমন্ত টারজন ভেবে বারবার ছুরিটা বসিয়ে দিতে লাগল সেই দেহের মধ্যে। অবশেষে সে টলতে টলতে শেখের কাছে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে শেখের মূর্তিটা পাল্টে গেল। সে চীৎকার করে সবাইকে জড়ো করে বলল, স্টিম্বলকে বেঁধে বন্দী করে রাখ ও আমাদের বন্ধু টারজনকে হত্যা করেছে। কাল ওর বিচার হবে।

কাপড়ঢাকা অবস্থাতেই সেই রাত্রিতে তোলো-গের মৃতদেহটাকে কবর দিল ওরা। পরদিন সকালে তোলোগকে শিবিরের কোথাও পাওয়া না গেলে অনেকে বলল, সে হয়ত একা একা কোথাও শিকার করতে বেরিয়ে গেছে।

পরদিন সকালে শেখ শিবির গুটিয়ে সর্দার বাতা-ন্দোর গাঁয়ে গিয়ে নিজেই হাজির হলো। সর্দার তাকে যথেষ্ট খাতির করে বলল, আমরা তোমাকে পথ দেখিয়ে দেব। তবে আমাদের জাতির সব ক্রীতদাসকে মুক্তি দিতে হবে।

শেখ বলল, তাহলে আমাদের মালপত্র বইবে কারা?

বাতান্দো বলল, নিমুরের উপত্যকা পর্যন্ত আমরা সবাই যাব। তারপর আমাদের সঙ্গের সব ক্রীত-দাসরা চলে আসবে।

ধনরত্নের লোভে তাতেই রাজী হয়ে গেল শেখ। শেখ বাতান্দোর সঙ্গে উত্তরদিকে একটা পাহাড়ের কাছে শিবির স্থাপন করে তার দলের মেয়েদের রেখে উপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থা করল। তারপর কিছু সশস্ত্র আরব আর তার দেশ থেকে আনা কিছু ক্রীতদাস নিয়ে পাহাড়ের ওপারে সেই উপত্যকাটায় গিয়ে পৌছল।

বাতান্দো একটা উঁচু জায়গা থেকে শেখকে দেখাল, উপত্যকাটার ওধারেই আছে সেই নিষিদ্ধ নগরী নিমুর।

নিমুর থেকে কিছু দূরে উপত্যকাটার ওধারে সিটি অফ সেপালকার নামে একটি নগরী ছিল। সেই নগরীর রাজা ছিল বোহান। আজ হতে সাতশো বছর আগে এই দুই দেশের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি এবং যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। পরে এক

চুক্তিবলে শান্তি স্থাপিত হয়।

সেই থেকে প্রতি বছর তিনদিন ধরে এক যুদ্ধ-ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দুই দেশের নাইট ও বীরপুরুষেরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পাবে। যে দেশ এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয় সেই দেশ বিজিত দেশের রাজার কাছ থেকে পাঁচজন সুন্দরী মেয়েকে বাছাই করা হয়। দুটি দেশ থেকেই পাঁচজন করে সুন্দরী মেয়েকে পুরস্কার হিসাবে সাজিয়ে রাখা হয়। যে দেশ জয়লাভ করে সেই দেশের বীর নাইটদের হাতে বিজিত দেশ তাদের পাঁচজন মেয়েকে তুলে দেয়।

মোট তিনদিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলে। প্রতিদিন কয়েকবার করে খেলা হয়। প্রতিবার বিরাট খোলা মাঠটার দুদিকে একশোজন করে দুই দেশের নাইট ঘোড়ায় চেপে সারবন্দীভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এবার দক্ষিণ দিকে নিমুরের দল আর উত্তরদিকে সিটি অফ সেপালকারের দল ছিল। জয়ঢাক বাজতে থাকে। সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুপক্ষের নাইটরা এক এক-জন বীর প্রতিপক্ষকে বেছে নিয়ে আক্রমণ করে। ঘোড়ার উপর থেকে তরবারি আর কখনো বা বর্শা দিয়ে যুদ্ধ হয়।

যাই হোক, খেলা শেষে দেখা গেল দুই পয়েন্টে নিমুরই জয়লাভ করল প্রতিযোগিতায়। নিমুরের নাইটরা সবাই ঘোড়ায় করে উল্টো দিকে প্রতিপক্ষ-দের শিবিরে চলে গেল পুরস্কার নেবার জন্য।

এমন সময় সিটি অফ সেপালকারের রাজা বোহান তিন-চারজন নাইট আর একটা খালি ঘোড়া এনে রাজকন্যা জিনালদাকে জোর করে ধরে খালি ঘোড়াটায় চাপিয়ে তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল। তার নাইটরাও চলে গেল তার পিছু পিছু।

এদিকে বাতান্দোগা সেই শূন্য বিরাট উপত্যকার প্রান্ত থেকে চলে গেলে শেখ তার দলবল আর অনেকগুলো বন্দুক নিয়ে উপত্যকাটা পার হয়ে সেই নিষিদ্ধ নগরীর দিকে এগিয়ে চলতে লাগল। সে নিমুরের পথে না গিয়ে বোহানের রাজ্য সিটি অফ সেপালকারের পথে যেতে লাগল।

শেখ নগরদ্বারে গিয়ে দেখল বাইরে লোকজন বেশী নেই। মাত্র দুই তিনজন প্রহরী নগরদ্বারে হাতে শুধু বর্শা আর কোমরে তরবারি নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

শেখের লোকেরা বন্দুক থেকে একটা গুলি করতেই একজন প্রহরী মারা গেল আর একজন আহত হলো।

নগরের মধ্যে ঢুকে বিশেষ কোন বাধা পেল না শেখরা। তাদের হাতে বন্দুক দেখে এবং দুই-একটা গুলি খেয়ে ভয়ে পালাতে লাগল সবাই।

শেখ তার দলের লোকদের নিয়ে সোজা রাজ-প্রাসাদে ঢুকে পড়ল। প্রাসাদের মধ্যে শেখ দেখল অনেক মণিমুক্তো, সোনা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু ছড়ানো রয়েছে।

শেখ ইবন জাদ অনেকগুলো বস্তা বার করে তাতে যতদূর সম্ভব ধাতুগুলো ভরে নিল। তারপর সেই সব ধনরত্ন নিয়ে অবাধে ও নিরাপদে চলে না গিয়ে সে অন্য একটা পরিকল্পনা করল।

রাত্রিবেলায় শেখ ভাবল এই প্রাসাদের শীর্ষদেশ থেকে সে আজ দেখেছে উপত্যকাটা যেখানে গিয়ে দূরে একটা পাহাড়ের পাদদেশে মিশেছে সেই পাহাড়ের কোলে এই ধরনের আর একটা নগরী আছে। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলল কাল সকালেই সে সদলবলে যাবে সেখানে।

এদিকে সেদিন রাত্রিতে শেখের শিবির হতে বেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে রাত কাটিয়ে পরদিন সকাল থেকে ব্লেকের খোঁজ করতে থাকে টারজন।

টারজন নিমুরের উপত্যকায় পাথরের বিরাট ক্রসটার কাছে এসে দুজন প্রহরীকে দেখে একটা ঝোপের ধারে লুকিয়ে পড়ল। একজন প্রহরীকে সে অতর্কিতে আক্রমণ করে মাটিতে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কোন্ রাজ্যের লোক? তোমাদের রাজ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ এসেছে? আমার কথার যদি ঠিক ঠিক জবাব দাও তাহলে তোমার কোন ক্ষতি করব না।

প্রহরীটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজিতে উত্তর করল, আমাদের এই রাজ্যের নাম নিমুর। এখানে কিছুদিন আগে এক শ্বেতাঙ্গ আসে। তার নাম স্যার জেমস ব্লেক।

টারজন বলল, এখন সে কোথায়? কি করছে?

প্রহরী বলল, এখন সে একজন বীর নাইট হয়েছে। আমাদের নিমুরের সম্মান রক্ষার জন্য সে এখন সেখানকার নগরীর সঙ্গে আমাদের যে যুদ্ধক্রীড়া প্রতিযোগিতা হচ্ছে তাতে অংশগ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানের মাঠে ওরা পৌঁছে দেখল সেখানে দারুণ গোলমাল চলছে। এইমাত্র বোহান নিমুরের রাজকন্যা জিনালদাকে জোর করে নিয়ে পালিয়ে

গেছে। সে যাবার পর সেপালকারের নাইটরাও তার পিছু পিছু পালিয়ে গেছে। একথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক সহ নিমুবের নাইটরাও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে।

কথাটা শুনে বাট্রাম টারজনকে বলল, যাবে আমার সঙ্গে?

টারজন নীরবে তার ঘোড়াটা বাট্রামের পিছু পিছু ছুটিয়ে দিল।

ব্রেক সোজা গিয়ে যে নাইটটা জিনালদাকে নিয়ে যাচ্ছিল তার পাঁজরে তরবারিটা আমূল বসিয়ে দিল। নাইটটা ঘোড়া থেকে পড়ে যেতেই ব্রেক জিনালদার হাত ধরে তাকে নিজের ঘোড়াটার উপর চাপিয়ে নিল। তখন পাশের অন্য নাইটদুটো ব্রেককে আক্রমণ করতে এলে ব্রেক তার প্যান্টের পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করে গুলি করল পরপর দুটো।

গুলি খেয়ে দুটো নাইটই পড়ে গেল ঘোড়া থেকে এবং তাদের দলের অন্য সব নাইটরা পালিয়ে গেল ব্রেককে ছেড়ে দিয়ে। নিমুরের নাইটরা তখন তাড়া করে নিয়ে যেতে লাগল। এই অবকাশে ব্রেক জিনালদাকে নিয়ে পাশের একটা বনে গিয়ে প্রবেশ করল।

জিনালদা তাকে বলল, সত্যিই তুমি বীর। তুমি যেভাবে আমাকে উদ্ধার করেছ তা কল্পনা করাও যায় না।

ব্রেক তখন সত্যিই বড় ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সে জিনালদাকে বলল, আমি আজ সকাল থেকে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তুমি আমাদের ঘোড়াটাকে এনে গাছের সঙ্গে বেঁধে দাও।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই করল জিনালদা। তারপর বনের মধ্যে চারদিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল সে। তার মনে হলো এখনি হয়ত কোন হিংস্র জন্তু বেরিয়ে এসে আক্রমণ করবে তাদের।

জিনালদা এবার ব্রেককে বলল, চল রওনা হওয়া যাক। তোমার ঐ আগ্নেয়াস্ত্রটা দিয়ে কত জন্তু তুমি মারবে?

এরপর সন্ধ্যা না হতেই বনপথে রওনা হয়ে পড়ল ওরা।

এদিকে ইবন জাদ তার সহচরদের নিয়ে বনের গভীরে এগিয়ে গেল। ওরা পশ্চিম দিক থেকে যেখানে ব্রেক জিনালদাকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানে গেল।

শেখ বলল, ওকে এইখানে বাঁধা অবস্থায় ফেলে রেখে মেয়েটাকে নিয়ে চলে যাও। ও এখানে মারা গেলে আমাদের কোন দোষী হতে হবে না।

শেখেরা সবাই চলে গেলে ব্রেক হাত পা বাঁধা অবস্থায় সেখানেই পড়ে রইল। সন্ধ্যা হতেই চাঁদ উঠল আকাশে। বনের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গাটায় পড়েছিল ব্রেক সেখানে কিছুটা চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা চিতাবাঘ এগিয়ে এল তার দিকে। তার জ্বলন্ত চোখদুটো দেখতে পেল ব্রেক!

কিন্তু চিতাবাঘটা তাকে লক্ষ্য করে একটা লাফ দিতেই ব্রেক দেখল গাছের উপর থেকে একটা মোটা দড়ির ফাঁস এসে তার গলার উপর পড়ল আর তার গলাটা আটকে গেল। বাঘটা শূন্যে ঝুলতে লাগল।

এবার গাছ থেকে এক দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গ নেমে এসে ব্লেকের সামনে দাঁড়াল। তাকে দেখে ব্লেক বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল, টারজন তুমি!

টারজনও বিস্মিত হয়ে বলল, ব্লেক তুমি! তোমাকে কত খুঁজে চলেছি আমি।

ব্লেকের হাত পায়ের সব বাঁধন ছুরি দিয়ে কেটে দিল টারজন।

টারজন বলল, কারা তোমায় এভাবে বেঁধে রেখে গেল?

ব্লেক বলল, একদল আরব। একটি মেয়ে আমার কাছে ছিল। তাকে তারা ধরে নিয়ে গেছে।

টারজন প্রশ্ন করল, কখন কোন্ পথে গেছে তারা?

ব্লেক একটা পথ দেখিয়ে বলল, ঘণ্টাখানেক আগে ঐ পথে গেছে তারা।

ওরা দুজনে সেই পথে কিছুদূর এগিয়ে গেলে টারজন বাতাসে গন্ধসূত্র ধরে বলল, এইখান থেকে আরবরা দুদলে বিভক্ত হয়ে দুদিকে গেছে। একদল গেছে উত্তর দিকে আর একদল গেছে দক্ষিণ দিকে নিমুরের পথে। তবে তুমি যে মেয়ের কথা বলছ তাকে শেখ উত্তর দিকে পাহাড়ের ওপারে নিয়ে গেছে। আমি জানি সেখানেই শেখের মঞ্জিল আছে। অবশ্য এটা আমার অনুমান। তুমি এখন উত্তর দিকে যাও। আমি যাব দক্ষিণ দিকে। আমি তোমার থেকে তাড়াতাড়ি যেতে পারব। আমি দক্ষিণ দিকে তাকে না দেখতে পেলে তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে তোমাকে ধরব। আর তুমি তাকে পেলে দক্ষিণ দিকে আমার কাছে চলে যাবে।

এই কথা বলে ব্লেকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল টারজন।

সারারাত ধরে ক্রমাগত উত্তর দিকে এগিয়ে চলল ইবন জাদ তাদের দলের লোকদের নিয়ে।

শেখ সদলবলে এগিয়ে যেতে থাকল। একদিকে ধনরত্ন আর একদিকে এক সুন্দরী যুবতী। শেখের দারুণ ভয় হচ্ছিল। তার কেবলি ভয় হচ্ছিল কোন লুণ্ঠনকারী হয়ত এগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে। পথ চলার সুবিধার জন্য শেখ ধনরত্নগুলো ভাগ করে কয়েকটা বস্তায় ভরে বিশ্বস্ত কয়েকজন অনুচরের হাতে দিয়ে দেয়। জিনালদার ভার দেয় ফাদের হাতে। স্টিম্বলের জ্বর হয়েছিল। দুর্বল ও রুগ্ন অবস্থায় পথ হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল তার। তবু সে ফাদের পাশাপাশি অতি কষ্টে পথ হেঁটে যাচ্ছিল।

পাহাড়টার পাদদেশে এসে আবার ইবন জাদ পূব দিকের একটা পথ ধরল। কারণ সে বাতান্দো-দের গাঁয়ের কাছ দিয়ে যেতে চাইছিল না। তাতে নতুন বিপদ দেখা দিতে পারে।

সেদিন রাত্রিতে শিবিরে খুব তাড়াতাড়ি রান্নার কাজটা সারা হয়ে গেল। আতিজা একটু দূর থেকে দেখল ফাদ সবার অলক্ষ্যে শেখের খাবারে কি একটা জিনিস ফেলে দিল। তা দেখে সন্দেহ হলো আতিজার। সে ভাবল ফাদ হয়ত বিষ মিশিয়ে দিয়েছে তার বাবার খাবারের মধ্যে। তাই যেই খাবার জন্য তার বাবা মুখে তুলতে গেল সে এসে খাবারের থালাটা ছিনিয়ে নিল তার বাবার হাত থেকে। শেখ এর কারণ জানতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে ফাদ তার বন্দুকটা নিয়ে চলে গেল। সে প্রথমে মেয়েদের তাঁবুতে গিয়ে জিনালদাকে ধরে

তাকে টানতে টানতে তার তাঁবুতে নিয়ে গেল। সেখানে স্টিম্বলকে ডেকে বলল, শেখ তোমাকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছে। বাঁচতে চাও ত এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে পালিয়ে চল।

এদিকে আতিজা যখন শেখকে বলল ফাদ তার খাবারে বিষ মিশিয়ে পালিয়ে গেছে তখন শেখ ফাদকে ধরে আনার হুকুম দিল। একজন লোক ফাদকে ধরার জন্য তার শিবিরের দিকে গিয়ে দেখল, ফাদ জিনালদা আর স্টিম্বলকে সঙ্গে করে পালাচ্ছে। তারা তাকে ধরতে গেলে ফাদ গুলি করল বন্দুক থেকে। ওদের হাতে তখন অস্ত্র না থাকায় ওরা ফিরে এল। ফলে অবাধে শিবিরের সীমানা ছেড়ে পালিয়ে গেল ফাদ।

এদিকে টারজন দক্ষিণ দিকে গিয়ে শেখের আবদেল আজিজের দলটাকে ধরে ফেলল। কিন্তু যখন দেখল তাদের দলে কোন মেয়ে বন্দী নেই তখন সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিকে ফিরে পথ চলতে লাগল।

শেখের দল সেপালকার নগরীর সীমান্তবর্তী পাহাড়টার পূর্ব প্রান্ত থেকে আবার দক্ষিণ দিকে যেতে টারজন তাদের দেখতে পেল। কিন্তু সে দলে স্টিম্বল আর জিনালদাকে দেখতে পেল না।

শেখকে দেখে প্রচণ্ড রাগ হলো টারজনের। শেখ তাকে বরাবর মিথ্যা কথা বলে ঠকিয়ে এসেছে।

টারজন দেখল পাঁচজন লোক বস্তাভরা ধনরত্নগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বোঝাভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ধীর গতিতে পথ হাঁটছিল তারা।

সহসা সবার অলক্ষ্যে একটা বিষাক্ত তীর এসে শেখের পাশে হাঁটতেথাকা একজন মালবাহকের গলাটাকে বিদ্ধ করল ভীষণভাবে। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল লোকটা। শেখরা অবাক হয়ে গেল। কোথাও কোন শত্রুকে দেখতে পেল না ওরা। শুধু পোকামাকড়ের ডাক ছাড়া আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

সন্ধ্যে হতে পার্বত্য অরণ্যের মাঝখানেই পথের ধারে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করল শেখ।

মৃতদেহটাকে পথের উপর ফেলে এসেছে তারা।

এদিকে আতিজার তাঁবুর পিছন দিকের পর্দাটা সরিয়ে সহসা একজন অন্ধকারে ঢুকে একটা হাত তার মুখে আর একটা হাত তার ঘাড়ের উপর দিয়ে কে বলল, কোন শব্দ করো না। চেঁচিও না, আমার কথার উত্তর দাও। তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

আতিজা বুঝল, এ নিশ্চয় কোন জিন বা অপদেবতার কাজ।

টারজন বলল, বল ইবন জাদ উপত্যকা হতে যে মেয়েটিকে ধরে এনেছিল সে এখন কোথায়?

আতিজা বলল, ফাদ তাকে নিয়ে পালিয়েছে।

টারজন আবার বলল, জায়েদকে যদি বাঁচাতে চাও তাহলে সত্যি কথা বল আমায়। তারা কোথায়?

আতিজা বলল, সত্যি বলছি, গতরাতে মঞ্জিল থেকে তারা পালিয়েছে। এখন কোথায় তা জানি না।

কারাগারের মধ্যে যে দুজন নগ্নদেহ বন্দী ছিল তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল ব্লেক।

সহসা কার পদশব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠল ব্লেক। সঙ্গে সঙ্গে একটা বাতির আলো এগিয়ে আসতে লাগল কারাগারের অন্ধকারে। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্লেক দেখল বাতি হাতে সেখানকার দুজন নাইট তার সামনে এসে দাঁড়াল। ব্লেক তাদের চিনতে পারল। তারা হলো স্যার গী আর স্যার উইলডারর্ড।

উইলডারর্ড বলল, স্যার গী আর আমি শুনলাম আগামীকাল তোমাকে পুড়িয়ে মারা হবে? আমরা তাই তোমাকে মুক্ত করার জন্য এসেছি। তোমার মত একজন বীর নাইটকে এভাবে হত্যা করলে এখানকার সব নাইটদের সারাজীবন ধরে এক অনপনেয় কলঙ্কের বোঝা বয়ে যেতে হবে।

এই কথা বলেই উইলডারর্ড ব্লেকের হাত পায়ের লোহার শিকলের বাঁধনগুলো খুলে দিল।

ব্লেক বলল, তোমরা আমায় মুক্ত করে দিচ্ছ, একথা বোহান জানতে পারলে তোমাদের প্রাণ যাবে।

উইলডারর্ড বলল, না, জানতে পারবে না। স্যার গী তোমার সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে গিয়ে নগরপ্রান্তে পৌঁছে দিয়ে আসবে তোমায়। সেখান থেকে তুমি নিমুরে চলে যাবে।

স্যার গী এবার ব্লেককে বলল, একটা কথার উত্তর দেবে? তুমি রাজকন্যা জিনালদাকে নিজের হাতে উদ্ধার করেছিলে। কিন্তু আরবরা তাকে কিভাবে ধরে নিয়ে গেল?

ব্লেক তখন যা যা ঘটেছিল সব কথা খুলে বলল তাদের।

তখন বিকালবেলা। বাঁদর-গোরিলাদের রাজা তোয়াৎ তার দলের গোরিলাদের নিয়ে বনের মধ্যে আহার অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছিল। তাদের দিকে ধীর গতিতে তিনজন লোক আসছিল। একজন আরব, একজন শ্বেতাঙ্গ আর একজন নারী।

আগন্তুক তিনজনের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ বৃদ্ধ জ্বরে ভুগছিল। রুগ্ন অবস্থায় সে একটা গাছের ডাল লাঠির মত করে ধরে তার উপর ভর দিয়ে পথ হাঁটছিল। আরব লোকটির হাতে একটা বন্দুক ছিল। মেয়েটির পোশাকটা জমকালো হলেও তা ময়লা এবং ছেঁড়া।

জিনালদাকে তার লোমশ হাত দিয়ে ধরে ফেলল তোয়াৎ। সে তাকে নিয়ে পালাতে চাইল। কিন্তু গোয়াদ নামে আর একটা বাঁদর-গোরিলা দাঁত বার করে তোয়াতের দিকে তেড়ে এল জিনালদাকে কেড়ে নেবার জন্য।

তোয়াৎ জিনালদাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু সে বেশীদূর যেতে পারল না। গোয়াদ তাকে তাড়া করল। তখন জিনালদাকে নামিয়ে দিয়ে গোয়াদের সঙ্গে লড়াইয়ে মত্ত হয়ে উঠল তোয়াৎ।

ওরা যখন দুজনে জোর লড়াই করছিল জিনালদাকে হাত করার জন্য তখন চেষ্টা করলে সেই অবসরে পালিয়ে যেতে পারত জিনালদা। কিন্তু সে তখন অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ায় পালাতে পারল না।

এমন সময় সেখানে কালো কেশরওয়ালা সোনালী রঙের একটা সিংহ এসে পড়ায় লড়াই ছেড়ে পালিয়ে গেল তোয়াৎ আর গোয়াদ। সিংহের গায়ের সোনালী চামড়টা শেষ বিকালের সূর্যের আলোয় চকচক করছিল।

সিংহটা কাছে এসে পড়ায় জিনালদা কোন উপায় না দেখে শুয়ে পড়ল। সিংহটা এসে জিনালদার শায়িত দেহটা শুঁকতে লাগল।

এদিকে জায়েদের নেতৃত্বে টারজনের একশো-জন ওয়াজিরি যোদ্ধা উত্তর দিকে আরবদের খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ এক জায়গায় তারা তিন-জনের পায়ের ছাপ দেখতে পায়। তিনজনের পায়ের ছাপের মধ্যে একজন মহিলার চটির ছাপ ছিল। জায়েদ তা দেখে বুঝল ওটা আতিজার চটির ছাপ।

এমন সময় ওরা দুজন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। লোকদুটো সেইদিকেই আসছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল ফাদ। ফাদকে চিনতে পেরে তার কাছে ছুটে গিয়ে জায়েদ জিজ্ঞাসা করল, আতিজা কোথায়?

ফাদ ভয় পেয়ে গেল। বলল, আমি জানি না।

জায়েদ রেগে গিয়ে তার ছোরাটা ফাদের বুকে আমূল বসিয়ে দিল। ফাদ সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ল। জায়েদ তখন তার ওয়াজিরি দল নিয়ে আবার উত্তর দিকে চলে গেল।

এদিকে টারজন জিনালদার খোঁজ করতে করতে তার গন্ধসূত্র ধরে উত্তর দিক থেকে এসে সেই বনটায় ঢুকল। অবশেষে এক জায়গায় তোয়াতের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তোয়াতের কাছ থেকে জানল জিনালদাকে একটা সিংহ ধরেছে।

টারজন জিজ্ঞাসা করল, কোথায়?

তোয়াৎ জায়গাটা দেখিয়ে দিলে টারজন সেখানে গিয়ে দেখল একটি মেয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে রয়েছে মরার মত আর তার পাশে একটা সোনালী সিংহ বসে রয়েছে থাবা গেড়ে।

জিনালদা কার পায়ের শব্দ শুনে শুয়ে শুয়েই চোখ মেলে তাকাল।

টারজন সিংহটাকে দেখেই তাকে ডাক দিল, জাদ-বাল-জা, চলে এস এদিকে।

জিনালদা আশ্চর্য হয়ে দেখল এক দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গ মানুষটি ডাক দিতেই সিংহটা তার কাছে পোষা কুকুরের মত ছুটে গেল।

টারজন এবার জিনালদার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, তুমিই রাজকন্যা জিনালদা?

জিনালদা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

টারজন তাকে বলল, তুমি কি আহত? আর ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি তোমার বন্ধু। তোমার সঙ্গীরা কোথায়?

জিনালদা সব ঘটনার কথা বলল একে একে। পরে প্রশ্ন করল, কে তুমি, আমাকে চিনলে কি করে?

টারজন বলল, আমি টারজন জেমস ব্লেকের বন্ধু। সে আর আমি তোমারই খোঁজ করছিলাম।

জিনালদা উৎসাহিত হয়ে বলল, আপনি তার বন্ধু হলে আমারও বন্ধু।

টারজন হাসিমুখে বলল, আমি তোমাদের চিরকালের বন্ধু।

জিনালদা বলল, আচ্ছা স্যার টারজন, আমি বুঝতে পারছি না, সিংহটা আপনার কোন ক্ষতি করল না কেন এবং কেনই বা সে আপনার কথা শুনল।

টারজন বলল, ও হচ্ছে জাদ-বাল-জা বা সোনালী সিংহ। ওকে আমি বাচ্চাবেলা থেকে পালন করেছি। ও মানুষের কাছে বেশী থাকে বলে তোমার কোন ক্ষতি করেনি এবং আমাকে ভাল-বাসে।

জিনালদা বলল, আপনি কি নিকটেই কোথাও থাকেন?

টারজন বলল, না, আমি অনেক দূরে থাকি। আমার লোকজনরা কাছে কোথাও আছে বলেই সিংহটা তাদের সঙ্গে এসেছে।

সিংহটাব কাছে টারজন জিনালদাকে রেখে তার জন্য কিছু ফল নিয়ে এল। জিনালদা তা খেয়ে সুস্থ হলো। তারপব জিনালদাব হাঁটার শক্তি না থাকায় তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে নিমুবেব পথে বওনা হলো। নগবের বাইবে সেই পাথবের ক্রসটার কাছে জিনালদাকে নামিয়ে দিল টাবজন। তারপর জাদ-বাল-জাকে নিয়ে ব্লেকের খোঁজে বেবিয়ে পড়ল।

আববদের খোঁজ করতে করতে ব্লেকও ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে। ঘোড়ায় চেপে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে দেখল একটা লোক শুয়ে আছে আব তার পাশে একটা চিতাবাঘ ওৎ পেতে বসে আছে। লোকটা মড়ার মত পড়ে থাকায় সে অপেক্ষা করছে লোকটা নড়লেই তাকে ধরবে।

ঘোড়াব উপর থেকেই তার হাতের বর্শাটা চিতা-বাঘের গায়ে সজোরে ছুঁড়ে দিল ব্লেক। বাঘটা সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। ব্লেক তখন ঘোড়া থেকে নেমে লোকটাব দিকে এগিয়ে গিয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়ে বলল, একি স্টিম্বল তুমি?

স্টিম্বল বলল, আমি এখন মরতে বসেছি ব্লেক। মৃত্যুর আগে সব কথা বলে যেতে চাই তোমায়। তুমি এখানে কি করছিলে? নাইটদের মত বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্রই বা পেলে কোথায়?

ব্লেক বলল, এখন কিছু খাবারের জন্য নিকটবর্তী গাঁয়ে নিয়ে যাব তোমাকে। আমি একবার সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে দেখে গাঁয়ের লোকরা পালিয়ে যায়।

ব্লেক স্টিম্বলকে নিয়ে সেই আদিবাসীদের গাঁয়ে চলে গেল। এবারেও গাঁয়ের লোকরা তাকে দেখে পালিয়ে গেল। ব্লেক প্রচুর খাদ্য পেল। স্টিম্বলকে পেট ভরে খাইয়ে সে তার ঘোড়াটাকেও খাওয়াল।

এমন সময় টারজনের ওয়াজিরি যোদ্ধারা সেখানে এসে হাজির হলো। তারা এসে ব্লেককে ইংরিজিতে বলল, তারা টাবজনের লোক। তারা তাদের মালিকের খোঁজ করছে। যাই হোক, তাবা সেই গাঁয়েতেই ব্লেককে নিয়ে রয়ে গেল। স্টিম্বল কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠল। ব্লেক ভাবল এবার তাকে কোন উপকূলে পাঠাতে আর কষ্ট পেতে হবে না।

শেখ ইবন জাদেব দলেব অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হয়ে উঠছিল। মালবাহকরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার উপর তাদের পিছনে সর্বক্ষণ একটা সোনালী রঙেব সিংহকে আসতে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তার মাঝে থেকে থেকে একটা কণ্ঠস্বর কানে আসছিল তাদের, প্রতিটি রত্নের জন্য একফোঁটা করে রক্ত দিতে হবে তোমাদের। তবু ধনরত্নের লোভটা ছাড়তে পারছিল না শেখ।

হঠাৎ আবার একটা তীর এসে একজন মাল-বাহকের বুকে লাগল। লোকটা মারা যেতেই আবার সেই অদৃশ্য মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, শেখ, তুমি নিজে সব ধনরত্ন তুলে নিয়ে বহন করতে থাক। তুমি নরহত্যা করে এই ধন লুণ্ঠন করেছ। তুমি হত্যা-কারী। তোমার এই হলো শাস্তি।

বস্তা কাঁধে পথ চলতে পারছিল না শেখ। তার উপর তার পিছনে সিংহটা সমানে আসছিল। সে অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়েছিল।

তার এই অবস্থা দেখে আতিজা একটা বন্দুক

হাতে তার বাবার কাছে এসে বলল, ভয় করো না বাবা, আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমি তোমাকে রক্ষা করব।

পথে যেতে যেতে ওরা একটা আদিবাসীদের গাঁয়ে এসে উঠল। ওরা আর চলতে পারছিল না। সেই গাঁয়েই ছিল টারজনের ওয়াজিরি যোদ্ধারা, জায়েদ, ব্লেক আব স্টিম্বল।

ওয়াজিরিরা আরবদেব দেখে তাদের সব অস্ত্র কেড়ে নিল। ক্লান্ত ও ভীত অবস্থায় বাধা দিতে পাবল না তারা। জায়েদ আরবদের বলল, ইবন জাদ কোথায়?

আরবরা বলল, পিছনে আসছে।

জায়েদ দেখল আতিজা তার বাবা শেখকে সঙ্গে কধে সেইদিকেই আসছে। সে ছুটে গিয়ে আতিজাকে জড়িয়ে ধবল। ওয়াজিরি যোদ্ধাদের দেখে ভয়ে মাটিব উপর বসে পড়ল শেখ। ধনরত্নভরা বড় বস্তাটা পড়ে গেল তাব হাত থেকে।

এমন সময় শেখের স্ত্রী হিরফা ভয়ে চীৎকার করে উঠল। সে দেখল একটা বড় সিংহকে নিয়ে দৈত্যাকার এক শ্বেতাঙ্গ তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

টারজনকে দেখতে পেয়ে ব্লেক ছুটে এসে তাকে ধরল। বলল, দেরী হয়ে গেল টারজন, জিনালদা মারা গেছে।

টারজন হেসে বলল, বাজে কথা। আমি আজ সকালে তাকে নিমুর নগরীতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি।

ব্লেক বিশ্বাস করতে চাইছিল না। টারজন তাকে সব ঘটনা একে একে পবিষ্কার কবে বললে সে শান্ত হলো।

পরদিন সকালে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। ব্লেক বলল, সে নিমুর নগরীতে ফিরে যাবে। রাজকন্যা জিনালদাকে নিয়ে নিমুবেব রাজপ্রাসাদেই বসবাস করবে। সে আর দেশে ফিরবে না। স্টিম্বলকে চাবজন ওয়াজিরি আপাততঃ টারজনের বাংলো-বাড়িতে বয়ে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে তার যাবার ব্যবস্থা করে দেবে টারজন।

জায়েদ আর আতিজাকে টারজনের বাড়িতেই কাজ করতে বলল টারজন। তার বাড়িতে রেখে দেবে তাদের। কিন্তু শেখকে ও বাকি আরবদের ক্ষমা করল না টারজন। ঠিক করল, আপাততঃ শেখদের ওয়াজিরি যোদ্ধাদের একটি দল একটা গাঁয়ে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে ওদের আবিসিনিয়ায় নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি কবে দেওয়া হবে।

৩ লুপ্ত সাম্রাজ্যে টারজন

টারজন অ্যাণ্ড দি লস্ট এম্পায়ার

মনিবের খোলা বাদামী কাঁধের উপর নকিমা উত্তেজিতভাবে নাচতে শুরু করে দিল। অনবরত কিচির-মিচির করছে, আর একবার টারজনের মুখের দিকে একবার জঙ্গলের দিকে তাকাচ্ছে।

ওয়াজিরিদের ছোট সর্দার মুভিরো বলল, কে যেন আসছে বাওয়ানা; নকিমা শুনতে পেয়েছে।

টারজনও শুনেছে।

মুভিরো বলল. বড় বাওয়ানার কান তো হরিণের মতই

টারজন হেসে বলল, তা যদি না হত তাহলে আজ টারজনকে এখানে দেখতেই পেতে না।

কে আসছে? মুভিরো শুধাল।

একদল মানুষ, টারজন জবাব দিল।

প্রথম দেখা গেল একটি দীর্ঘদেহ নিগ্রো সৈনিককে। ওয়াজিরিদের দেখেই সে থেমে গেল। একটু পরে একটি দাড়িওয়ালা সাদা মানুষ এসে তার পাশে দাঁড়াল। ভাল করে লক্ষ্য করে সাদা মানুষটি শান্তির চিহ্ন দেখিয়ে এগিয়ে গেল। জঙ্গলের ভিতর থেকে একডজন বা তারও বেশী সৈনিক তাকে অনুসরণ করল। তাদের বেশীর ভাগই কুলি; সঙ্গে মাত্র তিন-চারটে রাইফেল।

টারজন এবং ওয়াজিরিরা এবার বুঝতে পারল যে দলটা ছোট ও নিরীহ। ভয়ের কোন কারণ নেই।

দাড়িওয়ালা লোকটি এগিয়ে আসতেই টারজন সোল্লাসে বলল, ডক্টর ভন হার্‌বেন! প্রথমে তো তোমাকে চিনতেই পারি নি।

হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ভন হার্‌বেন বলল, অরণ্যরাজ টারজন, ঈশ্বর আমার প্রতি সদয়। তোমার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পুরো দু'দিন আগেই তোমার দেখা পেয়ে গেলাম।

টারজন বলল, তুমি কেন টারজনের দেশে এসেছ ডাক্তার? আশা করি আমার বন্ধুটির কোন বিপদ দেখা দেয় নি।

ভন হারবেন বলল, আমরা এসেছি তোমার সাহায্য পাবার আশায় আমার ছেলে এরিকের ব্যাপারে। তাকে তো তুমি কখনও দেখ নি।

টারজন বলল, না। কিন্তু তোমরা খুব ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। এইখানে তাঁবু ফেল। খেতে খেতেই তোমার সব কথা শোনা যাবে।

ভন হার্‌বেনই শুরু করল। এরিক আমার একমাত্র ছেলে। চার বছর আগে উনিশ বছর বয়সে সম্মানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষ করে প্রথম ডিগ্রিও পেয়েছে। সেই থেকে ইওরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা নিয়েই দিন কাটিয়েছে এবং প্রত্নতত্ত্ব ও অপ্রচলিত প্রাচীন

ভাষায় বিশেষ জ্ঞানলাভ করেছে। কয়েক মাস আগে সে আমার কাছে এসেছিল; এসেই আমাদের জেলায় এবং কাছাকাছি অঞ্চলে ব্যবহৃত কয়েকটি উপজাতির বিভিন্ন বাণ্টু কথ্য ভাষার প্রতি সে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সেই বিষয়ে উপজাতিদের মধ্যে গবেষণা চালাতে গিয়ে ওয়াইরামওয়াজি পর্বতমালার লুপ্ত উপজাতির প্রাচীন উপকথার বিষয় সে জানতে পারে, আর সেই থেকেই তার মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে এই উপকথার কোন বাস্তব ভিত্তি আছে, আর তা নিয়ে গবেষণা চালাতে পারলে হয়তো বাইবেলীয় যুগের লুপ্ত উপজাতিদের কোন বংশধরদের দেখাও মিলে যেতে পারে।

টারজন বলল, সে উপকথা আমি ভাল করেই জানি, আর তা নিয়ে অনুসন্ধান চালাবার ইচ্ছাও অনেকবার হয়েছে, কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে তা আর ঘটে ওঠে নি।

ডাক্তার বলতে লাগল, এরিক যখন ওয়াইরামওয়াজিতে একটা অভিযানের প্রস্তাব করল তখন আমি বরং তাকে উৎসাহই দিয়েছি, কারণ এ ধরনের একটা অভিযান পরিচালনার পক্ষে সেই তো সবচাইতে উপযুক্ত লোক। সে বাণ্টুদের কথ্য ভাষা জানে, উপজাতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে। আর পর্বতারোহণের যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও তার আছে।

কিন্তু যাত্রার পরে কিছুদিন যেতে না যেতেই আমি খবর পেয়েছি যে তার দলের কিছু লোক নিজ নিজ গ্রামে ফিরে এসেছে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা আমাকে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু যে সব কথা আমার কানে এসেছে তাতে পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে আমার ছেলের সময় ভাল যাচ্ছে না; কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছে। সুতরাং স্থির করলাম, একটা সাহায্যকারী দল নিয়ে তার কাছে যাব। কিন্তু সারা জেলা ঘুরে ওয়াইরামওয়াজি পর্বতে যাবার মত মাত্র এই ক'টি

লোককে যোগাড় করতে পেরেছি, কারণ তাদের ধারণা যে ওয়াইরামওয়াজির লুপ্ত উপজাতিরা একদল রক্তচোষা প্রেত। তখনই বুঝলাম যে এরিকের দল ছেড়ে যারা চলে এসেছে তারাই জেলার সর্বত্র এই আতংক ছড়িয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে স্বভাবতই অরণ্যরাজ টারজনের কথাই আমার প্রথম মনে হয়েছে। …এখন বুঝতে পারছ কেন আমি এখানে এসেছি।

তার কথা শেষ হতেই টারজন বলল, আমি তোমাকে সাহায্য করব ডাক্তার।

ভন হার্‌বেন বলল, খুব ভাল কথা। আমি জানতাম তোমার সাহায্য পাব। যতদূর মনে হচ্ছে এখানে তোমার লোকের সংখ্যা প্রায় কুড়ি, আর আমার সঙ্গে আছে চৌদ্দ। আমার লোকরা তল্পিবাহকের কাজ করতে পারবে, আর তোমার লোকরা তো আফ্রিকার সেরা যোদ্ধা বলে পরিচিত। তোমার নির্দেশে আমরা অচিরেই পথের হদিস পেয়ে যাব, আর ছোট হলেও যে দলটি আমাদের সঙ্গে যাবে তাদের নিয়ে এমন কোন দেশ নেই যেখানে আমরা যেতে পারব না।

টারজন মাথা নেড়ে বলল, না ডাক্তার, আমি একাই যাব। সেটাই আমার চিরকালের রীতি। একা হলে আমি অনেক দ্রুত যেতে পারব। তুমি তো জান জংলী লোকেরা আমাকে তাদের

আপনজন বলে মনে করে। অন্য লোক দেখলেই তারা দূরে সরে যাবে, কিন্তু আমার কাছ থেকে দূরে যাবে না।

ভন হারবেন বলল, "তুমি ভাল করেই বোঝ যে আমি তোমার সঙ্গেই যেতে চাই। তবে তুমি না বললে আমাকে তা মানতেই হবে।

তুমি তোমার মিশনে ফিরে যাও ডাক্তার; সেখানেই আমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করে থেকো।

মুভিরোর দিকে ঘুরে বলল, মুভিরো, আমার সৈন্যদের নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। প্রয়োজন হলে আমি ডাকলেই যাতে তাদের পাই সেইভাবে ওয়াজিরির প্রতিটি সৈনিককে সর্বদা প্রস্তুত রেখো।

টারজন তার ধনুক ও তীর-ভর্তি তূনীর পিঠে ঝুলিয়ে নিল: বাঁ কাঁধ ও ডান বগলের নীচে জড়িয়ে নিল ঘাসের দড়িটা; কোমরে ঝোলাল স্বর্গত পিতার শিকারী ছুরি। ছোট বর্শাটা হাতে নিয়ে মাথা সোজা করে দাঁড়াল।

এক মুহূর্ত সেইভাবে দাঁড়িয়ে ছোট্ট নকিমাকে সঙ্গে নিয়ে একটি বিদায়-বাণীও উচ্চারণ না করে ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে টারজন জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল।

ওয়াইরামওয়াজি পর্বতের গায়ে তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে এরিক ভন হারবেন শিবিরের দিকে তাকাল।

প্রথম ঘুম ভাঙতেই চারদিকে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা তার মনে একটা গোলমালের পূর্বাভাষ জাগিয়ে তুলেছিল। খাস খানসামা গাবুলাকে বার বার ডেকেও কোন সাড়া না পেয়ে সেটা আরও বেড়ে গেল।

তাড়াতাড়ি খোঁজ-খবর করতেই দেখা গেল লোকজনরা ভন হারবেনের সবকিছু নিয়ে সরে পড়েছে। সমস্ত খাবার-দাবার, রাইফেল ও গুলি তারা সঙ্গে নিয়ে গেছে। রেখে গেছে শুধু একটা লাজার পিস্তল ও এমুনিশন বেল্ট; এ দুটি বস্তু তাঁবুতে তার নিজের কাছেই ছিল।

ভন হারবেন পাহাড়ের উৎরাইয়ে বনের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তার বেশী সময় লাগল না। তাঁবুতে ফিরে গিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু টুকিটাকি জিনিস হ্যাভারস্যাকে ভরে নিল, এমুনিশন বেল্টটা বুকের উপর জড়িয়ে নিল, তারপর উপরের দিকে তাকিয়ে ওয়াইরামওয়াজির রহস্যের পথে যাত্রা করল।

সারাটা দিন সে পাহাড় বেয়ে উঠল। বিশ্রাম শুধু রাতে। সকালে উঠে আবার যাত্রা শুরু।

শেষ বাধা পেরিয়ে পর্বত-শিখরে দাঁড়িয়ে ভন হারবেন উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। সম্মুখে প্রসারিত একটা উঁচু-নীচু উপত্যকা। দূরে দেখা যাচ্ছে আর একটা পর্বতশ্রেণী—অস্পষ্ট ও ধূসর। দূরের পাহাড় ও তার মধ্যে কি আছে? আবিষ্কারের সম্ভাবনায় তার নাড়ির গতি দ্রুততর হল।

অনেক নীচে ফিতের মত তিনটে স্রোতধারা হ্রদে এসে পড়েছে; আরও দূরে চোখে পড়ছে একটা ফিতে—সেটা সম্ভবত রাস্তা। হ্রদের পশ্চিম দিকটা ঘন জঙ্গলে ঢাকা। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল, সেই বন ও হ্রদের মাঝখানে কি যেন নড়াচড়া করছে; হয়তো কোন তৃণভোজী পশুই হবে।

এ দৃশ্য দেখে ভন হার্‌বেনের আবিষ্কারক মনটা উত্তেজনার একেবারে চরমে উঠে গেল। নিশ্চয় এখানেই আছে ওয়াইরামওয়াজি লুপ্ত উপজাতির গোপন রহস্য; যতদূর চোখে পড়ছে এই সব খাড়া পাথরের প্রাচীর বেয়ে নীচে নামা একেবারেই অসম্ভব।

সূর্য ডুবে গেল। একসময় গ্র্যানিটের প্রাচীরে একটা সংকীর্ণ ফাটল তার চোখে পড়ল। পাহাড়ের মাথা থেকে নীচে নামবার মত একটা পথ তবু পাওয়া গেল, কিন্তু সে পথটা কতদূর নেমে গেছে ঘনায়মান অন্ধকারে তা বোঝা গেল না।

ক্ষুধায় ও ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে রাতের অন্ধকারে সে সেখানেই বসে পড়ল; নীচের অন্ধকার শূন্যে তার চোখ। অন্ধকার আরও গাঢ় হতেই সে দেখল, অনেক নীচে একটা আলোর ফুল্‌কি ঝিলিক দিয়ে উঠল; আরও একটা, আবারও একটা। প্রতিটি ঝিলিকের সঙ্গে বাড়ছে তার উত্তেজনা, কারণ আলো থাকা মানেই মানুষের উপস্থিতি। জলাভূমির মত হ্রদের অনেক জায়গাতেই আলোর ফুল্‌কি জ্বলছে; আর যেখানে দ্বীপটা অবস্থিত সেখানে অনেক মানুষের চলাফেরা।

ওটা কি? নীচের আঁধার-ঢাকা গহ্বর থেকে যে শব্দটা উঠে আসছে সেটা শুনবার জন্য ভন হারবেন কান পাতল। অস্পষ্ট ক্ষীণ একটা শব্দ কানে এল; কিন্তু তার ভুল হয় নি—সে শব্দ মানুষের কণ্ঠস্বর।

অনেক দূরে উপত্যকার বুক থেকে ভেসে এল কোন জন্তুর আর্তনাদ; তারপরেই দূরে বজ্রপাতের মত একটা গর্জন শোনা গেল। সেই শব্দ শুনতে শুনতে ভন হার্‌বেন ক্লান্ত হয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ল।

সকাল হলে কিছু গাছপালা জোগার করে আগুন জ্বেলে শরীর গরম করল। দিনের আলোয়

পাহাড়ের গায়ের ফাটলটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। সেটা কয়েকশ' ফুট পর্যন্ত নেমে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবু তার ধারণা হল, সেটা ওখানেই শেষ হয়ে যায় নি, আরও নীচে নেমে গেছে।

তবু নিরুপায় হয়েই তাকে নীচে নামতে হবে। আশা মরীচিকা! যদি একটা পথ মিলে যায়! ফাটলের উপর থেকে পা বাড়িয়ে নীচে নামতে যাবে এমন সময় পিছনে পায়ের শব্দ শুনে বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে গিয়ে সে হাতের লাজারটা বাগিয়ে ধরল।

মুখ ফেরাতেই এরিক ভন হার্‌বেন দেখল রাইফেলধারী জনৈক নিগ্রো তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

হাতের পিস্তল নামিয়ে সে চীৎকার করে ডাকল, গাবুলা! তুমি এখানে কি করছ?

সৈনিক বলল, বাওয়ানা, আমি তোমাকে একলা ফেলে চলে যেতে পারিনি; এই পাহাড়ের অধিবাসী প্রেতাত্মাদের হাতে তো তোমাকে মরতে দিতে পারি না।

ভন হার্‌বেন সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, তাই যদি হয় গাবুলা, তাহলে তারা তো তোমাকেও মেরে ফেলতে পারে।

গাবুলা বলল, জানি বাওয়ানা, আমিও মরব। আজ রাতে আমাদের দু'জনেরই মৃত্যু অনিবার্য।

তবু তুমি আমার পিছু পিছু এসেছ কেন?

তুমি আমাকে কত দয়া করেছ বাওয়ানা; তোমার বাবা আমাকে কত দয়া করেছে। ওদের কথা শুনে ভয় পেয়ে আমি ওদের সঙ্গে পালিয়েছিলাম, কিন্তু আমি ফিরে এসেছি।

ভন হার্‌বেন বলল, কিন্তু গাবুলা, আমি ওই খাদের নীচে নামব। বিদায়। সে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

গাবুলা কিন্তু মনিবের বাড়ানো হাতটা না ধরেই বলল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

জীবন্ত ওখানে নামতে পারলেও কোনদিন ফিরতে পারবে না জেনেও?

হ্যাঁ।

ভন হার্‌বেন নতুন উৎসাহে ও শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে আবার নীচে নামতে পা বাড়াল।

নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে অনেক কষ্ট স্বীকার করে প্রথমে ভন হার্‌বেন ও পরে গাবুলা সেই গহ্বরের নীচে পৌঁছে গেল।

সামনেই একটা ছোট নদী সবুজ উপত্যকার বুক চিরে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গিয়ে পড়েছে একটা বড় জলাভূমিতে। যতদূর মনে হয়, জলাভূমিটা মাইল দশেক বিস্তৃত।

জলজ ঘাস ও শেওলার নীচের কর্দমাক্ত মাটির উপর দিয়ে দু'জন সেই জল ভেঙে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে একসময় পায়ের নীচে শক্ত মাটি পেয়ে ভন হার্‌বেন বলে উঠল, আর ভয় নেই গাবুলা; মনে হচ্ছে এই পথ ধরেই আমরা হ্রদটাতে পৌঁছতে পারব।

এমন সময় পিছন থেকে একটা ছোট নৌকো দ্রুতবেগে ছুটে এসে সেখানে থেমে গেল। এক নৌকো ভর্তি সশস্ত্র সৈনিক তাদের দু'জনকে ঘিরে ফেলল।

এরিক ভন হার্‌বেন দীর্ঘকায়, উলঙ্গপ্রায় সৈনিকদের মুখের দিকে তাকাল। প্রথমেই তার মনোযোগ পড়ল তাদের অস্ত্রশস্ত্রের দিকে।

আধুনিককালের অসভ্য মানুষদের হাতে যে-রকম দেখা যায় তাদের বর্শাগুলি তার চাইতে অন্য রকম। আফ্রিকার অসভ্য লোকদের মত বর্শা তো আছেই, তাছাড়া আর একরকম ভারী বল্লম আছে যা দেখে যুবক পুরাতত্ত্ববিদটির মনে স্বভাবতই প্রাচীন রোমকদের হাতের তীক্ষ্ণমুখ শলাকার কথাই মনে পড়ল। সেই মিলটি আরও বেশী স্পষ্ট করে তুলল তাদের কাঁধের উপর থেকে ঝোলানো কোষবদ্ধ এক ধরনের ছোট, চওড়া দু-মুখো তরবারি। এগুলি যদি রোমের রাজকীয় বাহিনীর "গ্লেডিয়াস হিস্‌পেনাস" না হয় তো ভন হার্‌বেন এতকাল বৃথাই পড়াশুনা করেছে, গবেষণা করেছে।

বলল, গাবুলা, ওদের জিজ্ঞাসা করতো ওরা কি চায়।

বান্টু ভাষায় গাবুলা শুধাল, তোমরা কারা, আর এখানে কি চাও?

ভন হার্‌বেনও বলল, আমরা বন্ধু হতে চাই।

আমরা এসেছি তোমাদের দেশ দেখতে। তোমাদের সর্দারের কাছে আমাদের নিয়ে চল।

একটি ঢ্যাঙা নিগ্রো মাথা নেড়ে বলল, আমরা তোমাদের কথা বুঝতে পারছি না। তোমরা আমাদের বন্দী। তাই তোমাদের নিয়ে যাব আমাদের মনিবের কাছে। নৌকোয় উঠে এস। বাধা দিলে বা গোলমাল করলে মেরে ফেলব।

ভন হার্‌বেন ও গাবুলা ডোঙ্গায় পা দিল। একটা চওড়া খালের বুকে দুই পাশে দশ-পনেরো ফুট লম্বা প্যাপিরাস গাছের ভিতর দিয়ে ডোঙ্গা ভেসে চলল।

সর্দার জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোথা থেকে এসেছ?

ভন হার্‌বেন জবাব দিল, জার্মানিয়া থেকে।

সর্দার বলে উঠল, আরে! তারা তো বন্য ও অসভ্য বর্বর। তারা তো রোমের ভাষাই বলে না; তোমার মত খারাপ করেও বলে না।

কতদিন আগে জার্মান বর্বরদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ ঘটেছিল?

আমি তো কখনও সে দেশে যাই নি; তবে আমাদের ইতিহাসকাররা তাদের ভাল করেই চেনে।

তারা কতদিন আগে তাদেব কথা লিখেছে?

রোমক সনের ৮৩৯তম বর্ষে।

সে তো আটারোশ' সাঁইত্রিশ বছর আগেকার কথা। তারপরে সেখানে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

সর্দার বলল, তা কেমন করে হবে? এদেশের তো কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

ওয়াইরাম ওয়াজি পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত গ্রামের বাগেগো লুকেডি লাউয়ের খোলায় দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকল। একটি দৈত্যের মত সাদা

মানুষ মেঝেতে বসে আছে। দুই হাত পিছু-মোড়া করে বাঁধা; পায়েও বেড়ি। লুকেডির হাত থেকে দুধটা খেতে খেতেই বাইরে একটা সোরগোল উঠল। নানা রকম হুকুমের শব্দ। ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচি। বেজে উঠল রণ-ডঙ্কা। শুরু হল অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা। উচ্চ চীৎকার! লুকেডি দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েই সত্রাশে চীৎকার করে পিছিয়ে এসে কুঁকড়ে বসে পড়ল।

টারজন সবিস্ময়ে লুকেডির মুখের দিকে তাকিয়ে পরে নীচু দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল।

গ্রামের পথে উদ্যত বর্শা হাতে পুরুষ, আতংকিত নারী ও শিশুদের ভিড়।

প্রথমে টারজন ভাবল, অন্য কোন অসভ্য জাতি বুঝি গ্রাম আক্রমণ করেছে। কিন্তু একটু পরেই হৈ-চৈ থেমে গেল। বাগেগোরা ইতস্তত পালাতে লাগল। তাদের পিছনে ধাওয়া করছে কিছু সৈনিক। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তার পরেই ত্রস্ত পায়ের শব্দ, কিছু হুকুম, আর মাঝেসাঝে ভয়ার্ত আর্তনাদ।

তিনটি মূর্তি সবেগে কুটিরে ঢুকে পড়ল—শত্রু সেনারা কিছু পলাতককে খুঁজছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে লুকেডি ঘরের এক কোণে লুকিয়ে পড়ল।

টারজন বসে রইল। তাকে দেখতে পেয়ে দলপতি সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করল। একজন টারজনকে কিছু বলল। টারজন কিছুই বুঝতে পারল না, যদিও ভাষাটা যেন তার কাছে চেনা-চেনা মনে হল।

তাদের একজন লুকেডিকে দেখতে পেয়ে তাকে টানতে টানতে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এল। তারপর আঙুল বাড়িয়ে দরজাটা দেখিয়ে টারজনকে আবার কিছু বলল। টারজন তার গলার শিকলটা দেখাল।

একটি সৈনিক কুটির থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই দুটো পাথর হাতে নিয়ে ফিরে এসে সে টারজনকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে পাথরটাকে সজোরে তালার উপর ঠুকতে লাগল। তালাটা ভেঙে গেল।

মুক্তি পাওয়া মাত্রই টারজন ও লুকেডিকে কুটিরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। গ্রামের মাঝখানে প্রায় পঞ্চাশটি পুরুষ, নারী ও শিশু। বাগেগো বন্দীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে শ'খানেক হালকা বাদামী রঙের সৈনিক। টারজন এবার এই সব নবাগতদের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

তাদের আলখাল্লা, বর্ম, শিরস্ত্রাণ, পাদুকা—এসব কিছুই টারজন আগে কখনও দেখে নি; অথচ সবই তার কাছে কেমন যেন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। একটা বিচিত্র অনুভূতি জাগল তার মনে; সে যেন এই লোকগুলিকে আগেও দেখেছে, তাদের কথাবার্তা শুনেছে, এমন কি তাদের ভাষাও যেন বুঝতে পারছে। অথচ সে এও জানে যে, আগে কখনও সে তাদের দেখে নি। এমন সময় গ্রামের অপর দিক থেকে আর একটি মানুষ এগিয়ে এল—একটি সাদা মানুষ, সৈনিকদের মতই সাজপোশাক, তবে অনেক বেশী দামী ও ঝলমলে। হঠাৎ টারজন যেন সব রহস্যের চাবিকাঠিটি হাতে পেয়ে গেল—যে লোকটি এগিয়ে আসছে সে যেন উঠে এসেছে রোমের পালাজ্জো ডি কন্‌জারভেটারিতে অবস্থিত জুলিয়াস সিজারের প্রতিমূর্তির বেদী থেকে। আসলে এই যুবকটির নাম মালিয়াস লেপাস।

প্রতিটি সৈনিকের হাতে একটা করে ছোট শিকল ও তার একদিকে একটা করে ধাতুর কলার ও তালা। সেগুলির সাহায্যে তারা বন্দীদের গলায় গলায় শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলল। কিন্তু টারজনকে দলবন্দী করে এক শিকলে বাঁধা হল না; তার গলায় একটা লোহার কলার পরিয়ে শিকলের অপর প্রান্তটা তুলে দেওয়া হল একজন সৈনিকের হাতে।

পর্বতের সানুদেশ ধরে তারা উত্তর দিকে এগিয়ে চলল।

ঘটনাক্রমে টারজনের জায়গা হয়েছে বন্দী-সারির পিছনে আর লুকেডি রয়েছে সেই সারির একেবারে শেষে। হাঁটতে হাঁটতে টারজন শুধাল, এরা সব কারা লুকেডি?

টারজনের দিকে তাকিয়ে জনৈক বন্দী বলল, ওরা এসেছে ওদেরই একজনের হত্যাকে প্রতিরোধ করতে। ভালই হয়েছে যে এই লোকটিকে মেরে ফেলার আগেই ওরা এসে পড়েছে। নইলে সব্বাইকে মেরে ফেলত।

দু'ঘণ্টা চলবার পরে পথটা হঠাৎ ডান দিকে মোড় নিয়ে একটা সংকীর্ণ পাহাড়ি সুড়ঙ্গে ঢুকে গেল। চলতে চলতেই টারজন বুঝতে পারল যে তারা ক্রমেই পাহাড়ের ভিতরে ঢুকলেও উপরে ওঠার বদলে সুড়ঙ্গটা বরং নীচের দিকেই নেমে যাচ্ছে।

ধুলোভর্তি পথ ধরে সকলে এগিয়ে চলল দক্ষিণ দিকে। অনেকগুলি গ্রাম পার হয়ে গম্বুজ ও বুরুজওয়ালা একটা অট্টালিকা-নগরী। রাজপথ ধরে চলতে চলতে দেখল রাস্তায় ও বাড়ির ফটকে অনেক বাদামী ও কালো মানুষের ভিড়। অনেকেরই পরনে কুর্তা ও আলখাল্লা, যদিও নিগ্রোরা প্রায় উলঙ্গ।

অধিকতর প্রশস্ত আর একটা রাজপথ ধরে কিছুটা এগোতেই একটা বৃত্তাকার বিরাট গ্র্যানিট পাথরের বাড়ি দেখা গেল। বড় বড় থামের উপরে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উঁচু পর্যন্ত ধাপে ধাপে উঠে গেছে একটা বিরাট বাড়ি। একতলায় পর পর অনেকগুলি ঘর; কিন্তু পরের সবগুলি তলাই ফাঁকা। তার ভিতর দিয়েই টারজন দেখতে পেল, বৃত্তাকার বাড়িটার উপরে কোন ছাদ নেই; বুঝতে পারল এটা একটা মল্লক্ষেত্র—রোমের কালো-সিয়ামের মত।

সকলে ঘোরানো বাড়িটার পিছন দিকে পৌঁছে গেল। বাড়ির ভিতরে অসংখ্য গলি, বারান্দা ও ছোট ছোট ঘর; যেমন সংকীর্ণ, তেমনই অন্ধকার। সবগুলি ঘরের লোহার দরজা খোলা। চার-পাঁচ-জনের এক একটা দলের গলা থেকে শিকল খুলে নিয়ে তাদের এক একটা অন্ধকার নরকের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হল।

টারজন দেখল, লুকেডি ও অন্য দু'জন বাগেগোর সঙ্গে তাকে যে ঘরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে সেটা আগাগোড়া গ্যানিট পাথরে গড়া। ঘরের একটি-

মাত্র দরজায় লোহার গরাদে বসানো। দরজার উল্টো দিকের দেয়ালের মাথায় একটিমাত্র গরাদ দেওয়া জানালা দিয়ে সামান্যমাত্র আলো ও হাওয়া ঘরে ঢুকছে। তাদের মুখের উপরেই দরজা বন্ধ করে ভারী তালা লাগিয়ে দেওয়া হল। সেই নির্জন ঘরে সকলে অপেক্ষা করতে লাগল অনাগত নিয়তির জন্য।

একটা ফটকের সামনে পাল্কি থামল। লেপাস ও এরিক পাল্কি থেকে নামল। বাগানে ঢুকল। একটা গাছের ছায়ায় বসে একজন মজবুত-দেহ বয়স্ক লোক নীচু ডেস্কে কি যেন লিখছে। তার প্রাচীন-কালের রোমক দোয়াত, খাগের কলম, পার্চমেণ্ট কাগজ দেখে ভন হারবেনের দেহে শিহরণ খেলে গেল।

কেমন আছ খুড়ো! লেপাস চেঁচিয়ে বলল। বয়স্ক লোকটি তার দিকে মুখ ফেরাল। লেপাস আবার বলল, আজ তোমার জন্য একজন অতিথি এনেছি। এই হচ্ছে অনেক দূরের দেশ জার্মানিয়া হতে আগত বর্বর সর্দার এরিক ভন হারবেন। তারপর ভন হারবেনের দিকে ঘুরে বলল, আর এই আমার মাননীয় খুড়ো মশায় সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াস।

সেপ্টিমাস সাদরে ভন হার্‌বেনকে গ্রহণ করল। কুশল-প্রশ্নাদি বিনিময়ের পরে লেপাসকে সঙ্গে দিয়ে তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিল।

এক ঘণ্টা পরে পোশাকাদি বদলে ভন হার্‌বেন আবার যখন একাকি বাগানে ফিরে গেল সেপ্টিমাস তখন সেখান থেকে চলে গেছে।

ভন হার্‌বেন একাই বাগানের ভিতরে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে একটা ঝোঁপের বাঁক ঘুরতেই একটি সুন্দরী তরুণীর একেবারে মুখোমুখি হল। তরুণীটি অস্ফুট গলায় বলল, তুমি কে?

ভন হারবেন জবাব দিল, আমি এখানে নবাগত। মালিয়াস লেপাস আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আমি তার খুড়ো সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের অতিথি।

মেয়েটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, তা হতে পারে। অতিথি সৎকারের ব্যাপারে বাবার কুখ্যাতি আছে।

ভন হারবেন প্রশ্ন করল, তুমি কি ফেবো-নিয়াসের মেয়ে?

মেয়েটি বলল. হ্যাঁ, আমি ফেবোনিয়া। কিন্তু তোমার পরিচয় এখনও দাও নি।

আমি এরিক ভন হার্‌বেন; জার্মানিয়া থেকে এসেছি।

মেয়েটি সোৎসাহে বলে উঠল, জার্মানিয়া! সিজার জার্মানিয়ার কথা লিখে গেছে বটে। সাঙ্গুইনারিয়াসও লিখেছে। সে দেশ তো অনেক দূরে।

ভন হার্‌বেন বলল, সেদিনের পরে এত বেশী শতাব্দীকাল পার হয়ে গেছে যে তার তুলনায় তিন হাজার মাইলের দূরত্বটাকে খুব বেশী বলে মনে হচ্ছে না।

একটু চুপ করে থেকে ভন হার্‌বেন ডাকল, ফেবোনিয়া!

সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে মেয়েটি বলল, বল।

তোমার নামটা বড় সুন্দর। এ রকম নাম আগে কখনও শুনি নি।

নামটা তোমার পছন্দ?

খুব।

হঠাৎ মেয়েটি চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভন হার্‌বেনও পিছন দিকে ঘুরে গেল। একটি তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সম্পর্কে তারা কেউই সজাগ ছিল না।

ভন হার্‌বেন দেখল, একটি বেঁটে, কৃষ্ণকায় যুবক তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ঝল্‌মলে পোশাক। কোমর থেকে ঝুলছে একটা বেঁটে তরবারি।

যুবকটি বলল, তোমার এই বর্বর বন্ধুটি কে ফেবোনিয়া?

মেয়েটি উদ্ধত কণ্ঠে জবাব দিল, এ হচ্ছে এরিক ভন হার্‌বেন; আমার বাবা সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের অতিথি। আর এ হচ্ছে ফুল্‌বাস ফুপাস; বাবার প্রশ্রয় পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

ফুপাস ক্রুদ্ধ চোখ তুলে তাকাল। ঠিক সেই সময় মালিয়াস লেপাস এসে পড়ায় ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াল না। তবে ভন হার্‌বেন বুঝতে পারল

যে এই যুবকটি ফেবোনিয়াকে ভালবাসে।

আরও একটু পরে সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াস এসে তাদের দলে যোগ দিল। বলল, এবার সবাই মিলে স্নানে যাওয়া যাক।

লেপাস ভন হার্‌বেনকে চুপি-চুপি বলল, খুড়ো এবার সবাইকে নিয়ে সিজারের স্নানাগারে যাবে।

একটু বেলা হলে সৈন্যরা এসে কারা-কক্ষের দরজা খুলে দিল। জনৈক ক্রীতদাসসহ একটি শ্বেতকায় যুবক অফিসার ও কয়েকজন সৈনিক ঘরে ঢুকল। অফিসারটি শহরের ভাষায় টারজনকে কিছু বললে সে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল যে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। তখন ক্রীতদাসটি বাগেগোদের ভাষায় কথা বললে টারজন তা বুঝতে পারল। তখন সেই ক্রীতদাসের মারফৎ অফিসার টারজনের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

অফিসার বলল, তুমি কে, আর একজন সাদা মানুষ হয়ে বাগেগোদের গ্রামে কি করছিলে?

বন্দী জবাবে জানাল, আমি অরণ্যরাজ টারজন। এই পাহাড়ে এসে হারিয়ে গেছে এমন আর একটি সাদা মানুষের খোঁজেই আমি এসেছি। পা ফস্‌কে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে বাগেগোরা আমাকে বন্দী করে। তোমার সৈন্যরা বাগেগোদের গ্রামে হানা দিয়ে আমাকে ধরে এনেছে। সব কথা তো বললাম; আশা করি এবার তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে।

অফিসার বলল, তোমার কথার জবাব দিতে আমি আসি নি; এসেছি তার কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে যে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

অফিসারের নির্দেশে সৈনিকরা টারজনকে নিয়ে কারা-কক্ষের বাইরে চলে গেল।

শহরের রাজপথ ধরে মাইলখানেক যাবার পরে সকলে একটা খুব বড় বাড়িতে ঢুকল। চওড়া বারান্দা ঘুরে তারা ঢুকল একটা প্রশস্ত কক্ষে। সেই কক্ষের

এক প্রান্তে উঁচু বেদীর উপর কারুকার্যখচিত প্রকাণ্ড আসনে বসে আছে একটি দশাসই মানুষ।

ঘরে আরও অনেক লোকের সমাবেশ; সকলেরই পরনে কম-বেশী ঝকঝকে পোশাক-পত্তর। ক্রীতদাস, হরকরা ও অফিসাররা অনবরত আসা-যাওয়া করছে। টারজনকে নিয়ে সকলে একটা স্তম্ভের পাশে অপেক্ষা করতে লাগল।

বাগেগো দোভাষীকে টারজন জিজ্ঞাসা করল, এটা কোন্ জায়গা? আর দূরের ঐ লোকটিই বা কে?

এটা হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশের সম্রাটের দরবার-কক্ষ। আর ওই হচ্ছে সাব্‌লেটাস ইম্পারেটার স্বয়ং।

সম্রাট সাব্‌লেটাসের চেহারা দেখবার মত। সাদা সুতোর টিউনিকের উপর সোনার বর্ম আঁটা; সাদা স্যাণ্ডেলে সোনার বক্‌লস; আর কাঁধের উপর থেকে নেমে এসেছে সিজারদের লাল পৃষ্ঠ বসন। ভুরুর উপর দিয়ে জড়ানো কারুকার্যখচিত সাদা ফিতেটা বহন করছে তার মর্যাদার অপর চিহ্ন।

সকলে সিংহাসনের অদূরে থামতেই টারজন বাগেগো দোভাষীকে বলল, সাব্‌লেটাসকে জিজ্ঞাসা কর, কেন আমাকে বন্দী করা হয়েছে; তাকে বল, আমি চাই অবিলম্বে আমাকে মুক্তি দেওয়া হোক।

সাব্‌লেটাস সক্রোধে বলে উঠল, সাব্‌লেটাস ইম্পারেটরকে হুকুম করতে সাহস করে সে কে?

দোভাষীর কথা শুনে টারজন বলল, ওকে বলে দাও যে আমি অরণ্যরাজ টারজন; আর ওর মতই আমিও হুকুম করতে এবং সেই হুকুম তামিল হতে দেখতেই অভ্যস্ত।

সে কথা শুনে সাব্‌লেটাস গর্জন করে উঠল, এই উদ্ধত কুত্তাটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে দুটি সৈনিক টারজনকে চেপে ধরল। একজন ধরল ডান হাত, অপরজন বাঁ হাত। কিন্তু হঠাৎ টারজন এত জোরে দুজনের মাথা ঠুকে দিল যে, তারা অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল, আর সে নিজে বিড়ালের মত অনায়াস ভঙ্গীতে একলাফে সম্রাট সাব্‌লেটাসের বেদীর সামনে পৌঁছে গেল।

শক্ত থাবায় সম্রাটের কাঁধ দুটো চেপে ধরে টারজন তাকে সিংহাসন থেকে তুলে নিয়ে বারকয়েক সজোরে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিল। কয়েকজন বর্শাধারী সাব্‌লেটাসকে উদ্ধার করতে ছুটে আসা মাত্রই সম্রাটের গলার চামড়া ও বর্মের নীচটা ধরে টারজন তাকে এমনভাবে তুলে ধরল আত্মরক্ষার ঢালের মত করে যে. পাছে সম্রাটের গায়ে আঘাত লাগে সেই ভয়ে বর্শাধারীরা টারজনকে আক্রমণ করতেই সাহস পেল না।

বাগেগো দোভাষীকে উদ্দেশ্য করে টারজন তীক্ষ্নস্বরে বলল, ওদের বলে দাও, আমি রাস্তায় নেমে যাবার আগে কেউ যদি আমাকে বাধা দেয় তাহলে সম্রাটের গলাটা আমি ছিঁড়ে ফেলব।

কথাগুলি শুনে সাব্‌লেটাস তার লোকজনদের হুকুম দিল তারা যেন টারজনকে আক্রমণ না করে বরং তাকে নির্বিবাদে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে দেয়। ক্রোধে, ত্রাসে ও ক্ষোভে সাব্‌লেটাসের গলা তখন থর্‌ থর্‌ করে কাঁপছে।

অর্ধনগ্ন বর্বর লোকটি তাদের সম্রাটকে দুই হাতে তুলে ধরে ফটক পেরিয়ে গাছের সারি দিয়ে ঘেরা রাজপথে নেমে গেল। দোভাষী চলল তার আগে আগে।

প্রশস্ত রাজপথের মাঝখানে থেমে টারজন সাব্‌লেটাসকে মাটিতে নামিয়ে দিল।

সাব্‌লেটাস অতি দ্রুত ফটকের দিকে এগিয়ে চলল, আর রক্ষীরা আবার এসে রাজপথে ভিড় করল। কিন্তু তাদের চোখের সামনেই টারজন কয়েক পা দৌড়ে গিয়ে এক লাফে বুড়ো ওক গাছের ডালে চড়ে টারজন ডাল-পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাব্‌লেটাস ছুটতে ছুটতে বলতে লাগল, শিগ্‌গির! ওর পিছু নাও! ওই অসভ্য লোকটাকে যে নামিয়ে আনতে পারবে তাকে একহাজার দিনার পুরস্কার দেব।

এদিকে গাছের ডালে-ডালে কিছুদূর গিয়ে টারজন একটা নীচু ছাদের উপর নেমে এক লাফে আর একটা গাছে চড়ে বসল। কোন লোকজন সেদিকে আসছে কি না দেখবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে টারজন মাটি থেকে মাত্র বিশ ফুট উপরে নেমে এল। এত নিঃশব্দে সে নেমে এল যে

প্রাঙ্গণে দাঁড়ানো দুটি মানুষ কিছুই টের পেল না।

টারজন কিন্তু তাদের ভালোভাবেই চিনতে পারল। দুটি যুবক-যুবতী। যুবকটির কণ্ঠে ক্রোধের আভাষ। যুবতীটি সহসা চলে যাবার জন্য পা বাড়াল। যুবকটিও এক লাফে এসে তার হাত চেপে ধরল। যুবতীটি চীৎকার করে উঠল। যুবকটি এক হাতে তার মুখ চাপা দিয়ে আর এক হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। আর তখনই মাটিতে ধপাস্ করে একটা শব্দ হওয়ায় মুখ ফিরিয়ে একটি অর্ধনগ্ন দৈত্যকে দেখে বিস্ময়ে হাঁ করে রইল। দুটি ইস্পাত-ধূসর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ তার ভয়ার্ত কালো চোখের উপর, দুটি ভারী হাত চেপে ধরল তার টিউনিক; তাকে আছড়ে ফেলে দিল একপাশে।

যুবতী বলল, ডিলেক্টা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। এ জন্য আমার বাবা তোমাকে পুরস্কৃত করবে।

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই একটি যুবক অফিসার এসে হাজির হল। টারজন তাকে চিনতে পারল। এ সেই ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস যে তাকে কলোসিয়াম থেকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসেছিল।

সব কথা শুনে প্রিক্লেরাস রেগে আগুন। বলল, থাম। ভাল চাও তো এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাও।

ফাস্টাসের মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল, আমার বাবা সম্রাট সব কিছুই শুনতে পাবে। ডিলেক্টা, তুমিও ভুলে যেয়ো না যে সাব্‌লেটাস ইস্পারেটর তোমার বাবার প্রতিও খুব প্রসন্ন নয়।

ডিলেক্টা চীৎকার করে বলল, আমার ক্রীতদাসকে হুকুম করার আগেই তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফাস্টাস বাগান থেকে বেরিয়ে গেল।

অন্যদের সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে প্রিক্লেরাস ম্‌পিংগুকে বলল, নবাগত লোকটিকে বল যে, আমি
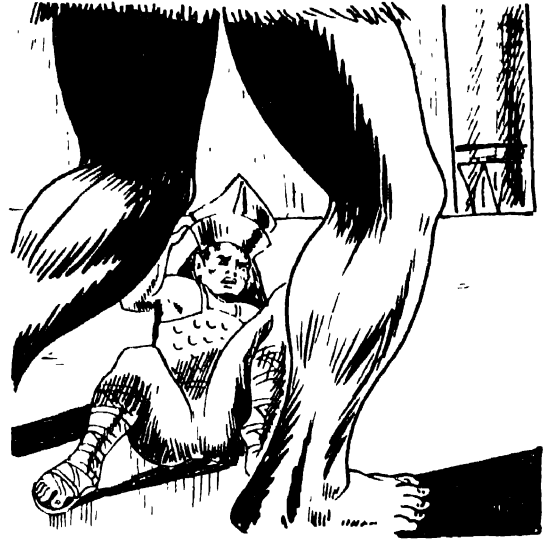
তাকে বন্দী করতে এলেও সে যদি আমার নির্দেশ-মত কাজ করে তাহলে ডিলেক্টার অনুরোধে আমি তাকে সাহায্য কবতেই চাই।

টারজন বলল, কি নির্দেশ? আমাকে কি করতে হবে?

প্রিক্লেরাস বলল, তুমি যে আমার বন্দী এইভাবে আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে কলোসিয়ামের দিকেই নিয়ে যাব। আমার বাড়িব বিপরীত দিকে পৌঁছেই আমি এমন একটা ইঙ্গিত করব যাতে তুমি বুঝতে পারবে যে সেটা আমার বাড়ি। তারপরেই আমি এমন সুযোগ করে দেব যাতে তুমি গাছের উপর দিয়ে পালিয়ে আমার বাড়িতে ঢুকে যেতে পার। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি সেখানেই অপেক্ষা করবে। ডিলেক্টা এখনই ম্‌পিংগুকে আমার বাড়ি পাঠাবে তোমার সেখানে যাবার সংবাদটা জানাতে, যাতে প্রাণ দিয়েও তারা তোমাকে রক্ষা করে। বুঝতে পারলে?

বুঝেছি, টারজন বলল।

প্রিক্লেরাস বলল, পরে তোমাকে কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের বাইরে পাহাড়ের ওপারে পাঠাবার একটা ব্যবস্থা আমরা করতে পারব বলেই আশা করি।

টারজনকে সঙ্গে নিয়ে সৈন্যসামন্তসহ ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস এগিয়ে চলল কলোসিয়ামের দিকে। কিছুদূর গিয়ে প্রিক্লেরাস পথের পাশে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল, আর তার পরেই এসে সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিল। টারজন বুঝতে পারল, তরুণ অফিসারটি তার বাড়ির নিশানা তাকে বুঝিয়ে দিল।

গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে টারজন প্রিক্লেরাসের বাড়িতে গিয়ে নামল। ম্পিংগু সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করেই ছিল। আর তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল মধ্যবয়সী একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা।

মহিলা ম্পিংগুকে শুধাল, এই কি সেই লোক?

ম্পিংগু বলল, হ্যাঁ, সেই।

মহিলা বলল, ওকে বল যে আমি ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসের মা কেস্টিভিটাস; আমার ছেলের পক্ষ হয়ে তাকে এখানে অভ্যর্থনা করছি।

বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরেই ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস টারজনের ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সকাল-বেলাকার সেই দোভাষী লোকটি।

লোকটি টারজনকে বলল, তোমার দোভাষী ও চাকর হিসাবে আমি এখানেই থাকব।

প্রিক্লেরাস জানাল, একমাত্র এই বাড়িটা ছাড়া আর সর্বত্র সম্রাটের লোকরা তন্ন তন্ন করে তোমার খোঁজ করেছে। কোথাও না পেয়ে সাব্লেটাসের ধারণা হয়েছে যে তুমি পালিয়েছ। আমরা তোমাকে দিন কয়েক এখানে লুকিয়ে রাখব; তারপর রাতের অন্ধকারে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেব।

টারজন হেসে বলল, দিনে বা রাতে যে কোন সময়েই আমি ইচ্ছা করলেই এখান থেকে চলে যেতে পারি। কিন্তু যার খোঁজে আমি এসেছি সে যে এখানে নেই সেটা নিশ্চিত জানতে পারলে তবেই আমি যাব। কিন্তু সর্বপ্রথম তোমার এই করুণার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যদিও এই করুণার কারণ আমি জানি না।

প্রিক্লেরাস বলল, কারণটা খুবই সরল। আজ সকালে যে যুবতীটিকে তুমি রক্ষা করেছ সে ডিয়ন সৃপ্লেণ্ডিডার মেয়ে ডিলেক্টা। তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আশা করি, আমার কৃতজ্ঞতার কারণটা এবার বুঝতে পেরেছ।

তা পেরেছি, টারজন বলল, ভাগ্যিস আমি ঠিক সময়ে সেখানে হাজির হয়েছিলাম।

এবার প্রিক্লেরাস বলল, এখানে তোমার জীবন যে কোন সময় বিপন্ন হতে পারে। তবু তুমি এখানে থাকতে চাইছ কেন?

টারজন বলতে লাগল, আমার এক বন্ধুর ছেলেকে খুঁজতে আমি এখানে এসেছি। অনেক সপ্তাহ আগে সেই যুবকটি আবিষ্কারের নেশায় এই ওয়াইরামওয়াজি পর্বতে এসে ঢুকেছে। বাইরে থেকেই তার লোকজন তাকে ফেলে পালিয়েছে। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা যেকোন ভাবেই হোক সে এখানেই এসেছে। তাই যদি হয় তাহলে আজ হোক কাল হোক সে তোমাদের এই শহরে আসবেই, আর নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছি যে এখানে

এলে তোমাদের সম্রাট তার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করবে না। তাই আমি এখানে থেকে যেতে চাই তাকে সাহায্য করব বলে।

প্রিক্লেরাস বলল, বেশ তো, তাই থাক। আমার বাড়িতে তুমি স্বাগত অতিথি।

টারজন তিন সপ্তাহ কাটাল ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসের বাড়িতে।

ওদিকে ঠিক সেই সময় ভন হার্‌বেন সুখে দিন কাটাচ্ছে প্রাচ্যের সম্রাটের দরবারে একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে। কিন্তু যতই সুখে ও মর্যাদায় দিন কাটুক, আসলে সে যে একজন বন্দী-মাত্র এই চেতনা তাকে সর্বদাই বিমর্ষ করে তোলে; সেখান থেকে পালাবার উপায়ের কথা ভাবে। তবু সে সব কিছুই সে ভুলে যায় যখনই সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের কন্যার কথা তার মনে পড়ে।

এই ভাবেই দিন কাটে। আর অনেক দূরের অন্য এক জগতে একটি ভয়ার্ত ছোট বানর এক সুদূর অরণ্যের প্রান্তে লাফিয়ে বেড়ায় মনের দুঃখে।

মনিব-কন্যা ও প্রিক্লেরাসের পরিবারের লোক-জন ছাড়া একমাত্র সেই যে এত বড় একটা গোপন খবর জানে সেটাই মাঝে মাঝে ম্‌পিংগুর মনকে সুড়সুড়ি দেয়, আর সেও এখানে-সেখানে মুখ খুলে বসে। ডিয়ন স্‌প্লেণ্ডিডাস পরিবারের সে বিশ্বস্ত ভৃত্য। তবু হাটে-বাজারে কখন যে সে কাকে কি বলেছে তাতেই ক্ষতি যা হবার তা হয়েছে। সেনানায়ক তাকে বন্দী করে প্রাসাদে নিয়ে গেল। সেখানে একজন অফিসারের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সব গোপন খবর সে ফাঁস করে দিল। ফলে সম্রাটের আদেশে পরপর বন্দী হল ম্‌পিংগুর মনিব, প্রিক্লেরাস ও টারজন।

যে সৈনিকরা টারজনকে কারা-কক্ষের মধ্যে ঠেলে দিল তাদের হাতের মশালের আলোয় সে দেখতে পেল, আরও একটি সাদা মানুষ ও জনাকয়েক

নিগ্রোকে দেয়ালের গায়ে শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছে। নিগ্রোদের মধ্যে একজন লুকেডি। টারজনকেও শিকলে আটকে দেওয়া হল সাদা মানুষটির ঠিক পাশেই।

সৈনিকরা চলে গেল। কারা-কক্ষ অন্ধকারে ভরে গেল।

পাশের সাদা লোকটি বলল, তুমিই কি সেই সাদা বর্বর যার সুখ্যাতি কারাগারের মধ্যেও এসে পৌঁচেছে?

আমি অরণ্যরাজ টারজন।

সাব্‌লেটাসকে তুমিই দুই হাতে মাথার উপর তুলে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেছিলে: তাজ্জব ব্যাপার!

টারজন বলল, ওসব কথা থাক। তুমি কে, আর কোন্ অপরাধে সিজারের কারাগারে ঢুকেছ?

লোকটি বলল, কোন সিজারের কারাগারে আমি ঢুকি নি। যে জীবটা এখন কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনা-রিয়াসের সিংহাসনে বসেছে সে কোন সিজারই নয়।

তাহলে সিজার কে? টারজন প্রশ্ন করল।

একমাত্র প্রাচ্যের সম্রাটরাই সিজার নামের অধিকারী।

টারজন বলল, তাহলে ধরেই নিচ্ছি যে তুমি কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের লোক নাও।

না। আমি কাস্ট্রা মেয়ারের মানুষ।

তাহলে তুমি এখানে বন্দী হলে কেমন করে?

লোকটি বলল, সে অনেক কথা। আমার খুড়ো প্রাচ্যের সম্রাট ভালিডাস অগাস্টাস বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে সাব্‌লেটাসের হাতে তুলে দিয়েছে। আমার নাম ক্যাসিয়াস হাস্টা; ভালিডাসের আগে আমার বাবাই ছিল সম্রাট। ভালিডাসের ভয়, আমি হয়তো সিংহাসনের দিকে হাত বাড়াতে পারি। তাই একটা সামরিক মিশনে পাঠাবার নাম করে সে আমাকে সাব্‌লেটাসের হাতে তুলে দিয়েছে।

তোমাকে নিয়ে সাব্‌লেটাস কি করবে? টারজন জানতে চাইল।

ঠিক তোমাকে নিয়ে যা করবে, ক্যাসিয়াস হাস্টা জবাব দিল। সাব্‌লেটাসের বিজয় উপলক্ষ্যে প্রতি বছর যে উৎসব হয় সেখানে আমাদের হাজির করা হবে, আর মল্ল-ক্ষেত্রে তাদের আমাদের খোরাক জোগাতে আমরা খুনোখুনি করে মরব।

সেটা কখন হবে? টারজন জানতে চাইল।

আর বেশী দেরী নেই। দেখছ না এখানে কত সাদা ও কালো মানুষকে আটক করে রেখেছে।

অন্ধকারে লুকেডিকে দেখা যাচ্ছে না, তবু তার দিকে ফিরে টারজন ডাকল, লুকেডি।

বল, লুকেডির গলা শোনা গেল।

তুমি ভাল আছ তো?

আমি তো মরতে বসেছি। ওরা আমাকে সিংহ দিয়ে খাওয়াবে, না হয় ক্রুসে পুড়িয়ে মারবে, অথবা যোদ্ধাদের সঙ্গে আমাকে লড়িয়ে দেবে। লুকেডির কাছে সবই সমান।

এই সব লোকই তোমাদের গাঁয়ের?

কে একজন বলে উঠল, গতকাল ওরা বলেছিল আমরা ওদের আপনজন, আর কালই সিজারের মজার জন্য ওরা আমাদের দিয়ে খুনোখুনি করাবে।

টারজন বলল, তোমরা নিশ্চয় সংখ্যায় খুব কম, তাই এই ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছ।

মোটেই না; সংখ্যায় আমরা শহরের লোকের দ্বিগুণ। আমরা সকলেই সাহসী যোদ্ধা।

তাহলে তোমরা বোকা।

আমরা চিরদিন বোকা থাকব না। অনেক লোকই সাব্‌লেটাস ও কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের সাদা মানুষদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত।

শহরের এবং বাইরের নিগ্রোরা সিজারকে ঘৃণা করে। কথাগুলি বলল ম্‌পিংগু। তাকেও টারজনের সঙ্গে বন্দী করে আনা হয়েছে।

লোকগুলির কথাবার্তা টারজনের মনে নতুন চিন্তার খোরাক জোগাল। সে জানে, হাজার হাজার আফ্রিকান ক্রীতদাস শহরে আছে; আরও হাজার হাজার আছে বাইরের গ্রামে গ্রামে। তাদের ভিতর থেকে যদি কোন নেতা মাথা তুলে দাঁড়ায় তাহলে অচিরেই সিজারের অত্যাচারের অবসান ঘটানো যায়।

এই সময় আর একদল সৈন্য এসে কারাগারের বাইরে থামল। ফটক খুললে তাদের মশালের আলোয় টারজন দেখল, আরও একটি বন্দীকে তারা সঙ্গে করে এনেছে: লোকটিকে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে আসতেই টারজন তাকে চিনতে পারল। ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস তাকে চিনতে পেরেও কথা বলল না দেখে টারজনও চুপ করে গেল। প্রিক্লেরাসকে শিকল দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে বেঁধে রেখে সৈন্যরা বেরিয়ে গেলে টারজন বলল, আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলেই তোমার আজ এই দশা হয়েছে।

প্রিক্লেরাস বলল, নিজেকে অকারণে দোষী করো না বন্ধু! ফাস্টাস বা সাব্‌লেটাস অন্য যে কোন একটা ছুতো খুঁজে নিত। যবে থেকে ডিলেকটার উপর ফাস্টাসের নজর পড়েছে তবে থেকেই আমার কপাল পুড়েছে। ওরা আমাকে সরিয়ে দিতই। আমি শুধু ভাবছি, কে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল।

আমি। অন্ধকারেই একজন বলে উঠল।

কে কথা বলল? প্রিক্লেবাস শুধাল।

টারজন বলল, ম্‌পিংগু। তোমার সঙ্গে দেখা করতে ডিয়ন সপ্লেণ্ডিডাসের বাড়ি যাবার পথে আমার সঙ্গে তাকেও বন্দী করা হয়েছে।

আমার সঙ্গে দেখা করতে! প্রিক্লেরাস সবিস্ময়ে বলল।

আমিই মিথ্যা করে ও কথা বলেছি, ম্‌পিংগু বলল। ওরা আমাকে বলতে বাধ্য করেছে।

ওরা কারা?

সিজারের অফিসার ও ছেলে। আমাকে সম্রাটের প্রাসাদের মধ্যে টেনে নিয়ে চিৎ করে ফেলে সাঁড়াশি দিয়ে আমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল, গরম শিক দিয়ে চোখ দুটো পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। বল কর্তা, তারপরে আমি আর কি

করতে পারতাম?

প্রিক্লেরাস বলল, সব বুঝতে পেরেছি। তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না ম্‌পিংগু।

কারাগারের ঠাণ্ডা ও শক্ত পাথরের মেঝেতে শুয়েও টারজন একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। সে ঘুম ভাঙল অনেক বেলায় কারাধ্যক্ষের ডাকে। সকলকেই খেতে দেওয়া হল মোটা রুটি ও জল।

খেতে খেতে টারজন অন্য বন্দীদের ভাল করে দেখতে লাগল। কাস্ট্রাম মেয়ারের এক সিজারের পুত্র ক্যাসিয়াস হাস্টা, কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের এক সম্ভ্রান্ত নাগরিক সৈন্যাধ্যক্ষ ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস, আর সে নিজে, এই তিনজনই সাদা মানুষ। বাকি সকলেই কালো নিগ্রো।

দুদিন দু' রাত কেটে গেল। তৃতীয় দিনে আর একটি বন্দীকে সেখানে রেখে রক্ষী-সৈন্যরা চলে গেল।

ক্যাসিয়াস হাস্টা চাপা উত্তেজনায় ডেকে উঠল, সিসিলিয়াস মেটেলাস, তুমি!

হাস্টার কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে মুখ ফিরিয়ে অপর যুবক বলে উঠল, হাস্টা! টার্টারাসের গভীরতম গভীর থেকে উঠে এলেও ও কণ্ঠস্বর আমি চিনতে পারতাম।

কোন্ দুর্ভাগ্য তোমাকে এখানে এনে ফেলেছে? হাস্টা শুধাল।

যে ভাগ্য আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে আমাকে মিলিত করেছে সেটা দুর্ভাগ্য হতে পারে না।

কিন্তু এ ঘটনা ঘটল কেমন করে?

মেটেলাস বলতে লাগল, তুমি কাস্ট্রাম মেয়ার ছেড়ে আসার পরে সেখানে অনেক কিছুই ঘটেছে। সম্রাটের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়ে ফুল্‌বাস ফুপাস তোমার সব বন্ধুদেরই সন্দেহ করছে। তাদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। এমন কি ফুপাস যদি তার মেয়ে ফেবোনিয়ার প্রেমে না পড়ত তাহলে সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসকেও এতদিনে কারাগারে ঢুকতে হত। কিন্তু সব চাইতে বড় দুঃসংবাদ হল, ভালিডাস অগাস্টাস ফুল্‌বাস ফুপাসকে পোষ্যপুত্র নিয়েছে এবং তাকেই পরবর্তী সম্রাটরূপে ঘোষণা করেছে।

হাস্টা চেঁচিয়ে বলে উঠল, ফুপাস হবে সিজার! আর মিষ্টি মেয়ে ফেবোনিয়া? সে কি ফুপাসকে ভালবাসতে পারবে?

মেটেলাস বলল, সেখানেই তো গোলমালের মূল। সে ভালবাসে আর একজনকে।

কে সে? মালিয়াস লেপাস নিশ্চয় নয়?

সে কাস্ট্রাম মেয়ারের মানুষ নয়। জার্মানিয়া থেকে আগত এক বর্বর সর্দার। সে নিজের নাম বলেছে এরিক ভন হার্‌বেন।

টারজন বলে উঠল, এরিক ভন হার্‌বেন। তাকে তো আমি চিনি। সে কোথায়? নিরাপদে আছে তো?

মেটেলাস বলল, মালিয়াস লেপাসের সঙ্গে সেও কাস্ট্রাম মেয়ারের কারাগারে বন্দী। মল্ল-ক্ষেত্রের খেলায় যদি সে বেঁচেও যায়, তাহলে তাকে সরিয়ে দেবার অন্য পথের অভাব ফুপাসের হবে না।

মল্ল-ক্ষেত্রের খেলা কবে হবে? টারজন প্রশ্ন করল।

অগাস্টের মাঝামাঝি তারিখে, হাস্টা জবাব দিল।

আমি শুনেছি সে খেলা এক সপ্তাহ ধরে চলে। কাস্ট্রাম মেয়ার যেতে ক'দিন লাগে? টারজন শুধাল।

মেটেলাস জবাব দিল, সেনাদলের লাগে আট ঘণ্টা। কিন্তু সে প্রশ্ন কেন? তুমি কি কাস্ট্রাম মেয়ার যাবার কথা ভাবছ নাকি?

টারজন কঠিন গলায় বলল, হ্যাঁ।

মেটেলাস হেসে বলল, আমাদেরও নিশ্চয় সঙ্গে নেবে?

তোমাদের দুজনকেই সঙ্গে নেব, টারজন বলল।

দুজনই হেসে উঠল।

ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস বলল, কাস্ট্রাম মেয়ারে গিয়ে ক্যাসিয়াস হাস্টা যদি আমার বন্ধু থাকে তাহলে আমিও আছি তোমাদের দলে।

হাস্টা বলল, কথা দিলাম ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস।

হাতের শিকল বাজিয়ে মেটেলাস বলল, কবে আমরা যাত্রা করব?

টারজন বলল, যে মুহূর্তে আমার হাতের শিকল খোলা হবে ; মল্ল-ক্ষেত্রে নিয়ে যাবার আগে সে কাজটা নিশ্চয় করা হবে।

খেলার শেষ দিন এসে গেল। রক্তপিপাসু মানুষের দল কলোসিয়ামে সমবেত হয়েছে। সেলের বাসিন্দাদের শেষবারের মত নিয়ে যাওয়া হয়েছে মল্ল-ক্ষেত্রের বেড়ার ধারে। লড়াইতে তাদের ফল ভালই হয়েছে, কারণ বারোটার মধ্যে মাত্র চারটে আংটা শূন্য হয়েছে।

দরজাটা সপাটে খুলে একজন ছোট অফিসার এসে বলল, তোমরা সকলেই এস। এবার শেষ খেলা।

তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হল একটা তরবারি, ছুরি, বল্লম, ঢাল ও শনের জাল। একে একে তাদের ঢোকানো হল মল্ল-ক্ষেত্রের ভিতরে। সপ্তাহব্যাপী লড়াইয়ের পরেও বেঁচে আছে এমন শ'খানেক যোদ্ধা সেখানে হাজির ছিল।

তাদের দুই সমান দলে ভাগ করা হল। এক দলের কাঁধে বেঁধে দেওয়া হল লাল ফিতে, অপর দলের কাঁধে সাদা ফিতে।

টারজন, হাস্টা, মেটেলাস, লুকেডি, ম্পিংগু ও ওগোন্যু—সকলেই পড়ল লাল ফিতের দলে।

টারজন হাস্টাকে শুধাল, আমাদের কি করতে হবে?

লালের সঙ্গে সাদার যুদ্ধ চলবে যতক্ষণ না লাল অথবা সব সাদা মারা পড়ে।

দুই দল মল্ল-ক্ষেত্রের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রিফেক্ট লড়াইয়ের নিয়মকানুন শুনিয়ে দিল। ভেরী বেজে উঠল। দুই দল সশস্ত্র মানুষ এগিয়ে চলল পরস্পরের দিকে। শুরু হল দুই দলের মুখোমুখি লড়াই।

অনেকক্ষণ ধরে লড়াই চলল। 'দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।' এ এক আশ্চর্য লড়াই।

বাঁচার লড়াই। নিয়ম নেই, নীতি নেই। হয় তোমার জীবন যাবে, নয়তো আমার।

রক্তাক্ত লড়াই শেষ হল। লালের দলে তখনও পনেরোজনই বেঁচে আছে।

তখন জনতা সমস্বরে চীৎকার করে বলতে লাগল, বিজয়ীর মালা লালদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হোক ; কিন্তু তার পরিবর্তে একমাত্র টারজন ছাড়া বাকি সকলকেই মল্ল-ক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল।

সকলে ভাবল, সাব্লেটাস হয়তো তাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করতে ইচ্ছুক। কিন্তু এ সব কী হচ্ছে!

ক্রীতদাসরা এসে মৃতদেহগুলিকে মল্ল-ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল ; পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্রগুলি কুড়িয়ে নিল ; নতুন করে বালি ছড়িয়ে দিল। টারজন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সিজারের আসনের নীচে, একাকি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

বুকের উপর দুই হাত ভাঁজ করে টারজন দাঁড়িয়েই আছে। কিসের জন্য এ প্রতীক্ষা তাও সে জানে না। জনতার ভিড়ের ভিতর থেকে ভেসে এল একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ—ক্রমেই সে

আর্তনাদ তীব্রতর হতে হতে প্রচণ্ড ক্রোধের চীৎকারে পরিণত হল, আর সে সব কিছুকে ছাড়িয়ে টারজনের কানে বাজতে লাগল কয়েকটা শব্দ : অত্যাচারী! ভীরু! বিশ্বাসঘাতক! সাব্‌লেটাস নিপাত যাক!

প্রিফেক্টকে কাছে ডেকে সিজার ফিস্‌ফিস্ করে আবার তার সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করল। বেজে উঠল ভেরী। প্রিফেক্ট উঠে দাঁড়াল। হাত তুলে বলতে লাগল, এই বর্বর লোকটির অসাধারণ ক্রীড়া-কৌশল সম্রাটের এতই ভাল লেগেছে যে তার প্রিয় প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য তাকে দিয়ে আর একটি নতুন খেলার ব্যবস্থা—প্রিফেক্ট তার কথা শেষ করতে পারল না; বিস্ময়ে ও রাগে সমবেত দর্শকরা হৈ-হৈ করে উঠল। সিজারকে লক্ষ্য করে নানা রকম ধ্বনি দিতে লাগল। উদ্যত বল্লম হাতে সৈনিকরা তাদের ঠেকিয়ে রাখতে লাগল।

এমন সময় মল্ল-ক্ষেত্রের শেষ প্রান্তের ফটকটা সপাটে খুলে গেল।

মল্ল-ক্ষেত্রের শেষ প্রান্তের দিকে তাকিয়ে টারজন দেখল, ছ'টি গোরিলাকে ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কয়েক মিনিট আগেই মল্ল-ক্ষেত্র থেকে উৎসারিত বিজয়-গর্জন তাদের কানে গেছে; তাই উত্তেজনায় ও হিংস্রতায় কাঁপতে কাঁপতে তারা খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে। সামনেই দেখতে পেল একটি ঘৃণিত টারমাঙ্গানিকে। যারা তাদের বন্দী করেছে, বিরক্ত করেছে, আঘাত করেছে, এ তো তাদেরই একজন।

একটি গোরিলা গর্জে বলল, আমি গোয়াট। আমি খুন করি।

আর একটিও গর্জে উঠল, আমি জুঠো। আমি খুন করি।

গো-ইয়াড খেঁকিয়ে বলল, টারমাঙ্গানিকে মার।

তারা হেলে-দুলে এগোতে লাগল।

ওদিকে জনতা শিস দিচ্ছে, আর্তনাদ করছে। সে সব ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে তাদের স্লোগান: সিজারের পতন হোক। সাব্‌লেটাস মুর্দাবাদ!

গোরিলারা এগিয়ে চলল। সকলের সামনে জুঠো। সে বলল, আমি জুঠো। খুনে।

টারজন বলল, বন্ধুকে খুন করার আগে ভাল করে তাকাও জুঠো। আমি অরণ্যরাজ টারজন।

জুঠো অবাক হয়ে থেমে গেল। অন্যরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল।

গো-ইয়াড বলল, আমি ওকে চিনি। আমি যখন যুবক ছিলাম তখন ও ছিল রাজা।

গাইয়াট বলল, সত্যি তো এর চামড়া সাদা।

টারজন বলল, হ্যাঁ, আমি সাদা-চামড়া। এখানে আমরা সকলেই বন্দী। এই সব টারমাঙ্গানিরা আমাদের শত্রু, তোমাদের শত্রু। ওরা চায় আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, কিন্তু আমরা তা করব না।

জুঠো বলল, না, আমরা টারজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না।

সাব্‌লেটাস পাশের অতিথিকে শুধাল, কি ব্যাপার? ওরা ওকে আক্রমণ করছে না কেন?

লোকটা ওদের মন্ত্রে বশ করেছে, অতিথি বলল।

উপস্থিত জনতা হা করে দেখছে। তারা দেখল, টারজন সিজারের আসনের দিকে এগিয়ে চলেছে ; গোরিলারা হেলে-দুলে চলেছে তার পাশে পাশে।

সম্রাটের আসনের নীচে পৌছে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। টারজন সাব্‌লেটাসের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার সব ফন্দি ব্যর্থ হয়েছে সিজার। এরা সবাই আমার আপনজন। আমার কোন ক্ষতি এরা করবে না। বরং আমার এক কথায় এরা গিয়ে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

সে কাজ টারজন অনায়াসে করতে পারত, কিন্তু তার পরেই তো সৈনিকদের হাতে বল্লমের আঘাতে তারও ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। তাছাড়া, নিজে পালিয়ে যাবার আগে ক্যাসিয়াস হাস্টা ও সিসিলিয়াস মেটেলাসকেও তো সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, তাদের সাহায্য ছাড়া সে তো এরিক ভন হারবেনের খোঁজই করতে পারবে না।

তাই প্রিফেক্ট যখন আবার তাকে ও গোরিলাদের কারাগারে ফিরিয়ে নিতে এল তখন সে কোনরকম বাধাই দিল না। মল্ল-ক্ষেত্রের ফটক বন্ধ হয়ে গেলে আবার একবার তার কানে এল জনতার সমবেত কণ্ঠস্বর : সাব্‌লেটাসের পতন হোক।

কারাগারে ঢুকেই টারজন দেখতে পেল ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসকে। এক বন্ধুর চেষ্টায় কারাগারের চাবিও তাদের হস্তগত হল। হাতের বেরি খুলে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার বারান্দা দিয়ে সেল থেকে সেলে ঢুকে সব বন্দীকে মুক্ত করে দিল। শুধু নিজেদের দলের লোকই নয়। আরও যে সব পেশাদার যোদ্ধাকে সিজার আটকে রেখেছিল তাদেরও মুক্তি দেওয়া হল।

সকলেই একবাক্যে টারজনের নেতৃত্বকে মেনে নিল।

টারজন বলল, আমরা সকলে হয়তো জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে পারব না, কিন্তু যারা পারবে
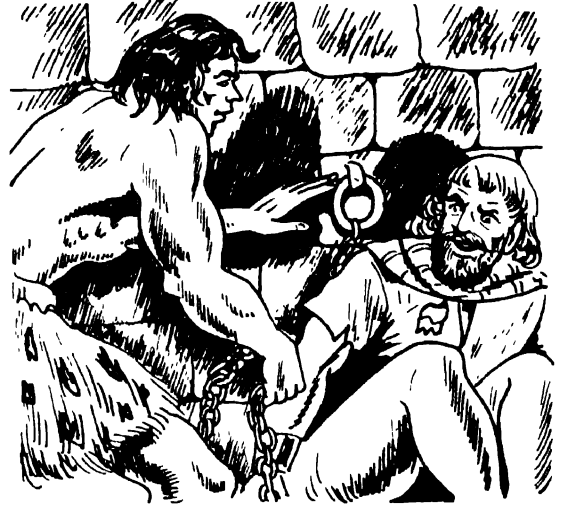
তারা অবশ্যই সিজারের অবিচারের প্রতিশোধ নেবে।

জনৈক যোদ্ধা বলল, তুমি ন্যায় করেছ কি অন্যায় করেছ জানি না ; আমরা বাঁচব কি মরব তাও বুঝি না, শুধু বুঝি লড়াই—যুদ্ধ।

টারজন বলল, যুদ্ধ তোমরা পাবে—প্রচুর যুদ্ধ।

তাহলে আমাদের পরিচালনা কর।

টারজন বলল, কিন্তু তার আগে আমার বাকি বন্ধুদের মুক্তি দিতে হবে।

প্রিক্লেরাস বলল, সব সেল আমরা খালি করে দিয়েছি, আর কেউ কোথাও নেই।

আছে বন্ধু, আছে, টারজন বলল, এখনও বাকি আছে আমার গোরিলা বন্ধুরা।

কাস্ট্রাম মেয়ারে ভালিডাস অগাস্টাসের কারাগারে এরিক ভন হারবেন ও মালিয়াস লেপাস সুদিনের জন্য অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু সুদিন কি আসবে ?

লেপাস বিষণ্ণ গলায় বলল, মৃত্যু ছাড়া আর কিই বা আমরা আশা করতে পারি। আমাদের বন্ধুরা ক্ষমতাচ্যুত, কারাগারে বন্দী, না হয় নির্বাসিত।

আর সব দোষ আমার, ভন হারবেন বলল।

নিজেকে অকারণে দোষী করো না। ফেবোনিয়া তোমাকে ভালবেসেছে সেটা তো তোমার অপরাধ নয়। আসল অপরাধী কুচক্রী ফুপাস।

ভন হার্‌বেন তবু বলতে লাগল। আমার ভালবাসাই ফেবোনিয়ার বিপদ ডেকে এনেছে, তার বন্ধুদের বিপন্ন করেছে। আর আমি এখানে পাথরের দেয়ালে শিকলে বন্দী হয়ে আছি। কিছুই করতে পারছি না।

লেপাস বলে উঠল, আহা, এ সময় ক্যাসিয়াস হাস্টা যদি এখানে থাকত! একটা মানুষের মত মানুষ। সিজার পোষ্যপুত্র নিয়েছে ফুপাসকে। এ পরিস্থিতিতে হাস্টার নেতৃত্ব পেলে গোটা শহর ভালিডাস অগাস্টাসেব বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত।

সেই সময়ে উপত্যকার অপর প্রান্তে কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াস শহরে সাব্‌লেটাসের দরবার-কক্ষে নিমন্ত্রিত লোকরা একে একে জড় হতে শুরু করেছে, কারণ সেই সন্ধ্যায়ই সিজার-পুত্র ফাস্টাসের বিয়ে হবে ডিয়ন স্‌প্লেণ্ডিডাসেব কন্যার সঙ্গে।

রাজপথে, এমন কি রাজপ্রাসাদের ফটকের ভিতরেও প্রচণ্ড ভিড় জমে গেছে। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি, হৈ-হল্লার শেষ নেই। জনতার চোখে-মুখে প্রচণ্ড ক্রোধ। আর সে ক্রোধ প্রকাশের মন্ত্র —অত্যাচারীর পতন হোক! সাব্‌লেটাস মুর্দাবাদ! ফাস্টাস মুর্দাবাদ!

ওদিকে প্রাসাদের উপরের ঘরে ক্রীতদাসী-পরিবৃত হয়ে বসে আছে বিয়ের কনে, মা তাকে নানা-ভাবে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

ডিলেক্টা বলছে, তা হবে না; কিছুতেই আমি ফাস্টাসের স্ত্রী হব না। ঘাঘরার নীচে দৃঢ়মুষ্টিতে সে ধরে আছে একটা সরু ছুরির হাতল।

কলোসিয়ামের নীচেকার বারান্দায় টারজন তার সেনাসমাবেশ নিয়ে ব্যস্ত। লুকেডি ও সহ-বন্দী জনৈক গ্রাম-প্রধানকে ডেকে বলল, তোমরা

পোর্টা প্রিটোরিয়াতে চলে যাও। সেখানে এপ্পিয়াস এপ্লোসাসকে বলবে, ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসের খাতিরে তোমাদের যেন শহর থেকে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয়। তারপর গ্রামে গ্রামে গিয়ে যোদ্ধা সংগ্রহ করবে। তাদের বলবে, তারা যদি সিজারের উপর প্রতিশোধ নিতে চায়, যদি চায় স্বাধীন মুক্ত জীবন, তাহলে তাদের অবিলম্বে শহরে এসে এখানকার বিদ্রোহী নাগরিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অত্যাচারীকে ধ্বংস করতে হবে। তাড়াতাড়ি চলে যাও; সময় বড়ই অল্প। সকলকে সঙ্গে নিয়ে পোর্টা প্রিটোরিয়ার পথে শহরে ঢুকে সোজা চলে যাবে সিজারের প্রাসাদে।

* * *

দলে দলে লোক আসতে লাগল। বাইরের গ্রাম থেকে অর্দ্ধ-নগ্ন যোদ্ধার দল, শহরের ক্রীতদাসের দল আর সমাজচ্যুত মানুষের দল যাদের মধ্যে আছে খুনী, চোর ও পেশাদার মল্লযোদ্ধা। সকলের আগে আগে চলেছে প্রিক্লেরাস, হাস্টা, মেটেলাস ও টারজন। টারজনকে ঘিরে চলেছে গাইয়াট, জুঠো, গো-ইয়াড ও অন্য গোরিলারা।

প্রশস্ত রাজপথ 'ভায়া প্রিন্সিপ্যালিস' বড় বড় সব গাছে ঢাকা থাকায় রাতের অন্ধকারে একটা

সুড়ঙ্গের রূপ নিয়েছে। সেই পথে কয়েকজন মশালধারীর পিছন পিছন টারজন প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল অনুগামীদের নিয়ে।

ফটকে শান্ত্রী চেঁচিয়ে বলল, কে আসে?

আমি অরণ্যরাজ টারজন।

সমবেত জনতা এক কণ্ঠে তার জয়ধ্বনি করে উঠল।

কেন তোমরা এখানে এসেছ? কি চাও?

আমরা এসেছি ফাস্টাসের হাত থেকে ডিলেক্টাকে উদ্ধার করতে, আর কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের সিংহাসন থেকে অত্যাচারীকে টেনে নামিয়ে দিতে।

হাজার কণ্ঠ এই ঘোষণাকে সমর্থন জানিয়ে বলল, অত্যাচারী মুর্দাবাদ! প্রাসাদ-রক্ষী মুর্দাবাদ! তাদের হত্যা কর—হত্যা কর!

জনতা দৃঢ়পদক্ষেপে প্রাসাদ-ফটকের দিকে এগিয়ে গেল।

সংবাদ-বাহক ছুটে গেল দরবার-কক্ষে সিজারের কাছে। ভাঙা গলায় বলল, জনতা বিদ্রোহ করেছে। সেনাদল, মল্লযোদ্ধা ও ক্রীতদাসরা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা ফটকের উপর ভিড় করছে। ফটক ভেঙে পড়বে।

তখন সিজারের দরবার-কক্ষের সোপানশ্রেণীতে চলেছে ফাস্টাস ও ডিলেক্টার বিয়ের আয়োজন। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দাঁড়িয়ে আছে সমবেত দর্শকদের দিকে মুখ করে। একপাশে দাঁড়িয়ে আছে ফাস্টাস। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল বিয়ের কনে। সঙ্গে প্রদীপ হাতে কুমারী সখীর দল। ডিলেক্টার মুখখানি ম্লান, কিন্তু পদক্ষেপ ধীর অথচ দৃঢ়। তাকে দেখাচ্ছে সম্রাজ্ঞীর মত। কিন্তু কনের পোশাকের নীচে তার ডান হাতে যে ধরা আছে একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা সেটা কেউ দেখতে পেল না।

সে সোপানে পা রাখল; কিন্তু ফাস্টাসের মত

পুরোহিতের কাছে না থেমে সে সোজা উপরে উঠে গেল। সাব্‌লেটাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, রোমের নাগরিক হিসাবে আমি আবেদন রাখছি সিজারের কাছে।

সিজার বলল, বেশ, বল তুমি কি অনুগ্রহ চাও?

আমি কোন অনুগ্রহ চাই না, আমি দাবী করছি আমার অধিকার। ফাস্টাসের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার আগে ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসকে আমি এইখানে জীবিত ও মুক্ত দেখতে চাই। তুমি তো ভালই জান যে সেই শর্তেই আমি এ বিয়েতে রাজী হয়েছি।

সিজার সক্রোধে উঠে দাঁড়াল। বলল, তা হতে পারে না।

দরবার-কক্ষের এক পাশের অলিন্দ থেকে ভেসে এল একটি কণ্ঠস্বর, হ্যাঁ, নিশ্চয় হতে পারে, কারণ আমার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস।

সকলেরই দৃষ্টি পড়ল অলিন্দের দিকে. এক-সঙ্গে অনেকে বলে উঠল, সেই বর্বর লোকটা! ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস!

অলিন্দ থেকে একলাফে একটা উঁচু স্তম্ভকে আঁকড়ে ধরে টারজন দ্রুত নেমে গেল মেঝের উপর। তার পিছন পিছন নেমে এল ছ'টি লোমশ গোরিলা।

সিজার চীৎকার করে ডাকল, রক্ষী! রক্ষী!

টারজন ও ছ'টি গোরিলা ধেয়ে গেল সিংহাসনের দিকে। রক্ষীদের হাতে ঝল্সে উঠল দশ-বারোখানা তরবারি। মেয়েরা আর্তনাদ করে মূর্ছা গেল। ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সিজার স্বর্ণ-সিংহাসনে এলিয়ে পড়ল। ফাস্টাস আর্তনাদ করে পালিয়ে গেল। একলাফে টারজন হাজির হল ডিলেক্টার পাশে। গোরিলারা সিঁড়ি বেয়ে সিংহাসনের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সিজার লুকিয়ে পড়ল তার মহত্ত্ব ও শক্তির প্রতীক সিংহাসনেরই পিছনে।

ওদিকে 'ভায়া প্রিন্সিপ্যাসিস-এর উপর প্রচণ্ড ঢেউয়ের মত একের পর এক আছড়ে পড়ছে ক্রুদ্ধ জনতার দল। ফটক ভেঙে তারা ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তাদের পায়ের নীচে অনেক রক্ষী চাপা পড়ে মরল।

এমন সময় পোর্টা ডেকুকামার দিক থেকে অনেক দূরে শোনা গেল ভেরীর আওয়াজ। সকলে আনন্দে উল্লাস-ধ্বনি করে উঠল। নিশ্চয় গ্রাম থেকে যোদ্ধার দল এসে পড়েছে তাদের সাহায্য করতে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নয়। বল্লম ও তরবারি উঁচিয়ে ধেয়ে এল সম্রাটের সৈন্যদল। ভীতত্রস্ত জনতা ছুটে পালাতে শুরু করল। আর দুর্ধর্ষ সেনাদল রক্তাক্ত তরবারি ও জ্বলন্ত মশাল হাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল।

দুই পক্ষের রণ-কোলাহলকে ছাপিয়ে বাগানের দূর প্রান্ত থেকে ভেসে এল এক বর্বর চীৎকার। সে চীৎকার উভয় পক্ষের সেনানীদেরই ক্ষণতরে স্তব্ধ করে দিল। টারজন সাগ্রহে মাথা তুলে তাকাল। বাতাসের গন্ধ শুঁকতে লাগল। পরিচয়, আশা, বিস্ময়, অবিশ্বাস—সব যেন একসঙ্গে তার বুকের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠল।

সে বর্বর চীৎকার বাড়তে বাড়তে ক্রমে সিজারের বাগানে ঢুকে পড়ল। সম্রাটের ভাড়াটে সৈনিকরা মুখ তুলে দেখল, একটি বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে একদল বীর যোদ্ধা। তাদের মাথার চামড়ার শিরস্ত্রাণে উড়ছে পাখির পালক, তাদের কণ্ঠেই ধ্বনিত হচ্ছে এই ভয়ংকর রণ-গর্জন—ওয়াজিরিরা এসে পড়েছে।

টারজন দেখল, সকলের সামনে রয়েছে মুভিরো, তার পাশে লুকেডি। কিন্তু সেই মুহূর্তে টারজনের বা সেখানে সমবেত অন্য কারও নজরে না পড়লেও সেই ওয়াজিরি বাহিনীর সঙ্গেই ছিল কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের নানা গ্রাম থেকে আসা সেই সব যোদ্ধার দল যারা দীর্ঘকালব্যাপী অবিচারের প্রতিহিংসা নিতে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটে এসেছে সিজারের রাজপ্রাসাদকে লক্ষ্য করে।

শেষ পর্যন্ত সম্রাটের সেনাদল অস্ত্র ত্যাগ করে টারজনের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করল। মুভিরো ছুটে এসে টারজনের সামনে নতজানু হয়ে তার হাতে চুমু খেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা

ছোট বানর ঝুলন্ত ডাল থেকে লাফিয়ে নেমে এল টারজনের কাঁধে।

মুভিরো বলল, ওয়াজিরিদের প্রতি পূর্বপুরুষের অনেক কৃপা না থাকলে আমরা ঠিক সময়ে এসে পৌঁছতে পারতাম না।

টারজন বলল, নকিমাকে না দেখা পর্যন্ত আমিও তো বুঝতে পারি নি আমার সন্ধান তোমরা কেমন করে পেলে।

মুভিরো বলল, হ্যাঁ, সবই নকিমার কৃতিত্ব। সেই তো ওয়াজিরিদের দেশে গিয়ে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে। তাই তো আজ বড় বাওয়ানাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দেশে ফিরে যেতে পারব।

টারজন মাথা নেড়ে বলল, না, আমি তো এখন যেতে পারব না। আমার বন্ধুর ছেলে এখনও এই উপত্যকায় আছে। তোমাদের সকলের সাহায্যে এবার আমি তাকে উদ্ধার করতে পারব।

এই সময় প্রিক্লেরাস এসে বলল, বন্ধু টারজন, গ্রাম থেকে যে সব লোক এসে রাজপ্রাসাদে ঢুকেছে তারা নির্বিচারে সকলকে খুন করছে, লুট চালাচ্ছে। তাদের তো বাধা দিতে হবে। এ সব থামাতে হবে।

টারজন বলল, নিশ্চয় থামাতে হবে। সৈন্য পাঠিয়ে সাব্‌লেটাস ও ফাস্টাসকে এখানে নিয়ে এস।

কিন্তু যাদের পাঠানো হল তারা ফিরে এসে জানাল, সাব্‌লেটাস মারা গেছে, ফাস্টাসও মারা গেছে। দরবার-কক্ষে ও অলিন্দ-পথে সেনেটর, রাজপুরুষ ও অফিসারদের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে আছে।

বিষণ্ন মুখে প্রিক্লেরাস শুধাল, কেউ কি বেঁচে নেই?

একজন বলল, আছে। কিছু লোক একটা ঘরে আত্মগোপন করেছিল। শুধু তারাই বেঁচে আছে। তাদের আমরা সব কথা জানিয়েছি। তারা এখনই এসে পড়বে।

অলিন্দ-পথে ঘরে এসে ঢুকল সদলে ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাস। তাকে দেখেই ডিলেক্টা আনন্দে চীৎকার করে উঠে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে টারজন বলল, সিজারের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তোমাদেরই একজনকে তো সিজারের দায়িত্বভার বহন করতেই হবে।

একজন চীৎকার করে বলে উঠল, টারজন জিন্দাবাদ! নতুন সিজার জিন্দাবাদ! সঙ্গে সঙ্গে ঘরের প্রতিটি স্যাঙ্গুইনারিয়াসের মুখে উচ্চারিত হল সেই ধ্বনি।

টারজন হেসে মাথা নেড়ে বলল, না আমি নই। এখানে এমন একজন আছে যার মাথায় আমি এই রাজমুকুট পরিয়ে দিতে চাই; তবে এক শর্তে।

কে সে? আর কি সেই শর্ত?

ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাস, বাইরের গ্রাম থেকে যে সব মানুষ এসেছে তাদের চিরতরে মুক্তি দিতে হবে, তাদের পুত্র-কন্যাদের আর কখনও ক্রীতদাস করে রাখা হবে না। অথবা তাদের মল্লবীরদেব কখনও জোর করে মল্ল-ক্ষেত্রে পাঠানো হবে না—এই শর্তে তুমি কি রাজমুকুট পরতে রাজী আছ?

ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাস মাথা নুইয়ে সম্মতি জানাল; আর টারজন রাজমুকুট পরিয়ে নতুন সিজারকে অভিষিক্ত করল।

কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াস থেকে ভায়া মেয়ার পথ ধরে পূব দিকে এগিয়ে চলেছে পাঁচ হাজার মানুষ। টারজনের ঠিক পিছনে উড়ছে ওয়াজিরিদের মাথার সাদা পালক। ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসের নেতৃত্বে চলেছে দীর্ঘদেহী ভাড়াটে সৈনিকের দল; আর সকলের পিছনে চলেছে দূর গ্রাম থেকে আগত যোদ্ধারা।

গরম ধূলোভর্তি রাস্তা ভায়া মেয়ার ধরে ওয়াজিরিরা পথ চলছে তাদের নিজস্ব রণ-সংগীত গাইতে গাইতে। ভারী শিরস্ত্রাণ বুকের উপর ঝুলিয়ে, লাঠির মাথায় বোঝাপত্তর ঝুলিয়ে কাঁধের উপর ফেলে মুখ-খিস্তি করতে করতে চলেছে ভাড়াটে সৈনিকরা। আর দূর গ্রাম থেকে আশা যোদ্ধারা হাসি-ঠাট্টা করতে করতে চলেছে একদল বনভোজন-কারীর মত।

কাস্ট্রাম মেয়ারের দুর্গের সম্মুখে সেনা সমাবেশ ও যুদ্ধের যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসাতে এত সময় কেটে গেল যে কাজ শেষ হবার পরে ক্যাসিয়াস হাস্টা বুঝতে পারল সেদিন আর দুর্গ আক্রমণ করা সম্ভব হবে না, কারণ ততক্ষণে অন্ধকার নেমে আসবে। তাই আর একটা মতলব মাথায় নিয়ে টারজন, মেটেলাস ও প্রিক্লেরাসকে সঙ্গে নিয়ে সে দুর্গের ফটকের দিকে এগোতে লাগল। তাদের সামনে চলল একদল মশালবাহী ও শান্তির পতাকা হাতে একদল সৈনিক।

বিপক্ষের সৈন্যদের আগমনের সময় থেকেই দুর্গের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ও কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। এখন শান্তির পতাকা হাতে একটি দলকে আসতে দেখে দুর্গাধিপতি একটি বুরুজ থেকে তাদের উদ্দেশ্য জানতে চাইল।

ক্যাসিয়াস হাস্টা বলল, শান্তির ব্যাপারে ভালিডাস অগাস্টাসের কাছে আমার দুটিমাত্র দাবী। এক, মালিয়াস লেপাস ও এরিক ভন হারবেনকে মুক্তি দিতে হবে; দুই, আমাকে কাস্ট্রাম মেয়ারে ফিরে যাবার অনুমতি দিতে হবে এবং আমার পদ-মর্যাদার অনুকূল সবরকম সুযোগ-সুবিধা আমাকে ভোগ করতে দিতে হবে।

কে তুমি?

আমি ক্যাসিয়াস হাস্টা। আমাকে তো তোমার ভাল করেই চেনা উচিত।

দুর্গাধিপতি বলল, ঈশ্বর করুণাময়।

ক্যাসিয়াস জিন্দাবাদ! ফুল্‌বাস ফুপাস মুর্দাবাদ! বহুকণ্ঠ একসঙ্গে গর্জে উঠল।

কয়েকজন ছুটে এসে দুর্গের ফটক খুলে দিল। দুর্গাধিপতি হাস্টার পুরনো বন্ধু। ছুটে বেরিয়ে এসে সে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

হাস্টা বলল, এ সবের অর্থ কি? কি হয়েছে?

ভালিডাস অগাস্টাসের মৃত্যু হয়েছে। আজই মল্ল-ক্ষেত্রে গুপ্তঘাতকের হাতে সে নিহত হয়েছে। ফুল্‌বাস ফুপাস এখন বসেছে সিজারের আসনে। বড় ভাল সময়ে তুমি এসে পড়েছ। সারা কাস্ট্রাম মেয়ার তোমাকে স্বাগত জানাবে।

দুর্গ থেকে হ্রদের তীর পর্যন্ত এবং ভাসমান সেতু হয়ে দ্বীপ পর্যন্ত এগিয়ে চলল প্রাচ্যের নতুন সম্রাটের বাহিনী। খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। জনসাধারণ উল্লাসে ফেটে পড়ল; ক্যাসিয়াস হাস্টাকে জানাল স্বাগত সম্ভাষণ।

অফিসার বাইরে থেকেই চীৎকার করে বলল, তোমরা সকলেই বেরিয়ে রাজপথে চলে এস। প্রাচ্যের সম্রাট ক্যাসিয়াস হাস্টার এই সব বন্ধুদের গায়ে কেউ হাত তুলো না।

ফেবোনিয়া, ভন হারবেন, লেপাস ও গাবুলা একসঙ্গে পড়ো-বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে নেমে রাজপথে এসে দাঁড়াল।

মালিয়াস লেপাস বলল, ঐ তো ক্যাসিয়াস হাস্টা। কিন্তু বাকি ওরা সব কারা?

ফেবোনিয়া বলল, ওরা নিশ্চয় স্যাঙ্গুইনারিয়াসের মানুষ। কিন্তু দেখ, ওদের মধ্যে একজনের কেমন বর্বরদের মত পোশাক। আরও দেখ, তার পিছনে যে যোদ্ধারা আসছে তাদের মাথায় কেমন পাখির পালক উড়ছে।

মালিয়াস লেপাস বলল, এ রকম দৃশ্য আমি জীবনে কখনও দেখি নি।

ভন হারবেন বলল, আমিও না। তবু ওদের আমি চিনতে পেরেছি, কারণ ওদের খ্যাতি ও বিবরণ আমি হাজার বার পড়েছি।

ওরা কারা? ফেবোনিয়াস শুধাল।

শ্বেতকায় দৈত্যটি হল অরণ্যরাজ টারজন, আর যোদ্ধারা হল তারই ওয়াজিরি সেনাদল।

পুরনো বন্ধুকে আলিঙ্গন করে হাস্টা বলল, ঈশ্বরের জয় হোক! কিন্তু জার্মানিয়ার যে বর্বর দলপতির খ্যাতি কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সে কোথায়?

লেপাস বলল, এই তো সে। নাম এরিক ভন হারবেন।

টারজন আরও কাছে এগিয়ে গেল। ইংরেজীতে বলল, তুমিই এরিক ভন হারবেন?

ভন হারবেনও ইংরেজীতে বলল, আর তুমি তো অরণ্যরাজ টারজন, আমি জানি।

টারজন হেসে বলল, তোমাকে দেখাচ্ছে ষোল আনা একজন রোমকের মত।

ভন হারবেন মুচকি হেসে বলল, আমি কিন্তু ষোল আনা একজন বর্বর।

রোমকই হও আর বর্বরই হও, তোমাকে যখন তোমার বাবার হাতে ফিরিয়ে দেব তখন সে খুব খুশি হবে।

ভন হারবেন শুধাল, অরণ্যরাজ, তুমি কি আমার খোঁজেই এখানে এসেছ?

টারজন বলল, একেবারে ঠিক সময়েই এসে পড়েছি।

কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব? ভন হারবেন বলল।

আমাকে নয় বন্ধু, টারজন বলল, ধন্যবাদ জানাও ছোট্ট নকিমাকে।

ধরিত্রীর গর্ভে টারজন

টারজন অ্যাট দি আর্থ'স কোর

যে কোন স্কুলের ছেলেও জানে, পেলুসিডার পৃথিবীর ভিতরে আর একটা পৃথিবী ; যে ফাঁকা গোলককে আমরা ধরিত্রী বলি তার আভ্যন্তরীণ তলেই এর অবস্থান।

ডেভিড ইনেস এবং এব্‌নার পেরি যখন নির্ধুম কয়লার নতুন স্তর আবিষ্কারের আশায় যন্ত্র-যানে চেপে একটা পরীক্ষামূলক অভিযাত্রায় বেরিয়েছিল তখনই ঘটনাক্রমে তারা এই পেলুসিডার আবিষ্কার করে। কিন্তু যন্ত্র-যানটা ভূ-গর্ভের দিকে চলতে শুরু করার পরে তার মুখটাকে যথাসময়ে ঘুরিয়ে দিতে না পারায় পাঁচ শ' মাইল সোজা এগিয়ে গিয়ে তৃতীয় দিনে যন্ত্র-যানের মুখটা যখন ভিতরকার জগতের খোলসটাকে ভেঙে বেরিয়ে গেল তখন একঝলক তাজা বাতাসে কেবিনটা ভরে গেল, যদিও অক্সিজেনের অভাবে পেরি ততক্ষণে অজ্ঞান হয়ে গেছে আর ডেভিডও দ্রুত জ্ঞান হারাতে বসেছে।

তারপর অনেক বছর কেটে গেল। দুই আবিষ্কারকের জীবনে অনেক ঝড় বয়ে গেল। পেরি আর কোন দিনই ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে নি, আর ইনেস্ এসেছে মাত্র একবার। অবশ্য সেই একই যন্ত্র-যানে সে ফিরে গিয়েছিল পৃথিবী থেকে।

কিন্তু কিছুটা আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে, আর বেশ কিছুটা আদিম জীবজন্তু ও সরীসৃপের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সভ্যতার পথে পেলুসিডার সাম্রাজ্যের অগ্রগতি খুব সামান্যই হয়েছে। তাছাড়া, এতদিন পরে ডেভিড ইনেস এবং এব্‌নার পেরির অস্তিত্বের কোন হদিসই হয় তো আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্র থেকে ঝুলছে পেলুসিডারের সূর্য ; সেখানকার সূর্য সব সময়ই শীর্ষস্থানে থাকে বলে পেলুসিডারে রাত বলে কিছু নেই, সেখানে বিরাজ করে অনন্ত শাশ্বত মধ্যাহ্ন।

কোন তারা না থাকায় এবং সূর্যের কোন আপাত গতি না থাকায় পেলুসিডারে কোন দিক-নির্ণয় যন্ত্র নেই ; দিকচক্ররেখা বলেও কিছু সেখানে নেই, কারণ যেখান থেকেই দেখা যাক সেখানকার ভূ-পৃষ্ঠ সব সময়ই উপরের দিকেই উঠে যায়। আবার সে পৃথিবীতে সূর্য, তারা ও চন্দ্র না থাকায় আমাদের পৃথিবীর মত সময়ের হিসাবও সেখানে নেই। আর তার ফলে পেলুসিডার এমন এক সময়হীন পৃথিবী যেখানে "ব্যস্ত মৌমাছি" এবং "সময়ই সম্পদ" এই ধরনের কোন কথাই প্রচলিত নেই।

বহিঃপৃথিবীর মানুষ আমরা অতীতে পেলুসিডার থেকে প্রেরিত যে খবরটি ধরতে পেরেছিলাম তার মর্মার্থ হল : পেলুসিডারের প্রথম সম্রাট ডেভিড ইনেস তার প্রিয় জন্মভূমি লুরাজ এজ-এর অদূরবর্তী বৃহৎ উপত্যকায় অবস্থিত "সারি" নামক শহর থেকে মহাদেশ ও মহাসাগর পার হয়ে অনেক দূরের কোর্‌সারদের দেশে এক অন্ধকার কারাগারে চরম দুঃখে দিন কাটাচ্ছে।

টারজন থেমে গেল। কান পাতল। বাতাস শুঁকল।

যে শব্দ টারজন শুনতে পেয়েছে সেটা এসেছে অনেক দূর থেকে। প্রথমে স্পষ্ট করে তার অর্থ বুঝতে না পারলেও সে এটা বুঝতে পেরেছে যে অনেক দূর থেকে একদল মানুষ আসছে।

কিছুদূর এগোতেই খালি পায়ের শব্দ আর আদিবাসীদের বোঝা বইবার গান তার কানে এল। তারপরেই তার নাকে এল কালো মানুষের গায়ের গন্ধ, আর সেই সঙ্গে এমন আর একটা আবছা গন্ধ নাকে এল যাতে টারজন বুঝতে পারল যে একটি সাদা মানুষ দলবল ও লটবহর নিয়ে শিকারে এসেছে।

মুখ ঘুরিয়ে টারজন নিঃশব্দে অতি দ্রুতগতিতে গাছপালার ভিতর দিয়ে এগিয়ে শিকারীদলের কিছুটা সামনে গিয়ে গাছ থেকে নেমে পথের উপর অপেক্ষা করতে লাগল।

একটা মোড় ঘুরেই শিকারীর দলটা তাকে দেখতে পেয়েই থেমে গিয়ে উত্তেজিতভাবে কথা-বার্তা বলতে লাগল।

টারজন বলল, আমি টারজন। টারজনের দেশে তোমরা কি করতে এসেছ?

সঙ্গে সঙ্গে যে যুবকটি দলের একেবারে সামনে ছিল সে এগিয়ে এল। তার মুখে দেখা দিল হাসির রেখা। বলল, তুমিই লর্ড গ্রেস্টোক?

কালার পালিত পুত্র জবাব দিল, এখানে আমি অরণ্যরাজ টারজন।

তাহলে তো আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে, যুবকটি বলল, কারণ সুদূর দক্ষিণ কালিফোর্নিয়া থেকে আমি তোমার খোঁজেই এসেছি।

তুমি কে? টারজনের কাছে তোমার কিসের দরকার?

আমার নাম জ্যাসন গ্রিড্‌লে। আর যে বিষয় নিয়ে কথা বলতে আমি তোমার কাছে এসেছি সে এক দীর্ঘ কাহিনী। আশা করি আমার সঙ্গে আমার পরবর্তী শিবিরে গিয়ে আমার এখানে আসার

উদ্দেশ্যটা মন দিয়ে শুনবার মত সময় ও ধৈর্য তোমার হবে।

টারজন মাথা নাড়ল। এই জঙ্গলের রাজ্যে আমাদের সময়ের অভাব হয় না।

সেদিন সন্ধ্যায় জ্যাসন ও টারজন একত্রে বসে কফি খেতে খেতে টারজন বলল, এবার বল, দক্ষিণ কালিফোর্নিয়া থেকে এত পথ পেরিয়ে কেন তুমি আফ্রিকার একেবারে অভ্যন্তরে এসে ঢুকেছ?

গ্রিড্‌লে হেসে বলল, কি জান, এখন সশরীরে এখানে হাজির হয়ে তোমার মুখোমুখি বসে হঠাৎ আমার কেমন যেন ভয় হচ্ছে যে আমার কথা শুনে তুমি না আমাকে পাগল ঠাউরে বস।

আমাকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল।

পৃথিবীটা একটা ফাঁকা গোলক এবং তার ভিতরে আর একটা পৃথিবী আছে—এই মতটা তুমি কখনও শুনেছ কি?

এ মতটা তো বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে অনেক আগেই খণ্ডন করা হয়েছে, টারজন জবাবে জানাল।

মার্কিন ভদ্রলোক বলল, কিন্তু সম্প্রতি সেই আভ্যন্তরীণ জগৎ থেকে একটা সংবাদ সরাসরি

আমার কাছে এসেছে।

তুমি আমাকে অবাক করে দিচ্ছ, টারজন বলল।

অবাক আমিও হয়েছিলাম, কিন্তু এ কথা সত্য যে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পেলুসিডার পৃথিবীর এব্নের পেরির সঙ্গে আমার বেতার-সংযোগ ঘটেছিল, আর সংবাদের একটা অনুলিপি আমি সঙ্গে করেই এনেছি। সংবাদটি যে যথার্থ তার একটি প্রমাণ-পত্র আমি একজনের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি যার নামের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে। আমি যখন সংবাদটি পাই তখন সে লোক আমার পাশেই ছিল; এই সে সব কাগজপত্র।

আধ ঘণ্টা ধরে জ্যাসন গ্রিড্লে পাণ্ডুলিপিটা খুলে তার বিশেষ বিশেষ সংখ্যাগুলি পড়ে শোনাল। পড়া শেষ করে বলল, এর থেকেই পেলুসিডারের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, আর ডেভিড ইনেসের দুর্ভাগাজনক পরিস্থিতিই আমাকে বাধ্য করেছে এই প্রস্তাব নিয়ে তোমার কাছে আসতে যাতে আমরা এমন একটা অভিযান চালাই যার প্রথম উদ্দেশ্যই হবে কোর্সারদের কারাগার থেকে তার উদ্ধার সাধন।

টারজন বলল, আচ্ছা, যদি ধরেই নি যে একটি আভ্যন্তরীণ জগৎ আছে তাহলেই বা সে পৃথিবী আবিষ্কারের কি উপায়ের কথা তুমি ভেবেছ?

আমার মনে হয়, আধুনিক জেপেলিন ধরনের কোন বিশেষভাবে তৈরী বায়ু-যানেই আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিযান চালানো যেতে পারে। হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহারের ফলে সে বায়ু-যান নিরাপত্তার দিক থেকেও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য হবে।

খুব সংগোপনে কাজ চলল ছ'মাস ধরে। ছ'মাস পরে "ও-২২০" নামে পরিচিত বায়ু-যানটি আকাশে উড়বার জন্য প্রস্তুত হল। বড় সিগার-আকৃতির "ও-২২০" যানটির বডি দৈর্ঘ্যে ৯৯৭ ফুট এবং তার পরিধি ১৫০ ফুট। গোটা যানটি ছ'টি বড় বড় বায়ু-নিরোধক ঘরে বিভক্ত। এঞ্জিনগুলো ৫৬০০ অশ্ব-শক্তিবিশিষ্ট; তার গতি ঘণ্টায় ১০৫ মাইল। এই হচ্ছে বায়ু-যানের বিবরণ।

জুন মাসের এক পরিষ্কার সকালে ভোর হবার আগেই ও-২২০ ধীরে ধীরে যাত্রা শুরু করল।

মূল অভিযানের জন্য ক্যাপ্টেন হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে জুপ্নারকে; তার পরিচালনায়ই বায়ু-যানটি নির্মিত হয়েছে। আর আছে রাজকীয় বিমান-বাহিনীর দুই প্রাক্তন অফিসার ভন হর্স্ট ও ডর্ফ, এবং জাহাজ-চালক লেফ্টেন্যান্ট হাইন্স। এ ছাড়া আছে বারোজন ইঞ্জিনীয়ার, আটজন যন্ত্রকুশলী, একটি নিগ্রো পাচক ও দুটি ফিলিপিনো কেবিন-বয়।

অভিযানের দলপতি স্বয়ং টারজন। জ্যাসন গ্রিড্লে তার সহকারী। আর যোদ্ধা হিসাবে আছে মুভিরো ও তার ন'জন ওয়াজিরি যোদ্ধা।

বায়ুযানটি যখন স্বচ্ছন্দ গতিতে শহরের উপরে উঠে গেল তখন জুপ্নার তার উৎসাহকে চেপে রাখতে পারল না। বলে উঠল, এমন সুন্দর যান আমি কখনও দেখি নি। হাত ছোঁয়ালেই এ সাড়া দেয়।

মোটামুটিভাবে ঘণ্টায় ৭৫ মাইল গতিতে চলে

দ্বিতীয় দিন মাঝরাত নাগাদ ও-২২০ উত্তর মেরুতে পৌঁছে গেল। হাইন্স যখন ঘোষণা করল যে তার হিসাবমত তারা উত্তর মেরুর খাড়া উপরে পৌঁছে গেছে, তখন সকলের মধ্যেই উত্তেজনা দেখা দিল।

আরও পাঁচ ঘণ্টা দক্ষিণ দিকে উড়ে যাবার পরে হাইন্স চীৎকার করে বলে উঠল, দেখ, দেখ। আমাদের ঠিক সামনেই জল দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। হাইন্স রিসিভারটা কানে লাগাল। খুব ভাল স্যার, বলে রিসিভারটা ঝুলিয়ে রেখে বলল, পর্যবেক্ষণ-কেবিন থেকে ভন হার্স্ট কথা বলল। নীচে একটা জন-প্রাণীহীন প্রান্তর সে দেখতে পেয়েছে।

গ্রিড্‌লে বলল, উত্তর কোর্‌সারের যে বিবরণ ইনেস দিয়েছে এটা তো তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

সকলেরই মনে বিশ্বাস হল, তাদের নীচের স্থল-ভাগটাই পেলুসিডার।

ও-২২০ ক্রমেই দক্ষিণদিকে এগোতে লাগল। আর যে মুহূর্তে মধ্যরাতের সূর্য-বলয়টা দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গেল অমনি সম্মুখে দেখা দিল পেলু-সিডারের সূর্য-দীপ্তি।

এই তো সেই পেলুসিডার যার স্বপ্ন দেখেছে জ্যাসন গ্রিড্‌লে।

অরণ্য ছাড়িয়ে একটা ঢেউ-খেলানো প্রান্তর। মাঝে মাঝে কিছু গাছ-গাছালি। প্রান্তরের বুক চিরে অসংখ্য নদী গিয়ে মিশেছে বিপরীত দিকের একটা বড় নদীতে। দলে দলে চরে বেড়াচ্ছে নানা ধরনের পশু। কিন্তু কোথাও মানুষের দেখা নেই।

টারজন বলল, এ দেশ তো আমার কাছে স্বর্গ বলে মনে হচ্ছে। এখানে নামা যাক ক্যাপ্টেন।

জাহাজটা ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল। এক-জন অফিসার ও দুটি লোককে পাহারায় রেখে অন্য সব যাত্রী পেলুসিডারের হাঁটু-সমান উঁচু সবুজ ঘাসের মধ্যে নেমে পড়ল।

চারদিকে তাকিয়ে টারজন বলল, এখন আমাদের সব চাইতে বেশী দরকার বিশ্রাম। পরিপূর্ণ বিশ্রামের জন্য আপাতত আমরা এখানেই থাকি, তারপর কোর্‌সার শহর খুঁজতে বের হওয়া যাবে।

এ প্রস্তাব সকলেই সমর্থন করল।

প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর পাহারা বদলের ব্যবস্থা করা হল, আর অফিসার ও অন্য সকলেই ঘড়ির কাঁটা ধরে ঘুমোতে লাগল।

অরণ্য-রাজ টারজনের ঘুমই প্রথম ভাঙল। সেই প্রথম জাহাজ থেকে বেরিয়ে পড়ল।

তখন পাহারায় ছিল লেঃ ডর্ফ। সে অবাক বিস্ময়ে দেখল, মাথাভর্তি কালো চুল জঙ্গলের রাজা খোলা প্রান্তর পার হয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ও-২২০-র ছোট বার্থে শুয়ে অফিসার্স মেসের পাচক রবার্ট জোন্স হাই তুলল, শরীরটাকে টান-টান করল; তারপর চোখ খুলে তাকিয়ে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠে বসল। বলল, হায় ভগবান! মশাইরা সকলেই এখনও ঘুমে অচেতন!

মধ্যাহ্ন সূর্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নেমে গেল।

জ্যাসন গ্রিড্‌লে কেবিন থেকে বেরিয়ে বলল, সুপ্রভাত!

জুপ্‌নার ও ডর্ফ সুপ্রভাত বলে তাকে স্বাগত জানাল।

জুপ্‌নার বলল, সুপ্রভাত বলব কি শুভ সন্ধ্যা বলব ঠিক বুঝতে পারছি না।

ডর্ফ বলল, বারো ঘণ্টা হল আমরা এখানে এসেছি, অথচ এর মধ্যে সময়ের কোন হেরফের ঘটল না। চার ঘণ্টা ধরে পাহারায় আছি, কিন্তু ঘড়ি সঙ্গে না থাকলে বুঝতেই পারতাম না সময়টা পনেরো মিনিট না এক সপ্তাহ।

জুপ্‌নার বলল, গ্রেস্টোক কোথায়? সে তো খুব সকালেই ওঠে।

গ্রিড্‌লে বলল, আমিও তো রবকে সেই কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম; সেও তাকে দেখে নি।

ডর্ফ বলল, আমি পাহারায় আসার পরেই সে বেরিয়ে গেছে। তারপর প্রায় ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল। বেশীও হতে পারে। দেখলাম, সে মাঠটা পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে গ্রিড্‌লে ও ভন হর্স্টের নেতৃত্বে ওয়াজিরি যোদ্ধাদের দলটাকে পাঠানো হল টারজনের খোঁজে।

মুভিরোর উপর পথ চিনে এগিয়ে যাবার ভার দেওয়া হল। গন্ধ শুঁকে শুঁকে মুভিরো ঠিকই এগিয়ে যেতে লাগল। বনের মধ্যে কিছুদূর গিয়ে একটা বড় গাছের নীচে সে থেমে গেল। বলল, এইখানে এসে বড় বাওয়ানা গাছে চড়েছে; কাজেই এর পর থেকে তার খোঁজ করা খুব শক্ত হবে।

তবু তারা এগিয়ে চলল।

ক্রমে অরণ্যের চেহারা বদলাতে লাগল। বড় বড় গাছগুলি এখন আর ততটা ঘনসন্নিবদ্ধ নয়। ঝোপ-ঝাড়ও ততটা ঘন নয়। ফলে পথ চলা কিছুটা সহজসাধ্য হয়েছে। ওয়াজিরি যোদ্ধাদের চলার গতি বাড়ল। মাইলের পর মাইল পার হয়ে গেল। মধ্যাহ্ন সূর্যের মায়ায় সময়ের হিসাব রাখতেও তারা বুঝি ভুলে গেল।

ক্রমে চারদিক থেকে ভেসে আসতে লাগল বিচিত্র ধ্বনি—কখনও গর্‌-গর্‌ শব্দ, কখনও গর্জন, কখনও আর্তনাদ।

জ্যাসন গ্রিড্‌লে অসহায়ভাবে সেই মধ্যাহ্ন সূর্যের দিকে তাকাল। সূর্যের হাসি বুঝি বা তাকেই ঠাট্টা করতে লাগল। অগত্যা যে কোন একটা পথ ধরেই সে এগোতে শুরু করল।

জ্যাসন গ্রিড্‌লে জীবনে কখনও এত ব্যর্থ ও অসহায় বোধ করে নি। অন্তহীন পথ ধরে অনন্তকাল এই পথ চলা; অথচ তিলমাত্র ধারণা নেই সে ও-২২০-র দিকে এগোচ্ছে না তার বিপরীত দিকে চলেছে। অথচ আর কিই বা সে করতে পারে।

ওদিকে সময় যত পার হচ্ছে ও-২২০-র যাত্রীদের মন ততই আশংকায় ভরে উঠছে।

জুপ্‌নার বলল, প্রায় বাহাত্তর ঘণ্টা হয়ে গেল তারা বাইরে গেছে। জীবনে কখনও আমি এত অসহায়বোধ করি নি। অথচ কি যে করব তাও বুঝতে পারছি না।

চোখে একটা শক্তিশালী দূরবীণ লাগিয়ে হল হাইন্স চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। পেলুসিডারের বন্য প্রাণী দেখার ব্যাপারে এই তিনটি প্রাণীর এখন আর কোন আগ্রহ নেই। হঠাৎ সে বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল।

কি হল? জুপ্‌নার বলল। কিছু দেখতে পেলে?

ডর্ফ বলল, দেখতে পেয়েছি। হয় গ্রিড্‌লে, নয়তো ভন হর্স্ট। কিন্তু যেই হোক সে একা।

জুপ্‌নার আদেশের ভঙ্গীতে বলল, লেফ্‌টেন্যান্ট, দশজনকে সঙ্গে নিয়ে এখনি চলে যাও। সকলেই যেন সশস্ত্র হয়ে যায়। সময় নষ্ট করো না।

ডর্ফ ততক্ষণে নীচে নেমে গেছে। ও-২২০-র মাথায় বসে দুই অফিসার তাদের দিকেই চোখ রাখল। দেখল, তারা পরস্পরেব দিকেই এগিয়ে চলেছে। জমিটা ঢেউ খেলানো বলে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। শ'খানেক গজ দূরে আসতেই লেফ্‌টেন্যান্ট চিনতে পারল যে লোকটি জ্যাসন গ্রিড্‌লে।

দ্রুত ছুটে এসে পরস্পরের হাত চেপে ধবল। গ্রিড্‌লে প্রথমেই হারানো লোকদেব কথা জানতে চাইল।

ডর্ফ মাথা নেড়ে বলল, একমাত্র তুমিই ফিরে এসেছ।

গ্রিড্‌লের চোখ থেকে সব আগ্রহের আলো নিভে গেল। হঠাৎ সে যেন অনেক ক্লান্ত, অনেক বুড়ো হয়ে পড়ল।

সকলেই তার এই কয়েক ঘণ্টার অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাইলে গ্রিড্‌লে বলল, সকলের আগে আমার চাই একটু স্নান। তারপর একপেট খাবার। তারপর হবে গল্প-গুজব।

আধ ঘণ্টা পরে স্নান করে, দাড়ি কামিয়ে নতুন পোশাক বদলে তাজা হয়ে খেতে খেতেই শুরু করল তার অভিযানের বিবরণ।

সব কথা শুনে জুপ্‌নার বলল, যে খোলা জায়গা থেকে তুমি ভন হর্স্ট ও ওয়াজিরিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলে, আর একটা অনুসন্ধানকারী

দল নিয়ে সেখানে যেতে পারবে কি?

গ্রিড্‌লে উত্তর দিল, তা নিশ্চয় পারব। বরং এমনভাবে পথটা বুঝিয়ে দিতে পারব যে আমাকে কোন দরকারই হবে না। যদি আর একটা দল পাঠানোই স্থির হয়, তাহলেও আমি সে দলের সঙ্গে যাচ্ছি না।

অফিসারবা সকলেই অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল।

দলেব সঙ্গে যাচ্ছি না, তবে আমি যাচ্ছি একা স্কাউট-প্লেনটায় চেপে। আর আমার প্রস্তাব হচ্ছে, আমি যাত্রা করার অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা পরে অনুসন্ধানকারী দলটাকে পাঠানো হোক, কারণ সেই সময়ের মধ্যেই আমি হয় হারানো বন্ধুদের অবস্থান জানতে পারব, না হয় একেবারেই বিফল হব।
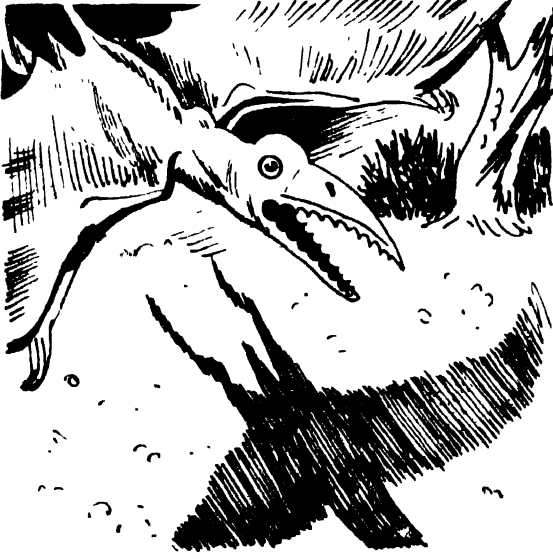
প্লেনটাকে ভাল করে দেখে নিয়ে গ্রিড্‌লে বাকি তিনজন অফিসারের সঙ্গে কর-মর্দন করল, জাহাজের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল, তারপর খোলা কক-পিটে চড়ে বসল।

গ্রিড্‌লে আকাশে উড়ল।

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে জ্যাসন গ্রিড্‌লে একটানা সোজা উড়ে চলল জঙ্গল, সমভূমি ও উঁচু-নীচু পাহাড়ি অঞ্চলের উপর দিয়ে।

একসময় অনেক দূর আকাশে এমন একটা কিছু তার চোখে পড়ল যাতে চরম বিস্ময়ে তার নিঃশ্বাস আটকে এল।

ঠিক তার মাথার উপরে ঘুরছে একটা বিরাটকায় প্রাণী। তার দুই উড়ন্ত ডানার বিস্তার তার প্লেনের প্রায় দ্বিগুণ। বিরাট দুই চোয়ালে বড় বড় দাঁতগুলি ঝকঝক করছে। সহসা তার মনে হল, প্রাণীটি তাকেই আক্রমণ করতে উদ্যত।

গ্রিড্‌লে তখন উড়ে চলেছে প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচুতে। বিরাট টেরানোডনটি সোজা নামতে লাগল তার প্লেন লক্ষ্য করে। জ্যাসন "ডাইভ" দিয়ে সেটাকে এড়িয়ে যেতে চাইল। তার পরেই প্রচণ্ড সংঘর্ষ, বিরাট গর্জন, কাঠ ভাঙার ও ধাতুতে ঘষা লাগার শব্দ : টেরানোডনটি সোজা এসে আছড়ে পড়ল প্লেনের প্রপেলারের ভিতরে।

তারপর যা ঘটল সেটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে আর পাঁচ সেকেণ্ড দেরী করলে জ্যাসন গ্রিড্‌লেকে আর সে দৃশ্য দেখতে হত না।

প্লেনটা সম্পূর্ণ উল্টে গেল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রিড্‌লেও লাফিয়ে পড়ল। প্যারাসুটের সুতোটা ধরে টান দিল। মাথায় কিসের যেন আঘাত লেগে সে জ্ঞান হারাল।

যে মুহূর্তে জ্যাসন গ্রিড্‌লে তার প্যারাসুটের দড়িটা ধরে টেনেছিল ঠিক তখনই তার প্লেনের ভাঙা প্রপেলারের একটা অংশ এসে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করেছিল তার মাথায়। জ্ঞান ফিরে এলে সে দেখল সে একটা উপত্যকার মাথায় ঘন ঘাসের বিছানায় শুয়ে আছে। উঁচু পাহাড়ের ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে এসে একটা গিরিনালা সেখানেই সমতল ভূমিতে পড়েছে।

সঙ্গীদের খোঁজে এসে এই বিপদ ঘটায় গ্রিড্‌লের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে প্যারা-সুটের বাঁধন খুলে ফেলল। তবু ভাল যে কপালের খানিকটা ছড়ে যাওয়া ছাড়া বিশেষ কোন ক্ষত হয় নি।

প্রথমেই তার মনে পড়ল জাহাজটার কথা। সে জানে, সেটা নিশ্চয়ই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, তবু তার আশা যে খোঁজ করলে তার ভিতর থেকে রাইফেল ও গুলিগুলো হয়তো পাওয়া যেতে পারে। এমন সময় একটা সম্মিলিত তর্জন-গর্জন কানে আসতেই সে ডান দিকে চোখ ফেরাল। কিছুটা দূরে একটা ছোট টিপির মাথায় দেখতে পেল, পেলুসিডারের চারটি হিংস্র নেকড়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। এই সব নেকড়েকে বহিঃপৃথিবীর প্রাণী-বিজ্ঞানীরা বলে হায়েনোডন, আর এই ভিতর-পৃথিবীর লোকরা বলে জালোক। দেখেই জ্যাসন বুঝতে পারল যে নেকড়ে-গুলো তাকে দেখে চেঁচাচ্ছে না ; তাদের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে দেখতে পেল, একটি মেয়ে তাদের দিকেই ছুটে চলেছে, আর তাকে তাড়া করে চলেছে চারটে পুরুষ মানুষ। ভয়বিহ্বল মেয়েটি একবার নেকড়েদের দিকে, একবার লোক চারটির দিকে তাকাচ্ছে।

পালাবার আর একটি মাত্র পথই খোলা আছে। সেদিকে তাকাতেই জানার চোখ পড়ল জ্যাসন গ্রিড্‌লের উপর। ইতস্তত করে সে থেমে গেল। তাকে উৎসাহ দিয়ে গ্রিড্‌লে চীৎকার করে তার দিকেই ছুটে আসতে বলল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুহূর্তমাত্র চুপ করে থেকে জানা মুখ ফিরিয়ে গ্রিড্‌লের দিকেই ছুটে গেল। তার পিছু নিল চারটি জন্তু ও চারটি মানুষ।

৪৫ ক্যালিবারের কোল্ট রিভলবারটা খাপ থেকে বের করে নিয়ে গ্রিড্‌লেও ছুটল মেয়েটির দিকে। বড় হায়েনোডনটা প্রায় কাছে এসে পড়েছে এমন সময় জানা পা হড়কে পড়ে গেল, আর জ্যাসনও তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে এত কাছে থেকে গুলি করল যে হায়েনোডনের দেহটা মেয়েটির পাশেই লুটিয়ে পড়ল।

গুলির শব্দ শুনে বাকি তিনটে জন্তু ও স্কুকের দল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফেলি দেশের এই স্কুকের দলই মেয়েটিকে তাড়া করেছিল। জালোকের মরা দেহটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জ্যাসন মেয়েটিকে তুলে ধরল। আর সেই সুযোগে অবণ্য-মানবীর সহজাত আত্মরক্ষার তাগিদে মেয়েটি খাপ থেকে টেনে বের করল তার পাথরের ছুরিটা। জ্যাসন গ্রিড্‌লে জানতেও পারল না যে সেই মুহূর্তে মৃত্যু তার কত কাছে এসে গেছে। ছুরির ফলাটা বসিয়ে দেবার ঠিক পূর্বক্ষণে এই লোকটির চোখে মেয়েটি এমন কিছু দেখতে পেল, যাতে সে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারল, এই মানুষটি তার বন্ধু, শত্রু নয়।

তার হাত থেকে ছুরিটা মাটিতে পড়ে গেল। তা দেখে নবাগতের মুখে দেখা দিল স্মিত হাসি। প্রত্যুত্তরে জোরামের লাল ফুলটির মুখেও হাসি দেখা দিল।

এদিকে দুটো হায়েনোডন তেড়ে গেল স্কুকদের আক্রমণ করতে, আর তৃতীয়টা তেড়ে এল জ্যাসন ও জানাকে লক্ষ্য করে। জ্যাসনের রিভলবারের এক গুলিতে তৃতীয় হায়েনার জীবনান্ত হল। ওদিকে তখন লড়াই চলেছে মানুষে ও জন্তুতে। জ্যাসনের
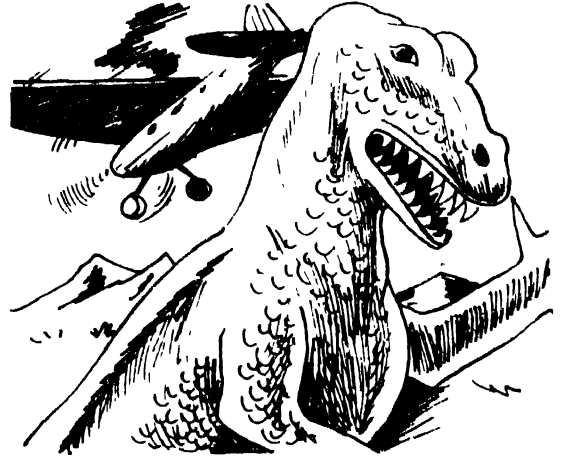
গুলিতে আর একটা হায়েনা লুটিয়ে পড়তেই স্কুকদের গদার আঘাতে লুটিয়ে পড়ল আরও একটা। জানার পাথরের বর্শায় মারা পড়ল চতুর্থটা।

হায়েনার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে এবার স্কুকের দলের দৃষ্টি পড়ল জ্যাসন ও জানার দিকে। জানা সভয়ে বলে উঠল, এবার ওরা আমাদের আক্রমণ করবে। তোমাকে মেরে ফেলে আমাকে নিয়ে যাবে। ওদের হাতে আমাকে ছেড়ে দিও না।

গদা ও গুলির যুদ্ধ বেশীক্ষণ চলল না। কোল্টের দুটি গুলিতে দু'জন ঘায়েল হতেই স্কুক ও তার সঙ্গী পালিয়ে প্রাণে বাঁচল।

চারটি হায়েনা ও দু'টো মানুষের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে জ্যাসন বলল, তোমাদের এই ছোট দেশটা বেশ সুন্দর; তবু এখানে মানুষ কি করে বেঁচে থাকে তা তো ভেবে পাই না।

জোরামের ফুলটি তার কথা বুঝল না, মুখে কিছু বললও না; শুধু সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে জ্যাসনকে দেখতে লাগল। সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠল মুগ্ধতা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। এক কথায়, এবার সে আর পালাতে চেষ্টা করল না। জ্যাসন গ্রিড্‌লেও বুঝি এবার পুরোপুরি পথ হারিয়ে ফেলল এই বিচিত্র জগতে।

একটা নীচু পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে টারজন নীচে একটা বিধ্বস্ত বিমানকে দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে খুঁজতে লাগল চালকের

মৃতদেহ। যখন দেখল ভিতরে কোন দেহ নেই তখন সে যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। একটু পরেই বিমানের পাশে বুট-পরা পায়ের ছাপ দেখেই চিনতে পারল সেগুলো জ্যাসন গ্রিড্‌লের বুটের ছাপ। তাতেই বোঝা গেল তার কোনরকম গুরুতর আঘাত লাগে নি। কিন্তু গ্রিড্‌লের পায়ের ছাপের সঙ্গেই যে মিশে আছে ছোট পায়ের স্যাণ্ডেলের ছাপ! এটা কি ব্যাপার! এই সঙ্গীটিকে গ্রিড্‌লে জোটাল কোথা থেকে?

গ্রিড্‌লে ও জানার পায়ের ছাপ ধরে কিছুদূর এগিয়েই একটা প্রকাণ্ড টেরানোডনের মৃতদেহ তারা দেখতে পেল।

আরও আধ মাইল চলার পরে দেখতে পেল, একটা খোলা প্যারাসুট মাটির উপর পড়ে আছে আর তারই অনতিদূরে পড়ে আছে চারটি হায়েনোডন ও দুটি লোমশ মানুষের মৃতদেহ। ভাল করে পরীক্ষা করে টারজন বুঝল যে দুটি মানুষ এবং দুটি হায়েনোডন মারা পড়েছে বুলেটবিদ্ধ হয়ে। সর্বত্রই রয়েছে জ্যাসনের সঙ্গীর স্যাণ্ডেলের ছাপ।

প্রথম কথা বলল টারজন, লোক ছিল মোট চারজন, এবং আমার বন্ধুর সঙ্গে কোন নারী অথবা যুবক।

এবার তার সঙ্গী স্থানীয় আদিবাসী টৌয়ার মুখ খুলল, চারজন এসেছিল নীচু অঞ্চল ফেলি থেকে, আর অপরটি জোরামের মেয়ে।

কি করে জানলে? টারজন জানতে চাইল।

টৌয়ার বলল, নীচু অঞ্চলের স্যাণ্ডেল আর পাহাড়ি অঞ্চলের স্যাণ্ডেল একরকম নয়। নীচু ঘাস বা শেওলা ঢাকা জলাভূমির উপর দিয়ে হাঁটতে হয় বলে নীচু অঞ্চলের স্যাণ্ডেলের সোল হয় পাতলা, আর পাহাড়ি অঞ্চলের স্যাণ্ডেলের সোল হয় মোটা।

আমরা কি জোরামের কাছে এসে পড়েছি? টারজনের প্রশ্ন।

টৌয়ার জবাব দিল, না, আমাদের সামনের সব চাইতে উঁচু পাহাড়টার ওপারে জোরাম।

প্রথম সাক্ষাতেই তুমি বলেছিলে যে তুমি জোরামের লোক।

হ্যাঁ, ওটাই আমার দেশ।

তাহলে তো এই মেয়েটিকে তুমি নিশ্চয় চেন?

সে আমার বোন, টৌয়ার জবাব দিল।

টারজন অবাক চোখে তাকাল। বলল, কি করে বুঝলে?

ঘাসবিহীন নরম মাটির উপর পায়ের ছাপ এত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে যে তার স্যাণ্ডেলের ছাপ চিনতে আমার কোন অসুবিধা হয় নি।

নিজের দেশ থেকে এতটা দূরে তোমার বোন কি করছিল! আর আমার বন্ধুর সঙ্গেই বা সে জুটল কেমন করে?

টৌয়ার বলল, সেটা তো খুব পরিষ্কার। ফেলি থেকে আগত এই লোকগুলি তাকে বন্দী করতে চেয়েছিল। তোমার দেশের লোকটি এসে জালোকগুলো ও দুটো ফেলির লোককে মেরে ফেলে এবং বাকি দুটোকে তাড়িয়ে দেয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমার বোন তার হাত থেকে পালাতে পারে নি, তার হাতেই বন্দী হয়েছে।

টারজন হাসল। পায়ের ছাপ দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না যে সে পালাবার কোনরকম চেষ্টা করেছিল।

টোয়ার মাথা চুলকে বলতে লাগল, তা ঠিক।

টারজন বলল, আমার বন্ধু কদাপি তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়নি। যদি তার সঙ্গে গিয়ে থাকে তো স্বেচ্ছায়ই গিয়েছে।

টোয়ার বলল, দেখাই যাক; সে যদি জোর করে জানাকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে মরবে।

ঠিক সেই সময় একটি ভগ্নমনোরথ মানুষের দল টিপ্‌ডার পর্বতশ্রেণীর শেষ প্রান্ত ঘুরে গাইওর কোর বা সুবৃহৎ গাইওর সমভূমিতে ঢুকেছে। দলের লোক-সংখ্যা এগারো—দশটি কৃষ্ণকায় ও একজন শ্বেতকায়। মানুষের ইতিহাসে কেউ কোনদিন এই এগারোটি মানুষের মত সম্পূর্ণভাবে পথ হারিয়ে একান্ত অসহায় হয়ে পড়ে নি।

মুভিরো ও তার যোদ্ধারা কুশলী অরণ্যচারী; কিন্তু পথ চিনবার এই অক্ষমতায় তারাও সম্পূর্ণ হতোদ্যম হয়ে পড়েছে।

ওদিকে ও-২২০-র যাত্রীরা সঙ্গীদের প্রত্যাবর্তনের আশায় অপেক্ষা করে করে অধৈর্য্য হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত জুপ্‌নার আর একটি দলের সঙ্গে ডর্ফকে পাঠাল তাদের খোঁজে। সত্তর ঘণ্টা পরে তারাও ফিরে এসে জানাল যে কারও দেখা মেলে নি।

তখন জুপ্‌নার স্থির করল, এমন নিষ্ক্রিয়ভাবে আর এখানে অপেক্ষা করা চলে না; জীবিত বা মৃত যে কোন অবস্থায় সঙ্গীদের খুঁজে বের করতেই হবে।

অতএব আর বিলম্ব নয়। ও-২২০ আকাশে উড়ল। রবার্ট জোন্স তার তেল-চিটচিটে দিনপঞ্জীর পাতায় লিখল: দুপুর বেলা আমরা এখান থেকে যাত্রা করলাম।

জ্যাসন গ্রিড্‌লে বলল, এই দিকে চল।

জানা বলল, না, এই দিকে। আঙুল বাড়িয়ে সে টিপ্‌ডার পর্বতশ্রেণীর উঁচু শিখরগুলো দেখাল।

দুজনের কেউ কারও ভাষা বোঝে না, তাই কিছু বোঝাতেও পারে না। হতাশ হয়ে গ্রিড্‌লে বোকা-

বোকা চোখে জানার দিকে তাকিয়ে হাসল। সেই হাসিরই জয় হল। জোরামের ফুলটি জ্যাসনের প্রদর্শিত পথেই পা বাড়াল।

কিন্তু তাদের পথ চলাই সার হল। ও-২২০-র দেখা মিলল না। তখন জ্যাসন হতাশ ভঙ্গীতে জানার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে এখন থেকে জানা যে পথে যেতে বলবে সেই পথেই সে যাবে।

তারপর শুরু হল নতুন যাত্রা। চড়াই ভেঙে দুজন এগিয়ে চলল টিপ্‌ডার পর্বতমালার সানুদেশ লক্ষ্য করে।

হঠাৎ একসময় মেয়েটি শুধাল, আমার দিকে তুমি এত বেশী তাকাও কেন?

জ্যাসন গ্রিড্‌লের মুখখানা লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সে চোখ ফিরিয়ে নিল। এই প্রথম সে বুঝতে পারল, সত্যি মেয়েটির দিকে সে বড় ঘন ঘন তাকাতে শুরু করেছে। কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল।

কথা বলছ না কেন জ্যাসন? মেয়েটি শুধাল।

কি কথা বলব?

আমার দিকে তাকালে যে কথা ফুটে ওঠে তোমার চোখে।

অপার বিস্ময়ে গ্রিড্‌লে তাকাল জানার দিকে। এও কি সম্ভব যে সে-দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তার নিজেরই চোখে।

জ্যাসন তার প্রশ্নের কোন জবাব না দেওয়ায় জোরামের লাল ফুলটি নিজের অন্তরের মধ্যে কি যেন খুঁজল। ধীরে ধীরে তার ঠোঁট থেকে মিলিয়ে গেল প্রত্যাশার হাসি।

ধীরে ধীরে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুখ ঘুরিয়ে ফিরে চলল সেই খাদটার দিকে যেখানে সে নেমে এসেছিল স্রুকদের তাড়া খেয়ে।

জ্যাসন চেঁচিয়ে ডাকল, জানা, রাগ করো না। কোথায় যাচ্ছ তুমি?

জানা থামল। উদ্ধত চিবুকটি আকাশে তুলে ম্লান হেসে পিছনে তাকিয়ে বলল, তোমার পথে তুমি চলে যাও জালোক, জানা চলল তার নিজের পথে। বলতে বলতেই যেন তার কথাকে প্রমাণ করতেই সে দ্রুতগতিতে খাদের পার থেকে নীচে নেমে গেল। জ্যাসন তাকে আর দেখতেই পেল না।

গহ্বরের মুখে ছুটে গিয়ে জ্যাসন গ্রিড্‌লে নীচে তাকিয়ে দেখল, মাত্র কয়েক গজ নীচে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে জানা ধীরে ধীরে নীচে নেমে যাচ্ছে। জ্যাসন রুদ্ধশ্বাস। এই মাথা ঝিম্‌-ঝিম্‌-করা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে কোন প্রাণী যে নামতে পারে সেটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। সে ভয়ে শিউরে উঠল।

জ্যাসন গ্রিড্‌লে উঠে দাঁড়াল। রাইফেল ঝোলাবার চামড়ার ফিতেটাকে পিঠের উপর বাঁধল। দুটো বন্দুকের খাপকেও পিঠের উপর ঝুলিয়ে দিল। পায়ের বুট খুলে নীচের খাদের মধ্যে ফেলে দিল। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পা দুটো খাদের মধ্যে নামিয়ে দিল। হাত বা পা রাখার মত প্রতিটি জায়গা খুঁজে খুঁজে জ্যাসন গ্রিড্‌লেও নামতে লাগল একটু একটু করে।

অনেক উপরে পাহাড় শ্রেণীর মাথায় দেখা দিল ঘন কালো মেঘ। পেলুসিডারে এই গ্রিড্‌লের প্রথম মেঘ দেখা। সে বুঝল, বৃষ্টি আসন্ন; কিন্তু সে বৃষ্টি যে কত ভয়ংকর হতে পারে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

ঝড় উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জানার মনে হল, এ ঝড় যে কতখানি বিপজ্জনক হতে পারে সে কথা তো নীচের লোকটি জানে না। কিন্তু সে তো ভাল করেই জানে এই প্রবল বর্ষণের ফলে অচিরেই খাদটা পরিণত হবে একটি উচ্ছ্বসিত তীব্রগতি জল-স্রোতে। তার আগেই জ্যাসনকে খাদের দেয়ালের কোন একটা উঁচু জায়গায় এনে আশ্রয় দিতেই হবে।

এখানকার মেয়ে হয়েও জানা আগে কখনও এত ভয়ংকর ঝড় দেখে নি। আকাশে বজ্র গর্জন করছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাতাস হাহাকার করছে, ধারা-বর্ষণে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। তবু তারই মধ্যে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও করুণার ব্যর্থ প্রেরণায় সে অন্ধের মত নীচে নামছে। নীচে তাকিয়ে দেখল, খাদের জল উঠে এসে তাকে প্রায় ছুঁই-ছুঁই করছে; এ অবস্থায় খাদের নীচে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। লোকটি অনেক আগেই স্রোতের মুখে ভেসে গেছে।

জ্যাসন মারা গেছে! জোরামের লাল ফুলটি মুহূর্তের জন্য নীচে উচ্ছ্বসিত জলস্রোতের দিকে তাকাল। ইচ্ছা হল, ঝাঁপ দিয়ে নীচে পড়ে। তার আর বাঁচবার সাধ নেই। তবু কিসের যেন তাগিদে সে থেমে গেল। আবার সে উপরে উঠতে লাগল।

কালিফোর্নিয়ায় ও আরিজোনায় জ্যাসন

গ্রিড্‌লে অনেক ঝড় দেখেছে। খাদের জল তার হাঁটু পর্যন্ত ওঠার আগেই অনেক কষ্টে সে আরও খানিক উপরে একটা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেল। সেখানেই একটা ঝোলানো পাথরের চাঁইয়ের নীচে সাময়িক আশ্রয় পেয়ে গেল।

পাথরের খাঁজে একটা বাসায় অনেকগুলি ডিম দেখতে পেয়ে তাই খেয়ে আপাততঃ ক্ষুধার নিবৃত্তি করল। কাছেই একটা বেঁটে গাছ দেখতে পেয়ে পোশাক ছেড়ে সেগুলি শুকোতে দিয়ে তার নীচেই শুয়ে পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল খেয়াল নেই, ঘুম ভাঙলে পোশাকের জন্য হাত বাড়াতেই—এ কী! পোশাক তো নেই! চারদিকে তাকাল; কেউ কোথাও নেই। তার ঠিক পাশেই রিভলবার ও গুলির বেল্ট ছিল; সেগুলি যথাস্থানেই রয়েছে।

একসময় দেখতে পেল, কিছু দূরে একটা গিরি-নালা থেকে ধোঁয়া উঠছে। চুপি চুপি সেখানে পৌঁছে জ্যাসন নীচে উঁকি দিল।

ঝর্ণার ধারে শুয়ে আছে একটি যোদ্ধা। পাশের আগুনে ঝলসানো হচ্ছে একটা মুরগি। যাতে যোদ্ধাটি কোনরকম সন্দেহ না করে সেজন্য সে স্থির করল সোজাসুজি হেঁটে তার কাছে গিয়ে হাজির হবে। এমন সময় গিরি-নালার অপর দিকের পাহাড়ের মাথায় তার দৃষ্টি পড়ল। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এমন একটি প্রাণী যা এর আগে বহিঃপৃথিবীর কেউ কোন দিন দেখে নি—চর্মাবৃত একটি বিরাট ডাইনোসর; দৈর্ঘ্যে ষাট-সত্তর ফুট, উচ্চতায় মাটি থেকে পুরো পঁচিশ ফুট। জন্তুটি হাঁটছে টিকটিকির মত চারটে পায়ে ভর রেখে। কিন্তু জ্যাসনকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ বিরাট লেজটাকে নীচে নামিয়ে সেটা সোজা ঝাঁপ দিল পাহাড়ের উপর থেকে।

বাতাসে হিস্‌-হিস্‌ শব্দ শুনে নীচের যোদ্ধাটি লাফ দিয়ে উঠে বর্শাটা বাগিয়ে ধরল; আর জ্যাসন গ্রিড্‌লেও একলাফে ঢালু পাহাড়টার উপর পৌঁছে দুটি বন্দুককেই খাপ থেকে খুলে যোদ্ধাটির দিকে ছুটে গেল।

পথ হারিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে টারজন। একটা পাহাড়ের মোড় বাঁক নিতেই একটি ছেলের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেল। টারজনকে দেখেই ছেলেটি থমকে থেমে গেল। তার হাতে উদ্যত বর্শা ও খাপ-খোলা ছুরি।

অরণ্য-রাজ বলল, আমি টারজন, অরণ্যের রাজা। আমি এসেছি বন্ধুর মত, তোমাকে মারতে নয়।

ছেলেটি বলল, আমি ওভান। কেন তুমি ক্রোভিতে এসেছ?

টারজন পথ হারিয়েছে। সে এসেছে পেলুসিডার থেকে অনেক দূরের এক অন্য জগৎ থেকে। বন্ধুদের হারিয়ে সে তাদেরই খোঁজ করছে। ক্রোভির লোকদের সঙ্গে সে বন্ধুত্ব করতে চায়।

ছেলেটি বলল, খুব ভাল কথা। তুমি আমাদের সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে পার। সে আমার বাবা। তারা যদি তোমাকে মেরে ফেলতে চায় তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করব।

কথা বলতে বলতে দুজন ক্রোভির দিকে চলতে লাগল।

ক্রোভির লোকজনদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজনই টারজনকে ভালভাবে গ্রহণ করল, তাদের মধ্যে আছে ওভানের মা মারাল, আর বোন বেলা।

একদিন মুখে মুখে জয়ধ্বনি শোনা গেল। কার্ব ফিরে এসেছে। জোরামের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে নিয়ে ফিরে এসেছে ক্রোভির বিজয়ী যোদ্ধারা। কার্ব মহান! ক্রোভির যোদ্ধারা মহান!

বিশজন যোদ্ধা ফিরল কার্বের নেতৃত্বে। তাদের সঙ্গে একটিমাত্র মেয়ে। তার হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা, গলায় একটা চামড়ার ফিতে, তার একটা দিক একজন যোদ্ধার হাতে ধরা।

আভান সর্দার সকলকে স্বাগত জানাল। উপহার স্বরূপ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে কার্বের সব কথা শুনল। তারপর বলল, এখনি পরিষদের একটা বৈঠক বসবে। সেখানেই স্থির হবে এই বন্দিনীকে কে পাবে। আরও একটা জরুরী ব্যাপার এদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

একসময় বন্দিনী মেয়েটিকে কাছে পেয়ে টারজন তাকে শুধাল, তুমি কি টোয়ারের বোন জানা?

মেয়েটি অবাক হয়ে তাকাল। তাকে ভাল করে দেখে নিয়ে বলে উঠল, ওহো, তুমিই সেই নবাগত?

হ্যাঁ।

আমার দাদা টোয়ার সম্পর্কে তুমি কি জান?

আমরা একসঙ্গে শিকার করেছি। জোরামে ফিরে যাবার পথে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। তোমার ও তোমার এক সঙ্গীর পায়ের ছাপ দেখেই আমরা এগোচ্ছিলাম, এমন সময় ঝড় এসে সব মুছে দিল। আমিও তোমার সেই সঙ্গীর খোঁজেই বেরিয়েছি।

যে লোকটি আমার সঙ্গে ছিল তাকে তুমি চেন?

সে আমার বন্ধু। সে কোথায়?

ঝড়ের সময় সে একটা গিরি-নালায় ছিল। নির্ঘাৎ ডুবে গেছে। তুমি কি তার দেশের মানুষ?

হ্যাঁ।

কি করে জানলে যে সে আমার সঙ্গে ছিল?

আমি চিনতে পেরেছি তার পায়ের ছাপ, আর টোয়ার চিনেছে তোমার পায়ের ছাপ।

মেয়েটি বলল, সে খুব বড় যোদ্ধা আর খুব সাহসী।

তুমি ঠিক জান সে মারা গেছে? টারজন প্রশ্ন করল।

নিশ্চিত জানি, জোরামের লাল ফুলটি বলল।

কিছুক্ষণ দুজনই চুপ। তাদের মনে জ্যাসন গ্রিড্‌লের চিন্তা। টারজনের খুব কাছে সরে এসে জানা ফিস ফিস করে বলতে লাগল, তুমি তার বন্ধু। কিন্তু এরা তোমাকে মেরে ফেলবে' কার্বকে আমি ভাল করেই চিনি। তার যা কথা সেই কাজ। আমরা দুজনই জ্যাসনের বন্ধু। যদি এখান থেকে পালাতে পারি আমি তোমাকে জোরামের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

ফিস্‌ফিস্ করে কি বলছ? পিছন থেকে একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। মুখ ফিরিয়ে তারা দেখল, আভান সর্দার। স্ত্রী মারালকে ডেকে বলল, মেয়েটিকে গুহার মধ্যে নিয়ে যাও। ও কার সঙ্গিনী হবে পরিষদে সেটা স্থির না হওয়া পর্যন্ত ও সেখানেই থাকবে।

জানাকে নিয়ে মারাল চলে যাবার পরে টারজনও উঠে দাঁড়াল। চারদিক তাকিয়ে দেখল, প্রায় শ'খানেক মানুষ এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। আর পালাবার একমাত্র পথ গিরি-নালার মুখের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডজনখানেক যোদ্ধা। একা

হলে সে হয় তো ওদের ভিতর দিয়ে পথ করেই চলে যেতে পারত, কিন্তু একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সে গুহাব মুখেব দিকে এগিয়ে চলল। টৌয়ারের বোন ও জ্যাসনেব বন্ধুকে ফেলে সে নিজে পালাতে পাবে না।

উড়ন্ত সরীসৃপটা দ্রুতগতিতে নেমে আসছে একক যোদ্ধাটিকে আক্রমণ কবতে। তাকে লক্ষ্য করেই ঝাঁপ দিল জ্যাসন গ্রিড্‌লে। সেই মুহূর্তে তার চোখে ভেসে উঠল একটি লুপ্ত সবীসৃপের ছবি—জুরাসিক পাহাড়েব স্টেগোসবাসের ছবি।

জ্যাসন দেখল, আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও একক যোদ্ধাটির চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। তার এক হাতে ছোট বর্শা, অন্য হাতে পাথরের ছুরি। সে মরবে, কিন্তু বীরত্বের পরিচয় রেখে মরবে।

কিন্তু যোদ্ধাটি বর্শা ছুঁড়বাব আগেই জন্তুটা তাদের সামনে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। নাকটা ঢুকে গেল মাটির মধ্যে। এক পাশে কাত হয়ে পড়ে মরে গেল।

মরে গেল! যোদ্ধাটি অবাক হয়ে বলল। কিসে মরল? আমি তো বর্শা ছুঁড়ি নি।

কোল্ট রিভলবার দুটো খাপে ভবতে ভরতে জ্যাসন বলল, এরাই মেরেছে।

তার দিকে তাকিয়ে সসম্ভ্রমে যোদ্ধাটি বলল, তুমি কে? জোরামদের দেশে কি করছ?

আমার নাম গ্রিড্‌লে—জ্যাসন গ্রিড্‌লে।

জ্যাসন! হ্যাঁ, জ্যাসন গ্রিড্‌লে, ঠিক বটে। এবার বল, তুমি কি টারজনকে চেন না?

টারজন! তুমি টারজনকে দেখেছ? সে বেঁচে আছে?

আমি তাকে দেখেছি। আমরা একসঙ্গে শিকার কবেছি, তোমাকে ও জানাকে খুঁজেছি; কিন্তু সে বেঁচে নেই, মাবা গেছে।

কি করে মারা গেল?

একটা পাহাড়ের মাথায় চড়ে সেটা পার হচ্ছিলাম এমন সময় একটা টিপ্‌ডার ছোঁ মেবে তাকে

তুলে নিয়ে গেছে।

টারজন! এ আশংকা তাব ছিল, কিন্তু এখন এমন অকাট্য প্রমাণ পাবার পবেও জ্যাসনেব মনে হল এ অবিশ্বাস্য। সেই ইস্পাত-কঠিন মানুষটি মরতে পারে না।

জ্যাসনকে চুপ করে থাকতে দেখে যোদ্ধাটি বলল, তাকে তুমি খুব ভালবাসতে, তাই না?

হ্যাঁ, আমরা দুজন একসঙ্গেই ছিলাম। এখন তো টাবজন মাবা গেছে, তাই আমি একাই জোরামের লাল ফুলটিকে খুঁজছি।

জ্যাসন বলল, আমিও তো তাকেই খুঁজছি। চল, দুজনে একসঙ্গেই খুঁজব। তোমার নাম কি?

লোকটি বলল, টৌয়ার।

বন-জঙ্গল ও জলাভূমিতে ঘেরা অনেক পথ পাব হয়ে দুজন এগিয়ে চলল।

অরণ্য-রাজ নিঃশব্দে গুহার মধ্যে ঢুকে গেল। ভিতরকার স্বল্প আলোয় দৃষ্টি অভ্যস্ত হয়ে এলে সে বুঝতে পাবল গুহাটা বেশ বড়। দেয়ালে গা ঘেঁসে খড়ের বিছানায় অনেক যোদ্ধা, কিছু নারী ও শিশু ঘুমিয়ে আছে। টারজন জোরামের মেয়েটির খোঁজে এগিয়ে চলল। সেই তাকে প্রথম চিনতে পেরে নীচু গলায় শিস্ দিয়ে জানিয়ে দিল।

এমন সময় মশাল হাতে একটি ছেলে গুহায় ঢুকল। টারজনকে দেখতে পেয়ে তার কাছে গেল। ছেলেটি ওভান।

সে বলল, পরিষদের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তারা তোমাকে মেরে ফেলবে।

টারজন উঠে দাঁড়াল। জানাকে বলল, এস। আর দেরী করা নয়। ওভানের দিকে ফিরে বলল, তুমি নিজেই বলেছ তুমি আমার বন্ধু। আশা করি তুমি চুপ করে থেকে আমাদের পালাবার সুযোগ করে দেবে।

ছেলেটি বলল, আমি তোমার বন্ধু বলেই এখানে এসেছি। বাইরে সশস্ত্র পাহারা। তাদের এড়িয়ে তোমরা পালাতে পারবে না।

কিন্তু এ ছাড়া আর কোন পথ নেই, টারজন বলল। একটা পথ আছে, আর সেই পথ দেখাতেই আমি এসেছি।

এস আমার সঙ্গে, বলে ছেলেটি গুহার শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে চলল। তার পিছনে চলল টারজন ও জানা।

একেবারে শেষপ্রান্তে গিয়ে ওভান থামল। মশালটা মাথার উপরে ধরল। সেই আলোয় দেখা গেল একটা ছোট ঘরের শেষ প্রান্তে আছে একটা অন্ধকার ফাটল।

ছেলেটি বলল, ওই অন্ধকার গর্তের ভিতর থেকে একটা পথ চলে গেছে পাহাড়ের মাথায়। একমাত্র সর্দার ও তার জ্যেষ্ঠপুত্রই সে পথের খবর জানে। বাবা যদি জানতে পারে যে আমি তোমাদের এই পথটা দেখিয়ে দিয়েছি তাহলে আমাকেও মেরে ফেলবে। রাস্তাটা খুব খাড়া ও এব্ড়ো-থেবড়ো। তবু এটাই একমাত্র পথ। চলে যাও। আমার জীবন বাঁচিয়েছিলে বলেই তার প্রতিদান দিলাম।

কথা শেষ করেই সে মশালটাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। গাঢ় অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেল। ছেলেটি আর কোন কথা বলল না। তার পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল।

জানার হাত ধরে টানতে টানতে অনেক কষ্ট করে দুজনে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল। তখন বলল, এবার? কোন্ দিকে যোবাম?

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জানা বলল, ওই দিকে। কিন্তু ও পথে আমরা যাব না। কার্ব ও তার দলবল সবগুলি পাহাড়ী পথের উপরেই নজর রাখবে। কাজেই আমরা সোজা নেমে যাব নীচের সমতল অঞ্চলের দিকে।

নামতে নামতেই যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা সমতলভূমি টারজনের চোখে পড়ল। শেষ পর্যন্ত একটা ঘোরানো গিরি-নালা ধরে চলতে চলতে তারা একেবারে মুখে পৌঁছে সেই বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতেই পৌঁছে গেল।

জোরামের লাল ফুলটিকে খুঁজে পাবার আশায় জ্যাসন গ্রিড্লে পাহাড়ের চূড়া ভেঙে ফেলির গ্রামের দিকে ছুটে চলেছে; বোনকে উদ্ধার করতে বা প্রতিশোধ নিতে বর্শা ও ছুরি হাতে তার পাশে চলেছে টোয়ার।

কোন রকম বিপদের আশংকা না করে তারা পাহাড় বেয়ে নেমে গাছের নীচেকার ঘন ঝোপের ভিতরে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একডজন মানুষ লাফিয়ে পড়ে তাদের মাটিতে ফেলে দিল। মুহূর্তের মধ্যে দুজনকে নিরস্ত্র করে পিঠমোড়া করে তাদের হাত বেঁধে ফেলল। তারপর ঝাঁকি দিয়ে দুজনকে

দাঁড় করিয়ে দিতেই আক্রমণকারীদের দিকে চোখ পড়ামাত্র জ্যাসন গ্রিড্‌লের চোখ বিস্ময়ে একেবারে ছানাবড়া হয়ে গেল।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, আরে কী আশ্চর্য! এখানে এসে গণ্ডাব, মামথ, ট্রাকোডন, টেবাডাকিটল ও ডাইনোসবের দেখা পাব তা জানতাম, কিন্তু পেলুসিডারেব একেবারে গহন গভীরে ক্যাপ্টেন কিড, লাফিতে, ও স্যাব হেনবি মর্গানকে দেখতে পাব এ যে স্বপ্নেও ভাবি নি।

একজন বলল, ওটা কোন্ ভাষা? তুমিই বা কে। আর কোথা থেকে এসেছ?

ভাষাটা প্রাচীন মার্কিনী, আব আমি এসেছি ইউ. এস. এ. থেকে। কিন্তু তোমবা কাবা? আব কেনই বা আমাদের বন্দী কবেছ?

একজন দাড়িওয়ালা লোক বলল, আমবা জানি তুমি কে বা কোন্ দেশ থেকে এসেছ। আমাদেব বোকা বানাতে চেষ্টা করো না।

বেশ তো, তা যদি জানই তো আমাকে ছেড়ে দাও, কাবণ তোমরা নিশ্চয় জান যে কাবও সঙ্গে আমাদেব কোন লড়াই নেই।

বক্তা বলল, তোমাদেব দেশ সব সময়ই কোবসাবদেব সঙ্গে যুদ্ধরত। তুমি ও সাবিব লোক। তোমাব অস্ত্রশস্ত্র দেখেই সেটা বুঝতে পেরেছি। তোমাকে দেখামাত্রই বুঝেছি, তুমি সুদূব সাবি থেকে এসেছ। একজন সঙ্গীব দিকে তাকিয়ে বলল, এই তো স্বয়ং টানাব। সে যখন কোবসাবে বন্দী ছিল তখন তাকে দেখেছিলে কি?

না, তখন আমি জাহাজে ছিলাম। তবে এই যদি টানাব হয় তাহলে আমরা অনেক পুবস্কাব পাব।

প্রথম বক্তা বলল, এবাব জাহাজে ফিবে চল। আর সময় নষ্ট কবে কোন লাভ নেই।

জাহাজের 'লংবোট'টা তীরে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল। পাহারায় ছিল পাঁচজন কোরসাব।

বন্দীদের নৌকোর মধ্যে ঠেলে দিয়ে কোরসাবরাও উঠে পড়ল। তীব্র স্রোতের টানে নৌকোটা

তর্‌তর্ করে ভেসে চলল।

পেরির কাছ থেকে বেতাব মারফৎ জ্যাসন পেলুসিডারের টানারদের যে কাহিনী আগেই জানতে পেরেছিল তাতেই কোরসারদের চেহাবা ও স্বভাব তার জানাই ছিল। তবু তাবা কেউই সামনা সামনি দেখা রক্ত-মাংসের মানুষ ছিল না।

এই সব অসভ্য কোবসার, তাদেব নৌকো, তাদেব পোশাক ও প্রাচীনকালেব আগ্নেয়াস্ত্র দেখেই জ্যাসন স্পষ্ট প্রমাণ পেল যে তারা বহিঃপৃথিবী থেকেই এখানে এসেছে। সে আরও বুঝল, এদের দেখেই ডেভিড ইনেসের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে পেলুসিডার থেকে বহিঃপৃথিবীতে যাবার একটা পথ মেরু অঞ্চলের দিকে অবশ্যই আছে।

কাজেই এই অসভ্য লোকগুলির হাতে পড়াব দুর্ভাগ্যের জন্য টোয়ার খুব হতাশ হলেও জ্যাসন কিন্তু দেখতে পেয়েছে সৌভাগ্যের হাতছানি। সে ধরেই নিয়েছে, এরা তাদেব নিয়ে যাবে সেই কোরসার শহরে যেখানে ডেভিড ইনেসকে বন্দী কবে রাখা হয়েছে; আর তা যদি হয় তাহলে তো পেলুসিডারের সম্রাটকে উদ্ধারের যে ব্রত নিয়ে তারা এই অভিযানে এসেছে তাব প্রথম লক্ষ্যে তারা পৌঁছে যেতে পারবে।

নৌকো ভেসে চলেছে। জ্যাসন ও টোয়ারকে রাখা হয়েছে নৌকোর মাঝখানে। তাদের হাত

তখনও পিঠমোড়া করে বাঁধা। জ্যাসনের কাছেই যে কোরসারটি বসে আছে সঙ্গীরা তাকে ডাকছিল লাজো বলে। লোকটি প্রথম থেকেই জ্যাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

প্রথম সুযোগেই সে লাজোর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করল। লাজো শুধাল, কি চাও?

তোমাদের সর্দার কে? জ্যাসন জানতে চাইল।

সর্দার কেউ নেই। সে আগেই মারা গেছে। তুমি কি চাও?

আমি চাই আমাদের হাতের বাঁধন খুলে ফেলা হোক। আমরা তো পালাতে পারব না। আমরা নিরস্ত্র, আর সংখ্যায় তোমরা অনেক। অথচ এই সব সরীসৃপদের আক্রমণে যদি নৌকোটা ভেঙে যায় বা ডুবে যায় তাহলে তো হাত-বাঁধা অবস্থায় আমরা একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ব।

লাজো ছুরি বের করল। জ্যাসন ও টৌয়ারের হাতের বাঁধন কেটে দিল।

আবার চলা শুরু হল। জ্যাসনের মনে হল, এই অজ্ঞাত যাত্রার বুঝি শেষ নেই। তারা অনেকবার খেল, অনেকবার ঘুমল। সীমাহীন জলাভূমির বুক চিরে নৌকো চলেছে তো চলেইছে। দুই তীরের ঘন সবুজ বন আর ডালে ডালে নানা রঙের ফুল দেখে দেখে চোখ পচে যাবার উপক্রম হল। তবু চলার শেষ হল না।

এতক্ষণ চুপচাপ বসে কাটালেও এবার জ্যাসন ও টৌয়ারকেও কাজে লাগানো হল। তাদের হাতেও তুলে দেওয়া হল বৈঠা। বারুদ-ভর্তি গাদা বন্দুক রয়েছে বৈঠাওয়ালাদের পাশে; নৌকোর গলুই ও পিছন দিকে সশস্ত্র লোকগুলো চলেছে বাঁ দিকের তীরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে।

বৈঠা চালাতে চালাতে তাদের দুজনকে খুবই ক্লান্ত হতে দেখে লাজো তাদের কিছুক্ষণের জন্য ছুটি দিল। এমন সময় হঠাৎ নৌকোর গলুই থেকে ভয়ার্ত চীৎকার উঠল: তারা এসে পড়েছে।

নৌকোর মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। কোনরকমে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে তুলে জ্যাসন

তাকিয়ে দেখল বীভৎস সরীসৃপের পিঠে চেপে ধেয়ে আসছে মানুষের মতই একপাল জীব। হাতে লম্বা বল্লম। তাদের আঁশওয়ালা বাহনগুলো অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে জলের ভিতর দিয়ে ছুটে আসছে। আর কাছে এলে দেখল, মানুষের মত দেখতে হলেও তারা মানুষ নয়—এক শ্রেণীর বিচিত্র সরীসৃপ—মাথাটা গিরগিটির মত, তাতে সরু কান ও ছোট শিং।

সে চেঁচিয়ে বলল, হা ঈশ্বর! ওরা কারা?

টৌয়ার কাঁপতে কাঁপতে বলল, ওরা হরিবের দল। ওদের হাতে পড়ার চাইতে মরা ভাল।

স্রোতের টানে ও বৈঠার বেগে ভারী নৌকোটা সোজা ছুটে চলেছে সেই ভয়ংকর বীভৎস জীবগুলোর দিকে। দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। সামনের গলুই থেকে একটা বন্দুক গর্জে উঠল। হরিবরা নৌকোর সামনে থেকে সরে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তারা নৌকোর দুই পাশ বরাবর ছুটতে লাগল। গাদা বন্দুক থেকে সমানে বের হচ্ছে আগুন ও ধোঁয়া, ছুটছে তার ভিতরকার লোহা ও পাথরের টুকরো। কিন্তু হরিবদের ভ্রূক্ষেপ নেই। একটা পড়ছে তো ছুটো এগিয়ে সে তার জায়গা নিচ্ছে।

নৌকোর জীবিত আরোহীর সংখ্যা ক্রমে মুষ্টি-মেয় হয়ে এল। হরিবরা তখন বাহনদের ছেড়ে প্রতিপক্ষের নৌকোর উপর লাফিয়ে পড়তে লাগল। বাঁকা তলোয়ার ও গাদা বন্দুকেব মৃত্যু-লীলা সমানেই চলতে লাগল; কিন্তু বিপুল সংখ্যাধিক্যে বলীয়ান সর্প-নরের দল অবশিষ্ট কোরসারদের প্রায় ঢেকে ফেলল।

যুদ্ধ শেষ হল। তখন বেঁচে আছে মাত্র তিনজন কোরসার। লাজো তাদের মধ্যে একজন। হরিবরা তাদের হাত বেঁধে তীরে নামালো। গুরুতর আহত-দের ছুরির আঘাতে আঘাতে শেষ করল। জ্যাসন ও টোয়ারকে অক্ষত অবস্থায় দেখে তাদেরও হাত বেঁধে তীরে নামিয়ে কোরসারদেব পাশেই রেখে দিল।

টোয়ার বলল, তুমি জান ওরা কারা? আগে কখনো ওদের দেখেছ?

লাজো বলল, হ্যাঁ, জানি, তবে এই প্রথম ওদের দেখা পেলাম। ওরা হরিবের দল—সর্প-নর। বেলা আম ও গিয়র কোর্সের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাস করে।

ক্লান্ত দেহে, অবসন্ন মনে জ্যাসনও একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

উঠে দাঁড়াও। একজন হরিবের কর্কশ ডাকে জ্যাসনের ঘুম ভেঙে গেল। তোমার হাতের বেড়ি খুলে দিচ্ছি। পালাতে পারবে না। সে চেষ্টা করলেই মরবে। আমার সঙ্গে এস।

ওদিকে অন্য সব হরিবরা উঠে দাঁড়িয়ে শিসের মত একটা বিচিত্র শব্দ করে ডাকতে লাগল, আর সে ডাক শুনে জল থেকে উঠে ও জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের বাহনরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সকলেই যার যার বাহনে চড়ে বসল। পাঁচ বন্দীকে বসিয়ে নিল পাঁচ আরোহীর সামনে। তারপর সেই বিচিত্র মিছিল এগিয়ে চলল সূর্যহীন অন্ধকার ঘন অরণ্যের পথে।

বন পার হয়ে তারা সূর্যের আলোয় পৌঁছে গেল। দূরে জ্যাসনের চোখে পড়ল একটা হ্রদের ঝিল্‌মিল্ জল।

হ্রদের তীরে পৌঁছে একটি হরিব হঠাৎ টোয়া-রের মুখটা চেপে ধরে বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর চাপে নাকটা আটকে দিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটু পরেই দুজন ডুবে গেল।

একটু পরে আর এক হরিব এসে লাজোকে নিয়ে সেই একই ভাবে হ্রদের জলে ডুব দিল। বাকি দু'জন কোরসারেরও সেই একই দশা হতে দেরী হল না।

এবার তার পালা। হরিবের হাত থেকে ছাড়া পেতে জ্যাসন প্রাণপণ চেষ্টা করল। কিন্তু সেই চটচটে হাতের মুঠি আলগা হল না। তাকে নিয়ে সেও অতি দ্রুত জলের নীচে নেমে গেল। একটু পরেই আঠালো কাদার উপর দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে চলল। একটু বাতাসের জন্য তার ফুস্‌ফুস্‌টা যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল, সব ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে এল, মুহূর্তের জন্য সব কিছু অন্ধকারে ঢেকে গেল। কিন্তু তার চাইতেও গাঢ়তর নরকের অন্ধকার গর্তের ভিতরে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হল। তারপরেই তার মুখ ও নাকের উপর থেকে হাতটা সরিয়ে নেওয়া হল। ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে এলে সে বুঝল যে সে ডুবে যায় নি; কাদার উপর শুয়ে প্রশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিচ্ছে বাতাস, জল নয়।

তাব চারদিক ঘিবে নেমে এল পরিপূর্ণ অন্ধকাব। একটা চটচটে শরীর তার শরীরেব উপব দিয়ে সব্‌সর্ কবে চলে গেল; তাবপর আর একটা—আবও একটা। জলেব একটা ছলাৎ-ছলাৎ, গড়-গড় শব্দ, তাবপব নীববতা—কববেব নীববতা।

বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে পৌঁছবার পরে টাবজন ও জানাও পড়ল হবিবদেব কবলে। কিন্তু একদল সশস্ত্র প্রাণীর দ্বাবা পরিবৃত হয়েও বিনা বাধায় অস্ত্র সমর্পণেব ইচ্ছা অরণ্য-রাজেব নেই। সে বলল, আমাদের নিয়ে তোমরা কি কবতে চাও?

একটা হবিব বলল, তোমাদের নিয়ে যাব আমাদের গাঁয়ে; পেট ভরে খাওয়াব। হরিবদের কাছ থেকে কেউ পালাতে পাবে না, সে চেষ্টা করো না।

টাবজন তবু ইতস্তত কবতে লাগল। জোরামেব লাল ফুলটি তার আরও কাছে গিয়ে চুপি চুপি বলল, ওদেব সঙ্গেই চল। তাহলে হয় তো পবে পালাবাব কোন সুযোগ মিলতেও পাবে।

মাথা নেড়ে টারজন হবিবের দিকে ফিরে বলল, আমবা প্রস্তুত।

অন্ধকার বনের পথ ধরে তাবা এগিয়ে চলল।

জঙ্গলে ঢোকাব পর থেকেই টারজন বুঝতে পেরেছে যে ইচ্ছা করলেই এখন সে পালাতে পারে। এক লাফে যে কোন একটা নীচু ডাল ধরতে পারলেই চোখের নিমেষে এক ডাল থেকে আব এক ডালে উঠে সে এমন ভাবে হাওয়া হয়ে যাবে যে কোন হরিবের সাধ্য নেই তাকে ধরতে পারে। কিন্তু সে তো জানাকে ফেলে যেতে পারে না। তাকে সব কথা বলার মত সুযোগও পাচ্ছে না। কাজেই সে সুযোগেব জন্যই অপেক্ষা করতে লাগল।

একসময় পাগলা হাওয়ায় এমন একটা গন্ধ তার নাকে এসে লাগল যা সে জীবনে আর কখনও পাবে বলে আশাও করতে পারে নি। এই পরিচিত গন্ধ যাদের গা থেকে আসছে তারা আছে সামনেব দিকে। অতএব পালাবার সুযোগ এসেছে। কিন্তু দু'জন একই সঙ্গে পালানো সম্ভব নয়। মেয়েটিকে নিরাপদ করতে হলে আগে তাকে পালাতে হবে। তারপর—

একসময় মাথার উপরে একটা শক্ত ডাল দেখতে পেয়ে এক লাফে সেটাকে ধরে ফেলে টারজন বিদ্যুৎ গতিতে গাছের মগডালে ঘন পাতাব আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটে গেল যে হরিববা কেউ কিছু বুঝবার আগেই সে হাওয়া হয়ে গেল।

কিছুটা পিছন থেকে জানাও তাকে পালাতে দেখল। জোরামের লাল ফুলেব মন থেকে আশার শেষ ক্ষীণ শিখাটাও নিভে গেল। টারজনকে সে দোষ দিল না, তবু সে মনে মনে জানল যে জ্যাসন তাকে এভাবে ছেড়ে যেতে পাবত না।

বাতাসে ভেসে আসা গন্ধকে অনুসবণ করে টারজন অতি দ্রুত গাছপালার ভিতব দিয়ে এগিয়ে চলল। বিশাল পেলুসিডারের অন্ধকাব বনের মধ্যে এই গন্ধ তাব নাকে আসবে সেটা যতই অবিশ্বাস্য হোক তবু এই গন্ধ যাদের কাছ থেকে আসছে তাদের অস্তিত্বকে সে কখনও সন্দেহ করে নি।

একসময় সে নীচের স্তরে নামতে লাগল। গন্ধটাও ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। নামতে নামতে যখন বনের এক কোণে মাটিতে তার পা পড়ল তখন দশটি দীর্ঘদেহী যোদ্ধার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সে যেন নেমে এল স্বর্গের দেবদূতের মত।

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে মুহূর্তকাল তার দিকে তাকিয়ে থেকে তারা ছুটে গেল তাব দিকে, তার

সামনে নতজানু হয়ে তার হাত দুটিতে চুমো খেতে লাগল। তারা চীৎকার করে বলতে লাগল. ওঃ, বাওয়ানা, বাওয়ানা, সত্যি কি তুমি এলে! মুলুঙ্গু তার সন্তানদের প্রতি কৃপা করেছে; তাদের বড় বাওয়ানাকে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছে।

টারজন বলল, কিন্তু বাছারা, তোমাদের উপর আমি একটা কাজের ভার দিচ্ছি। সর্প-নররা পিছনেই আসছে; তাদের সঙ্গে আছে একটি বন্দিনী মেয়ে। তোমাদের সঙ্গে রাইফেল রয়েছে। আশা করি প্রচুর গুলিও আছে।

যতদূর সম্ভব বর্শা ও তীর ব্যবহার করে আমরা প্রচুর গুলি হাতে রেখেছি বাওয়ানা।

খুব ভাল করেছ। এবার সে সব দরকারে লাগবে। উড়োজাহাজটা থেকে আমরা কতটা দূরে আছি?

তা তো জানি না, মুভিরো বলল।

জান না? টারজন বলল।

না বাওয়ানা, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি।

জাহাজ থেকে দূরে এসে তোমরা কি করছিলে? টারজন প্রশ্ন করল।

গ্রিড্‌লে ও ভন হর্স্টের সঙ্গে আমরা তোমাকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলাম বাওয়ানা।

তারা কোথায়? টারজন শুধাল।

অনেক দিন আগে আমরা গ্রিড্‌লের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি; তারপর থেকে আর তাকে দেখি নি।

তারা আসছে। টারজন সকলকে সতর্ক করে দিল।

আমিও শুনতে পেয়েছি বাওয়ানা, মুভিরো বলল।

এবার দেখবে কিছু ভয়ংকর মানুষ, টারজন বলল; তবে তাদের চেহারা দেখে ভয় পেয়ো না। তোমাদের বুলেটই তাদের সাবাড় করবে।

মুভিরো সদর্পে বলল, কোন ওয়াজিরিকে কখনও ভয় পেতে দেখেছ বাওয়ানা?

টারজন হাসল। বলল, একজনের রাইফেল

আমাকে দাও, তারপর জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়। ঠিক কোন্ পথে তারা যাবে তা জানি না। যে কেউ তাকে দেখবে অমনি গুলি চালাবে মেরে ফেলতে। কিন্তু মনে রেখো, তাদের একজনের সামনে মেয়েটি আছে। খুব সাবধান, মেয়েটির যেন কোন ক্ষতি না হয়।

কথা শেষ হবার আগেই প্রথম হরিবটি দর্শন দিল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল রাইফেল। অগ্রগামী হরিবটি ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। গোরোবর ছুটিয়ে ধেয়ে এল বাকি হরিবরা। পরপর গর্জে উঠল টারজন ও অন্যদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র। পরাজয় কাকে বলে তা তারা জানত না; এবার জানল। প্রতিপক্ষের হাতের আগুন-খেকো অস্ত্রের বিরুদ্ধে এটে ওটা যাবে না বুঝতে পেরে বাকি হরিবরা ইতস্তত ছুটতে লাগল।

এতক্ষণের মধ্যেও টারজন জানার দেখা পায় নি। ভাল করে দেখল, একটা দুরন্ত গতি গোরোবরের পিঠে চড়ে বিদ্যুৎগতিতে সে ছুটে চলে যাচ্ছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা সওয়ারবিহীন

গোরোবর পিছন থেকে ধাক্কা মেবে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। পুনরায় উঠে দাঁডাবাব আগেই জানা ও তার অপহরণকারী দূরেব গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্ধকাব বনের পথে ছুটে চলেছে টারজন। দূর থেকে ছুটন্ত হবিবকে দেখতে পেয়েই টাবজন একটা গাছে উঠে তাদেব অনুসরণ করে চলল। ক্রমে সে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল যেখানে তার ঠিক নীচেই হরিবটা জানাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে।

কাল বিলম্ব না করে একটা জীবন্ত বর্শার মত টারজন সোজা লাফিয়ে পড়ল হরিবের পিঠেব উপর। সেই ধাক্কাতেই সেটা মাটিতে পড়ে গেল। পেশীবহুল হাতে তাব গলাটাকে পেঁচিয়ে ধরে টারজন সেটাকে টেনে তুলে নিজেও সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর সেটাকে দুই হাতে মাথাব উপর তুলে বার কয়েক ঘুরিয়ে সজোরে মাটিতে ছুঁড়ে দিল।

শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পারল যে হরিবটা চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেছে, তখন টারজন নীচু হয়ে তার পাথরের ছুরিটা নিয়ে নিল। মাটি থেকে তুলে নিল তার বল্লমটা। জানার দিকে ফিরে বলল, এস, এখানে আমাদের জন্য একটিমাত্র নিরাপদ স্থানই আছে। বলেই জানাকে কাঁধে তুলে নিয়ে সে এক লাফে গাছে চড়ে বসল।

মুভিরো ও তার দলকে যেখানে শেষ দেখেছিল সেই দিকেই তারা দ্রুত ফিরে চলল। এমন সময় শুনতে পেল, অনেক পায়ের শব্দ তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

মেয়েটিকে একটা মোটা ডালের আড়ালে লুকিয়ে রেখে টাবজন নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল।

মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করার পরেই নীচে দেখা দিল একটি প্রায় উলঙ্গ মানুষ। কোমরে জড়ানো এক ফালি নোংরা ছাগলের চামড়া; তাও কাদায় মাখা-মাখি; সারা দেহেও কাদাব প্রলেপ। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে সে একাকি কি কবছে বুঝতে না পেবে টারজন একলাফে তার ঠিক সামনে মাটিতে নেমে এল।

তাকে দেখে লোকটিও থেমে গেল। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পাবছে না। চেঁচিয়ে বলল, টাবজন! সত্যি কি তুমি! তুমি তাহলে মাবা যাও নি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সত্যি তুমি মারা যাও নি।

অরণ্য-রাজের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। সবিস্ময়ে বলল, গ্রিড্‌লে! জ্যাসন গ্রিড্‌লে! জানা যে বলল তুমি মারা গেছ!

জ্যাসন বলে উঠল, জানা! তুমি তাকে চেন? তাকে দেখেছ? কোথায় সে?

সে আমার সঙ্গেই আছে, টারজন জবাব দিল। তারপর বলল, চল, ওয়াজিরিদের খুঁজে বের করতে হবে।

অদূরেই অনেক মানুষের কলকণ্ঠ ভেসে এল। রাইফেলধারী দশটি ওয়াজিরি যোদ্ধা টোয়ার ও তিন কোরসারকে ঘিরে ধরে নিয়ে আসছে।

এতক্ষণ উভয়পক্ষই পরস্পরকে শত্রু বলে ধবে নিয়েছিল। এবার টারজন, জ্যাসন ও জানার মধ্যস্থতায় তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হল, বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

টারজনকে জীবিত দেখে টোয়ারের বিস্ময়েব সীমা রইল না। জানাকে সুস্থ দেহে নিরাপদে দেখতে পেয়ে আনন্দে ও স্বস্তিতে তার বুকটা ভবে গেল। জানা ছুটে এসে দাদাকে জড়িয়ে ধরল।

দীর্ঘ পবিশ্রম ও ক্লান্তিব পরে সকলেই পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিল। পরস্পরকে শোনাল তাদের অভি-যানের কাহিনী। টোয়ারের ইচ্ছা জানাকে নিয়ে জোরামে ফিরে যাবে। টারজন, জ্যাসন ও ওয়াজিরিদের একমাত্র বাসনা অভিযানেব অন্য সঙ্গীদের খুঁজে বের করবে। লাজো ও তার সঙ্গীরা চাইল তাদের জাহাজে ফিরে যেতে।

অনেক আলোচনার পর স্থিব হল, আপাতত সকলে মিলে কোরসাবেই যাওয়া হবে। তদনুসাবে অনেক খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে একদিন সকলে লংবোট-টাতে চেপে বসল।

অনুকূল বাতাসে লংবোটের আরোহীরা ভেসে চলেছে সূর্যালোকিত সমুদ্রেব বুকে। আর সেই একই পথে আকাশে উড়ে চলেছে ও-২২০ অভিযাদেব হাবানো সঙ্গীদেব ব্যর্থ অনুসন্ধানে।

দেখতে দেখতে বাতাস ধেয়ে এল ঝড়ের বেগে, ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠল। কাজেই তীরে যাবাব চেষ্টা ছেড়ে তারা বাতাসের আগে আগেই চলতে বাধ্য হল। বৃষ্টি নেই, বিদ্যুৎ নেই, আকাশে মেঘ নেই—শুধু প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসছে বাতাস; উচ্ছ্বসিত সমুদ্র বুঝি তাদের গিলে খাবে।

কিন্তু ভাগ্যের যাদুবলে নৌকোটা রক্ষা পেল। বাতাস পড়ে গেল। সমুদ্র আবার শান্ত হল। এবার চারদিকে শুধু জল আর জল, তীরভূমির চিহ্নমাত্র চোখে পড়ছে না।

টারজন বলল, উপকূল-রেখা তো হারিয়ে গেল লাজো, এবার আমরা কোরসারের পথ খুঁজে পাব কেমন করে?

লাজো বলল, সেটা খুব সহজ হবে না।

হঠাৎ আঙুল তুলে জানা বলে উঠল, ওটা কি?

সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে ঘুরে গেল।

লাজো বলল, একটা পাল। আমরা বেঁচে গেলাম।

কিন্তু ধর জাহাজটা যদি শত্রুর হয়? জ্যাসন বলল।

লাজো বলল, না, তা নয়। কারণ কোরসাব ভিন্ন অপর কারও জাহাজ এ সমুদ্রে চলাফেরা করে না।

জানা বলে উঠল, ওই আরেকটা পাল। অনেকগুলো পাল।

সকলে দূরের পালগুলির দিকে তাকিয়ে বইল। ধীরে ধীরে সেগুলি এগিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল যে একটা বেশ বড় নৌ-বহর তাদের অনুসরণ করছে।

লাজো বলল, ওরা তো কোরসাব নয়। ওরকম জাহাজও আমি আগে কখনও দেখি নি।

শত্রু-জাহাজের পাটাতনের উপব একটি লোক উঠে এল। চীৎকাব করে বলল, জাহাজ থামাও, নইলে তোমাদের উড়িয়ে দেব।

তুমি কে? জ্যাসন প্রশ্ন করল।

আমি আনোবক-এর জা, আর এটা পেলুসিডার-সম্রাট প্রথম ডেভিডের নৌ-বহর। তোমরা কারা?

আমরা বন্ধু, টারজন জবাব দিল।

কোরসারের সমুদ্রে পেলুসিডার-সম্রাটের কোন বন্ধু থাকতে পারে না।

এব্‌নার পেরি যদি তোমার সঙ্গে থাকে তাহলে আমরা প্রমাণ করে দেব যে তুমি ভুল করছ, জ্যাসন বলল।

জা বলল, এব্‌নার পেরি আমাদের সঙ্গে নেই, কিন্তু তার সম্পর্কে তুমি কি জান?

মার্কিনী সঙ্গীটিকে দেখিয়ে টারজন বলল, এর নাম জ্যাসন গ্রিড্‌লে। হয় তো এব্‌নার পেরির কাছে এর নাম শুনে থাকবে। একটা অভিযাত্রী দল নিয়ে বহির্জগৎ থেকে সে এখানে এসেছে কোরসারজুর কারাগার থেকে ডেভিড ইনেসকে উদ্ধার করতে।

লংবোটে তিনজন কোরসারকে দেখে জার মনে কিছুটা সন্দেহ জাগলেও সব কথা বুঝিয়ে বলার পরে, বিশেষ করে ওয়াজিরিদের রাইফেলগুলো পরীক্ষা করে দেখার পরে সে এদের সব কথাই সত্য বলে মেনে নিল, সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল তাদের জাহাজে। সেখানে তখন নৌ-বহরের অনেকেই হাজির হয়েছে। মুখে-মুখে খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে অপরিচিত এই সব মানুষদের মধ্যে দু'জন তাদের বন্ধু; তারা এসেছে বহির্জগৎ থেকে ইনেসকে উদ্ধার করতে। তাই টারজন ও জ্যাসনকে স্বাগত জানাতে এসেছে অন্য সব জাহাজের ক্যাপ্টেনরা। তাদের মধ্যে আছে পেলুসিডার-সম্রাজ্ঞী সুন্দরী ডিয়ানের ভাই শক্তিমান ডেকর; তুরীয়দের সর্দার গুর্কের কোল্ক, আর সারির রাজা লোমশ ঘক-এর ছেলে টানার। তাদের কাছেই টারজন ও জ্যাসন জানল যে এই নৌ-বহরও চলেছে ডেভিডকে উদ্ধার করতে।

টানার প্রশ্ন করল, তোমরা কি করে আশা করতে পারলে যে মাত্র একডজন লোক নিয়ে ডেভিডকে উদ্ধার করতে পারবে?

টারজন বলল, আমাদের সব লোক এখানে নেই। আমরা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, আর তাদের খুঁজে পাচ্ছি না। অবশ্য আমাদের দলে লোক খুব বেশী নয়। সম্রাটকে উদ্ধারের ব্যাপারে লোকবল অপেক্ষা অন্য বলের উপরেই আমরা নির্ভর করেছি।

ঠিক সেই মুহূর্তে জাহাজ থেকে হৈ-চৈর শব্দ ভেসে এল। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। সকলেই আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখাচ্ছে। ইতি-মধ্যেই কেউ কেউ কামানের নলকে সেই দিকে তুলে ধরেছে; সকলেই রাইফেলে গুলি ভরতে ব্যস্ত। টারজন ও জ্যাসন উপরে তাকাতেই দেখল, তাদের মাথার উপরে ও-২২০।

বোঝা গেল, নৌ-বহরকে দেখতে পেয়ে উড়ো-জাহাজটা ঘুরে ঘুরে সেইদিকেই নেমে আসছে।

জ্যাসন বলে উঠল, ওটা আমাদের জাহাজ। ওরা আমাদের বন্ধু।

ক্রমে জাহাজ থেকে জাহাজে খবর ছড়িয়ে পড়ল

যে তাদের মাথার উপরে উড্ডীয়মান বস্তুটি কোন উড়ন্ত সরীসৃপ নয়, একটা উড়োজাহাজ, আর তাতে আছে এব্‌নার পেরি ও তাদের প্রিয় সম্রাট প্রথম ডেভিডের বন্ধুর দল।

জ্যাসন গ্রিড্‌লে জনৈক যোদ্ধার হাত থেকে বর্শাটা নিয়ে তার মাথায় লাজোর মাথার রুমালটা বেঁধে একটা পতাকা তৈরী করে সংকেত করল : ও-২২০ শোন! এটা পেলুসিডার-সম্রাট প্রথম ডেভিডের নৌ-বহর ; সেনাপতি আনোরক-এর জা ; লর্ড গ্রেস্টোক, দশজন ওয়াজিরি ও জ্যাসন গ্রিড্‌লে জাহাজেই আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ও-২২০-র পিছন দিকের বুরুজে গর্জে উঠল কামান—আন্তর্জাতিক অভিবাদন-রীতির প্রথম সূচনা।

উড়োজাহাজটা আরও নীচে নেমে এলে টারজন শুধাল, তোমাদের সঙ্গে সকলেই আছে তো?

হ্যাঁ, জুপ্‌নারের জবাব ভেসে এল।

ভন হর্স্ট তোমাদের সঙ্গে আছে কি? জ্যাসনের প্রশ্ন।

না, জুপ্‌নারের জবাব।

তাহলে একমাত্র সেই হারিয়ে গেল, জ্যাসন বিষণ্ণ গলায় বলল।

তোমরা কি একটা কিছু নামিয়ে দিয়ে আমাদের তুলে নিতে পার? টারজন প্রশ্ন করল।

জুপ্‌নার চেষ্টা করে জাহাজটাকে জা'র জাহাজের পাটাতনের পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে নামিয়ে আনল। একটা ঝোলা নামিয়ে দিয়ে এক এক করে দলের সকলকেই ও-২২০-তে তুলে নিল ; প্রথমে ওয়াজিরি, তারপর জানা ও টোয়ার, তারপর জ্যাসন ও টারজন ; তিন কোরসারকে জা-র বন্দী-রূপে রেখে দেওয়া হল।

নৌ-বহরটি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। ও-২২০-ও উড়ে চলল তার মাথার উপর দিয়ে। অনেকদিন পরে একত্র হয়ে অনেক কথা আলোচনা করল, অনেক স্মৃতি-কথা শোনাল।

দূরে দেখা দিল কোরসারের উপকূল-রেখা।
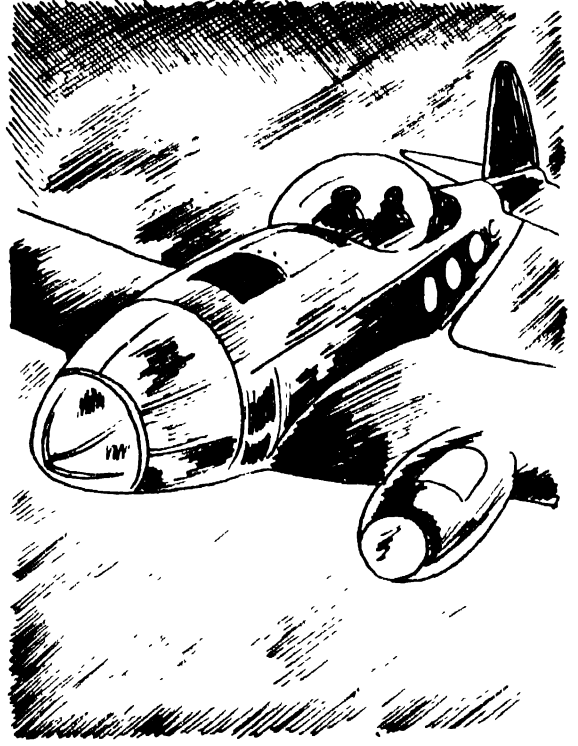
তখন একটা ঝোলা নামিয়ে দিয়ে জাকে তুলে নেওয়া হল ও-২২০-তে। সেখানে ডেভিডকে উদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হল। জা তার জাহাজে ফিরে এসে লাজো ও অপর দুই কোরসারকে ও-২২০তে তুলে দিল।

জ্যাসন ও টারজন তিন বন্দীকে সঙ্গে নিয়ে প্রকাণ্ড উড়োজাহাজটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। সব দেখে শুনে তারা তো একেবারে থ। কামান ও বোমা দেখিয়ে জ্যাসন বলল, এর একটা ছুঁড়লেই তোমাদের কিড-এর রাজপ্রাসাদটা হাজার ফুট আকাশের দিকে উড়ে যাবে। আর দেখতেই পাচ্ছ সে-রকম বোমা আমাদের হাতে অনেকগুলি আছে। আমরা ইচ্ছা করলেই গোটা কোরসার ও তার নৌ-বহরকে ধ্বংস করে ফেলতে পারি।

তারপরই ও-২২০ পূর্ণ গতিতে ছুটে চলল কোরসারের দিকে। শহরের মাথার উপর দিয়ে সেটাকে উড়তে দেখে কোরসারের রাজপথে ও গৃহ-প্রাঙ্গণে ভিড় জমে গেল। ভীত, বিস্মিত দৃষ্টিতে সকলেই তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে।

শহরের তিন হাজার ফুট উপরে জাহাজটা থামল। তিন কোরসার বন্দীকে টারজন ডেকে পাঠাল।

বলল, তোমরা জান, কোরসারকে ধ্বংস করার ক্ষমতা আমরা রাখি। পেলুসিডার-সম্রাটকে উদ্ধার করতে যে বিরাট নৌ-বহর আসছে তাও তোমরা দেখেছ। তার সঙ্গে আছে আমাদের এই উড়ো-জাহাজ। এখান থেকে আমরা শহর লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ব। তোমাদের গুলি কখনও এতদূরে পৌঁছবে না। এ অবস্থায় তোমার কি মনে হয় না লাজো যে আমরা কোরসার অধিকার করতে পারব?

আমি তা জানি, লাজো জবাব দিল।

খুব ভাল কথা, টারজন বলল। একটা সংবাদ দিয়ে আমি তোমাকে কিডের কাছে পাঠাব। তাকে তুমি সত্য কথাই বলবে তো?

বলব, লাজো জবাব দিল।

খুবই সহজ সংবাদ। তাকে বলবে, পেলুসিডারের সম্রাটকে মুক্ত করতেই আমরা এসেছি। কি ভাবে আমাদের সে দাবী আদায় করা হবে তাও তাকে বুঝিয়ে বলবে। তারপর বলবে, সে যদি সম্রাটকে জাহাজে করে নিয়ে গিয়ে আনোরক-এর জার হাতে অক্ষত অবস্থায় তুলে দেয়, তাহলে কোন গোলাগুলি না ছুঁড়ে আমরা সারিতে ফিরে যাব। বুঝেছ?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে, বলে ডর্ফের দিকে ফিরে টারজন বলল, এবার ওকে নিয়ে যাবে কি?

লাজোর হাতে একটা প্যারাশুট দিয়ে জ্যাসন বলল, এটাকে ধর। এই রিংটাকে চেপে ধর। তারপর জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়েই সেটাকে ভাল করে একটা ঝাঁকি দিও, ব্যস্—তাহলেই তুমি স্বচ্ছন্দে মাটিতে নেমে যাবে একটা হাল্কা পালকের মত।

লাজো তবু বলল, আমি মরে যাব।

জ্যাসন বলল, তুমি দেখছি ভয়ানক ভীরু। কিন্তু আমি বলছি, তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

লাজোকে কেবিনের দরজার কাছে নিয়ে ডর্ফ সেটাকে সপাটে খুলে দিল।

রিংটাকে ঝাঁকি দিতে ভুলো না, বলেই ডর্ফ সজোরে লাজোকে ঠেলে ফেলে দিল। পরমুহূর্তেই কেবিনের সকলেই দেখল, সাদা পাখনা মেলে প্যারাশুটটা বাতাসের বুকে ঝিল্‌মিল্ করছে। এবার টারজনের বাণী অবশ্যই কিডের কাছে পৌঁছবে।

একটু পরেই দেখা গেল, দলে দলে লোক চলেছে রাজপ্রাসাদ থেকে নদীর দিকে। একটা জাহাজ নোঙর তুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সারি থেকে আগত নৌ-বহরের দিকে।

ও-২২০ আকাশ-পথে তাকে অনুসরণ করে চলল, আর জার জাহাজটা এগিয়ে এল কিডের জাহাজের সঙ্গে মিলিত হতে। আর এই ভাবেই পেলুসিডারের সম্রাট ডেভিড ইনেস ফিরে গেল তার নিজের লোকজনের মধ্যে।

কোরসার জাহাজটা বন্দরে ফিরে গেল। উড়ো-জাহাজটা নেমে এল সারির নৌ-বহরের খুব কাছা-কাছি। ডেভিড ও তার উদ্ধারকারীদের মধ্যে সম্ভাষণ-বিনিময় হল—অথচ তাদের কাউকে সে আগে কখনও দেখে নি।

দীর্ঘকাল বন্দী অবস্থায় কাটাবার ফলে অর্ধভুক্ত সম্রাট খুব শুকিয়ে গেছে; শরীরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবে তার দেহ মোটামুটি অক্ষতই আছে। নিজেদের দেশে ফিরে যাবার পথে সারির জাহাজগুলোতে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল।

জ্যাসন বলল, আমি তোমাদের সঙ্গে ফিরছি না। আমাকে তোমরা জা-র জাহাজে নামিয়ে দাও।

কি বললে? টারজন চেঁচিয়ে বলে উঠল। তুমি এখানেই থেকে যাবে?

আমার কথামতই এই অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল। তাই অভিযানে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব আমার। তাই লেঃ ভন হার্স্টের ভাগ্যকে অনিশ্চিতের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি কিছুতেই বহির্জগতে ফিরে যেতে পারি না।

টারজন বলল, কিন্তু তুমি কেমন করে ভন হার্স্টকে খুঁজে পাবে?

জ্যাসন উত্তর দিল, ডেভিড ইনেসকে বলব তার সন্ধানে একটা অভিযানের ব্যবস্থা করে দিতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পেলুসিডারের স্থানীয় লোকদের নিয়ে গড়া সেই অভিযাত্রীদল ভন হার্স্টকে খুঁজে বের করতে পারবে।

টারজন বলল, তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। তুমি যদি এই নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে একান্তই ইচ্ছুক হয়ে থাক তাহলে এখনই তোমাকে জা-র জাহাজে নামিয়ে দেব।

রাইফেল, রিভলবার ও যথেষ্ট গুলি-গোলা নিয়ে জ্যাসন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। অভিযানের সঙ্গীদের কাছ থেকে একে একে বিদায় নিল।

সকলের সঙ্গে কর-মর্দন শেষ করে বলল, বিদায় জানা।

মেয়েটি জবাব দিল না। দাদার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, বিদায় টোয়ার।

বিদায়? কি বলছ তুমি জানা? টোয়ার শুধাল।

যাকে ভালবেসেছি তার সঙ্গেই ফিরে যাচ্ছি আমি, জোরামের লাল ফুলটি স্মিত হেসে জবাব দিল।

আজ প্রায় ছমাস হলো আফ্রিকার জঙ্গলের ভয়ঙ্কর গভীরে টারজন তার হারানো স্ত্রীর খোঁজ করে চলেছে দিনরাত। সে এক মৃত জার্মান ক্যাপ্টেনের ডায়েরী থেকে জানতে পেরেছে তার স্ত্রী এখনো জীবিত আছে।

একদিন গভীর রাতে বনভূমিতে অস্বাভাবিক একটা শব্দে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল টারজনের। সে উঠেই দেখল যে গাছে সে ছিল তার তলাতেই ঘাসে ঢাকা প্রান্তরটার উপর দিয়ে নগ্নপ্রায় এক শ্বেতাঙ্গ ছুটে আসছে। লোকটার পিছনে একটা সিংহ তাকে তাড়া করে আসছিল। সিংহটা আর একমুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়বে লোকটার উপর। টারজন তাই একলাফে সিংহ আর শ্বেতাঙ্গ লোকটার মাঝখানে নেমে পড়ল।

টারজনকে সামনে পেয়েই সিংহটা তার একপাশে থাবা বসিয়ে একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করল। কিন্তু টারজন সেদিকে নজর না দিয়ে সিংহটার পিঠের উপর চেপে তার ছুরিটা সিংহটার বুকের দিকে বসিয়ে দিতে লাগল। শ্বেতাঙ্গ লোকটাও তার হাতে যে একটা ধারাল খাঁড়া ছিল তাই দিয়ে সিংহটার মাথার উপর জোরে একটা কোপ বসিয়ে দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সিংহটা মারা গেল।

সিংহটার মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে টারজন তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এক বিকট চীৎকার করল চাঁদের দিকে তাকিয়ে। লোকটা ভয় পেয়ে কিছুটা সরে গেল। কিন্তু টারজন তার ছুরিটা খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে তার দিকে ফিরে দাড়াতে লোকটা আর ভয় পেল না।

টারজন এবার লোকটার সঙ্গে বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু সে টারজনের কোন কথাই বুঝতে পারল না। তখন টারজন লোকটার বাঁ হাতটা টেনে তার বুকের উপর রেখে লোকটার বুকের উপর নিজের ডান হাতটা রাখল। লোকটা এবার বুঝতে পারল এই অচেনা লোকটি তার জীবন বাঁচানোর পর তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চাইছে।

এরপর টারজন তার পেটে হাত দিয়ে লোকটিকে খাবার জন্য ইশারা করল।

টারজন তার সঙ্গীর আনা যখন সেই বাদাম, ফলমাকড় আর শুকনো মাংসগুলো খাচ্ছিল দুজনে তখন ওরা খেয়াল করেনি গাছের উপর থেকে একটা কালো রঙের বিরাটকায় লোমশ প্রাণী ওদের দিকে তাকিয়ে আছে কুটিল দৃষ্টিতে। সেই অদ্ভুত বিরাটকায় প্রাণীটার উপর টারজনের চোখ পড়তেই সে দেখল

এই প্রাণীটার সঙ্গে তার সঙ্গীর চেহারার অনেক মিল রয়েছে। দুজনকেই মানুষের মত অনেকটা দেখতে। দুজনেরই লেজ আছে। দুজনেরই অস্ত্রশস্ত্র এক এবং হাঁটার ভঙ্গিমাও এক। দুজনেই এক ভাষায় কথা বলে। তবে আগন্তুক সঙ্গী প্রাণীটির গোটা গাটা বড় বড় লোমে ঢাকা আর অচেনা আগন্তুক প্রাণীটির রংটা কালো ; কিন্তু তার সঙ্গীর রংটা সাদা।

অচেনা প্রাণীটা গাছ থেকে টারজনের সঙ্গীটির সামনে নেমে পড়ল লাফ দিয়ে। তারপর তার হাতের লাঠিটা তার মাথায় এমন জোরে মারল যে সে অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

টারজন যখন দেখল তার সঙ্গী অচেতন হয়ে পড়ে গেছে তখন সে আগন্তুক জন্তুটাকে একটা ঘুষি মেরে আক্রমণ করল।

টারজন এবার দেখল মাটির উপর অচেতন হয়ে এতক্ষণ পড়ে থাকা তার সঙ্গীটি চোখ মেলে তাকিয়েছে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে এখন সুস্থ হয়ে উঠেছে। সে উঠে দাঁড়াতেই আগন্তুক গোরিলাটা তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। টারজন দেখল তারা পরস্পরের কথা বুঝতে পারছে এবং তাদের হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গী দেখে মনে হলো তারা এখন বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চায় নিজেদের মধ্যে।

এরপর তারা দুজনে মিলে যাবার জন্য উদ্যত হয়ে টারজনকে তাদের সঙ্গে ইশারায় যেতে বলল।

টারজনও দেখল ওদের সঙ্গে গিয়ে এ অঞ্চলের অজানা জায়গাগুলোকে জেনে নেওয়া ভাল। তাতে জেনকে খোঁজার কাজ সহজ হবে। সে তাই কোন আপত্তি না করে তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল।

তিন দিনের দিন ওরা একটা ছোট পাহাড়ের পাদদেশে একটা বড় গুহার কাছে এসে থামল। এই গুহাটাতেই আশ্রয় নিল ওরা।

দেওয়ালে ওরা যে নাম লিখল তার থেকে ওদের

সাহায্যে টারজন বুঝল লোমহীন সাদা গোরিলাটির নাম হলো তাদেন আর লোমশ কালো গোরিলাটির নাম ওমং। তারা দুজনেই টারজনকে তাদের ভাষা শেখাতে লাগল এবং অল্পদিনের মধ্যেই টারজন ওদের ভাষায় কথা বলতে শিখল।

টারজন তখন তার স্ত্রী জেনের চেহারার বর্ণনা দিয়ে তাকে তারা কোথাও দেখেছে কি না তা জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু তারা বলল, একমাত্র টারজন ছাড়া অন্য কোন মানুষ জীবনে তারা দেখেনি কখনো।

তাদেন বলল, আমার বাড়ি হচ্ছে আলুর।

টারজন বলল, আলুর কোথায় ?

তাদেন বলল, আমাদের দেশ আলুর হচ্ছে ঐ পাহাড়গুলোর ওপারে। কোতান যতদিন বেঁচে থাকবে আমি সেখানে ফিরে যাব না।

টারজন জিজ্ঞাসা করল, কোতান কে ?

তাদেন বলল, সে হচ্ছে সেখানকার রাজা। আমি

তার সৈন্যবিভাগে কাজ করতাম। তার মেয়ে ওলোয়াকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু কোতান আমাকে দেখতে পারত না। তাই কৌশলে মারার জন্য ভাকাত নামে এক বিদ্রোহী গ্রাম্য সর্দারকে দমন করার জন্য আমাকে পাঠায় কোতান। কিন্তু তার সে চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। কারণ আমি ভাকাতকে পরাজিত ও বন্দী করি এবং সেখানকার বিদ্রোহ দমন করে গৌরবের সঙ্গে ফিরে আসি। কিন্তু কোতান আমাকে দেখে আরো রেগে উঠল আগের থেকে। আমার বাবা জাদন হচ্ছেন সিংহমানুষ। আলুরের বাইরে একটা বড় গাঁয়ের সর্দার তিনি। আমাদের দেশে মন্দিরের পুরোহিতদের আমরা খুবই শ্রদ্ধা করি। রাজা যদি একবার কাউকে পুরোহিত পদে নিযুক্ত করে তাহলে সে পদ প্রত্যাখ্যান করা মানেই দেব-দ্রোহিতা বা ধর্মদ্রোহিতা করা। কিন্তু পুরোহিতরা বিয়ে করতে পারে না জীবনে। কুটিল কোতান তাই আমাকে পুরোহিত পদে নিযুক্ত করে আমার বিয়ে হওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিতে চাইল চিরদিনের মত।

একদিন ওলোয়া এসে আমাকে খবর দিল, তার বাবার দূত আমাকে মন্দিরে নিয়ে যাবার জন্য আসছে। তখন আমি পাঁচিল ডিঙিয়ে নগর পার হয়ে পালিয়ে এলাম।

টারজন বলল, সেখানে যাওয়ার দারুণ ঝুঁকি আছে বিপদের।

তাদেন বলল, ঝুঁকি আছে বটে, কিন্তু এমন কিছু নয়। আমি যাবই।

টারজন বলল, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। কারণ আমি তোমাদের শহরটা দেখব এবং আমার স্ত্রীরও খোঁজ করব একবার। ওমৎ, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে?

ওমৎ বলল, কেন যাব না? আমাদের জাতির লোকেরা আলুরের উপর দিকের পাহাড়গুলোতে বাস করে। আমাদের সর্দারের নাম হলো ঈসাৎ। ঈসাৎ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেখানে পানাৎ লী নামে একটা মেয়ে আছে যাকে দেখে আমি খুশি হব এবং সেও আমাকে দেখে খুশি হবে।

ওমৎ বলল, তাহলে এগিয়ে চল।

এবার তিনজনে বিপদসংকুল পাহাড়ী পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

এরপর ওমৎ তাদের এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল যার এক রহস্যময় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল টারজন। চারদিকে সাদা ধবধবে পাহাড় দিয়ে ঘেরা সবুজ ঘাসে ঢাকা এক বিরাট উপত্যকা দেখতে পেল ওরা। মাঝখানে স্বচ্ছনীল জলে ভরা একটা নদী বয়ে যাচ্ছিল। তারই মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আলুর নগরী।

ওমৎ বলল, আমরা উপত্যকাটা দিয়ে এগিয়ে যাব। বাঁদিকের পাহাড়গুলোর গুহায় আমাদের জাতির লোকরা থাকে। আমি পানাৎ লীকে আবার দেখব। তাদেনও তার বাবার সঙ্গে দেখা করবে। টারজন আলুরে গিয়ে তার স্ত্রীর খোঁজ করবে।

তাদেন বলল, আমরা এখন যতক্ষণ পারব এক-সঙ্গেই তিনজন থাকব। ওমৎ রাত্রিবেলায় পানাৎলীর সঙ্গে দেখা করবে চুপি চুপি। কারণ আমরা তিনজনে একসঙ্গে গেলেও ঈসাতের যোদ্ধাদের আমরা পরাস্ত করতে পারব না।

টারজন একাই কি মনে করে আলুর নগরীর দিকে হাঁটতে শুরু করে দিল। নগরীর বাইরে পৌঁছতেই একজন হোদন যোদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

টারজনই প্রথমে কথা বলল তার সঙ্গে। বলল, তোমাদের রাজা কোতানের সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দেবে।

হোদন যোদ্ধা বলল, আমাদের এই নগরদ্বারে একমাত্র শত্রু বা ক্রীতদাস ছাড়া বাইরের আর কেউ আসে না।

টারজন উত্তর করল, আমি শত্রু বা ক্রীতদাস কিছুই নই। আমি দেবতা জাদ-বেন-ওথোর কাছ থেকে আসছি।

হোদন যোদ্ধা আশ্চর্য হয়ে বলল, সত্যিই তুমি জাদ-বেন ওথোর লোক? তা হলে তুমি হোদন বা ওয়াজদন কেউ নও, আর তোমার লেজও নেই। এস আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে রাজা কোতানের কাছে নিয়ে যাব।

এই বলে সে নগরীর ভিতর দিয়ে টারজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

টারজনের পথপ্রদর্শক সেই হোদন যোদ্ধা টার-জনকে নিয়ে নগরদ্বারে যেতেই বারোজন প্রহরী ঘিরে ধরল তাদের। একজন যোদ্ধা প্রাসাদের ভিতরে রাজা কোতানকে খবর দিতে গেল। পনের মিনিট পরে একজন যোদ্ধা এসে টারজনকে খুঁটিয়ে দেখে বলল, কে তুমি? রাজা কোতানের কাছ থেকে কি চাও তুমি?

টারজন বলল, আমি কোতানের বন্ধু, কোতানের সঙ্গে দেখা করার জন্য জাদ-বেন-ওথোর দেশ থেকে এসেছি।

টারজনের কথায় হোদন যোদ্ধারা ইতস্ততঃ করতে লাগল। তাদের একজন তাকে বলল, তুমি কেমন করে এখানে এলে?

টারজন তখন রেগে গিয়ে বলল, ওথোর রোষ থেকে যদি বাঁচতে চাও তাহলে আমাকে এখনি রাজা কোতানের কাছে নিয়ে চল।

এ কথায় হোদনরা ভয় পেয়ে গেল সবাই।

প্রথমে জাদ-বেন-ওথোর দূত ও পরে পুত্র হিসাবে পরিচয় দিল টারজন। তার এই শেষের কথাটায় কাজ হলো।

যে হোদন যোদ্ধাটি টারজনের সঙ্গে কথা বলছিল সে টারজনকে ভয়ে ভয়ে বলল, হে ডোর-উল-ওথো, হতভাগ্য ডাকলতের উপর দয়া করো।

এই বলে সে পাশের লোকদের সরিয়ে টার-জনকে সঙ্গে করে কোতানের প্রাসাদে নিয়ে গেল।

ডাকলৎ রাজা কোতানের পানে তাকিয়ে বলল, হে রাজন, একবার দেখ আমাদের একমাত্র দেবতা

জাদ-বেন ওথো তার ছেলেকে দূত হিসাবে পাঠিয়ে আমাদের কত অনুগ্রহ করেছেন।

উঠে দাঁড়াল কোতান। এক গভীর কৌতূহল আর আগ্রহের সঙ্গে দেখতে লাগল আগন্তুককে।

এদিকে টারজন তখন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার হাত দুটো আড়াআড়িভাবে তার বুকের উপর চাপানো ছিল।

অবশেষে রাজসভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সিংহাসন থেকে ডাকলৎকে উদ্দেশ্য করে কোতান বলল, কে তোমাকে বলেছে যে আগন্তুক ডোর-উল-ওথো ?

ডাকলৎ টারজনকে দেখিয়ে উত্তর করল ভয়ে ভয়ে, উনি বলেছেন।

কোতান বলল, আর তাই বিশ্বাস করতে হবে সত্য বলে ?

ডাকলৎ বলল, শোন কোতান, তুমি নিজের চোখে যা দেখছ তা সত্য বলে মেনে নেওয়াই উচিত। তুমি দেখ, ওঁর চেহারাটা সত্যিই দেবতার মত, ওঁর হাত পা আমাদের হাত পা থেকে আলাদা। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের পরম পিতা ওথোর মতই উনি লেজহীন।

এগুলো সত্যিই আগে ভাল করে দেখেনি কোতান। দেখে সত্যিই সে অবাক হয়ে গেল। এমন সময় একজন যুবকবয়সী হোদন যোদ্ধা ভিড় সরিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, হ্যাঁ, কোতান, ডাকলতের কথাই ঠিক। আমরা যখন গতকাল কোর উল লুন থেকে বন্দীদের ধরে নিয়ে আসছিলাম তখন আমি এই দেবতাকে একটা ভয়ঙ্কর জন্তুর পিঠের উপর চড়ে আসতে দেখেছিলাম। ব্যাপারটা দেখেই ভয়ে পালিয়ে যাই আমরা বনের আড়ালে। কোন মানুষের পক্ষে কোর উল অরণ্যের গ্রীফ নামে ঐ ভয়ঙ্কর জন্তুকে বশ করে তার পিঠে চড়ে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

এই কথার বেশীর ভাগ সভাসদ বিগলিত হয়ে পড়ল। তাদের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না।

কোতান তখন টারজনকে বলল, তুমি যদি সত্যিই ডোর উল-ওথো হও তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে আমার এই অবিশ্বাস আর সংশয় একেবারে অমূলক নয়, কারণ আমাদের দেবতা জাদ-বেন ওথো যে দয়া করে তাঁর পুত্রকে আমাদের কাছে পাঠাচ্ছেন সে কথা ত কোনভাবে জানাননি আমাদের। তাছাড়া আমরা কি করে জানব যে তাঁর পুত্র আছে ?

টারজন বলল, রাজার উপযুক্ত কথাই বলেছ। জাতীয় দেবতা সম্পর্কে এই ধরনের ভয় আর সম্মানের সঙ্গে কথা বলা উচিত। জাদ-বেন-ওথো জানতে চান তুমি ঠিকমত কাজকর্ম করছ কিনা। তা দেখার জন্যই তিনি আমায় পাঠিয়েছেন এখানে। আমি এসে প্রথমেই যা দেখেছি তাতে বুঝেছি তুমি সত্যিই রাজা হবার উপযুক্ত।

রাজা কোতান তখন পিরামিডের মত সিংহাসন থেকে নেমে তাকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানিয়ে সিংহাসনে তার পাশে বসার জন্য আহ্বান জানাল।

টারজন সেই পিরামিডের উপর উঠে পাথরের যে বেঞ্চটায় কোতান বসত তার উপর বসল। ঐটাই ছিল কোতানের সিংহাসন। কিন্তু তার পাশে কোতান বসতে গেলে সে তাকে বাধা দিয়ে বলল, দেবতার পাশে কোন মানুষকে বসতে নেই।

টারজন বসার পর কোতানকে বলল, তবে দেবতা তার বিশ্বস্ত ভক্তকে তার পাশে বসার জন্য আহ্বান করতে পারে। এস কোতান, আমি তোমাকে জাদ-বেন-ওথোর নামে বসতে বলছি আমার পাশে।

কোতান তার আসনে টারজনের পাশে বসলে রাজসভার কাজকর্ম আবার শুরু হলো। টারজন হঠাৎ এসে পড়ায় সভার কাজ সব বন্ধ ছিল এতক্ষণ।

একসময় সভার কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে কোতান নিজে সঙ্গে করে মন্দির দেখাতে নিয়ে গেল টারজনকে। টারজন দেখল মন্দিরটা রাজপ্রাসাদেরই একটা অংশ। সেই মন্দিরের ভিতর নানা আকারের বেদী ছিল। সেই সব বেদীর অনেকগুলোতে লাল রং লেগে ছিল। টারজন তার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে বুঝতে পারল ওগুলো শুকিয়ে যাওয়া মানুষের রক্তের দাগ।

টারজন দেখল প্রধান পুরোহিত লুদেনের চোখে মুখে তার দেবত্ব সম্বন্ধে এক সংশয়ের ছাপ ফুটে রয়েছে। তবু সে তার আচরণের মধ্যে এক আপাত আনুগত্যের ভাব দেখাচ্ছে। টারজন দেখল এখন তার একমাত্র ভয় লুদেনকে। প্রধান পুরোহিত হিসাবে একমাত্র সেই তার প্রতারণাকে ধরে ফেলতে পারে।

মন্দিরে ঘুরতে ঘুরতে টারজন দেখল অনেক ওয়াজদন ক্রীতদাস একটা ঘেরা জায়গার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হোদনরা ওয়াজদনদের গাঁয়ে গিয়ে তাদের ধরে এনেছে।
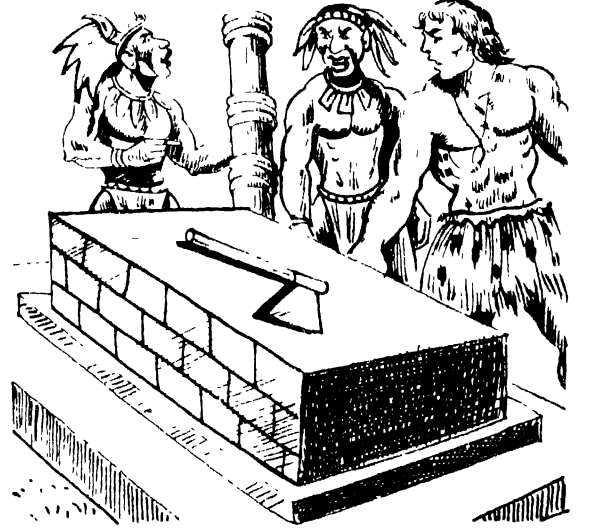
টারজন একসময় লুদেনকে জিজ্ঞাসা করল, এরা কারা ?

লুদেন বলল, জাদ বেন ওথোর পুত্র একথা ভালই জানেন।

টারজন শান্তভাবে বলল, ডোর-উল-ওথোর কোন প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করতে নেই। মনে রেখ ভণ্ড পুরোহিতের রক্ত জাদ-বেন-ওথোর প্রিয় বস্তু।

লুদেন তখন বলল, প্রতিদিন তোমার পিতা জাদ-বেন-ওথো দিনের শেষে পশ্চিম দিকে অস্ত গেলে ঐ সব ক্রীতদাসদের একজনের রক্ত দিয়ে পূব দিকের বেদীটা ধুয়ে দিতে হয়।

টারজন বলল, কে তোমাদের বলল যে জাদ-বেন ওথো তার সৃষ্ট মানুষদের রক্ত চান ? তার বেদীর উপর মানুষ খুন করতে কে বলল তোমাদের ?

লুদেন বলল, তাহলে কি হাজার হাজার মানুষ বৃথা রক্ত দান করছে ?

কোতান, অন্যান্য যোদ্ধারা, পুরোহিতরা এবং ক্রীতদাসরা টারজনের কথাগুলো সব শুনছিল। টারজন বলল, ঐ সব ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দাও। জাদ-বেন ওথোর নামে আমি বলছি তোমরা ভুল করছ।

লুদেনের মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। সে চীৎকার করে তার পাশের পুরোহিতদের বলল, জাদ-বেন-ওথোর পুত্র বলেছেন। অতএব বন্দীদের ছেড়ে দাও। তাদের মুক্ত করে যেখান থেকে এনেছ সেখানে পাঠিয়ে দাও।

ক্রীতদাসরা সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হয়েই টারজনের সামনে তারা প্রণিপাত হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম জানাল।

কোতান তখন ভয়ে ভয়ে বলল, তাহলে কি করলে জাদ-বেন-ওথো তুষ্ট হবেন?

টারজন বলল, যদি তাঁকে তোমরা তুষ্ট করতে চাও তাহলে তাঁর বেদীতে এমন সব খাদ্য ও উপহার পুজো হিসাবে দাও যেগুলি পরে শহরের গরীব দুঃখীদেব মধ্যে বিতরণ করা যাবে। এইভাবেই তোমরা দেবতার অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে টাবজন একা একা প্রাসাদের চারদিক ঘুবে দেখতে লাগল। প্রাসাদের কেন্দ্রস্থলে চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেল সে। জায়গাটার মাথার উপবে কোন ছাদ নেই এবং পাঁচিলটার গায়েও কোন জানালা দরজা নেই। পাঁচিলের গায়ে এক জায়গায় একটা গাছ ছিল। টারজন সেই গাছটায় উঠে পড়ে গাছের উপর থেকে চারদিকে তাকাতে লাগল। সে দেখল পাঁচিলঘেরা সেই জায়গাটা আসলে একটা ঘেরা বাগান।

বাগানের মাঝে ঘুরতে ঘুরতে টারজন একসময় দেখতে পেল একজন সুন্দরী হোদন যুবতী তার সোনার বক্ষ বন্ধনীর উপর চেপে ধরে একটি পাখিকে আদর করছে আর তার পাশে একজন ওয়াজদন তরুণী বসে রয়েছে।

টারজন দেখল এই তরুণীই পানাৎ লী এবং তারই সে খোঁজ করছে গতকাল থেকে।

হোদন যুবতীটি তখন টারজনকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, হে অতিথি, কে আপনি?

পানাৎ লী বলল, গতকাল রাজসভায় যে অতিথি আসে তার কথা শোননি?

যুবতীটি আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনিই তাহলে ডোব-উল-ওথো?

টারজন বলল, হ্যাঁ। তুমি কে?

যুবতীটি বলল, আমি রাজা কোতানের কন্যা, নাম ওলোয়া।

টারজন বুঝল এই ওলোয়াই হলো তাদেনের প্রেমিকা। সে এবাব ওলোয়ার কাছে এসে বলল, হে কোতানকন্যা, জাদ-বেন-ওথো তোমার উপর তুষ্ট হয়ে অনুগ্রহ করে তোমার প্রেমাস্পদকে বহু বিপদ আপদের কবল থেকে উদ্ধার করে আজও নিরাপদে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ওলোয়া বলল, কিন্তু বুলাতের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে বলে বাবা কথা দিয়েছে।

টারজন বলল, কিন্তু বুলাৎকে তুমি ত ভালবাস না। তাছাড়া তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েই তাদেনকে উদ্ধার করেছেন।

এই বলে টারজন উপরে মুখ তুলে বলল, থাম, জাদ-বেন-ওথো কি বলে শুনি।

উপরে মুখ তুলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, ওঠ, জাদ-বেন-ওথো আমাকে আকাশবাণীর মাধ্যমে বললেন, এই ক্রীতদাসী তরুণী পানাৎ লী। এর বাড়ি হলো কোর-উল-জা যেখানে তাদেন আছে।

ওলোয়া আর পানাৎ লী টারজনের সামনে নতজানু হয়ে বসেছিল। ওলোয়া উঠে দাঁড়িয়ে পানাৎ লীর মুখের দিকে তাকাল। পানাৎ লী বলল, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে।

ওলোয়া তখন টারজনের পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলল, জাদ-বেন-ওথোর অসীম দয়া আমার উপর। আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে।

টারজন বলল, যদি পানাৎ লীকে তোমরা তার বাড়িতে পাঠিয়ে দাও তাহলে আমার পিতা সন্তুষ্ট হবেন তোমাদের উপর।

ওলোয়া বলল, এ ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমার বাবাকে একথা জানাবে সে।

সহসা পিছনের ঝোপ থেকে কে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করে উঠল।

ওরা সবাই পিছন ফিরে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখল রাজা কোতান কখন এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পিছনে।

টারজনকে দেখতে পেয়েই কোতান বলল, ও, আপনি ডোব-উল-ওথো? কিন্তু এখানে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে দেবতাদেরও যাওয়া নিষিদ্ধ, যেমন এই নিষিদ্ধ উদ্যান। আসুন ডোব-উল-ওথো।

এরপর কোতান অন্য একটি পথ দিয়ে টারজনকে নিয়ে একটা ছোট ঘরে ঢুকল।

দরজার সামনেই প্রধান পুরোহিত লুদন দাঁড়িয়েছিল। টারজন তার চোখেমুখে এক কুটিল চক্রান্তের

ভাব লক্ষ্য করল। কিছুক্ষণ পর একজন যোদ্ধা ঘরের ভিতরে ঢুকে কোতানকে বলল, প্রধান পুরোহিত আপনাকে মন্দিরে ডাকছেন।

কোতান বলল, তাঁকে বল আমি যাচ্ছি।

এই বলে টারজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল কোতান, আমি এখনি আসছি ডোব উল-ওথো।

কিন্তু কোতান ফিরে এল এক ঘণ্টা পরে। কোতানের পানে তাকিয়েই চমকে উঠল টারজন। তার চোখে মুখে ভয়ের স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে ছিল। তার হাতদুটো কাঁপছিল।

টারজন বলল, কোন দুঃসংবাদ আছে কোতান?

কোতান কিন্তু উত্তর দিল না একথার। সহসা মুখ তুলে তার যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে বলল, ধরো ওকে, কারণ প্রধান পুরোহিত লুদন বলছে, ও প্রতারক।

কোতান আরও বলল, লুদন বলছে, তুমি জাদ-বেন-ওথোর পুত্র নও। তোমাকে অভিযোগকারীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তোমার বিচার হবে।

মনে রাখবে এসব ব্যাপারে রাজার কোন হাত নেই। তাঁকে প্রধান পুরোহিতের নির্দেশ মেনে চলতে হয়।

অবশেষে ঠিক হলো বিচার হবে মন্দিরে। লুদন টারজন ও কোতানকে একটি বড় বেদীর কাছে নিয়ে গেল। সেখানে একটা উঁচু জায়গার উপর টারজনকে বসতে বলল লুদন। টারজন দেখল বেদীর উপর একটি জলভরা গামলার মধ্যে এক নবজাত শিশুর মৃতদেহ রয়েছে।

টারজন লুদনকে জিজ্ঞাসা করল, এর মানে কি?

কুটিল হাসি হেসে লুদন বলল, দেবতা হয়ে তুমি এটা জান না? এই না জানাটাই তোমার দেবত্ব সম্বন্ধে দাবির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সর্বজ্ঞ দেবতার পুত্র হয়েও একথাটা তুমি জান না যে প্রতিদিন সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন এক বয়স্ক ব্যক্তিকে পূব দিকের একটি বেদীতে বলি দেওয়া হয় তেমনি প্রতিদিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি নবজাত শিশুকে বলি দেওয়া হয় পশ্চিম দিকের বেদীতে। য কথা প্রতিটি হোদন শিশু জানে, সেকথা তুমি জাদ বেন ওথোর পুত্র হয়েও জান না।

এই বলে লুদন একজন কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসকে ডাকল। সে ভয়ে ভয় এগিয়ে এলে লুদন টারজনকে দেখিয়ে বলল, বল তুমি এর সম্বন্ধে কি জান?

সেই ওয়াজদন ক্রীতদাসটি বলল, আমি কোর-উল লুনের এক অধিবাসী। দিনকতক আগে কোর-উল জার একদল যোদ্ধার সঙ্গে আমাদের লড়াই হয়। ও তখন কোর-উল-জার পক্ষে লড়াই করছিল। ওকে তারা টারজন-জাদ-গুরু বলে ডাকছিল। কিন্তু ও দেবতা নয়। কারণ একসময় ওর পিছন থেকে একজন ওর মাথায় একটা লাঠির ঘা মারতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায় এবং তখন আমাদের লোকরা ওকে বন্দী করে নিয়ে যায়। পরে ও প্রহরীকে হত্যা করে সেখান থেকে পালিয়ে আসে।

জাদন বলল, একজন দেবতার বিরুদ্ধে একজন ক্রীতদাসের একথা মেনে নেওয়া উচিত নয়।

লুদন বলল, রাজকন্যার কথা হয়ত বেশী গ্রহণযোগ্য হবে আপনার পক্ষে।

কোতান লুদনকে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আমার মেয়ে এ সম্বন্ধে কি জানে? তুমি নিশ্চয় আমার মেয়েকে সর্বসমক্ষে হাজির করাবে না।

লুদন বলল, না, তাঁর দাসীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে।

এই বলে একজন অধীনস্থ পুরোহিতকে পানাৎ লীকে আনার জন্য হুকুম করল লুদন।

পানাৎ লীকে আনা হলে লুদন বলল, পানাৎ লী নামে এই মেয়েটিকে গতকাল যখন ধরে আনা হয় তখন সে বলেছিল এই লোকটিই তাকে কোর-উল-গ্রীফের অরণ্যে একজন তেরোদন আর দুটো ভয়ঙ্কর জন্তুর হাত থেকে উদ্ধার করে। পরে সে তার দেশ কোর উল-জার পথে যাবার সময় ধরা পড়ে আমাদের হাতে।

লুদন আবার বলল, এর দ্বারা এই কথাই প্রমাণ

হয় না কি যে এই লোকটা কোন দেবতার পুত্র নয় ?

পানাৎ লী বলল, কিন্তু ওঁকে দেখে মানুষ বলেও মনে হয়নি ।

লুদন আবার জিজ্ঞাসা করল পানাৎ লীকে। বলল, ও কি তোমাকে একথা বলেছিল যে ও দেবতা জাদ-বেন-ওথোর পুত্র ?

পানাৎ লী ভয়ে ভয়ে বলল, না ।

লুদন বলল, খুব হয়েছে। আর না। এই কে আছ, ওকে বন্দী করো। আগামীকালই জাদ-বেন-ওথোর নির্দেশমত ওকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে ।

যোদ্ধারা পুরোহিতদের মধ্যে সবচেয়ে আগে যে লোকটা হাত বাড়িয়ে টারজনকে ধরতে গেল, টারজন সেই লোকটার একটা হাত আর পা বজ্রমুষ্টিতে ধরে বেদীর উপর তুলে ধরল। তারপর লুদন ছুরি হাতে টারজনের দিকে এগিয়ে গেলে টারজন সেই পুরোহিতের দেহটা সজোরে লুদনের গায়ের উপর ছুঁড়ে দিল। লুদন টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল ।

এই অবকাশে টারজন বেদীর পিছনের দিকে নগরপ্রাচীরের যে অংশ ছিল তার উপরে বেদী থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। সেখান থেকে আবার লাফ দিয়ে একেবারে আলুর নগরীর বাইরে চলে যাবার আগে বলে গেল সে, মনে ভেবো না জাদ-বেন-ওথো তার পুত্রকে ত্যাগ করেছেন ।

এই বলে নগরপ্রাচীর থেকে লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ।

আলুরের মন্দিরের মাঝে পুরোহিতরা যখন টারজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখন একজন নগ্ন বিদেশী রাইফেল হাতে পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকা পার হয়ে কোর-উল-জার দিকে এগিয়ে চলেছিল। সে দেখল একজন লম্বা শ্বেতাঙ্গ শিকারে যাচ্ছে।

তার হাতে ছিল একটা মোটা লাঠি আর একটা ছুরি খাপের মধ্যে কোমরে ঝোলানো ছিল। এই শিকারী হলো তাদেন ।

তাদেন দেখল টারজন যে জাতির লোক এই বিদেশীও সেই জাতির লোক। বিদেশী হাত তুলে বোঝাতে চাইল সে শান্তি ও বন্ধুত্ব চায় ।

তাদেন বিদেশীকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে ?

বিদেশী বলল, সে তার ভাষা বুঝতে পারছে না। বিদেশী তাদেনের লেজ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। তাদেন তাকে হাবভাবে বুঝিয়ে দিল সে শিকার করে বেড়াচ্ছে ।

কিন্তু আপাততঃ শিকারের কথা ভুলে গিয়ে তাদেন বিদেশীকে তার বন্ধু ওমতের কাছে নিয়ে যেতে চাইল। তার এই মনের কথাটা বিদেশীকে বুঝিয়ে দিতে সেও রাজী হয়ে গেল। তখন তারা দুজনেই কোর-উল-জার পথে এগিয়ে যেতে লাগল ।

ওমৎ তখন তার গুহায় ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওমৎ এসে গেল ।

তাদেন ওমৎকে বলল, আমার মনে হয় এই বিদেশী টারজনকেই খুঁজছে।

বিদেশী টারজনের নাম শুনে বলল, হ্যাঁ আমি টারজনকেই খুঁজছি।

এরপর বিদেশী বিভিন্ন দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে ওমতের কাছ থেকে জানতে চাইল টারজন এখন কোথায় এবং কোনদিকে গেছে।

তার উত্তরে ওমৎ তাকে জানাল আজ থেকে পাঁচ দিন আগে টারজন ঐ পাহাড়ের উপর নিয়ে কোথায় গেছে তা কেউ জানে না।

তখন বেদেশী একাই পাহাড় পার হয়ে টারজনের খোঁজে বেরিয়ে যেতে চাইল।

ওমৎ বলল, চল আমরাও ওর সঙ্গে যাই। আমাদের লোকদের হত্যা করার জন্য আমরা কোর-উল-লুনের লোকদের শাস্তি দেব।

তাদেন বলল, আগামী কাল সকাল পর্যন্ত বিদেশীকে অপেক্ষা করতে বল। কাল আমরা অনেক যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে যাব।

ওমৎ মেনে নিল তাদেনের কথাটা। রাত্রিবেলায় বিদেশী একটি গুহাতে রাত কাটাল।

পরদিন সকালেই ওমৎ একশোজন যোদ্ধাকে সঙ্গে করে কোর-উল-লুনের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযানে বার হল। তার সঙ্গে সেই শ্বেতাঙ্গ বিদেশী এবং বন্ধু তাদেনও রইল।

মন্দিরের পাঁচিলটা পার হয়ে মাটিতে লাফ দিয়ে নেমে পানাৎ লীর কথা ভাবতে লাগল টারজন। সে এখনো মুক্তি পায়নি। কিন্তু এখন এতসব শত্রুর মাঝখানে আবার ফিরে গিয়ে পানাৎ লীর খোঁজ করে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

অবশেষে টারজন ঠিক করল প্রাসাদের উঠোন দিয়ে না গিয়ে সে মন্দিরের তলা দিয়ে যে সব ঘর ও বারান্দা আছে তার ভিতর দিয়ে যাবে।

মন্দিরসংলগ্ন পাঁচিলটা আবার পার হয়ে মন্দিরের ভিতরে ঢুকতেই টারজন দেখল সেখানে বিশেষ কেউ নেই, কারণ পুরোহিতরা সব তাকে খোঁজার কাজে ব্যস্ত। তাই দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল। একসময় একজন পুরোহিত তার সামনে হঠাৎ এসে পড়তেই টারজন অতর্কিতে তার ছুরিটা পুরোহিতের বুকে বসিয়ে দিল। তার দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই টারজন তার মাথার পোশাকটা তুলে নিজের মাথার উপর চড়িয়ে নিল আর তার লেজটা কেটে নিয়ে তার পরনের কৌপীনের সঙ্গে যুক্ত করে সেটা হাতে ধরে রইল। তারপর আবার নিষিদ্ধ বাগানের দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ পর টারজন দেখল ওলোয়া চিন্তান্বিত অবস্থায় বাগানের মধ্যে ঢুকল। কিছুক্ষণের মধ্যে একদল লোক বাগানের মধ্যে এসে সোজা রাজকন্যা ওলোয়ার সামনে এসে বলল, যে বিদেশী লোকটি নিজেকে জাদ-বেন-ওথোর পুত্র ডোর-উল-ওথো নামে নিজেকে ঘোষণা করেছে সে আসলে ভণ্ড প্রতারক। সে পালিয়ে গেছে। আমরা তাকে এই নিষিদ্ধ

বাগানে খুঁজতে এসেছি।

ওলোয়া আশ্চর্য হয়ে বলল, কই? আমি ত দেখিনি তাকে। এ বাগানে আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

তখন অনুসন্ধানকারী পুরোহিতরা বাগান ছেড়ে চলে গেল। তারা চলে যেতেই ব্যস্তভাবে ছুটতে ছুটতে পানাৎ লী এসে হাজির হলো। তাকে দেখেই ওলোয়া প্রশ্ন করল, কি হয়েছে পানাৎ লী?

পানাৎ লী বলল, কি বলব রাজকুমারী, ওরা সেই বিদেশীকে মেরে ফেলত।

ওলোয়া বলল, কিন্তু সে ত পালিয়ে গেছে।

পানাৎ লী বলল, হ্যাঁ, ওরা তার খোঁজ করছে।

ওলোয়া বলল, কিন্তু সে ত ভণ্ড প্রতারক।

পানাৎ লী বলল, তাকে তুমি চেন না রাজকুমারী।

ওলোয়া বলল, তাহলে তার সম্বন্ধে তুমি কি জান?

পানাৎ লী বলল, সে দেবতার পুত্র কি না জানি না, তবে সে যে সাধারণ মানুষের থেকে অনেক উর্ধ্বে একথা জোর করে বলতে পারি।

ওলোয়া বলল, সত্যিই সে বড় এক আশ্চর্যজনক লোক। হয়ত লুদনই তাকে চিনতে ভুল করেছে।

পানাৎ লী বলল, সে বেঁচে থাকলে ঠিক সে কোন না কোন উপায়ে তাদেনের হাতে তোমাকে তুলে দিত।

ওলোয়া বলল, আর কোন উপায় নেই। কারণ আগামী কালই বুলাতের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

এবার ওলোয়া ফুল তুলতে তুলতে হঠাৎ টারজন যেখানে লুকিয়েছিল সেখানে এসে পড়ল। টারজনকে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল ওলোয়া। কিন্তু টারজন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভয়ের কিছু নেই রাজকুমারী, আমি তাদেনের বন্ধু।

আশাকরি তোমরা আমাকে লুদনের হাতে তুলে দেবে না।

ওলোয়া বলল, কিন্তু আমার বাবা কোতান জানতে পারলে রেগে যাবে, তার উপর প্রধান পুরোহিত লুদন হয়ত এর জন্য দেবতার কাছে আমাকে বলি দেবে।

টারজন বলল, কিন্তু তুমি না বললে ও জানবে কি করে?

ওলোয়া তখন টারজনকে বলল, আচ্ছা বিদেশী, তুমি যদি সত্যিই দেবতা হও তাহলে মানুষের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?

টারজন বলল, দেবতা ও মানুষ একসঙ্গে মিশে গেলে দেবতাদের অবস্থাও মানুষদের মতই হয়।

ওলোয়া বলল, আচ্ছা তুমি তাদেনকে দেখেছ এবং তার সঙ্গে কথা বলেছ?

টারজন বলল, হ্যাঁ, আমি একপক্ষকাল তার কাছে ছিলাম।

ওলোয়া চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই টারজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা রাজকুমারী, তুমি গতকাল আর একজন বিদেশীর কথা বলছিলে। কে সে?

ওলোয়া বলল, হ্যাঁ, আমি দেখিনি। তবে একটা

গুজব শুনেছি একজন বিদেশিনী মহিলাকে মন্দিরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাকে প্রধান পুরোহিত লুদন এবং আমার বাবা রাজা কোতান দুজনেই বিয়ে করতে চায়। মহিলাটি নাকি খুবই সুন্দরী।

টারজন পানাৎ লীকে বলল, তাকে মন্দিরের মধ্যে কোথায় রাখা হয়েছে জান ?

পানাৎ লী বলল, আমরা কি করে জানব ?

এই বলে প্রাসাদের দিকে চলে গেল পানাৎ লী।

রাত্রির অন্ধকার নেমে আসতেই নিষিদ্ধ বাগান থেকে টারজন বেরিয়ে মন্দিরের উঠোনে সেই দোতলা রুদ্ধদ্বার ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল যে ঘরটা সেদিন মন্দির পরিদর্শনকালে দেখে তার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। সে ঘরের জানালা দরজা সব বন্ধ। লুদন বলেছিল ঘরটা খালি পড়ে আছে। ঘরখানা দেখে সেদিনই সন্দেহ জাগে তার মনে।

গম্বুজের মত দোতলা ঘরটা মন্দিরের বাইরের দিকে। তার ওধারেই সেই বিরাট হ্রদ।

টারজন দেখল একতলায় একটা মিট মিট করে আলো জ্বলছে। চাপা গলায় দুজন লোক কথা বলছে। সে তার ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতার দ্বারা বুঝতে পারল এই ঘরে একজন মহিলা আছে। সে ক্রমে বুঝতে পারল লুদনই কথা বলছে জেনের সঙ্গে। জেনই হচ্ছে বিদেশিনী মহিলা।

টারজন খেয়াল করেনি ঘরটার নিচেরতলাটা দুভাগে বিভক্ত ছিল। লুদন জেনের সঙ্গে যেখানে কথা বলছিল তার পাশে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা অন্ধকার কুঠরি ছিল। টারজন না জেনেই সেই অন্ধকার কুঠরিটায় ঝাঁপ দিল।

ঝাঁপ দিতেই টারজন দেখল ঘরটা ভীষণ অন্ধকার। অন্ধকারে হাতড়ে কাউকে না পেয়ে সে জেনের নাম ধরে ডাকতে লাগল। কিন্তু জেন কোন উত্তর দিল না। তার বদলে লুদন তার গলার স্বর চিনতে পেরে চীৎকার করে বলল, তোমার পিতা জাদ-বেন ওথোর কাছে যাও।

সেই কুঠরিটার পিছন দিকে একটা জানালা ছিল। জানালাটা খোলা থাকায় সেখান দিয়ে চাঁদের আলো আসছিল। টারজন দেখল জানালাটার পাশ দিয়ে একটা টানা বারান্দা চলে গেছে। তার একদিকে সেই বিরাট হ্রদ আর একদিকে সাদা রঙের একটা উঁচু পাঁচিল।

সহসা টারজন চাঁদের আলোয় দেখল কোর-উলের অরণ্যে দেখা সেই গ্রীফ বা ডাইনোসর নামে একটা ভয়ঙ্কর জন্তু রয়েছে বারান্দাটায়। সে বুঝল এই ছোট্ট কুঠরিটা থেকে সেই বিরাটকায় জন্তু আর তার ভয়ঙ্কর লম্বা লেজ থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় নেই।

এদিকে জন্তুটা তার উপস্থিতির কথা বুঝতে পেরে শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসছে তার দিকে। টারজন তখন অন্য কোন উপায় না পেয়ে ছুটে গিয়ে হ্রদের জলে ঝাঁপ দিল।

এদিকে লুদন রাত্রিতে একা জেনকে বিয়েতে রাজী করাবার জন্য সেই ঘরটায় এসেছিল। দিনের বেলায় কোতানের ভয়ে এখানে আসতে পারে না সে।

লুদনের কথায় জেন যখন রাজী হলো না তখন লুদন তাকে জোর করে ধরতে গেল। কিন্তু জেন তাকে বলল, খবরদার, তুমি আমাকে ছোঁবে না। তাহলে দুজনের একজন মরবেই।

এমন সময় পাশের ঘরে টারজনের পড়ার শব্দ হয়। টারজন 'জেন জেন' বলে চীৎকার করতে থাকে এবং তার গলার স্বর শুনে উপহাস করে লুদন তার পিতা জাদ-বেন-ওথোর কাছে ফিরে যেতে বলে।

এরপর লুদন আবার জেনের দিকে এগিয়ে এলে সহসা জাদন এসে ঘরে ঢোকে। লুদন তাকে দেখেই বলে ওঠে, জাদন এমন সময় এখানে?

জেন দেখল গম্ভীর মুখে এক যোদ্ধা লুদনের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই মুহূর্তে তাকে তার ত্রাণকর্তা বলে মনে হলো।

জাদন বলল, আমি কোতানের কাছ থেকে আসছি। বিদেশিনী মহিলাকে নিষিদ্ধ বাগানের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে।

লুদন চুপ করে রইল। সে জানত কোতান কেন জাদনের উপর এ কাজের ভার দিয়েছে। কারণ এই জাদনই তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সামন্ত আর শক্তিশালী যোদ্ধা। এই জাদনই পুরোহিতদের সব রকমের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করে আসছে রাজা কোতানকে।

লুদন তাই সরাসরি জাদনের বিরোধিতা না করে তাকে কৌশলে ফাঁদে ফেলার জন্য বলল, ঠিক আছে, পাশের ঘরে এস, এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

কিন্তু তখন জেন জাদনকে বলল, আপনি যদি বাঁচতে চান তাহলে ওঘরে যাবেন না।

জাদন এবার জেনকে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কেন তুমি একথা বলছ?

জেন বলল, ওঘরটা অন্ধকার কারাগার। ওখানে একটা জন্তু আছে। ও আমাকে ওঘরে জোর করে ঢুকিয়ে দেবে বলে মাঝে মাঝে ভয় দেখাত।

জাদন সাবধান হয়ে যেতে লুদন চলে গেল। জাদন জেনকে বলল, কেন তুমি আমাকে সাবধান করে দিলে? আমি ত তোমায় মুক্তি দিতে পারব না।

জেন বলল, লুদন হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। কিন্তু তোমাকে দেখে একজন সত্যিকারের বীর এবং সম্মানিত ব্যক্তি বলে মনে হয়।

জাদন বলল, তুমি বুদ্ধিমতী। এখন আমার সঙ্গে এস। তুমি এখন নিষিদ্ধ বাগানের পাশে রাজকন্যা ওলোয়ার ঘরে থাকবে। এই কারাগারের থেকে সেখানটা নিরাপদ।

জেন ভয়ে ভয়ে বলল, কিন্তু কোতান?

জাদন বলল, তোমাকে বিয়ে করার আগে কতকগুলো অনুষ্ঠানের ব্যাপার আছে। তাতে বেশ কয়েকদিন লেগে যাবে। তাছাড়া বিয়ের ব্যাপারে একটা সমস্যা আছে। কারণ রাজার বিয়ে একমাত্র পুরোহিতই দিতে পারে এবং লুদনের এতে মত নেই।

জেন বলল, ঠিক আছে, যত দেরী হয় ততই ভাল।

মন্দিরের সীমানা পার হয়ে প্রাসাদে ঢুকতে যাবার মুখে দুজন পুরোহিত জাদন আর জেনকে ঢুকতে দিতে চাইল না। তারা বলল, একমাত্র প্রধান পুরোহিত লুদনের হুকুম ছাড়া বন্দিনী প্রাসাদে ঢুকতে পারবে না।

জাদন তার ছুরিতে হাত দিয়ে বলল, রাজা কোতানের আদেশে ও প্রাসাদ অন্তঃপুরে যাচ্ছে এবং অন্যতম সামন্ত জাদন তাকে নিয়ে যাচ্ছে। সরে যাও। ওকে ঢুকতে দাও।

তারা সরে যেতেই জাদন জেনকে নিয়ে প্রাসাদে ঢুকে পড়ল। জাদন এবার অন্তঃপুরের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে একজন প্রহরীকে বলল, এই বিদেশিনী মহিলাকে রাজকন্যা ওলোয়ার ঘরে নিয়ে যাও।

প্রহরী জেনকে সঙ্গে করে ওলোয়ার ঘরের সামনে গিয়ে বাইরে থেকে বলল, রাজকুমারী, এই সেই বিদেশিনী বন্দিনী এসেছে, আপনার ঘরে যাবে।

ভিতর থেকে ওলোয়া বলল, ওকে আসতে বল এখানে।

জেন ঘরের ভিতরে ঢুকলে প্রহরী চলে গেল।

সেদিন রাত্রিতে কোতানের রাজপ্রাসাদে ভোজ-সভাটা একটু আগেই শুরু হয়েছিল। পরদিন বুলাতের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হবে। সেই উপ-লক্ষ্যে রাজা কোতান এই ভোজসভার আয়োজন করেছে। বুলাতের বাবা মোসার রাজ্যের একজন শক্তিশালী সামন্ত।

আজকের এই ভোজসভায় প্রচুর মদ্যপান করে সকলেই প্রায় মাতাল হয়ে উঠেছিল। সবচেয়ে বেশী মাতাল হয়ে উঠেছিল বুলাৎ। সে নেশার ঘোরে সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। সে এক-পাত্র মদ নিয়ে বলল, আমি এটা ওলোয়ার নামে পান করছি।

এ কথায় রেগে গেল কোতান। সে গম্ভীরভাবে চড়া গলায় বলে উঠল, একথা বলতে তুমি পার না, কারণ এখনো তোমার সঙ্গে ওলোয়ার বিয়ে হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য হলো বুলাতের। সে একথার

মানে বেশই বুঝতে পারল। অথচ নেশার ঘোরও তার বেশ ছিল। সে রাগের মাথায় তার কোমরে ঝোলানো খাপ থেকে ধারালো ছোরাটা বার করে সেটা সামনে বসে থাকা কোতানের বুকটা লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে দিল।

ছোরাটা কোতানের বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে যেতেই সে পড়ে গেল। বুলাৎ তখন তার অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পেরে পালিয়ে যাবার জন্য দরজার কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু প্রহরীরা তার পথ আটকে দাঁড়াল।

মোসার তখন এগিয়ে গিয়ে বলল, কোতান মারা গেছে। এখন মোসার হচ্ছে রাজা। সুতরাং আমার অনুচর যোদ্ধারা এসে আমাকে রক্ষা করো।

মোসারের এই কথায় তার কিছু অনুগামী যোদ্ধা এগিয়ে এসে মোসার ও বুলাৎকে ঘিরে দাঁড়াল। কিন্তু ঠিক এমন সময় জাদন ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বলল, এখন ওদের দুজনকেই গ্রেপ্তার করো। কোতানের বিশ্বাসঘাতক হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়ার পর পান-উল-দলের যোদ্ধারা তাদের রাজাকে মনোনীত করে নেবে।

বেগতিক দেখে মোসার ও বুলাৎ একসময় লুকিয়ে পালিয়ে গেল ভোজসভার ঘর থেকে।

ওরা দুজনে প্রাসাদ ত্যাগ করে সোজা নিজেদের দেশে পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু গেটের কাছে যেতেই হঠাৎ মোসার বুলাৎকে বলল, চল, যাবার সময় ওলোয়াকে নিয়ে আসি।

বুলাৎ বলল, তাহলে আমরা ধরা পড়ে যাব।

মোসার বলল, এখন ওরা মারামারি করছে। ওলোয়ার নিরাপত্তার ব্যাপারে নজর দিতে পারবে না।

এই বলে মোসার বুলাৎকে সঙ্গে নিয়ে ওলোয়ার অন্তঃপুরে গিয়ে চাতুরী করে বলল, ওলোয়া, একটা

দারুণ দুঃসংবাদ আছে। রাজ্যের যোদ্ধারা হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তারা এইমাত্র কোতানকে হত্যা করেছে। তারা এখন মাতাল অবস্থায় এই-দিকে আসছে। এখন এখানে থাকা নিরাপদ নয় তোমার পক্ষে। তাই তোমাকে আমি নিরাপদে আমাদের রাজ্যে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি।

কথাটা শুনে ওলোয়া বলল, আমার বাবা রাজা কোতান মারা গেছে? তা যদি হয় তাহলে ত এখন আমিই রাণী। পাল-উল-দলের যোদ্ধারা নতুন রাজা মনোনীত না করা পর্যন্ত রাজ্যের আইন অনুসারে আমিই রাণী। আমি তোমার অযোগ্য কাপুরুষ ছেলেকে কখনই বিয়ে করতে চাইনি। এখনই চলে যাও এখান থেকে।

মোসার এবার রেগে গিয়ে বুলাৎকে বলল, বুলাৎ, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যাও আর আমি এই বিদেশিনী নারীকে নিয়ে যাচ্ছি।

এই বলে ওলোয়া ও পানাৎ লী কিছু বুঝতে পারার আগেই জেনকে ধরে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মোসারের ব্যাপার দেখে উৎসাহিত হয়ে বুলাৎ ওলোয়াকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু পানাৎ লী বুলাতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিতে

লাগল। বুলাৎ তখন তার ছুরি খুলে পানাৎ লীকে হত্যা করতে যেতেই বাইরে থেকে কে একজন ঘরে ঢুকে বুলাতের হাত ধরে তার মুখে একটা ভয়ঙ্কর ঘুষি মারল।

টারজনকে দেখে পানাৎ লী আর ওলোয়া দুজনেই চিনতে পারল। টারজন দেখল আর সময় নেই। সে বলল, সেই বিদেশিনী মহিলা কোথায়? সে আমারই স্ত্রী।

পানাৎ লী বলল, এই মৃত লোকটার বাবা মোসার তাকে নিয়ে পালিয়েছে একটু আগে। ওর বাড়ি তুলুর।

টারজন বলল, ঠিক আছে, আমি তাকে উদ্ধার করার জন্য যাচ্ছি। পরে ফিরে এসে তোমাদের উদ্ধার করব।

গ্রীফের হাত থেকে বাঁচার জন্য হ্রদের জলে ঝাঁপ দেয় টারজন। টারজন পাথরের পাঁচিলটা অতিকষ্টে পার হয়ে সাঁতার কেটে কুলে গিয়ে উঠল।

ইচ্ছা করলে কুলে উঠে আলুর নগরীর বাইরে চলে যেতে পারত টারজন। কিন্তু জেনের কথা ভেবে তা পারল না। সে নিষিদ্ধ বাগানে জেনের খোঁজে যাবার জন্য পুরোহিতের পোশাক পরে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল। এদিকে লুদন সেই ঘর থেকে ফিরে এসে তার ঘরের মধ্যে তার বিশ্বস্ত পুরোহিতদের ডেকে তাদের সঙ্গে এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার কথা আলোচনা করতে লাগল। টারজন লুদনের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বারান্দার একপাশে নৈশ ছায়ায় গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে লুদনদের চক্রান্তমূলক আলোচনার কথা শুনতে লাগল। লুদন প্রথমে একজন পুরোহিতের হাতে কোতানকে হত্যা করার ভার দিল। বলল, কোতান প্রধান পুরোহিতের আদেশ লঙ্ঘন করে তাকে অপমানিত করেছে। সুতরাং তাকে হত্যা করে মন্দিরের পুরোহিতদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

লুদন এবার পানসাৎ নামে এক পুরোহিতকে শহরের মধ্যে গিয়ে তার অনুগামী যোদ্ধাদের গুপ্তদ্বার দিয়ে প্রাসাদে আনবার জন্য যেতে বলল। সে বলল, কোতানের মৃত্যুর পর জাদন রাজা হতে চাইবে। কিন্তু তোমরা মোসারকে তার বাড়ি থেকে নিয়ে এস। শুনছি সে গোলমালের সময় বাড়ি পালিয়ে গেছে। তাকে আমি রাজা করব। সে আমার মতের লোক। সে রাজা হলে আমাদের আধিপত্য সবক্ষেত্রে বজায় থাকবে।

লুদন একজন পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করল, সেই বন্দিনী মহিলাটি কোথায়?

পুরোহিত বলল, জাদন তাকে জোর করে প্রাসাদের অন্তঃপুরে ঢুকে রাজকন্যার ঘরে নিয়ে গেছে।

লুদন বলল, ঠিক আছে, আমরা পরে খুঁজে বার করব। নিষিদ্ধ বাগানের মধ্যেই তাকে পাব। পানসাৎ, এখন চলে যাও। শহরে গিয়ে রটনা করবে জাদনই রাজক্ষমতার লোভে রাজাকে হত্যা করেছে।

পানসাৎ চলে গেলে টারজনও নিঃশব্দে তার

অনুসরণ করে গুপ্ত সুড়ঙ্গপথ দিয়ে প্রাসাদের বাইরে পানসাৎ চলে যেতে টারজন আবার প্রাসাদে ফিরে এল। সে সোজা অন্তঃপুরে ওলোয়ার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। দেখল বুলাৎ পানাৎ লীকে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে তার বুকে ছুরি মারার জন্য উদ্যত হয়েছে। তখন সে ঘরে ঢুকে বুলাতের একটা হাত ধরে তার মুখে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরে তাকে ফেলে দিল।

তারপর অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে মোসারের খোঁজে প্রাসাদের বাইরে যাবার জন্য গেটের কাছে পৌঁছতেই কয়েকজন যোদ্ধা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। কারণ সে তাড়াহুড়ো করে মাথায় পুরোহিতের পোশাকটা পরতে ভুলে যাওয়ায় তাদের মনে সন্দেহ হয়।

টারজন দেখল একা এতগুলো যোদ্ধার সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। তাছাড়া যোদ্ধারা জাদন-পন্থী। তারা অবশ্য টারজনের ভয়ে তার খুব একটা কাছে আসতে পারছিল না। টারজন তাদের বলল, আমি লুদনের ষড়যন্ত্রের কথা সব আড়াল থেকে শুনেছি। সে এইমাত্র পানসাৎকে শহর থেকে অনেক যোদ্ধা নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়েছে। একটি গুপ্ত পথ দিয়ে প্রাসাদে ঢুকবে তারা। গুপ্ত পথটিও আমি দেখে নিয়েছি।

একজন যোদ্ধা বলল, তোমার কথা যদি মিথ্যা হয়?

টারজন বলল, আমার সঙ্গে তোমরা শহরে গেলেই বুঝতে পারবে। আমার কথা মিথ্যা হলে তোমরা আমাকে যে কোন শাস্তি দিতে পার। আর সত্য হলে আমাকে ছেড়ে দেবে। আমি এখন মোসারের খোঁজে তার দেশে যাব।

যোদ্ধারা টারজনের সঙ্গে শহরে গিয়ে দেখল সত্যিই পানসাৎ শহরের যোদ্ধাদের ডেকে উত্তেজিত

করছে। তারা দেখল টারজনের কথাই ঠিক, সে সত্যিই জাদনের বন্ধু। তারা তাই টারজনকে ছেড়ে দিয়ে বিদ্রোহী যোদ্ধাদের আক্রমণ করল।

যাবার আগে টারজন তাদের জিজ্ঞাসা করল, মোসারের দেশ কোথায়?

যোদ্ধারা বলল, তার দেশ হলো তুলুর। আলুরের সীমানা পার হয়ে আবার একটা বড় হ্রদ পাবে। তার দক্ষিণ দিকে তুলুর রাজ্য।

জেনকে কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে পারছিল না মোসার। তখন সে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। আলুর নগরীর সীমানাটা কোনরকমে পার হয়ে সে জেনকে টানতে টানতে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। এমন সময় মোসার দলের যোদ্ধাদের দেখতে পেল। তারই জন্য অপেক্ষা করছিল নগরের বাইরে এক জায়গায়। মোসার তখন তাদের দুজনকে জেনকে তুলে নিয়ে যাবার জন্য হুকুম করল।

হ্রদের ঘাটে এসে ওরা সবাই তিনটে নৌকোয় চাপল।

মোসার সদলবলে জেনকে নিয়ে নৌকো ছেড়ে দিল। একসময় মোসার অন্যমনস্ক হওয়ায় সুযোগ বুঝে জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে কুলের দিকে চলে গেল জেন।

এদিকে টারজন হ্রদের কাছে এসে একটা নৌকো পেয়ে তাতে উঠে পড়ে নিজেই দাঁড় বাইতে লাগল। সে বুঝতে পারল এই হ্রদটার ওপারে দক্ষিণ কূলে আছে মোসারের তুলুর রাজ্য।

লুদন আবার আলুর থেকে দুজন পুরোহিতকে পাঠিয়েছিল মোসারকে আলুরে নিয়ে যাবার জন্য। কারণ সে তাকে রাজা করতে চায়। তুলুর থেকে যে তিরিশজন যোদ্ধা আলুরের পথে নৌকোয় করে আসছিল তাদের সঙ্গে পথে দেখা হলো আলুরের পুরোহিত দুজনের সঙ্গে। তারাও একটা নৌকোয় করে যাচ্ছিল। তাদের নৌকোগুলো একজায়গায় হতেই তারা পরস্পরের খবরাখবর নিতে লাগল। তখন তারা দেখল একটা নৌকো চালিয়ে টারজন-জাদ-গুরু নামে সেই বিদেশীটা তুলুরের দিকে যাচ্ছে। তাকে তারা সবাই ভয়ের চোখে দেখত। তুলুরের যোদ্ধারা আলুরের পুরোহিতদের বলল, তোমরা তাড়াতাড়ি তুলুরে গিয়ে মোসারকে সাবধান করে দাও।

আলুরের পুরোহিতরা তুলুরের রাজসভায় গিয়ে মোসারের সঙ্গে দেখা করতেই একজন প্রহরী এসে খবর দিল, ডোর-উল-ওথো প্রাসাদদ্বারে এসে দাঁড়িয়ে আছে। সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

জেন সাঁতার কেটে হ্রদটা পার হয়ে কূলের উপর উঠে বনের ধারে একটা গাছতলায় বসে রইল। আজ কয়েক মাস ধরে বন্দীজীবন যাপন করছে সে। প্রথমে কাইজারের আদেশে হপ্টম্যান ফ্রিৎস স্লাইদার বৃটিশবিরোধী জার্মান সেনাপতি হিসাবে বৃটিশ অধিকৃত পূর্ব আফ্রিকায় অভিযান চালাতে গিয়ে লর্ড গ্রেস্টোকের বাংলোতে ধ্বংসকার্য চালায় এবং জেনকে বন্দী করে তুলে নিয়ে যায়।

টারজনও বৃটিশদের সহায়তায় তার ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রতিশোধবাসনায় উন্মত্ত হয়ে জার্মানদের উপর অনেক অত্যাচার করে। জার্মানরা তখন বিজয়ী বৃটিশরা যেপথে এগিয়ে আসছিল সেই পথটা এড়াবার জন্য স্লাইদারের সহকারী লেফটন্যান্ট ওবারগাৎসের প্রহরাধীন জেনকে অন্য পথে পাঠিয়ে দেয়।

ওবারগাৎসের সঙ্গে তখন ছিল একদল আদিবাসী সৈন্য। এই সেনাদল আর জেনকে নিয়ে সে দক্ষিণ আফ্রিকার একটা আদিবাসী গাঁয়ে গিয়ে ওঠে।

একদিন যে আদিবাসী মহিলাটি জেনের দেখাশোনা করত, জেনের প্রতি স্নেহবশতঃ সে এসে জেনকে সাবধান করে দেয়। বলে আজ রাতেই ঐ শ্বেতাঙ্গকে তারা হত্যা করবে।

কথাটা শুনেই ওবারগাৎসের ঘরে চলে গেল জেন। জেন তাকে সব কথা খুলে বলল। শেষে বলল, আজ রাতটা আমরা এখানে থাকলেই আমাদের মেরে ফেলবে ওরা। সুতরাং এখনি আমাদের পালিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।

ওবারগাৎস কোন প্রতিবাদ করল না। সে সবকিছু ভেবে জেনের কথামতই কাজ করল। শিকারের জন্য বন্দুকবাহক ও ভৃত্যরা রওনা হবার কিছুক্ষণ পর সে শিকারীর বেশে জেনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

দিনের পর দিন রাতের পর রাত তারা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ভীষণ কষ্টের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলল।

যেতে যেতে কতকগুলো পাহাড় পার হয়ে জাদ-বেন-ওথোর উপত্যকায় এসে পড়ল। সেখানে একদিন একদল হোদন যোদ্ধার চোখ পড়ায় জেনকে ধরে আলুর নগরীতে নিয়ে গেল তারা। ওবারগাৎস কোনরকমে পালিয়ে গেল।

আজ বহুদিন পর সকল বন্দীত্ব হতে মুক্ত হয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জেন।

পরদিন সকালে-রোদের তাপ গায়ে লাগতেই উঠে পড়ল জেন। জেনের কাছে একটা থলে ছিল। তাতে কতকগুলো বিভিন্ন আকারেব পাথব কুড়িয়ে নিল। তাবপর জেন একটা লম্বা চারাগাছ উপড়ে নিয়ে সেটাকে বর্শার মত করে নিল। ছুরি দিয়ে তার মুখটা সরু করে ফেলল। এবার টারজনের কথা মনে পড়ল। ভাবল টাবজন যদি প্রাণে বেঁচে থাকে তাহলে তার সঙ্গে একদিন না একদিন দেখা হবেই তার। সে তাকে খুঁজে বের করবেই।

এমন সময় আলুর থেকে দুজন পুরোহিত এসে দেখা করল মোসারের সঙ্গে।

তারা টারজনের নাম শুনেই মন্দিরের ভিতরে চলে গেল। টারজনের নাম শুনে মোসারও ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু তুলুরের পুরোহিতবা মোসারকে পরামর্শ দিল টারজনকে সে যেন খুব খাতির করে। পরে তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করতে হবে

কৌশলে।

টাবজন মোসারের সামনে এসেই কোনরকম অভিবাদন বা ভনিতা না করে সরাসরি বলল, তুমি আলুর থেকে যে বিদেশী মহিলাকে এনেছ সে কোথায়?

টারজনের গম্ভীর কণ্ঠ শুনে ভয় পেয়ে গেল মোসার। সে বলল, সে পথেই পালিয়ে গেছে। আমি তার খোঁজ করাব জন্য তিরিশজন লোককে পাঠিয়েছি।

টারজন এবার বলল, আলুর থেকে যে দুজন পুরোহিত একটু আগে এসেছে তারা কোথায়?

মোসার বলল, তারা মন্দিরে পুরোহিতদের সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

পরে পুরোহিতরা দলবেঁধে টারজনের কাছে গিয়ে বলল, হে ডোর-উল-ওথো, আপনি দয়া করে আমাদের রাজ্যে যখন পদার্পণ করেছেন তখন মন্দিরটা একবার দেখে যান।

টারজন এই খাতির পেয়ে গলে গেল। সে পুরোহিতদের সঙ্গে মন্দিরদর্শন করতে গেল। মন্দিরটা ঘুরিয়ে দেখানোর পর মাটির তলায় সেই অন্ধকার কারাগারটায় নিয়ে গেল। ঘরটা ভীষণ অন্ধকার।

ওরা মশাল জ্বেলে কারাগারটায় টারজনকে নিয়ে ঢুকেই বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল। টারজন এবার ওদের চক্রান্তের ব্যাপারটা বুঝতে পারল। টারজন অন্ধকারে হাতড়ে কয়েকটা পাথর দিয়ে ওদিকের জানালাগুলোকে ভেঙ্গে পালিয়ে যাবার পথ করার চেষ্টা করতে লাগল।

এদিকে আলুর থেকে একজন পুরোহিত এসে তুলুরের প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করল। সে বলল, কোতানের মৃত্যুর পর থেকে জাদন রাজা হবার চেষ্টা করছে। আমরা চাই তুমি আলুর চল। আমরা তোমাকে আলুরের প্রধান পুরোহিতের পদে বরণ করে নেব। তুমি আলুরে চলে যাবে। আমরা ওখানে সব ব্যবস্থা করে রাখব। তুমি এখানে একজনকে হত্যা করবে। আমরা ওখানে একজনকে হত্যা করব।

এই বলে পুরোহিত চলে গেল। প্রধান পুরোহিত মনে ভাবল, বন্দী টারজনকে খুন করতে বলেছে। সে বুঝতে পারেনি আলুরের পুরোহিত তাকে মোসারকে খুন করার কথা বলেছে। তারা লুদনকে হত্যা করবে।

প্রধান পুরোহিত তাই দশজন যোদ্ধা নিয়ে সেই কারাগারটায় চলে গেল। কিন্তু তারা অন্ধকার কারাগারে ঢুকেই দেখল টারজন পালিয়ে গেছে।

জেন একটা খরগোশ শিকার করল। এবার আগুন জ্বালাতে হবে। আগুনে দগ্ধ না করে সে মাংস খেতে পারবে না। আগুন জ্বেলে মাংসটা পুড়িয়ে খাবার পর একটা আনন্দের উত্তেজনা অনুভব করতে লাগল সে।

বর্শাটা তুলে নিয়ে আবার হরিণের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল সে। হরিণের মাংসই তার প্রিয় খাদ্য। নদীটার ধারে অনেকক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে সে একটা হরিণ দেখতে পেয়ে তার হাতের বর্শাটা ছুঁড়ে দিল। বর্শাটা হরিণটাকে বিদ্ধ করতেই সেটা পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে এক পুরুষ কণ্ঠ নদীর ওপার থেকে বলে উঠল, 'সাবাস!'

জেন প্রথমে লোকটাকে চিনতে পারল না। কাছে আসতে জেন চিনতে পারল। লোকটা হলো ওবারগাৎস।

জেন বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল, ওবারগাৎস তুমি!

ওবারগাৎস বলল, হ্যাঁ আমি।

জেন বলল, আমি ভাবছিলাম তুমি এতদিনে সভ্যজগতের কোন দেশে চলে গেছ।

ওবারগাৎস বলল, চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। এদেশের চারদিকে শুধু জলাশয়। আর যতসব হিংস্র জন্তু। তাদের হাত থেকে কোনরকমে বেঁচে গেছি।

জেন বলল, ওবারগাৎস, তুমি এখন যাও। আমাকে একা থাকতে দাও।

ওবারগাৎস হাসতে লাগল। না, না, তোমাকে একা ফেলে আমি এখন যেতে পারি না। তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব এখন আমার।

জেন বলল, আমি এখন একাই আত্মরক্ষায় সমর্থ। আমি যে বর্শা চালনা করতে পারি তা তুমি একটু আগেই দেখেছ।

ওবারগাৎস বলল, না, আমি যাব না।

জেন এবার বর্শাটা হাতে ধরে আদেশের সুরে বলল, চলে যাও বলছি। আমাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবে না। যদি আমি তোমাকে আবার দেখতে পাই তাহলে তোমায় হত্যা করব।

এই বলে জেন চলে গেল সেখান থেকে।

আলুর নগরীতে তখন দারুণ গোলমাল চলছিল। রাজ্যের যত সব যোদ্ধা আর পুরোহিতরা লুদন আর জাদন এই দুই নেতার অধীনে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু লুদনের পুরোহিত ও যোদ্ধারা ক্রমে সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে জাদনের দলের যোদ্ধাদের প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিতে থাকে। জাদন তখন রাজকন্যা ওলোয়া, পানাৎ লী আর তার দলের লোকদের নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে তার রাজ্য জালুরে চলে যায়।

মোসারের কারাগার থেকে বেরিয়ে টারজন তার বারান্দায় লাফ দিয়ে পড়ল। দেখল পাশেই একটা খাড়াই পাঁচিল।

অন্ধকারে মুহূর্তমধ্যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে নগরের রাজপথে গিয়ে পড়ল টারজন। একবার পিছন ফিরে দেখল, কেউ তাকে ধরতে আসছে কি না।

তুলুর নগরী থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকেই এক নিবিড় স্বস্তি অনুভব করল টারজন। রাতের অন্ধকারেও গাছে গাছে দ্রুত অনেকটা পথ পার হলো টারজন। ক্রমে একটা নদীর ধারে এসে পড়ল সে। গাছ থেকে নেমে নদীটা পার হয়ে আবার ওপারের জঙ্গলে চলে গেল। কিন্তু ওপারের বনটায় ঢুকে নাকে কিসের ঘ্রাণ পেয়ে স্তব্ধ হয়ে একবার দাঁড়াল সে। তারপর এক নতুন উদ্যমে কাকে যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল।

খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একটা বড় গাছের তলায় এসে দেখল গাছের উপরে একটা মাচা বাঁধা রয়েছে।

টারজন মাচার সামনে এসে ডাকল, জেন, প্রিয়তমা জেন, আমি।

হঠাৎ টারজন শুনতে পেল কে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাচার বিছানার উপরেই পড়ে গেল। সে তখন মাচার সামনেকার ডালপালার বাধাগুলো নিজের হাতে সরিয়ে মাচার ভিতরে ঢুকে দেখল জেন মড়ার মত শুয়ে আছে।

ধীরে ধীরে জেনের জ্ঞান ফিরে এলে জেনের মনে হলো সে স্বপ্ন দেখছে। জেন বলল, ঈশ্বর তাহলে এতদিনে আমাদের উপর দয়া করেছেন জন।

দুজনেরই মুখে অসংখ্য কথা ভিড় করে আসছিল। জেন এবার প্রশ্ন করল, জ্যাক কোথায়?

টারজন বলল, আমি ত জানি না। আমি শেষবার যখন তার কথা শুনি সে তখন ছিল আর্গন ফ্রন্টে। কিন্তু এখন তুমি কোথায় যেতে চাও?

জেন বলল, আমি প্রথমে জ্যাককে ফিরে পেতে চাই। তাকে ফিরে পেতে যেখানে যেতে হয় যাব। আমি অবশ্য মাঝে মাঝে বাংলোটারই স্বপ্ন দেখি, শহরের কথা মনে হয় না।

পরদিন সকালেই জেনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল টারজন।

ওবারগাৎস সেদিন জেনের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ এক জোর হাসিতে ফেটে পড়ল সে। তার সামনে তখন বিস্তৃত হয়েছিল এক বিশাল হ্রদের জলরাশি। সেই হ্রদের ওপারে একটা নদী আছে। তার পাড়েই আছে আলুর নগরী। সেখানকার লোকেরা জাদ-বেন-ওথো নামে এক দেবতার পূজো করে। ওবারগাৎস মনে মনে ঠিক করল, ওদের দেবতা জাদ-বেন-ওথোর নাম ধারণ করে ও যাবে সেখানে। হ্রদের জলে কিছুটা নেমে পাগলের মত চীৎকার করতে লাগল ওবারগাৎস, আমিই হচ্ছি জাদ-বেন-ওথো, আমিই সেই মহান দেবতা।

কিন্তু অত দূর থেকে কেউ তার কথা শুনতে পেল না। কেউ তাকে নিতে এল না দেখে ওবারগাৎস নিজেই হ্রদের জলরাশি সাঁতার কেটে পার হতে লাগল। হ্রদটার অনেকখানি পার হয়ে নদীটার কাছাকাছি এসে সাঁতার কাটতে কাটতে একটা ছোট নৌকো পেয়ে গেল। নৌকোটা আধ-ডোবা অবস্থায় ভেসে চলেছিল।

এবার নৌকোটার উপর চেপে দুহাতে করে জল কেটে এগিয়ে যেতে লাগল। নদীতে নৌকোয় যখন আলুর নগরীর দিকে এগিয়ে চলেছিল ওবারগাৎস তখন প্রাসাদপ্রাচীর ও নদীর ধার হতে অনেক লোক, শিশু আর নারীরা তার অদ্ভুত চেহারাটার পানে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

লুদনও দেখল ওবারগাৎসকে। সে তার পুরোহিতদের বলল, ওই বিদেশীকে এখানে সম্মানের সঙ্গে নিয়ে এস। আমার মতে এই হলো জাদ-বেন-ওথো।

তার অধীনস্থ পুরোহিতরা ওবারগাৎস ঘাটে নামতেই তাকে সম্মানের সঙ্গে মন্দিরে নিয়ে গেল। নৌকো থেকে নেমে ওবারগাৎস বলে উঠল, আমি

হচ্ছি জাদ-বেন-ওথো। আমি স্বর্গ থেকে আসছি। আমার প্রধান পুরোহিত কোথায়?

লুদন বিদেশীর দিকে কটাক্ষপাত করে একবার দেখে নিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেও দেবতারূপী এই বিদেশীকে আপন প্রয়োজনসিদ্ধির কাজে লাগাতে চাইল। সে মনে মনে ঠিক করল তাদের দেবতা জাদ-বেন-ওথোর নামধারী এই বিদেশীকে এই মন্দিরে দীর্ঘকাল রেখে দেবে। সে সারা রাজ্যে রটনা করে দেবে জাদ বেন ওথো স্বয়ং দয়া করে তার কাছে এসেছেন এবং তার মতকে সমর্থন করেছেন।

এই কথা নগর মধ্যে প্রচার হলে বহু লোক দলে দলে মানুষরূপী জাদ-বেন-ওথোকে দেখতে এল। তার উদ্দেশ্যে অনেকে অনেক পূজার অঞ্জলি দিল। ওরাবগাৎসের খাতির বেড়ে গেল।

লুদন শুনেছিল জাদন জালুরে চলে গেলেও সেখান থেকে সৈন্য সংগ্রহ করছে। সুযোগ বুঝলেই সে আলুর নগরী আক্রমণ করবে। বর্তমান আলুর নগরীতে কোন রাজা নেই। এখন লুদনই একমাত্র সব ক্ষমতার অধিকারী।

টারজন আর জেন দুজনে মনের আনন্দে হ্রদ আর নদী পার হয়ে একটা উপত্যকার উপর দিয়ে যেতে লাগল। টারজনের ইচ্ছা আপাততঃ সে কোর-উল-জা রাজ্যে গিয়ে তার বন্ধু ওমতের সঙ্গে দেখা করবে। তার কাছেই তাদেন আছে।

তিন দিন পর ওরা আলুরের কাছাকাছি একটা নদীর ধারে এসে পড়ল। হঠাৎ জেন বিরাটকায় গ্রীফ দেখে টারজনকে বলল, ওটা কি?

টারজন বলল, ওটা গ্রীফ নামে এক জন্তু। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে কাছে কোন গাছ নেই। এখন জন্তুটা আমাদের না দেখলেই ভাল। কারণ তোমাকে নিয়ে একা আমি ওর সঙ্গে লড়াই করতে পারব না।

জেন বলল, কিন্তু জন্তুটা যে এত বড় তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। যেন একটা যুদ্ধজাহাজ।

টারজন হেসে বলল, আক্রমণ করার সময় ওরা বড় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

ওরা ধীর গতিতে উপত্যকাটার উপর দিয়ে যেতে লাগল যাতে জন্তুটার নজর ওদের উপর না পড়ে। কিন্তু জন্তুটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ও দের দেখতে পেয়ে গর্জন করে উঠল। টারজন বলল, আর উপায় নেই। এবার ওর সঙ্গে মোকাবিলা করতেই হবে। আর পালানো যাবে না।

টারজন এরপর জেনকে বলল, আমি যাচ্ছি, তোমার বর্শাটা দাও।

টারজন এবার তেরোদনদের মত হুইউঃ বলে চীৎকার করে উঠতেই জন্তুটা মৃদু গর্জন করে উঠল। টারজন তখন জেনকে নিয়ে জন্তুটার লেজে ভর দিয়ে তার চওড়া পিঠটায় চড়ে বসল। তারপর জন্তুটাকে কোর-উল-জার পথে চালনা করে নিয়ে যেতে লাগল। টারজন ভাবল সে এই জন্তুটার পিঠে চেপেই ওমৎদের গাঁয়ে চলে যাবে।

কিন্তু কোর-উল-জা যেতে হলে আলুবের পাশ দিয়ে যেতে হবে। তাই আলুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় অনেকে গ্রীফের উপর টারজনকে দেখে ছুটে লুদনকে খবর দিল।

টারজন জেনকে নিয়ে গ্রীফের উপর চেপে কোন পথে যাচ্ছে তার খবর দিতে লুদন ভাবল টারজন জালুরের পথে যাচ্ছে এবং সে জাদনের সঙ্গে যোগদান করবে। তখন জাদন টারজনকে নিয়ে একযোগে আলুর আক্রমণ করবে। লুদন তখন তার বিশ্বস্ত পুরোহিত পানসাৎকে গোপনে তার পরিকল্পনার কথাটা বুঝিয়ে দিল। পানসাৎ মাথায় যোদ্ধার জমকালো পোশাক পরে একজন যোদ্ধার বেশ ধারণ করল। তারপর সে জালুরের পথে রওনা হলো।

টারজন যাচ্ছিল কোর-উল-লুনের পথে। একদল হোদন যোদ্ধা পথে এক ভয়ঙ্কর জন্তুকে দেখে ছুটে পালাতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা ফাঁকা জায়গায় পড়তেই জাদনের লোকরা টারজনকে দেখতে পেল। জাদন তখন সৈন্য সমাবেশ করছিল।

হঠাৎ জাদনের একজন প্রহরী গ্রীফের পিঠে টারজনকে একটু দূর থেকে দেখে চিনতে পারল। সে ছুটে গিয়ে জাদনকে খবর দেয়। কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করতে মন চাইছিল না জাদনের। পরে সে নিজে পাহাড়ের ধারে এসে দেখল কথাটা সত্যি। সে তখন চীৎকার করে বলে উঠল, হ্যাঁ। উনিই সেই দেবতা ডোর-উল-ওথো।

জাদন টারজনকে লক্ষ্য করে বলল, আমি জাদন, জালুরের প্রধান। আমি তোমার বন্ধু। আমরা তোমার পায়ে প্রণাম জানাচ্ছি। আমাদের প্রার্থনা, তুমি লুদনের বিরুদ্ধে আমাদের আসন্ন ন্যায়যুদ্ধে সাহায্য করো।

টারজন বলল, তুমি তাকে এখনো পরাস্ত করতে পারনি? আমি ভাবছিলাম তুমি তাকে মেরে রাজা হয়েছ।

জাদন বলল, না, জনগণ প্রধান পুরোহিতকে ভয় করে। তার উপর আলুরের মন্দিরে একজন বিদেশী নিজেকে স্বয়ং জাদ-বেন-ওথো হিসাবে পরিচয় দিচ্ছে। লুদনও তাকে মন্দিরে খাতির যত্ন করে রেখে দিয়ে জাদ-বেন-ওথোর নামে প্রচার চালিয়ে দল ভারী করছে। তবে জনগণ যদি জানতে পারে ডোর উল ওথো আবার ফিরে এসেছে আমাদের কাছে তাহলে এ যুদ্ধে আমরা জয়ী হবই।

টারজন কিছুটা চিন্তা করে বলল, বল জাদন, কিভাবে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

জাদন বলল, আমার সঙ্গে জালুরে গিয়ে সৈন্য সংগ্রহের কাজে আমাকে সাহায্য করবে।

টারজন গ্রীফের পিঠে চড়েই জালুরের দিকে এগিয়ে চলল। জাদন আর যোদ্ধারা হেঁটে হেঁটে যেতে লাগল।

জালুরের প্রাসাদে জেনকে ওলোয়া আর পানাৎ লীর কাছে রেখে দিল। ওলোয়া আর পানাৎ

দুজনেই টারজনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হয়ে তাকে প্রণাম করল।

সেদিন রাতটা কাটানোর পর পরদিনই যুদ্ধযাত্রা করল ওরা।

যেদিন জাদন টারজনকে নিয়ে আলুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল সেইদিন রাত্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলুর থেকে যোদ্ধার বেশে আসা লুদনের অনুচর পানসাং জালুরের প্রাসাদ-উদ্যান থেকে পুরোহিতদের ঘরে চলে গেল। সে কৌশলে দুজন পুরোহিতকে তার দলে এনে জেনকে নিয়ে পালিয়ে যাবার এক চক্রান্ত করল।

রাত নিশুতি হলে এবং প্রাসাদের সব লোক ঘুমিয়ে পড়লে পানসাং তার অনুগত দুজন পুরোহিতকে সঙ্গে করে অন্তঃপুরে জেন যে ঘরে একা ঘুমোচ্ছিল সেই ঘরে চলে গেল। ঘুমন্ত জেনের মুখ আর হাত পা বেঁধে তাকে তুলে নিয়ে প্রাসাদের বাইরে নদীর ঘাটে চলে গেল। মুখ বন্ধ থাকায় চীৎকার করতে পারল না জেন। নদীর ঘাটে একটা নৌকো বাঁধা ছিল। তাতে জেনকে চাপিয়ে নৌকো ছেড়ে দিল পানসাং।

তখন চাঁদ ডুবে গেছে। কিন্তু ভোর হয়নি তখনো। আলুরের বাইরে জাদনের সেনাদল দুদলে ভাগ হয়ে গেল। একটা দল নিয়ে টারজন গুপ্তপথ দিয়ে প্রাসাদসংলগ্ন মন্দিরে চলে যাবে আর জাদন একটা দল নিয়ে সোজা প্রাসাদদ্বারে চলে গিয়ে আক্রমণ করবে। ঘুমন্ত নগরীতে কোন বাধা পাবে না তারা। তাদেরের কাছে একজন দূত পাঠানো হয়েছে। সে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে একই সময়ে আক্রমণ করবে।

টারজনরা একটা মশাল এনেছিল সঙ্গে। মশালটা জ্বেলে সেই গোপন সুড়ঙ্গ পথটা দিয়ে

এগিয়ে যেতে লাগল টারজন।

টারজন গুপ্তপথ দিয়ে সোজা মন্দিরের দরজার কাছে চলে গেল। তার দলের যোদ্ধারা অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল। দরজায় কোন পাহারা না থাকায় টারজন একাই লুদনের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সহসা সে দেখল একজন আলুরের যোদ্ধা একজন বিদেশী মহিলাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। টারজন এবার লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ছুটে গেল। ওদিকে পানসাং টারজনকে চিনতে পেরে একটা অন্ধকার ঘরে বন্দিনীকে নিয়ে ঢুকল। টারজন তখন তার হাতের মশালটা নিবিয়ে দিয়ে সেই ঘরটায় ঢুকে পড়ল। অন্ধকার ঘরটায় টারজন ঢুকে পড়তেই তার দুদিকের দুটো দরজা বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দেখল, ঘরের দরজা দুটো বন্ধ এবং পাথর দিয়ে আটকানো। উপরে একটা জানালা আছে এবং জানালাটা বন্ধ।

লুদন যখন তার ঘরে বসেছিল তখন পানসাৎ বন্দিনী জেনকে তুলে নিয়ে তার সামনে মেঝের উপর নামিয়ে রাখল। লুদন আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল, এর জন্য তুমি প্রচুর পুরস্কার পাবে। এবার যদি ভণ্ড ডোর-উল-ওথোকে একবার ধরতে পারতাম তাহলে সমগ্র পান-উল-বাসী আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যেত।

পানসাৎ বলল, তাকে আমরা ধরেছি মালিক।

লুদন আশ্চর্য হয়ে বলল, সে কি! তাকে ধরেছ? টারজন-জাদ-গুরু ধরা পড়েছে? তাকে কি হত্যা করেছ?

পানসাৎ বলল, না। তাকে জীবন্ত ধরে রেখেছি। তাকে আমাদের প্রাচীন কারাগারটায় ধরে রেখেছি।

এমন সময় একজন পুরোহিত ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় এসে খবর দিল, জাদনের যোদ্ধারা প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

পানসাৎ বলল, ও ঠিকই বলেছে মালিক। গুপ্ত-পথ দিয়ে টারজনই জাদনের লোকদের এনেছে প্রাসাদে।

লুদন বেরিয়ে গিয়ে দেখল কথাটা সত্যি। সে মন্দিরের বিপদসূচক ঘণ্টাটা বাজাতে লাগল জোরে। তারপর কয়েকজন বিশ্বস্ত পুরোহিতকে ডেকে বারান্দা পার হয়ে আর একটা ঘরে চলে গেল। জেনকেও তার ঘরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

মন্দিরের বিপদসূচক ঘণ্টাগুলোকে জোরে বাজাতে দেখে জাদন ভাবল এতক্ষণে টারজন তার সঙ্গের যোদ্ধাদের নিয়ে মন্দির ও প্রাসাদ আক্রমণ করেছে তাই এই ঘণ্টাধ্বনি। এদিকে লুদন জাদনের দলের সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য সে তার পুরোহিতদের বলল, যাও তোমরা প্রাসাদের মাথা থেকে প্রচার করে দাও, ভণ্ড ডোর-উল-ওথো ধরা পড়েছে। আমাদের কাছে ভগবান জাদ-বেন-ওথো আছেন। তিনি বলেছেন, এখনো সময় আছে, আক্রমণকারীরা অস্ত্রত্যাগ করে যুদ্ধে বিরত হলে তাদের ক্ষমা করা হবে।

এরপর লুদন জাদ-বেন-ওথোরূপী ওবারগাৎসের কাছে লোক পাঠিয়ে দিল। দেবতার ভান করতে করতে ওবারগাৎসের মাথাটার ঠিক ছিল না। সে যে দেবতা নয়, একজন মানুষ এটা সে নিজেই আর বুঝতে পারছে না। সে তাই সব সময় মাথার চুলে ও দাড়িতে ফুল গুঁজে রাখত।

ওবারগাৎস তখন ঘুমোচ্ছিল তার ঘরে। এমন সময় লুদনের লোক গিয়ে তাকে জাগাল। বলল, শত্রুরা প্রাসাদে ঢুকে পড়েছে।

ওবারগাৎস বিছানার উপর বসে বলল, আমি হচ্ছি জাদ-বেন-ওথো, কে আমার ঘুম ভাঙ্গাল?

এমন সময় আর একজন পুরোহিত এসে বলল, হে ভগবান জাদ-বেন-ওথো, জাদনের সৈন্যরা প্রাসাদ আক্রমণ করেছে।

ওবারগাৎস বলল, আমি হচ্ছি জাদ-বেন-ওথো। আমি বজ্র হেনে সেই সব নাস্তিক অধার্মিকদের পুড়িয়ে মারব।

ওবারগাৎস ব্যস্তভাবে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগল।

এদিকে লুদন তার পুরোহিতদের নিয়ে নিজে প্রাসাদের উপর থেকে কথা বলতে লাগল জাদনের দলের লোকদের সঙ্গে। জাদনের দলের যোদ্ধারা যখন শুনল টারজন-জাদ-গুরু বন্দী হয়েছে লুদনের হাতে এবং তাদের ভগবান জাদ-বেন-ওথো স্বয়ং মন্দিরে অবস্থান করছেন তখন তারা সব উদ্যম হারিয়ে ফেলল। তারা শুনল টারজন ডোর-উল-ওথো নয়, একজন ভণ্ড, মানুষের মত বন্দী হয়ে পড়ে আছে। তখন তাদের মনোবল ভেঙ্গে গেল। প্রাসাদের ভিতর যারা যুদ্ধ করছিল জাদনের পক্ষে তারাও টারজনকে না পেয়ে মনোবল হারিয়ে প্রাসাদদ্বারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জাদনও সেই-খানে ছিল। সেও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল।

লুদন উপর থেকে জাদনের সেনাদলকে বলল, তোমাদের অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করো। ভগবান জাদ বেন-ওথো তাই বলেছেন। তোমাদের ভণ্ড ডোর-উল-ওথো এখন আমাদের হাতে বন্দী।

তখন নিচের থেকে জাদনের লোকরা বলল, তাহলে জাদ বেন-ওথোকে আমাদের সামনে নিয়ে এসে দেখাও। ডোর-উল-ওথো যদি বন্দী হয়ে থাকে তাহলে তাকেও এনে দেখাও। ৫৩৬

লুদন তখন দুজনকেই প্রাসাদের ছাদের উপর নিয়ে আসতে বলল।

এদিকে টারজন দেখল যে ঘরটায় সে বন্দী ছিল সেই ঘরের উপর দিকে জানালার কাছে কড়িকাঠের সঙ্গে একটা দড়ি লাগানো ছিল। দড়িটাতে ভর দিয়ে উপরের দিকে উঠে জানালা দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। এমন সময় উপর থেকে একদল পুরোহিত এসে টারজনের হাত দুটো চামড়ার দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। আর সেই সময় টারজন

যখন ঝুলছিল তখন তার পা দুটো বেঁধে ফেলল। তারা টারজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে ছাদের উপর লুদনের পাশে নামিয়ে দিল।

ওবারগাৎস তার আগেই ছাদের উপর দাঁড়িয়েছিল। টারজনকে দেখেই ভয় পেয়ে গেল ওবারগাৎস।

লুদন জাদনকে দেখিয়ে বলল, এই দেখ, বন্দী ডোর উল-ওথো।

ওবারগাৎস আবার বলল, আমি জাদ বেন-ওথো।

টারজন তার পানে তাকিয়ে বলল, তুমি হচ্ছ লেফটেন্যান্ট ওবারগাৎস। তুমি হচ্ছ সেই তিনজনের একজন যাকে আমি অনেক খুঁজে বেড়িয়েছি।

ওবারগাৎস দেখল টারজনের কথা শুনে অনেকে তার পানে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে।

ওবারগাৎস বলল, আমিই জাদ-বেন-ওথো। এই লোকটা আমার পুত্র ডোর-উল-ওথো নয়। তার ভণ্ডামি আর প্রতারণার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে। সূর্য আকাশের মধ্যভাগে আসার সঙ্গে সঙ্গে বেদীর উপর তার শিরশ্ছেদ করা হবে। যাও, ওকে আমার চোখের সামনে থেকে নিয়ে যাও।

যারা টারজনকে বয়ে নিয়ে এসেছিল তারা আবার সেখান থেকে তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে মন্দিরের বলির বেদীর উপর শুইয়ে দিল।

এরপর ওবারগাৎস জাদনের লোকদের লক্ষ্য করে বলতে লাগল, তোমাদের অস্ত্র ফেলে দাও। আত্মসমর্পণ করো। তা না হলে আমি বজ্র নিক্ষেপ করে তোমাদের পুড়িয়ে মারব। যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের আমি ক্ষমা করব।

জাদন তখন চীৎকার করে বলল, যে করে করবে, কিন্তু জাদন কখনো লুদন আর তার ভক্ত দেবতার পায়ে মাথা নত করবে না।

কিন্তু সত্যি সত্যি জাদনের দলের কিছু লোক অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করল। তারপর তারা প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে গিয়ে লুদনের পক্ষে যোগদান করল।

আবার যুদ্ধ শুরু হলো। লুদনের নির্দেশে তখন একদল যোদ্ধা গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে প্রাসাদের বাইরে গিয়ে প্রাসাদদ্বারে যুদ্ধরত জাদনের সেনাদলের উপর আক্রমণ শুরু করল। তখন দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে পালাতে লাগল তারা। জাদন বন্দী হলো।

জাদনকেও হাতপা বাঁধা অবস্থায় মন্দিরে টারজন আর জেনের কাছে আনা হলো।

লুদন ওবারগাৎসকে জিজ্ঞাসা করল, এই নারীকে কি বলি দেওয়া হবে?

ওবারগাৎস বলল, আগে এদের বলি দেওয়া হোক। পরে আজ রাতে আমি ভেবে দেখব কি করা যায়।

জেন টারজনকে বলল, এই হয়ত আমাদের শেষ দেখা।

টারজন তখন নিজের কথা বা মৃত্যুর জন্য মোটেই ভাবছিল না। সে ভাবছিল শুধু জেনের কথা। সে জেনকে সাহস দিয়ে বলল, এভাবে এর আগেও অনেকবার বন্দী হয়েছিলাম আমি।

জেন বলল, এখনো আশা রাখ তুমি?

টারজন বলল, এখনো আমি বেঁচে আছি।

এবার ওবারগাৎস বলল, কই, আমার বলির খাঁড়া দাও। আমি নিজের হাতে বলি দেব ওকে।

লুদন বলির খাঁড়াটা ওবারগাৎসের হাতে দিয়ে দিল। বেদীর উপর শায়িত অবস্থায় টারজন জেনকে বলল, বিদায়!

জেনকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ওবারগাৎস খাঁড়াটা হাতে নিয়ে বলল, আমিই সেই মহান দেবতা। এবার দেবদ্রোহী এই অধর্মাচারীর মৃত্যু দেখ।

এই বলে সে খাঁড়াটা গলার উপর তোলার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে কিসের একটা জোর শব্দ হলো। সকলে চমকে উঠল। ব্যাপারটা কি তা কেউ বুঝতে পারার আগেই টারজনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ওবারগাৎস। টারজন দেখল রাইফেলের গুলি লেগেছে ওবারগাৎসের গায়ে।

সঙ্গে সঙ্গে লুদনও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তার পাশে দাঁড়িয়ে মোসারও পড়ে গেল গুলির আঘাতে।

এবার সকলে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল মন্দিরের প্রাচীরের উপর একদল হোদন যোদ্ধা, জাদনের ছেলে তাদেন আর পাশে টারজনের মত দেখতে এক শ্বেতাঙ্গ বিদেশী দাঁড়িয়ে আছে। শ্বেতাঙ্গ বিদেশীর হাতে একটা রাইফেল ছিল এবং তার থেকেই গুলি করছিল ও।

তাদেন এবার চীৎকার করে বলল, সব পুরোহিতদের গ্রেপ্তার করো। বন্দীদের বাঁধন খুলে দাও। এই হলো জাদ-বেন-ওথোর বিচার। এইভাবে জাদ-বেন-ওথো তাঁর দূতকে পাঠিয়ে অন্যায়কারীদের উপর চরম শাস্তি দান করলেন।

আলুর নগরীর সব পুরোহিত স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তাদেনের কথা এবার সবাই তারা অকুণ্ঠভাবে বিশ্বাস করে ফেলল। লুদনের জাদন-বেন-ওথো আর জাদনের ডোর-উল-ওথা—কার শক্তি বেশী, কে ভণ্ড আর কে খাঁটি তা তারা স্বচক্ষে দেখল। তার অভ্রান্ত প্রমাণ তারা পেয়ে গেল। এবার সকলেই জাদনের পক্ষ সমর্থন করল। জাদনই হবে সমগ্র পানউল দলের রাজা। তাদের সঙ্গে এক বিরাট সেনাদল আর কোর-উল-জার রাজা ওমৎও ছিল।

টারজন আর জেনের বাঁধন খুলে দিতেই তারা দেখল তাদের সামনে তাদেনের সঙ্গে তাদের হারানো ছেলে জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে। জ্যাক তার মাকে জড়িয়ে ধরল। এতদিন পর তাকে কাছে পেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল জেন। টারজন জ্যাকের কাঁধের উপর হাত রাখল। তার পুরনো বন্ধু ওমৎ আর তাদেনকেও ফিরে পেল টারজন।

টারজন, জেন আর জ্যাক পাশাপাশি তিনজন দাঁড়ালে তাদের দেবতা ভেবে সবাই তাদের সামনে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

জালুর থেকে রাজকন্যা ওলোয়া আর পানাৎ লীকে নিয়ে আসা হলো।
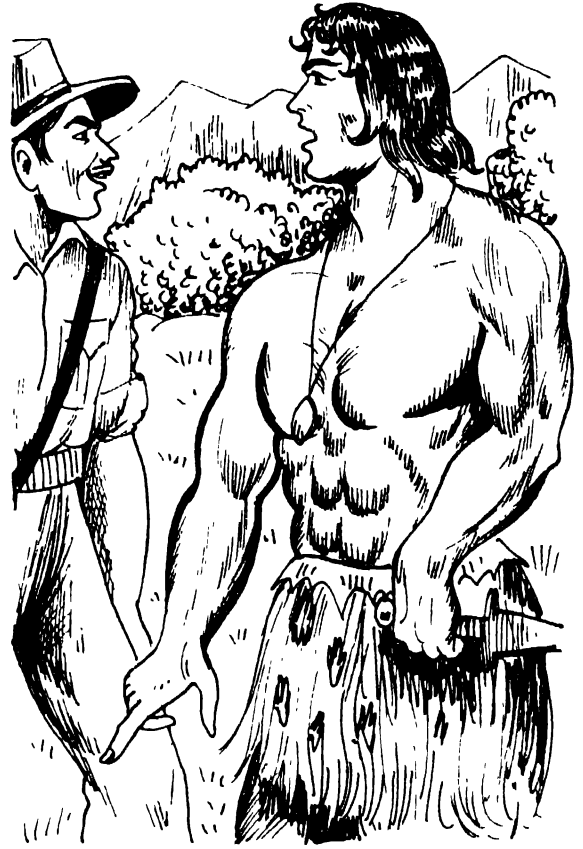
আলুর ও সমগ্র পান-উল দলের রাজারূপে জাদনের অভিষেক হবার পরই তাদেনের সঙ্গে ওলোয়া আর ওমতের সঙ্গে পানাৎ লীর বিয়ে হয়ে গেল।

রাজা হয়েই তার সিংহাসনের পাশে টারজনকে বসিয়ে জাদন বলল, আমরা কিভাবে রাজ্য শাসন করব সে বিষয়ে ডোর-উল-ওথো তাঁর পিতার ইচ্ছা প্রকাশ করুন।

টারজন বলল, আজ থেকে মন্দিরে আর কোন রক্তপাত চলবে না। এতদিন অত্যাচারী পুরোহিতরা তোমাদের বুঝিয়ে এসেছে জাদ-বেন-ওথো এক নিষ্ঠুর দেবতা যিনি মানুষের রক্ত পান করতে ভালবাসেন। কিন্তু একথা যে ভুল তা তো আজ প্রমাণিত হয়ে গেল।

.জাদন বলল, বন্দী পুরোহিতদেব নিয়ে কি কবব? তাদের কি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে?

টারজন বলল, না, ওদেব ছেড়ে দাও। ওরা ইচ্ছামত নিজেদের পথ বেছে নেবে।

জাদন ও তাদেনেব অনুরোধে টারজন ও ওমৎ একসপ্তাহকাল আলুরের প্রাসাদে রয়ে গেল। এরপর ওমৎ তাব রাজ্যে চলে যাবে। ঠিক হলো টারজন সপবিবাবে যেদিন উত্তব দিকে তার দেশের দিকে রওনা হবে সেদিন একদল হোদন ও একদল ওয়াজ-দন যোদ্ধা তার সঙ্গে অনেক দূব পর্যন্ত গিয়ে বিপদ-সংকুল জলাশয়গুলো পার করে দিয়ে আসবে।

টারজনের বিদায়কালে ওমৎ আব তাদেন দুজনেই বিদায় অভিবাদন জানাল।

টারজন ও নিষিদ্ধ নগরী

টারজন এ্যাণ্ড দি ফরবিডন সিটি

তখন বর্ষা শেষ হয়ে গেছে। দুপুরবেলা। একটা হাতির পিঠের উপর পা ছড়িয়ে শুয়েছিল টারজন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন নিগ্রো টারজনের সামনে এসে দাঁড়াল।

টারজন বলল, কি খবর ওগাবি?

ওগাবি বলল, আমি এখন শ্বেতাঙ্গ মালিক গ্রেগরির সফরিতে যোগদান করেছি। গ্রেগরি আমাকে বড় মালিক টারজনের খোঁজে পাঠাল।

টারজন বলল, আমি গ্রেগরিকে চিনি না। কি জন্য আমাকে খুঁজতে পাঠাল?

সে আপনাকে তার কাছে লোয়াঙ্গো গাঁয়ে নিয়ে যেতে বলল আমাকে।

না, টারজন সেখানে যাবে না। গাঁটা বড় নোংরা আর লোকগুলো খুব খারাপ।

কিন্তু মালিক দার্ণৎ বলল টারজন আসবেই।

টারজন এবার আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, লোয়াঙ্গো গাঁয়ে দার্ণৎ এল কি করে? এ কথা আগে বলনি কেন আমাকে?

এই কথা বলেই হাতির পিঠ থেকে একলাফে নেমে হাতিটাকে বিদায় জানিয়ে সেই মুহূর্তে লোয়াঙ্গো গাঁয়ের পথে রওনা হয়ে পড়ল টারজন। ওগাবি তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

লোয়াঙ্গো গাঁয়ে তখন দারুণ গরম। ফরাসী নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন পল দার্ণৎ কোন একটা হোটেলের ঘরে টেবিলের তলায় পা ছড়িয়ে একটা চেয়ারের উপর বসেছিল। হেলেন গ্রেগরির সুন্দর চেহারাটার পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।

হেলেন একসময় দার্ণৎকে বলল, আপনি কি মনে করেন যে টারজনকে আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি ব্রিয়ানকে খুঁজে বার করতে পারবেন?

পল দার্ণৎ বলল, সারা আফ্রিকার জঙ্গলে কোথায় কি আছে তা টারজনের মত এত ভাল করে আর কেউ জানে না। তবে মনে রাখবে তোমার ভাই নিখোঁজ হয়েছে আজ থেকে দুবছর আগে।

হেলেনের বাবা ঘরেই ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, হ্যাঁ ক্যাপ্টেন, আমি বুঝি আমার ছেলে হয়ত মারা গেছে।

সেই ঘরেরই একপ্রান্তে অন্য একটি টেবিলে এক যুবতী তার পাশের একজন সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছিল। যুবতী মেয়েটির নাম মাগরা আর লোকটির নাম লাল টাস্ক।

এমন সময় টারজন ঘরে ঢুকে সোজা দার্ণতের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল ওরা সবাই। মাগরা আশ্চর্য হয়ে বলল, এ কখনো হতে পারে না।

হেলেন বলল, না বাবা, ব্রিয়ান এখনো মরেনি। আমি তা জানি। আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করে অনেক খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি, অভিযানকারীদের মধ্যে চারজন মারা যায় আর বাকি সবাই পালিয়ে যায়। মৃতদের দলে ব্রিয়ান ছিল না।

গ্রেগরি বলল, দেরী হয়ে গেলে মুস্কিল হয়ে যাবে। ওগাবি গেছে প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল। কিন্তু টারজনের এখনো দেখা নেই। তাকে হয়ত খুঁজে পায়নি। আমি অবিলম্বে রওনা হতে চাই। তাছাড়া উলফ্‌ও ভাল লোক। সেও নাকি আফ্রিকার সব জায়গা চেনে।

দার্ণৎ বলল, আপনি হয়ত ঠিকই বলেছেন তবে টারজন আপনাদের সঙ্গে থাকলে ভাল হত।

গ্রেগরি আর হেলেনও টারজনকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উঠল, কারণ টারজনকে দেখতে অনেকটা ব্রিয়ানের মত।

দার্ণৎ গ্রেগরিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল টারজনের। গ্রেগরি বললেন, আশ্চর্যজনক চেহারার মিল।

ওদিকে মাগরা লাল টাস্ককে বলল, ওই হচ্ছে ব্রিয়ান গ্রেগরি।

লাল বলল, ঠিক বলেছ তুমি। ওর জন্য আমরা কয়েক মাস ধরে খোঁজ করছি আর ও আমাদের হাতের কাছে এসে পড়ল। ওকে আতন থোমের কাছে ধরে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কি করে নিয়ে যাব সেটাই ভাবনার কথা।

মাগরা লালকে নিয়ে ভিতরের দিকে একটা ঘরে চলে গেল। মাগরা বলল, সোজাসুজি বললে বা আমাদের দেখলে ও আসবে না। একটা ছেলেকে দিয়ে একটা চিঠি পাঠাচ্ছি।

টারজন যখন দার্ণৎ আর গ্রেগরির সঙ্গে কথা বলছিল তখন হঠাৎ হোটেলের একটি বালকভৃত্য এসে টারজনের হাতে একটা চিঠি দিল।

টারজন চিঠিটা পড়ে দার্ণৎকে বলল, লিখেছে পাশের ঘরে এখনি আমাকে দেখা করতে হবে। তলায় 'পুরনো বন্ধু' এই বলে নাম সই করেছে। বিশেষ জরুরী।

দার্ণৎ সাবধান করে দিল টারজনকে।

তবু টারজন শুনল না। চলে গেল। সে সেই হোটেলেরই অন্য এক ঘরে গিয়ে দেখল একটা টেবিলের পাশে লম্বা চেহারার সুন্দরী এক যুবতী দাঁড়িয়ে রয়েছে। টারজন তাকে বলল, নিশ্চয় আমার কোন ভুল হয়েছে। আমি ত আপনাকে চিনি না।

মাগরা বলল, কোন ভুল হয়নি ব্রিয়ান গ্রেগরি। আমার মত এক পুরনো বন্ধুকে বোকা বানাতে পার না তুমি!

তার কণ্ঠে যেন ভীতিপ্রদর্শের ভাব ছিল। টারজন ঘুরে দাঁড়াল।

মাগরা বলল, কারণ এখান থেকে জোর করে চলে যাওয়াটা হবে তোমার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। লাল টাস্ক পিস্তল হাতে তোমার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। তুমি আমার সঙ্গে পুরনো বন্ধু হিসাবে হাতে হাত দিয়ে উপরতলায় একটা ঘরে এস। পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে কিন্তু তোমার মৃত্যু অনিবার্য।

ওরা যখন উপরতলায় যাচ্ছিল তখন দার্ণৎ আর গ্রেগরি ওদের দেখতে পেল। দার্ণৎ দেখল, অচেনা একটি মেয়ে আর একটি লোকের সঙ্গে টারজন উপরতলায় কোথায় গেল। ওদের চোখের দৃষ্টিটা কিন্তু ভাল মনে হলো না দার্ণতের।

রুদ্ধদ্বার ঘরের সামনে গিয়ে ওরা দাঁড়াল। মাগরা ডাকতেই ভিতর থেকে কে দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকে টারজন দেখল একটা মাত্র জানালা আছে সেই ঘরে। আর একটা দরজা আছে পিছন দিকে পাশের ঘরে যাবার জন্য। কিন্তু দরজাটা বন্ধ।

আতন থোম টারজনকে দেখে বলে উঠল, তোমাকে দেখে খুশি হলাম ব্রিয়ান গ্রেগরি।

টারজন বলল, আমি ব্রিয়ান গ্রেগরি নই, তুমি সেটা জান। বল, কি চাও তুমি?

আতন একটু থেমে বলল, আমি চাই নিষিদ্ধ-নগরী আশেয়ারে যাবার পথনির্দেশ। এই পথ-নির্দেশসহ তুমি একটা মানচিত্র তৈরী করেছিলে। আমি সেই মানচিত্রটা চাই।

টারজন বলল, আমার কাছে কোন মানচিত্র নেই। আমি আশেয়ার নগরীর নামও শুনিনি।

আতন তখন রেগে গিয়ে লালকে কি বলল টারজন তা বুঝতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে খাপ থেকে পিস্তল বার করল লাল টাস্ক।

মাগরা বাধা দিয়ে বলল, না, ও কাজ কবো না।

এদিকে গুলির আওয়াজ পেয়ে দার্ণৎ গ্রেগরিকে নিয়ে টারজনের খোঁজে উপরতলায় চলে গেল। টারজনও একটা ঘর থেকে সাড়া দিতেই ওরা চলে গেল সেই ঘরে। ঘরে ঢুকেই দার্ণৎ বলে উঠল, কি ব্যাপার ?

টারজন বলল, একটা লোক আমাকে গুলি করতে গিয়েছিল ! কিন্তু যে মেয়েটি আমাকে আসার জন্য চিঠি দেয় সেই মেয়েটিই তার হাতটা সরিয়ে গুলিটাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট কবে দেয়। লোকটা বেগে গিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছে।

দার্ণৎ বলল, পিছন দিকে যে সিঁড়ি আছে তা উঠোনে নেমে গেছে। আমরা তাড়াতাড়ি গেলে ওদের ধরতে পারব।

টারজন বলল, ওদের যেতে দাও। লাল টাস্ক বলে একটা লোককে আমি মেঝের উপর ফেলে রেখেছি ঘায়েল করে। তার কাছ থেকে সব খবর পাব।

ওরা সবাই সেই ঘরে গিয়ে দেখল লাল টাস্ক সেখানে নেই।

দার্ণৎ বলল, ওরা কি চাইছিল তোমার কাছ থেকে ?

টাবজন বলল, ওরা ভেবেছিল আমিই ব্রিয়ান গ্রেগবি। ওরা নিষিদ্ধ নগরী আশেয়ারে যাবার জন্য আমার কাছ থেকে একটা ম্যাপ চাইছিল। ব্রিয়ান নাকি সেই ধরনের একটা ম্যাপ তৈরী করেছিল।
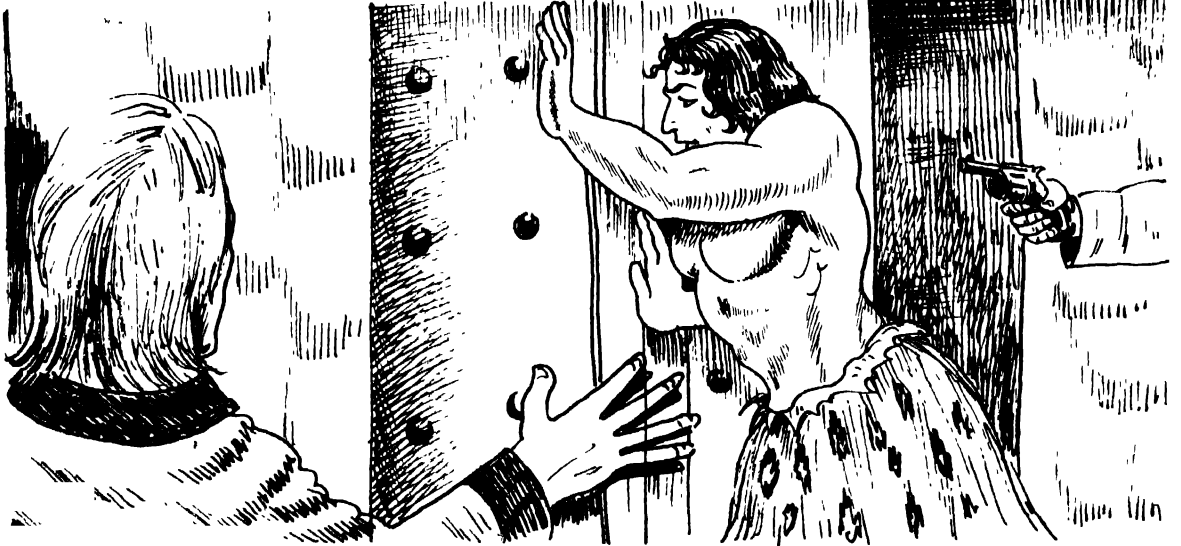
দার্ণৎ বলল, তুমি এখন কি করছ ?

টারজন বলল, আমি সে ঘরের দরজা ভাঙব।

এই বলে সে তার দেহের চাপে দরজাটা সত্যি সত্যিই ভেঙ্গে দিল। কিন্তু দেখল ঘরটা শূন্য। ওরা অন্য কোথাও পালিয়েছে।

গ্রেগরি বলল, আমি ওসব কিছুই জানি না। আমি শুধু আমার হারানো ছেলেকে খুঁজে পেতে চাই।

টারজন বলল, তাহলে আপনাদের কাছে কোন ম্যাপ নেই ?

গ্রেগরি বলল, হ্যাঁ আছে। ব্রিয়ান একটা মোটামুটি খসড়া করেছিল। সে কোথায় ছিল তার একটা আভাস দিয়েছিল শুধু।

দার্ণং এবার টারজনকে বলল, তুমি ওদের ঘরে যাবার আগে আমাকে প্রশ্ন করেছিলে, কেন তোমাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি।

টারজন বলল, হ্যাঁ।

দার্ণৎ বলল, আমি একটা বিশেষ কাজে লোয়াঙ্গোতে এসে মঁসিয়ে গ্রেগরিদের সঙ্গে পরিচিত হই। ওঁদের সমস্যার কথা শুনে খুবই কৌতূহলী ও আগ্রহী হয়ে উঠি আমি এ ব্যাপারে। আমি তখন তাঁকে বলি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে এমন একজন সুযোগ্য লোক আমার জানা আছে। সে ইচ্ছা করলে আপনাদের এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে তার ভার নিতেও পারে।

টারজন বলল, আমারও কৌতূহল জাগছে আপনাদের অভিযানে অংশ নিলে ওদের সঙ্গে আবার দেখা হবেই।

এরপর টারজন বলল, আপনার প্রস্তুতিকার্য সব শেষ?

গ্রেগরি বলল, বোঙ্গা থেকে আমরা প্রথম যাত্রা শুরু করব আশেয়ারের পথে। প্রথমে উলফ্ নামে এক শ্বেতাঙ্গ শিকারীর উপর এই অভিযানের সব কিছুর ভার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন অবশ্য আপনিই সব কিছু করবেন।

টারজন বলল, শিকারী হিসাবে ভদ্রলোক আসতে চায় ত আসুক না।

গ্রেগরি বলল, আগামীকাল সকালে হোটেলে সে এসে দেখা করবে আমাদের সঙ্গে।

লোয়াঙ্গোর বাজার অঞ্চলে ওং ফেঙের দোকানের পিছন দিকে পুরু পর্দাওয়ালা একটা ঘর আছে। সে

ঘরে আতন থোম উত্তেজিতভাবে কথা বলছিল মাগরার সঙ্গে।

আতন থোম একসময় বলল, কেন তুমি তাকে বাঁচালে? কেন আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিলে?

মাগরা আমতা আমতা করে বলল, কারণ, কারণ

আতন থোম বলল, কিন্তু তুমি ত জান আমি বিশ্বাসঘাতকদের কখনো ক্ষমা করি না।

মাগরা বলল, এখন আমাদের দরকার হলো আশেয়ারে যাওয়া, ফাদার অফ ডায়মণ্ডকে খুঁজে বার করা। গ্রেগরিরাও সেখানে যাচ্ছে। তার মানে তারা এখনো হীরে পায়নি। তাদের কাছে শুধু একটা ম্যাপ আছে। ব্রিয়ান সেই ম্যাপটা তৈরী করে। ম্যাপটা আমাদের পেতে হবে এবং আমার একটা পরিকল্পনা আছে। শোন।

আতন থোমের কানের কাছে মুখটা এনে মাগবা ফিসফিস করে কি বলতেই আতন থোমের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, চমৎকার। আগামী কালই লাল টাঙ্ক এ কাজটা সেরে ফেলবে। ওং ফেঙ এখন তারই কাজ করছে। সে না পারলে উলফ্ এ কাজ করবে।

পরদিন সকালে ছাদের উপর গ্রেগরিরা টারজনের সঙ্গে যখন প্রাতরাশ করছিল তখন উলফ্ এল। গ্রেগরি টারজনের সঙ্গে উলফের পরিচয় করিয়ে দিল। টারজনের পরনে কৌপীন আর তার হাতে আদিম কালের অস্ত্রশস্ত্র দেখে উলফ্ বলল, এ যে দেখছি একটা বুনো লোক। একে আপনি সঙ্গে নেবেন গ্রেগরি?

গ্রেগরি বলল, টারজনের উপর আমাদের অভিযানের সব দায়িত্ব থাকবে।

উলফ্ বলল, সেকি? সে কাজ ত আমার।

টারজন বলল, সেটা আগের কথা। এখন যদি শুধু শিকারী হিসাবে আমাদের দলে আসতে চাও তাহলে আসতে পার।

উলফ্ কিছুক্ষণ ভেবে বলল, ঠিক আছে। তাই যাব।

টারজন বলল, আগামী কাল নৌকোয় করে আমরা বোঙ্গা যাচ্ছি। সেখানেই তুমি অপেক্ষা করবে। তার আগে তোমাকে কোন দরকার নেই।

ক্ষুণ্ণ মনে চলে গেল উলফ্।

গ্রেগরি বলল, আমার মনে হচ্ছে ওকে শত্রু করে তুললে।

টারজন তাচ্ছিল্যভরে বলল, আমি ত ওকে একটা কাজ দিয়েছি। তবে ওর উপর কড়া নজর রাখতে হবে।

দার্ণৎ বলল, উলফ্ আবার আসছে।

উলফ্ এসে সরাসরি গ্রেগরিকে বলল, আমি ভাবলাম আমরা কোথায় যাচ্ছি তা একবার ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। কোথায় কোথায় ভাল শিকার পাওয়া যায় সেই সব জায়গাগুলোও দেখতে হবে। আপনার কাছে ম্যাপ আছে?

গ্রেগরি বলল, আছে। হেলেন, তোমার কাছে ছিল ম্যাপটা। কোথায় সেটা?

হেলেন বলল, উপরের ড্রয়ারটায়।

গ্রেগরি বলল, এস উলফ্ দেখি একবার চোখ বুলিয়ে।

উলফ্‌কে নিয়ে গ্রেগরি হেলেনের ঘরে গেল। বাকি সবাই ছাদেই বসে রইল। ড্রয়ারের কাগজপত্র ঘেঁটে ম্যাপটা বার করল গ্রেগরি। তারপর টেবিলের

উপর ম্যাপটা খুলে ধরল উলফ্। সেটা কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে বলল, আমি ওদেশের কিছুটা জানি। কিন্তু আমি আশেয়ারের নাম শুনিনি কখনো।

কিছুক্ষণ পর উলফ্ বলল, আমাকে ম্যাপটা একবার দিন না, কালই আমি এটা ফেরৎ দিয়ে যাব।

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে গ্রেগরি বলল, ম্যাপটা আমি হাতছাড়া করতে পারি না।

উলফ্ বলল, ঠিক আছে।

সেদিন দার্ণৎ টারজন আর গ্রেগরিদের লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছিল। খাবার পর দার্ণৎ হেলেনকে দেখতে পেল না। শুনল, হেলেন বাজারে গেছে কিছু জিনিসপত্র কেনার জন্য। দার্ণৎ আগেই তাকে নিষেধ করেছিল, সে যেন বাজারে একা না যায়, কারণ জায়গাটা ভাল নয়। তবু হেলেন সে নিষেধ শোনেনি।

এদিকে আতন থোম তখন ওং ফেঙের দোকানের পিছন দিকের একটা ঘরে বসে লাল টাস্কের পথ চেয়ে বসেছিল উদ্বিগ্ন হয়ে। পাশের একটা ঘরে মাগরা হেলেনকে পাহারা দিচ্ছিল। হেলেন একসময় বলল, আচ্ছা, ম্যাপটা পেলে কি ওরা আমায় ছেড়ে দেবে?

মাগরা বলল, ম্যাপটা পেলেও এখান থেকে ওরা নিরাপদে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না তোমাকে। আমি এ জন্য খুবই দুঃখিত। আতন থোম এখন হীরের লালসায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে। ও ম্যাপটা না পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হবে না।

হেলেন বলল, ম্যাপটা না পেলে ওরা কি সত্যি সত্যিই আমাকে দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেবে?

মাগরা বলল, হ্যাঁ দেবে।

এমন সময় লাল টাস্ক আতন থোমের ঘরে এসে

ঢুকল। বলল, একটা কাগজ একটুকরো পাথরের সঙ্গে বেঁধে ফেলে দিয়েছে। দেখ কি লিখেছে।

থোম পড়ে দেখল, ওরা লিখেছে ম্যাপটা চুরি হয়ে গেছে।

থোম বলল, আমি ম্যাপ ছাড়াই আশেয়ারে যাব। ওর মেয়েকে আমি কোনদিন ছাড়ব না। দেখ কে ডাকছে।

লাল দরজা খুলে দেখল উলফ্। সে এসেই বলল, আশেয়ারে যাবার পথ-নির্দেশের ম্যাপটা পেলে কি দেবে তুমি?

থোম বলল, পাঁচশো পাউণ্ড।

উলফ্ বলল, হাজার পাউণ্ড দেবে আর যা হীরে পাবে তার অর্ধেক অংশ। তাহলে ম্যাপটা দেব।

আতন থোম বলল, কি করে দেবে?

উলফ্ বলল, আমি ম্যাপটা হেলেনের ঘর থেকে চুরি করে এনেছি।

থোম বলল, তোমার কাছেই আছে তাহলে?

উলফ্ বলল, ম্যাপটা কাড়ার চেষ্টা করবে না।

টাকা দাও, ম্যাপটা নিয়ে নাও।

উলফ্ তার পকেট থেকে ম্যাপটা বার করে থোমকে দেখাল। কিন্তু তার হাতে ছেড়ে দিল না। থোম তার পকেট থেকে ইংলণ্ডের একটা ব্যাঙ্ক থেকে আনা একতাড়া নোটের বাণ্ডিল বার করে তার থেকে পাঁচশো পাউণ্ড বার করে উলফের হাতে দিল।

উলফ্ বলল, তোমার মত টাকা থাকলে আমি কখনো এত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে হীরের খোঁজে যেতাম না।

থোম বলল, তুমি কি তাহলে গ্রেগরিদের সঙ্গে যাচ্ছ?

উলফ্ বলল, নিশ্চয়। আমি গরীব মানুষ, একটা কাজ চাই ত। তবে তুমি আশেয়ারে পৌঁছলে এবং হীরের খোঁজ পেয়ে গেলে আমি তোমার কাছে গিয়ে হাজির হব। তার অর্ধেক ভাগ আমায় দিতেই হবে।

থোম বলল, তুমি আর একটা উপকার আমার করতে পার। আমি মাগরাকে গ্রেগরিদের দলে পাঠাচ্ছি। সে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। তোমার কাজ হবে তাদের ভুল পথে চালিত করা। তারা পথ হারিয়ে ফেললে তুমি মাগরাকে নিয়ে সোজা আশেয়ারে চলে আসবে। ওখানকার পথ তোমার চেনা আছে। তুমি আমার শিবিরে গিয়ে উঠবে। বুঝলে?

উলফ্ বলল, বুঝেছি। আমি তাহলে যাচ্ছি।

সেদিন দুপুর রাতে আতন থোম লাল টাস্ক আর হেলেনকে নিয়ে একটা স্টীমারে চাপল। স্টীমারে ওঠার সময় মাগরাকে বিদায় দিয়ে বলল, যেকোন অছিলায় গ্রেগরিদের দলে যোগদান করবে। উলফ্কে আমি বিশ্বাস করি না। তার উপর নজর রাখবে। তাছাড়া তুমি গ্রেগরিদের দল ত্যাগ না করা পর্যন্ত ওকে আমি ছাড়ব না।

পরদিন সকালেই মাগরা গ্রেগরিদের কাছে চলে গেল। গত রাতে হেলেনের চিন্তায় ঘুম হয়নি ওদের। সকালে উঠেই দার্ণৎ বলল, আর পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

গ্রেগরি বলল, কিন্তু পুলিশে খবর দিলে ওরা যদি হেলেনকে মেরে ফেলে?

এমন সময় দরজায় করাঘাত শুনে গ্রেগরি বলল, ভিতরে এস।

দরজা খুলে মাগরা ঘরে ঢুকল।

মাগরাকে দেখে চমকে উঠল দার্ণৎ, তুমি!

দার্ণতের দিকে না তাকিয়ে মাগরা টারজনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি এসেছি তোমার বোনের সন্ধান দিতে।

গ্রেগরি বলল, কোথায় সে? তার সম্বন্ধে কি জান?

মাগরা বলল, আতন থোম তাকে বোঙ্গা হয়ে দূর জঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছে। গত রাতে বোঙ্গা যাবার জন্য স্টীমার ধরেছে। আমারও যাবার কথা ছিল তাদের সঙ্গে। কিন্তু কেন যাইনি তা জানতে চেও না।

দার্ণৎ বলল, কিন্তু স্টীমারটা ত আজকে ছাড়ার কথা ছিল।

ওরা ঘুষ দিয়ে ক্যাপ্টেনকে বশ করেছে।

টারজন বলল, এই মেয়েটির কথা বিশ্বাস করবে না।

মাগরা বলল, আমার কথা বিশ্বাস করতে পার। বিশ্বাস না হলে আমাকে তোমাদের এখানে আটক করে রেখে দিতে পার।

গ্রেগরি হা হুতাশ করতে লাগল হেলেনের জন্য। আমার ছেলে গেছে এবার মেয়েও গেল।

দার্ণৎ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, হতাশ হয়ো না, যা হয় একটা উপায় হবেই।

গ্রেগরি বলল, চার দিনের মধ্যেই আতন থোম বোঙ্গা চলে যাবে। নৌকোটা আবার বোঙ্গাতেই একদিন থেকে যাবে। তারপর এখানে ফিরে আসতে তার আড়াই দিন সময় লাগবে। তারপর আমরা ক্যাপ্টেনকে সঙ্গে সঙ্গে রাজী করিয়ে স্টীমারে রওনা হয়ে পড়লেও ইতিমধ্যে থোম ছয় সাত দিন সময় পেয়ে যাবে। সে তখন অনেক দূর ভিতরে চলে যাবে।

দার্ণৎ বলল, টারজন যখন আছে থোম আফ্রিকার মধ্যে যেখানেই থাক টারজন তাকে খুঁজে বার করবেই। আমি একটা উপায় খুঁজে বার করেছি। নৌবাহিনীর কর্তৃপক্ষকে বলে আমি একটা সামুদ্রিক বিমানের ব্যবস্থা করব। তাহলে আতন থোম বোঙ্গা থেকে চলে যাবার আগে তাকে গিয়ে আমরা ধরতে পারব।

মাগরার মনে যাই থাক কথাটা শুনে চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না।

দার্ণতের চেষ্টায় কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিমান যোগাড় করে ওরা রওনা হলো।

বিমানটা আকাশে ওড়ার আধ ঘন্টার মধ্যেই তাদের বিমানটা এক ঝড়ের কবলে পড়ে গেল। পাইলট লাভাক ভেবেছিল ঝড়টা বেশীক্ষণ স্থায়ী হবে না এবং একটা বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

কিন্তু ওদের বিমানটা ক্রমেই দুলতে লাগল। এক ঘন্টা এইভাবে কাটার পর লাভাক দার্ণৎকে তার কাছে আসার জন্য ইশারায় ডাকল। দার্ণৎ কাছে এলে সে বলল, ঝড়টা যে এত সাংঘাতিক হবে তা আগে বুঝতে পারেনি ক্যাপ্টেন।

আরো দুঘন্টা ধরে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিমানটাকে চালিয়ে নিয়ে গেল লাভাক। তারপর হঠাৎ এঞ্জিন থেকে তেল বেরিয়ে আসতে লাগল। দার্ণৎ সবাইকে সাবধান করে দিল। বলল, সবাই লাইফ বেল্ট পরে তৈরী হয়ে নাও। আমার প্লেন নামতে শুরু করেছে।

দার্ণৎ লাভাককে জিজ্ঞাসা করল, আমরা এখন কোথায় আছি? এটা কোন্ অঞ্চল? কতটা উপরে আছি?

লাভাক বলল, এটা অরণ্য অঞ্চল, জায়গাটা কি তা বলা শক্ত। তাছাড়া কম্পাসটা ঠিক নেই। এখন আমরা প্রায় তিনশো ফুট উপরে আছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে জাহাজটা একটা বড় লেকের ধারে জঙ্গলের গা ঘেঁষে পড়ে গেল। ওদের কারো কোন আঘাত লাগল না। শুধু ওগাবি ভয়ে অচেতন হয়ে পড়ল।

আজ চারদিন ধরে তারা এই জঙ্গলে বন্দী হয়ে আছে। উড়োজাহাজটাকে আর ওড়াতে পারেনি ওরা।

দার্ণৎ একদিন টারজনকে জিজ্ঞাসা করল, এখন বুঝতে পারছ আমরা কোথায় আছি?

টারজন বলল, এ জায়গাটা হলো বোঙ্গার পূর্ব দিকে আর কিছুটা দক্ষিণ দিকে। আমাদের আর বোঙ্গা যেতে হবে না। আমরা এখান থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে গেলেই পথে ওদের সঙ্গে দেখা হবে। তাছাড়া সঙ্গে আমাদের বোঝা না থাকায় ওদের থেকে তাড়াতাড়ি পথ চলতে পারব।

এদিকে বোঙ্গা থেকে রওনা হয়ে একদল লোকের একটি সফরি উত্তর পূর্ব দিকে এগিয়ে চলেছিল। সেই দলে ছিল তিনজন শ্বেতাঙ্গ।

সে দলের নেতা ছিল আতন থোম আর যুবতী মেয়েটি ছিল হেলেন। একসময় আতন থোম হেলেনকে বলল, চালাকি করে আমরা বোঙ্গা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। বোঙ্গায় এসে আশে-য়াবের পথে রওনা হতে তোমার বাবার এক সপ্তা অথবা তারও বেশী সময় লাগবে। ততক্ষণে আমরা এত দূরে গিয়ে পড়ব যে তারা আর আমাদের ধরতে পারবে না।

হেলেন বলল, তুমি বোকার মত কাজ করছ। তুমি যদি বুদ্ধিমান হতে তাহলে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বোঙ্গায় পাঠিয়ে দিতে। আমাকে ছেড়ে না দিলে বাবা তোমাকে ছাড়বে না। তোমাকে যেমন করে হোক ধরবেই।

সন্ধ্যে হতেই ওরা এক জায়গায় শিবির স্থাপন করল রাতের বেলায় হেলেন তাঁবুর পিছন দিক দিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পালিয়ে গেল। চাঁদের আলোয় পথ চিনে চিনে এগিয়ে চলেছিল সে। অদূরে একটা সিংহ গর্জন করছিল। কিন্তু সিংহের থেকে তার বেশী ভয় হচ্ছিল আতন থোমকে।

না জেনেই একটা পথ পেয়ে গিয়েছিল হেলেন। সেই পথটা ধরে সারারাত যেতে লাগল সে। সে ভেবেছিল সে বোঙ্গার পথেই যাচ্ছে। কিন্তু সকাল হতেই সে যখন বন পার হয়ে একটা বিরাট ফাঁকা প্রান্তরে এসে পড়ল তখন সে বুঝতে পারল পথ

হারিয়ে ফেলেছে সে।

বুইরু নামে এক নরখাদক জাতীয় নিগ্রো আদিবাসীদের সর্দার পিঙ্গুর ছেলে চেমিঙ্গো সেদিন তিনজন নিগ্রোযোদ্ধাকে নিয়ে একটা মানুষখেকো সিংহ শিকার করতে বেরিয়ে এসেছিল গাঁ থেকে।

চেমিঙ্গোই প্রথম দেখতে পেল হেলেনকে। সে তার সঙ্গীদের বলল, ঐ দেখ এক শ্বেতাঙ্গ মেয়ে আসছে। আমি ওকে আমার বাবার কাছে ধরে নিয়ে যাব।

হেলেন দেখল চার পাঁচজন নিগ্রো বর্শা হাতে তাকে ধরতে আসছে। সে দেখল তারা এখনো বেশ কিছুটা দূরে। সে তাই উপত্যকা ছেড়ে বনের দিকে ছুটতে লাগল।

কিন্তু বনে ঢোকার মুখেই একটা সিংহ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হেলেন। উভয় সংকটে পড়ল সে। একদিকে মারমুখী নিগ্রোযোদ্ধা আর একদিকে মানুষখেকো সিংহ।

চেমিঙ্গোরাও সিংহটাকে দেখেই বুঝতে পারল এই মানুষখেকো সিংহটারই খোঁজ করে বেড়াচ্ছে ওরা। সিংহটা তখন হেলেনের উপর ঝাঁপ দেবার জন্য উদ্যত হতেই চেমিঙ্গো তার বর্শাটা সজোরে ছুঁড়ে দিল সিংহটার বুকে।

আহত সিংহটা তখন হেলেনকে ছেড়ে চেমিঙ্গোকে আক্রমণ করল। চেমিঙ্গো তখন শুয়ে পড়ে তার উপর তার বড় ঢালটা চাপিয়ে দিল। এবার চতুর্থ সঙ্গীটি তার বর্শাটা দিয়ে আহত সিংহের বুকটা বিদ্ধ করল। সিংহটা এবার পড়ে গেল মাটিতে। চেমিঙ্গো তখন মাটি থেকে উঠে পড়ল।

এরপর চেমিঙ্গো হেলেনকে টানতে টানতে তাদের গাঁয়ের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

সর্দার পিঙ্গু বলল, আজ রাতেই ওকে মারা হবে। সেই সঙ্গে নাচ গান ও উৎসব হবে।

গ্রেগরিদের সফরিটা তখন বনপথ পার হয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটায় এসে পড়ে।

গ্রেগরি বলল, বোঙ্গায় গিয়ে আমাদের আতন থোমকে ধরতেই হবে। সেখানে তার হাত থেকে হেলেনকে উদ্ধার করতে হবে। তাছাড়া আমাদের হাতে ম্যাপ নেই। ম্যাপটা থাকলেও আমরা না হয় আশেয়ারে গিয়ে ওদের ধরতাম।

উলফ্ বলল, আমি ও পথ চিনি। গ্রেগরি যদি আমাকে এক হাজার পাউণ্ড আর হীরের অর্ধেক ভাগ দিতে রাজী হয় তাহলে আমি আশেয়ারে ওকে নিয়ে যাব।

টারজন বলল, তুমি একটি কুটিলমনা বদমাস লোক। তারপর সেখান থেকে চলে গেল।

গ্রেগরি দার্ণৎকে জিজ্ঞাসা করল, টারজন কোথায় গেল।

দার্ণৎ বলল, ও গেল কোন এক আদিবাসীদের গাঁয়ের সন্ধানে। সেখানে কিছু নিগ্রোভৃত্য পাওয়া যেতে পারে। এইভাবে সে তোমার ও মেয়ের কোন সন্ধান পেয়ে যেতে পারে।

টারজন গাছের ডালে ডালে যখন যেতে লাগল তখন দিন শেষ হয়ে আসছিল। সে দেখল মোট

তিনটে লোক তার শত্রু। তারা হলো আতন থোম, লাল টাস্ক আর উলফ্। কিন্তু মাগরা একটা রহস্য তার কাছে। তাকে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। সে অবশ্য জবাব বুলেটের হাত থেকে তার জীবন বাঁচিয়েছে একথা ঠিক। কিন্তু আসলে সে আতন থোমের দলের লোক এবং তার চর।

একটা হরিণ শিকার করতে যেতেই দূর থেকে আদিবাসীদের ঢাকের আওয়াজ কানে এল টারজনের।

লাল টাস্ক বলল, ঐ ঢাকের আওয়াজ শুনলে আমার বড় ভয় হয়।

আতন থোম বলল, আগামীকাল রাতে আর এ ঢাকের আওয়াজ শুনতে হবে না। কারণ তখন আমরা আশেয়ারের পথে অনেক দূর এগিয়ে যাব।

এদিকে গ্রেগরিদের শিবিরে তখনো টারজন ফিরে না আসায় মাগরা ব্যস্ত হয়ে বলল, টারজন এখনো ফিরে এল না।

লাভাক বলল, এতক্ষণ ধরে যে ঢাকগুলো বাজ-

হেলেনের হাত পা বেঁধে চেমিঙ্গোরা তাদের গাঁয়ের একটা নোংরা কুঁড়ে ঘরে বন্দী করে রেখে-ছিল। হঠাৎ সে ঢাকের শব্দ শুনে চমকে উঠল। হেলেন বুঝল, ওরা নরখাদক নিগ্রো। একটু পরেই তাকে হত্যা করে তার মাংস খাবে ওরা।

হেলেনকে এবার কয়েকজন নিগ্রোযোদ্ধা হাত পা বাঁধা অবস্থায় ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সর্দার পিঙ্গুর ঘরের সামনে একটা লম্বা বাঁশের খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখল। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটাকে এক দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল হেলেনের। হঠাৎ একটা বর্শার ফলকের অগ্রভাগ তার গায়ের এক জায়গায় চামড়াটা ভেদ করতেই তার হুঁস হলো।

আতন থোম তখন তাদের শিবিরে লাল টাস্কের সঙ্গে কথা বলছিল। তারাও ঢাকের আওয়াজটা শুনেছিল।

ছিল দূরে তা হঠাৎ থেমে গেল।

অসহায় হেলেনকে ঘিরে যখন নরখাদক আদি-বাসীরা নাচতে লাগল এক বন্য বর্বর উল্লাসে আর মাঝে মাঝে তাদের বর্শার ফলকের অগ্রভাগ দিয়ে হেলেনের গাটাকে স্পর্শ করছিল তখন তার মনে হচ্ছিল এর থেকে একটা বর্শার আঘাতে তার মৃত্যু ঘটলে ভাল হত।

এদিকে টারজন ঢাকের শব্দ লক্ষ্য করে পিঙ্গুদের গাঁটার সামনে এসে পড়ল। সে বন্ধ গেটটা লাফ দিয়ে পার হয়ে গাঁয়ের মধ্যে পড়ে একটা গাছের উপর উঠে পড়ল। তাকে কেউ দেখতে পেল না। নাচের জায়গায় যে আগুন জ্বলছিল তার আলোয় টারজন দেখল যাকে ঘিরে আজ এই হত্যার উৎসব শুরু হয়েছে সে হচ্ছে বন্দিনী হেলেন। নাচতে নাচতে একজন আদিবাসী মুহূর্তের উত্তেজনায় তার বর্শা উঁচু করে হেলেনের বুকটাকে বিদ্ধ করার জন্য উদ্যত

হলো। হেলেন তার চোখদুটো বন্ধ করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলো।

সহসা কোথা থেকে একটা তীর রহস্যময়ভাবে এসে সেই আদিবাসীর বুকটা বিদ্ধ করতেই সে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সব বাজনা থেমে গেল। আহত লোকটার আর্ত চীৎকারে হেলেন চোখ খুলে দেখল তার পায়ের তলায় একটা লোক তীরবিদ্ধ অবস্থায় মরে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন একটা ছুরি হাতে এগিয়ে এল হেলেনের দিকে। টারজন তখন গাছের উপর থেকে এমন ভয়ঙ্করভাবে বিজয়োল্লাসসূচক এক চীৎকার করে উঠল যে আদিবাসীরা স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই।

সে চীৎকার শুনে যে লোকটা ছুরি হাতে হেলেনকে বধ করতে এসেছিল সে থেমে গেল। এমন সময় গাছের উপর থেকেই টারজন বলতে লাগল, শ্বেতাঙ্গ বনদেবতাকে নিয়ে যাবার জন্য অরণ্যদানব এসেছে। সাবধান সবাই।

এই বলে সে গাছ থেকে নেমে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। অন্য সব আদিবাসীরা এতে ভয় পেয়ে সরে দাঁড়ালেও সর্দার পিঙ্গুর ছেলে চেমিঙ্গো একটা ছুরি হাতে এগিয়ে এসে বলল, চেমিঙ্গো অরণ্যদানবকে ভয় করে না।

টারজন হেলেনের বাঁধনগুলো খুলে দিয়ে চেমিঙ্গোর দিকে এগিয়ে গেল। একটা হাত দিয়ে চেমিঙ্গোর একটা হাত আর অন্য একটা হাত দিয়ে তার পেটটা ধরে মাথার উপর তাকে তুলে ধরল টারজন।

এবার টারজন চেমিঙ্গোকে তুলে ধরে বলল, গেট খুলে দাও, তা না হলে পিঙ্গুর ছেলে চেমিঙ্গো মরবে।

পিঙ্গু এগিয়ে গিয়ে টারজনকে বলল, তুমি আমার ছেলেকে মেরো না। আমরা গেট খুলে দিচ্ছি।

টারজন বলল, তোমরা যদি গেট খুলে দিয়ে আমাদের যাবার পথ পরিষ্কার করে দাও তাহলে তোমার ছেলের কোন ক্ষতি করব না।

পিঙ্গু গেট খোলার আদেশ দিল। গেট খুলে দিতেই টারজন হেলেনকে নিয়ে বাইরে গিয়ে পিঙ্গুকে ছেড়ে দিল।

টারজন আর হেলেন গাঁয়ের সীমানা ছেড়ে গ্রেগরিদের ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। টারজন হেলেনকে বলল, তুমি কি করে এখানে এসে পড়লে?

হেলেন বলল, আমি গতকাল রাতে আতন থোমের শিবির ছেড়ে বোঙ্গা যাবার উদ্দেশ্যে পথ চলতে থাকি। কিন্তু আমি ভুল পথে এসে পড়ি। আজ এই গাঁয়ের একদল আদিবাসী আমায় ধরে আনে এখানে। কিন্তু তুমি কি করে এলে?

টারজন তখন তার সব কথা বলল।

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার পর গ্রেগরিদের শিবিরে সবাই যখন প্রাতরাশ খাচ্ছিল তখন মাগরা বলল, টারজন এখনো ফেরেনি?

এমন সময় দার্ণৎ দেখল টারজন আর হেলেন শিবিরের দিকে আসছে। গ্রেগরিও শিবিরের বাইরে থেকে হেলেনকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল তাকে। তার চোখে জল এসেছিল। লাভাক, দার্ণৎ সবাই আনন্দে ঘিরে দাঁড়াল তাকে। একমাত্র উলফ্ দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

টারজন বলল, আমি আতন থোমের সফরিটার খোঁজ করতে গিয়েছিলাম এবং খোঁজ পেয়েছি।

উলফ্ বলল, পথ চিনতে ভুল হতে পারে যে কোন মানুষের।

টারজন গম্ভীরভাবে বলল, ভুল নয়, ইচ্ছাকৃতভাবে তুমি আমাদের ভুল পথে চালিত করেছ। তুমি

আমাদের ঠকিয়েছ। এই লোকটাকে দল থেকে তাড়িয়ে দাও গ্রেগরি।

উলফ্ বলল, একা আমি এই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যাব?

গ্রেগরি বলল, তাড়াতাড়ো করে কিছু করা ঠিক হবে না।

টারজন বলল, ঠিক আছে। তোমরা যা খুশি করবে ওকে নিয়ে। কিন্তু পথপ্রদর্শকের কাজ থেকে ইস্তফা দেওয়া হলো আজ থেকে।

অবশিষ্ট হরিণের মাংসটুকু টারজন আর হেলেন খেল। খাবার পর হেলেন আতন থোমের শয়তানির কথা এবং তার সব অভিজ্ঞতা খুলে বলল। গ্রেগরি বলল, তার এই শয়তানির জন্য আতন থোমকে চরম মূল্য দিতে হবে।

দার্ণৎ আর লাভাক দুজনেই বলল, এর জন্য তাকে মরতে হবে।

এবার ওদের দলটা আতন থোমের দলটাকে ধরার জন্য এগিয়ে যেতে লাগল আশেয়াবের পথে। দুদিনের মত ওদের খাবার আছে দেখে একদিন টারজন গ্রেগরিকে বলল, আমি এখন যাচ্ছি। আজ বা কাল ফিরব।

তোমরা এগোতে পার। আমি ঠিক তোমাদের ধরে ফেলব।

ওরা আবার এগিয়ে চলল। দার্ণৎ বলল, টারজন আমাদের ঠিক ধরে ফেলবে।

সেদিন বিকালেই ফিরে এল টারজন।

আতন থোমের সফরিটা একটা গভীর বন থেকে বেরিয়ে একটা ফাঁকা প্রান্তরে এসে পড়ল। ওরা দেখল ওদের সামনে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে এক বিরাট শূন্য প্রান্তর আর তাদের ডান দিকে ছিল একটা নদী। ওদের সামনে দূরে প্রান্তরটার শেষপ্রান্তে যে কতকগুলো পাহাড় ছিল তার মধ্যে এটাকে একটা মৃত আগ্নেয়গিরি মনে হচ্ছিল।

থোম বলল, ঐ দেখ লাল টাস্ক, ঐটা হচ্ছে তুয়েন বাকা পাহাড়। পাহাড়টার ওপারেই আছে আশেয়ার, সেই নিষিদ্ধ নগরী।

লাল টাস্ক বলল, আর আছে হীরকদেশের পিতা মালিক।

আতন থোম বলল, আজ মাগরা থাকলে ভাল হত।

লাল টাস্ক বলল, ওরা না এলেই ভাল। হীরের ভাগ দিতে হবে না।

থোম বলল, কিন্তু মাগরার মাকে আমি কথা দিয়েছিলাম।

লাল টাস্ক বলল, সে অনেক দিনের কথা। মাগরার মা মারা গেছে আর মাগরাও সেকথা জানে না।

নিগ্রোভৃত্যরা তখন নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করছিল। মবুলু তাদের কাছ থেকে আতন থোমের কাছে এসে বলল, আমার লোকরা এখান থেকে যাবে না মালিক।

আতন থোম বলল, সেকি, আমি ত তাদের আশেয়ারে যাবার জন্যই নিযুক্ত করেছি।

মবুলু বলল, বোঙ্গা থেকে আশেয়ার তখন অনেক দূরে থাকায় তারা রাজী হয়েছিল। কিন্তু এখান থেকে আশেয়ার অনেক কাছে বলে তারা আর যেতে চাইছে না। তুয়েন বাকা হচ্ছে নিষিদ্ধ নগরী আশেয়ারের অভিশপ্ত সীমারেখা তাই তারা ভয় পেয়ে গেছে।

থোম বলল, তুমি হচ্ছ তাদের সর্দার। তুমি তাদের যেতে বাধ্য করবে।

মবুলু বলল, না, আমি তা পারব না। আজ এখানেই শিবির গড়ে তোলা হোক।

সে রাতে নদীর কলতান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেক হীরের স্বপ্ন দেখল আতন থোম। হীরক দেশের পিতাকে সে খুঁজে বার করবেই। সকাল হতেই সে নিগ্রোভৃত্যদের ডাকাডাকি করতে লাগল। কিন্তু কারো কোন সাড়াশব্দ পেল না। সে তখন উঠে নিজের নিগ্রোভৃত্যদের তাঁবুতে গেল। কিন্তু গিয়ে দেখল, নিগ্রোভৃত্যরা শিবির ছেড়ে সব পালিয়েছে।

সে গিয়ে তখন লাল টাস্ককে উঠিয়ে বলল, কুকুরগুলো সব আমাদের ছেড়ে হঠাৎ পালিয়েছে।

লাল টাস্ক বলল, আল্লা! তাহলে মালিক, আমরা মাত্র দুজনে সেখানে যেতে পারি না।

থোম বলল, চুপ করো. আমরা নিষিদ্ধ নগরী আশেয়ারে যাবই। মাগরা সবচেয়ে দামী হীরের গয়না পরবে। আমরা দুজনে সবচেয়ে ধনী হব। ভারতের রাজা মহারাজাদের হার মানিয়ে দেব আমি। প্যারিসের রাস্তাগুলোকে সোনা দিয়ে ভরিয়ে দেব।

এক জোর অট্টহাসিতে পাগলের মত ফেটে পড়ল থোম। বলল, এস, এই নদীর ধার দিয়ে বরাবর এগিয়ে চলব আমরা।

নদীর ধারের পথটা উঁচু নিচু এবং বড় বড় পাথরে ভরা। লাল টাস্ক থোমের পিছু পিছু যেতে লাগল নীরবে। কিছুদূর যাবার পর ওরা দেখল পথটা সরু হয়ে গেছে আর তার বাঁদিকে খাড়াই পাহাড়।

একবার পা ফস্‌কে গেলে ওরা পড়ে যাবে খরস্রোতা নদীর জলে। নদীর ওপারেও খাড়াই পাহাড়।

লাল টাস্ক বলল, মালিক ফিরে চল। জগতের সব হীরে পেলেও এ বিপদের ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না।

থোম বলল, না, এগিয়ে চল। এই পথই আশেয়ারে চলে গেছে। আমি মরে গেলে তবে ফিরে যাবে। চুপ করো। হৈ চৈ করো না। তুমি একটা কাপুরুষ।

হঠাৎ লাল টাস্ক বলল, আল্লা, শোন মালিক, বনের ভিতর থেকে কারা যেন আমাদের দেখছে। জায়গাটা খুব খারাপ। কি একটা শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে শব্দটা আসছে কবরের ভিতর থেকে।

আতন থোম আর লাল টাস্ক সেই রাতটা কোনরকমে সেই খাদের কাছে কাটিয়ে পরদিন সকালে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরতে লাগল।

আতন থোম বলল, লোকজন না হলে আশেয়ারে যাওয়া যাবে না। আমি বোঙ্গায় ফিরে গিয়ে কিছু সাহসী লোকজন যোগাড় করব।

নদীতে একটা বড় নৌকো ছিল। কুড়িজন নিগ্রো ক্রীতদাস নাবিক হিসাবে কাজ করছিল। যোদ্ধারা আতন থোম আর টাস্ককে সেই নৌকোতে চাপাল।

আতন থোম জোরে হেসে উঠল। টাস্ক বলল, হাসলে কেন মালিক?

থোম বলল, হাসলাম কারণ এ নৌকো যাবে নিষিদ্ধ নগরী আশেয়ারে।

নৌকোটা যখন আশেয়ারের দিকে এগিয়ে চলেছিল তখন একসময় থোম সেই সব যোদ্ধাদের নেতাকে বলল, তোমরা কেন আমাদের বন্দী করলে? আমাদের দিয়ে কি করবে?

যোদ্ধাদের নেতা বলল, তোমাদের বন্দী করেছি কারণ নিষিদ্ধ নগরী আশেয়ারের খুব কাছে তোমাদের পেয়েছি। এই নিষিদ্ধ নগরীতে একবার কেউ এলে আর সে ফিরে যেতে পারে না। আমরা আমাদের রাণী আটকার কাছে নিয়ে যাব। যা করার তিনিই করবেন।

এরপর নৌকো নদী ছেড়ে একটা বিরাট হ্রদে গিয়ে পড়ল। তার দুদিকে বন আর প্রান্তর দেখা যাচ্ছিল। তার ফাঁকে ফাঁকে দুদিকে দুটো নগরের বড় বড় প্রাসাদ দেখা যাচ্ছিল।

অবশেষে নিষিদ্ধ নগরী আশেয়ারের ঘাটে এসে নৌকোটা ভিড়তেই যোদ্ধারা আতন থোম আর লাল টাস্ককে নামতে বলল।

আতন থোম বলল, আমি একবার রাণীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের কথা তাঁকে নিজের মুখে জানাতে চাই।

অফিসার গিয়ে প্রহরীদের বলল, ওদের অনেক বেয়াদবি সহ্য করেছি। আর না। ওদের একটা ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ করে রেখে দাও। বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেই রকম খাদ্য তাদের দেবে।

শিকলবাঁধা অবস্থায় ওদের একটা অন্ধকার ঘরে ঠাণ্ডা পাথরের মেঝের উপর ফেলে রাখা হলো।

একদিন দরজা খুলে কয়েকজন প্রহরী সেই কারাকক্ষের মধ্যে এসে বলল, চল আমাদের সঙ্গে। রাণী তোমাদের ডেকেছেন।

বিরাট প্রাসাদের একটি বড় ঘরের মধ্যে তাদের নিয়ে যাওয়া হলো। একটা বড় পাথর কেটে তৈরী করা সিংহাসনে রাণী বসে ছিল। তার দুদিকে যোদ্ধারা অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়েছিল। তার সামনে অনেক ক্রীতদাস যেকোন হুকুম তামিল করার অপেক্ষায় ছিল নতজানু হয়ে।

রাণীকে দেখতে সুন্দরী, বয়স তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। তার মাথার চুলগুলো বিন্যস্ত অথচ ছড়ানো ছিল মাথার চারদিকে। তার উপর সাদা পালকের একটা মুকুট ছিল।

রাণী থোমকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা আশেয়ারে এসেছ কেন?

থোম বলল, আমরা এখানে আসতে চাইনি। আমরা পথ হারিয়ে তুয়েন বাকার কাছে এসে পড়ি। তারপর ফিরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তোমার যোদ্ধারা আমাদের ধরে বন্দী করে।

রাণী বলল, তোমরা নাকি বলেছ তোমাদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। সেটা কি? বাজে কথা বলে আমার সময় নষ্ট করলে তার ফল কিন্তু ভাল হবে না।

আতন থোম বলল, আমাদের একদল শক্তিশালী শত্রুর কবল থেকে পালিয়ে আসছিলাম আমরা। আমরা জানতে পারি তারা আশেয়ারে আসছে। তারা এখানে এসে হীরে চুরি করে নিয়ে যেতে চায়। আমি তাদের ধরতে সাহায্য করতে চাই তোমাদের।

রাণী আটকা বলল, তাদের সঙ্গে সেনাদল আছে কি?

থোম বলল, সম্ভবতঃ আছে। তাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আছে।

রাণী আটকা তার এক সামন্তকে বলল, এই লোকটি যদি সত্যি কথা বলে থাকে তাহলে একে কারাগারে না রেখে নগরের মধ্যে ঘোরাফেরার স্বাধীনতা দিয়ে আটক রাখা হোক।

সেদিন দুপুরের দিকে হঠাৎ বাতাসে কিসের গন্ধ পেয়ে সচকিত হয়ে উঠল টারজন। বলল, একদল আদিবাসী আসছে।

গ্রেগরি বলল, ওরা এসে গেছে। ওদের দলে অনেক কুলী আর মালপত্র রয়েছে।

ওগাবি বলল, বোঙ্গাতে এই লোকগুলোকেই প্রথমে আপনারা ঠিক করেছিলেন। পরে আতন থোম চালাকি করে তার দলে নিয়ে যায়। ওরা তাদের দল ছেড়ে এসেছে।

টারজন বলল, শ্বেতাঙ্গদের সফরি ত্যাগ করার জন্য তোমাদের শাস্তি পেতে হবে। তার জন্য তোমাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে আশেয়ারে যেতে হবে।

মবুলি বলল, তুয়েন বাকা হচ্ছে নিষিদ্ধ নগরী যাবার পথে অভিশপ্ত সীমারেখা। আমার লোকরা যেতে চায়নি সেখানে। তাই তারা সফরি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।

টারজন বলল, তোমরা মালপত্রও সব নিয়ে এসেছ। তার শাস্তিস্বরূপ তোমাদের এখন আমাদের সঙ্গে তুয়েন বাকা যেতে হবে।

মবুলি বলল, আমার লোকরা ভয় পাচ্ছে।

টারজন বলল, যেখানে টারজন যাচ্ছে সেখানে ভয়ের কোন কারণ নেই।

এরপর তিনদিন ধরে গ্রেগবিদের সফরি আশেয়ারের পথে এগিয়ে চলল।

বড় বড় পাথরে ভরা পথটা দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে একটা অদ্ভুত জন্তুর পায়ের ছাপ দেখল টারজন। যেন একটা বিরাটকায় সরীসৃপের গন্ধ পেল। কিছুদূর পা চালিয়ে সাবধানে গিয়ে সে দেখল একজন শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধা সামনে একটা বিরাটকায় সরীসৃপ দেখে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

টারজন বুঝল এই শ্বেতাঙ্গ নিশ্চয় এ অঞ্চলের অধিবাসী। তার কাছ থেকে এখানকার অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সরীসৃপটা এখনি তাকে গিলে খেলে সে তথ্য আর পাওয়া যাবে না। সে তাই ছুরি হাতে গিয়ে সরীসৃপটার গলার কাছে এক দুর্বল অংশে ছুরিটা বসিয়ে দিল। সরীসৃপটা তবু কায়দা হলো না, সে লড়াই করে যেতে লাগল। টারজনও বারবার ছুরিটা তার গায়ে বসাতে লাগল।

দুজনের চেষ্টায় সরীসৃপটা মরে গেলে শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধা টারজনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি শত্রু না মিত্র?

টারজন বলল, আমি তোমার বন্ধু। আমি হচ্ছি টারজন। তুমি কে?

যোদ্ধা বলল, আমি থোবোজ নগরীর অধিবাসী, নাম থেটান।

টারজন বলল, আমি আশেয়ারে যেতে চাই।

যোদ্ধা বলল, তুমি এমন একটা ব্যাপারের কথা বললে যাতে আমি কোন সাহায্য তোমায় করতে পারব না। আশেয়ারের লোকরা আমাদের চিরশত্রু। সেখানে তোমাকে নিয়ে গেলে আমাদের দুজনকে তারা হয় মেরে ফেলবে না হয় বন্দী করে রেখে দেবে। আমি বরং আমাদের রাজার কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।

টারজন মবুলিদের বলল, তোমরা সব মালপত্র নদীতে দাঁড়ানো নৌকোতে তুলে দাও।

নৌকোটা এগিয়ে চলল।

সহসা লাভাক সামনে অদূরে একটা নৌকো দেখতে পেয়ে বলল, ঐ দেখ!

নৌকোটা তাদের দিকেই এগিয়ে আসছিল। থেটান বলল, আশেয়ারের নৌকো। আশেয়ারের যোদ্ধারা আছে ওতে।

ছয়টা নৌকো যোদ্ধাদের নিয়ে তাদের দিকে আসছিল।

থেটান বলল, ওরা আমাদের ধরে ফেলবে।

টারজন বলল, এখন লড়াই করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

আশেয়ারের নৌকোগুলো কাছে আসতেই টারজনের সংকেত পেয়ে গ্রেগরির দলের লোকেরা বর্শা আর বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে লাগল আশেয়ারের যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে। কিন্তু গুলি করতে অসুবিধে হচ্ছিল ওদের। নৌকোটা দুলছিল। তবু আশেয়ারের যোদ্ধারা অনেকে নিহত হলো। তাদের হাত থেকে ছোঁড়া একটা ছোট বর্শা এসে গ্রেগরিদের একজন নাবিককে বিদ্ধ করল। নাবিকরাও তখন টারজনদের হয়ে লড়াই করতে লাগল।

এমন সময় আশেয়ারের একটা বড় নৌকো জোরে এসে টারজনদের নৌকোটাকে ধাক্কা মারতে সেটা উল্টে গেল। যাত্রীরা সব জলে পড়ে গেল।

আশেয়ারের নৌকোগুলো সব চলে গেলে দেখা গেল সবাই জল থেকে উঠেছে। একমাত্র দার্ণৎ আর হেলেনকে পাওয়া গেল না। থেটান বলল, আশেয়ারের যোদ্ধারা তাদেব জল থেকে তুলে তাদের নৌকোয় চাপিয়ে নিয়ে পালিয়েছে।

থেটান বলল, আশেয়ারের নৌকোগুলোব আলো দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে বাঁদিকে। তার মানে-নগরে ফিরে যাচ্ছে ওরা।

সারারাত এইভাবে চলার পর সকাল হতে থোবোজের ঘাটে গিয়ে পৌছল গ্রেগরিদের নৌকোটা। ঘাটের উপব থেকে মাথায় কালো পালকের উষ্ণীষপরা যোদ্ধাবা বিদেশীদের দেখে গর্জন করে উঠল, কে তোমরা?

থেটান উত্তর দিল, রাজা হেরাতের ভাইপো থেটানের বন্ধু এরা!

যোদ্ধাদলের নেতা বলল, বিদেশীদের কোনক্রমে ঢুকতে দেওয়া হয় না এই নগরীতে। আগে আমি তোমাদের সবাইকে বন্দী করে নিয়ে যাব রাজার কাছে। পরে রাজা যা করেন তাই হবে।

হেলেন আর দার্ণৎকে প্রথমে আশেয়ারের রাজপ্রাসাদের একটা অন্ধকার ঘরে আটক রাখা হলো।
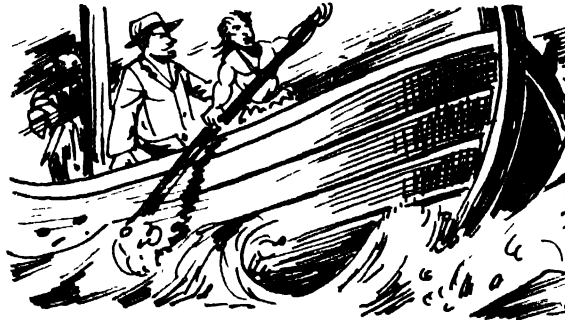
তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। লাভাক বলল, এখন ত বাঁচলাম, এরপর আমাদের ভাগ্যে কি আছে তা একবার ভেবে দেখ।

টারজন বলল, সামনে কি আছে তা আমরা কেউ জানি না। সুতরাং খারাপের মধ্যেও ভালটাই আশা করতে হবে।

আশেয়ার নগরীতে আলো দেখতে পেল ওরা। ওদের নৌকোটা থোবেজের দিকে এগিয়ে আসছিল।

ওদের দুজনকে দরবার হলে রাণীর সামনে নিয়ে যাওয়া হলে আতন থোম আর লাল টাস্ককে মঞ্চের মধ্যে দেখে বিস্ময়ের আবেগে চীৎকার করে উঠল হেলেন। দার্ণৎকে দেখিয়ে বলল, ঐ দেখ।

রাণীব সিংহাসনের সামনে ওদের নিয়ে যাওয়া হলে রাণী আটকা কড়াভাবে ওদের জিজ্ঞাসা করল, কেন তোমরা এই নিষিদ্ধ নগরীতে এসেছ?

হেলেন বলল, আমার ভাই ব্রিয়ান গ্রেগরির খোঁজে আমবা এসেছি।

রাণী আটকা বলল, মিথ্যা কথা। তোমরা হীরকদের পিতাকে চুরি কবে নিয়ে যেতে এসেছ।

আতন থোম বলল, মেয়েটির কোন দোষ নেই। ওর সঙ্গীরাই হীরকদের পিতাকে চুরি করে নিয়ে যেতে এসেছে।

দার্ণৎ বলল, মেয়েটিই সত্যি কথা বলছে। ঐ লোকটাই মিথ্যা কথা বলছে। ও-ই হীরে চুরি করতে এসেছে।

রাণী আটকা বলল, তোমরা সবাই মিথ্যা কথা বলছ। মেয়েটিকে মন্দিরে নিয়ে যাও। সেখানে ও সেবাদাসীর কাজ করবে। লোকটাকে বন্দী করে রাখগে।

দার্ণৎকে প্রহরীরা নিয়ে যাবার জন্য ধরতে এলে সে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে হঠাৎ আতন থোমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটা টিপে ধরল।

কিন্তু থোমকে মেরে ফেলার আগেই যোদ্ধারা দার্ণৎকে সরিয়ে দিল জোর কবে।

প্রহরীরা থোম আর টাম্ককেও ধরতে যাচ্ছিল। কিন্তু সামন্ত আকামেন রাণীর কানে কানে কি বলতে রাণী বলল, আমি আকামেনেব উপর এই লোকটির ভার দিলাম।

দার্ণৎকে ওরা হোরাস হ্রদের জলের তলায় সুড়ঙ্গপথ দিয়ে মন্দিবে নিয়ে গেল। সেখানে প্রহরীরা পুরোহিতদের হাতে ওকে তুলে দিয়ে এল। পুরোহিতরা আবার দার্ণৎকে প্রধান পুরোহিত বৃদ্ধ ক্রুলারের সিংহাসনের সামনে নিয়ে গিয়ে বলল, রাণী আটকা এই বন্দীকে পাঠিয়ে দিয়েছে। এ হীরকদের পিতার শুচিতা নষ্ট করতে এসেছিল।

ক্রুলার রেগে গিয়ে বলল, এত লোককে আমি খাওয়াব কি করে? যাই হোক, ওকে একটা খাঁচায় ভরে রেখে দাও।

দার্ণৎ দেখল, বড় ঘরখানার মধ্যে দুদিকে অনেক বড় বড় খাঁচায় এক একজন শীর্ণকায় লোককে বন্দী করে রাখা হয়েছে। লোকগুলোব মাথায় একরাশ করে রুক্ষ চুল আর মুখে দাড়ি গজিয়ে উঠেছে। দার্ণৎকে একটা খাঁচায় ভরা হলে পাশের খাঁচা থেকে একজন শীর্ণকায় অনশনক্লিষ্ট দাড়িওয়ালা লোক দার্ণৎকে লক্ষ্য করে বলল, তুমিও কি হীরে চুরি করতে এসেছিলে?

দার্ণৎ বলল, না, আমরা একটা লোকের খোঁজে এসেছিলাম।

খাঁচায় সেই বন্দী লোকটি বলল, কে সে লোক?

দার্ণৎ বলল, ব্রিয়ান গ্রেগরি নামে একটি লোক এখানে বন্দী আছে অনেক দিন ধরে।

লোকটি বলল, মজার কথা ত! আমিই ত ব্রিয়ান গ্রেগরি। আমাকে খুঁজতে তুমি আসবে কেন?

দার্ণৎ বলল, তুমিই তাহলে ব্রিয়ান গ্রেগরি? আমি হচ্ছি ফরাসী নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন দার্ণৎ।

ব্রিয়ান বলল, ফরাসী নৌবাহিনী আমার খোঁজ করবে কেন?

দার্ণৎ বলল, আমি যখন কোন একটা কাজে

লোয়াঙ্গো গিয়েছিলাম তখন তোমার বাবা এখানে আসার জন্য এক অভিযানের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। আমি তাঁর অভিযানে যোগদান করি।

ব্রিয়ান বলল, তাহলে বাবা আসছিলেন আমার জন্য ?

শুধু তোমার বাবা নয়, তোমার বোনও এসেছে। তোমার বাবা জলপথে আসার সময় নৌকাডুবি হওয়ায় জলে পড়ে যান। তারপর কি হয়েছে জানি না। তবে তোমার বোন আমার সঙ্গে এখানে বন্দী হয়।

ব্রিয়ান বলল, আমার জন্যই এত সব কষ্ট।

দার্ণৎ বলল, ঐটাকে বলে হীরকদের পিতা ?

ব্রিয়ান বলল, ঐ বড় কৌটোটাতে বিবাট একতাল হীরে আছে। প্রধান পুরোহিত ক্রুলার ওটাকেই হীরকদের পিতা বলে।

দার্ণৎ বলল, খাঁচায় যে সব বন্দী রয়েছে তারা কি সবাই বিদেশী ?

ব্রিয়ান বলল, না, কিছু আশেয়ারের লোকও আছে যারা রাণীর বিরাগ-ভাজন হয়ে পড়ে কোনক্রমে। কিছু থোবোজের লোক আছে। আমাব পাশে আছে হার্কুফ। সে ছিল এই মন্দিরেরই এক পুরোহিত। ক্রুলারের সঙ্গে কোন কারণে ঝগড়া হওয়ার জন্যই তার এই অবস্থা।

এদিকে থোবোজের রাজপ্রাসাদের একটি ঘর থেকে টারজন, থেটান, লাভাক আর গ্রেগরিকে রাজদরবারে রাজা হেরাতের সিংহাসনের সামনে বন্দী অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হলো। রাজার পাশে রাণী মেনথেব বসে ছিল। সিংহাসনের দুপাশে কালো পালক মাথায় যোদ্ধারা দাঁড়িয়েছিল।

হেরাতের চেহারাটা বেশ উঁচু আর পুরু। তার চিবুকে অল্প একটু দাড়ি ছিল।

হেরাৎ থেটানকে বলল, তুমি আমাদের দেশের সব আইন কানুন জেনেও বিদেশীদের সঙ্গে করে এনেছ। তুমি আমার ভাইপো হলেও তোমাকে আইনের খাতিরে ক্ষমা করতে পাবি না।

থেটান বলল, তুয়েন বাকার পাদদেশে একদিন এক বিরাট সরীসৃপের কবলে পড়ে আমাব জীবন চলে যাচ্ছিল। তখন টারজন নামে এই লোকটি তার নিজের জীবন বিপন্ন করে সেই জন্তুটাকে বধ করে আমাকে বাঁচায়। পরে জানলাম, এই লোকটি আর তার সঙ্গীরা আশেয়াবের শত্রু। ওরা বিদেশী হলেও আমাদের শত্রু নয়। তাই তাদের বন্ধু ভেবে নিয়ে এসেছি।

থেটানের কথা শুনে নরম হলো হেরাৎ। বলল, তোমার অপরাধ আমি ক্ষমা করলাম। কিন্তু বিদেশীদের এখন বন্দী হয়ে থাকতে হবে। তাদের অবশ্য আমি বাঁচার একটা করে সুযোগ দেব। তিনটি শর্ত পূরণের উপর তাদের জীবন নির্ভর করছে। প্রথমতঃ তাদের একজনকে এক আশেয়ারের যোদ্ধাকে হত্যা করতে হবে লড়াই করে। দ্বিতীয়তঃ তাদের একজনকে একটা সিংহকে বধ করতে হবে। তৃতীয়তঃ তাদের একজনকে আশেয়ারের মন্দির হতে হীরকদের পিতাকে নিয়ে আসতে হবে।

হেরাৎ বলল, মেয়েটিকে অন্দরমহলে মেয়েদের কাছে নিয়ে যাও। তার যেন কোন ক্ষতি না হয়। পুরুষদের এখন বন্দী করে রাখ। শর্ত পালনের জন্য পরে তাদের একে একে ডেকে পাঠাব।

পরদিন সকালে কারাগারের মধ্যে ওদের ঘুম ভাঙ্গলে একজন প্রহরী ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, তোমাদের মধ্যে একজন এস, আশেয়ারের সেই যোদ্ধার সঙ্গে লড়াই করে তাকে মারতে হবে।

লাভাক আর গ্রেগরি একে একে দুজনেই যেতে চাইল।

কিন্তু টারজন তাদের কথা না শুনে প্রহরীর সঙ্গে চলে গেল।

প্রাসাদের উঠোনে এক জায়গায় লড়াইয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। আশেয়ারের সেই যোদ্ধাকে আনা হলো টারজনের সামনে। থেটান উৎসাহ দিল টারজনকে। হেরাৎ বলল, এ লড়াইয়ে ওর জীবন যাবেই।

আশারীয় যোদ্ধাটা এসে টারজনকে প্রথমে বুকের উপর সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরল। ভাবল এইভাবে সে তাকে চেপে মেরে ফেলবে। টারজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। আশারীয় যোদ্ধা যখন দেখল তাতে কিছুই হলো না তখন সে আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি কি মানুষ না কোন পশু?

টারজন বলল, আমি হচ্ছি বাঁদরদলের রাজা টারজন। আমি তোমাকে বধ করব।

আশারীয় যোদ্ধা আবার টারজনকে আক্রমণ করতে টারজন তাকে মাথার উপর তুলে একপাক ঘুরিয়ে মাটির উপর আছড়ে ফেলে দিল। তাকে মেরে ফেলতে পারত টারজন তখনি। কিন্তু তাকে নিয়ে সে খেলা করতে চাইল। টারজন লোকটার দিকে ধীর গতিতে এগিয়ে গেলে লোকটা উঠে টারজনের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে পালিয়ে গিয়ে বসে পড়ল। টারজন আবার তার কাছে গেলে লোকটা

তার কোমর থেকে একটা ছুরি বার করে নিজের বুকে বসিয়ে দিল।

হেরাৎ আশ্চর্য হয়ে বলল, আশারীয় যোদ্ধার আজ কি হলো তা বুঝতে পারছি না।

থেটান বলল, ও হেরে গেল। বিদেশী বন্দী জিতে গেল।

হেরাৎ বলল, যদিও ও নিজের হাতে আশারীয় যোদ্ধাকে বধ করেনি তা হলেও জয়ী। ওকে ডেকে আন।

রাণী মেনথেব বলল, এ ধরনের শক্তিশালী মানুষ আমি আগে কখনো দেখিনি।

টারজন তার সামনে এসে দাঁড়ালে হেরাৎ বলল, তুমি এখন থেকে স্বাধীন। অন্য দুটি শর্ত এখনো পূরণ না হলেও আমি তোমাকে স্বাধীনতা দান করলাম। অন্য দুজন একে একে শর্ত পূরণ করতে পারলে তারাও ছাড়া পাবে।

টারজন বলল, আমাদের দলের মেয়েটির কি হবে ?

হেরাৎ বলল, সে ভালই আছে। অন্য শর্ত দুটি পূরণ হলে সেও ছাড়া পাবে। তুমি এখন থেটানের অতিথি হিসাবে থাকবে। তোমার সঙ্গীরা শর্ত পালন করতে পারুক বা না পারুক তাদের পরীক্ষা হয়ে গেলেই তুমি এ দেশ থেকে চলে যেতে পারবে। এখন ঠিক করো তোমার সঙ্গীদের মধ্যে কে সিংহ মারবে ?

টারজন বলল, আমি মারব।

রাণী বলল, তুমি ত স্বাধীনতা পেয়ে গেছ। আবার কেন জীবন দিতে যাবে ?

টারজন বলল, তা হলেও আমি সিংহ মারব।

হেরাৎ রাণীর দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে, ও যদি মরতে চায় ত তাই মরবে।

সেদিন সকালবেলায় দেখা গেল একমাত্র পিঞ্জরাবদ্ধ বন্দীরা ছাড়া মন্দিরের মধ্যে আর কোন লোক নেই।

মাথায় অদ্ভুত শিরস্ত্রাণপরা একটা লোক একটা ত্রিশূলের উপর একটা বড় মাছ গেঁথে ওদের সামনে এসে বলল, এই হলো তোমাদের খাবার।

ব্রিয়ান বলল, ওর নাম হলো টোম। হোবাস হ্রদে ও মাছ ধরে বেড়ায়। সেই মাছ খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি।

জাইথেব হেলেনকে জোর করে ধরতে গেল। হেলেন টেবিল থেকে ফুলদানিটা তুলে নিয়ে তাই দিয়ে সজোরে জাইথেবের মাথায় এমনভাবে মারল যে জাইথেব পড়ে গেল। হেলেন বুঝতে পারল জাইথেব মারা গেছে।

জাইথেবের কোমর থেকে চাবির গোছাটা আর ছোরাটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হেলেন।

যাবার আগে জাইথেবের মৃতদেহটা আলমারির পাশে লুকিয়ে রাখল যাতে হঠাৎ কেউ দেখতে না পায়।

মন্দিরের ভিতরে গিয়ে সে সোজা ব্রিয়ান আর দার্ণতের সঙ্গে দেখা করল। খাঁচার তালা খুলে ওদের দুজনকে মুক্ত করে দিয়ে বলল, আমি জাইথেবকে হত্যা করেছি। ও আমাকে ধরতে এসেছিল।

হেলেন বলল, এখন এখান থেকে এই মুহূর্তে পালিয়ে যেতে না পারলে মরতে হবে।

ব্রিয়ান বলল, আমার পাশের খাঁচাটায় হার্কুফ আছে। ও আগে এখানকারই এক পুরোহিত ছিল। ও এখান থেকে বেরিয়ে যাবার গুপ্ত পথ জানে। ওকে মুক্ত করে দাও।

হেলেন একে একে বন্দীদের সব খাঁচাগুলো খুলে দিল। হার্কুফ সব বন্দীদের নিয়ে একটা সুড়ঙ্গ পথ ধরে অন্ধকারে আগে আগে যেতে লাগল।

ওরা ছিল সংখ্যায় মোট ন'জন। সারারাত ধরে পথ চলে ওরা যখন সুড়ঙ্গপথ পার হয়ে বাইরের জগতের মুক্ত আলো হাওয়ায় এসে দাঁড়াল তখন ভোর হয়ে গেছে।

ব্রিয়ান হার্কুফকে জিজ্ঞাসা করল, এটা কোন্ জায়গা ?

হার্কুফ বলল, এটা আশেয়ার নগরীর মাথায় যে একটা পাহাড় আছে তারই পাশে এসে পড়েছি আমরা। আমরা দিনের বেলায় পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে থাকব। রাত্রি হলে পথ চলব। তাহলে আমরা সকাল হতেই থোবোজে পৌঁছব। তুয়েন বাকা পাহাড় থেকে যে পথটা বেরিয়ে এসেছে সেই পথ ধরেই এগিয়ে যাব আমরা।

টারজনের বীরত্বপূর্ণ চেহারাটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল রাজা হেরাৎ। রাণীকে সে বলল, তোমার রুচিটা সতিাই ভাল মেনথেব। লোকটা সতিাই বীর এবং মানুষ হিসাবে মহান। তার মত লোকের এভাবে মৃত্যু হওয়া উচিত নয়।

টারজন দেখল দুটো সিংহ একসঙ্গে তাকে আক্রমণ করলে জয়লাভ করা শক্ত হবে তার পক্ষে। সে দেখল দুটো সিংহের মধ্যে একটা সিংহ এগিয়ে আসছে তার দিকে। সে তাই আগে এগিয়ে আসা সিংহটাকে আক্রমণ করে ঘায়েল করে সেই সিংহটাকে অন্য সিংহটার মুখের কাছে ঠেলে দিল। তখন অন্য সিংহটা ঠেলে দেওয়া সিংহটাকে আক্রমণ করে কামড়ে ছিঁড়ে মেরে ফেলল। ভাবল সেই

পরদিন দুপুরবেলায় টারজনকে দুজন প্রহরী ডেকে নিয়ে এল প্রাসাদের উঠোনে একটা ঘেরা নিচু জায়গার কাছে। ঘেরা জায়গার মধ্যে দুটো সিংহকে ছেড়ে দেঁওয়া হয়েছে। টারজনকে লড়াই করতে হবে তার মধ্যে। গোলাকার সেই নিচু জায়গাটার উপর থেকে রাজা, রাণী, সামন্তরা ও অনেক দর্শক দেখতে লাগল লড়াইটা।

সিংহটা তাকে শত্রু ভেবে কামড়াতে আসে।

এবার সেই বিজয়ী সিংহটা টারজনকে লক্ষ্য করতে থাকে। এখন উপরের বেড়ার ধারে ঝুঁকে দেখতে গিয়ে অসাবধানতাবশতঃ হঠাৎ লড়াই-এর জায়গাটার মধ্যে পড়ে যায় মেনথেব; টারজন ছুটে গিয়ে মেনথেবকে ধরে দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সিংহটার দিকে ছুরি হাতে এগিয়ে গেল।

এদিকে রাণী পড়ে যাওয়ায় হেরাৎ চেঁচামিচি করে যোদ্ধাদের ডাকতে লাগল। সে বলল, সিংহটা টারজন আর রাণী দুজনকেই মেরে ফেলবে।

টারজন সিংহটার ঘাড়ে উঠে তার কালো কেশর-গুলো এমনভাবে ধরল যে শত চেষ্টা করেও সিংহটা তার পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না টারজনকে। টারজন তার ছুরিটা অন্য হাত দিয়ে সিংহটার পাঁজরে বসাতে লাগল বারবার। অবশেষে ছুরিটা আমূল বিদ্ধ হতেই পড়ে গেল সিংহটা।

হেরাৎ আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, লোকটা দানব না দেবতা।

হেরাতের কাছে ওরা যেতেই হেরাৎ টারজনকে বলল, তুমি আমার রাণীর জীবন বাঁচিয়েছ। তুমি তার জন্য দ্বিগুণ স্বাধীনতা লাভ করলে। তুমি এখানে থাকতে পাব, আবার ইচ্ছা করলে চলে যেতেও পার।

টারজন বলল, আমাকে আশেয়াবে গিয়ে ব্রুলার আর হীরকদের পিতাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। গ্রেগরির মেয়ে আর আমাব সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু সেখানে আছে।

হেরাৎ বলল, ঠিক আছে যাও। কোন সাহায্য দরকার হলে বলবে।

টারজন বলল, আমি একাই যাব। তবে কোন সাহায্যের দরকার হলে ফিরে এসে জানাব।

আশেয়ারের রাজপ্রাসাদের একটি ঘরে লাল টাস্ক উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, আমি এ কাজ পারব না। আমাকে মরতে হবে এর জন্য।

আতন থোম তাকে আশ্বস্ত করে বলল, এতে বিপদের কোন ঝুঁকি নেই। সব ঠিক হয়ে আছে। এ কাজ করতে পারলে তুমি আশেয়ারের ভাবী রাজার আপনজন হয়ে উঠবে। তার ফলে হীরকদের পিতার খুব কাছাকাছি চলে আসবে। তাছাড়া আকামেন তোমাকে সাহায্য করবে। সে তোমাকে রাণীর শোবার ঘরে নিয়ে যাবে। তারপর তোমাকে কি করতে হবে তা তুমি জান।

এমন সময় দরজা ঠেলে আকামেন এসে ঘরে ঢুকল। থোম বলল, সব ঠিক, লাল টাস্ক এ কাজ করবে।

আকামেন বলল, রাণী এখন শুয়েছে। দবজার সামনে কোন প্রহরী নেই।

লাল টাস্ক গিয়ে ছুরি হাতে ঘরে ঢুকল। আকামেন বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু ছুরি হাতে লাল টাস্ক রাণীর বিছানার দিকে এগিয়ে যেতেই পর্দা ঠেলে একদল যোদ্ধা ঘরে ঢুকেই লাফিয়ে পড়ল টাস্কের উপব। রাণী আটকা উঠে বসল বিছানার উপর। বলল, এই লোকটা, আকামেন আর আতন থোমকে আমার দরবার ঘরে নিয়ে যাও। সামন্তদের সব ডাক।

রাণীর সিংহাসনের সামনে তিনজনকে দাঁড় করালে রাণী আকামেনকে বলল, তুমি এই দুজন লোকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছ আমাকে হত্যা করার জন্য। কারণ তুমি রাজা হতে চাও। তাদের একজন আমাকে কথাটা জানিয়ে দেয়। তোমাদের এখনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করে খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখার হুকুম দিচ্ছি। তোমাদের বন্দীদশা আরো দুঃসহ করে তোলার জন্য তোমাকে অর্ধেক করে খাবার দেওয়া হবে। তোমাদের একটা করে হাত আর পা কেটে ফেলা হবে। এইভাবে তোমাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম কী ভীষণ এবং বিপজ্জনক হতে পারে।

ক্রুলারের মন্দিরে বন্দীদের খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখা হলো আকামেন, থোম আর টাস্ককে। তার খাঁচা থেকে হীরের কৌটোটাকে দেখতে পাচ্ছিল আতন থোম।

টারজন আর থেটান, গ্রেগরি আর লাভাক যে ঘরে শৃংখলিত অবস্থায় বন্দী ছিল সেই ঘরে গিয়ে তাদের বলল, হেরাৎ তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন।

টারজন বলল, তোমরা এখন মুক্ত অবস্থায় শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারবে। আমি আশেয়ার থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকবে তোমরা।

গ্রেগরি বলল, আশেয়ারে যাবে কেন?

টারজন বলল, তোমার মেয়ে আর দার্ণতের খোঁজে। তার উপর তোমাদের মুক্তির জন্য ক্রুলার আর হীরকদের পিতাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে।

লাভাক বলল, সিংহদুটো মারা হয়েছে?

টারজন বলল, হ্যাঁ, তারা এখন মৃত।

গ্রেগরি আর লাভাক দুজনেই টারজনের সঙ্গে আশেয়ারে যেতে চাইল।

টারজন বলল, একজনকে এখানে থাকতেই হবে। একজন আমার সঙ্গে যেতে পার। আচ্ছা লাভাক এস।

তখনি যাত্রা শুরু করল ওরা।

এদিকে আশেয়ার থেকে যে নয়জন বন্দী পালিয়ে এসেছিল তারা পথ হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের পাগুলো ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল। হার্কুফ বলল, এখন ভোর হয়ে গেছে। এখন আর পথ চলব না আমরা। এখন লুকিয়ে থাকার জন্য একটা গুহা খুঁজতে হবে।

এদিকে টারজন আর লাভাক আশেয়ারের পথে যেতে যেতে এক জায়গায় বাতাসে মানুষের গন্ধ পেয়ে থমকে দাঁড়াল। টারজন বুঝল, কয়েকজন শ্বেতাঙ্গের একটি দল মন্থর গতিতে কোথায় যাচ্ছে। তাদের দলে একটি শ্বেতাঙ্গ মেয়েও আছে।

টারজন এক জায়গায় লাভাককে দাঁড় করিয়ে

রেখে একা সেই গন্ধসূত্র ধরে এগিয়ে গিয়ে দেখল, দূরে নয়জন পলাতকের একটি দলকে ধরার জন্য ছয়জন আশারীয় যোদ্ধা বর্শা উঁচিয়ে ছুটছে। একটা বর্শার আঘাতে একজন পলাতক পড়ে গেল। তখন বাকি সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে আশারীয় যোদ্ধারা গিয়ে তাদের ঘিরে ফেলল। বর্শার বাঁট দিয়ে পলাতকদের মারতে লাগল। যোদ্ধাদের একজন হেলেনকে মারতে গেলে দার্ণৎ একটা ঘুষিতে তাকে ফেলে দিল। এমন সময় একজন যোদ্ধা তার বর্শাটা দার্ণতের বুকে বসিয়ে দিতে গেল। ঠিক সেই সময় একটা তীর গিয়ে যোদ্ধার পিঠে লাগতেই সে পড়ে গেল। আশারীয় যোদ্ধারা চারদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। কে বা কারা কোথা থেকে তীর মারল তা বুঝতে পারল না তারা কিছুই। কিন্তু তারা কিছু বোঝার আগেই আর একটা তীর এসে আর একজন যোদ্ধাকে বিদ্ধ করল।

দার্ণৎ বলল, তোমরা আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাও। তা না হলে তোমরা সবাই মারা যাবে।

যোদ্ধারা বলল, তোমাদের ছেড়ে দিয়ে গেলেও রাণী আটকার হাতে আমাদের মরতে হবে।

এই বলে তারা যেমন একসঙ্গে বর্শা তুলে দার্ণৎদের মারতে উদ্যত হলো অমনি পর পর কয়েকটা তীর এসে বাকি যোদ্ধাদের বিদ্ধ করে মেরে ফেলল তাদের সবাইকে।

এবার টারজন ওদের সামনে এসে দাঁড়াতেই দার্ণৎ জড়িয়ে ধরল তাকে। বলল, আমি আগেই হেলেনকে বলেছিলাম এ টারজন ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না।

হেলেন বলল, বাবা কোথায়? মাগরা কোথায়? তারা কি ডুবে গেছে সেই নৌকাডুবির সময়?

টারজন বলল, না, তারা থোবোজের রাজ-

বাড়িতে বন্দী হয়ে আছে। অবশ্য নগরমধ্যে স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারবে তারা। তাদের মুক্তির জন্য আমাকে আশেয়ারে গিয়ে প্রধান পুরোহিত ক্রুলারকে আর হীরকদের পিতাকে থোবোজে নিয়ে যেতে হবে।

এক ঘণ্টা পরে তারা একসঙ্গে আশেয়ারের পথে রওনা হলো।

সেদিন রাত্রিবেলায় গ্রেগরি থেটানকে বলল, আমরা দুজনেই চলে যেতে চাই। তুমি আমাদের এ বিষয়ে সাহায্য করতে পার?

থেটান বলল, তোমরা টারজনের বন্ধু। সে আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আমি তোমাদের চলে যেতে সাহায্য করব। তোমরা হোরাস হ্রদের পশ্চিম দিকের পথ ধরে আশেয়ারের পথে চলে যাবে। থোবোজে আর ফিরে এস না।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই থেটান গ্রেগরি আর মাগরাকে নিয়ে গুপ্ত পথ দিয়ে নগরপ্রান্তে চলে গেল। সেখানে তাদের আশেয়ারের পথটা দেখিয়ে দিয়ে বিদায় দিল।

টারজনরা সংখ্যায় মোট ছয়জন হলো। ওরা আশেয়ারে ক্রুলারের মন্দিরে যাবার গুপ্ত পথের মুখে এসে দাঁড়াল। একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে সুড়ঙ্গ-পথটা শুরু হয়েছে।

হার্কুফ বলল, মন্দিরের চাবিকাঠি আমার কাছে আছে। ক্রুলার কোথায় শোয় আমি জানি। ও যখন উপাসনার শেষে ঘুমোয় তখন মন্দিরে কেউ থাকে না। পুরোহিতরা আপন আপন ঘরে শুতে যায়। হীরের কৌটোটা ক্রুলারের সিংহাসনের সামনে পড়ে থাকে। ক্রুলারকে ধরে ফেলতে পারলে ও তাকে হত্যার ভয় দেখালে সে কোন শব্দ না করে চলে আসতে পারে আমাদের সঙ্গে।

টারজন বলল, তোমরা সবাই এই জায়গাটায় পাহাড়ের ধারে লুকিয়ে থাক কোন গুহায়। আমি হার্কুফকে নিয়ে যাব। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা ফিরে না এলে তোমরা নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে নিও। তুয়েন বাকার সীমানাটা যেকোনভাবে পার হয়ে যাবে।

অন্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল টারজন আর হার্কুফ।

এদিকে গ্রেগরি আর মাগরা সেই পথে আসতে আসতে আশেয়ার থেকে পালিয়ে আসা তিনজন বন্দীর দেখা পেল। তারা গ্রেগরিকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কে ?

গ্রেগরি বলল, তুয়েন বাকা থেকে বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজছি আমরা।

পলাতকরা বলল, আমরাও তাই খুঁজছি। এস আমাদের সঙ্গে।

গ্রেগরি বলল, আমাদের সঙ্গীরা আশেয়ারের পথে গিয়েছে। তাদের খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কোথাও যেতে পারব না।

পলাতকরা বলল, আমরা তাদের দেখেছি। তারা ছিল সংখ্যায় ছয়জন। তার মধ্যে একজন মহিলা ছিল।

গ্রেগরি বলল, তারা কে কে তা জান ?

পলাতকরা বলল, তারা ছিল মোট ছয়জন, টারজন, দার্ণৎ, লাভাক, ব্রিয়ান গ্রেগরি, হার্কুফ আর হেলেন।

গ্রেগরি অবাক হয়ে গেল। ওরা কিভাবে মুক্ত হলো তার কিছুই বুঝতে পারল না গ্রেগরি। যাই হোক, হেলেন আর ব্রিয়ান জীবিত আছে এবং তারা টারজনের দেখা পেয়েছে জেনে খুশি হলো।

এদিকে টারজন আর হার্কুফ যখন সুড়ঙ্গপথের মধ্যে ঢোকে তখন আশেয়ারের এক পুরোহিত একটা বড় পাথরের পাশ থেকে লুকিয়ে তা দেখে।

টারজন আর হার্কুফ সুড়ঙ্গপথটা পার হয়ে মন্দিরে ওঠার মুখে ধরা পড়ে গেল। তাদের অতর্কিত আক্রমণে ফেলে দিয়ে বেঁধে ফেলল যোদ্ধারা। তারপর তাদের মন্দিরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। এক একটি খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হলো তাদের। তারা গিয়ে দেখল দার্ণৎ ব্রিয়ান, হেলেন আর লাভাকও খাঁচায় ভরা রয়েছে।

এমন সময় মন্দিরের সব তালাচাবির রক্ষক এসে একটা খাঁচা খুলে টারজনকে বলল, রাণী তোমায় ডাকছেন।

রাণী আটকা তখন সামন্তদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তার সিংহাসনে বসেছিল। টারজন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তার আপাদমস্তক ভাল করে নিরীক্ষণ করে বলল, তাহলে তুমিই হচ্ছ সেই মানুষ যে আমার অনেক যোদ্ধাকে মেরেছ এবং একটা নৌকো দখল করে নিয়েছ

রাণী আটকা বলল, আর হীরকদের পিতা?

টারজন বলল, তার প্রতি আমার কোন লোভ নেই।

রাণী আটকা বলল, আতন থোম হীরে চুরি করতে এসেছিল আর তুমি ত তাব চর।

টারজন বলল, সে আমার শত্রু।

আটকা কি ভেবে নিয়ে বলল, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি সত্য কথা বলছ। আমি

টারজন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকায় আটকা রেগে গিয়ে বলল, কি, কথা বলছ না কেন?

টারজন বলল, বৃথা কথা বলে কি হবে? আমি সেদিন অনেকগুলো যোদ্ধাকে মেরেছি। গতকাল বনে আমি তোমার আরো ছয়জন যোদ্ধাকে মেরেছি।

রাণী আবার জিজ্ঞাসা করল, আশেয়ারে তুমি কেন এসেছ? কেন তোমরা শত্রুতা করছ আমার সঙ্গে?

টারজন বলল, আমার যে সব সঙ্গীরা বন্দী আছে এখানে আমি তাদের মুক্ত করতে এসেছি। আমি তোমাদের শত্রু নই। আমি শুধু আমার বন্ধুদের মুক্তি চাই।

তোমাকে বন্ধু হিসাবে পেতে চাই। কতকগুলো বাঁদর-গোরিলা তোমার হয়ে যুদ্ধ করেছিল। তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার করো। তোমাকে দিয়ে আমার অনেক কাজ হবে। তুমি মুক্ত।

টারজন বলল, আর আমার বন্ধুরা? তারাও মুক্ত ত?

আটকা বলল, অবশ্যই না। ব্রিয়ান গ্রেগরি হীরকদের পিতাকে চুরি করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তোমার অন্য সঙ্গীরা তাকে সাহায্য করতে এসেছিল। সুতরাং তাদের মুক্তি দেওয়ার কোন কথাই উঠতে পারে না।

টারজন বলল, তারা মুক্তি পেলেই আমি এখানে থাকতে পারি।

আটকা রেগে গিয়ে বলল, এই লোকটাকে নিয়ে যাও। খাঁচায় বন্দী করে রাখো।

প্রহরীরা টারজনকে নিয়ে গিয়ে আবার সেই খাঁচাটায় আবদ্ধ করে রাখল।

ক্রুলারের সিংহাসনের পাশে মঞ্চের উপর চেয়ারের মত যে একটা সিংহাসন ছিল তার উপর বসল রাণী আটকা। সে জোর গলায় ঘোষণা করল একমাত্র মেয়েটি ছাড়া অন্য সব পলাতক বন্দীদের একে একে বলি দেওয়া হবে। আর হোরাস হ্রদের তলায় যে পীড়নাগার আছে তার মধ্যে ডুবিয়ে মারা হবে মেয়েটিকে, কারণ জাইথেরকে খুন করেছিল সে।

সেখান থেকে জলের ভিতর দিয়ে হেলেনকে নিয়ে যাবার জন্য তিনজন টৌম বা ডুবুরি এসে হেলেনকে তার পরনের পোশাক খুলে ডুবুরির পোশাক আর শিরস্ত্রাণ পরতে বলল। তারপর তাকে নিয়ে মন্দির থেকে চলে গেল।

রাত গভীর হলে মন্দিরের পুরোহিতরা তাদের আপন আপন ঘরে শুতে গেলে টারজন তার দেহের অসীম শক্তি দিয়ে খাঁচার দুটো রড বেঁকিয়ে ফাঁক করে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। তারপর হার্কুফের খাঁচাটাকেও একইভাবে ফাঁক করে তাকে মুক্ত করে দিল।

হার্কুফ টারজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। ডুবুরিদের ঘরে গিয়ে ওরা দেখল তারা সবাই ঘুমোচ্ছে। তাদের ঘর থেকে দুটো ডুবুরির পোশাক আর শিরস্ত্রাণ নিয়ে নিল। দুটো ডুবুরি-পোশাক আর দুটো শিরস্ত্রাণ পরে নিল। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে জলের তলা দিয়ে একটা বড় পাকা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। বাড়িটার ছাদের উপরে গিয়ে ওরা বুঝল এই বাড়ির নিচের তলায় একটা ঘরে বন্দী আছে হেলেন।

এদিকে সেই বাড়ির পীড়নাগারে হেলেনকে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয় ডুবুরিরা। ঘরের মধ্যে একটা মই ছিল। ঘরটার মধ্যে জল ঢুকছিল। হেলেন বুঝল এই ঘরেতে অনেক বন্দীকে রেখে তাকে ধীরে ধীরে ডুবিয়ে মারা হয়। ঘরের মেঝেটা প্রথমে জলে ডুবে গেল। হেলেন মইয়ের একটা সিঁড়িতে উঠল। এইভাবে যতই জল উঠতে থাকে ততই মইয়ের একটা উঁচু সিঁড়িতে উঠতে থাকে হেলেন। তখন জলে ভরে গেছে গোটা ঘরটা।

হেলেন যখন জলের উপর ভাসতে শুরু করেছে তখন টারজন আর হার্কুফ দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে হেলেনকে উদ্ধার করে নিয়ে এল কিন্তু তাদের মুখে ও মাথায় শিরস্ত্রাণ আর ডুবুরিপোশাক থাকায় তাদের চিনতে পারল না।

এদিকে ডুবুরিদের মধ্যে একজন হঠাৎ জেগে উঠে যখন দেখল তাদের দুটো জলপোশাক আর শিরস্ত্রাণ চুরি হয়ে গেছে তখন সে ছুটে মন্দিরে গিয়ে পুরোহিত-দের জাগাল। পুরোহিতরা তখন খাঁচাগুলো পরীক্ষা করে দেখল দুটো খাঁচা শূন্য। বন্দীরা পালিয়ে গেছে অথচ তালাচাবি ঠিক আছে। শুধু রেলিংগুলো বাঁকানো।

সঙ্গে সঙ্গে ছয়জন ডুবুরি ত্রিশূল হাতে পলাতক বন্দীদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। তারা বুঝল বন্দীরা

যখন জলপোশাক আর শিরস্ত্রাণ নিয়ে গেছে তখন তারা অবশ্যই হেলেন নামে সেই বন্দিনী মেয়েটাকে উদ্ধার করতে গেছে।

তাদের ধারণাই ঠিক। টারজন আর হার্কুফ যখন হেলেনকে নিয়ে সেই বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন তাদের দেখতে পেল ডুবুরি যোদ্ধারা। তারা গিয়ে টারজনকে ঘিরে ফেলল।

জলের ভিতরে কিভাবে লড়াই করে ছয়জন যোদ্ধাকে ঘায়েল করবে তা ভেবে পেল না টারজন। তবু সে প্রথমেই দুজন যোদ্ধাকে মেরে ফেলল ত্রিশূল দিয়ে। আর দুজন যোদ্ধা টারজনকে ধরতেই হেলেন তার ত্রিশূলটা একটা যোদ্ধার বুকে বসিয়ে দিল। এইভাবে পাঁচজন যোদ্ধা মারা গেল একে একে। একজন পালাচ্ছিল কিন্তু সে গিয়ে খবর দিয়ে আরো যোদ্ধা আনবে বলে তাকে ধরে মেরে ফেলল টারজন।

এরপর মন্দিরের পথে না গিয়ে জলের তলা দিয়ে অন্য পথ ধরল হার্কুফ। তারা ঠিক করল আশেয়ার নগরী থেকে কিছুটা দূরে হোরাস হ্রদের কূলে এক জায়গায় উঠবে তারা।

গ্রেগরি আর মাগরা টারজন ফিরে না আসা পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ মাগরা গ্রেগরিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল, একটা গুহা মনে হচ্ছে না?

ওরা এগিয়ে গিয়ে দেখল সত্যিই একটা বড় গুহা। ভিতরে ঢুকে দেখল ভিতর দিকে একটা বারান্দা চলে গেছে। অন্ধকার হলেও কিছু কিছু দেখা যাচ্ছিল। মাগরা ভিতরে ঢুকতে নিষেধ করছিল গ্রেগরিকে। কিন্তু গ্রেগরি শুনল না।

মাগরা বলল, মনে হয় অন্ধকারে চুপিসারে কারা যেন আমাদের পিছু নিয়েছে।

হঠাৎ একটা হাত এসে মাগরার ঘাড়টা ধরে

কোথায় নিয়ে গেল তাকে। চীৎকার করার সুযোগও পেল না। গ্রেগরি পিছন ফিরে দেখল মাগরা নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আর একটা হাত এসে গ্রেগরিকে ধরল।

গ্রেগরি আর মাগরাকে ধরে একই জায়গায় নিয়ে আসা হলো। ওরা বুঝল সাদা পোশাকপরা থোবোজের একদল অধিবাসী এই গুহাতেই ছিল।

হোরাস হ্রদের কূলে উঠে টারজন বলল, আমি একটা নৌকো পেলে আশেয়ারে চলে যেতাম। সেখানে আমার কাজ আছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে টারজন হেলেন ও হার্কুফের কথা না শুনে হোরাসের জলে ঝাঁপ দিল। হেলেন আর হার্কুফ সেখানেই রয়ে গেল।

টারজন আশেয়ারের কূলের দিকে অর্ধেকটা পথ সাঁতার কেটে যেতেই একটা নৌকোর আলো দেখতে পেল। একটা নৌকোর মশালের আলো তার কাছে পড়তেই সে জলে ডুব দিল। জলে ডুবে ডুবে অনেকটা গিয়ে জলের উপর মাথা তুলল। সে ভাবল আশেয়ারের নৌকো হলে সে আবার ধরা পড়বে।

টারজন আবার সাঁতার কেটে এগিয়ে যেতে থাকলে হঠাৎ নৌকোটার কাছে এসে পড়ল। কারণ তখন কোন আলো ছিল না নৌকোটাতে। নৌকো থেকে দুজন যোদ্ধা টারজনকে ধরে তুলে নিল নৌকোতে। টারজন এবার দেখল যোদ্ধাদের মাথায় কালো পালক রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে থেটানের গলার আওয়াজ শুনতে পেল।

থেটান বলল, তারা আগেই পালিয়েছে। হেরাৎ ক্ষেপে গেছে।

থেটান যখন দেখল সে কোনক্রমেই টারজনকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারবে না তখন সে বলল, আমি তোমাকে আমার নৌকো করে আশেয়ারের ঘাটে দিয়ে আসব।

টারজন বলল, দুজন সঙ্গী আছে একটা গুহার মধ্যে। তাদেরও নিয়ে যেতে হবে।

থেটান তার নৌকোটা নিয়ে টারজনের কথামত হ্রদের একদিকের কূলে গিয়ে ভেড়াল। টারজন হেলেন আর হার্কুফের নাম ধরে ডাকতে লাগল। হেলেন আর হার্কুফ বেরিয়ে এসে টারজনকে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।

থেটান বলল, আমরা আলো না জ্বেলে আশেয়ারের সীমানাটা পার হচ্ছিলাম। আমরা যাচ্ছিলাম কিছু ক্রীতদাসের খোঁজে। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?

টারজন বলল, আমি যাচ্ছিলাম আশেয়ারের ঘাট থেকে একটা নৌকো চুরি করে আনতে।

থেটান বলল, তুমি কি পাগল হয়েছ?

টারজন বলল, কিন্তু আমাকে আশেয়ারে যেতেই হবে। সেখানে আমার সঙ্গীরা বন্দী হয়ে আছে। তাদের উদ্ধার করতে হবে। তারপর সেখান থেকে ক্রলাব আর হীরকদের পিতাকে হেরাতের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে মাগরা আর গ্রেগরি আছে।

টারজন তাদের নিয়ে নৌকোয় চাপাল। নৌকো ছেড়ে দিল। নৌকোটা হ্রদের মাঝামাঝি যেতেই আশেয়ারের চারটে নৌকো থেটানের নৌকোটাকে ঘিরে ফেলল। অনেকগুলো মশালের আলো তাদের উপর পড়ল। আশারীয় যোদ্ধারা যুদ্ধের ধ্বনি দিতে লাগল।

টারজন সঙ্গে সঙ্গে জলপোশাক আর শিরস্ত্রাণ পরে ফেলল। হেলেন আর হার্কুফকেও তা পরতে বলল। তারপর হ্রদের জলে হেলেনের হাত ধরে ঝাঁপ দিল। আশেয়ারের যোদ্ধাদের এড়িয়ে যাবার জন্য গভীর জলে ডুব দিল তারা।

সকাল হতেই টারজন হেলেনকে নিয়ে মন্দিরের দিকে রওনা হলো। কিছুটা যেতেই হার্কুফের দেখা

পেয়ে গেল। হার্কুফই তখন আশেয়ারের পথে ওদের নিয়ে যেতে লাগল। কিছুটা পথ যেতেই ওরা একটা পুরনো ভাঙ্গা নৌকো ডুবে থাকতে দেখল। হার্কুফ সেটা দেখতে পেয়ে তার উপরে লাফ দিয়ে কিসের খোঁজ করতে লাগল। হঠাৎ একটা মণি-মুক্তোখচিত কৌটো পেয়ে আনন্দে লাফাতে লাগল হার্কুফ।

পরে একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হার্কুফ বলল, এখানে অপেক্ষা করব। রাত না হওয়া পর্যন্ত আমরা মন্দিরে যাব না। মন্দিরের পুরোহিতরা যখন উপাসনা করতে যাবে, যখন মন্দির ফাঁকা থাকবে তখনি ওরা মন্দিরে গিয়ে ঢুকবে এবং বন্দীদের মুক্ত করবে।

মন্দিরের একটা খোলা জানালা দিয়ে ভিতরের দিকে তাকাতে লাগল হার্কুফ। অবশেষে উপাসনার সময় হয়ে গেলে সে টারজনকে বলল, এখানে হেলেন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য।

এই বলে হেলেনের পায়ের কাছে সেই কৌটোটা নামিয়ে রেখে টারজনকে মন্দিরে নিয়ে চলে গেল হার্কুফ।

টারজন আর হার্কুফ তাদের ত্রিশূলে একটা করে মাছ গেঁথে নিয়ে মন্দিরের ভিতরে ঢুকে বন্দীদের খাঁচাব সামনে গিয়ে দেখতে লাগল। তখন মন্দিরে ক্রলার বা কোন পুরোহিত ছিল না। টাবজন এই অবকাশে এক একটা খাঁচার রডগুলো ভেঙ্গে সব বন্দীদের মুক্ত করে দিল। আতন থোম খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়েই হীরের সেই বড় কৌটোটা তুলে নিয়ে বুকে করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই লাল টাস্ক আর ব্রিয়ান গ্রেগরি তাকে ধরে ফেলল। যে হীরকদের পিতার জন্য তারা এতদিন ধরে এত কষ্ট করে এসেছে সেই পিতাকে তারা কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবে না।

টারজন আর হার্কুফ বাড়তি দুটো জলপোশাক এনেছিল। সেই দুটো দার্নৎ আর ব্রিয়ানকে পরতে বলল টারজন যাতে তারা জলপথে হোরাস হ্রদের তলা দিয়ে পালাতে পারে তাদেব সঙ্গে। টারজন বাকি বন্দীদের বলল, তোমরা বাবান্দার তলা দিয়ে যে গুপ্তপথ চলে গেছে সেই পথ দিয়ে চলে যাও।

আতন থোম তখন সেই হীরের বড় কৌটোটা বুকে করে গুপ্ত পথ ধরে ছুটতে লাগল। লাল টাস্ক আর ব্রিয়ানও তাদের পিছু পিছু ছুটতে লাগল। টারজন ব্রিয়ানকে আতন থোমেব সঙ্গে যেতে নিষেধ করল। কিন্তু ব্রিয়ান শুনল না। সে বলল, আমি নরকে এতদিন কি বৃথাই এত কষ্ট ভোগ করেছি।

টারজন তখন বলল, তাহলে তোমার যা খুশি করো। আমরা যোদ্ধারা আসার আগেই জলপথে

চলে যাব।

টারজন, হার্কুফ, দার্ণৎ আর লাভাক জলপোশাক পরে তৈরী হলো।

রাণী আটকা তখন সামন্তদের সঙ্গে এক ভোজ-সভায় ছিল, প্রাসাদের মধ্যে। এমন সময় একজন পুরোহিত গিয়ে এই দুর্ঘটনার কথা জানায়। রাণী তা শুনে একদল যোদ্ধাকে মন্দিরে পাঠিয়ে দেয়।

অবশেষে সেই ভূতুড়ে যোদ্ধা জলপোশাকপরা লোকটা হেলেনকে নিয়ে হ্রদের পারে সেই পাহাড়ের গুহাটায় নিয়ে গেল যেখানে মাগরা আর গ্রেগরিকে থোবোজের পুরোহিতরা আটকে রেখেছিল। হেলেন-কে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল গ্রেগরি। বলল, হেলেন তুই! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুই এখনো বেঁচে আছিস।

ক্রুলার মন্দিরে এসে চেঁচামেচি করাতে হার্কুফ তার ত্রিশূলটা ক্রুলারের বুকে বসিয়ে দিল। এমন সময় আশেয়ারের যোদ্ধারা এসে গেল। যোদ্ধাদের ফাঁদে ফেলার একটা পরিকল্পনা করেছিল হার্কুফ। তারা চারজন যখন একটা ঘরের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন যোদ্ধারা তাদের তাড়া করে সেই ঘরে ঢুকতেই ঘরের দরজা দুটো দুদিক থেকে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর বাইরে হাওয়াঘর থেকে পাম্প চালিয়ে ঘরটা জলে ভরে দিল। ফলে যোদ্ধাগুলো সব জলে ডুবে মারা গেল।

এদিকে হেলেন যেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল জলের তলায় সেখানে হঠাৎ ভূতের মত ডুবুরির পোশাকপরা একটা লোক কোথা থেকে এসে তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে লাগল জলের মধ্যে দিয়ে।

হেলেন বলল, তুমি এখানে কি করছ বাবা? টারজন আমাকে বলেছিল, তুমি আর মাগরা থোবোজে বন্দী হয়ে আছ।

মাগরা বলল, বন্দীই ছিলাম। আমরা পালিয়ে এসেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এর থেকে সেখানে বন্দী হয়ে থাকাই ভাল ছিল।

এবার যে সাদা পোশাকপরা লোকটা হেলেনকে ধরে এনেছিল সে লোকটা তার শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলতে দেখা গেল লোকটা বুড়ো আর তার মাথার চুলগুলো সাদা।

হেলেন বলল, আমাকে বন্দী করে রেখেছিল ওরা। ডুবুরির পোশাক পরে পালিয়ে আসি আমি।

থোবোজদের আসল দেবতা হলো ঐ বৃদ্ধ চোন। চোন বলল, আমি একটা লোককে কেটে তার নাড়ীভুঁড়ী নিয়ে দেবতাদের কাছে জানতে চাইব এরা

আমাদের শত্রু কিনা। মেয়েটা মিথ্যা কথা বলছে। যদি ওরা শত্রু না হয় তাহলে মেয়েটা আমার সেবা-দাসী হবে। আর যদি দৈববাণীতে বলে এরা আমাদের শত্রু তাহলে ওদের বলি দেওয়া হবে।

নাগরা বলল, ও যদি আসল দেবতা হয় তাহলে ও জানত আমরা শত্রু নই। তুমি মোটেই দেবতা নও। তুমি দুষ্ট প্রকৃতির একটা লোক।

পুরোহিতরা নাগরাকে মারতে উদ্যত হলো। কিন্তু চোন তাদের বাধা দিয়ে বলল, না, মারবে না।

এদিকে গুপ্তপথ পার হয়ে আতন থোম হীরের কৌটোটা বুকে করে ছুটতে লাগল। তার পিছনে লাল টাস্কও ছুটছিল।

পাহাড়ের ধার দিয়ে ছুটতে ছুটতে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়ল ওরা। সেখানে বাঁদর-গোরিলা উঙ্গো তার দলের সঙ্গে খেলা করছিল। সে আতন থোম আর লাল টাস্ককে ছুটতে দেখে রেগে যায় প্রথমে।

টারজন, দার্ণৎ, লাভাক আর হার্কুফ প্রথমে হেলেন যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে এল। হেলেনকে সেখানে দেখতে না পাওয়া গেলেও হার্কুফ সেই হীরের কৌটোটা পেয়ে গেল।

এমন সময় জলপোশাক আর ঘোড়ার মুখোসপরা ছয়জন লোক কোথা থেকে এসে আক্রমণ করল ওদের। ওদের ঘিরে ফেলল চারদিক দিয়ে। টারজন একজনকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলতে আক্রমণকারীদের একজন দার্ণৎকে আক্রমণ করল। টারজন দার্ণতের সাহায্যে এগিয়ে গেলে আক্রমণকারীদের একজন লাভাকের পেটের মধ্যে তার মুখোসের তীক্ষ্ণ শিংটা ঢুকিয়ে দিলে লাভাক সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। টারজন তখন তার ত্রিশূল দিয়ে আর একজন আক্রমণকারীকে বধ করলে বাকি আক্রমণকারীরা পালিয়ে গেল।

টারজন তখন বলল, ক্রলার মারা গেছে। হীরের কৌটোটা চুরি হয়ে গেছে। এবার আমি আমার কথামত হেরাতের কাছে ফিরে যাব।

হার্কুফ বলল, আমার হাতে যে কৌটোটা রয়েছে এটাই হলো হীরকদের পিতা।

টারজন হার্কুফকে বলল, তুমি কৌটোটা নিয়ে যাও হেরাতের কাছে। বলবে, আমি একটা নৌকো পেলে থোবোজে গিয়ে দেখা করব তার সঙ্গে।

হার্কুফ থোবোজে গিয়ে হেরাতের হাতে হীরের কৌটোটা তুলে দিয়ে সব কথা বলল। বলল, টারজনের সাহায্য ছাড়া হীরকদের পিতাকে উদ্ধার করতে পারতাম না। তারা এখন বিপন্ন। তাদের উদ্ধারের জন্য এখনি আমাদের সাহায্য পাঠানো উচিত।

হেরাৎ বলল, ক্রলার মারা গেছে। হীরকদের পিতাকে পেয়ে গেছি। আমাদের যুদ্ধের নৌকো-গুলো সব প্রস্তুত করো। আমরা এখনই আশেয়ার আক্রমণ করব। আমাদের যত যুদ্ধের নৌকো আছে সব সাজাও।

হার্কুফ চলে গেলে টারজন ও দার্ণৎ আশেয়ারের পথে পা বাড়াল। টারজন হোরাস হ্রদের পাশে পাশে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে চলতে লাগল। যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল টারজন। উঙ্গোর দলের একটা বাঁদর-গোরিলাকে দেখতে পেল। টারজন দেখল একটা বাঁদর গোরিলা একটা গুহার সামনে উঁকি মেরে কি দেখছে। টারজন বুঝল গুহার ভিতরে নিশ্চয় এমন কিছু আছে যা কৌতূহল জাগাচ্ছে।

এদিকে চোন সেই গুহামন্দিরের মধ্যে গ্রেগরিকে বেদীর উপর শুইয়ে তার পেট কেটে নাড়ীভুঁড়ী বার করতে যাচ্ছিল।

এমন সময় ব্রিয়ান আর টাস্ক বাঁদর-গোরিলাদের ভয়ে সেই গুহামন্দিরে ঢুকে পড়ল।

এদিকে একদল বাঁদর-গোরিলা এসে গুহা-মন্দিরে ঢুকতেই সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। পুরোহিতরা ভয়ে পালাতে লাগল। জুথো আর গয়ান নামে দুটো বাঁদর-গোরিলা হেলেন আর মাগরাকে গোলমালের সময় ধরে তুলে নিয়ে গেল।

বাইরে গিয়ে জুথো আর গয়ানদের ঝগড়া লেগে গেল নিজেদের মধ্যে। সেই অবসরে মাগরা আর হেলেন সেখান থেকে ছুটে পালাতে লাগল। কিন্তু আশেয়ারের একটা নৌকো হ্রদের কূলের কাছ দিয়ে যেতে যেতে তাদের দেখতে পেয়ে নৌকো থামিয়ে কূলে লাফ দিয়ে নেমে তাদের ধরে ফেলল। তারপর তাদের নৌকোয় চাপিয়ে নৌকো ছেড়ে দিল। তাদের আশেয়ারে রাণীর কাছে নিয়ে গেল তারা।

এদিকে টারজন দার্ণৎকে নিয়ে গুহামন্দিরে ঢুকেই গ্রেগরিকে মুক্ত করল।

টাস্ক গ্রেগরিদের সঙ্গে হেলেনের খোঁজ করতে থাকাকালে হঠাৎ দেখল আতন থোম হীরের কৌটোটা নিয়ে পালাচ্ছে। সে তখন সবাইকে ফেলে থোমের পেছনে ছুটতে লাগল। আতন থোম টাস্ক-কে খুব কাছে আসতে দেখে একটা পাথর নিয়ে তার মাথায় সজোরে ছুঁড়ে দিতে মাথাটা গুঁড়ো হয়ে গেল টাস্কের।

বাতাসে মেয়েদের গন্ধসূত্র ধরে হেলেন আর মাগরার খোঁজ করতে করতে আর একটা গুহায় ঢুকে পড়ল টারজন। সেখানে জুথো আর গয়ানকে দেখে হেলেন আর মাগরার কথা জিজ্ঞাসা করল। তারা বলল, নৌকো থেকে লোক এসে ধরে নিয়ে গেছে।

তখন টারজন আশেয়ারে যেতে চাইল। চোন বলল, আমার পুরোহিতরা তোমার সঙ্গে যাবে।

টারজন, দার্ণৎ, চোন তার দলের পুরোহিতদের আর উঙ্গোর বাঁদর-গোরিলাদের সঙ্গে আশেয়ারের নগরদ্বারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

এদিকে হেরাৎও অনেক নৌকোবোঝাই যোদ্ধা নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আশেয়ারের দিকে। আশেয়ারের নৌকোবোঝাই যোদ্ধারা আগে হতেই থোবোজের নৌকো দেখে অপেক্ষা করছিল। হোরাস হ্রদের উপরে সেখানে দুদলে প্রচণ্ড যুদ্ধ লেগে গেল।

ঠিক তখনি আশেয়ারের নগরদ্বারে টারজন তার দলবল নিয়ে যোদ্ধাদের হারিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল

প্রাসাদের মধ্যে। সে রাণী আটকার কাছে সোজা চলে গিয়ে বলল, যে দুটি মেয়েকে বন্দী করে রাখা হয়েছে তাদের ছেড়ে দাও। তা না হলে আমি কাউকে ছাড়ব না।

আটকা বলল, সত্যিই তুমি বিজয়ী। এই মুহূর্তে তাদেব ছেড়ে দেওয়া হবে।

মাগরা আর হেলেনকে টারজনের সামনে আনা হলে গ্রেগরি বলল, আবার আমরা পুনর্মিলিত হলাম। এখন আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এমন সময় হেরাৎ আশেয়ারের সব যোদ্ধাকে হারিয়ে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করল বিজয়গর্বে। এই প্রথম থোবোজের এক রাজা শত্রুরাজ্য জয় করে আশেয়ারের মাটিতে পা দিল। চোন আর টারজন অভ্যর্থনা জানাল হেরাৎকে। ওরা যখন কথাবার্তা বলছিল তখন একদল থোবোজের যোদ্ধা আতন থোমকে টানতে টানতে ধরে আনল। বলল, এর কাছে একটা হীরের কৌটো রয়েছে।

চোন বলল, এটাই কি আসল হীরকদের পিতা?

কিন্তু সে জানত না আসল হীরের কৌটোটা হার্কুফ তার আগেই থোবোজে নিয়ে গেছে।

চোন কৌটোর ঢাকনাটা খুলতে গেলে আতন থোম বাধা দিয়ে বলল, খুলো না, ওটা আমি প্যারিসে নিয়ে বিক্রি করব। গোটা প্যারিস শহরটাকে কিনব। ওটা আমার।

ঢাকনা খুলে চোন দেখল আসলে একতাল কয়লা ভরা আছে তার মধ্যে।

এই দেখে আতন থোম নিজের বুক চাপড়াতে চাপড়াতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটল তার।

ব্রিয়ান বলল, হায় হায়, এর জন্য এত কষ্ট ভোগ করলাম, কত লোক প্রাণ দিল। তবে আসলে কিন্তু কয়লাই হীরের পিতা।

টারজন বলল, মানুষ হলো প্রকৃতপক্ষে এক আশ্চর্য জন্তু।
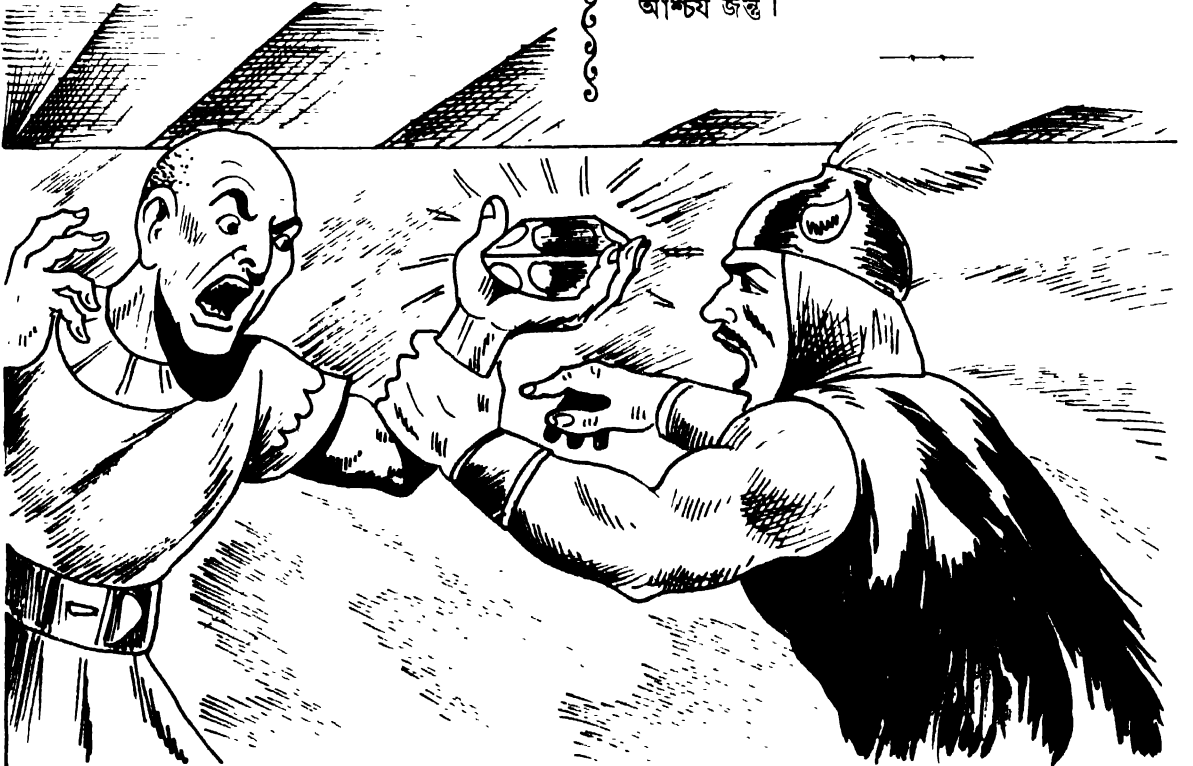
উগোগো নদীর তীরে নর-খাদক ওবেবের গ্রামের একটা অন্ধকার নোংরা ঘরে পাচার উপর ভর দিয়ে বসে এস্টেবান মিরাণ্ডা একটা আধসিদ্ধ মাছের বাকি অংশটা খুবলে খুবলে খাচ্ছিল। তার গলায় ঝুলছে কয়েক ফুট লম্বা মরচে-ধরা শিকলে আটকানো একটা ক্রীতদাস-কণ্ঠি।

গত এক বছর ধরে এস্টেবান মিরাণ্ডা এইভাবে কুকুরের মত শিকলে বাঁধা আছে। তার নিশ্চিত ধারণা যে সেই গোরিলাদের টারজন; দীর্ঘকাল যাবৎ সে নিজেকে টারজনের সঙ্গে একাত্ম করে ভেবেছে এবং একজন ভাল অভিনেতার মত অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সেই ভূমিকায় অভিনয় তো করেছেই, উপরন্তু তার মতই জীবন-যাপন করেছে—টারজনই হয়ে উঠেছে। ওবেবের কাছেও সে গোরিলাদের টারজন; কিন্তু গ্রামের ওঝা এখনও বলে যে আসলে সে হচ্ছে জল-পিশাচ, আর তাকে না রাগিয়ে বরং তার পূজা করাই উচিত। ওঝা গ্রামের মানুষদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে যে তাদের এই বন্দীটি টারজনের ছদ্মবেশে আসলে জল-পিশাচ; সুতরাং তার কোন ক্ষতি হলে গ্রামের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এস্টেবান মিরাণ্ডার সুখের বিষয়টি হল রুশ ক্রাস্কির হীরকের থলের চিন্তা। গোরিলা-মানুষটির কাছ থেকে থলেটা চুরি করার পরে স্পেনীয় লোকটি ক্রাস্কিকে খুন করে সেটা হস্তগত করে—আবার বোলগানির নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাত থেকে "হীরক প্রাসাদ উপত্যকায়" গোমাঙ্গানিকে উদ্ধার করার পরে সেই লোকটিই হীরক গম্বুজের নীচে অবস্থিত সুরক্ষিত কক্ষে থলেটি তুলে দেয় টারজনের হাতে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা নোংরা খোয়াড়ের অস্পষ্ট আলোয় বসে এস্টেবান মিরাণ্ডা সেই উজ্জ্বল পাথরগুলি গোণে, আদর করে তাতে হাত বুলোয়। কারও পায়ের শব্দ শুনলেই রূপকথার ঐশ্বর্যকে লুকিয়ে ফেলে তার একমাত্র পরিধেয় শতচ্ছিন্ন কটি-বস্ত্রের মধ্যে।

একটি বছরের নির্জন বন্দী-জীবনের পরে এখন আবার তার সামনে দেখা দিয়েছে আনন্দের খোরাক: ওঝা খামিসের মেয়ে উহ্‌হা। একটি বছর ধরে এই রহস্যময় বন্দীটিকে সে দূর থেকে দেখেছে; ক্রমে

তার ভয় ভেঙেছে ; একদিন বন্দী যখন কুঁড়ের বাইরে রোদে শুয়েছিল তখন মেয়েটি তার কাছে এগিয়ে এল।

তাকে দেখে এস্টেবান থেমে থেমে বলল, এক বছর হল আমি সর্দার ওবেবের গাঁয়ে এসেছি, কিন্তু আগে কখনও ভাবতেও পারি নি যে তোমার মত একটি সুন্দরী এখানে থাকে। তোমার নাম কি?

উহ্হা খুশি হল। বলল, আমি উহ্হা। ওঝা খামিস আমার বাবা।

এস্টেবান শুধাল, তুমি এতদিন আসনি কেন?

ভয়ে।

কিসের ভয়?

মেয়েটি ইতস্তত করতে লাগল। এস্টেবান হেসে বলল, আমি জল-পিশাচ, তোমার ক্ষতি করব—এই ভয় তো?

হাঁ।

শোন! এস্টেবান ফিস্‌ফিস্ করে বলল, কাউকে বলো না কিন্তু। জল-পিশাচ হলেও আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।

তবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উহ্হা ছুটে বাড়ি ফিরে গেল।

দিনের শেষে খামিস বাড়ি ফিরলে একসময় উহ্হা তাকে শুধাল, আচ্ছা বাবা, জল-পিশাচের ক্ষতি যারা করে সে তাদের কেমন করে শাস্তি দেয়?

খামিস বলল, নদীতে যত মাছ আছে, তারও তেমনি অসংখ্য উপায় আছে। নদী থেকে মাছ তাড়িয়ে দিতে পারে, জঙ্গল থেকে শিকার তাড়িয়ে দিতে পারে, ফসল নষ্ট করে দিতে পারে। তাহলেই তো আমরা না খেয়ে মরে যাব। রাতের বেলা আকাশ থেকে আগুন এনে ওবেবের সব মানুষকে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে পারে।

একটু চুপ করে থেকে উহ্হা আবার বলল, তার গলায় কণ্ঠি বাঁধা থাকলে সে পালাবে কেমন করে? কে ওটা খুলে দেবে?

খামিস বলল, ওবেবে ছাড়া আর কেউ ওটা খুলতে পারবে না। তার থলির মধ্যে একটা পিতলের টুকরো থাকে ; সেটা দিয়েই কণ্ঠিটা খোলা যায়। কিন্তু জল-পিশাচের কোন কিছুরই দরকার হয় না। ইচ্ছা করলেই সে সাপ হয়ে কণ্ঠির ভিতর দিয়ে গলে যেতে পারে। আরে, তুমি চললে কোথায়?

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়ে বলল, ওবেবের মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে।

ওবেবের মেয়ে তখন ভুট্টা পেষাই করছিল। ওঝার মেয়েকে দেখে মুখ তুলে হাসল। সতর্ক করে দিয়ে বলল, গোলমাল করো না উহ্হা, ভিতরে বাবা ঘুমচ্ছে।

নানান কথা বলতে বলতে একসময় উহ্হা ছুটে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াল। ওপাশের দেয়ালের গায়ে ওবেবে মাদুরে শুয়ে ঘুমচ্ছে। তার নাক ডাকছে। উহ্হা চুপিসারে

এগিয়ে গেল। সর্দারের শরীরের নীচ থেকে তার থলির অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে। কাঁপা হাতটা বাড়িয়ে সে থলিটা তুলে নিল। মুখটা খুলে ভিতরে কি আছে দেখল। পিতলের চাবিটা চিনতে তার অসুবিধা হল না। চাবিটা বের করে নিয়ে থলিটা বন্ধ করে আবার বিছানায় রেখে দিল। তারপর সতর্ক দ্রুতপদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সে রাতে ওবেবের ঘরে উনুনের আগুন ক্রমে ছাই হয়ে গেল; একে একে সকলেই ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল। এস্টেবান মিরাণ্ডা তার খোয়াড়ের দরজায় ত্রস্ত পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে কান পাতল।

সে হাঁক দিল, কে?

চুপ! আমি ওঝা খামিসের মেয়ে উহ্‌হা। তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি। এই দেখ! তোমার গলার কণ্ঠির চাবি আমার হাতে।

খুব ভাল করেছ। ওটা দাও।

আর একটু এগিয়ে চাবিটা তার হাতে দিয়েই উহ্‌হা পালিয়ে যাচ্ছিল; বন্দী তাকে বাধা দিয়ে বলল, দাঁড়াও! যখন মুক্তি দিয়েছ তখন আমাকে জঙ্গল পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, আর কিছু অস্ত্র-শস্ত্র এনে দাও। যে আমাকে মুক্তি দেবে, জল-দেবতার কৃপালাভ করতে হলে এ কাজ তাকে করতেই হবে।

উহ্‌হা তীরবেগে অন্ধকার গ্রামের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। বার কয়েক ব্যর্থ চেষ্টার পরে মিরাণ্ডার গলায় মরচে-ধরা তালাটা খুলে গেল। এবার সে মুক্ত, স্বাধীন। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই উহ্‌হা তীরভর্তি একটা তূণীর, একটা ধনুক ও একটা ছুরি নিয়ে হাজির হল।

এস্টেবান বলল, এবার আমাকে ফটক পর্যন্ত নিয়ে চল।

জল-পিশাচের ভয়ে এবং জল-দেবতার কৃপালাভের আশায় উহ্‌হা এ প্রস্তাবেও রাজী হল। বড় রাস্তাটা এড়িয়ে যতটা সম্ভব কুঁড়ে ঘরগুলির ছায়ায় ছায়ায় সে এস্টেবানকে নিয়ে গ্রামের ফটকে পৌঁছে গেল।

উহ্‌হা ফটক বন্ধ করে গ্রামে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই এস্টেবান তার হাতটা ধরে বলল, এস. তোমার পুরস্কার নাও।

উহ্‌হা নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু মিরাণ্ডা হাত দিয়ে তার মুখটা চেপে ধরে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লর্ড গ্রেস্টোকের আফ্রিকাস্থ বাংলোর বারান্দা থেকে নেমে তিনটি প্রাণী গোলাপ-বীথির ভিতর দিয়ে ফটকের দিকে হাঁটতে লাগল। দুজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক : বয়স্ক লোকটির হাতে বৈমানিকের শিরস্ত্রাণ ও একজোড়া গগল্‌স্‌। যুবকটির কথা মন দিয়ে শুনতে শুনতে সে নিঃশব্দে হাসছে।

যুবকটি বলল, মা এখানে থাকলে তুমি একাজ করতে পারতে না ; মা তোমাকে করতে দিত না।

টারজন বলল, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। কিন্তু এবারটা তুমি আমাকে উড়তে দাও ; আমি কথা দিচ্ছি, তোমার মা ফিরে না আসা পর্যন্ত আর আকাশে পাড়ি দেব না।

তরুণীটি বলল, ওর মতই আমারও তোমার জন্য ভয়ের অন্ত নেই বাবা। তুমি এত বেশী ঝুঁকি নাও যে মনে হয় তুমি বুঝি বা নিজেকে অমর বলে মনে কর। তোমার আরও সাবধান হওয়া উচিত।

যুবকটি স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে বলল, মিরিয়েম ঠিকই বলেছে ; তোমার আরও সাবধান হওয়া উচিত বাবা।

দূরের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাইপ্লেন। আর ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে দুটি ওয়াজিরি সৈনিক। শিরস্ত্রাণ ও গগল্‌স্‌ পরে টারজন ককপিটে চড়ে বসল।

এক মুহূর্ত পরেই বাইপ্লেনটা আকাশে উড়ল।

ঘণ্টা দেড়েক ধরে টারজন সোজা উড়ে চলল। যে রকম সহজ নৈপুণ্যের সঙ্গে সে জাহাজটাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে তারই অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দে সে ভুলেই গেল কতক্ষণ ধরে উড়ছে, বা কতদূর পথ পার হয়েছে।

টারজন স্থির করল, জাহাজটাকে বাড়িমুখো ফেরাবার আগে এই রহস্যঢাকা দেশটাকে আরও ভাল করে দেখতে মাটির আরও কাছাকাছি নামবে। করলও তাই। হঠাৎ তার খেয়াল হল, বিচিত্র এই নতুন দেশটাকে দেখতে সে এতই মশগুল হয়ে পড়েছিল যে কখন অজান্তে জাহাজটা বড় বেশী নীচে নেমে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজটা অনেক উঁচু একটা বড় গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পাক খেয়ে সশব্দে ভেঙে পড়ল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরেই সব নিশ্চুপ।

বনপথ ধরে এগিয়ে এল একটি অতিকায় প্রাণী ; দেহ গঠন মানুষের মত, অথচ ঠিক মানুষ নয়। কড়া-পড়া শক্ত হাতে একটা মুগুর নিয়ে একটা অতিকায় পশু বুঝি দুই পায়ে খাড়া হয়ে এগিয়ে এল। প্রাণীটির উচ্চতা ছ' ফুটের মত।

আরও খানিকটা এগিয়ে এসে দেখতে পেল একটা লোক পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সে গোরিলা-মানুষ টারজন। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মাথার উপরে তার বিধ্বস্ত বাইপ্লেনটা গাছের ডালে আটকে রয়েছে।

এই বিচিত্র লোকটিকে দেখে সে অবাক হল, কিন্তু ভয় পেল না। আঘাত করতে হাতের মুগুরটা তুলেও কেন কে জানে আঘাত করল না। তারপর গোরিলা-মানুষের দেহটাকে একঝটকায় কাঁধে তুলে নিয়ে যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকেই হাঁটতে লাগল।

টারজনকে কাঁধে নিয়ে একটা বিচিত্র পাথরের গুহায় সে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলেমেয়েরা টারজনকে ঘিরে দাঁড়াল। তাকে ভাল করে দেখল, উল্টে দিল, খোঁচা দিল, চিমটি কাটল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, টারজন যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল।

টারজনের ভাগ্য ভাল, উড়োজাহাজ থেকে পড়ার সময় নরম ডালপালার ভিতর দিয়ে পড়ায় মাথায় সামান্য আঘাত ছাড়া বড় রকমের কোন আঘাত পায় নি। ধীরে ধীরে তার জ্ঞান ফিরে এল। ক্রমে শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল।

উঠে বসল। ধীরে ধীরে গুহার বাইরে বেরিয়ে এল। সেখানে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে কেউ রোদে, কেউ বা ছায়ায় বসে আছে। টারজন ভাবল, এরা কারা? এরা কি তার রক্ষী, না নিজেরাই বন্দী?

কালো চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে টারজন মাথাটা নাড়াতে লাগল। তার মনে পড়ল, মাঝপথে হঠাৎ বিমানটা ভেঙে পড়েছিল, একটা বড় গাছের ডালপাতার ভিতর দিয়ে সে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল; কিন্তু তাছাড়া আর কিছুই তার মনে পড়ছে না। আলালি ছেলেমেয়েদের দিকে চোখ রেখে নির্ভীক সিংহের মত সদম্ভে পা ফেলে বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েগুলো এগিয়ে এসে তাকে ঘিরে ধরল। ছেলেগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মেয়েগুলোই কাছে এগিয়ে এল। টারজন তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল; পর পর নানা উপ-জাতির ভাষায় কথা বলল, কিন্তু তারা কোনটাই বুঝতে পারল না। সকলেরই ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তখন টারজনের উপর। তাকে দিয়ে পেটের ক্ষিধে মেটাতে তারা তখন কৃতসংকল্প।

কিন্তু তাদের বাধা দিল ষোল বছরের একটি ছেলে। নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে ও মাথা নেড়ে সে অন্য সকলকে বিরত করতে চেষ্টা করতে লাগল। ফল কিন্তু হল উল্টো। ক্ষিধের জ্বালায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে অন্য ছেলেমেয়েগুলো সেই ছেলেটাকেই পাল্টা আক্রমণ করে বসল। দ্রুত সরে গিয়ে ছেলেটা কোমর থেকে কয়েকটা পালক-লাগানো পাথর তুলে নিয়ে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারল। দুটি মেয়ে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তৃতীয় পাথরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটা ছেলের কপালে গিয়ে লাগতে সেও সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। এবার ছেলেমেয়েরা সকলেই মার মার ভঙ্গীতে ছেলেটাকে তাড়া করে এল। একটা পাথর আবার তাদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েই ছেলেটা টারজনের দিকে ছুটে গেল।

কিসের টানে কে জানে টারজন ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসল। ছেলেটা ভয়ংকর দুই পাটি দাঁত মেলে ধরল; অবশ্য টারজনের বুঝতে অসুবিধা হল না যে ছেলেটা তার হাসিরই প্রতিদান দিল। টারজন আবার ছেলেটার দিকে তাকাল; সে তখন ভয়ে কাঁপছে। অদূরেই পিছনের একটা প্রাচীর। একটানে আলালুস জাতির ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে টারজন সেই দিকে ছুটে গেল। এক লাফে প্রাচীরের উপর চড়ে বসে ছেলেটিকেও ও পাশের মাটিতে নামিয়ে দিয়ে নিজেও সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল।

পথ দেখিয়ে ছেলেটা ছুটছে আগে আগে; পিছনে ছুটছে টারজন। কিন্তু অচিরেই সে দ্রুততর গতিতে ছেলেটাকে ছাড়িয়ে আগে চলে গেল। পরমুহূর্তেই অনুসরণকারীদের বোকা বানিয়ে টারজন জঙ্গলে ঢুকেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু দূর থেকেও তার চোখ রইল আলালুস ছেলেটার দিকে। সে তখন নীচের পথ ধরে প্রাণপণে ছুটছে।

আলালুস যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হল টারজনের দীর্ঘ পথযাত্রা।

এইভাবে টারজন ও আলালুস যখন দীর্ঘ অরণ্যপথ পার হয়ে চলল আর টারজন খুঁজতে লাগল একটা পালাবার পথ, ঠিক তখনই ওঝা খামিসের মেয়ে ছোট্ট উহ্ হাকে সঙ্গে নিয়ে সেই একই অরণ্যের অন্য প্রান্তের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে এস্টেবান, পশ্চিম উপকূলে যাবার একটা পথের সন্ধানে।

আলালুস যুবকটি টারজনের পিছনেই লেগে রইল। এতদিনে টারজনও যুবকটির ইঙ্গিত ভাষা কিছুটা শিখে নিয়েছে।

একদিন তেমনিভাবে একা শিকারে বেরিয়ে টারজন একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। দেখতে পেল একটি বিরাটকায়া আলালুস নারীকে; তাকে ঘিরে ধরেছে একদল বেঁটে বামন—পশ্চিম উপকূলের বিশেষ ধরনের হরিণের পিঠে সওয়ার হয়ে তারা হাতের বর্শা ও তরবারি দিয়ে বার বার আঘাত করছে আলালুস নারীর বিরাট দুটি পায়ে, নারীটিও আক্রমণকারীদের লাথি মেরে ও হাতের মুগুর চালিয়ে ধীরে ধীরে জঙ্গলের দিকে পিছু হটে যাচ্ছে।

নারীটির এক এক লাথিতে আক্রমণকারীদের ডজন-খানেক সৈনিক ধরাশায়ী হচ্ছে ; ইতিমধ্যেই শ'খানেক যোদ্ধার প্রায় অর্ধেকই মারা পড়েছে।

টারজন জঙ্গলের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। তাকে দেখা মাত্রই দ্বিতীয় শত্রু মনে করে বামন সৈন্যরা হতাশায় চীৎকার করে রণে ভঙ্গ দিল। কিন্তু নারীটি মুখ ভেংচে মুগুর উঁচিয়ে তাকেই তেড়ে এল। তার বাঁ হাতের মুঠিতে ঝুলছে একটি বেঁটে মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে টারজনও ধনুকে তীর জুড়ে হুংকার দিয়ে উঠল, চলে যাও, নইলে তোমাকে খুন করে ফেলব। আর যাবার আগে হাতের ছোট মানুষটিকে ছেড়ে দিয়ে যাও।

নারীটি কিন্তু হিংস্র ভঙ্গীতে দাঁত বের করে আরও জোরে ছুটে এল। আর দেরী করা বিপজ্জনক। টারজন হাতের তীর ছুঁড়ে দিল। সে তীর আমূল বিদ্ধ হল নারীটির বুকে। সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। কিন্তু তার আগেই টারজন এক লাফে এগিয়ে গিয়ে তার মুঠোর ভিতর থেকে বামন সৈন্যটিকে উদ্ধার করে আনল।

সমবেত বামনরা আনন্দে হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল। নতজানু হয়ে সকলে টারজনের হাতে চুমো খেতে লাগল। টারজন বুঝতে পারল, এই লোকটি তাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ; হয়তো তাদের সর্দার।

সকলের দিকে ভাল করে তাকিয়ে টারজন বুঝল, এদের মধ্যে যে সব চাইতে লম্বা তার উচ্চতা মাত্র আঠারো ইঞ্চি ; রোদে পুড়ে তাদের সাদা চামড়া অনেকটা তামাটে রং ধরেছে।

মুক্তিপ্রাপ্ত যুবকটি এগিয়ে এসে টারজনের সামনে নতজানু হয়ে হাত বাড়াল ; টারজনও মাথাটাকে ঈষৎ নামিয়ে হাত বাড়িয়ে অভিবাদন জানাল। সর্দার জানাল, তারা এবার ফিরে যাবে ; অতএব টারজনও তাদের সঙ্গেই চলুক।

কৌতূহল বশতই টারজন তাদের সঙ্গে যেতে সম্মত হল।

যাই হোক, দিনের আলো থাকতে থাকতেই একসময় টারজন দেখতে পেল, অনেক দূরে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে গম্বুজ-আকারের অনেকগুলি পাহাড়ের চূড়া, আর একদল সৈনিক হরিণের পিঠে সওয়ার হয়ে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে দ্রুত গতিতে।

আরও কাছে পৌছে টারজন দেখল, অসংখ্য বামন সেই পাহাড়-চূড়াগুলিতে চলাফেরা করছে ; আর যেগুলিকে দূর থেকে পাহাড়ের চূড়া বলে মনে হয়েছিল আসলে সেগুলি ছোট ছোট পাথরের তৈরী গম্বুজওয়ালা বাড়ি ; নিজেরাই সেগুলি তৈরী করেছে।

সকলের সঙ্গেই টারজনের একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠল। বিশেষ করে তাদের রাজা অ্যাডনড্রোহাখিস তো তার উপর খুব খুশি, কারণ রাজার ছেলে কোমোডোফ্লোরেন্সালকে সেই বাঁচিয়েছে আলালুস নারীর কবল থেকে। অতএব পরম সুখেই তার দিন কাটতে লাগল।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন টারজন রাজকুমার কোমো-ডোফ্লোরেন্সালকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার স্ত্রী কোথায়?

সে জবাব দিল, আমার স্ত্রী নেই। পার্শ্ববর্তী শহর ভেল্টোপিস্‌মেকাসের বিরুদ্ধে আমাদের একটা যুদ্ধের আয়োজন চলছে। সেখানকার রাজার একটি পরমা সুন্দরী কন্যা আছে; নাম জানজারা। রাজা অ্যাডেনড্রোহাখিসের ছেলের সেই হবে উপযুক্ত পাত্রী।

একদিন রাজা অ্যাডেনড্রোহাখিসের শহরের এক প্রান্তে একটা বড় গাছের নীচে ঘাসের বিছানায় শুয়ে ছিল টারজন। হঠাৎ মাটির নীচ থেকে একটা অস্পষ্ট কাঁপন কানে আসায় তার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

জেগে উঠে ভাল করে কান পাততেই সে বুঝতে পারল, শব্দটা মাটির নীচ থেকে আসছে না, আসছে মাটির উপর থেকেই, আর সেটাও খুব দূর থেকে নয়। শব্দটা অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে। মুহূর্তমাত্র হতচকিতভাবে থেকেই হঠাৎ সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাজা অ্যাডেনড্রোহাখিসের প্রাসাদ-গম্বুজ মাত্র শ'খানেক গজ দূরে; টারজন সেই দিকে পা চালিয়ে দিল। দক্ষিণ ফটকের মুখে জনাকয়েক সৈনিকসহ একজন অফিসার এসে প্রশ্ন করল, ব্যাপার কি?

টারজন জবাব দিল, অনেক হরিণের আসার শব্দ সে শুনতে পেয়েছে।

অফিসার বলল, কোন্ দিক থেকে আসছে?

পশ্চিম দিকে আঙুল বাড়িয়ে টারজন বলল, শব্দটা ঐদিক থেকেই আসছে বলে মনে হচ্ছে।

ভেল্টোপিস্‌মেকাসের লোকরা আসছে। চীৎকার করে কথাগুলি বলেই অফিসার সঙ্গীদের দিকে ঘুরে বলল, শীঘ্র যাও। ট্রোহানাডাল্‌মেকাসের লোকদের জাগাও—আমি যাচ্ছি রাজপ্রাসাদ ও রাজাকে সতর্ক করে দিতে।

সকলেই যার যার পথে চলে গেল।

টারজন দেখতে পেল, অবিশ্বাস্যরকম অল্প সময়ের মধ্যেই হাজার হাজার সৈনিক দশটি গম্বুজের প্রতিটি থেকে জলস্রোতের মত বেরিয়ে আসছে। উত্তর ও দক্ষিণ ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছে হরিণারোহী সৈনিক আর পূর্ব ও পশ্চিম ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছে পদাতিক সৈন্যের দল।

সৈন্য পরিচালনার গুরু দায়িত্ব নিয়ে গম্বুজ-প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেছে যুবরাজ কোমোডো-ফ্লোরেন্সাল। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সে শহর থেকে দু' মাইল দূরে প্রথম ঘাঁটি বানিয়েছে সাত হাজার পাঁচ শ' সৈন্যের। তার পিছনে আধ মাইল দূরে রেখেছে দু' হাজার সৈন্য; তাছাড়া অগ্রবর্তী সৈন্যদলে আছে দশ হাজার সৈনিক; গোটা শহরকে তারা ঘিরে রেখেছে।

টারজন রাজা অ্যাডেনড্রোহাখিসের দিকে এগিয়ে গেল। রাজার গায়ের সোনালী পোশাক ঝলমল করছে।

তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে রাজা বলল, রক্ষী-দলপতি আমাকে বলেছে, ভেল্টোপিস্‌মেকাস বাহিনীর আগমন বার্তা তুমিই সকলের আগে জানিয়েছ। তাই আর একবার ট্রোহামাডালমেকাসের মানুষদের তুমি কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছ। কি করলে সে ঋণ শোধ হবে বল?

টারজন সবিনয়ে জানাল, আমার কাছে তোমাদের কোন ঋণ নেই। তোমাদের বন্ধুত্ব লাভ করলেই আমি খুশি হব। তুমি শুধু এই অনুমতি দাও, আমি যেন তোমার ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারি।

রাজা বলল, মৃত্যু কীট যতদিন আমাকে গিলে না খাবে ততদিনই আমি তোমার বন্ধু থাকব। তোমার যেখানে খুশি যেতে পার। তুমি যে যুদ্ধের জায়গাটাই বেছে নিয়েছ তাতে আমি মোটেই বিস্মিত হই নি।

যুবরাজ হাঁক দিল, ওরা এসে পড়েছে।

উঁচু নীচু প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে টারজন দেখল, ভেল্টোপিসমেকাসবাসীরা দলে দলে এগিয়ে আসছে।

কোমোডোফ্লোরেন্সালের হুকুমে শুরু হল প্রচণ্ড লড়াই। সেদিকে তাকিয়ে যুবরাজ বলল, সংখ্যায় ওরা অনেক বেশী। সেই সংখ্যার জোরেই ওরা আমাদের কিছু লোককে বন্দী করবে, আমরাও কিছু লোককে বন্দী করব।

বলতে বলতেই যুবরাজ সেখান থেকে সরে গেল। সে ছুটে গেল নিজের সৈন্যদের পাশে। সেখানে চলেছে দুই পক্ষের হাজার হাজার সৈন্যের মরণ পণ সংগ্রাম।

এতক্ষণে ভেল্টোপিসমেকাসবাসীদের দৃষ্টি পড়ল টারজনের উপর। তারা দলে দলে ধেয়ে এল তাকে লক্ষ্য করে। টারজনও প্রথমে হাতের ডালটা দিয়ে তাদের ঝাটা-পেটা করতে লাগল। কিন্তু শত্রুপক্ষ

যুবরাজ কোমোডোফ্লোরেন্সাল তাকে সাদরে গ্রহণ করল। তার কাঁধে একটা পাতা ভরা ডাল দেখে যুবরাজ অবাক হয়ে তাকাল।

টারজন বলল, খবর কি?

যুবরাজ বলল, খবর পেয়েছি, ওদের দলে আছে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার সৈন্য।

ঠিক তখনই পশ্চিম দিক থেকে একটা শব্দের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল।

যে সংখ্যাহীন। টারজনের ঝাটার আঘাতে যতজন মারা যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা দশগুণ এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হঠাৎ একটি বেঁটে সৈনিক এসে ঢুঁ মারল টারজনের পেটে; সে আঘাতে তার মাথাটা ঘুরে গেল; মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল সে।

নরখাদক ওবেবেদের ওঝা খামিসের মেয়ে উহ্‌হা জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা ঘরে ঘাসের উপর গুড়ি-সুড়ি মেরে শুয়ে আছে।

স্পেনীয় লোকটির দিকে তাকিয়ে ছোট্ট নিগ্রো মেয়েটির চোখ দুটি ঝিকমিকিয়ে উঠল, কারণ তার প্রতিহিংসা সাধনের উপায় রয়েছে ঐ লোকটিরই দখলে। আগুনের দিকে ঝুঁকে শুয়ে পড়ে লোকটি খুশি মনে তাকিয়ে আছে তার ছোট হরিণ চামড়ার থলেটার দিকে। ছোট্ট উহ্‌হা জানে, থলের ভিতর-কার এই ঝকমকে ছোট পাথরগুলোকে এস্টেবান মিরাণ্ডা কত ভালবাসে। সেগুলো যে হীরে তা সে জানে না, সেগুলোর মূল্যও বোঝে না। শুধু জানে যে এই পাথরগুলোকে লোকটা এত ভালবাসে যে সে মরবে তবু ওগুলো হাতছাড়া করবে না।

এক সময় স্পেনীয় লোকটির শ্বাস-প্রশ্বাস থেকেই বোঝা গেল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে উহ্‌হা ঘাসের নীচে হাত ঢুকিয়ে একটা বড় মুগুর টেনে বের করল। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে উঠে ঘুমন্ত মিরাণ্ডার পাশে হাঁটু ভেঙে বসল। মুগুরটাকে মাথার উপর তুলে সবেগে মাত্র একবার এস্টেবানের খুলিতে আঘাত হানল—একটি আঘাতই যথেষ্ট। কিন্তু উহ্‌হা চায় না যে সে মারা যাক; সে বেঁচে থেকে জানুক যে উহ্‌হা তার বড় আদরের থলেটা চুরি করেছে। মিরাণ্ডার কোমরে ঝোলানো ছুরিটা দিয়েই কটিবস্ত্রটা কেটে উহ্‌হা তার চামড়ার থলে ও হীরেগুলো হাতিয়ে নিল। তারপর দরজার কাঁটা-গাছগুলো সরিয়ে রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল!

জ্ঞান ফিরে এলে টারজন দেখল, একটা বড় ঘরের মাটির মেঝেতে সে শুয়ে আছে। দুটো বড় আকারের মোমবাতি জ্বলছে ঘরে।

ঘরে পঞ্চাশ থেকে একশ' জন অন্য লোক রয়েছে। সকলেরই উচ্চতা প্রায় তারই মত, কিন্তু তারা সকলেই সশস্ত্র ও সুসজ্জিত। টারজন ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভাল করে জ্ঞান হতে আরও বুঝতে পারল যে তার সারা শরীরে ব্যথা, হাত দুটো ভারী ও অবশ। হাত নাড়তে চেষ্টা করল—পারল না, দুটো হাতই পিছমোড়া করে বাঁধা। তবে পায়ে কোন বাঁধন নেই। অনেক কষ্টে উঠে বসে চারদিকে তাকাল। ঘরভর্তি সৈনিক; দেখতে হুবহু ভোল্টোপিস্‌মেক্কাস-বাসীদের মত, কিন্তু তাদের উচ্চতা স্বাভাবিক মানুষেরই মত। ঘরে অনেকগুলো টেবিল ও বেঞ্চি পাতা; লোকগুলি হয় তাতে বসে আছে, নয়তো মেঝেতে শুয়ে আছে। তাদের প্রায় সকলেই আহত, অনেকে গুরুতর আহত। কিছু লোক তাদের সেবা-শুশ্রূষা করছে।

টারজনের ক্ষতস্থানগুলি খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেল। সাত দিনের দিন তাকে হাজির করা হল রাজা এল্‌কোমোয়েলহাগোর প্রাসাদে।

ফটকের দরজা খুলে গেল। প্রকাণ্ড ঘর। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত, নানা কারুকর্মে ঝলমল।

উঁচু বেদীব উপর আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে আছে রাজা।

বক্ষী-সর্দার তার সম্মুখে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল : হে এল্‌কোমোয়েল্‌হাগো, ভেল্টোপিস্‌মেকাসের রাজা, সর্ব-মানবের শাসনকর্তা, তোমার হুকুম মতই জোয়ান্‌থ্রোহাগোর এই ক্রীতদাসকে এনেছি।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে তার দিকে তাকিয়ে থেকে রাজা বলল, তুমি কোন্‌ শহর থেকে এসেছ ?

জবাব দিল রক্ষী-সর্দার, এ বেচারি কথা বলতে পারে না।

কোন শব্দ করতে পারে ? রাজা শুধাল।

বন্দী হবার পর থেকে কোন শব্দই উচ্চারণ করে নি।

এই সময় ঘরের অন্য দিকের দরজাটা খুলে গেল। রাজকুমারী ঘরে ঢুকলে রাজা বলল, এস জান্‌জারা। দেখ কী বিচিত্র এক দৈত্যকে এখানে আনা হয়েছে।

রাজকুমারী মেঝে পেরিয়ে টারজনেব সামনে এসে দাঁড়াল। টারজন বুঝল, এই মেয়েটির সঙ্গেই একদিন তার বন্ধু কোমোডোফ্লোরেন্সালের বিয়ে হবে। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল, রাজকুমারীর সুন্দর ভুরু দুটি যেন বাঁকা হয়ে উঠল।

রাজকীয় গম্বুজ থেকে টারজনকে সোজা নিয়ে যাওয়া হল শহর থেকে সিকি মাইল দূরে অবস্থিত খনি অঞ্চলে। মাটির নীচে একটা আলোকিত ঘরে ঢুকে তাকে খনির ভারপ্রাপ্ত অফিসারের হাতে তুলে দিয়ে রাজার হুকুম জানিয়ে দেওয়া হল।

টেবিলে রাখা একটা মস্ত বড় খাতা খুলে অফিসার বলল, তোমার নাম ?

বক্ষী-সর্দার বলল, ও তো জাটাকোলোলদের মতই বোবা ; সুতরাং ওর কোন নাম নেই।

অফিসার বলল, ঠিক আছে, ওকে আমরা দৈত্য বলে ডাকব। খাতায় লিখল—জুয়ান্‌থ্রল, মালিক জোয়ান্‌থ্রোহাগো, নিবাস ট্রোহানাডাল্‌মেকাস ; তারপর একজন সৈনিককে ডেকে বলল, ওকে ছত্রিশ তলায় নিয়ে যাও ; সেখানকার সর্দারকে বলে দিও ওকে যেন হাল্কা কাজ দেওয়া হয়, আর ওর যেন কোনরকম ক্ষতি না হয়, কারণ সেটাই রাজার হুকুম —যাও ! না, দাঁড়াও ; এই নাও ওর সংখ্যা ; এটা ওর কাঁধে সেটে দাও।

কালো অক্ষরে সংখ্যার ছাপ মারা একটা গোল কাপড়ের টুকরো নিয়ে সৈনিক সেটাকে পিতলের আংটা দিয়ে টারজনের সবুজ জামার কাঁধের সঙ্গে আটকে দিল।

টারজনকে হাল্কা কাজই দেওয়া হল। সেই সুযোগে অবসর সময়ে সে চারদিকের সব কিছু দেখে বেড়াতে লাগল।

তাকে সব চাইতে বিস্মিত করেছে এই লোকগুলির দেহের আকার। তারা কেউ বামন নয়, যে কোন ইওরোপীয় মানুষের মতই দেখতে।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে একটি তরুণীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। উনুনের আগুনে সে একটুকরো মাংস ঝলসাচ্ছিল। চোখে চোখ পড়তেই সে ইসারায় টারজনকে কাছে ডাকল। কাছে গিয়ে দেখল মেয়েটি খুবই সুন্দরী।

তুমি দৈত্য? মেয়েটি শুধাল।

আমি জুয়ানথ্রল, টারজন জবাব দিল।

ওর কাছে তোমার কথা শুনেছি। আমি তোমার জন্যও খানা পাকাব, অবশ্য অন্য কারও সঙ্গে যদি সে ব্যবস্থা না করে থাক।

কারও সঙ্গে কোন ব্যবস্থাই আমি করি নি; কিন্তু তুমি কে, আর ওটাই বা কে?

মেয়েটি বলল, আমি টালাস্কার, কিন্তু আমি তো ওর শুধু সংখ্যাটাই জানি। তার সংখ্যা আট শ'র তিনগুণ যোগ উনিশ। তোমার সংখ্যা দেখছি আট শ'র তিনগুণ যোগ একুশ। তোমার কি কোন নাম আছে?

সবাই আমাকে জুয়ানথ্রল বলে ডাকে।

পিছন থেকে একটা হাত তার কাঁধ স্পর্শ করল; একটি পুরুষ-কণ্ঠ ডাকল তার নাম ধরেঃ টারজন!

মুখ ফেরাতেই পূর্ব-পরিচয়ের একটা খুশির ঝলকে টারজনের মুখ ঝলমল্ করে উঠল।

কোম—! সহর্ষে সে ডাকতেই যাচ্ছিল, কিন্তু লোকটির তর্জনী ততক্ষণে তার ঠোঁটের উপর উঠে এসেছে। লোকটি বলল, এখানে ও নাম নয়। এখানে আমি আওপোলটো।

কিন্তু তোমার এত বড় শরীর! তুমি তো এখন আমার মতই বড়। বামনরা সব হঠাৎ এত বড় হয়ে উঠল কেমন করে?

কোমোডোফ্লোরেন্সাল হাসল। বলল, মানুষের অহংকারই তাকে বুঝতে দেয় না যে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো দিক থেকেও তো ঘটে থাকতে পারে।

টারজন বলল, কী বলতে চাও তুমি? তাহলে কি আমিই বেঁটে হয়ে গেছি?

কোমোডোফ্লোরেন্সাল মাথা নাড়ল। একটা গোটা জাতির মানুষজন, তাদের জিনিসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, বাড়িঘর সব কিছু হঠাৎ আকারে বড় হয়ে গেছে— এটা ভাবার চাইতে তুমি নিজেই ছোট হয়ে গেছ সেটা ভাবাই সহজতর নয়?

কিন্তু সে তো অসম্ভব! টারজন চীৎকার করে বলল।

যুবরাজ বলল, কয়েক চাঁদ আগে পর্যন্ত আমিও তাই বলতাম। এমন কি যখন গুজব রটে গেল যে ওরা তোমাকে বেঁটে করে দিয়েছে তখনও আমি তা বিশ্বাস করি নি। কিন্তু এখন তো নিজের চোখেই সব দেখতে পাচ্ছি।

কি করে এটা করল? টারজন জানতে চাইল।

কোমোডোফ্লোরেন্সাল বলতে লাগল, ভেল্টোপিস্‌মেকাসে, হয়তো গোটা বামনদের দেশেই, জোয়ানথ্রোহাগো হচ্ছে সবচাইতে পণ্ডিত লোক। তার অনেক অলৌকিক কীর্তির কথা আমরা শুনেছি। সে একজন শ্রেষ্ঠ ওয়ালমাক।

টারজন বলল, বামনদের দেশে এরকম কোন যাদুকরের কথা তো আগে কখনও শুনি নি। টারজনের ধারণা 'ওয়ালমাক' কথাটার অর্থ যাদুকর। অবশ্য অনেকটা তাই বটে। যে বিজ্ঞানী অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারে তাকেই বলা হয় ওয়ালমাক।

আওপোলটো বলতে লাগল, জোয়ানথ্রোহাগোই তোমাকে বন্দী করেছিল। তোমাকে ভেল্টোপিস্‌মেকাসে নিয়ে আসার পরে নিজের যন্ত্রপাতির সাহায্যে সেই তোমাকে বেঁটে বানিয়ে দিয়েছে। ওদের আলোচনা থেকেই আমি এ সব জেনেছি; ওরা বলছে, এ কাজ করতে তার নাকি বেশী সময়ও লাগে নি।

কি ভেবে টারজন বলল, যে কাজ জোয়ানথ্রোহাগো করেছে সেটাকে পাল্টে দেবার ক্ষমতাও নিশ্চয় তার আছে।

সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কোন জীবকে মূল আকারের চাইতে বড় করতে সে পারে না, যদিও অনেক জীবজন্তুকে সেই আজ পর্যন্ত ছোট করেছে।

টারজন সখেদে বলল, তাহলে তো দেশে ফিরে আমার শত্রুদের কাছে আমি খুবই অসহায় হয়ে পড়ব।

যুবরাজ ধীর গলায় বলল, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করোনা বন্ধু।

কেন?

কারণ তোমার নিজের দেশে ফিরে যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। যদি বাবা কখনও ভেল্টোপিস্‌মেকাসের লোকদের যুদ্ধে হারাতে পারে, তবেই আমাদের উদ্ধারের একটা উপায় হতে পারে।

টারজন বলল, তাহলে তুমি কি মনে কর যে বাকি জীবনটা আমাদের এই পাতালের গর্তেই কাটাতে হবে?

দুঃখের হাসি হেসে যুবরাজ বলল, কখনও যদি আমাদের মজুরের কাজ করতে বাইরের জগতে পাঠায়, তাহলে—

দুই কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে টারজন বলল, বুঝেছি। দেখাই যাক।

অনেকগুলো ঘর ও বারান্দা পেরিয়ে টারজন ও কোমোডোফ্লোরেন্সালকে প্রাসাদের একই তলায় একেবারে ভিতরের দিকের একটা ছোট ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে বাইরে থেকে খিল এঁটে দেওয়া হল।

কোমোডোফ্লোরেন্সাল ফিস্ ফিস্ করে বলল, এবার আমরা একা; সব কথা বলা যেতে পারে।

টারজন শুধাল, আমরা কোথায় আছি ?

যুবরাজ বলল, আমরা আছি এল্‌কোমোয়েল-হাগোর গম্বুজের একেবারে সর্বোচ্চ তলায় একটা ভিতরের ঘরে। একেবারে নীচু তলা থেকে ছাদ পর্যন্ত যে খোলা জায়গাটা সোজা উঠে গেছে এ ঘরটা তার ঠিক পাশে বলেই বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কোন মোমবাতির দরকার হচ্ছে না—খোলা জায়গাটা দিয়ে যথেষ্ট হাওয়া আমরা পাচ্ছি। এবার বল, ঘরের মধ্যে এতক্ষণ কি হল।

টারজন বলল, এখনও তো পরীক্ষা করে দেখি নি, বলেই জানালার কাছে গিয়ে শিকগুলো পরীক্ষা করতে কিছুটা চাপ দিতেই বেঁকে গেল। এবার সবলে চাপ দিতেই দুটো শিক সম্পূর্ণ বেঁকে গিয়ে জানালা থেকে খুলে বেরিয়ে এল।

কোমোডোফ্লোরেন্সাল অবাক হয়ে বলল, জোয়ান্‌থ্রোহাগো তোমার আকার ছোট করেছে বটে, কিন্তু তোমার ক্ষমতাকে খাটো করতে পারে নি।

সবগুলো শিক খুলে ফেলে একটা ছোট শিককে

সোজা করে নিয়ে যুবরাজের হাতে দিয়ে বলল, বেশ ভাল অস্ত্র হবে। পালাতে গিয়ে যুদ্ধ করতে হলে কাজে লাগবে। নিজের জন্যও একটা শিক সোজা করে নিল।

তারপর টারজন যুবরাজকে বলল, আজ রাতে, কাল, অথবা পরবর্তী চাঁদে—কে জানে ? সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

টারজন শুধাল, এই তলা থেকে গোলাকার গম্বুজের পথে একেবারে ছাদ পর্যন্ত দূরত্ব কতটা হবে বল তো ?

তা বারো হুয়াল হবে।

মিনুনিদের মাপকাঠি অনুসারে এক হুয়াল মোটা-মুটি তিন ইঞ্চির মত।

টারজন বলল, কি পদ্ধতিতে আমাকে বামন করা হয়েছে সেটা দেখলাম, আরও জানলাম, যে কোন সময় আমার আগেকার শরীর আবার ফিরে পেতে পারি—তিন থেকে উনচল্লিশ চাঁদের মধ্যে যে কোন দিন সেটা ঘটতে পারে।

যতদিন এই ছোট ঘরে আছ ততদিন সেটা না ঘটলেই ভাল।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে এখান থেকে বের হতেই হবে।

যুবরাজ জানালার কাছে গিয়ে গরাদের মোটা শিকগুলো দেখিয়ে বলল, তুমি কি মনে কর যে এগুলো ভাঙতে পারবে ?

সবচাইতে লম্বা শিকটা নিয়ে যতদূর সম্ভব মেপে টারজন বলল, দূরত্বটা বড়ই বেশী।

কিসের ?

ছাদের।

তাতে তোমার কি ? তুমি কি ভাবছ যে গম্বুজের ছাদে উঠে সেখান থেকে পালাবে ?

টারজন দৃঢ়স্বরে বলল, নিশ্চয়—অবশ্য যদি ছাদে উঠতে পারি।

কোমোডোফ্লোরেন্সাল আরও জোরে হেসে উঠল। তুমি কি ভাবছ নীচে নামলেই পালাতে পারবে ? শাস্ত্রীরা নেই? অন্য পাহাবাদার নেই ?

টারজন বলল, তাহলে তো দেখছি সুড়ঙ্গের ভিতর দিক দিয়ে নামাই নিরাপদ।

কোমোডোফ্লোরেন্সাল চেঁচিয়ে বলল, এই সুড়ঙ্গ বেয়ে নামবে ? তুমি কি পাগল! নামতে গেলেই তো একেবারে চারশ' ছ্যাল নীচে পড়ে যাবে।

থাম! টারজন ধমকে উঠল।

কোমোডোফ্লোরেন্সাল অবাক বিস্ময়ে অপেক্ষা করে রইল। আবার কথা বলল টারজন, খনির যে ঘরে টালাস্কাবকে আটকে রেখেছে সেটা খুঁজে বের করতে পারবে ?

কেন ?

তার কাছে যেতে হবে। তাকে কথা দিয়েছি, সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

তা বের করতে পারব।

আর কিছু সময় পরে টারজন বলন, এস। আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

কোন্ পথে পালাবে ?

মাঝখানের সুড়ঙ্গ-পথে। যে ছুঁচলো শিকটা তোমাকে দিয়েছিলাম সেটা সঙ্গে আছে ?

হ্যাঁ।

তাহলে জানালার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এস। মুখের কাছে যে শিকগুলো রেখেছি সেগুলো নিয়ে এস। বেশীর ভাগটা আমিই বইব। চলে এস।

জানালার মুখে চারটে শিক পড়ে ছিল।

প্রত্যেকটার মুখ বড়শির মত বাঁকানো। টারজন তাহলে অন্ধকারে এতক্ষণ এই কাজ করছিল। একটু এগোতেই সে টারজনের গায়ে ধাক্কা খেল।

টারজন বলল, এক মিনিট দাঁড়াও। জানালার গোবরাটে একটা গর্ত করছি। সেটা হয়ে গেলেই যাত্রা শুরু। একটু পরে আবার বলল, এবার শিক-গুলো দাও।

অন্ধকার ঘরে কোমোডোফ্লোরেন্সাল সঙ্গীর নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেল ; শুনতে পেল পাথরের গায়ে লোহার শিক ঘসার ও ঠোকার শব্দ।

কি করছ তুমি ?

থাম! টারজন বলল।

আরও কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাজ করে টারজন মাথা তুলে বলল, আমি আগে নামছি। আমার শিস শুনলেই তুমি আমাকে অনুসরণ করবে।

কোথায়? যুবরাজ প্রশ্ন করল।

সুড়ঙ্গ-পথে সর্বপ্রথম যেখানে পা রাখার জায়গা পাব সেখানে। আশা করছি, আঠারো ফুয়ালের মধ্যেই আর একটা তলা পেয়ে যাব। চারটে শিককে হুকে আটকে উপরের প্রান্তটাকে আটকে দিয়েছি গোবরাটের গর্তের সঙ্গে, আর একেবারে নীচের দিকটা ঝুলিয়ে দিয়েছি আঠারো ফুয়াল নীচে।

টারজন ঈষৎ হেসে জানালা বেয়ে নীচে নেমে গেল; এক হাতে ছুঁচলো শিকের অস্ত্র, অন্য হাত ঝুলছে গোবরাট থেকে।

একটার পর একটা শিক ধরে ঝুলতে ঝুলতে টারজন অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে নামতে লাগল। এক সময় ঠিক নীচু তলার জানালার গোবরাটটা পেয়েও গেল পায়ের নীচে। সেখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বারকয়েক নিঃশ্বাস টেনে খুব নীচু করে একটা শিস দিল। সঙ্গে সঙ্গে লোহার সিঁড়িটা নড়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরে সেও টারজনের পাশে এসে দাঁড়াল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, আরে! আমরা যে অসাধ্য সাধন করেছি! এবার মনে হচ্ছে, আমাদের পলায়নটা একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে।

টারজন বলল, ধীরে, বন্ধু, ধীরে; এখনও অনেক পথ বাকি। টালাস্কারের দেখা এখনও পাই নি। চলে এস।

হাতের শিক বাগিয়ে ধরে তারা পাশের ঘরটাতে ঢুকল। কোমোডোফ্লোরেন্সাল চারদিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের ভাগ্য ভাল বন্ধু যে কোন রক্ষী নেই।

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বিপরীত

দিকের দরজাটা সপাটে খুলে দুটি সৈনিক ঘরে ঢুকল। চারদিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা এখানে কি করছ ক্রীতদাসরা?

শ-শ্-শ্! ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে টারজন বলল, দরজাটা বন্ধ করে দাও। কেউ শুনতে পাবে!

একটি সৈনিক বলল, কি শুনতে পাবে?

একলাফে তাদের পেরিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল টারজন; লোহার শিকটা উদ্যত করে বলল, শুনতে পাবে যে তোমরা আমাদের বন্দী।

সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধু একযোগে আক্রমণ করল দুই সৈনিককে। দুজনের হাতের লোহার শিকের আঘাতে দুই সৈনিকেরই মৃত্যু হল।

টারজন বলল, প্রথম কর্তব্য এই দুই সৈনিকের সঙ্গে পোশাক বিনিময় করা। বলতে বলতেই গায়ের সবুজ জামাটা খুলে ফেলল।

তারপর একটা মৃতদেহকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে টারজন পাশের ঘরে গেল এবং জানালা দিয়ে সেটাকে সুড়ঙ্গপথে নীচে ফেলে দিল। তার নির্দেশ-মত কোমোডোফ্লোরেন্সাল অপর মৃতদেহটি নিয়ে অনু-

রূপভাবে নীচে ফেলে দিল।

টারজন বলল, মৃতদেহ দুটোকে ভাল করে পরীক্ষা না করলে সকলেই মনে করবে পালাবার চেষ্টা করে আমরা দুজনই মারা গেছি। বলতে বলতে যে হুক-করা শিকলের মই বেয়ে তারা নেমেছে তারই দুটো খুলে নিয়ে টারজন সে দুটোকেও মৃতদেহের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মুখে বলল, এর ফলে কথাটা আরও সহজেই সকলের মাথায় আসবে।

নতুন সাজে সেজে দুজন বারান্দায় বেরিয়ে এল। একটার পর একটা তলা পার হয়ে নীচে নামতে লাগল। বারান্দায় বা সিঁড়িতে খুব অল্প লোকই চলাচল করছে। সৈনিকের পোশাক-পরা লোক দুটির দিকে তারা কেউই বিশেষ মনোযোগ দিল না। যে যার কাজে চলে গেল।

নামতে নামতে একটা ফাঁকা জনহীন ঘর পেয়ে সেখানেই তারা রাতটা কাটিয়ে দিল। ঘুম ভেঙে উঠে আবার যখন হাঁটতে শুরু করল তখন সবগুলি বারান্দাতেই লোকের ভিড় বেড়ে গেছে।

একেবারে শেষ তলায় বারান্দায় পৌঁছতেই দেখতে পেল সুড়ঙ্গ-পথের নীচেকার চত্বরে অনেক মানুষের ভিড়। যারা ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তারা ঘাড় উঁচু করে কি যেন দেখার চেষ্টা করছে। সকলেই নানা রকম প্রশ্ন করছে, কিন্তু কেউই কোন জবাব দিচ্ছে না।

একটু একটু করে টারজন আর কোমোডোফ্লোরেন্সাল ও ভিড়ের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। দুই কনুই দিয়ে ভিড় সরিয়ে একটি লোক বেরিয়ে আসতেই সকলে তার কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইল। লোকটি তখন জানাল, পালিয়ে যাবার চেষ্টার ফলে দুটি ক্রীতদাস ওখানে মরে পড়ে আছে। বলল, গম্বুজ-প্রাসাদের একেবারে উপরের তলায় জোয়ানথো-হাগোর ক্রীতদাসদের ঘরে তাদের আটক করে রাখা হয়েছিল। কোন রকম জোড়াতালি দিয়ে একটা মই বানিয়ে সুড়ঙ্গ-পথে নীচে নামতে গিয়ে মইটা ভেঙে নীচে পড়ে গেছে। দুজনের শরীরই এমন ভাবে দুমড়ে ভেঙে গেছে যে তাদের চেনাই শক্ত। এখন লাশ দুটোকে বাইরে নিয়ে বন্য জন্তুদের মুখে ফেলে দিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আর দেরী না করে টারজন ও তার সঙ্গী ভিড়ের সঙ্গে মিশে ফটকের দিকে এগিয়ে গেল।

বাইরের খোলা রোদে দাঁড়িয়ে কোমোডোফ্লোরেন্সাল জানতে চাইল এবার কোন্ দিকে যাওয়া হবে?

টারজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, টালাস্কারের খোঁজে যেতে হবে; তাকে আমি কথা দিয়েছি।

দিনের পর দিন যায়। টারজন বাড়ি ফেরে না। তার ছেলে ক্রমেই শংকিত হয়ে উঠছে। আশপাশের গ্রামে লোক পাঠিয়েছে। কোন খবর নেই।

শেষ পর্যন্ত একটা গুল্‌তি ও কিছু আদিম অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বিশেষ দ্রুতগামী সাহসী ওয়াজিরিকে সঙ্গী করে কোরাক নিজেই বেরিয়ে পড়ল বাবার খোঁজে। অনেক দিন ধরে অনেক পরিশ্রম করে প্রতিটি জঙ্গল ও বনভূমি তারা চষে ফেলল কিন্তু বাবার কোন খোঁজই পেল না।

তিনজন যাত্রী তিনদিন ধরে একটানা পূবের দিকে হাঁটল, চতুর্থ দিনে মোড় নিল দক্ষিণ দিকে। দূর দক্ষিণ দিগন্তে দেখা দিল একটা মস্ত অরণ্য। দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে ট্রোহাস্তাল্‌মেকাস; এখনও দু'দিনের পথ।

দু'দিন পরে তারা ট্রোহানাডালমেকাসের রাজ-প্রাসাদের অদূরে পৌঁছে গেল। দূর থেকেই শান্ত্রীরা তাদের দেখতে পেল; সঙ্গে সঙ্গে একদল সৈন্য ছুটে গেল তাদের খোঁজ-খবর নিতে। যুবরাজ ও টারজনকে দেখেই তারা উল্লাসে ফেটে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিয়ে যাওয়া হল এডেণ্ডোহা-খিসের দরবার-কক্ষে। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাজা আনন্দে কেঁদেই ফেলল। টারজনকেও সে ভোলে নি; যদিও প্রায় তাদের সমান উঁচু এই মানুষটিই যে সেই দৈত্যাকার টারজন একথা বুঝতে সকলেরই বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল।

যাই হোক, রাজা তাকেও সিংহাসনের কাছে ডেকে নিয়ে জারটল বা যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করল, উপযুক্ত যান-বাহন ও অর্থ দিল, বাসস্থানের ব্যবস্থা করল, আর অনুরোধ জানাল, সে যেন তাদের মধ্যেই স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

তখন কোমোডোফ্লোরেন্সাল টালাস্কারকে সিং-হাসনের নীচে নিয়ে বলল, মহান এডেণ্ডোহাখিস, এবার আমার নিজের জন্য একটি বর চাইছি। জার্টোলোস্টো হিসাবে অন্য শহর থেকে লুট করে আনা কোন রাজকন্যাকে বিয়ে করতে আমি প্রথা-বদ্ধ; কিন্তু এই ক্রীতদাসী মেয়েটির মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি আমার প্রেয়সীকে। তাই সিংহাসনের দাবী ছেড়ে দিয়ে তার বিনিময়ে এই মেয়েটিকে গ্রহণ করার অনুমতি আমাকে দেওয়া হোক।

রাজা তখন সিংহাসনের সোপান বেয়ে নীচে নেমে এসে জানজারার হাত ধরে তাকে নিয়ে সিংহা-সনের পাশে বসিয়ে দিল।

বলল, কেবলমাত্র প্রথামতেই তুমি কোন রাজ-কন্যাকে বিয়ে করতে যাবে; কিন্তু প্রথা তো বিধান নয়। ট্রোহানাডালমেকাসের একজন অধিবাসী যাকে ইচ্ছা তাকেই বিয়ে করতে পারে।

টালাস্কার বলল, সে যদি বিধান অনুসারে কোন রাজকন্যাকেই বিয়ে করতে বাধ্য হত তাহলেও সে আমাকে বিয়ে করতে পারত, কারণ আমি মাণ্ডালা-মেকাসের রাজা টালাস্‌থাগোর মেয়ে। ভেল্টো-পিস্‌মেকাসের লোকরা আমার মাকে বন্দিনী করে নিয়ে এসেছিল আমার জন্মের মাত্র কয়েক চাঁদ আগে। মা আমাকে বলে গিয়েছিল, কোন রাজ-

পুত্র ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করার আগে আমি যেন আত্মহত্যা করি, কিন্তু কোমোডোয়োরেন্সাল যদি কোন ক্রীতদাসের পুত্র হত তাহলে মায়ের সে নির্দেশ আমি লঙ্ঘন করতাম। ভেল্টোপিস্‌মেকাস ছেড়ে আসার রাত পর্যন্ত আমি স্বপ্নেও ভাবি নি যে সে রাজপুত্র, কিন্তু তখন তো আমার মন-প্রাণ সবই তাকে সঁপে দিয়েছি, যদিও সে কথা সে মোটেই জানত না।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু টারজনের দেহের কোন পরিবর্তন হল না। মিনুনিদনদের মধ্যে বেশ সুখেই তার দিন কাটছিল; তবু দেশের জন্য তার মন কেঁদে উঠল; সে স্থির করল, এই চেহারা নিয়েই বিঘ্নসংকুল স্বদেশের পথে যাত্রা করবে।

বন্ধুরা তাকে বাধা দিল, কিন্তু টারজন কৃত-সংকল্প। অকারণে আর বিলম্ব না করে সে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যাত্রা করল। একহাজার হরিণ-আরোহী সৈন্যের এক কামাক সেনাদল মহা অরণ্য পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিল।

ছোট ছোট পশু, পাখি ও ডিম খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে গাছের ডালে শুয়ে সে রাত কাটাল। দ্বিতীয় রাতেই একটা বমির ভাব হওয়াতে তার ঘুম ভেঙে গেল। একটা আসন্ন বিপদের আশংকা তাকে পেয়ে বসল। হঠাৎ তার মনে হল, হয়তো স্বাভাবিক দেহ ফিরে পাবার এটা পূর্বলক্ষণ। অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে যে রকম হয়ে থাকে সেই রকম তারও মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করতে লাগল। গাছের উপর থেকে নীচে নামবার মত জোরও যেন পাচ্ছে না। হাঁটু কাঁপছে। কোন রকমে নীচে নেমে একটা চড়াই বেয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ একটা তাজা বাতাসের ঝাপ্‌টা এসে নাকে লাগল। সে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। সে বন পার হয়েছে। এবার সে মুক্ত!

পিছন থেকে একটা গর্জন কানে এল। তলোয়ার হাতে নিয়ে সে কাটা-বনের মধ্যে ঢুকে গেল। কত দূর গেল বা কোন্ দিকে গেল কিছুই বুঝতে পারল না। তখনও ঘন অন্ধকারে চারদিক ঢাকা। হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়েই সে জ্ঞান হারাল।

নর-খাদক ওবেবের গ্রাম থেকে ফিরবার পথে জনৈক ওয়াজিরি পথের পাশে একটা কংকাল দেখতে পেল। সেটা কোন বিশেষ ঘটনা নয়। আফ্রিকার বনপথে এ রকম অনেক কংকাল পড়ে থাকে। কিন্তু এ কংকালটা দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু ওবেবের গ্রামের অনেক অদ্ভুত কাহিনী শুনেই উস্থুলা তার প্রিয় মনিবের খোঁজে এ দেশে এসেছিল। ওবেবে কখনও টারজনকে দেখে নি, বা তার কথাও শোনে নি। এ কথা সে বার বার উস্থুলাকে বলেছে; কিন্তু ওখানকার অন্য অনেকের মুখ থেকে সে শুনেছে যে এক বছর বা তারও বেশী সময় ওবেবে একটি সাদা মানুষকে বন্দী করে রেখে-ছিল, আর কিছুদিন আগে সে পালিয়ে গেছে।

প্রথমে উম্বুলা সেই সাদা লোকটিকেই টারজন বলে ধরে নিয়েছিল, কিন্তু সে লোকটির বন্দী হওয়ার সময়-কালটা বিবেচনা করে সে বুঝতে পেরেছে যে সে লোক টারজন হতে পাবে না ; তাই সে দেশে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু পথের পাশে একটি শিশুর কংকাল দেখেই তার মনে পড়ে গেল উহ্‌হার নিরুদ্দেশ হবার কথা। সে থমকে দাঁড়াল। ভাল করে লক্ষ্য করতে আরও একটা জেনিস সে দেখতে পেল—পথ থেকে কয়েক ফুট দূরে আবও কয়েকটা কংকালের মধ্যে পড়ে আছে একটা ছোট চামড়ার থলে। উম্বুলা নীচু হয়ে সেটা তুলে নিয়ে ভিতরকার জিনিসগুলো হাতের উপরেই ঢেলে ফেলল। দেখেই বুঝতে পারল জিনিসগুলি তার মনিবের। অনেক চাঁদ আগে সাদা মানুষরা বড় বাওয়ানার এই সব হিরে চুরি করেছিল। এগুলি সে তার মনিব-পত্নীকে ফিরিয়ে দেবে।

এগিয়ে গেল। কি বীভৎস দৃশ্য! একটি মোষের পচা-গলা মৃতদেহের পাশে শুয়ে সাদা মানুষটি সাগ্রহে মোষেব হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

লোকটি মাথাটা একটু তুলতেই তার মুখটা ভাল করে দেখতে পেয়ে উম্বুলা আতংকে চীৎকার করে উঠল। এ যে বড় বাওয়ানা!

ছুটে গিয়ে উম্বুলা তাকে হাঁটুর উপর তুলে নিল। কিন্তু লোকটি সমানে হাসতে লাগল, আর শিশুর মত বক্ বক্ করে চলল। পাশেই মোষটার শিং-এর সঙ্গে ঝুলছে বড বাওয়ানার হীরে বসানো সোনার লকেটটা। উম্বুলা আবার সেটাকে বড় বাওয়ানার গলায় পরিয়ে দিল। কাছাকাছি তার জন্য একটা ভাল কুটির বানিয়ে দিল ; শিকার করে তার খাবার এনে দিল ; গায়ের জোর ফিরে না আসা পর্যন্ত তার কাছেই রয়ে গেল। গায়ের জোর ফিরে এলেও তার

মনের জোর কিন্তু ফিরল না।

উম্বুলা মনিবকে বাড়ি নিয়ে গেল।

তার সারা দেহে ও মাথায় অনেক আঘাত ও ক্ষত। যে মানুষটি একদিন ছিল অরণ্যরাজ টারজন আজ সেই ছোট্ট মানুষটিকে সারিয়ে তুলবার জন্য ইংলণ্ড থেকে একজন বড় সার্জনকে আফ্রিকায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হল।

তিনদিন পরে বৃহৎ কন্টক বনের কাছাকাছি পথ ধরে নিঃশব্দে চলতে চলতে হঠাৎ সে থেমে গেল ; দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরল হাতের বর্শাটা। একটি ছোট খোলা জায়গায় প্রায় উলঙ্গ একটি লোক মাটিতে পড়ে আছে। লোকটি জীবিত—নড়াচড়া করছে—কিন্তু সে কি করছে। উম্বুলা নিঃশব্দে আরও কাছে

যে কুকুরের দল একদিন লর্ড গ্রেস্টোককে ভালবাসত আজ তারা এই জড়বুদ্ধি লোকটিকে দেখে দূরে সরে যায়। তাকে যখন হুইল চেয়ারে বসিয়ে সোনালী সিংহ জাদ্‌ বাল্‌ জার খাঁচার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেটাও তাকে দেখে গর্জন করতে থাকে।

ছেলে কোরাক অসহায়ভাবে মেঝেতে পায়চারি করে। মা ইংলণ্ড থেকে রওনা হয়েছে। এখানে পৌঁছে বাবার এই অবস্থা দেখে তার যে কি প্রতি-ক্রিয়া হবে সে কথা ভাবতেও সে ভয়ে শিউরে ওঠে।

রের গ্রাম থেকে তার মেয়ে উহ্‌হাকে চুরি করে পালিয়েছে সেই দিন থেকেই ওঝা খামিস তাকে নিরন্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে। অনেক দূর দূর গ্রামেও গেছে; কিন্তু মেয়েকে বা তার অপহরণকারীকে খুঁজে পায় নি।

তেমনি একটা ব্যর্থ অনুসন্ধানের পরে খামিস দেশে ফিরে চলেছে। সবে সকাল হয়েছে। শিবির তুলে নতুন করে যাত্রা শুরু করতেই ডান দিকে শ'খানেক গজ দূরে একটা খোলা জায়গায় কিছু একটাকে পড়ে থাকতে দেখল। নীচু ঘাসের উপরে বেরিয়ে আছে মানুষের একটা হাঁটু। আরও কাছে এগিয়ে যেতেই বিস্ময়ের একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল তার ঠোঁট থেকে—জল-পিশাচের দেহটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে; একটা হাঁটু ভেঙে রয়েছে—সেটাই সে দেখতে পেয়েছে ঘাসের উপরে।

জল পিশাচ কি মৃত, না ঘুমিয়ে আছে? হাতের বর্শাটাকে খামিস তার বুকে ছোঁয়াল। জল-পিশাচ জাগল না। ও তাহলে ঘুমিয়ে নেই! আবার মৃত বলেও মনে হচ্ছে না। খামিস হাঁটু ভেঙে বসে তার বুকে কান রাখল। সে মরে নি!

এই পিশাচ তার মেয়েকে চুরি করেছে। খামিস ক্রোধে জ্বলে উঠল।

কোমরে জড়ানো শক্ত দড়িটা খুলে নিয়ে পিশাচের হাত দুটোকে পিঠ-মোড়া করে বেঁধে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘণ্টাখানেক পরে জ্ঞান ফিরে এলে জল-পিশাচ চোখ মেলে তাকাল।

ওঝা বলল, আমার মেয়ে উহ্‌হা কোথায়?

জল-পিশাচ হাতের বাঁধন খুলতে চেষ্টা করল, পারল না। খামিসের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। চুপচাপ শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে আবার চোখ মেলল।

হাতের বর্শা দিয়ে খোঁচা মেরে ওঝা হুকুম করল, উঠে দাঁড়াও!

জল-পিশাচ পাশ ফিরে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। খামিস বর্শা উঁচিয়ে পথ দেখিয়ে দিল। সন্ধ্যা নাগাদ তারা পৌঁছে গেল ওবেবের গ্রামে।

যে কুঁড়েঘর থেকে জল-পিশাচ একদিন পালিয়েছিল খামিস তাকে সেই ঘরেই ঠেলে দিল। অনেক বর্শা ও প্রশ্নের খোঁচা খেয়েও জল-পিশাচ একটা কথাও বলল না। তাকে দেখতে এসে ওবেবেও অনেক প্রশ্ন করল . কিন্তু জল-পিশাচ শুধু হা করে তাকিয়ে রইল, কোন কথাই বলল না।

ওঝা উঠে এসে আবার প্রশ্ন করল। জবাব পেল না। প্রচণ্ড রাগে সে জল-পিশাচের মুখে একটা ঘুষি মারল। নীচু হয়ে একটা গরম শিক তুলে নিয়ে বলল. এবার আমার প্রশ্নের জবাব ঠিকই দেবে!

ওবেবে কর্কশ গলায় বলল, আগে ডান চোখটা!

ডাক্তার এল টারজনের বাংলোতে—লেডি গ্রেস্টোককই সঙ্গে করে নিয়ে এল। লণ্ডনের খ্যাতনামা সার্জন। সার্জন ও লেডি গ্রেস্টোক সঙ্গে সঙ্গে টারজনের ঘরে গেল। জোড়াতালি দিয়ে তৈরী একটা হুইল-চেয়ারে টারজন বসেছিল। অর্থহীন দৃষ্টিতে সে তাদের দিকে তাকাল।

তুমি আমাকে চিনতে পারছ না জন? লেডি বলল।

ছেলে এসে তাকে বাইরে নিয়ে গেল। মা তখন কাঁদছে।

ছেলে বলল, বাবা আমাদের কাউকেই চিনতে পারছে না মা। অস্ত্রোপচারের আগে তুমি আর বাবার সঙ্গে দেখা করো না। এ অবস্থায় ওকে দেখলে তোমার কেবল কষ্টই বাড়বে।

সার্জন তাকে পরীক্ষা করল। মাথার খুলিতে আঘাত লাগায় মস্তিষ্কের উপর একটা চাপ পড়েছে। অস্ত্রোপচারের ফলে সেই চাপটা চলে গেলে রোগীর মানসিক ভারসাম্য ও স্মৃতিশক্তি ফিরে আসতে পারে। কাজেই অস্ত্রোপচার করাই সঙ্গত।

পরের দিনই কয়েকজন নার্স ও দুজন ডাক্তার এল নাইরোবি থেকে। সকালেই অস্ত্রোপচার করা হল।

ঘণ্টাখানেক পরেই দরজা খুলে সার্জন তাদের ঘরে ঢুকল।

সার্জন বলল, এখনই আপনাদের কিছু বলতে পারছি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। আমি নির্দেশ দিয়েছি, দশদিন পর্যন্ত নার্স ছাড়া আর কেউ লর্ডের ঘরে ঢুকতে পারবে না। ওষুধ খাইয়ে তাকে আমি দশ দিনের জন্য আধা-অজ্ঞান অবস্থায় রেখে গেলাম। লেডি গ্রেস্টোক, ততদিন আমরা শুধু আশাই করতে পারি।

ওঝার বাঁ হাত জল-পিশাচের কাঁধে; তার ডান হাতে দগ্‌দগে লাল লোহার শিক।

ওবেবে আবার বলল, ডান চোখটা আগে।

সহসা বন্দীর পিঠ ও কাঁধের মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। মুহূর্তের জন্য এত প্রচণ্ড শক্তিতে সে শরীরটা ঝাঁকি দিল যে তার হাতের বাঁধন পট্ পট্ করে ছিঁড়ে গেল; মুহূর্ত পরেই তার ইস্পাত-কঠিন আঙুলগুলি ওঝার ডান কব্জির উপর চেপে বসল। জ্বলন্ত দৃষ্টি পড়ল তার চোখের উপর। ওঝার আঙুলগুলি অসাড় হয়ে এল; জ্বলন্ত শিকটা হাত থেকে পড়ে গেল।

ওবেবে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেই যার যার বাড়ির দিকে ছুট দিল। তা দেখে ওবেবেও পালিয়ে গেল।

তখন জল-পিশাচ দুই হাতে খামিসকে ধরে মাথার উপর তুলে সর্দার ওবেবের পিছনে ধাওয়া করল। ওবেবে তার আগেই নিজের ঘরে ঢুকে গেল। আর তাকে শেষ করে দিতে জল-পিশাচও এক লাফে ঘরের চালে উঠে চাল ভেঙে নীচে নেমে গেল।

একটা দেহ তার উপর নেমে আসায় সর্দার ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে আতংকের চাইতেও আত্মরক্ষার তাগিদটাই ওবেবের কাছে বড় হয়ে উঠল। কোমর থেকে ছুরিটা টেনে নিয়ে বার বার বসিয়ে দিল জল-পিশাচের দেহে। যখন বুঝতে পারল যে তার ইহলীলা সাঙ্গ হয়েছে তখন তাকে টানতে টানতে বাইরের চাঁদ ও আগুনের আলোয় নিয়ে এসে ওবেবে চীৎকার করে বলতে লাগল, ফিরে এস ভাই সব, ফিরে এস; ভয়ের কিছু নেই, কারণ আমি তোমাদের সর্দার ওবেবে নিজের হাতে জল-পিশাচটাকে হত্যা করেছি।

বলতে বলতে পিছনের মৃতদেহটাকে ভাল করে দেখেই ওবেবে আঁতকে উঠে পথের ধুলোর উপরেই বসে পড়ল। যাকে সে টেনে এনেছে সেটা ওঝা খামিসের দেহ।

লোকজনরা এগিয়ে এসে সবই দেখল; কোন কথা বলল না; সকলেই ভয় পেয়েছে। কয়েকটি সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে ওবেবে ঘরের ভিতরে ও বাইরে অনেক খুঁজল। লোকটি চলে গেছে। ফটক পর্যন্ত গেল। ফটক বন্ধ। কিন্তু ফটকের সামনের ধুলোয় খালি পায়ের ছাপ রয়েছে—একটি সাদা মানুষের খালি পায়ের ছাপ।

ওবেবে ঘরে ফিরে এল। ভয়ার্ত লোকগুলি তার জন্যই অপেক্ষা করে আছে।

সে বলল, ওবেবের কথাই ঠিক। লোকটা জল-পিশাচ নয়—অরণ্যরাজ টারজন, কারণ একমাত্র সেই পারে খামিসকে অতটা উঁচুতে তুলে ধরে ঘরের চালের উপর ছুঁড়ে দিতে, আর একমাত্র সেই পারে কোনরকম সাহায্য ছাড়া আমাদের ফটক ডিঙিয়ে যেতে।

এল সেই দশম দিনটি। অস্ত্রোপচারের ফলাফল

জানতে বড় সার্জনটি এখনও গ্রেস্টোকের বাংলোতেই অপেক্ষা করছে।

সার্জন বলল, লর্ড গ্রেস্টোক এবার তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠবেন। অনেক কথাই তাকে বলে দিতে হবে। জ্ঞান হবার পরেও তিনি নিজেকেই চিনতে পারেন নি; কিন্তু এ রকম পরিস্থিতিতে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

আশ্চর্য চোখে চারদিকে তাকিয়ে রোগী ঘরের মধ্যে কয়েক পা হাঁটল।

সার্জন বলল, ইনি আপনার স্ত্রী গ্রেস্টোক।

লেডি গ্রেস্টোক দুই হাত বাড়িয়ে স্বামীর দিকে এগিয়ে গেল। অশক্ত রোগীর মুখে ঈষৎ হাসি খেলে গেল; সেও দুই পা বাড়িয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল। সহসা কে যেন তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। ফ্লোরা হকেস।

সে বলে উঠল, হা ঈশ্বর, লেডি গ্রেস্টোক! এ আপনার স্বামী নয়। এতো মিরাণ্ডা, এস্টেবান মিরাণ্ডা! আপনি কি মনে করেন, লক্ষ লোকের মধ্যেও আমি ওকে চিনতে পারব না? এখানে আসার পর থেকে আমি তাকে একবারও দেখি নি, রোগীর ঘরেই তো যাই নি, কিন্তু সে এ ঘরে ঢোকামাত্রই আমার মনে সন্দেহ জেগেছে। মুখের হাসি দেখেই আমি তাকে চিনতে পেরেছি।

বিহ্বল স্ত্রী চীৎকার করে বলল, ফ্লোরা! তুমি ঠিক চিনেছ? না! না! নিশ্চয় তোমার ভুল হয়েছে! স্বামীকে ফিরিয়ে দিয়ে আবার নিয়ে যাবার জন্য ঈশ্বর নিশ্চয় তাকে আমার কাছে এনে দেয় নি। জন! বল, সত্যি কে তুমি? তুমি নিশ্চয় আমাকে মিথ্যা বলবে না।

মুহূর্তের জন্য লোকটি চুপ করে রইল। যেন দুর্বলতাবশতই এদিক-ওদিক দুলতে লাগল। সার্জন এগিয়ে এসে তাকে ধরে ফেলল।

লোকটি বলল, আমি খুবই অসুস্থ। হয় তো আমি বদলে গেছি, কিন্তু আমিই লর্ড গ্রেস্টোক। কিন্তু এই নারীকে তো আমি স্মরণ করতে পারছি না। সে ফ্লোরা হকেসকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

মিথ্যা কথা! মেয়েটি কেঁদে ফেলল।

হ্যাঁ, কথাটা মিথ্যা. একটি শান্ত কণ্ঠস্বর পিছন থেকে বলে উঠল। সকলে ঘুরে দাঁড়াল। বারান্দায় যাবার ফরাসী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একটি দৈত্যাকার শ্বেতকায় মূর্তি।

তার দিকে ছুটতে ছুটতে লেডি গ্রেস্টোক চীৎকার করে বলে উঠল, জন! কী করে এত বড় ভুল আমি করলাম? আমি—

বাকি কথা আর বলা হল না, অরণ্যরাজ টারজন এক লাফে ঘরের ভিতরে ঢুকে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল।

জীবন যদি হয় বুটিদার বস্ত্র তাহলে সময় তার টানা। সময় চিরন্তন, স্থির, অপরিবর্তনীয়। সুদক্ষ শিল্পী ভাগ্যদেবী তার পোড়েন সংগ্রহ করে পৃথিবীর চার কোণ ও অষ্টবিংশতি সমুদ্র থেকে, আকাশ থেকে, আর মানুষের মন থেকে। তারপর যে নক্সা সে ফুটিয়ে তুলতে থাকে তা কোন দিন শেষ হয় না।

একটা সুতো এখান থেকে, একটা ওখান থেকে, আর একটা সুতো আসে সুদূর অতীত থেকে—যে অতীত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে আছে সঙ্গী সুতোটির জন্য যাকে না পেলে ছবিটি সম্পূর্ণ হবে না।

কিন্তু ভাগ্যদেবী বড়ই ধৈর্যশীলা। যে বুটিদার বস্ত্রটি সে তৈরী করতে চায়, যে অনাদি ও অনন্ত নক্সাটি সে ফুটিয়ে তুলতে চায়, তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দুটি সুতোর মিলন ঘটানোর জন্য সে একশ' বছর, হাজার বছর অপেক্ষা করে থাকে।

এক হাজার আটশ' পঁয়ষট্টি বছর আগেকার কথা (সঠিক তারিখ সম্পর্কে পণ্ডিতরা একমত নয়)। টারসাসের পল রোমে শহিদ হয়েছিল।

দূর অতীতের সেই শোকাবহ ঘটনাটি যে একজন ইংরেজ বিমান-চালিকা ও আমেরিকার একজন ভূতত্ত্ববিজ্ঞানের অধ্যাপকের জীবন ও ভাগ্যের উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করবে সেটা আমাদের কাছে আশ্চর্য মনে হলেও ভাগ্যদেবীর কাছে তা নয়। যে ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে আমি বসেছি, প্রায় দু'হাজার বছর ধরে সে তো ধৈর্য সহকারে তারই অপেক্ষা করে ছিল।

কিন্তু পল এবং এই দুটি যুবক-যুবতীর মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। সে ইফেসাসের অ্যাঙ্গাস্টাস। অ্যাঙ্গাস্টাস ছিল ওনেসিফোরাস পরিবারের ছেলে। খেয়ালী ও অপস্মার রোগগ্রস্ত যুবক। টারসাসের পল যখন প্রাচীন আইওনিয়ার ইফেসাস শহরে প্রথম এসেছিল তখন যে সমস্ত লোক নবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল তাদের অন্যতম ছিল অ্যাঙ্গাস্টাস।

ছেলেবেলা থেকেই সে অপস্মার রোগগ্রস্ত। ধর্মের ব্যাপারেও অত্যধিক উন্মাদনাপ্রিয়। যীশুর অন্যতম প্রধান শিষ্যটিকে মর্ত্যে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপেই পূজা করে। তাই পলের শহিদ হবার সংবাদ

তাকে এতই অভিভূত করে যে সে মানসিক ভারসাম্যই হারিয়ে ফেলে।

পাছে তার উপরেও অত্যাচার হয় এই ভয়ে সে আলেক্সান্দ্রিয়ার জাহাজ ধরে ইফেসাস থেকে পালিয়ে যায়। ছোট জাহাজটার ডেকের উপর ভয়ার্ত রুগ্ন অবস্থায় কোন রকমে ঢাকাঢুকি দিয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় রেখেই তার কথা আমরা শেষ করতে পারতাম। কিন্তু আরও একটা ঘটনা ঘটল। জাহাজটা রোডাস দ্বীপে থামলে অ্যাঙ্গাস্টাস সেখানে নেমে পড়ে এবং (ধর্মান্তরের পথেই হোক আর অর্থের বিনিময়েই হোক) সুদূর উত্তর থেকে আগত বর্বর জাতির একটি সুকেশী ক্রীতদাসীকে সংগ্রহ করে।

এখানেই আমরা অ্যাঙ্গাস্টাস ও সিজারের কালকে বিদায় জানাই, আর কল্পনা করি, অ্যাঙ্গাস্টাস ও সুকেশী ক্রীতদাসী মেয়েটি আলেক্সান্দ্রিয়া বন্দর থেকে মেম্ফিস ও থিবির ভিতর দিয়ে আফ্রিকায় পালিয়ে গেল।

আফ্রিকার সূর্য অস্ত যেতে এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। নিষিদ্ধ ঘেঞ্জি পর্বতমালার রহস্যময় দুরারোহ সুউচ্চ শিখরশ্রেণী ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন। পড়ন্ত সূর্যও ঢাকা পড়েছে সে মেঘের আড়ালে।

সেই ঘন মেঘের ভিতর থেকে ভেসে আসছে ভয়াল বিচিত্র ভ্রমরের গুঞ্জন। ঘেঞ্জি বন্ধুর শিখরগুলিকে ঘিরে ভ্রমরটা পাক খাচ্ছে। শব্দটা কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে।

লেডি বারবারা কলিস চিন্তিত হয়ে পড়েছে। পেট্রল ফুরিয়ে আসছে। এই সংকটকালে কম্পাসটাও অকেজো হয়ে পড়েছে। মেঘের ভিতর দিয়ে সে অন্ধের মত উড়ে চলেছে।

জ্বালানি নিঃশেষ হবার মুখে। মেঘের নীচে পাহাড়ের উপর নামবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তাই শেষ পথটিই সে বেছে নিল। ক্ষণিক প্রার্থনা সেরে দশ গুণতে গুণতেই প্যারাসুটের দড়িতে টান দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘেঞ্জি পর্বতমালার বহুদূর দক্ষিণে বুঙ্গালো উপজাতির সর্দার কাবারিগা অরণ্যরাজ টারজনের সামনে নতজানু হয়ে বসেছে।

আর মস্কোতে লাল রাশিয়ার ডিক্টেটর স্তালিনের কার্যালয়ে ঢুকল পিওতর্ স্তাবুচ।

নিগ্রো সর্দার কাবারিগা, অথবা পিওতর্ স্তাবুচ বা লেডি বারবারা কলিসের কথা কিছুমাত্র না জেনেই ফিস শেরিডন মিলিটারি একাডেমির ভূতত্ত্ববিজ্ঞানের অধ্যাপক লাফায়েৎ স্মিথ, এ. এম., পি-এইচ., ডি, এস-সি ডি. নিউ ইয়র্কের বন্দর থেকে একটা স্টিমারে চেপে বসল। মিঃ স্মিথ একজন শান্ত, বিনয়ী, পণ্ডিতদর্শন যুবক। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। তার চোখের কোন দোষ নেই, তবু সে চশমা পরে কারণ তার বিশ্বাস চশমা পড়লে তাকে মর্যাদাসম্পন্ন ও বয়স্ক দেখায়। এক বছর হল পশ্চিমের একটা অখ্যাত মিলিটারি একাডেমিতে সে পড়াচ্ছে। সেই সুযোগে জীবনের আর একটি ইচ্ছাকে পূরণ করতে সে আফ্রিকাতে যাচ্ছে সেই অন্ধকার মহাদেশের পাহাড়ের বড় বড় ফাটলের গঠন-রীতি নিয়ে গবেষণা করতে।

নিউ ইয়র্কে সময় যখন মধ্যাহ্নের ঢং ঘণ্টা বাজে, মস্কোতে তখন সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা বাকি। কাজেই লাফায়েৎ স্মিথ যখন সকালবেলা জাহাজে চাপল, ঠিক সেই সময় পড়ন্ত অপরাহ্নে পিওতর্ স্তাবুচ রুদ্ধদ্বার কক্ষে স্তালিনের সঙ্গে আলোচনায় রত।

স্তালিন বলল, এই কথা রইল। সব বুঝেছ তো?

স্তাবুচ বলল, সব বুঝেছি। পিটার জাভেরির হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে, আর যে কারণে আফ্রিকায় আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে তা দূর করতে হবে।

স্তালিন বলল, শেষেরটাই বেশী দরকারি। একটা গোরিলা-মানব হলেও একটি সুসংগঠিত লাল অভিযানকে সে সম্পূর্ণ পরাভূত করেছে। সে না এসে পড়লে আবিসিনিয়া ও মিশরে অনেক কিছুই ঘটতে পারত। তোমাকে আরও জানিয়ে রাখছি কমরেড, আরও একটা অভিযান আমরা চালাব। তবে তোমার রিপোর্ট হাতে আসার এবং সেই বাধা দূর হবার আগে নয়।

স্তাবুচ বুক ফুলিয়ে বলল, আমি কি কখনও ব্যর্থ হয়েছি?

স্তালিন উঠে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, লাল রাশিয়া OGPU-র কাছে পরাজয় আশা করে না। কথা বলার সময় শুধু তার ঠোঁট দুটি হাসল।

সেই রাতেই লিওন স্তাবুচ মস্কো ত্যাগ করল। ভেবেছিল, সে যাচ্ছে একা গোপনে, কিন্তু রেলের কামরায় তার পাশেই বসেছিল ভাগ্যদেবী।

পায়ের কাছে নতজানু নিগ্রো সর্দারের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে টারজন বলল, উঠে দাঁড়াও। তুমি কে? কেনই বা টারজনের কাছে এসেছ?

মহান বাওয়ানা! আমি কাবারিগা—বুঙ্গালো উপজাতির সর্দার। মহান বাওয়ানার কাছে আমি এসেছি আমার লোকজনদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের আশায়।

তোমার লোকজনদের কিসের দুঃখ? কার জন্য দুঃখ? টারজন জানতে চাইল।

কাবারিগা বলল, দীর্ঘকাল ধরে আমরা সকলের সঙ্গে শান্তিতে বাস করছি। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোনরকম যুদ্ধ-বিগ্রহ করি না। কিন্তু একদা আবিসিনিয়া থেকে একদল লোক আমাদের দেশে এসে বাসা বেঁধেছে। তারা আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে, আমাদের ফসল, ছাগল ও লোকজনদের চুরি করে নিয়ে যায়, তারপর দূর দেশে সে সব বিক্রি করে দেয়।

কিন্তু তুমি আমার কাছে এসেছ কেন? আমার দেশের সীমানার বাইরে কোন জাতির ব্যাপারে আমি তো হস্তক্ষেপ করি না।

নিগ্রো-সর্দার বলল, মহান বাওয়ানা, আমি তোমার কাছে এসেছি কারণ তুমি একজন সাদা মানুষ, আর যারা আমাদের উপর উৎপীড়ন করছে তাদের সর্দারও একজন সাদা মানুষ। সকলেই জানে, তুমি খারাপ সাদা মানুষদের যম।

টারজন বলল, সে কথা আলাদা। আমি তোমার সঙ্গে তোমাদের দেশে যাব।

এইভাবে নিগ্রো-সর্দার কাবারিগার কাজের ভার চাপিয়ে দিয়ে ভাগ্যদেবী টারজনকে নিয়ে গেল উত্তরের দিকে। তার নিজের লোকরা জানলও না সে কোথায় গেল, কেন গেল—এমন কি তার একান্ত

বন্ধু ছোট্ট নকিমাও জানল না।

অনেক উঁচু একটা পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছে আব্রাহামের ছেলে আব্রাহাম। সকলেই দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে মুখ করে। সকলের মুখেই ফুটে উঠেছে বিস্ময়, জিজ্ঞাসা, ভয়। সকলেই কান পেতে শুনছে, ঘন কাল মেঘের আড়াল থেকে ভেসে আসছে এমন একটা বিচিত্র বিপজ্জনক গুঞ্জন-ধ্বনি যা তারা আগে কখনও শোনে নি।

সমবেত নর-নারীর একেবারে পিছনে দাঁড়িয়েছিল একটি কিশোর। হঠাৎ সে মাটিতে পড়ে গোঙাতে লাগল; তার মুখ দিয়ে ফেনা গড়াতে লাগল। একটি নারীও আর্তনাদ করে মূর্ছা গেল।

আব্রাহাম প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলে উঠল, হে প্রভু, সত্যি যদি তুমি এসে থাক তাহলে তোমার অনুগত জনরা তোমার আশীর্বাদ ও নির্দেশ শুনবার জন্য অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু তুমি যদি আমাদের প্রভু না হও, তাহলেও তোমার কাছে আমাদের প্রার্থনা—তুমি আমাদের সকলকে বিপদ থেকে রক্ষা কর।

এবার চারদিকে অনেকেই পড়ে যেতে লাগল। কারও শরীর কাঁপছে। কেউ মূর্ছা যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে কারও নজর নেই।

আবার সেই ভয়ংকর শব্দ তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। শব্দটা ক্রমেই বাড়ছে। একেবারে মাথার উপর এসে গেছে। এমন সময়—

মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি ভৌতিক মূর্তি—একটা প্রকাণ্ড সাদা বস্তু আর তার নীচে এদিক-ওদিক দুলছে একটা ছোট্ট পুতুল। সেটা ধীরে ধীরে নেমে আসছে। তা দেখে আরও ডজনখানেক মানুষ মাটিতে পড়ে গোঙাতে লাগল, তাদের মুখ থেকেও ফেনা গড়াতে লাগল।

প্রায় পাঁচশ' নর-নারী ও শিশুর চোখের সামনে লেডি বারবারা কলিন্স ভাসতে ভাসতে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে সকলে নতজানু হয়ে বসে পড়ল।

এ হয়তো গেব্রিয়েল, লম্বা দাঁড়িওয়ালা একজন বলল।

একটি নারী কেঁদে বলল, ওই শোন তার শিঙার আওয়াজ—শেষের দিনের শিঙাধ্বনি।

চুপ কর! আব্রাহাম কর্কশ গলায় বলল।

কিশোরটি তখনও মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আরও একজন পড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে লাগল। তারও মুখ দিয়ে ফেনা গড়াতে লাগল।

কী আশ্চর্য, তারা সকলেই সাদা মানুষ! আফ্রিকার বুকের মধ্যে সে নেমেছে একটি সাদা মানুষদের উপনিবেশে। লেডি বারবারা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। মানুষগুলির দুটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে তার চোখে পড়ল—সকলেরই বড় বড় নাক আর ছোট থুত্‌নি। নাকটা এত বড় যে মুখটাই কদাকার দেখায়, আর অনেকেরই থুত্‌নি বলে কিছু নেই বললেই চলে।

আরও দুটি পরস্পরবিরোধী জিনিস তার চোখে পড়ল——প্রায় এককুড়ি অপস্মারগ্রস্ত মানুষ মাটিতে পড়ে কাৎরাচ্ছে, আর একটি স্বর্ণকেশী সুন্দরী উঠে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ মেলে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

লেডি বারবারা করুণ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসল। মেয়েটিও হাসল, কিন্তু পরক্ষণেই সভয়ে চারদিকে তাকাল।

লেডি বারবারা শুধাল, আমি কোথায় এসেছি? এটা কোন্ দেশ? এরা সব কারা?

মাথা নেড়ে মেয়েটি শুধাল, তুমি কে? তুমি কি প্রভুর দেবদূত?

এবার বারবারার মাথা নাড়ার পালা। মেয়েটির ভাষা সে কিছুই বুঝতে পারে নি।

সাদা লম্বা দাড়িওয়ালা লোকটি এবার সাহস করে এগিয়ে এসে মেয়েটিকে বলল, চলে যাও জেজেবেল! এই স্বর্গীয় অতিথির সঙ্গে কথা বলার দুঃসাহস তোমার হলো কেমন করে?

মেয়েটি ভয়ে পিছিয়ে গেল। হঠাৎ কি মনে করে সে ফিরে গিয়ে লেডি বারবারার দিকে তাকাল। বারবারার ঠোঁটে সেই মিষ্টি হাসি। তা দেখে মেয়েটির সাহস বেড়ে গেল। দুষ্টুমি করে বলল, জান জারোব, ও বলল যে স্বর্গ থেকে তোমাদের জন্য বার্তা নিয়ে এসেছে, আর সে বার্তা জানাবে শুধু আমার মুখ দিয়ে, আর কাউকে নয়।

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। সরল মনে সকলেই কথাটা বিশ্বাস করল। ফলে লেডি বারবারার সঙ্গে জেজেবেলের প্রতিও সকলের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তাদের দুজনের একত্রে থাকার সব রকম ব্যবস্থা করে দেওয়া হল।

রাতে শুয়ে লেডি বারবারা এখানকার লোকদের লম্বা নাক, ছোট থুত্‌নি ও অপস্মার রোগের কথাই ভাবতে লাগল। কিন্তু কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যাই খুঁজে পেল না। পাবেই বা কেমন করে? কেউ তো তাকে বলে নি অ্যাঙ্গাস্টাস ও সুকেশী ক্রীতদাস মেয়েটির প্রাচীন কাহিনী। আসলে এখানকার কেউ জানেই না যে অ্যাঙ্গাস্টাসের ছিল বড় নাক, ছোট থুত্‌নি ও অপস্মার রোগ। প্রায় উনিশ শতাব্দী আগে যে ক্রীতদাসী মেয়েটি মারা গেছে তার যে ছিল সুস্থ মন ও উজ্জ্বল স্বাস্থ্য যার জন্য আজও এদের মধ্যে জেজেবেলের মত সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে জন্মায় সে কথাও এরা কেউই জানে না।

"বন্দুকবাজ" ড্যানি প্যাট্রিক ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে আরামে শুয়ে আছে। তার পোশাকের মধ্যে নিরাপদে লুকানো আছে ২০ জি. বাঁ বগলের নীচে বিশেষভাবে তৈরী খাপের মধ্যে লুকানো আছে একটা ৪৫। বন্দুকবাজ প্যাট্রিক জানে, বেশ কিছুদিন এটাকে ব্যবহার করতে হবে না, তবু তৈরী থাকা ভাল। "বন্দুকবাজ" শিকাগোর লোক। সেখানে যে সমাজে সে চলাফেরা করে তারা সকলেই তৈরী থাকার ব্যাপারটায় বিশ্বাসী।

আপাতত জাহাজের ডেক চেয়ারে বসে সে রোদ পোয়াচ্ছে। একটানা তিন দিনের সমুদ্র-যাত্রায় ড্যানি বিরক্ত হয়ে উঠেছে। সহযাত্রীরা কেউ তার সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা বলে না। কেন বলে না তাও সে বুঝতে পারে না।

যাই হোক আজ তৃতীয় দিনে একটি যুবক এসে তার পাশে বসল। তার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, সুপ্রভাত। আবহাওয়াটা ভারি সুন্দর।

ড্যানি নিরুত্তাপ নীল চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে বলল, তাই বুঝি? তারপর আবার

চোখ ফেরাল তরঙ্গমুখর অসীম সমুদ্রের বুকে।

লাফায়েৎ স্মিথ হেসে একটা বই খুলে চেয়ারে হেলান দিল। ধীরে ধীরে অভবা প্রতিবেশীটিব কথা ভুলেই গেল।

সেদিন বিকেলে ড্যানি যুবকটিকে আবাব দেখতে পেল সুইমিং পুলে। একটি জিনিস তাকে মুগ্ধ করল। কি সাঁতারে, কি ডাইভিং-এ, যুবকটি অন্য সকলের চাইতে অনেক বেশী দক্ষ। তাব রোদে-পোড়া তামাটে রং দেখেই বুঝল, যুবকটি দীর্ঘ সময় সুইমিং পুলে কাটাতে অভ্যস্ত।

পবদিন সকালে ডেকে এসেই ড্যানি দেখল, যুবকটি তার আগেই এসে চেয়ারে বসে আছে। নিজেব চেয়াবে বসে সে বলল, সুপ্রভাত। সকালটা বড় ভাল।

বই থেকে মুখ তুলে যুবকটি বলল, তাই বুঝি? তাবপব আবার বইয়েব পাতায় চোখ বাখল।

ড্যানি হেসে বলল, আমার কথাটাই আমাকে ফিবিয়ে দিলে? কি জান, আমি ভেবেছিলাম তুমিও ওই সব উঁচু টুপিওয়ালাদেব একজন। কিন্তু কাল তোমাকে পুকুবে দেখেছি। তুমি বেশ ভাল লাফাতে পাব।

লাফায়েৎ স্মিথ এ. এম. পি-এইচ. ডি. এস-সি., ডি, বইটা কোলেব উপর রেখে যুবকটিব দিকে তাকাল। মুখে দেখা দিল বন্ধুত্বেব হাসি।

প্রমোদ ভ্রমণে চলেছ বুঝি? ড্যানি প্রশ্ন করল।

আশা করি, ভ্রমণটা সুখেরই হবে। তবে এটাকে বাবসায়িক ভ্রমণও বলা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা। আমি একজন ভূ-তত্ত্ববিদ।

ইংলণ্ডে যাচ্ছ কি?

দিন দুই মাত্র লণ্ডনে থাকব, স্মিথ জবাব দিল।

আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ইংলণ্ডে যাচ্ছ।

লাফায়েৎ স্মিথ বিব্রত বোধ করল। তাবপব হেসে বলল, দেখ, লণ্ডন হচ্ছে ইংলণ্ডের রাজধানী। কাজেই লণ্ডনে থাকা মানেই ইংলণ্ডে থাকা।

ড্যানি চেঁচিয়ে বলল, গীজ্! কি জান, আমি কোনদিন আমেবিকার বাইবে যাই নি।

স্মিথ বলল, আমাব তো মনে হয় লণ্ডন তোমাব ভালই লাগবে।

তারপব ড্যানি পাল্টা প্রশ্ন কবল, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

আফ্রিকা!

সেই বাঘ-হরিণ-সিংহ-হাতিব দেশে যাচ্ছ কেন? শিকারে?

শিকারেই বটে, তবে জন্তু-জানোয়ার নয়, পাথর শিকারে।'

গীজ্! পাথর শিকারে কে না যাচ্ছে? তা নিয়ে কত রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটছে।

স্মিথ হেসে বলল, সে পাথর নয়।

তার মানে তুমি হীরের খোঁজে যাচ্ছ না?

না। আমি যাচ্ছি পাহাড়ের গঠন-রীতি জানতে।

সেটা বাজারে বিক্রী করতে পারবে?

না।

কি ভেবে মাথা নাড়তে নাড়তে ড্যানি শুধাল, আচ্ছা, আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই তো কি বল মিস্টার?

লাফায়েৎ স্মিথ অবাক হল। এই যুবকটিকে তার ভাল লেগেছে। হয়তো সঙ্গী হিসাবে সে ভালই হবে। আফ্রিকার জঙ্গলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটাতে আর একজন শ্বেতকায় সঙ্গী পেলে সময়টাও ভাল কাটবে। তবু সে ইতস্তত করতে লাগল। এই লোকটি সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। কোন পলাতক আসামীও তো হতে পারে।

তাকে ইতস্তত করতে দেখে ড্যানি বলল, খরচের কথা নিয়ে ভেবো না। আমার খরচটা আমিই দেব।

না, না, খরচ নিয়ে আমি ভাবছি না। কি জান, আমরা কেউ কাউকে জানি না। দুজনের মতের মিল নাও হতে পারে।

ড্যানি এবার জোর দিয়ে বলল, আমি কিন্তু আফ্রিকা যাবই। আর তুমিও যখন সেখানেই যাবে তখন দু'জন একসঙ্গে গেলে ক্ষতি কি? তাতে খরচ কম পড়বে, আর একজন সাদা মানুষের বদলে দু'জন সাদা মানুষ নিশ্চয়ই ভাল। এখন ভেবে বল, আমরা একসঙ্গে যাব, না আলাদা-আলাদা?

লাফায়েৎ স্মিথ হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, একসঙ্গে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটল। ট্রেনের ঝক্-ঝক্। স্টিমারের ধ্বক্-ধ্বক্। পুরনো পথে অনেক কালো মানুষের পায়ের ছাপ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সাদা মানুষদের নেতৃত্বে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সাফারি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ঘেঞ্জি পর্বতমালার অরণ্য-অঞ্চলের দিকে। কেউ কারও খবর রাখে না, কার কি উদ্দেশ্য তাও জানে না।

পশ্চিম দিক থেকে এল লাফায়েৎ স্মিৎ ও বন্দুকবাজ প্যাট্রিক: দক্ষিণ দিক থেকে এল বড় ইংরেজ শিকারী লর্ড পাস্‌মোর; পূব দিক থেকে লিওন স্তাবুচ।

ঘেঞ্জি পর্বতমালার সানুদেশের ঢালু জমিতে স্তাবুচরা থেমেছে দুপুরের বিশ্রামের জন্য। তার লোকজনদের মধ্যে কিছুটা গোলমাল চলেছে। একদল কুলি গোল হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। তাদের দেখিয়ে স্তাবুচ সর্দারকে জিজ্ঞাসা করল, ওরা কি করছে?

সর্দার বলল, ওরা ভয় পেয়েছে বাওয়ানা।

জেনেশুনেও স্তাবুচ বলল, কিসের ভয়?

দস্যুর ভয় বাওয়ানা। কাল রাতে ওরা তিন-জন পালিয়েছে। আরও পালাবে। সকলেই ভয় পাচ্ছে।

স্তাবুচ ধমক দিয়ে বলল, এবার ওরা আমাকে ভয় করবে। আর কেউ পালালে আমি—আমি—

কিন্তু সে কথা আর বলা হল না। একজন কুলি হঠাৎ দাঁড়িয়ে সভয়ে চীৎকার করে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে বলল, ঐ দেখ! দস্যুরা আসছে।

দূরে আকাশ-পটে কালো ছায়ার মত দেখা দিল একদল অশ্বারোহী। তারা সবেগে ধেয়ে আসছে। সাদা আলখাল্লা বাতাসে উড়ছে, রাইফেলের নল ও বর্শার ফলা রোদ্দুরে চকচক করছে।

হঠাৎ একটা কুলি ছুটে গিয়ে একটা তল্পি কাঁধে তুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ছুটে গেল স্তূপ করা তল্পিতল্পার দিকে।

সর্দার ও আস্কারিরা ছুটে গেল। কুলিরা ততক্ষণে তল্পিতল্পা নিয়ে পিছনের পথ ধরে পালাতে ব্যস্ত। সর্দার বাধা দেওয়াতে একটা কুলি ঘুষি মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর সকলেই পালাতে লাগল—কুলিবা, আস্কারিরা, এমন কি সর্দার পর্যন্ত।

স্তাবুচ একা। সেও পালাতে যাচ্ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পাবল পালাবার চেষ্টা বৃথা। হুংকার দিতে দিতে অশ্বারোহীরা ছুটে আসছে শিবিব লক্ষ্য করে। একেবারে তার সামনে এসে তাবা ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। বদখৎ চেহারাতেই তাদের স্বভাব পবিস্ফুট।

দস্যু-সর্দাব স্তাবুচকে কি যেন বলল, কিন্তু সে তার কিছুই বুঝতে পারল না। দু'জন দস্যুকে স্তাবুচেব পাহাবায় বেখে বাকিরা শিবিরে ঢুকে সব কিছু লুটপাট করে এনে ঘোড়ার পিঠে চাপাল। তারপব স্তাবুচকে নিরস্ত্র ও বন্দী করে সব কিছু নিয়ে যে দিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই ঘোড়া চালিয়ে দিল।

ঘন জঙ্গলের আড়ালে থেকে দুটি তীক্ষ্ণ ধূসর চোখে কিন্তু সব কিছুই দেখল। স্তাবুচবা দুপুরের বিশ্রামের জন্য থামার পর থেকেই সে শিবিরের উপব নজর রেখেছিল। দস্যুরা চলে যেতেই এক-লাফে গাছে চড়ে সে দুলতে দুলতে চলল উল্টো পথে অর্থাৎ যে পথে স্তাবুচের লোকরা পালিয়েছে।

দলের সর্দার গোলোবা সদলে ছুটছে বনের পথ ধবে। কিন্তু যখন দেখল যে দস্যুরা তাদের তাড়া করছে না, তখন সে থামল। এমন সময় গাছের আড়াল থেকে একটি ব্রোঞ্জ-কঠিন সাদা মানুষ পথের সামনে হঠাৎ দেখা দিল। একটুকরো কটি-বস্ত্র ছাড়া সে প্রায় নগ্নদেহ। তাকে দেখেই ভয়ে ও বিস্ময়ে সকলে থেমে গেল।

লোকটি নিজের ভাষায় প্রশ্ন করল, তোমাদের

সর্দার কে? সকলেরই চোখ ঘুরে গেল গোলোবাব দিকে।

নিগ্রো সর্দার বলল, আমি।

তোমার বাওয়ানাকে রেখে চলে এলে কেন?

উত্তর দিতে গিয়েও গোলোবা থেমে গেল। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, সর্দার গোলোবাকে সে কথা শুধোবার তুমি কে হে?

সাদা লোকটি বলল, আমি অরণ্যরাজ টারজন।

গোলোবা বজ্রাহত। অরণ্যরাজ টারজনকে সে কখনও চোখে দেখে নি, কিন্তু এই বড় বাওয়ানার কীর্তি-কাহিনী সবই শুনেছে। প্রশ্ন করল, তুমি টারজন?

সে মাথা নাড়ল। গোলোবা সভয়ে নতজানু হয়ে বলল, দয়া কর বড় বাওয়ানা! গোলোবা জানত না।

টারজন ধমক দিয়ে উঠল, আমি সব জানি। এবার ভালয় ভালয় ফিরে যাও।

গোলাবা ভয়ে ভয়ে বলল, দস্যুবা যদি আবার তাড়া করে?

করবে না। তারা পশ্চিম দিকে চলে গেছে। তোমার বাওয়ানাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। ভাল কথা। লোকটা কে? এখানে কি করছে?

অনেক দূরে উত্তরের দেশ থেকে সে এসেছে। সে বলে দেশটার নাম কশা।

টারজন বলল, হ্যাঁ। আমি সে দেশের কথা জানি। সে এখানে এসেছে কেন?

তা জানি না। তবে শিকার করতে আসে নি, কারণ খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া সে শিকার করে না।

সে কি টারজনের কথা কখনও বলেছে?

হ্যাঁ, প্রায়ই বলে। সব গ্রামেই সে টারজনের কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কেউ বলতে পারে না।

টারজন বলল, ঠিক আছে। তুমি যেতে পার।

মিডিয়ান দেশের উপত্যকার একেবারে নীচে অবস্থিত হ্রদটার দিকে এগিয়ে চলেছে লেডি বারবারা কলিস ধূলি-ধূসরিত পথ ধরে। তার ডান দিকে চলেছে আব্রাহামের ছেলে আব্রাহাম, বাঁদিকে চলেছে স্বর্ণ-কেশিনী জেজেবেল। তাদের পিছনে বিষণ্নমুখ একটি তরুণীকে ঘিরে এগিয়ে চলেছে শিষ্যের দল। তারও পিছনে সর্দারদের নেতৃত্বে চলেছে বাকি গ্রামবাসীরা।

শোভাযাত্রীরা হ্রদের তীরে এসে হাজির হল। এখানকার লোকেরা মনে করে হ্রদটা অতলান্ত। যে জায়গাটায় এসে তারা থামল সেখানে জমাট লাভা-পাথরের কয়েকটা বড় চাঁই হ্রদের উপর ঝুলে আছে। আব্রাহামের পুত্র আব্রাহাম শিষ্যদের নিয়ে তারই একটা পাথরের উপর বসল। তাদের মাঝখানে সেই তরুণীটি। জিহোবাবের একটিমাত্র ইঙ্গিতে আধা ডজন যুবক এগিয়ে এল। তাদের এক-জনের হাতে শক্ত সুতোর একটা জাল, অপর দুজনের হাতে একটা ভারী জমাট লাভার চাঁই। দ্রুতগতিতে তারা ভীত, ত্রস্ত, আর্তনাদকারী তরুণী-টির উপর জালটাকে ছড়িয়ে দিয়ে লাভা-পাথরটাকে তার সঙ্গে বেঁধে দিল।

আব্রাহামের পুত্র আব্রাহাম মাথার উপর হাত তুলে সংকেত করতেই অন্য সকলে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। সে তখন অপরিচিত হযবরল-র মত এমন কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করতে লাগল যেটা মিডিয়ান ভাষা নয়, কোন ভাষাই নয়।

মেয়েটি ততক্ষণে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এলিয়ে পড়েছে। যুবকরা জালটাকে শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

সহসা আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম অর্থহীন মন্ত্র ছেড়ে স্থানীয় ভাষায় বলতে লাগল, মেয়েটি পাপ করেছে, তাই তাকে শাস্তি পেতেই হবে। তবে অপার করুণাময় জিহোবার ইচ্ছায় তাকে আগুনে পোড়ানো হবে না, চিন্নেরেথের জলে তাকে তিন-বার ডোবানো হবে যাতে শরীর থেকে সব পাপ ধুয়ে যায়।

কথা শেষ করে ইঙ্গিত করতেই চারটি যুবক দু'দিক থেকে জালটাকে তুলে ধরল, আর বাকি দু'জন ধরে রইল জালের লম্বা দড়িটার দুই প্রান্ত। এবার তারা দুই প্রান্ত থেকে মেয়েটিকে দোলাতে লাগল ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত। চেন্নেরেথ হ্রদের শান্ত জলরাশির উপর দোদুল্যমান মেয়েটির আর্ত চীৎকারের সঙ্গে মিশে গেল সেই সব দর্শকদের চীৎকার ও আর্তনাদ যাদের দুর্বল স্নায়ু এই চরম

উত্তেজনা সহ্য করতে না পেরে আকস্মিক অপস্মার রোগের প্রকোপে মাটিতে পড়ে গোঙাতে শুরু করেছে।

ভীত ত্রস্ত মেয়েটিকে যুবকরা ক্রমেই দ্রুততর বেগে দোলাতে লাগল। হঠাৎ তাদের একজনও মাটিতে এলিয়ে পড়ল। তার ফেনায়িত মুখ থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ বের হতে লাগল। মেয়েটির নরম দেহটা শক্ত লাভা-পাথরের উপর আছড়ে পড়ল। জেহোবার ইঙ্গিতে আর একটি যুবক এসে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়েটি অবিরাম দুলতে লাগল একবার চিন্নেরেথের জলের উপর, একবার শক্ত লাভা-পাথরের উপর।

জাল দোলানোর তালে তালে আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম মন্ত্রের মত উচ্চারণ করতে লাগল, জিহোবার নামে! আর তার পুত্র পলের নামে!

এটাই বোধ হয় সংকেত। চার যুবক সঙ্গে সঙ্গে জালের দড়িতে ঢিলে দিল আর জল শুদ্ধু মেয়েটি সটান ডুবে গেল হ্রদের জলে। খানিকটা জল ছলকে উঠল। তার ঢেউ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল হ্রদের বুকে। কয়েক সেকেণ্ড সব চুপচাপ। শুধু শোনা যেতে লাগল মিডিয়ানদের অনিবার্য নিয়তির শিকার আরও অনেক অপস্মারগ্রস্ত মানুষের আর্তনাদ ও গোঙানির শব্দ।

কয়েক সেকেণ্ড পরে আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম আবার সংকেত দিতেই ছয় যুবক জলশুদ্ধু মেয়েটিকে টেনে তুলল জলের উপরে। কিছুক্ষণ সেইভাবে রেখে পয়গম্বরের নির্দেশে আবার তাকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে ধরল।

ছয় যুবক জালটাকে তুলে মেয়েটির অসার দেহটাকে পাথরের উপর নামিয়ে দিল ঠিক সেই-খানে যেখানে লেডি বারবারা নতজানু হয়ে প্রার্থনায় রত।

পয়গম্বর তার দিকে ফিরে বলল, কি করছ তুমি?

অসহায় মেয়েটির জীবন রক্ষার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি।

মুখ বিকৃত করে পয়গম্বর বলল, ওই দেখ তোমার প্রার্থনার জবাব। মেয়েটি মরে গেছে। এর দ্বারা জেহোবা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহামই তার পয়গম্বর, আর তুমি একটি ধাপ্পাবাজ!

জেজেবেল অস্পষ্ট গলায় বলল, আর আমাদের রক্ষা নেই!

সেটা লেডি বারবারাও বুঝতে পারল; তবু সংকটকালে আত্মহারা না হয়ে পয়গম্বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বলল, হ্যাঁ, মেয়েটি মারা গেছে, কিন্তু জেহোবা তাকে নতুন জীবন দান করতে পারে।

আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম বলল, তা পারে, কিন্তু দেবে না।

তোমার কথায় দেবে না, কারণ সে তোমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছে; তার পয়গম্বর হয়েও তুমি তাকে অমান্য করেছ। দ্রুতপায় প্রাণহীন দেহটার পাশে এগিয়ে গিয়ে লেডি বারবারা আবার বলল, কিন্তু আমার প্রার্থনায় জেহোবা ওকে নতুন জীবন দেবে। এস জেজেবেল, আমাকে সাহায্য কর।

আধুনিক খেলা-ধুলায় অভিজ্ঞ অন্য অনেক নারীর মতই লেডি বারবারাও জলমগ্ন মানুষের চিকিৎসা-পদ্ধতি বেশ ভালই জানে। সেই সব প্রক্রিয়াই সে মেয়েটিব উপব প্রয়োগ করতে লাগল। কিন্তু তাব সঙ্গে একটু ভড়ং যোগ করল সমবেত নব-নারীদের মনে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জাগাতে। তাব নানা রকম নির্দেশমত জেজেবেল কাজ কবতে লাগল, আর লেডি বাববাবা মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে গড় গড় করে আবৃত্তি করতে লাগল কখনও "চার্জ অব্ দি লাইট ব্রিগেড" থেকে, কখনও "এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড" থেকে, আবার কখনও কিপ্‌লিং বা ওমর খৈয়াম থেকে। এইভাবে দশ মিনিট চিকিৎসাব পবে মেয়েটির দেহে যখন জীবনেব লক্ষণ দেখা দিল তখন সে লিংকনের "গেটিস্‌বুর্গ ভাষণ"-এর অংশবিশেষ আবৃত্তি করে তাব মন্ত্র পাঠ শেষ করল।

পয়গম্বর, শিষ্যবৃন্দ, প্রধানগণসহ সমবেত জনতা মুগ্ধবিস্ময়ে এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করল।

একজন অশ্বারোহী লুঠেরার পিছনে বসে বন্দী লিওন স্তাবুচ অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। ঘটনাচক্রে একবার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলেও যে কোন দ্বিতীয় সুযোগেই লুঠেরারা যে তাকে শেষ করে ফেলবে তা সে বুঝতে পারছে।

একটা পাহাড়ি খাড়ি-পথ ধরে লুঠেরারা এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ পরেই দূরে একটা প্রাচীর-ঘেরা গ্রামে লুঠেরারা ঢুকে পড়ল। গ্রামবাসীরা চীৎকাব কবে তাদেব অভ্যর্থনা জানাল।

একটা ভাঙা ঘর থেকে বেরিয়ে এল একজন বেঁটে দাড়িওয়ালা সাদা মানুষ। তাকে দেখেই স্তাবুচ যেন কিছুটা স্বস্তি পেল।

দলের সর্দার সেই দাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে সব কথা বলতে লাগল। সেই ফাঁকে স্তাবুচকে সেখানে নিয়ে আসা হল।

সর্দারের সব কথা শুনে দাড়িওয়ালা হাসিমুখে স্তাবুচকে কি যেন বলল। স্তাবুচ বুঝল যে লোকটি ইতালীয় ভাষায় কথা বলছে। কিন্তু সে ভাষা

উঠে দাঁড়িয়ে লেডি বারবাবা তখনও আবৃত্তি করে চলেছে, জনগণের কল্যাণে জনগণকে নিয়ে গঠিত জনগণের এই সরকার কখনও পৃথিবী থেকে লুপ্ত হবে না। মুখ ফিবিয়ে জালধাবী ছয়জন যুবককে আদেশ কবল, মেয়েটিকে ওই জঙ্গলের মধ্যে শুইয়ে তার বাবা-মার কাছে নিয়ে যাও। এস জেজেবেল। আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহামের দিকে একবার ফিবেও তাকাল না।

তো সে বুঝতেও পারে না। তখন সে ইংরেজিতে কথা বলল।

দাড়িওয়ালা ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল, ইংবেজি ভাষা আমি একটু-একটু বুঝি। তুমি কে? কোন্ দেশ থেকে এসেছ তুমি?

স্তাবুচ বলল, আমি একজন বিজ্ঞানী। আগে কথা বলেছিলাম রুশ ভাষায়।

রাশিয়া কি তোমার দেশ?

হ্যাঁ।

এবার পরিবর্তিত স্বরে দাড়িওয়ালা শুধাল, তোমার নাম কি কমরেড ?

আমার নাম লিওন স্তাবুচ। আর তোমার নাম কি ?

দোমিনিক কাপিয়েত্রো। এস, ভিতরে গিয়ে সব কথা হবে। আমার কাছে একটা বোতল আছে। সেটা দিয়েই শুভ-সূচনা করা যাবে।

পাত্রের পর পাত্র মদ ফুরোতে লাগল। ক্রমে দুজনের মেজাজও দিলদরিয়া হয়ে উঠল। সামনে দুটো খালি বোতল; আর একটা নতুন খোলা হয়েছে। মদের ঝোঁকে স্তাবুচের গলা জড়িয়ে ধরে ভদ্রলোকটি নিজে থেকেই বলতে শুরু করল, কমরেড, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। অতএব আমাকে বলতেই হবে কেন আমি এই নোংরা গলা-কাটা লোকগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়েছি। আমি ছিলাম ইতালীয় বাহিনীর একজন সৈনিক। আমার রেজিমেন্ট তখন ইরিত্রিয়া-তে অবস্থিত। একজন সাচ্চা কমুনিস্ট হিসাবে সেখানেই বিভেদ ও বিদ্রোহের উস্কানি দিতে শুরু করলাম, আর একটা ফ্যাসিস্ট কুকুর কম্যাণ্ডিং অফিসারকে বলে দিল। আমি গ্রেপ্তার হলাম। আমাকে নির্ঘাৎ গুলি করে মারা হত, কিন্তু তার আগেই আমি আবিসিনিয়াতে পালিয়ে গেলাম।

পথে নেমে কিছু ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র চুরি করলাম। পথে একদল ডাকাতকেও দলে ভিড়িয়ে নিলাম। তাদের নিয়েই শুরু করলাম পথে পথে চুরি-ডাকাতি। কিন্তু তাতে মালকড়ি সামান্যই জুটত। কাজেই সুদূর ঘেল্পি অঞ্চলে গিয়ে শুরু করে দিলাম কালো হস্তিদন্তের চালাও লাভের ব্যবসা।

কালো হস্তিদন্ত ? এরকম কোন জিনিসের নাম তো শুনি নি।

কাপিয়েত্রো হেসে বলল, আরে, দু-পেয়ে হাতি।

স্তাবুচ শিস্ দিয়ে বলে উঠল, এবার বুঝতে পেরেছি। তুমি একজন ক্রীতদাস-শিকারী। থাক, ওসব কথা। এবার তোমার কথা বল।

আমি একটি লোকের সন্ধান করছি।

আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলে তো অনেক লোক আছে। তার জন্য এই সুদূর ঘেল্পি অঞ্চলে এসেছ কেন ?

স্তাবুচ উত্তরে বলল, আমি যার খোঁজ করছি তাকে ঘেল্পির দক্ষিণেই কোথাও পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা।

নেশার ঘোরে না থাকলে হয় তো একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে নামটা বলত না। সে নির্দ্বিধায় বলল, অরণ্যরাজ টারজন নামে একজন ইংরেজকে আমি খুঁজছি।

কাপিয়েত্রোর চোখ দুটো কুঁচকে গেল। প্রশ্ন করল, সে কি তোমার বন্ধু ?

তাকে কখনও দেখিও নি, স্তাবুচ জবাব দিল।

কাপিয়েত্রো বলল, তার দেশ ঘেল্পির অনেক দক্ষিণে। কিন্তু অরণ্যরাজ টারজনের সঙ্গে তোমার কি কাজ ?

আমি মস্কো থেকে এসেছি তাকে হত্যা করতে। কথাটা বলে ফেলেই স্তাবুচের মনে হল, কাজটা ভাল হয় নি।

কাপিয়েত্রো বলল, যাক, আশ্বস্ত হলাম।

কেন ?

কালো হস্তিদন্ত সংগ্রহের ছোটখাট কাজে সেই আমার পথে সব চাইতে বড় বাধা। সে আমার পথ থেকে সরে গেলেই আমি বেঁচে যাই।

লর্ড পাস্‌মোরের সাফারি ঘেঞ্জি পর্বতমালার পশ্চিম দিক ধরে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে। তার দীর্ঘদেহ, কুলিরা সুশিক্ষিত সেনাদলের মত সঠিক পদক্ষেপে এক তালে এগিয়ে চলেছে। সর্বত্র শৃংখলার চিহ্ন সুপরিস্ফুট।

পূব দিকে কয়েক মাইল এগিয়ে একটা চড়াই বেয়ে উঠবার সময় দুটি সাদা মানুষ একটিমাত্র ভৃত্য ও একটি বন্দুকবাহককে নিয়ে দল ছেড়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে চলেছে।

লাফায়েৎ স্মিথ বন্দুকবাজকে বলল, তুমি সাফারির সঙ্গে এখানে থাক। জায়গাটা ভাল, এখানে একটা শিবির বসাবার ব্যবস্থা কর। আরও কিছুটা দেখে আসি। এখনও অনেক বেলা আছে।

খোলা জায়গা পেরিয়ে লাফায়েৎ স্মিথ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পথ ক্রমেই আরও দুরারোহ; যেমন চড়াই, তেমনি ঝোপ-ঝাড়ে ভর্তি। বেশ কষ্ট করে সে উপরে উঠতে লাগল।

এক সময় একটা পাহাড়ের মাথায় উঠল। সামনে দূরে মাইলের পর মাইল জুড়ে উঁচু-নীচু পাহাড়ের সারি। এ পাহাড় থেকে সামনের পাহাড়ে যাবার পথে একটা বড় খাঁড়ি।

লাফায়েৎ স্মিথ খাঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। যতটা ভেবেছিল খাঁড়িটা তার চাইতেও বেশী গভীর। তবু গভীর আগ্রহে নীচে নেমে সে আবার উপরে উঠতে লাগল পরের পাহাড়টা বেয়ে। কৌতূহল তাকে এতই অভিভূত করে রেখেছে যে সময়ের দিকে কোন খেয়ালই রইল না।

খাড়িব উপরে উঠেই রাত নেমে এল। তবু সে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল। আরও কয়েক ঘণ্টা পার হবার আগে স্মিথ বুঝতেই পাবে নি যে সে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

একটু একটু করে লাফায়েৎ স্মিথ এগিয়ে চলল সুড়ঙ্গ-পথ ধরে। আবিষ্কারের নেশায় ভুলে গেল ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিরাপত্তার কথা। সুড়ঙ্গটা ক্রমেই সরু হয়ে আসছে। এক সময় দু'দিকের দেওয়াল এত বেশী চেপে এসেছে যে কোনরকমে একটা মানুষ তার ভিতর দিয়ে গলে যেতে পারে।

অন্ধকাব ক্রমেই বাড়ছে। এক সময় সে হাতে-পায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল। মনে সর্বদাই ভয়—না জানি কি আছে এ পথের শেষে।

এক সময় একটুকরো দিনের আলো হঠাৎ ঝলমলিয়ে উঠল গুহার মুখে। হামাগুড়ি দিয়ে বের হতেই সামনে পড়ল একটা উপত্যকা। সম্মুখে প্রসারিত ঝোপঝাড়ে ভর্তি বিস্তীর্ণ প্রান্তর; মাঝখানে একটা নীল হ্রদ পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝিলমিল করছে।

সেখান থেকে চারদিকে তাকিয়ে একটা আশ্চর্য দৃশ্য তার চোখে পড়ল। কুঁড়ে ঘরে সাজানো একটা গ্রাম। কিন্তু না, সে নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছে। এই পরিত্যক্ত জায়গায় গ্রাম আসবে কোথা থেকে?

নিশ্চয় এটা তার চোখের ভুল।

এগিয়ে চলল গ্রামটার দিকে—আশ্রয় ও আহার্যের আশায়। হ্রদের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা দৃশ্য চোখে পড়তেই সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দুটো ক্রুশ-কাষ্ঠের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মেয়ে। আগুনের আভা পড়েছে তাদের মুখে। দুজনই সুন্দরী।

লাফায়েৎ স্মিথ বুঝতে পারল একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছে। ক্রুশ দুটোর নীচে স্তূপীকৃত করা হয়েছে শুকনো ঘাস-পাতা ও জ্বালানী-কাঠ। এক-দল যুবকের হাতে জ্বলন্ত মশাল। জ্বালানি-কাঠে আগুন ধরাবার আয়োজন চলছে।

একটি বৃদ্ধ মন্ত্রপাঠ করছে। এখানে-ওখানে মাটিতে পড়ে আছে কিছু মানুষ। নিশ্চয় "দশা" পড়েছে। বুড়ো লোকটি সংকেত করতেই শুকনো কাঠে আগুন ধরানো হল।

আর দেরী করা চলে না। একলাফে এগিয়ে গিয়ে গ্রামবাসীদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে লাফায়েৎ স্মিথ ক্রুশকাষ্ঠের কাছে হাজির হল। পায়ের বুট দিয়ে জ্বলন্ত কাঠগুলিকে লাথি মেরে সরিয়ে দিল। তারপর '৩২-টাকে উঁচিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বিস্মিত ক্রুদ্ধ জনতার দিকে।

স্মিথের পেছন থেকে ভেসে এল একটি ইংরেজ-কণ্ঠ: এই মুহূর্তে গুলি চালাও; নইলে ওরা তোমাকে শেষ করে ফেলবে।

লাফায়েৎ স্মিথের বিস্ময়ের শেষ নেই। এ যে এক ইংরেজ মহিলার কণ্ঠস্বর। একজন মশালবাহী এগিয়ে আসতেই স্মিথ গুলি করল। আর্তনাদ করে বুক চেপে ধরে সে স্মিথের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তা দেখে আর যারা এগিয়ে আসছিল তারা পিছিয়ে গেল। অতি-উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে অ্যাঙ্গাস্টাসের কাছ থেকে উত্তরা-ধিকারসূত্রে পাওয়া অপস্মার রোগগ্রস্ত বাকি লোক-গুলো মাটিতে পড়ে গোঙাতে লাগল।

তাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সেই সুযোগে লাফায়েৎ স্মিথ দুই বন্দিনীর হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিল। দু'জনকে দুই হাতে তুলে ধরল। জেজেবেলকে ক্রুশে বাঁধা হয়েছিল অনেকক্ষণ আগে। সে কোন-মতেই একাকি দাঁড়াতে পারছিল না। লেডি বারবারা ও স্মিথ দুজনেই তাকে ধরে রইল যতক্ষণ না তার পায়ের স্বাভাবিক রক্ত-চলাচল ফিরে আসে।

আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম হতচকিত। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। সম্বিত ফিরে পেয়ে সে চীৎকার করে বলল, কে এই মহাপাপী? ওকে আক্রমণ কর! ওর হাত-পা-মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেল।

পয়গম্বরের দিকে পিছন ফিরে তারা দাঁড়িয়ে-ছিল। সেই সুযোগে বুড়ো পয়গম্বর বলির খড়্গটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল তাদের দিকে। তার সব রাগ পড়ল লেডি বারবারার উপর। সেই

তো যত নষ্টের গোড়া। চুপি চুপি এগিয়ে লেডি বারবারার পিছনে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পয়গম্বর খড়্গ সমেত ডান হাতটা মাথার উপর তুলল আঘাত হানার উদ্দেশ্যে। সমবেত দর্শকবা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। সহসা তাদের কানে এল পয়গম্বরের রুদ্ধ-শ্বাস আকস্মিক আর্তনাদ; তার অবশ মুঠি থেকে খড়্গটা পড়ে গেল; সে নিজেও ভূতলশায়ী হল। নবাগতদের দৃঢ় মুষ্টি আর গলা চেপে ধরেছে।

লেডি বারবারা বলল, এখনই পালাও। মুহূর্তের মধ্যে ওরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

স্মিথ বলল, তোমার বন্ধুটিকে সঙ্গে নিতে আমার সঙ্গে তোমাকেও হাত লাগাতে হবে। সে একা হাঁটতে পারবে না।

লেডি বারবারা বলল, তুমি ওকে বাঁ হাত দিয়ে ধর। তাহলে ডান হাতে পিস্তল চালাতে পারবে। আমি অপর দিকটা ধরছি।

জেজেবেল মিনতি করে বলল, আমাকে রেখে যাও। আমার জন্য তোমরাও পালাতে পারবে না।

স্মিথ বলল, বাজে কথা রাখ। আমার গলা জড়িয়ে ধর।

লেডি বারবারা আশ্বাস দিয়ে বলল, রক্ত-চলাচল স্বাভাবিক হলেই তুমি হাঁটতে পারবে। চলে এস। যত তাড়াতাড়ি পারি পালাই এখান থেকে।

বাধা দিল জোবাব। নোংরা জামার ভিতর থেকে একটা ছুরি বের করে চীৎকার করে বলল, ওদের আটকাও।

জোবাবের দিকে পিস্তল তাক করে স্মিথ হুকুম করল, একপাশে সরে দাঁড়াও!

মুহূর্তের মধ্যে জোবাবের পাঁজরে নলটা ঠেকিয়ে ঘোড়া টিপল। বিকৃতস্বরে চীৎকার করে সে মাটিতে পড়ে যেতেই নলের মুখটা জনতার দিকে ঘুরিয়ে আবার গুলি করল। ভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে মিডি-য়ানরা পালিয়ে গেল।

জেজেবেল বলল, যে কোন মুহূর্তে ওরা আবার আসতে পারে। এই সুযোগে আমাদের পালাতে হবে।

স্মিথ বলল, আমার পিছনে পিছনে এস। আমি যে পথে এসেছি সেই পথে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ চলার পরে লাফায়েত স্মিথই প্রথম মুখ খুলল। বলল, তোমাদের দুজনের পরিচয়টা কিন্তু এখনও জানা হয় নি।

লেডি বারবারা বলল, জেজেবেল এখানকারই মেয়ে।

আর তুমি? তুমিও কি এখানকার মেয়ে?

লেডি বারবারা জবাব দিল, না আমি ইংরেজ।

অথচ কোন্ পথে এখানে এসেছ তাও জান না?

জানি—আমি এখানে নেমেছি প্যারাসুটে।

স্মিথ হাঁ করে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে

থেকে বলল, তুমি লেডি বারবারা কলিস!

তুমি কি করে জানলে? তুমি কি আমাকে খুঁজছ?

না, কিন্তু লণ্ডন হয়ে আসার সময় খবরের কাগজে তোমার বিমানে ওড়া ও নিখোঁজ হবার খবর অনেক পড়েছি—ছবি-ছাপাও বেরিয়েছিল। বুঝলে তো?

আর ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেল তোমার সঙ্গে। আশ্চর্য যোগাযোগ! কি সৌভাগ্য আমার।

স্মিথ মুখ নীচু করে বলল, কি জান, আসলে আমিও পথ হারিয়ে ঘুরছি। ফলে তোমার ভাগ্যের বিশেষ হেরফের কিছু হয় নি।

তা কেন? তুমিই তো আমাকে কবরে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছ।

ওরা কি সত্যি তোমাকে পুড়িয়ে মারত না কি? আজকের সভ্য জগতেও কি তা সম্ভব?

মিডিয়ানরা দু'হাজার বছর আগেকার যুগে বাস করে। তা ছাড়া, তারা যেমন ধর্মভীরু তেমনি জন্মগত উন্মাদ।

স্মিথ জেজেবেলের দিকে তাকাল। সদ্য-উদিত চাঁদের আলো পড়েছে তার মুখে। স্মিথের মনোভাব বুঝতে পেরে লেডি বারবারা বলল, জেজেবেলের কথা আলাদা। কারণটা বুঝিয়ে বলতে পারব না, কিন্তু সে তার দেশের অন্য লোকদের মত নয়। সেই আমাকে বলেছে, মাঝে মাঝে নাকি তার মত দু'একটি ছেলেমেয়েও এদেশে জন্মায়।

কিন্তু সে তো ইংরেজীতে কথা বলে, স্মিথ বলল।

আমি ওকে ইংরেজী শিখিয়েছি, লেডি বারবারা বলল।

বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে ও কি সত্যি আমাদের সঙ্গে যাবে?

এবার কথা বলল জেজেবেল। নিশ্চয় যাব। এখানে থাকব কি খুন হবার জন্যে? আজ রাতে আমার বাবা, মা, ভাই-বোনরা সকলেই ছিল ক্রুশকাষ্ঠের কাছে। তারা আমাকে ঘৃণা করে।

জন্মের মুহূর্ত থেকেই ঘৃণা করে। আমি তাদের মত নই। তাছাড়া, মিডিয়ানদের দেশে ভালবাসা বলে কিছু নেই—আছে শুধু ধর্ম। তারা মুখে ধর্মের কথা বলে আর কার্যক্ষেত্রে ছড়ায় শুধু ঘৃণা।

জেজেবেলের পায়ের অবশ ভাবটা কেটে গেছে। এখন সে একাই হাঁটতে পারছে। নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে তিনটি প্রাণী। আফ্রিকার ভরা চাঁদ উঠেছে আকাশে। তারই আলোয় পথচলা সুগমতর হয়েছে। চিন্নেরেথের নীল জলরাশিকে ডাইনে রেখে তারা এগিয়ে চলেছে।

মাঝরাতের কিছু পরেই স্মিথ প্রথমবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে আবার হাঁটতে লাগল। পিছন থেকে জেজেবেল বুঝতে পারল, তার পা টলছে। স্মিথ আবার পড়ে গেল। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সে যখন তৃতীয়বার পড়ে গেল তখন লেডি বারবারা ও জেজেবেল তাকে ধরে তুলল।

লেডি বারবারা বলল, তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।

না, না, আমি ঠিক আছি।

তুমি শেষবার কখন খেয়েছ? লেডি বারবারা শুধাল।

স্মিথ বলল, সঙ্গে কিছু চকোলেট ছিল।

বিকেলের দিকে তাই খেয়েছি।

লেডি বারবারা তবু প্রশ্ন করল, আমি জানতে চাইছি, পুরো খাবার কখন খেয়েছ ?

দেখ, হাল্কা লাঞ্চ খেয়েছি গতকাল দুপুরে, ববং বলতে পা্ব তার আগের দিন।

লেডি বারবারা সবিস্ময়ে বলল, আর এখন মাঝ রাত পার হয়ে গেছে। অথচ সেই থেকে তুমি হেঁটেই চলেছ ?

দুর্বল হাসি হেসে স্মিথ বলল, কিছুক্ষণ দৌড়তেও হয়েছে ; একটা সিংহ তাড়া করেছিল যে।

ইংরেজ মেয়েটি বলল, তুমি একটু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানেই বিশ্রাম নেব।

কে ড্যানি ?

আমার বন্ধু ; এই অভিযানে আমার সঙ্গী।

তাব কি আফ্রিকা-অভিযানের অভিজ্ঞতা আছে ?

তা নেই, তবে সে কাছে থাকলেই যে ভরসা পাওয়া যায়। তাছাড়া সে গুলিগোলা ছুঁড়তে খুব ওস্তাদ।

চিৎ হয়ে শুয়ে স্মিথ চাঁদের দিকে তাকাল। এখন সে অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। শুয়ে শুয়ে গত ত্রিশ ঘণ্টার ঘটনাবলীই তার মনের মধ্যে নড়াচড়া করতে লাগল। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

পাছে তার ঘুম ভেঙে যায় তাই লেডি বারবারা

স্মিথ মাথা নেড়ে বলল, না, না, তা কবো না। দিনের আলো ফুটবাব আগেই আমাদের এই উপত্যকাটা পার হতে হবে। সূর্য উঠলেই তারা আমাদের খুঁজতে বের হবে।

লেডি বারবাবা কঠিন গলায় বলল, সে যা হয় হবে। তোমাকে বিশ্রাম নিতেই হবে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও লাফায়েত বসে পড়ল। বলল, আমার দ্বারা তোমাদের বিশেষ কোন সাহায্য হবে বলে তো মনে হয় না। এ সময় ড্যানি থাকলে খুব ভাল হত।

ইশারায় জেজেবেলকে ডেকে নিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে বসল। বলল, আহা বেচারি ! অনেক ধকল গেছে ওব উপর দিয়ে।

ও কি তোমার দেশের মানুষ ? জেজেবেল প্রশ্ন করল।

না, ও মার্কিনী। কথা শুনেই বুঝেছি।

ও খুব সুন্দর, দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেজেবেল বলল।

কয়েক সপ্তাহ ধরে কেবল আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহামকে দেখলে তোমার সঙ্গে আমাকেও একমত হতে হবে যে সন্ত গান্ধীও একটি এডোনিস, লেডি বারবারা বলল।

তারপর একটা হাই তুলে বলল, ও সব কথা পরে হবে। এস একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

লেডি বারবারা মাটির উপর শুয়ে অচিরেই ঘুমিয়ে পড়ল। সারাটা দিন তার উপর দিয়েও তো অনেক ধকল গেছে।

মাঝ রাতের পরে একটা শব্দ শুনেই টারজনের ঘুম ভেঙে গেল।

মাথা তুলে কান পাতল; তারপর মাথা নীচু করে মাটিতে কান রাখল। উঠে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই বলল, অশ্ব ও অশ্বারোহী।

এতরাতে অশ্বারোহী আসছে কেন? তারা কারা?

টারজন তো জানে না ড্যানি ডাকাতের সর্দার কাপিয়েত্র-র হাতে বন্দী হয়েছে। তাকে পিছ্‌মোড়া করে বেঁধে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলেছে তাদের শিবিরে।

অন্ধকারে "বন্দুকবাজ" টলতে টলতে চলেছে। বিশ বছরেরও বেশী কালের জীবনে এত ক্লান্তি সে কোনদিন অনুভব করে নি। প্রতিটি পদক্ষেপই মনে হচ্ছে শেষ পদক্ষেপ।

শেষ পর্যন্ত ডাকাতের দলটা ডোমিনিক কাপিয়েত্রর গ্রামের ফটক দিয়ে ঢুকল। "বন্দুকবাজ"কে নিয়ে যাওয়া হল একটা কুটিরে। হাতের বাঁধন কেটে দিতেই সেখানকার কঠিন মাটিতেই তার দেহটা এলিয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে কোন রকমে কিছু পেটে দিয়েই সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। একটা ক্লান্ত ডাকাত কুটিরের মুখে ঘুমে ঢুলতে লাগল।

ডাকাতরা যখন সারি দিয়ে গ্রামের ভিতরে ঢুকছিল টারজন তখন নেমে এসেছিল উপরকার পাহাড়ের মাথায়। ভরা জ্যোৎস্নায় অশ্বারোহীদের বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। কাপিয়েত্র ও স্তাবুচকে দেখেই সে চিনতে পারল; মার্কিন ভূতত্ত্ববিদের দলের সর্দার ওগোনিয়োকেও দেখতে পেল; আরও দেখল, "বন্দুকবাজ" অত্যন্ত কষ্টে টলতে টলতে চলেছে।

ক্রমে রাত বাড়ল। চারদিক নিস্তব্ধ। পাহাড়ের উপর থেকে সব কিছু দেখে-শুনে-বুঝে টারজন নিঃশব্দে নেমে এল গ্রামের পাচিলের পাশে। এক-লাফে উঠে গেল পাঁচিলের মাথায়। আর একলাফে পাঁচিল থেকে নামল। এগিয়ে গেল সেই কুটিরটার দিকে যেখানে ঘুমিয়ে আছে সাদা যুবকটি। দরজার পাশে বসে আছে পাহারাদার। রাইফেলটা হাঁটুর নীচে। ধীরে ধীরে সে পা ছড়িয়ে বেড়ার গায়ে হেলান দিল। প্রহরী ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিঃশব্দে টারজন এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। দুই হাত বাড়াল। মট্ করে একটা শব্দ হল। ইস্পাত-কঠিন মুঠোর এক মোচরে গলার হাড়টা ভেঙে গেল।

অন্ধকারেই মৃতদেহটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে টারজন ঘরের ভিতরে ঢুকল। খুব সাবধানে ঘুমন্ত "বন্দুকবাজ"কে ঠেলে দিল। কিন্তু তার ঘুম ভাঙল না। আরও জোরে ঠেলা দিয়েও যখন কোন কাজ হল না তখন এক চড় কসিয়ে দিল তার গালে।

"বন্দুকবাজ" নড়েচড়ে বলে উঠল, গীজ! তোমরা কি একটু ঘুমতেও দেবে না। বলেছি তো মুক্তি-পণ পাবে।

মুচ্‌কি হেসে টারজন ফিসফিস্ করে বলল, উঠে পড় হে। হৈ-চৈ করো না। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

তুমি আবার কে?

অরণ্যবাজ টারজন।

গীজ! বন্দুকবাজ উঠে বসল।

টারজন বলল, আমাকে অনুসরণ কর। যাই ঘটুক না কেন আমার খুব কাছে কাছেই থেকো। আমি তোমাকে ছুঁড়ে দেব পাঁচিলের মাথায়। কোন রকম শব্দ করো না, আর খুব সাবধানে ও-পাশে নেমো,—ওদিকের মাটি অনেকটা নীচু।

পাঁচিলের কাছে পৌঁছে "বন্দুকবাজ" উপরে তাকাল। তার সন্দেহ ঘনীভূত হল। তার এক শ' আশি পাউণ্ড ওজনের দেহটাকে ছুঁড়ে দেবে পাঁচিলের উপরে—পাগল না কি!

"বন্দুকবাজে"র কলার ও ব্রীচেস চেপে ধরে তাকে কয়েকবার ঝুলিয়ে টারজন ছুঁড়ে দিল পাঁচিলের উপরে। পর মুহূর্তে ড্যানি প্যাট্রিকের প্রসারিত আঙুলগুলি পাঁচিলের মাথাটাকে আঁকড়ে ধরল।

"বন্দুকবাজ" ড্যানি প্যাট্রিক তো হতবাক। কী মানুষ রে বাবা! জীবনে কখনও সে এ রকমটি দেখে নি, দেখার আশাও করে না।

পাঁচিল থেকে নেমে দুজন নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। পাহাড়ের অনেক উপরে যেখানে সে গত রাতটা কাটিয়েছে, সেখানেই দুজন পৌঁছে গেল। টারজন বলল, ভোর পর্যন্ত যতটা পার বিশ্রাম করে নাও। তুমি খুব ক্লান্ত।

গীজ! আহা, এ রকম দরদভরা কথা কতকাল শুনিনি, ড্যানি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু দূরে টারজন শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়েও পড়ল। কিন্তু ভোর হবার সাথে সাথেই তার ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গীটি তখনও ঘুমোচ্ছে। নিঃশব্দে সে কাছাকাছি একটা জলার দিকে এগিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ড্যানির ঘুম ভাঙল। উঠে দেখে টারজন নেই। কোথায় গেল? তাকে ফেলে পালিয়েছে? তাকে তো সে রকম মানুষ বলে মনে হয় নি। তবু—কিছুই বলা যায় না।

"বন্দুকবাজ" ভাবতে লাগল; এখন আমি কি করি? গীজ! খিদেও পেয়েছে খুব। তার জন্যে অপেক্ষা করব, না চলতে শুরু করব? যাবই বা কোথায়? কি খাব? মহা মুস্কিল।

যতদূর দৃষ্টি যায় চারদিকে তাকাল। কোথায় টারজন?

সামনের লম্বা ঘাসকে দু' ভাগ করে দেখা দিল টারজন। তার কাঁধে একটা মরা শুয়োর। আজকের খাদ্য।

টারজন শুয়োরটাকে নামিয়ে রেখে বলল, এই নাও, প্রাতরাশ এনেছি। এবার শুরু করে দাও।

ড্যানি বলল, খুব ভাল করেছ; আমি এটাকে কাঁচাই খেয়ে ফেলব।

খুব ভাল কথা। টারজন বসে পড়ল। দু'টুকরো মাংস কেটে একটা টুকরো ড্যানিকে দিয়ে বলল, খাও।

আহারাদি শেষ করে দুজন পথে নামল লাফায়েত স্মিথের খোঁজে। টারজন অচিরেই তার পায়ের দাগ দেখতে পেয়ে সেই পথ ধরে এগোতে লাগল; কিন্তু ড্যানির চোখে এমন কিছু পড়ল না যাকে মানুষের পায়ের দাগ বলে মনে হতে পারে।

অদূরে একটা গ্রাম দেখতে পেয়ে কৌতূহলবশে টারজন স্মিথের পায়ের দাগ ছেড়ে সেই গ্রামের দিকে হাঁটতে লাগল। ড্যানি প্যাট্রিক তখনও ফাটলের পথের পাথরের ঠোক্কর খেতে খেতে কোন-রকমে এগিয়ে চলেছে।

এই ভাবে ক্লান্ত দেহে সে যখন ফাটলের শেষ প্রান্তে পৌঁছে একটি আশ্চর্য উপত্যকার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ততক্ষণে টারজন তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

"বন্দুকবাজ" বলে উঠল, গীজ! কে জানত যে এমন একটা জায়গা এখানে আছে? আর টারজনই বা কোন্ পথে গেল?

খানিক ভেবেচিন্তে ভুল পথ ধরে সে এগোতে লাগল।

"বন্দুকবাজ" ড্যানি প্যাট্রিক ক্লান্ত, বিরক্ত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে হেঁটেছে কিন্তু বন্ধুর কোন হদিস পায় নি। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

সে হ্রদের দিকে চলতে লাগল। পথময় বড় বড় পাথর ছড়ানো। একটা বড় পাথরের চাঁই ঘুরে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে উঠল। তার দিকেই এগিয়ে আসছে একটি স্বর্ণকেশী মেয়ে। সেও দাঁড়িয়ে পড়ল। মৃদু হেসে বলল, আরে, তুমি আবার কে?

তার মিডিয়ান ভাষা "বন্দুকবাজ" কিছুই বুঝতে পারল না।

ড্যানি বলল, এতদিনে আমার আফ্রিকা আসার একটা মানে পাওয়া গেল। এবার বলতো খুকি, তুমি ভাল আছ তো?

জেজেবেল ইংরেজিতে বলল, ধন্যবাদ। আমাকে তোমার ভাল লেগেছে জেনে খুশি হলাম।

ড্যানি বলল, গীজ, তুমি দেখছি যুক্তরাষ্ট্রের ভাষায় কথা বলছ? তুমি কোন্ দেশের মেয়ে?

আমি মিডিয়ান থেকে আসছি।

সে দেশের নাম তো কখনো শুনি নি। তা তুমি এখানে কি করছ?

আমি অপেক্ষা করছি লেডি বারবারার জন্য; আর স্মিথের জন্য।

স্মিথ! কোন্ স্মিথ? ড্যানির সাগ্রহ প্রশ্ন।

ও, সে খুব সুন্দর, জেজেবেল খোলাখুলি বলল।

ড্যানি বলল, এখানে তো একমাত্র সুন্দর তুমি জেজেবেল!

নিজেদের কথা নিয়ে তারা এতই মসগুল হয়ে পড়েছিল যে অন্য কোন দিকেই তাদের নজর ছিল না। হঠাৎ জেজেবেল চেঁচিয়ে বলে উঠল, ওই দেখ, কারা যেন আসছে। অনেকগুলি কালো মানুষ। ওঃ ড্যানি, আমার ভয় করছে।

একনজর দেখেই "বন্দুকবাজ" তাদের চিনতে পারল। বলল, ওরা ডাকাত জেজেবেল, পালাও।

দুজনে ছুটতে শুরু করল। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ডাকাতরা সহজেই তাদের ধরে ফেলল। ড্যানি দ্রুতগতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা ডাকাতের পা ধরে টেনে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তার হাতের ছিটকে-পড়া রাইফেলটা তুলে নিয়ে তারই মাথায় সজোরে আঘাত করল। ডাকাতের মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

এইভাবে তিনটে ডাকাতকে ঘায়েল করার পরে ড্যানি নিজেই ঘায়েল হল। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গিয়েও একটা ডাকাত ড্যানির পা ধরে টেনে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য

ডাকাতরা আঘাত করল তার মাথায়।

জেজেবেল সভয়ে দেখল, ড্যানির মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে। সে ছুটে গেল তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাকে ধরে ফেলল। একটা ঘোড়ার পিঠে তাকে তুলে নিয়ে ডাকাতরা জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

"বন্দুকবাজ" ড্যানি প্যাট্রিকের নিশ্চল দেহটা তার নিজের রক্তের মধ্যেই পড়ে রইল।

ক্রীতদাস-শিকারীরা নতুন সুন্দরী বন্দিনীকে নিয়ে গ্রামে ঢুকতেই সকলে হৈ-চৈ করে তাদের অভ্যর্থনা জানাতে লাগল। কাপিয়েত্র ও স্তাবুচও তাদের কুটিরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

কাপিয়েত্র জেজেবেলের হাত ধরে কুটিরের ভিতরে নিয়ে গেল। স্তাবুচও পিছন-পিছন গেল।

জেজেবেল বলল, আমাকে এখানে এনেছ কেন? আমি তো তোমাদের কোন ক্ষতি করি নি। আমাকে ড্যানির কাছে ফিরে যেতে দাও। সে গুরুতর আহত।

আহত নয়, মৃত, কাপিয়েত্র বলল। তার জন্য দুঃখ করো না। এক বন্ধু গেছে, দুই বন্ধু পেয়েছ।

ক্ষুধার্ত চোখে স্তাবুচ মেয়েটিকে দেখছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, ওকে পেতেই হবে। বলল, কেঁদো না। আমি তোমার বন্ধু। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চোখ তুলে জেজেবেল বলল,

কালো শয়তানরা কি এনেছে? কাপিয়েত্র শুধাল।

মনে হচ্ছে একটি সুন্দরী, স্তাবুচ জবাব দিল।

কাপিয়েত্র বলল, আরে, তাই তো! একে কোথায় পেলে?

খুব কাছেই। সঙ্গে একটা পুরুষও ছিল। নর-বানরের সঙ্গে যে পালিয়েছিল সেই।

সে কোথায়? তাকেও ধরে আনলে না কেন?

সে আমাদের সঙ্গে লড়ল; তাই তাকে মেরে ফেলতে বাধ্য হয়েছি।

তুমি যদি আমার বন্ধু, তাহলে আমাকে ড্যানির কাছে নিয়ে চল।

একটু পরেই সব হবে। বলে স্তাবুচ কাপিয়েত্রকে শুধাল, কত চাও?

কাপিয়েত্র বলল, প্রিয় বন্ধুটির কাছে ওকে বিক্রী করব না। এস, একটু পান করা যাক, তারপর সব বুঝিয়ে বলব।

বোতল থেকে দুজনই বেশ খানিকটা করে মদ গিলল।

মদের নেশায় ক্রমে দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি

শুরু হল। তা থেকে ধস্তাধস্তি। চীৎকার করে উঠে কাপিয়েত্র এক ঘুষি কসাল স্তাবুচের চোয়ালে। স্তাবুচও পাল্টা ঘুষি চালাল। দুজন দুজনের গলা টিপে ধরল। স্তাবুচ তার কোটের নীচ থেকে একটা সরু ছুরি বের করল। কাপিয়েত্র তা দেখতে পেল না। স্তাবুচের ডান হাতের ছুরিটা সজোরে বসে গেল কাপিয়েত্রর পিঠে। কাপিয়েত্র আর্তনাদ করে উঠল তারপরই কাঠ হয়ে পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। এবার কি ঘটবে ভেবেই স্তাবুচ শিউরে উঠল।

তাড়াতাড়ি জেজেবেলকে ধরে একটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে স্তাবুচ নিজে উঠল আর একটা ঘোড়ায়। তারপর প্রায় পঞ্চাশজন ডাকাতের চোখের সামনে দিয়ে তারা গ্রামের ফটকটা পার হয়ে গেল।

তারা যখন ঘোড়ার মুখ পাহাড়ের উপরের দিকে সরিয়ে দিল ততক্ষণে রাতের আঁধার নেমে এসে তাদের ঢেকে দিল।

"বন্দুকবাজ" ড্যানি প্যাট্রিক চোখ মেলে আফ্রিকার সুনীল আকাশের দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। হাতটা তুলে মাথায় রাখল। একি! হাতটা রক্তে লাল হয়ে গেছে।

আপন মনেই বলে উঠল, গীজ! ওরা আমাকে খুব ঠেঙিয়েছে!

হঠাৎ তার মনে পড়ল—শিবিরে ফিরতে হবে। সে না ফিরলে স্মিথ খুব চিন্তা করবে। ওবাস্মিই বা কোথায়? চারদিকে তাকাল। জীবিত অথবা মৃত—তাকে কোথাও দেখতে পেল না। অগত্যা সে একাই শিবিরের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

চলতে চলতে পাহাড়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল। সেখান থেকে নীচের গ্রামটা দেখা যায়। সেখানে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েই সে ডাকাতদের গ্রামের উপর চোখ রাখল।

দেখল, স্তাবুচ কুটির থেকে বেরিয়ে ঘোড়াগুলির কাছে গেল। ফিরে এল দুটো ঘোড়া নিয়ে। কুটিরের ভিতরে ঢুকে বেরিয়ে এল জেজেবেলকে সঙ্গে নিয়ে।

হঠাৎ 'বন্দুকবাজ' ড্যানি প্যাট্রিকের মাথার মধ্যে একটা অদ্ভুত খেলা শুরু হয়ে গেল। সব কথা মনে পড়ে গেল। জেজেবেলকে দেখামাত্রই তার স্মৃতি ফিরে এল।

উঠে দাঁড়িয়ে সেও পাহাড়ের ধার ধরে ছুটতে লাগল দুই অশ্বারোহীর সমান্তরালে থেকে। গোধূলি নেমে এসেছে। একটু পরেই অন্ধকার হবে। সব ক্লান্তি ভুলে সে ছুটতে লাগল। তবু এক সময় ঘন অন্ধকারে তারা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেল।

ওদের ধরতে হবে—ধরতে হবেই। হোঁচট খেতে খেতে সে ছুটে চলল। বার বার বলতে লাগল, বেচারি খুকি! বেচারি খুকি! ঈশ্বর! আমার সহায় হও।

রাত নেমেছে। লেডি বারবারা কলিস ও লাফায়েত স্মিথকে নিয়ে অরণ্যরাজ টারজন চলেছে মিডিয়ান দেশের উপত্যকা পেরিয়ে। কিন্তু জেজেবেল ও 'বন্দুকবাজ'এর কোন চিহ্নই খুঁজে পাচ্ছে না।

সঙ্গী দুটি ক্লান্তির শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে। কিন্তু কেউই টারজনকে সে কথা বলে নি, কারণ তারা জানে, তাতে জেজেবেল ও ড্যানির অনুসন্ধানে বাধা পড়বে।

হোঁচট খেতে খেতে লেডি বারবারা একবার মাটিতে পড়ে গিয়ে অস্ফুট চীৎকার করে উঠল। তা শুনে পিছন ফিরে তাকে ঐ অবস্থায় দেখে টারজন ঘুরে এসে তাকে কোলে তুলে নিল।

বলল, আর বেশী দূর নয়।

শিবিরের প্রান্তে গিয়ে টারজন দাঁড়িয়ে পড়ল।

কয়েকজন অস্কারি ছিল পাহারায়। তাদের সঙ্গে কিছু কথা বলে টারজন লেডি বারবারাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল, ওদের বলে দিলাম, তাদের বাওয়ানাকে যেন বিরক্ত না করে। এখানে একটা বাড়তি তাঁবু আছে; লেডি বারবারা সেটাতে থাকতে পারবে। সর্দার নিজেই স্মিথের থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। এখানে তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। ওরা বলছে ওদের বাওয়ানা লর্ড পাস্‌মোর। সেই তোমাদের রেল-স্টেশনে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে। আপাতত আমি চললাম তোমাদের বন্ধুদের খোঁজে।

কথা শেষ হল। তারা মৌখিক ধন্যবাদ জানাবার আগেই টারজন রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ওদিকে স্তাবুচ ও জেজেবেল সারা রাত ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। স্তাবুচ পথ হারিয়ে নাস্তানাবুদ।

ভোরের দিকে একটা বনের প্রান্তে তারা থামল। স্তাবুচের আর চলবার শক্তি নেই। ঘোড়া থেকে নেমে বলল, একটু না ঘুমিয়ে পারছি না।

জেজেবেলও ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়া দুটোকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে মাটিতে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল স্তাবুচ। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

দূরে পাহাড়ের মাথায় পূবের আকাশে আলো ফুটছে। স্তাবুচ ঘুম থেকে উঠে বলল, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। তুমি ঐ গাছটাতে উঠে বস। আমি বনের মধ্যে ঢুকে দেখি শিকার পাই কি না।

জেজেবেল গাছে চড়ে বসল; স্তাবুচ শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে গেল।

একটা ছোট হ্রদ দেখতে পেয়ে স্তাবুচ একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। কোন জন্তু জল খেতে এলেই তাকে গুলি করবে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। হঠাৎ একটা প্রাণী এসে আবির্ভূত হল হ্রদের অপর তীরে।

স্তাবুচের শয়তানী চোখ দুটি সংকুচিত হল। এই তো সেই লোক যাকে খুন করতে সে মস্কো থেকে এত দূরে এসেছে। সুবর্ণ সুযোগ! ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

হাতের রাইফেল তুলে খুব সাবধানে তাক করল। ঝোপের আড়াল পড়ায় টারজন বন্দুকের নলটা দেখতে পেল না।

স্তাবুচ বুঝতে পারল, উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছে। শিকারও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখনি গুলি করতে হবে। লোকটা তো চিরকাল একভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না। সে ঘোড়ায় আঙুল রাখল।

রাইফেল গর্জে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিকার এক-লাফে একটা নীচু ডাল ধরে মুহূর্তের মধ্যে পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্তাবুচ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

এবার সে ভয় পেল। ছুটে পালিয়ে গেল। মন থেকে মুছে গেল সুন্দরী জেজেবেল। এখন চাচা আপন প্রাণ বাঁচা!

বনের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ বাহুতে

একটা যন্ত্রণা বোধ করায় তাকিয়ে দেখল একটা তীরের পালক-লাগানো দিকটা বাহুর সঙ্গে ঝুলছে।

তীরটা বাহুতে বিঁধে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে আরও জোরে ছুটতে লাগল। মাথার উপরেই রয়েছে তার যম!

আর একটা তীর এসে বিঁধল তার অপর বাহুর মাংস-পেশীতে। আতংকে ও যন্ত্রণায় স্তাবুচ নতজানু হয়ে বসে পড়ল। দুই হাত তুলে বলল, বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও। আমি তোমার কোন ক্ষতি করি নি।

আর একটা তীর সোজা এসে তার গলায় বিঁধে গেল। আর্তনাদ করে সেটাকে চেপে ধরে স্তাবুচ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

অরণ্যরাজ টারজন নীরবে গাছ থেকে নেমে মুমূর্ষু লোকটির দিকে এগিয়ে গেল। যন্ত্রণায় কাৎড়াতে কাৎড়াতে স্তাবুচ পাশ ফিরেই ধনুর্ধর টারজনকে দেখতে পেল। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে এতদূর এসেছে সেটা সম্পূর্ণ করার জন্য সে কোমরের রিভলবারটার দিকে হাত বাড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যরাজের হাত থেকে ছুটে এল আর একটা তীর। বিদ্ধ হল স্তাবুচের বুকে। হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হল। একটা আর্তনাদও ফুটল না মুখে। লিও স্তাবুচের মাথাটা ঢলে পড়ল। মুহূর্ত-কাল পরে একটি গোরিলা মানুষের বিজয়-হুংকার জঙ্গলের মধ্যে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

সেই হুংকার শুনে জেজেবেলের বুকটা কেঁপে উঠল। সভয়ে গাছ থেকে নেমে সে ছুটতে শুরু করল। কোথায় চলেছে তা জানে না—তার একমাত্র লক্ষ্য এই নির্জনতার আতংক থেকে দূরে চলে যেতে হবে।

দিনের আলোয় "বন্দুকবাজ" দেখল কাছেই একটা বন। সারারাত ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ কানে আসে নি। এখন দিনের আলোয় চারদিকে ভাল করে তাকাল। স্তাবুচ ও জেজেবেলের চিহ্ন নেই।

সব ক্লান্তি ভুলে আবার সে উত্তর দিকে ছুটতে লাগল। হয় তো এখনও জেজেবেলকে বাঁচাতে পারবে।

একটু পরেই সিংহটা থমকে দাঁড়িয়ে উত্তর-পূর্ব দিকের ঢাল বেয়ে নেমে গেল। ড্যানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। নিজের জন্য নয়—জেজেবেলের নিরাপত্তার আশায়।

দূর থেকে একটা গুলির আওয়াজ কানে এল। স্তাবুচের রাইফেলের শব্দ। "বন্দুকবাজ" আরও জোরে পা চালিয়ে দিল। কয়েক মিনিট পরেই কানে এল রুশীয়টির আর্তনাদ, আর পরক্ষণেই ভেসে এল টারজনের বিজয়-হুংকার।

নতুন করে বনের দিকে এগোতে গিয়েও হঠাৎ সে থেমে গেল। বন-বাদাড় ভেঙে কে যেন ছুটে আসছে। দেখা দিল সেই ছুটন্ত মূর্তি।

তার সামনে লাফিয়ে পড়ে ড্যানি চেঁচিয়ে ডাকল, জেজেবেল! তার গলা আবেগে কাঁপছে।

আর্তনাদ করে মেয়েটি থেমে গেল। ড্যানি! উত্তেজনায় তার স্নায়ুর সব শক্তি উবে গেল। মাটিতে বসে পড়ে পাগলের মত কেঁদে উঠল।

"বন্দুকবাজ"ও কয়েক পা এগিয়ে টলতে টলতে বসে পড়ল। তারপরই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। তার চোখ ফেটে জল এল। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে সেও ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

তারা যখন গল্পে মত্ত, অরণ্যরাজ টারজন তখন বন ছেড়ে তাদের খোঁজে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ওদিকে দিন হতেই একশ' ডাকাত ঘোড়ায় চেপে গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়ল। কাপিয়েত্রর মৃতদেহ দেখে বুঝতে পারল যে কশীয়টি তাদের ধোঁকা দিয়ে সর্দারকে মেরে পালিয়ে গেছে।

দূর থেকে টারজনকে দেখতে পেয়ে হুংকার ছেড়ে ডাকাত-সর্দার জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বাকি দলটাও হৈ-হৈ রবে তার পিছু নিল।

টারজন বুঝতে পারল, পাহাড়ে উঠবার আগেই ওরা তাকে ধরে ফেলবে। তবু সে সমান বেগে ঘোড়া ছোটাতে লাগল।

অসংখ্য চীৎকার করতে করতে ডাকাতদল ধেয়ে আসছে। সকলের আগে সর্দার।

ডাকাতদের অর্ধবৃত্ত পূর্ণ হয়ে এল। টারজন তীরের পর তীর ছুঁড়ছে। তূণ শূন্য হয়ে গেল। আর তীর নেই। ডাকাতরা তাকে ঘিরে ধরল।

পিছন থেকে একজন চীৎকার করে উঠল, মেরো না! ও যে অরণ্যরাজ টারজন। ওর জন্য অনেক টাকা মুক্তি-পণ মিলবে।

অনেক প্রাণের বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত ডাকাতরা টারজনকে বন্দী করল। হাত-পা বেঁধে তাকে একটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিল। চার ডাকাত তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল গ্রামে। বাকিরা স্তাবুচ ও জেজেবেলের খোঁজে এগিয়ে গেল।

জেজেবেল ও "বন্দুকবাজ" হাতে হাত ধরে এগিয়ে চলেছে।

ড্যানি বলল, আশ্চর্য এই দুনিয়া। ভাব তো জাহাজে যদি স্মিথের সঙ্গে আমার দেখা না হত তাহলে তোমার সঙ্গেও এখানে আমার দেখা হত না। সেই থেকেই তো শুরু। একটু থেমে আবার বলতে লাগল, এখান থেকে আমরা এমন কোথাও চলে যাব যেখানে কেউ আমাদের চেনে না। নতুন করে জীবন শুরু করব। একটা গ্যারেজ নেব, অথবা একটা ফিলিং-স্টেশন; আর একটা ফ্ল্যাট। গীজ, সেখানে তোমাকে এমন সব জিনিস দেখাব যা কোন দিন চোখে দেখ নি—মুভি, বেল, জাহাজ! গীজ! তুমি তো কিছুই দেখ নি। আর আমি ছাড়া দেখাবেই বা কে?

জেজেবেল বলল, সত্যি ড্যানি, কী যে ভাল লাগছে!

ভেসে এল রাইফেলের গর্জন। চমকে জেজেবেল বলল, ওটা কি?

কোথাও লড়াই হচ্ছে। চল, লুকিয়ে পড়ি, বলে জেজেবেলের হাত ধরে ড্যানি একটা ঝোপের ভিতরে ঢুকে গেল। আরও কাছে এগিয়ে এল ডাকাতদলের অশ্বক্ষুরের শব্দ। তাদের পাশ দিয়েই ডাকাতরা একে একে ছুটে গেল। হঠাৎ এক ডাকাতের চোখ পড়ল তাদের উপর। তার চীৎকারে অন্য ডাকাতরা ঘুরে এসে দুজনকে ঘিরে ফেলল।

বেচারি "বন্দুকবাজ"! বেচারি জেজেবেল! বড় ক্ষণস্থায়ী তাদের সুখের জীবন। আবার তারা বন্দী হল। দুই কালা শয়তানের পাহারায় দুজন এগিয়ে চলল গ্রামের দিকে।

অন্ধকার কুটিরে টারজন প্রাণপণে বন্ধন-মুক্তির চেষ্টা করে চলেছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তার কপালে।

অবশেষে চেষ্টা সফল হল। বেড়ির ভিতর দিয়ে একটা হাত গলে বেরিয়ে এল। তারপর বাকি বেড়ি খুলতে দেরী হল না। টারজন মুক্ত হল।

নীচু গলায় গর্জন করে সে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে এগিয়ে গেল। উঠোনে ডাকাতরা বসে আছে।

টারজন এক লাফে পাঁচিলে উঠে গেল। কয়েকটা গুলি ছুটে এল তাকে লক্ষ্য করে; তত-ক্ষণে সে লাফিয়ে ও-পারে পড়েই রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

জেজেবেল দাঁত দিয়ে ড্যানির হাতের বাঁধন কেটে দিল। দুজনেই উঠে দাঁড়াল।

বাঁচা গেল, বলে উঠল বন্দুকবাজ।

এবার মুক্তি, বলল জেজেবেল।

কি মনে পড়ায় "বন্দুকবাজ" বলল, প্রথমেই দেখতে হবে আজ আমি কিসের উপর শুয়েছিলাম। কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছিল।

কুটিরের এককোণে রাখা ছেড়া কম্বলগুলো হাতড়ে একটু পরেই সে উঠে দাঁড়াল। একহাতে টমসন মেসিনগান ও রিভলবার, অন্য হাতে একটা খাপ ও বেল্ট।

ঠিক সেই মুহূর্তে ভেসে এল বহু কণ্ঠের হুংকার ও ফটকে পাহারারত শাস্ত্রীর রাইফেল থেকে গুলির শব্দ। অস্পষ্ট দিনের আলোয় সে দেখতে পেয়েছে একটা শত্রু-বাহিনী নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে গ্রামের দিকে।

দরজার কাছে ছুটে এসে বাইরে তাকিয়ে ড্যানি প্যাট্রিক অবস্থা কিছুটা বুঝতে পারল। দু'পক্ষ

থেকেই গুলি-বিনিময় চলছে। কিন্তু সে বুঝতে পারল না—ডাকাতদলের এই শত্রু কারা।

ফটকে অনেক ডাকাত জমায়েত হয়েছে। দূরের শত্রুপক্ষকে লক্ষ্য করে তারা রাইফেল চালাচ্ছে। "বন্দুকবাজ" হাঁটু গেড়ে বসে মেসিনগান কাঁধে তুলে নিল। ডজনখানেক ডাকাত মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল।

সামনে-পিছনে দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে বাদবাকি ডাকাতরা রাইফেল ফেলে দিয়ে আত্ম-সমর্পণ করল।

"বন্দুকবাজ" ও জেজেবেলকে অক্ষতদেহে দেখতে পেয়ে টারজন তাদের সাদর সম্ভাষণ জানাল। ড্যানি বলল, ভাগ্যিস ঠিক সময়ে তুমি এসে পড়লে। কিন্তু তোমার এই বন্ধুরা কারা? এদের কোথায় পেলে?

ওরা সবাই আমার লোক।

"বন্দুকবাজ" সোৎসাহে বলে উঠল, বহুৎ আচ্ছা! কিন্তু বুড়ো স্মিথকে দেখেছ কি?

সে আমার শিবিরে নিরাপদেই আছে।

আর বারবারা? সে কোথায়?

সে স্মিথের সঙ্গেই আছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের সঙ্গে দেখা হবে।

ডাকাতদলের বন্দীদের সঙ্গে কথা বলতে টারজন সেইদিকে চলে গেল।

বন্দীদের নানা দলে ভাগ করে তাদের একজন করে দলপতি স্থির করে টারজন সকলকে যার যার গাঁয়ে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল। গালাদের নেতৃত্বে বন্দী ডাকাতদের পাঠানো হল আবিসিনিয়ার পথে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রামটা খালি হয়ে গেল। গ্রামের নানান অঞ্চলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডুলি পাকিয়ে উঠতে লাগল নীল আকাশের দিকে। নানা দলে ভাগ হয়ে বন্দীরা সকলেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত। যাবার আগে সব দলপতি অরণ্যরাজের সম্মুখে নতজানু হয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাল।

লাফায়েত স্মিথ ও লেডি বারবারার বিস্মিত চোখের সামনে লর্ড পাস্‌মোরের শান্ত শিবিরটি কর্ম-কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল। সারাটা দিন সৈনিকরা তৈরী হয়ে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে রইল। সে অপেক্ষা চলল রাত পর্যন্ত। সর্বত্র চাপা উত্তেজনা। শিবিরে আগেকার মত গান নেই, হাসি নেই। যোদ্ধারা বসে আছে আগুনের ধুনিকে ঘিরে। হাতে-হাতে রাইফেল মজুদ।

ডাক এল অনেক রাতে। কালো কালো মানুষগুলোর ছায়া মিলিয়ে গেল জঙ্গলের অন্ধকারে। মাত্র চারজন রইল পাহারায়, আর রইল দুই সাদা অতিথি।

সকালে তাঁবু থেকে বেরিয়ে লেডি বারবারা দেখল, শিবির প্রায় পরিত্যক্ত। আছে শুধু রাঁধুনি ছোকরা আর তিনটি কালা আদমি।

দিন গড়িয়ে বিকেল হল। অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটল না। লর্ড পাস্‌মোর বা তার যোদ্ধারা কেউ ফিরল না।

হঠাৎ ছোকরাটি উঠে দাঁড়িয়ে কান পাতল। বলে উঠল, ওরা আসছে।

ক্রমে সৈন্যদের পায়ের শব্দ স্পষ্টতর হল। সেদিকে তাকিয়ে লাফায়েত স্মিথ উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠল, ঐ তো "বন্দুকবাজ"! সঙ্গে জেজেবেল। কী আশ্চর্য! ওরা দুজন একসঙ্গে।

লেডি বারবারা চীৎকার করে বলল, সঙ্গে আবার অরণ্যরাজ টারজন! সেই ওদের দুজনকে উদ্ধার করেছে।

অবশেষে চারজনকে মিলিত হতে দেখে টারজনের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলে গেল।

লেডি বারবারা বলল, বড়ই দুঃখের কথা যে এই সুখের ক্ষণে লর্ড পাস্‌মোর এখানে নেই।

আছে, বলল টারজন।

চারদিকে তাকিয়ে লেডি বারবারা প্রশ্ন করল, কোথায়?

আমিই লর্ড পাস্‌মোর, টারজন জবাব দিল।

তুমি?

হ্যাঁ। কাপিয়েত্র ও তার দলবলের কথা শুনেই আমি এই ভূমিকাটি নিয়েছিলাম। আমি জানতাম কাপিয়েত্রর দল আমার শিবিরও আক্রমণ করতে আসবে।

"বন্দুকবাজ" বলে উঠল, গীজ! ব্যাটারা নিশ্চয় জোর ঠেঙানি খেয়েছে।

লেডি বারবারা হেসে বলল, তাই আমাদেব আশ্রয়দাতা লর্ড পাস্‌মোবকে কখনও চোখে দেখতে পাই নি।

টারজন বলল, আমি কিন্তু তোমাদের কাছাকাছিই ছিলাম। তোমাব বন্ধুদের খুঁজতে গিয়ে নিজেই বন্দী হয়েছিলাম। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সব বিপদ কেটে গেছে।

ড্যানি বলে উঠল, আমরা কালিফোর্নিয়ায় ফিরে যাচ্ছি। সেখানে একটা গ্যারাজ ও ফিলিং-স্টেশন কিনব।

আমবা ? লেডি বারবারা প্রশ্ন করল।

নিশ্চয় ; আমি আব জেজ, ড্যানি বলল।

সত্যি ? লেডি বারবাবা উচ্ছ্বসিত। ও কি সত্যি বলছে জেজেবেল ?

সবই ও. কে., স্বর্ণকেশিনী উত্তর দিল।

যে গল্পটা আমি বলতে যাচ্ছি সেটা যদি দুটি নির্দিষ্ট ইওরোপীয় রাষ্ট্রের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত তাহলে তার ফলে মহাযুদ্ধের চাইতেও ভয়ংকর আর একটা যুদ্ধ বেধে যেতে পারত। কিন্তু তা নিয়ে আমার কোনরকম মাথাব্যথা নেই। আমার কথা হচ্ছে, গল্পটা খুব ভাল আর এই কাহিনীর অনেকগুলি রোমহর্ষক অধ্যায়ের সঙ্গে অরণ্যরাজ টারজন খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

আফ্রিকার জঙ্গলে পাকাপোক্তভাবে গড়া একটা ছোটখাট শিবির। অনেক কালো মানুষ গোমাঙ্গানি অর্থাৎ নিগ্রো আর কিছু সাদা মানুষ অর্থাৎ টারমাঙ্গানি সেখানে বাস করে। তারা বেশ কিছুদিন এখানে আছে। মনে হচ্ছে আরও কিছুদিন থাকবে। সাদা মানুষদের জন্য চারটে তাঁবু আর আরবদের জন্য 'ব্যেট'গুলো বেশ সুন্দরভাবে শৃংখলার সঙ্গে সাজানো; তার পিছনে আছে স্থানীয় গাছ-গাছালি দিয়ে তৈরী নিগ্রোদের চালাঘর।

একটা 'ব্যেট' এর সামনে খোলা জায়গায় বসে জনাকয় বেদুইন তাদের প্রিয় কফি খাচ্ছে : আর একটা তাঁবুর সামনে গাছের ছায়ায় বসে চারজন সাদা মানুষ তাস খেলছে ; চালাঘরে একদল দীর্ঘদেহী গালা যোদ্ধা 'মিংকালা' খেলছে ; অন্য জাতির কালা মানুষরাও সেখানে আছে—পূর্ব আফ্রিকার ও মধ্য আফ্রিকার মানুষদের সঙ্গে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কিছু পূর্ব উপকূলের নিগ্রো অধিবাসী। তাদের সঙ্গে এত বেশী রাইফেল আছে যে মনে হয় বুঝি তাদের প্রত্যেকের জন্যই একটা করে রাইফেল আছে।

একটা পাগড়ি-বাঁধা কালো পূর্ব-ভারতীয় মানুষ তাঁবুর সামনে পা ভেঙে বসেছিল। তার চোখ রয়েছে কিছু দূরের আর একটা তাঁবুর দিকে। একটু পরেই একটা মেয়ে যখন সেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল, তখনই রঘুনাথ জাফর উঠে তার দিকে এগিয়ে গেল। মিষ্টি হেসে তাকে কি যেন বলল। মেয়েটি উত্তর দিল, কিন্তু হাসল না। তারপরই যারা তাস খেলছিল মেয়েটি তাদের দিকে এগিয়ে গেল।

একটি পরিষ্কার মুখ বড়সড় লোক বলে উঠল, হেলো জোরা! ভাল ঘুম হয়েছে তো?

মেয়েটি বলল, তাতো হয়েছে কমরেড; কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে বিরক্তি ধরে গেল। এভাবে অকর্মার মত তো আর বসে থাকা যায় না।

যা বলেছ। আমারও সেই দশা।

রঘুনাথ জাফর শুধাল, কম্যাণ্ডার জাভেরি মার্কিনী লোকটির জন্য তুমি আর কতদিন অপেক্ষা করবে?

বড় কর্তাটি কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, তাকে আমার দরকার। বংশজাত ধনী মার্কিনীটিকে আমাদের কাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রাখার নৈতিক সুবিধার কথা চিন্তা করেই তার জন্য অপেক্ষা করাটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছি।

মেক্সিকোবাসী কৃষ্ণকায় যুবক রোমেরো বলল, এই লোকগুলি সম্পর্কে আমি কিন্তু সর্বদাই সন্দিহান। পুঁজিবাদই তাদের একমাত্র ভরসা। মনে-প্রাণে তারা সর্বহারাদের ঘৃণা করে, ঠিক যেমন আমরা তাদের ঘৃণা করি।

জাভেরি তবু বলল, এ লোকটি একটু স্বতন্ত্র মিগুয়েল। সে পুরোপুরিভাবেই আমাদের দলে এসে গেছে।

যে লোকটি এখনও জমায়েতে হাজির হয় নি তার সম্পর্কে এই সব কথা শুনে জোরা ড্রিনের ঠোঁট ঈষৎ ঘৃণায় বেঁকে গেল।

বেলা গড়িয়ে এল।

আর একটা দলের আগে আগে হাঁটতে হাঁটতে একটি যুবক মাথাটা খাড়া করে কান পাতল। বলল, এত দূরে তো নয় টনি।

না স্যার, আরও অনেক কাছে, ফিলিপিনোটি উত্তর দিল।

যুবকটি বকুনির সুরে বলল, অন্য সকলের সঙ্গে দেখা হবার আগেই ওই 'স্যার' কথাটা তোমাকে ছাটাই করতে হবে টনি।

ফিলিপিনোটি মুচকি হেসে বলল, ঠিক আছে কমরেড। সকলকেই আমি 'স্যার' বলি তো, তাই ওটা পাল্টানো একটু শক্ত।

তাহলে তো তুমি খুব সাচ্চা লাল হতে পার নি টনি।

ফিলিপিনোটি এবার জোর গলায় বলল, আমি নিশ্চয় সাচ্চা লাল। না হলে এখানে এসেছি কেন? তুমি কি মনে কর সিংহ, পিঁপড়ে, সাপ, মাছি ও মশায় ভর্তি এই নিষিদ্ধ দেশে আমি বেড়াতে এসেছি? না, আমি এসেছি ফিলিপিনের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে।

অপরজন গম্ভীর গলায় বলল, কিন্তু তুমি এখানে আসায় ফিলিপিনের মানুষ স্বাধীন হবে কেমন করে?

এণ্টনিও মোরি মাথা চুলকে বলল, তা জানি না; তবে এর ফলে আমেরিকার বিপদ হবে।

নতুন দিন দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে শিবির-বাসীদের মধ্যেও দেখা দিল নতুন কর্মব্যস্ততা।

একটা ফোল্ডিং ক্যাম্প-টেবিলে বসে জাভেরি সহকারীদের নির্দেশ দিচ্ছে; জোরা ও রঘুনাথ জাফরের সাহায্যে সারিবদ্ধ সশস্ত্র মানুষগুলির হাতে গুলি-গোলা তুলে দিচ্ছে। শেখ আবু বতন তার রোদে-পোড়া সৈনিকদের নিয়ে দূরে বসে আছে।

জোরা বলল, শিবির পাহারা দেবার জন্য কত-জনকে রেখে যাচ্ছ?

জাভেরি জবাব দিল, তুমি ও কমরেড জাফর এখানেই থেকে যাবে। শিবিরের রক্ষী হিসাবে তোমার ছেলেরা থাকবে; তাছাড়া দশজন আস্কারিও এখানে থেকে যাবে।

মেয়েটি বলল, তাই যথেষ্ট। এখানে কোন বিপদ নেই।

জাভেরি বলল, না। এখন নেই, তবে সেই টারজন এসে পড়লে ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াবে। তবে আমি শুনেছি সে নাকি অনেক দিন এদেশে নেই। আকাশপথে কি একটা অভিযানে

বেরিয়েছে। সেই থেকে তার কোন খবরই নেই। প্রায় নিশ্চিত যে সে মারাই গেছে।

শেষ কালো মানুষটির হাতে গুলি গোলা পৌঁছে দেওয়া হয়ে গেলে কিটেম্বো তার স্বজাতীয়দের কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নীচু গলায় কি যেন বোঝাতে লাগল। তারা সকলেই বাসোম্বা ; তাই তাদের সর্দার কিটেম্বো তাদের ভাষাতেই কথা বলছে।

জোরা ড্রিনভ তাদের যাত্রার পথের দিকেই তাকিয়ে আছে। যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ জোরার দুটি সুন্দর চোখের তারা স্থিরনিবদ্ধ হয়ে রইল পিটার জাভেরির উপর। ধীরে ধীরে নদীর পথটা ধরে চলতে চলতে সে অন্ধকার বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জাভেরি দলবল নিয়ে চলেছে ওপার-এর পথে

কিটেম্বো সব সাদা মানুষকেই ঘৃণা করে। স্মরণাতীতকাল থেকে বৃটিশরা এসে তাদের দেশকে অধিকার করেছে।

কিটেম্বো সর্দার অসভ্য, নিষ্ঠুর, বিশ্বাসহন্তা ; তার কাছে সব সাদা মানুষই অভিশাপস্বরূপ। তবু জাভেরির সঙ্গে যোগাযোগটাকে সে বৃটিশদের উপর প্রতিশোধ নেবার একটা সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাই সে, তার স্বজাতিদের অনেককে এনে জাভেরির অভিযানে নাম লিখিয়েছে, কারণ জাভেরি তাকে কথা দিয়েছে বৃটিশদের চিরদিনের মত এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে এবং আবার কিটেম্বোকে সগৌরবে তার আসনে বসাবে।

আজকের এই মনোরম সকালে এমনি একটি দলই যাত্রা করেছে রহস্যময় ওপার-এর রত্ন-ভাণ্ডার লুঠ করার আশায়।

ষড়যন্ত্রকারীদের মূল দলটার সঙ্গে তাড়াতাড়ি মিলিত হবার আশায় ওয়েনি কোল্ট তার লোকজনদের তাড়া দিচ্ছে দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হতে। পাছে অধিক সংখ্যায় এক সঙ্গে আফ্রিকায় ঢুকলে সকলের মনোযোগ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাই প্রধান ষড়যন্ত্রকারীরা ভিন্ন ভিন্ন পথে আফ্রিকায় ঢুকেছে। কোল্ট নেমেছে পশ্চিম উপকূলে। সেখান থেকে কিছুটা পথ ট্রেনে গিয়ে তারপর চলেছে পদব্রজে। স্বভাবতই অন্য প্রধান ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে মিলিত হতে সে খুবই ইচ্ছুক হয়ে পড়েছে। কারণ একমাত্র পিটার জাভেরি ছাড়া আর কারও সঙ্গে তার পরিচয় নেই।

ইওরোপের শান্তিকে বিঘ্নিত করা এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করাই যাদের লক্ষ্য সে রকম একটি

অভিযাত্রী দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার মধ্যে যে প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি আছে মার্কিন যুবকটি তা ভাল করেই জানে। তবু যৌবনের উৎসাহ দমিয়ে রাখতে পারে নি।

উপকূল থেকে একঘেয়ে দীর্ঘ যাত্রাপথে তার একমাত্র সঙ্গী ছেলেমানুষ টনি। ফিলিপিনের স্বাধীনতা সম্পর্কে তার ধারণা খুবই অস্পষ্ট। অর্থ-নৈতিক বিপ্লবের ফলে একদিন না একদিন ফোর্ড বা রক্‌ফেলারের সম্পত্তির অংশীদার হয়ে সেও ভাল ভাল পোশাকপত্র কিনতে পারবে এই স্বপ্নেই সে বিভোর।

কোল্টরা চলেছে তো চলেছে। তারা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে নি যে তাদের মাথার উপরকার বৃক্ষ-পথে চলেছে এক অরণ্য-দেবতা এপোলো, আর তার কাঁধে বসে অবিরাম কিচির-মিচির করছে একটা ছোট বানর। গাছের উপর দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ-ই এই সাদা মানুষটি টারজনের চোখে পড়ে যায়। তখনই তার মনে হয়, যে নবাগত মানুষদের মূল শিবিরের খোঁজে সে চলেছে এই যুবকটিও হয়তো সেই দিকেই যাচ্ছে; আর তাই ধৈর্যের সঙ্গে সে এই যুবকটিকে অনুসরণ করে চলেছে।

ওদিকে রঘুনাথ জাফর চলেছে জোরা ড্রিনভের তাঁবুর দিকে। মেয়েটি খাটিয়ায় শুয়ে বই পড়ছিল। জাফর দরজায় দাঁড়াতেই তার ছায়া পড়ল বইটার উপর। মেয়েটি চোখ তুলে তাকাল।

হিন্দুটির ঠোঁটে খোসামোদের হাসি। বলল, দেখতে এলাম তোমার মাথার ব্যথাটা কেমন আছে।

মেয়েটি ঠাণ্ডা গলায় বলল, ধন্যবাদ। কিন্তু কেউ আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটালেই আমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাব।

তবু জাফর ভিতরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসল।

বলল, সকলেই চলে যাওয়ায় বড় একা-একা লাগছে।

না। আমি একাই ভাল আছি। বিশ্রাম নিচ্ছি।

জাফর বলল, তোমার মাথাব্যথাটা বড় তাড়াতাড়ি চাড়া দিয়ে উঠল। একটু আগেও তো তোমাকে বেশ তাজা ও হাসিখুশি দেখেছিলাম।

মেয়েটি কোন জবাব দিল না।

সম্ভবত তার মনের কথাটা আঁচ করেই রঘুনাথ জাফর বলল, ওয়ামালা আস্কারিদের সঙ্গে শিকারে গেছে।

আমি তো তাকে অনুমতি দেই নি, জোরা বলল।

অনুমতিটা আমিই দিয়েছি, জাফর বলল।

খাটিয়ায় উঠে বসে মেয়েটি সক্রোধে বলল, সে অধিকার তোমার নেই। তুমি বড় বেশীদূর এগিয়েছ কমরেড জাফর।

হিন্দুটি সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলল, একটু অপেক্ষা কর লক্ষ্মীটি। ঝগড়া করো না। তুমি তো জান আমি তোমাকে ভালবাসি, আর ভিড়ের মধ্যে ভালবাসা জমে না।

মেয়েটি বলল, বটে, এতদূর! জাভেরি ফিরে আসুক, তারপর এর ফয়সালা হবে।

হিন্দুটি সাগ্রহে বলল, জাভেরি ফিরে আসার অনেক আগেই আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব কেমন করে আমাকে ভালবাসতে হয়। বলেই সে পা বাড়াল। মেয়েটিও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রের খোঁজে চারদিকে তাকাল।

হিন্দুটি বলল, তুমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। তাঁবুতে ঢুকেই আমি সব কিছু দেখে নিয়েছি।

তুমি একটা পশু, জোরা বলল।

কেন এত অবুঝ হচ্ছ জোরা? ভেবে দেখ—

বেরিয়ে যাও! মেয়েটি আদেশ করল।

কিন্তু রঘুনাথ জাফর দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরল।

ওয়েনি কোল্টের গাইড কিছুটা আগে আগেই চলছিল। হঠাৎ থেমে মুখটা হাসিতে ভরিয়ে সে পিছন ফিরে তাকাল। সামনে আঙুল বাড়িয়ে বিজয়গর্বে বলল, ঐ শিবির বাওয়ানা!

সেই রকমই দেখাচ্ছে। কোল্ট ঘাড় নাড়ল। চারদিকে ঘুরে একটু দেখাই যাক। টনিকে সঙ্গে নিয়ে কোল্ট তাঁবুগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে তার নজরে পড়ল, একটা তাঁবুর মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে।

তাঁবুর ভিতরকার কাণ্ড দেখে কোল্ট তো একেবারে হা—দুটি নর-নারী মেঝেতে পড়ে ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করছে, পুরুষটি মেয়েটির গলা টিপে ধরেছে, আর মেয়েটি প্রাণপণে পুরুষটির মুখে কিল-গুঁতো মারছে।

কোল্ট জাফরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক ঝটকায় তাকে একপাশে ঠেলে ফেলে দিল। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে জাফরও এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে মার্কিন যুবকটিকে আক্রমণ করতেই সে তাকে এমন এক ঘুষি চালাল যে জাফরের মাথাটা ঘুরে গেল। আবার আক্রমণ করতেই আর এক ঘুষি পড়ল তার মুখে। এবার জাফর মাটিতে পড়ে গেল। কোন রকমে উঠে দাঁড়াতেই কোল্ট তাকে সজোরে চেপে ধরে একপাক ঘুরিয়ে পাছায় লাথি মেরে তাঁবুর দরজা দিয়ে বাইরে ঠেলে দিল। ফিলিপিনো সঙ্গীকে বলল, ও যদি আবার তাঁবুতে ঢুকতে চেষ্টা করে তো গুলি করবে টনি। তারপর মেয়েটিকে তুলে নিয়ে খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়ে কোল্ট বালতি থেকে জল এনে জোরার কপাল, গলা ও কব্জি ভাল করে মুছে দিল।

বাইরে গাছের ছায়ায় কুলি ও আস্কারিদের শুয়ে থাকতে দেখে রঘুনাথ জাফর গুটি গুটি নিজের

তাঁবুর দিকে সরে পড়ল। তার বুকের মধ্যে ক্রোধ ও খুনের নেশা টগবগ করে ফুটছে।

জোরা ড্রিনভ চোখ মেলে তাকাল। তার মুখের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে ওয়েনি কোল্ট।

কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে জোরা ড্রিনভ বলল, নিশ্চয় তুমিই সেই মার্কিন যুবক।

কোল্ট জবাব দিল, আমি ওয়েনি কোল্ট। আর তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ বলেই অনুমান করছি যে এটা কমরেড জাভেরির শিবির।

মেয়েটি মাথা নাড়ল। তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছিলে কমরেড।

সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

একটু পরে কোল্ট শুধাল, কমরেড জাভেরি কি শিবিরে নেই?

না; সে একটা ছোট অভিযানে বেরিয়েছে।

কোল্ট হেসে বলল, তাহলে তো আমাদের দুজনকে পরিচয় করিয়ে দেবার মত কেউ এখানে নেই।

জোরা বলল, আমি ক্ষমা চাইছি। আমার নাম জোরা ড্রিনভ।

আর ও লোকটা কে?

রঘুনাথ জাফর, একজন হিন্দু।

ও কি আমাদের লোক?

হ্যাঁ; কিন্তু আর থাকবে না—পিটার জাভেরি ফিরে আসার পরে তো নয়ই।

তার মানে—?

মানে পিটার ওকে খুন করবে।

কোল্ট কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, সেটাই ওর প্রাপ্য। হয়তো সে প্রাপ্যটা আমারই মিটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

মার্কিন যুবকটি তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। চোখ দুটো অর্ধেক বুজে জোরা খাটিয়াতেই শুয়ে রইল।

গাছের উপর বসে টারজন সবই লক্ষ্য করছে। অপরিচিত যুবকটির ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণ তার মনকে টেনেছে। ওদিকে রঘুনাথ জাফর যে একটা রাইফেল হাতে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল সেটাও তার দৃষ্টি এড়ায় নি।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে জাফর সোজা জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। টারজনও গাছের উপর দিয়ে তার পিছু নিল। জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে শিবিরের অধেকটা ঘুরে জাফর থেমে গেল। সেখান থেকে গোটা শিবিরটাই সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু পাতার আড়ালের জন্য তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

কোল্ট লোকজনের কাজকর্মের তদারক করছে। পথশ্রমে ক্লান্ত লোকগুলি চুপচাপ কাজ করে চলেছে। চারদিকে শান্ত নিস্তব্ধতা। হঠাৎ একটা আর্ত চীৎকার ও রাইফেলের গুলির শব্দ শুনে সে স্তব্ধতা খান্ খান্ হয়ে গেল। একটা বুলেট কোল্টের মাথার পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে পিছনে দাঁড়ানো লোকটির কানের নতি ছিঁড়ে দিয়ে চলে

গেল। সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ পড়ে গেল। কোন্ দিক থেকে গুলিটা এসেছে খুঁজতে গিয়েই কোণ্টের চোখে পড়ল জঙ্গলের ভিতর থেকে এক ঝলক ধোঁয়া উঠছে।

ঐ তো ওখানে, বলে কোণ্ট সেদিকেই ছুটে যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে আস্কারিদের সর্দারকে বলল, কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে তুমি ডান দিক থেকে এগিয়ে যাও, আর বাকিদের নিয়ে আমি এগোচ্ছি বাঁদিক থেকে।

ঠিক আছে বাওয়ানা, বলে সর্দার কিছু লোক নিয়ে এগিয়ে গেল।

কোণ্টই প্রথম দেখতে পেল—শিবিরের কাছাকাছি পড়ে আছে রঘুনাথ জাফরের মৃতদেহ। তার ডান হাতে রাইফেলটা ধরাই আছে, বুকের উপর থেকে বেরিয়ে আছে একটা তীরের কাঠি।

হিন্দুটিকে কবর দেবার নির্দেশ দিয়ে ওয়েনি কোণ্ট লোকজন নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এল।

জোরা ড্রিনভ তার তাঁবুর দরজাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি? কি হয়েছে?

রঘুনাথ জাফর খুন হয়েছে।

সব বিবরণ শুনে জোরা বলল, তাহলে তীরটা কে ছুঁড়ল?

কোণ্ট বলল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। সবই যেন রহস্যে ঢাকা।

খাবার টেবিলে বসে কোণ্ট বলল, আজ তোমার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে, অথচ তোমার তো কোনরকম ভাবান্তর দেখছি না।

জীবনে এ রকম অনেক ঝড় আমি কাটিয়ে এসেছি কমরেড কোণ্ট, কাজেই আমার মধ্যে এখন স্নায়ু বলতে কিছু নেই।

কোণ্ট এক দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। বলল, তোমাকে দেখে মনে হয় জন্মসূত্রে তুমি প্রোলেতারিয়েত নও।

আমার বাবা ছিল শ্রমিক। জারের আমলে নির্বাসনে থাকতেই তার মৃত্যু হয়। তাই তো যা কিছু রাজকীয়, যা কিছু পুঁজিবাদ সংক্রান্ত সে সবেতেই আমার এত ঘৃণা। তাই তো কমরেড জাভেরির দলে যোগ দেবার প্রস্তাব যখন এল তখন প্রতিশোধ নেবার আর একটা ক্ষেত্র আমি খুঁজে পেলাম।

কোণ্ট বলল, যুক্তরাষ্ট্রে জাভেরির সঙ্গে যখন আমার সর্বশেষ দেখা হয় তখন তার মাথায় এখনকার মত কোন পরিকল্পনা নিশ্চয় ছিল না, কারণ এ ধরনের কোন অভিযানের কথা সে তখন আমাকে বলে নি। এখানে এসে তার সঙ্গে যোগ দেবার নির্দেশ যখন পেলাম তখনও বিস্তারিত বিবরণ কিছুই আমাকে জানানো হয় নি। কাজেই তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি এখন সম্পূর্ণ অন্ধকারেই আছি।

জোরা এবার বলল, অবশ্য মোটামুটি পরিকল্পনাটা আমাদের কারো কাছেই গোপনীয় কিছু নয়। মূল পরিকল্পনাটা হচ্ছে, পুঁজিবাদী শক্তিগুলিকে এমনভাবে যুদ্ধ ও বিপ্লবের মুখে ঠেলে দিতে হবে যাতে

তারা আমাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে না পারে। আমাদের প্রেরিত প্রতিনিধিরা দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষের বিপ্লবকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে।যাতে গ্রেট বৃটেনের মনোযোগ ও সামরিক শক্তি সেই দিকে আকৃষ্ট হতে বাধ্য হয়। কিন্তু ফিলিপিনে আমাদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। চীনের অবস্থা তো তুমি ভালই জান। আমরা আশা করি, আমাদের সহায়তায় অচিরেই তারা জাপানের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে উঠবে। ইতালি একটি সাংঘাতিক শত্রু, আর প্রধানত সে দেশকে ফ্রান্সের সঙ্গে একটা যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতেই আমরা এখানে এসেছি।

কোণ্ট তবু প্রশ্ন করল, কিন্তু আফ্রিকার জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে জাভেরি ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ লাগাবে কেমন করে?

এই মুহূর্তে ফরাসী ও ইতালীয় কমরেডদের একটি প্রতিনিধিদল রোমে রয়েছে ঠিক এই কাজেরই জন্যে। ফরাসী সেনাবাহিনী কর্তৃক ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড অভিযানের পরিকল্পনা-সমন্বিত কাগজপত্র তাদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

যথাসময়ে কমরেড জাভেরির রোমস্থ জনৈক গুপ্ত সদস্য ফ্যাসিস্ট সরকারকে এই ষড়যন্ত্রের কথাটা জানিয়ে দেবে; আর প্রায় সেই একই সময়ে আমাদের অভিযানের কিছু সাদা মানুষ ফরাসী সামরিক অফিসারের ইউনিফর্ম গায়ে চড়িয়ে আমাদেরই কালো মানুষদের ফরাসী স্থানীয় সৈনিক সাজিয়ে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড আক্রমণ করবে।

কোণ্ট সোৎসাহে বলে উঠল, পরিকল্পনাটি যেমন দুঃসাহসিক তেমনি বিরাট, কিন্তু এ রকম একটা পরিকল্পনাকে সফল করতে তো প্রচুর অর্থ ও জনবলের প্রয়োজন।

মেয়েটি বলল, আমি অবশ্য সব কথা জানি না, তবে এটুকু জানি যে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজের জন্য এই যথেষ্ট অর্থ সে ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করতে পেরেছে; আর বাকি অর্থের জন্য এই অঞ্চল থেকে পাওয়া সোনার উপরেই সে নির্ভর করছে।

মাথার উপরে গাছের ডালের উপর টান-টান হয়ে শুয়ে টারজন কান খাড়া করে সব কিছুই শুনছে।

কোণ্ট আবার বলল, আচ্ছা, কথাটা যদি খুবই গোপনীয় না হয় তাহলে বলতো এত বেশী পরিমাণ সোনা কমরেড জাভেরি কোথায় পাবে বলে আশা করছে।

ওপার-এর বিখ্যাত রত্ন-ভাণ্ডারে। আশা করি তার কথা তুমিও শুনেছ।

তা শুনেছি, কিন্তু তাকে নিছক উপকথা ছাড়া আর কিছুই ভাবি নি। এ ধরনের রত্ন-ভাণ্ডারের কথা সারা বিশ্বের গ্রাম্য কাহিনীতে অনেক শোনা যায়।

কিন্তু ওপার উপকথা নয়।

মাথার উপরে টারজন নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে গেল। যাবার আগে নকিমাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল।

কোণ্ট ও জোরার কথাবার্তা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঘুরতে লাগল। একসময় টারজন আবার সেখানে ফিরে এল। এবার কিন্তু সে একা নয়।

জোরা বলল, জাফরকে কে যে মেরেছে তা হয়তো আমরা কোনদিনই জানতে পারব না।

তার কথা শেষ হবার আগেই তাদের মাথার উপরকার গাছের ডালে একটা সর্-সর্ শব্দ হল, আর তারপরেই একটা ভারী দেহ ছিটকে পড়ল দুজনের মাঝখানেব টেবিলের উপরে। টেবিলটা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল।

প্রাচীর, সুউচ্চ গৃহশীর্ষ ও গম্বুজের সারি। আফ্রিকার উজ্জ্বল সূর্যকিরণে শহরের লাল ও সোনালী গম্বুজ ও মিনারগুলি ঝকঝক করছে।

টারজন ইতিপূর্বেও আর একবার ওপারএ এসেছিল। সেবারে প্রধান পুরোহিত কাড্‌জিকে পরাস্ত করে সে লা-কে তার প্রিয় প্রজাদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল। সেবারে ওপার-এর মানুষদের বন্ধুত্বের স্মৃতি নিয়েই সে ফিরে গিয়েছিল। তারপর বেশ কিছু বছর ধরে লা-কে সে বান্ধবী বলেই জানে। সেখানে বন্ধুর সমাদর পাবার আশা নিয়েই সে ওপার-এর পথে চলেছে।
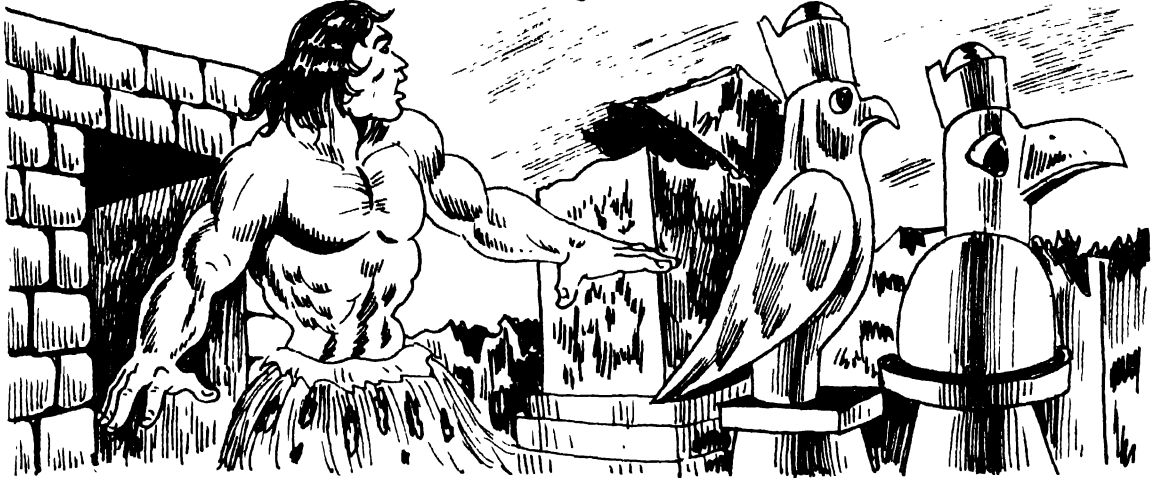
দুজনই লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কোণ্ট চকিতে রিভলবারটা বের করল, আর জোরা পিছনে সরে গিয়ে উদ্গত চীৎকারটাকে চেপে দিল। কোণ্টের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। তাদের দুজনের মাঝখানে চিং হয়ে পড়ে আছে রঘুনাথ জাফরের মৃতদহ; মৃত চোখ দুটি তাকিয়ে আছে রাতের অন্ধকারের দিকে।

টারজন ও নকিমা পাহাড়ের চূড়াকে অতিক্রম করে নির্জন উপত্যকার পথে এগিয়ে চলেছে—তাদের সামনেই দেখা যাচ্ছে প্রাচীন ওপার-এর দীর্ঘ

কাজেই নির্ভয়ে ও নিঃশংকচিত্তে সে ওপারের নিরেট পাথরেব বহিঃপ্রাচীরের ফাটলের ভিতর দিয়ে ঢুকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। সেখানে খানিকটা খোলা জায়গার ওপারে আরও একটা সংকীর্ণ পথ পার হয়ে সে একটা প্রশস্ত রাজপথে গিয়ে পড়ল। তার বিপরীত দিকেই দাঁড়িয়ে আছে ওপার-এর বিরাট মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ।

নিঃশব্দে সে মন্দিরের দরজা পার হয়ে গেল। দুই পাশে সারি সারি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভের গায়ে নানা কিম্ভূতদর্শন পাখির মূর্তি খোদাই করা।

টারজন নির্ভয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে পা রাখল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা পাকানো গদা সজোরে তার মাথায় এসে পড়ল। টারজন অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

জটা-বাঁধা চুল-দাড়িওয়ালা জনবিশেক লোক তাকে ঘিরে ফেলল। ছোট ছোট বাঁকানো পায়ে তারা এগিয়ে এল। তাদের পাট-করা দাড়ি লোমশ বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। দুর্বোধ্য ভাষায় কলরব করতে করতে তারা শক্ত বেড়ি দিয়ে টারজনের হাত-পা বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে তুলে নিয়ে আর একটা বড় ঘরে ঢুকল। মেঝেতে কয়েক ফুট উঁচু বেদীর উপরকার মস্ত বড় সিংহাসনে বসে আছে একটি যুবতী নারী।

তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল জট-বাঁধা চুল-দাড়িওয়ালা আর একটি লোক। তার হাতে-পায়ে সোনার তাগা বাঁধা, গলায় সাতনরী হার। নীচে মেঝের উপর অনেক নর-নারীর জটলা—তারা ওপার-এর অগ্নি-দেবতার সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী।

লোকগুলি টারজনকে এনে সিংহাসনের নীচে ফেলে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে চৈতন্য ফিরে আসায় টারজন চোখ মেলে চারদিকে তাকাল।

সিংহাসনের পাশে দাঁড়ানো লোকটিকে বলল, এ সবের অর্থ কি ডুথ? লা কোথায়? তোমাদের প্রধান সন্ন্যাসিনী কোথায়?

মেয়েটি ক্রুদ্ধ হয়ে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, জেনে রাখ হে বিদেশী, আমিই প্রধান সন্ন্যাসিনী। আমার নাম ওআ, অগ্নি-দেবতার প্রধান সন্ন্যাসিনী আমি।

তাকে উপেক্ষা করে টারজন আবার ডুথকে জিজ্ঞাসা করল, লা কোথায়?

ওআ রাগে জ্বলে উঠল। তার হাতের বলিদানের খড়্গের রত্নখচিত হাতলভাঙ্গা ছাদের ফাটল দিয়ে আসা সূর্যকিরণে ঝিকমিকিয়ে উঠল। লাফ দিয়ে

বেদীর শেষ প্রান্তে এসে সে চীৎকার করে বলে উঠল, সে মারা গেছে! ঠিক যেমন তুমি মারা যাবে যখন তোমার রক্ত দিয়ে আমরা অগ্নি-দেবতার পূজা করব। লা ছিল দুর্বল। সে তোমাকে ভালবেসেছিল। অথচ দেবতা তোমাকে বেছে নিয়েছিল বলি হিসাবে। কিন্তু ওআ শক্তিময়ী। টারজন ও লা তার কাছ থেকে ওপার-এর সিংহাসন চুরি করে নিয়েছিল। এবার সে তার প্রতিশোধ নেবে। ওকে নিয়ে যাও। বলির যূপকাষ্ঠে ফেলার আগে ওকে যেন আমাকে আর না দেখতে হয়।

টারজনের পায়ের বেড়ি কেটে দিয়ে তাকে নিয়ে চলল ওপার-এর অন্ধকার কারাকক্ষের দিকে। মশালের আলোয় পথ দেখে দেখে তাকে কারাকক্ষে রেখে লোকজনরা চলে গেল।

আগেও একবার টারজন এই কারাগারে ছিল;

আর পালিয়েও গিয়েছিল। কাজেই এবারও সে সঙ্গে সঙ্গে পালাবার পথ খুঁজতে শুরু করে দিল।

সে বুঝতে পারল, ঘরের একমাত্র ঘুলঘুলির ওপারের বারান্দাটাতে কোন সন্ন্যাসী পাহারায় নেই। পালাবার এই তো সুযোগ।

ঘুলঘুলিটার লোহার শিক বেঁকিয়ে টারজন লাফিয়ে পড়ল নীচের অন্ধকার বারান্দায়। ঘরের পর ঘর পার হয়ে সে এগিয়ে চলল।

টারজনের সামনে কাঠের হুড়কো দেওয়া একটা বড় দরজা। দ্রুত হাতে হুড়কোটা তুলে দরজা খুলে সে ভিতরে পা দিল।

শিবিরে আসবার পরদিন ওয়েনি কোল্ট সাংকেতিক ভাষায় একটা লম্বা চিঠি লিখে ছোকরা চাকরটাকে দিয়ে সেটা উপকূলে পাঠিয়ে দিল। নিজের তাবু থেকেই জোরা ড্রিনভ সেটা দেখতে পেল। কিছুক্ষণ পরে কোল্ট এসে হাজির হল জোরার তাঁবুর পাশে বড় গাছটার ছায়ায়।

জোরা বলল, কমরেড কোল্ট, আজ সকালেই তুমি একটা চিঠি পাঠিয়েছ।

দ্রুত চোখ তুলে কোল্ট বলল, হ্যাঁ।

তোমার জানা উচিত ছিল যে এই অভিযানে একমাত্র কমরেড জাভেরি ছাড়া আর কেউ চিঠি লিখতে পারে না।

কোল্ট বলল, আমি জানতাম না। আমি উপকূলে পৌঁছবার আগেই কিছু টাকা সেখানে এসে থাকার কথা ছিল। টাকাটা আসে নি। সেটার খোঁজ নিতেই ছোকরাকে পাঠিয়েছি।

ও, বলে জোরা চুপ করল।

বিকেলে দু'জন একসঙ্গে শিকারে বের হল। একসঙ্গে রাতের খাবার খেল। এইভাবে দিন কাটতে লাগল। তারপর একদিন উত্তেজিত কালা আদমি এসে খবর দিল, অভিযাত্রীরা ফিরে এসেছে। সকলেই বুঝল, ছোট দলটির পতাকায় জয়ের বার্তা লেখা হয় নি। নেতাদের মুখে পরাজয়ের হতাশা। জাভেরি জোরাও কোল্টের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করল।

রাতে খাবার টেবিলে বসে দু'পক্ষই তাদের অভিজ্ঞতার কথা শোনাল। রঘুনাথ জাফরের মৃত্যু, কবর দেওয়া ও তার ভৌতিক পুনরভ্যুত্থানের কাহিনী সকলকেই রোমাঞ্চিত করে তুলল।

পরদিন সকাল থেকেই ওপার-এ অভিযান পরিচ লনা নিয়ে একটা বৈঠক বসল। আলোচনায় স্থির হল, পুরো দলটাই ওপার-এর প্রাচীর পর্যন্ত যাবে; কিন্তু যোদ্ধাদের মধ্যে মাত্র দশজন সাদা মানুষদের সঙ্গে শহরে ঢুকবে।

নতুন অভিযানের উদ্যোগ-আয়োজনেই কয়েকটা দিন কেটে গেল। একদিন সকালে জাভেরি ও তার দলবল নতুন করে ওপার-এর পথে যাত্রা করল। জোরা ড্রিনভও তাদের সঙ্গে যেতে

চেয়েছিল, কিন্তু যেহেতু উত্তর আফ্রিকার অনেক এজেন্টের কাছ থেকে চিঠিপত্র আসার কথা আছে তাই তাকে শিবিরে রেখে যাওয়া হল। আবু বতনও তার সেনাদল ও কিছু চাকরবাকরসহ শিবির পাহারা দেবার জন্য রয়ে গেল।

ঘরের ভিতরে পা দিয়েই টারজন বুঝতে পারল, আবার সে বন্দী হয়েছে। এখন সে কি করবে? ভাবতে ভাবতেই ঘরের পিছন দিক থেকে চুপি চুপি পা ফেলার শব্দ তার কানে এল। খাপ থেকে ছুরি খুলে সে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। ও কার পায়ের শব্দ! নিঃশব্দে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

কে তুমি? একটি নারী-কণ্ঠের প্রশ্ন।

তুমি কোথায়? টারজনের পাল্টা প্রশ্ন।

ঘরের পিছন দিকে, স্ত্রীলোকটি জবাব দিল।

তারপর বলল, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। এ কণ্ঠস্বর আমার পরিচিত। তুমি তো অরণ্যরাজ টারজন।

টারজন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার বল তো? ওআ হয়েছে প্রধান সন্ন্যাসিনী, আর নিজের কারাগারে তুমি নিজেই বন্দী?

লা তার দুঃখের কাহিনী শোনাল। ওআ ডুথের সঙ্গে ভালবাসা করে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলে। টারজনকে ভালবাসার জন্য রাজ্যের জনসাধারণ এমনিতেই লার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এবার ওআর মিথ্যা প্রচারের ফলে সকলেই লার বিরুদ্ধে গেল। লাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে সেখানে বসাল ওআকে, আর লাকে করল বন্দিনী।

কাহিনী শেষ করে লা বলল, তুমি এসে পড়েছ; এবার আমাদের পালাতে হবে।

টারজন অসহায়ভাবে বলল, কোন্ পথে পালাব?

লা বলল, আমার ঘরের পিছনের দেয়ালে দীর্ঘকাল ধরে অব্যবহৃত একটা সুড়ঙ্গ আছে।

সেটাই আমাদের পালাবার একমাত্র পথ।

হাতে হাত ধরে দু'জন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে পা বাড়াল।

অনেক কষ্টের পথ পার হয়ে একসময় দুজনই একটা নির্জন ঘরে এসে বিশ্রাম নিল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। প্রধান সন্ন্যাসিনীর দুটি সুন্দর চোখ অরণ্য-দেবতার সুন্দর শরীরের উপর নিবদ্ধ।

একসময় লা ডাকল, টারজন!

চোখ তুলে টারজন বলল, বল লা।

আমি আজও তোমাকে ভালবাসি টারজন।

ও কথা এখন থাক।

না, আমাকে বলতে দাও। একথা বলতে আমার দুঃখই হয়, তবু এ যে এক মধুর দুঃখ—আমার জীবনের একমাত্র মধুস্বাদ।

তার কাঁধে হাত রেখে টারজন বলল, তুমি চিরদিনই আমার অন্তর অধিকার করে আছ লা। তাকে ভালবাসাও বলতে পার।

টারজন কোন জবাব দিল না। দু'জন চুপচাপ। এখন শুধু রাত নামার অপেক্ষা, যাতে সকলের অলক্ষ্যে তারা শহরে নামতে পারে। টারজনের মনে একটিমাত্র চিন্তা—কেমন করে লাকে আবার সিংহাসনে বসানো যায়।

লা বলল, অগ্নি-দেবতা যখন রাতের বিশ্রাম নিতে যায় তার ঠিক আগে সব সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা দরবার-কক্ষে সমবেত হয়। আজ রাতেই সেই সমাবেশ হবে। তখন আমরা শহরে নামতে পারব।

তারপর? টারজনের সাগ্রহ প্রশ্ন।

দরবার-কক্ষে যদি আমরা ওআকে খুন করতে পারি, সেই সঙ্গে ডুথ্‌কেও, তাহলে আর ওদের

কোন নেতা থাকবে না। আর নেতাহীন হলেই ওরা শক্তিহীন।

বেলা পড়ে এল। সূর্য নেমে এল পশ্চিম আকাশে। ক্রমে সন্ধ্যা হল। সকলের অলক্ষ্যে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে দুজন পথে নামল। সন্ন্যাসীরা টের পেয়ে হৈ-হৈ করে তাদের পিছু নিল। টারজন এবার লাকে কাঁধে ফেলে দ্রুত ছুটতে লাগল।

বাইরের জগতের অন্ধকারে ওপার-এর মানুষরা অভ্যস্ত নয়। তাই আর না এগিয়ে তারা ফিরে গেল।

টারজন লা-কে মাটিতে নামিয়ে দিল। লা কিন্তু তবু তার গলা জড়িয়ে ধরেই রইল। তার বুকের মধ্যে মুখ রেখে কেঁদে উঠল।

টারজন বলল, কেঁদো না লা। আমরা আবার ওপার-এ ফিরে যাব; তোমাকে আবার সিংহাসনে বসাব।

লা বলল, আমি সেজন্য কাঁদছি না।

তাহলে?

কাঁদছি আনন্দে, কারণ এখন আমি অনেকটা সময় তোমার সঙ্গে একলা থাকতে পারব।

একটা গাছে চড়ে তারা রাতটা কাটাল।

ভোরে প্রথম ঘুম ভাঙল টারজনের। আকাশ মেঘে ঢাকা। ঝড় উঠবে। অনেক সময় হয়ে গেল কোনরকম খাবার মুখে পড়ে নি। আগের দিন সকাল থেকে লা-ও কিছু খায় নি। অতএব সকলের আগে চাই কিছু খাবার। আর এখানে খাবার মানেই শিকার। টারজন একবার ঘুমন্ত লা-র দিকে তাকিয়ে শিকারের সন্ধানে চলে গেল।

একটা শুয়োরের রাং কেটে নিয়ে টারজন ফিরে চলল সেই গাছটার দিকে যার উপরে সে ঘুমন্ত লা-কে রেখে এসেছে। সেখানে পৌঁছে দেখল লা নেই। নাম ধরে ডাকল, সাড়া পেল না। কোথায় গেল

লা ? নিশ্চয় ওপার-এর দিকে ফিরে গেছে। সেটাই তো তার একমাত্র পরিচিত জায়গা। টারজন ভাবল, তার ফিরতে যত দেরীই হয়ে থাকুক, লা কোনমতেই তার আগে ওপার-এর পর্বত-প্রাচীরে পৌছতে পারবে না। পথেই সে তাকে ধরে ফেলতে পারবে। টারজন তাই ওপার-এর পথেই পা চালিয়ে দিল।

কিন্তু পর্বত-প্রাচীরের সানুদেশে পৌছেও তাকে দেখতে না পেয়ে সে একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠল। সেখান থেকে অনেক দূরে ওপার-কে দেখা যায়। এখানে বৃষ্টি খুব অল্পই হয়েছে। ফলে লা ও তার নেমে যাওয়ার পায়ের ছাপ বেশ স্পষ্টই চোখে পড়ছে। কিন্তু সে পথ বেয়ে উপরে ওঠার কোন পায়ের ছাপই তো দেখা যাচ্ছে না। তাহলে লা গেল কোথায় ? তবে কি সে জঙ্গলের পথ ধরেই অন্য দিকে চলে গেছে ?

দ্রুত পায়ে পাহাড় থেকে নেমে সে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল।

বনপথ ধরে কিছুদূর এগিয়েই নদীর তীরে সে একটা শিবির দেখতে পেল। তার মনে আশা জাগল, এখানে হয়তো লার দেখা মিলবে। কাঁটা গাছের বেড়া দেওয়া জায়গাটার মাঝখানে কিছু সাদা মানুষদের তাঁবু; গাছের ছায়ায় বসে কুলিরা ঝিমুচ্ছে; একটি মাত্র আস্কারি রয়েছে পাহারায়; বাকিরা রাইফেল পাশে রেখে দিবানিদ্রা দিচ্ছে। কিন্তু ওপার-এর লা-কে কোথা'ও দেখতে পাওয়া গেল না। তবে কি লা-কে কোথাও বন্দী করে রেখেছে ? কিন্তু রাতের অন্ধকারে ছাড়া তো আর সন্ধান করা যাবে না। অতএব তাকে অপেক্ষা করতেই হবে। কাছেই একটা গাছের উপরে উঠে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যাবেলা জোরার জন্য রান্না করতে করতে বাচ্চা চাকর ওয়ামালা বলল, এর আগে তোমাকে বাদামী বাওয়ানার কাছে রেখে গিয়েছিল; সে লোক

ভাল ছিল না। শেখ আবু বতনকেও আমার বিশেষ ভাল মনে হচ্ছে না। এখন বাওয়ানা কোল্ট এসে পড়লে বাঁচি।

জোরা বলল, আমারও তাই মনে হয়। ওপার থেকে ফিরে আসার পর থেকেই আরবরা যেন কেমন হয়ে উঠেছে।

ওয়ামালা বলল, সারাটা দিন তারা সর্দারের তাঁবুতে বসে ফুসুর-ফুসুর করেছে, আর আবু বতন বার বার তোমার দিকে তাকিয়েছে।

জোরা বলল, ওটা তোমার কল্পনা ওয়ামালা। এত সাহস তার হবে না।

পরমুহূর্তেই সে হঠাৎ বলে উঠল, ওদিকে দেখ ওয়ামালা। ও কে?

কালো ছোকরাটি সেই দিকে চোখ ফেরাল। শিবিরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। সুন্দরী যুবতীটি এক দৃষ্টিতে তাদের দিকেই তাকিয়ে ছিল।

ততক্ষণে কয়েকজন আরবও তাকে দেখতে পেয়ে তার দিকে ছুটে গেল। তা দেখে জোরাও দ্রুত

তার দিকে এগিয়ে গেল যাতে আরবরা তাকে ধরবার আগেই সে পৌঁছে যেতে পারে। তার মুখের হাসি দেখেই ওপার-এর লা তার মনের ভাব বুঝতে পারল।

জোরা শুধাল, তুমি কে? একা এই জঙ্গলে কি করছ?

লা মাথা নেড়ে যে ভাষায় জবাব দিল তার মাথামুণ্ডু কিছুই জোরা বুঝতে পারল না। জোরা ড্রিনভ অনেক ভাষা জানে, কিন্তু কোন ভাষাতেই কাজ হল না। আরবরা তাদের ভাষায় কথা বলল; ওয়ামালা তার ভাষায় কথা বলল। কিন্তু কোন ফল হল না। ' তখন জোরা তার গলা জড়িয়ে ধরে তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গেল। লা ইসারায় জানাল সে স্নান করবে।

আহারাদি শেষ হলে ওয়ামালা জোরার তাঁবুতেই লা-র জন্য আর একটা খাটিয়া পেতে দিল।

জোরা বলল, ওয়ামালা, আজ রাতে তুমি তাঁবুর বাইরেই শোবে। এই নাও একটা পিস্তল।

শেখ আবু বতন অনেক রাত পর্যন্ত তার তাঁবুতে বসে সর্দারদের সঙ্গে কথাবার্তার শেষে বলল, এই নতুন চিজ্‌টির জন্য যে দাম পাওয়া যাবে তেমনটি আগে কখনো মেলে নি।

ঘুম ভাঙতেই টারজন আকাশের তারার দিকে তাকাল। অর্ধেক রাত পার হয়ে গেছে। উঠে শরীরটাকে টান্ টান্ করে নীচে নেমে সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

শিবিরের সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। একটিমাত্র আস্কারি প্রহরী ধুনির পাশে বসে আছে। তার চোখের দৃষ্টিকে এড়িয়ে টারজন কুলিদের ঝুপড়ির পিছন দিয়ে ইওরোপীয়দের তাঁবুর কাছে পৌঁছে গেল। একটার পর একটা তাঁবুর পিছন দিকের দেয়াল কেটে ভিতরে ঢুকে সে লা-কে খুঁজতে লাগল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। লা-কে দেখতে পেল না। অগত্যা টারজন আবার সেই গাছেই ফিরে গেল। রাতটা সেখানে কাটিয়ে সকাল হলে আবার বেরিয়ে পড়ল লা-র সন্ধানে।

এক সঙ্গে তৈরী হয়ে এসে দু'জন প্রাতরাশ খেতে বসল তাঁবুর বাইরে গাছের ছায়ায়। ওয়ামালা পরিবেশন করল। জোরার মনে হল, শেখদের ঘরগুলোতে যেন একটা কর্মব্যস্ততা চলেছে। ব্যাপারটাকে সে কোনরকম গুরুত্ব দিল না, কারণ মাঝে মাঝেই ওরা তাঁবুগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে যায়।

প্রাতরাশের পরে জোরা তার রাইফেলটা তেল দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দুটো কালো কুলিকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে বেরিয়ে গেল। লা তাদের চলে যেতে দেখল, কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও জোরা তাকে ডাকল না বলে সে তাদের সঙ্গে গেল না।

আবু বতনের একই জাতির আর এক শেখের ছেলে ইব্‌ন দামু এই অভিযানে ইবন্ বতনের ডান হাত। দূর থেকে অনেকক্ষণ ধরেই সে মেয়ে দুটির উপর নজর রেখেছিল। একজন বন্দুকবহনকারী ও দুজন কুলিকে নিয়ে জোরাকে বেরিয়ে যেতে দেখেই সে বুঝল যে ওরা শিকারে চলে গেল।

সঙ্গী দুটিকে নিয়ে সে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর ওপার-এর লা-র তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল। তার সামনে পৌঁছে ইবন্ দামুক কি যেন বলল। উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথাটা নেড়ে লা তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ইবন্ দামুক আর একটু কাছে গিয়ে লা-র খোলা কাঁধে হাত রাখল।

লা-র দুই চোখে আগুন জ্বলে উঠল। লাফ দিয়ে সরে গিয়ে কোমরের ছুরির বাটটা চেপে ধরল। ইবন্ দামুক কয়েক পা পিছিয়ে গেল, কিন্তু তার এক সঙ্গী লাফিয়ে পড়ে তাকে ধরতে গেল।

লোকটা মহামূর্খ! লা বাঘিনীর মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বন্ধুরা বাধা দেবার আগেই লার ছুরিটা পর পর তিনবার আমূল বিদ্ধ হল তার বুকে। মরণ-আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে তার মৃতদেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সে আর্তনাদ শুনে অন্য আরবরাও ছুটে এল। লা চীৎকার করে বলল, দূরে থাক! অগ্নি-দেবতার প্রধান সন্ন্যাসিনীর গায়ে কেউ হাত তুলতে চেষ্টা করে না।

তার কথাগুলি কেউ বুঝল না, কিন্তু বুঝল তার জ্বলন্ত চোখ ও রক্তাক্ত ছুরির অর্থ। সকলেই দূরে দাঁড়িয়ে হৈ-চৈ করতে লাগল। এ সবের অর্থ কি ইবন্ দামুক? আবু বতন প্রশ্ন করল।

লোকটা ওকে স্পর্শও করে নি, অথচ—

আবু বতন বলল, সিংহিনী হলেও ওর কোন ক্ষতি করা চলবে না।

ইবন্ দামুক বলল, উল্লাহ! কিন্তু ওকে পোষ মানাতে তো হবে।

শেখ বলল, যে লোক ওর জন্য সব চাইতে বেশী স্বর্ণমুদ্রা দেবে সে কাজের ভারটা সেই নেবে। আমাদের একমাত্র কাজ ওকে খাঁচায় বন্দী করা। শোন বাছারা, ওকে ঘিরে ধরে ছুরিটা কেড়ে নাও। ভাল করে পিঠমোরা করে হাত বেঁধে ফেল। অন্য সকলে ফিরে আসার আগেই আমরা তাঁবু তুলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকব।

ডজনখানেক লোক একযোগে লা-র উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সিংহিনীর মত সেও লড়তে লাগল। ছুরির আঘাতে রক্তাক্ত হল অনেকে। আরও একটি আরবের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তবু শেষ পর্যন্ত লাকে পরাজয় স্বীকার করতে হল। ছুরিটা কেড়ে নিয়ে তার দুই হাত শক্ত করে বেঁধে ফেলা হল।

দু'জন সৈনিককে পাহারায় রেখে আবু বতন অন্য চাকরদের সঙ্গে নিয়ে যাত্রার আয়োজন করতে লাগল। ইবন দামুকের উপর জিনিসপত্র

ও খাবার-দাবার গুছিয়ে নেবার ভার দিয়ে সে নিজে গেল ইওরোপীয়দের তাঁবু লুঠ করতে। তার বিশেষ নজর জোরা ড্রিনভ ও জাভেরির তাঁবুর উপর। আশানুরূপ সোনাদানা না পেলেও জোরার তাঁবুতে একটা বাক্সের মধ্যে সে প্রচুর টাকা পেল। দূরদর্শী জাভেরি তার অর্থ-ভাণ্ডারের বেশী অংশটাই তাঁবুর মেঝেতে মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছিল। তাই সেটার খোঁজ আবু বতন পেলই না।

জোরা খুব ভাল শিকার নিয়েই ফিরে এল। তার পিছনেই রাইফেল দুটো নিয়ে আসছে ওয়ামালা। কুলিরা চলেছে শিকারের ভারী বোঝা নিয়ে। কিন্তু শিবিরে পৌছবার আগেই পথের দু'পাশের ঝোপের ভিতর থেকে আরবরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জন ওয়ামালার হাত থেকে রাইফেল দুটো ছিনিয়ে নিল। বাকিরা চেপে ধরল জোরাকে। রিভলবারটা টেনে বের করেও সে এই আকস্মিক আক্রমণকে ঠেকাতে পারল না। অচিরেই তার দুই হাত পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলা হল।

সে জোর গলায় বলল, এ সবের অর্থ কি? শেখ আবু বতন কোথায়?

লোকগুলি হো-হো করে হেসে উঠল।

আর একটু এগিয়ে শিবিরের অবস্থা দেখে সে তো স্তম্ভিত। সব তাঁবু খুলে ফেলা হয়েছে। আরবরা রাইফেল হাতে যাত্রার জন্য প্রস্তুত। তার ক্ষণপূর্বের অতিথিটিকেও হাত বেঁধে আটকে রেখেছে।

এসব কেন করেছ আবু বতন? জোরা প্রশ্ন করল।

শেখ বলল, আল্লার ইচ্ছায় আমাদের দেশকে আমরা নাস্‌রানিদের হাতে তুলে দেব না আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি।

এই নারী ও আমাকে নিয়ে কি করতে চাও?

কিছুটা পথ তোমাদের সঙ্গে করেই নিয়ে যাব। সেখানে একটি ধনী লোক বাস করে। সে তোমাদের দু'জনকেই ভাল বাড়িঘর দেবে।

তার মানে কোন কালা সুলতানের কাছে আমাদের বেচে দেবে?

শেখ কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কথাটা সেভাবে আমি বলছি না। বরং বলতে চাই, আমরা চলে গেলে তোমরা যাতে এই জঙ্গলে শুকিয়ে না মর তাই একজন ভাল বন্ধুর কাছে তোমাদের উপহার-স্বরূপ রেখে যেতে চাই।

তীব্র ঘৃণায় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জোরা বলল, আবু বতন, তুমি ভণ্ড, বিশ্বাসঘাতক।

আবু বতন বলল, খুব হয়েছে। এস হে বাছারা, আমরা যাত্রা শুরু করি।

শিবিরে স্তূপীকৃত বাড়তি জিনিসপত্রে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আরবরা দল বেঁধে চলে গেল পশ্চিমের দিকে।

সময় কাটাবার জন্য দুর্ভাগ্যের সঙ্গিনীটিকে

জোরা একটু একটু করে ইংরেজি শেখাতে শুরু করল। প্রথমে ইসারায় নানা জিনিস দেখিয়ে তার নাম বলে বলে শুরু করল। এইভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলার মত একটা চলনসই ব্যবস্থা করে ফেলল।

প্রথম দিনের পর থেকেই বন্দিনীদের হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আরব রক্ষীরা সব সময়ই তাদের চোখে-চোখে রাখে।

তারা চলতে লাগল আবিসিনিয়ার গালা অঞ্চলের ভিতর দিয়ে। কিন্তু গালা অঞ্চলের একেবারে প্রান্তে পৌঁছে বন্যায় স্ফীত একটা নদীর তীরে তারা বাধা পেল। উত্তরে মূল আবিসিনিয়ায়ও যেতে পারল না, আবার দক্ষিণে যাবারও সাহস হল না। কাজেই তারা নদীর তীরেই অপেক্ষা করতে বাধ্য হল।

পিটার জাভেরি এসে দাঁড়াল ওপার-এর প্রাচীরের সামনে। দলের আগে আগে চলেছে মিগুয়েল রোমেরো; তার ঠিক পিছনে ওয়েনি কোল্ট। আর বাকি সাদা মানুষরা রয়েছে সকলের পিছনে যাতে দরকার হলে তারা অবাধ্য কালা আদমিদের জোর করে এগিয়ে যেতে বাধ্য করতে পারে।

রোমেরো ও কোল্ট ভিতরের প্রাচীরের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাকি চারজন বাইরের প্রাচীরের ভিতর ঢুকতেই বিধ্বস্ত নগরের বিষণ্ণ নিস্তব্ধতাকে ভেঙে শোনা গেল আর্ত কণ্ঠস্বর।

উঠোনটা পার হয়ে ভিতরের প্রাচীরের দিকে এগোতেই দেয়ালের বিপরীত দিক থেকে তাদের কানে এল একটা নারকীয় হল্লা—বহুকণ্ঠের বীভৎস রণ-হুংকার আর দ্রুত পায়ের শব্দ। একটা গুলির শব্দ হল; তারপর আর একটা, আরও একটা।

রাইফেল উদ্যত করে তারা মন্দিরের দিকে পা বাড়াল। কিছুটা এগোতেই ছায়া-ঢাকা খিলান ও অসংখ্য দরজার পথে ছুটে বেরিয়ে এল একদল মানুষ। তাদের বীভৎস রণ-হুংকারে প্রাচীন নগরীর স্তব্ধতা ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে গেল।

শুরু হল লড়াই। দু'জনই গুলি ছুঁড়তে লাগল। প্রতিপক্ষের কয়েকজন আহত হল। একটা ছুটন্ত গুলি এসে কোল্টের মাথায় লাগল। ধপাস্‌ করে সে মাটিতে পড়ে গেল, আর মুহূর্তের মধ্যে ওপার-এর বেঁটে মানুষগুলো তার দেহটাকে ঘিরে ফেলল।

মিগুয়েল রোমেরো বুঝল, তার সঙ্গীর অবস্থা শোচনীয়। তার পক্ষে একাকি সঙ্গীকে উদ্ধার করার আশা সুদূরপরাহত। তাই সে চেষ্টা না করে নিজের প্রাণ বাঁচাতে সে পিছু হটতে লাগল। দুটো প্রাচীর পার হয়ে আবার সে খোলা মাঠে ফিরে এল।

প্রাচীরের ভিতর থেকে আবার শোনা গেল অসভ্যদের বিজয়-উল্লাস। জাভেরি বলল, আমিও একা ওপার দখল করতে পারব না। অতএব সকলকেই শিবিরে ফিরে যেতে হবে।

বেঁটে সন্ন্যাসীরা কোল্টকে ঘিরে ধরে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। তারপর কাঁধে তুলে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গেল।

চেতনা ফিরে এলে কোল্ট দেখল সে একটা মস্ত বড় ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছে। এটাই ওপার-মন্দিরের দরবার-কক্ষ। কোল্টের চেতনা ফিরে আসতে দেখে রক্ষীরা এক ঝট্‌কায় তাকে দাঁড় করিয়ে ওআ-র সিংহাসনের বেদীর দিকে ঠেলে দিল।

সম্মুখে সুদৃশ্য সিংহাসনে বসে আছে অপরূপ সুন্দরী এক তরুণী। তাকে ঘিরে রয়েছে প্রাচীন সভ্যতার জৌলুষের প্রাচুর্য। কিম্ভূত চেহারার লোমশ পুরুষ ও সুন্দরী-সখিদল পরিবৃত হয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে সে বসে আছে। চোখ দুটি নির্মম ও নিষ্ঠুর।

তরুণী সিংহাসনে উঠে দাঁড়াল। বন্দীর উপর স্থির দৃষ্টি রেখে কোমর থেকে ছুরি বের করে মাথার উপর তুলে হিংস্র দ্রুতকণ্ঠে কি যেন বলে গেল।

ওআ-র কথা শেষ হতেই রক্ষীরা কোল্টকে বাইরে নিয়ে গেল। বেচারা বুঝতেও পারল না যে অগ্নি-দেবতার প্রধান সন্ন্যাসিনী তাকে দিয়েছে মৃত্যুদণ্ড।

রক্ষীরা তাকে নিয়ে গেল সুরঙ্গের মুখে একটা গুহায়। লোহার গরাদ দেওয়া দরজা ও জানালা দিয়ে প্রচুর আলো বাতাস সে ঘরে ঢুকছে। কব্জির বাঁধন খুলে দিলে রক্ষীরা তাকে সেই গুহার মধ্যে রেখে চলে গেল।

ওয়েনি কোল্ট জানালা দিয়ে তাকাতেই দেখতে পেল ওপার-এর সূর্য-মন্দির। যজ্ঞ-বেদীর সিঁড়িতে অনেক রক্তের দাগ। প্রাঙ্গণে স্তূপীকৃত নর-কপাল। কোল্ট ভয়ে শিউরে উঠল। এতক্ষণে সে বুঝতে পারল, কি শাস্তি তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

হঠাৎ তার মনে হল, প্রাঙ্গণের যজ্ঞ-বেদীর দিক থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ যেন কানে এল। ভাল করে কান পাততেই বুঝতে পারল, সত্যি কে যেন আসছে। নিঃশব্দে উঠে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল। দূরাগত তারার আলোয় দেখল, প্রাঙ্গণ থেকে কে যেন তার গুহার দিকেই এগিয়ে আসছে; তবে সে মানুষ কি জন্তু তা সে ঠাহর করতে পারল না।

ওয়েনি কোল্ট তাকিয়েই আছে। মূর্তি তার গুহার দিকেই এগিয়ে আসছে। ও কি তার মৃত্যু-দূত? তাকে যজ্ঞ-বেদীতে নিয়ে যেতে আসছে? কাছে—আরও কাছে। সে এসে দাঁড়াল তার গুহার দরজার শিকের ওপারে। নরম গলায় ফিস্ ফিস্ করে কি যে বলল তার বিন্দু-বিসর্গও সে বুঝতে পারল না; শুধু বুঝতে পারল, যে এসেছে সে নারী।

কৌতূহলবশে সেও দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একটা নরম হাত এসে তাকে স্পর্শ করল পরম আদরে। প্রাঙ্গণের মাথার উপরে খোলা

আকাশ থেকে ভরা চাঁদের উজ্জ্বল জ্যোৎস্না এসে পড়েছে গুহার মুখে। শিকের ফাঁক দিয়ে মেয়েটি তাকে খাবার দিল। আর সেই সময় তার হাতটা টেনে নিয়ে তাতে ঠোঁট দুটি ছোঁয়াল।

ওয়েনি কো'ট হতবাক। সে জানত যে এই তরুণী সন্ন্যাসিনীটি প্রথম দর্শনেই তার প্রেমে পড়েছে। ওপার-এর কিম্ভুতদর্শন লোমশ পুরুষদের দেখে অভ্যস্ত তার চোখে ও মনে এই নবাগত পুরুষটি দেখা দিয়েছে দেবতার মহিমায়। তারপরই হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিঃশব্দ পায়ে মন্দিরের খিলানের অন্ধকার-পথে অদৃশ্য হয়ে গেল

মেয়েটির আনা খাবার খেয়ে কো'ট শুয়ে শুয়ে কেবলই ভাবতে লাগল, কী এক দুর্নিরীক্ষ শক্তি মানুষের সব কর্মধারাকে পরিচালিত করে। ভাবতে ভাবতে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

কো'ট ঘুমের মধ্যেই একবার নড়ে উঠে চমকে জেগে উঠল। অস্তগামী চাঁদের অলোয় দেখল, দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাঞ্ছিতা নারী। চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলে সে ভিতরে ঢুকল। কো'ট লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। নাও হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল ঘরের বাইরে।

অনেক অন্ধকার গলি-পথে ঘুরে ঘুরে ভিতরের প্রাচীরের কাছে এসে নাও আঙুল বাড়িয়ে বলল, ঐ পথে চলে যাও। নাও-র হৃদয়কে নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে। তোমাকে আর কোন দিন চোখে দেখতে পাব না, তবু সারা জীবন এই মুহূর্তটির স্মৃতি আমি বুকের মধ্যে বয়ে বেড়াব।

নাও তার খাপ-শুদ্ধ ছুরিটা কো'টের হাতে তুলে দিল। এই বিপদসংকুল পথে নিরস্ত্র যাত্রা সমীচিন নয়। ভিতরের প্রাচীরের কাছে পৌছে কো'ট একবার পিছন ফিরে তাকাল। চাঁদের আবছা আলোয় প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের ছায়ায় ছোট্ট

সন্ন্যাসিনী খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কো'ট হাত নাড়িয়ে নীরবে শেষ বিদায় সম্ভাষণ জানাল।

ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড অভিযানের চূরান্ত সাফল্যের ব্যাপারে যে আত্মবিশ্বাস পিটার জাভেরি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিল, ধীরে ধীরে সে আবার সেটা ফিরে পাচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সরবরাহ আসতে আরম্ভ করেছে; বিদ্রোহী নিগ্রোরাও অনেকটা শান্ত হয়েছে, আর তার ফলে নতুন নতুন সংগ্রামী মানুষ এসে তার দলে যোগ দিচ্ছে। জাভেরির পরিকল্পনাটা এই রকম: দ্রুত ও আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে কিছু আদিবাসী গ্রাম ধ্বংস করে ও দু'একটা ফাঁড়ি দখল করে তড়িৎ-গতিতে সীমান্ত পার হয়ে চলে আসবে, ফরাসী ইউনিফর্মগুলিকে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য বাক্সবন্দী করে রাখবে এবং আবিসিনিয়াতে রাস্‌তাকারিকে গদীচ্যুত করবে; সেখানকার দলীয় প্রতিনিধিরা আগেই জানিয়েছে যে সেখানে বিপ্লবের ভূমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। প্রতিনিধিরা আরও আশ্বাস দিয়েছে,

একবার আবিসিনিয়া দখল করে সেখানে ঘাঁটি বানাতে পারলে সমগ্র উত্তর আফ্রিকার আদিম জাতিরা দলে দলে এসে তার পতাকাতলে সমবেত হবে।

ওদিকে মার্কিন পুঁজিপতিদের লোভের সুযোগ নিয়ে সুদূর বোখারোতে বম্বার, স্কাউট ও যোদ্ধা বিমানসহ ছু-শ' বিমানের একটা বহরকে হঠাৎ পারস্য ও আরবের আকাশপথে নিয়ে আসা হবে তার আবিসিনিয়ার ঘাঁটিতে। স্থানীয় লোকদের নিয়ে যে বিরাট বাহিনী সে গড়ে তুলেছে তার সঙ্গে এই সব শক্তি মিলিত হলে গোটা পরিস্থিতি আসবে তার অনুকূলে; তার সঙ্গে যোগ দেবে মিশরের বিদ্রোহী সেনাদল। এইভাবে, ইওরোপ একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তার বিরুদ্ধে কোন সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে না, তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল হবে, আর সে হবে চিরদিনের মত অজেয়।

হয়তো এটা একটা উন্মাদ স্বপ্ন; হয়তো পিটার জাভেরি সত্যি উন্মাদ—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন্ বিশ্ব-বিজয়ী কিছুটা উন্মাদ ছিল না?

সে যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে তার সাম্রাজ্যের সীমান্ত একটু একটু করে দক্ষিণে প্রসারিত হচ্ছে। তারপর একদিন সে শাসন করবে একটা বিরাট মহাদেশ—সে হবে আফ্রিকার সম্রাট প্রথম পিটার।

একদিকে সমস্ত শিবির জুড়ে যখন চলেছে এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদগ্র কর্মব্যস্ততা, তখন ওদিকে একশ' কাল সৈনিক এগিয়ে আসছে জঙ্গলের পথে। তাদের গায়ের চামড়া মসৃণ, চকচকে; তাদের ঘুমন্ত মাংসপেশী ও সহজ পদক্ষেপ তাদের দৈহিক সক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করছে। গোড়ালিতে ও কব্জিতে তামার বালা, গলায় সিংহ বা চিতার নখের মালা, এবং সিংহ বা চিতার চামড়ার এক-ফালি কটি-বস্ত্র ছাড়া নগ্ন দেহ। প্রত্যেকের মাথায় সাদা পাখির পালক গোঁজা। কিন্তু তাদের আদিম সাজসজ্জার এখানেই ইতি, কারণ তাদের সকলেরই হাতে আধুনিক অস্ত্রের সম্ভার; স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, রিভলবার ও বুলেটভর্তি চামড়ার বক্ষবন্ধনী। একটি ছুর্ভেদ্য বাহিনী নিঃশব্দে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। তাদের দলপতির কাঁধের উপর বসে আছে একটা ছোট্ট বানর।

নদীতীরের অস্থায়ী শিবির থেকেই সুযোগ মত আলাদা আলাদা ভাবে জোরা ড্রিনভ ও ওপারের লা আবু বতনের হাত থেকে পালিয়ে গেল। ঘটনা-চক্রে একসময় আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে গেল। পথশ্রমে ক্লান্ত ওয়েনি কোল্ট ও লার সঙ্গে। ঠিক একইভাবে একদিন জঙ্গলের মধ্যে জোরা ড্রিনভের দেখা হয়ে গেল টারজনের সঙ্গে। ছুজন একসঙ্গে

চলতে লাগল। আর সেই অবস্থাতেই একদিন এক গুপ্ত আততায়ীর গুলিতে আহত হল টারজন। ফলে তারা দুজনেই ধরা পড়ল জাভেরির দলের হাতে।

পরদিন খুব সকালে অভিযাত্রী দল সারি বেঁধে শিবির থেকে বেরিয়ে পড়ল। কালা আদমিরা গায়ে চড়িয়েছে ফরাসী উপনিবেশরক্ষীবাহিনীর উর্দি; জাভেরি, রোমেরো, আইভিচ ও মোরির গায়ে ফরাসী অফিসারদের পোশাক। টারজনের সেবাশুশ্রূষার জন্য জোরা ড্রিনভ থেকে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু জাভেরির হুকুমে তাকেও দলের সঙ্গে চলতে হচ্ছে। বন্দীর দেখাশুনা এবং রেখে যাওয়া রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র পাহারা দেবার জন্য অল্প কয়েকটি নিগ্রো ও ডরস্কিকে শিবিরে রেখে যাওয়া হয়েছে।

যাত্রার ঠিক পূর্বক্ষণে জাভেরি চুপিচুপি শেষ নির্দেশ শুনিয়ে দিল ডর্‌স্কিকে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। এমন ব্যবস্থা করবে যাতে মনে হবে যে সে পালিয়েছে অথবা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে।

ডর্‌স্কি বলল, এ নিয়ে তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না কমরেড। তুমি ফিরে আসার অনেক আগেই বাছাধনকে ভবপারে পাঠিয়ে দেব।

আক্রমণকারীদের সামনে কষ্টকর দীর্ঘপথ। পাঁচশ' মাইল বন্ধুর পথে দক্ষিণ-পূর্ব আবিসিনিয়ার ভিতর দিয়ে তাদের ঢুকতে হবে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডে। জাভেরির মনোগত বাসনা—ইতালীয় উপনিবেশে আক্রমণের একটা মহরা শুধু দেবে। তাতেই ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইতালীয়দের ক্রোধ জাগ্রত হবে, আর সেখানকার ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটর সেই ওজুহাতে ইওরোপের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

জাভেরি হয়তো কিছুটা পাগল ছিল। এতদিন

সে দেখেছে একটি সাম্রাজ্যের স্বপ্ন; এখন দেখছে দুটি সাম্রাজ্যের স্বপ্ন। এক নতুন রোমক সম্রাট শাসন করবে ইওরোপ, আর সে নিজে হবে আফ্রিকার সম্রাট। তার চোখের সামনে ভাসছে দুই সোনার সিংহাসন—একটিতে আসীন সম্রাট প্রথম পিটার, আর অপরটিতে সাম্রাজ্ঞী জোরা। অভিযানের দীর্ঘ পথ এই স্বপ্ন দেখেই সে কাটাতে লাগল।

সকালে টারজনের জ্ঞান ফিরল। শরীর দুর্বল, রুগ্ন; মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা। নড়বার চেষ্টা করতেই বুঝল, হাত-পা শক্ত করে বাঁধা। কি ঘটেছে, কোথায় আছে—কিছুই সে জানে না। তাঁবুর ক্যানভাসের দেয়াল দেখে বুঝল, যে ভাবেই হোক শত্রুর হাতে সে ধরা পড়েছে। এখানে সে একা নয়; বাইরে লোকজনের গলা শোনা যাচ্ছে। তবে যতদূর মনে হয়, তারা সংখ্যায় বেশী নয়।

গভীর জঙ্গল থেকে ভেসে এল হাতির ডাক। অস্পষ্টভাবে কানে এল সিংহের গর্জন। মাথাটা ঘুরিয়ে তাঁবুর বাইরে তাকাল। তার ঠোঁট থেকে বের হল একটানা নীচু চীৎকার—বিপন্ন পশুর বুক-ফাটা ডাক।

ডর্স্কি তার তাঁবুর সামনে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছিল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছোকরা নিগ্রো-চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে ভয়ে ভয়ে টারজনের তাঁবুর দিকে এগোতে লাগল। ডর্স্কির হাতে উদ্যত রিভলবার।

ঘরে ঢুকে দেখল, টারজন যেখানে ছিল সেখানেই শুয়ে আছে। তবে তার চোখ দুটি খোলা। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সে ডর্স্কির দিকে তাকাল। ডর্স্কি কয়েকটা প্রশ্ন করল, কোন জবাব পেল না।

ডর্স্কির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। চীৎকার করে বলল, ব্যাটা গোরিলা, আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করো না। আমি ভাল করেই জানি, এ লোকটার বকবকানি সব তুমি বুঝতে পেরেছ। তাছাড়া, তুমি একজন ইংরেজ, অবশ্যই ইংরেজি জান। তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিয়ে গেলাম। ফিরে এসেও যদি দেখি তুমি কথা বলছ না, তাহলে তোমার কপালে অশেষ দুর্গতি আছে। বলেই সে তাঁবু থেকে সটান বেরিয়ে গেল।

ছোট্ট নকিমা অনেক পথ পার হয়ে গিয়েছিল। তার গলার শক্ত বেড়ি থেকে ঝুলছিল একটা চামড়ার থলে। তার মধ্যেই চিঠিটা ছিল। সেটা সে এনে দিয়েছিল ওয়াজিরিদের সেনাপতি মুভিরোকে। আর ওয়াজিরিরা যখন পথে নামল তখন নকিমা সগর্বে মুভিরোর কাঁধেই বসে পড়ল। অনেকটা সময় পর্যন্ত সে মুভিরোর কাঁধেই ছিল; তারপর মনের খেয়ালেই হোক আর অন্য কোন প্ররোচনাতেই হোক সকলকে ছেড়ে সে নিজের কাজে চলে গেল।

বড় বড় গাছের ডালে ডালে ঝুলতে ঝুলতে সে চলতে লাগল। আপন খেয়াল খুশিতে একবার এদিকে ছোটে, একবার ওদিকে। আর তাতেই অনেক সময় নষ্ট হল।

এইভাবে নকিমা যখন বহুদূর জঙ্গলে অকারণে ছুটাছুটি করছে, ঠিক তখনই পাঁচ মিনিট পরে ডর্স্কি আবার ঢুকল টারজনের তাঁবুতে। নিজস্ব মতলবটাকে মনে মনে ঠিক করে নিয়েই সে এসেছে।

বন্দীর মুখের ভাব বদলে গেছে। কান পেতে কি যেন শুনছে। ডর্স্কিও কান পাতল। কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না। টারজনের অন্তর কিন্তু খুশিতে ভরে উঠেছে।

ডরস্কি বলল, আমি এসেছি তোমাকে শেষ সুযোগ দিতে। ওপার-এর স্বর্ণ-ভাণ্ডারের সন্ধানে কমরেড জাভেরি দু'বার সেখানে অভিযান চালিয়েছে; দু'বারই ব্যর্থ হয়েছে। সকলেই জানে, ওপার-এর রত্ন-ভাণ্ডার কোথায় আছে তা তুমি জান এবং আমাদের সেখানে নিয়ে যেতেও পার। কথা দাও, কমরেড জাভেরি ফিরে এলেই তুমি এ কাজ করবে, তাহলে তোমার কোনরকম ক্ষতি করা তো হবেই না, উপরন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। আমার প্রস্তাব না মানলে তুমি মরবে। কোমরের খাপ থেকে লম্বা ছুরিটা টেনে বের করল।

টারজন তবু পাথরের মত নিশ্চুপ। ছুরির সরু ফলাটা তার চোখের সামনে এনে ডরস্কি বলল, বেশ ভাল করে ভেবে দেখ। মনে রেখো, এই ফলাটা যখন তোমার পাঁজরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব তখন একটুও শব্দ হবে না। ফলাটা তোমার হৃৎপিণ্ডে ঢুকে যাবে, আর রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকবে। তারপর ফলাটা বের করে ঘাটা জুড়ে দেব। বিকেলের দিকে দেখা যাবে তুমি মরে পড়ে আছ, আর নিগ্রোদের কাছে আমি জানাব যে হঠাৎ গুলি লেগে তুমি মারা গেছ। সত্য ঘটনা তোমার বন্ধুরা জানতেও পারবে না। তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধও কেউ নেবে না। বৃথাই তোমার জীবনটা যাবে।

ছুরিটা টারজনের মুখের একেবারে কাছে এসে গেছে। হঠাৎ বন্যপশুর মত টারজনও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ইস্পাতের-কঠিন চোয়াল দিয়ে চেপে ধরল ডরস্কির কব্জি। সে ছিট্‌কে সরে গেল। অবশ আঙ্গুলের ভিতর থেকে ছুরিটা মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টারজন তার আততায়ীকে লেঙ্গি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার পিঠের উপর চেপে বসল।

চীৎকার করে লোকজনদের ডাকতে ডাকতে ডরস্কি বাঁ হাত দিয়ে কোমরের রিভলবারটা বের করতে চেষ্টা করল, কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারল যে দেহের উপর থেকে টারজনকে সরাতে না পারলে সে কাজ করা যাবে না।

তার কানে এল, লোকজন সব হৈ-হৈ করে ছুটে আসছে। তারপরেই শুনতে পেল আতংকের চীৎকার। আর পরমুহূর্তেই মাথার উপর থেকে তাঁবুটা অদৃশ্য হয়ে গেল; ডরস্কি সভয়ে দেখতে পেল একটা প্রকাণ্ড হাতি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মুহূর্তের মধ্যে ডরস্কিকে ছেড়ে দিয়ে টারজন পাশ ফিরে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডরস্কিও রিভলবারে হাত দিল। টারজন চীৎকার করে বলল, মার ট্যান্টর, মার।

হাতির ঝোলানো শুড়টা এসে ডরস্কিকে পেঁচিয়ে ধরল। কর্কশ গলায় চীৎকার করতে করতে ডরস্কিকে মাথার উপর তুলে কয়েক পাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল শিবিরের মধ্যে। আতংকিত নিগ্রোরা ছুটে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। ট্যাণ্টর এগিয়ে গিয়ে দাঁত দিয়ে ডরস্কির দেহটাকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এমনভাবে তাকে পায়ের নীচে পিষতে লাগল যে মাইকেল ডরস্কি একটা রক্তাক্ত পিণ্ডে পরিণত হল।

ধীরে ধীরে সে শান্ত হল। হেলে দুলে টারজনের পাশে এসে দাঁড়াল। তার কথামত টারজনকে পিঠের উপর তুলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল।

গভীর বনে ঢুকে ট্যাণ্টর নরম ঘাসের উপর টারজনকে শুইয়ে দিল।

সেই সময় গাছের ডালে ডালে ঝুলতে ঝুলতে ছোট্ট নকিমাও সেখানে এসে উপস্থিত হল।

তাকে দেখে টারজন বলল, নীচে নেমে এস নকিমা; আমার হাতের বেড়ি খুলে দাও।

নকিমা ছোট ছোট দাঁত দিয়ে চামড়ার বেড়ি কেটে দিল। এবার সে নিজের পায়ের বেড়ি কেটে ফেলল।

এবার ট্যাণ্টর টারজনকে পিঠে তুলে নিল। নকিমাও মনিবের দেখাদেখি লাফিয়ে উঠল প্রথমে ট্যাণ্টরের পিঠে, তারপর সেখান থেকে টারজনের কাঁধে।

তিন বন্ধু নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। গাছের ছায়া দীর্ঘতর হতে লাগল। বনের আড়ালে সূর্য অস্ত গেল।

এইভাবে দিন কাটে। অসহায় কোল্ট শয্যাশায়ী। জাভেরি এগিয়ে চলেছে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের দিকে। মাথার ক্ষত সেরে যাওয়ায় টারজন চলেছে তাদেরই পথ ধরে।

এক সময় জাভেরির অগ্রগামী বাহিনীকে সে ধরে ফেলল। তখন রাত। । শ্রান্ত লোকজনরা শিবিরে বসে আমোদ-ফূর্তি করছে। ব্যাপারটা যে জানে না তার মনে হবে এটা বুঝি ফরাসী উপনিবেশ রক্ষীবাহিনীর শিবির।

গাছের উপর বসে টারজন সবই দেখল। ধনুকে একটা তীর জুড়ল। ছিলায় টংকার দিয়ে তীরটা ছুঁড়ে দিল। সেটা গিয়ে বিঁধল একটি শান্ত্রীর পায়ের গুলিতে। বিস্ময়ে ও বেদনায় চীৎকার করে সে মাটিতে পড়ে গেল। লোকজন এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। সেই ফাঁকে টারজন জঙ্গলের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ওদিকে আর একটা সেনাদলও চলেছে সেই জঙ্গলের পথ ধরে। সারাদিন হেঁটে রাতে তাদের অস্থায়ী শিবির পড়ল। আহারাদি শেষ করে শ' খানেক কালো সৈনিক ধুনির চারপাশে ইতস্তত শুয়ে বসে গল্প শুরু করল।

এমন সময় মাথার উপরকার গাছের ডাল থেকে একটি মূর্তি এসে নামল তাদের ঠিক মাঝখানে।

সঙ্গে সঙ্গে একশ' সৈনিক লাফ দিয়ে অস্ত্র হাতে নিল; কিন্তু পরমুহূর্তেই সহজভাবে থেমে গিয়ে গলা ছেড়ে বলে উঠল, বাওয়ানা! বাওয়ানা!

যেন কোন সম্রাট বা দেবতার সামনে তারা সকলেই নতজানু হল; যারা কাছে ছিল তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে তার হাত-পা স্পর্শ করল। ওয়াজিরিদের কাছে টারজন তো শুধু রাজা নয়, সে যে তাদের জীবন্ত দেবতা।

টারজন বলল, খুব ভাল কাজ করেছ বাছারা। নকিমাও ঠিক মতই কাজটা করেছে। আমার চিঠিটা তোমাদের পৌঁছে দিয়েছে, আর যেখানে তোমাদের দেখা পাব বলে ভেবেছিলাম ঠিক সেখানেই তোমাদের পেয়ে গেলাম।

মুভিরো বলল, সব সময় আমরা নবাগতদের চাইতে একদিনের পথ এগিয়ে থাকি বাওয়ানা। শিবির ফেলি ওদের পথ থেকে বেশ কিছুটা দূরে, যাতে আমাদের শিবির ওদের চোখে না পড়ে।

বান্টু ভাষায় ঘোষণা করল: মুলুঙ্গুব, সন্তানেরা, ফিরে যাও। যদি বাঁচতে চাও তো ফিরে যাও। আর বিলম্ব না করে সাদা মানুষদের সঙ্গ ত্যাগ কর।

জাভেরি বলল, ওটা কে? কি বলল?

আমাদের সতর্ক করে দিয়ে ফিরে যেতে বলল, কিটেম্বো জবাব দিল।

জাভেরি চমকে উঠল, ফেরা হবে না। যাই ঘটুক, আমরা এগিয়ে যাবই।

বিষণ্ণ মনে সকলে যার যার জায়গায় থেকে চলতে লাগল। সামনে অনেক দূর থেকে ভেসে এল সেই ভৌতিক কণ্ঠস্বর; সাদা মানুষদের সঙ্গ ত্যাগ কর।

জাভেরি ও জোরা ড্রিনভ পাশাপাশি হাঁটছিল। চোখ-মুখ খিঁচিয়ে বলল, ওই লোকটাকে যদি হাতের কাছে পেতাম তো এক গুলিতে—

তার কথা শেষ হবার আগেই দলের পিছন দিকে আকাশ থেকে ভেসে এল সেই কণ্ঠস্বর: সাদা মানুষদের সঙ্গ ত্যাগ কর।

টারজন বলল, আগামীকাল আমরা এখানেই তাদের জন্য অপেক্ষা করব। আজ রাতে টারজন তোমাদের বুঝিয়ে বলবে তার পরিকল্পনার কথা।

পরদিন সকালে জাভেরির দলবল আবার যাত্রা শুরু করল। ঘণ্টাখানেক নির্বিঘ্নে কেটে গেল। হঠাৎ মাথার উপর থেকে একটি ভৌতিক কণ্ঠস্বর।

ইতিমধ্যে গোটা দল জঙ্গল পার হয়ে একটা খোলা জায়গায় পড়েছে। সেখানে তারা মাথা-সমান উঁচু ঘাসের ভিতর দিয়ে চলতে লাগল। মাঝামাঝি পৌছবার পরেই গর্জে উঠল একটা রাইফেল। আর একটা। আরও একটা।

গুলি কারও গায়ে লাগে নি। তবু সেনাদলের

মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেল। দেখা দিল বিশৃংখলা।

আবার সামনে শোনা গেল সেই সতর্ক-বাণী : ফিরে যাও! এই শেষ সতর্ক-বাণী। অমান্য করলে মৃত্যু অনিবার্য।

দলে ভাঙন দেখা দিল। রোমেরো গুলি করার হুকুম দিল। প্রত্যুত্তরে সামনের ঘাসের ভিতর থেকে গুলি চলল। এবার ডজনখানেক লোক পড়ে গেল—কেউ নিহত, কেউ আহত হল।

জাভেরির দলবল অনেক কষ্টে তাদের শেষ শিবিরে পৌছে গেল। কিন্তু রাত পর্যন্ত হিসাব করে দেখা গেল শতকরা পঁচিশজন তখনও নিখোঁজ; তাদের মধ্যে জোরা ও রোমেরোও আছে। একে একে যারাই শিবিরে এল তাদের প্রত্যেককে জাভেরি মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কেউ তাকে দেখে নি।

আরও একটু রাত হতেই দু'জন একসঙ্গে শিবিরে ঢুকল। তাদের দেখে জাভেরি যেমন স্বস্তি বোধ করল, তেমনি রাগও হল।

ধমক দিয়ে বলল, তোমরা আমার সঙ্গে থাকলে না কেন?

কারণ আমি তোমার মত ছুটতে পারি না, জোরা জবাব দিল। জাভেরি আর কিছুই বলল না।

শিবিরের উপরকার অন্ধকারের ভিতর থেকে ভেসে এল সেই পরিচিত সতর্ক-বাণী : সাদা মানুষদের সঙ্গ ত্যাগ কর! তারপর দীর্ঘ নিস্তব্ধতা, মাঝে মাঝে কালা আদমিদের ফিস্‌ফিস্ আলোচনা। আবার সেই কণ্ঠস্বর : তোমাদের দেশে ফিরে যাবার পথ সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত, কিন্তু সাদা মানুষদের পিছনে হাঁটছে মৃত্যু। তোমাদের উর্দি ছুঁড়ে ফেলে দাও; সাদা মানুষদের ছেড়ে দাও জঙ্গলে ও আমার হাতে।

একটি কালা সৈনিক শরীর থেকে ফরাসী উর্দি খুলে ফেলে উনুনের আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও তাই করতে লাগল।

থাম! জাভেরি চীৎকার করে বলল।

চুপ কর সাদা মানুষ! পাল্টা গর্জে উঠল কিটেম্বো।

সাদাদের মেরে ফেল! জনৈক বাসেম্বো সৈনিক চীৎকার করে বলল।

সবাই ছুটল সাদা মানুষদের লক্ষ্য করে। উপর থেকে আবার ভেসে এল সতর্ক-বাণী : সাদা মানুষরা আমার লোক। তাদের আমার হাতেই ছেড়ে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকরা থেমে গেল। জাভেরি রাগে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। সব্বাইকে গালাগালি করে বলল, আমাকে কেউ সাহায্য

করলে এ রকমটা ঘটত না। কিন্তু আমি একা তো সব কাজ করতে পারি না।

এ কাজটা তো তুমি একাই করেছ, রোমেরো বলল।

কি বলতে চাও তুমি?

আমি বলতে চাই, একটা উদ্ধত গাধার মত কাজ করে তুমি সব্বাইকে শত্রু করে তুলেছ। তবু তোমার সাহসের উপর ভরসা থাকলে তারা তোমার সঙ্গেই চলত। একটা ভীরুকে অনুসরণ করতে কেউ চায় না।

তোমার এতদূর স্পর্ধা। চীৎকার করে উঠে জাভেরি রিভলবারে হাত দিল।

জোরা বলে উঠল, এ সব কী পাগলামি হচ্ছে। একদল উচ্ছৃংখল কালা আদমির মধ্যে আমরা মাত্র পাঁচজন। কাল তারাও আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। আমরা যদি প্রাণ নিয়ে আফ্রিকা থেকে ফিরে যেতে চাই তাহলে আমাদের একসঙ্গে চলতে হবে। নিজেদের ঝগড়া ভুলে যাও; সকলের মুক্তির জন্য একযোগে কাজ কর।

বাকি রাতটা সুখে না হোক নির্বিঘ্নেই কাটল। সকালে দেখা গেল, সব কালা আদমি গা থেকে ফরাসী উর্দি খুলে ফেলেছে। পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা অন্য একজনের সহাস্য চোখও সে দৃশ্য দেখল। কোন কালো ছোকরা সাদা মানুষদের সেবা করতে এল না। তারা নিজেরাই প্রাতরাশ তৈরী করল।

কালা আদমিরা যার যার গাঁঠরি কাঁধে ফেলে শিবির থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা করল। তাদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে সাদা মানুষগুলি চুপচাপ বসে রইল।

পরদিন সকালে পাঁচ শ্বেতমূর্তি ফিরে চলল তাদের মূল শিবিরে।

আর ঠিক একদিনের পথ আগে থেকে অন্য এক সোজা পথে টারজন ও তার ওয়াজিরি সেনারা চলল ওপার-এর দিকে।

টারজন মুভিরোকে বলল, লা হয়তো সেখানে নেই। কিন্তু ওআ ও ডুথ্‌কে আমি শাস্তি দিতে চাই যাতে লা বেঁচে থাকলে একদিন না একদিন ওপার-এ ফিরে গিয়ে প্রধান সন্ন্যাসিনীর গদিতে বসতে পারে।

বহু মাইল দূরে তাদের এই বন্ধুটি জঙ্গলের মধ্যে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। একসময় সেখানে একটা বড় শিবির ছিল; এখন কয়েকটা ঝুপড়িতে কিছু কালা আদমি থাকে।

তার পাশাপাশি হাঁটছে ওয়েনি কোণ্ট। এতদিনে সে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। তাদের পিছনে চলেছে সোনালী সিংহ জাদ্‌-বাল্‌-জা।

কোণ্ট বলল, শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম। তোমাকে, ধন্যবাদ।

লা বলল, ভালই হল। এবার তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব। তার গলায় বেদনার সুর।

কোণ্ট বলল, বিদায় কথাটা আমার ভাল লাগে না।

একটি নারী ও একটি পশু পাশাপাশি চলে গেল ওপার-এর পথে। সেদিকে তাকিয়ে কোণ্টের গলায় কি যেন আটকে আসতে লাগল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে শিবিরে ফিরে গেল। কালো মানুষগুলি দুপুরের রোদেও ঘুমিয়ে আছে। তাদের ডেকে তুলল। কোণ্টকে দেখে তারা তো হতবাক। তারা যে ধরেই নিয়েছিল সে মারা গেছে।

ওপার-এর প্রান্তরে বিধ্বস্ত নগরীর দিকে হাঁটছে একজন নারী ও একটা সিংহ। তাদের পিছনে খাড়ির উঁচু মাথায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকেই লক্ষ্য রেখেছে আর একজন মানুষ। তার পিছনে একশ' সৈনিক পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে উপরে উঠছে। তারা এসে পাশে দাঁড়াতেই দীর্ঘদেহ মানুষটি আঙুল বাড়িয়ে বলল, লা!

আর ঘুমাও, মুভিরো বলল। সে পিছন পিছন হাঁটছে কী আশ্চর্য বাওয়ানা, সে কিন্তু আক্রমণ করছে না।

টারজন বলল, আক্রমণ করবে না। ও যে জাদ্-বাল-জা।

পিছনের হৈ-চৈ-এর শব্দ প্রথমে জাদ্-বাল্ জার কানেই ধরা পড়ল। থেমে সে মুখ ফেরাল। মাথাটা তুলল। কান খাড়া করল। নাক কুঁচকাল। তারপরই গাঁ-গাঁ করে ডেকে উঠল। লা দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল। একটি অগ্রসরমান সেনাদলকে দেখে সে হতাশায় ভেঙে পড়ল।

দলটা এগিয়েই আসছে। হঠাৎ লা-র নজরে এল, যে লোকটি সকলের আগে আগে আসছে তার গায়ের রং ফর্সা। সে চিনতে পেরেছে। চীৎকার করে বলল, ওই তো টারজন! জাদ্-বাল-জা, ওই তো টারজন।

হয়তো জাদ্-বাল্-জাও মনিবকে চিনতে পারল। একছুটে এগিয়ে গেল। টারজনের সামনে গিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। তার কাঁধে দুই থাবা রেখে আদর করে গালটা চাটতে লাগল। তাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে টারজন লা-র দিকে এগিয়ে গেল।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, শেষ পর্যন্ত—

লা বলল, হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত তুমি শিকার করে ফিরে এলে।

টারজন বলল, আমি তখনই ফিরেছিলাম, কিন্তু তুমিই চলে গিয়েছিলে।

তুমি ফিরে এসেছিলে? তা যদি জানতাম তাহলে তো আমি অনন্তকাল সেখানেই অপেক্ষা করে থাকতাম।

টারজন সস্নেহে লা-র কাঁধে হাত রাখল। অস্ফুট স্বরে বলল, সেই চিরকালের লা! তারপরই কি যেন মনে পড়তে ওপারএর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠল, চল। রাণী এবার ফিরে যাবে তার সিংহাসনে।

ওপার-এর অদৃশ্য চোখগুলি অগ্রসরমান দলটিকে দেখতে পেল। লা, টারজন ও ওয়াজিরিদের তারা চিনতে পারল। অনেকে জাদ্-বাল্-জাকেও চিনল। ওআ ভয় পেল। ডুথ্ কাঁপতে লাগল। ছোট নাও-এর বুক খুশিতে ভরে উঠল।

অভিযাত্রীরা বহিঃপ্রাচীরের প্রাঙ্গণে ঢুকল। একটি প্রাণীও তাদের বাধা দিল না। দরবার-কক্ষে ঢুকে যে দৃশ্য তাদের চোখে পড়ল তাতেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছে ওআ ও ডুথ্-এর মৃতদেহ; পাশেই ছ'টি সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর মৃতদেহ। আর কেউ কোথাও নেই।

অগ্নি-দেবতার প্রধান সন্ন্যাসিনী লা আর একবার ওপার-এর রাণী হয়ে সিংহাসনে বসল।

সেদিন রাতে অরণ্যরাজ টারজন ওপার-এর সোনার থালায় আহার্য গ্রহণ করল। সুন্দরী তরুণীরা পরিবেশন করল মাংস, ফল ও অমৃতস্বাদ দ্রাক্ষারস।

পরদিন সকালে টারজন ফিরে চলল দলবল নিয়ে। তার কাঁধের উপর ছোট্ট নকিমা, পাশে সোনালী সিংহ, আর পিছনে একশ' ওয়াজিরি সৈন্য।

দীর্ঘ একঘেয়ে পথ চলার পর সাদা মানুষদের

ক্লান্ত অবসন্ন দলটা তাদের মূল শিবিরে ফিরে এল। সকলের আগে জাভেরি ও আইভিচ, তাদের পিছনে জোরা ড্রিনভ, বেশ কিছুটা দূরে পাশাপাশি রোমেরা ও মোরি। এই ভাবেই দীর্ঘ পথ তারা পার হয়ে এসেছে।

তাদের আসতে দেখে কোল্ট এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্বলে উঠল জাভেরি। চীৎকার করে বলল, বিশ্বাসঘাতক! তোমাকে শেষ করাই আমার জীবনের শেষ কাজ। রিভলবার বের করে নিরস্ত্র কোল্টকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল।

প্রথম গুলিটা কোল্টের গা ঘেসড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু দ্বিতীয়বার গুলি করার সময় আর জাভেরি পেল না। তার পিছন থেকে গর্জে উঠল আর একটা আগ্নেয়াস্ত্র। পিটার জাভেরির হাত থেকে পিস্তলটা পড়ে গেল। এক হাতে পিঠ চেপে ধরে সে মাতালের মত টলতে লাগল।

আইভিচ বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়াল। হা ভগবান, এ তুমি কী করলে জোরা?

জোরা বলল, যা করতে বারো বছর অপেক্ষা করেছিলাম। শৈশব পার হবার পর থেকেই যে কাজটি করার জন্য বেঁচে আছি।

ওয়েনি কোল্ট ছুটে গিয়ে জাভেরির রিভলবারটা মাটি থেকে তুলে নিল। ততক্ষণে রোমেরো ও মোরিও ছুটে এসেছে।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জাভেরি হিংস্র চোখে চারদিক তাকাতে তাকাতে বলল, কে? কে আমাকে গুলি করল?

আমি, জোরা ড্রিনভ বলল।

তুমি! জাভেরি ঢোক গিলল।

হঠাৎ ওয়েনি কোল্টের দিকে ফিরে জোরা বলতে লাগল, সব কথা তোমার জানা দরকার। আমি কম্যুনিষ্ট নই, কোনো দিন ছিলাম না। এই লোকটা আমার বাবাকে, মাকে আর দাদা ও দিদিকে খুন করেছে। আমার বাবা ছিল—কিন্তু সে কথা থাক। এতদিনে তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিলাম। তীব্র দৃষ্টিতে জাভেরির দিকে তাকিয়ে বলল, গত কয়েক বছরে অনেকবারই তোমাকে মারতে পারতাম, কিন্তু মারি নি। কারণ তোমার জীবনের চাইতেও বেশী কিছু আমি চেয়েছিলাম। গোটা বিশ্বের সুখ-শান্তিকে ধ্বংস করার যে জঘন্য পরিকল্পনা তুমি এবং তোমার মত লোকরা করেছিল, আমি চেয়েছিলাম সেটাকে ব্যর্থ করার কাজে সাহায্য করতে।

পিটার জাভেরি উঠে বসল। বিস্ফারিত চোখ দুটি চকচক করছে। হঠাৎ সে খক্-খক্ করে কাসল। মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে লাগল। তার পরই সে ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে।

খোলা জায়গাটার ওপারে জঙ্গলের প্রান্তে এসে দাঁড়াল একটি মূর্তি। নিঃশব্দে সে যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছে। জোরা ড্রিনভই তাকে প্রথম দেখতে পেল। চিতার চামড়ার লেংটি-পরা একটি সাদা মানুষ এগিয়ে আসছে। তার চলনে সিংহের সাবলীল গতি-ভঙ্গী।

ও কে? কোল্ট প্রশ্ন করল।

জোরা বলল, কে তা জানি না, তবে এটুকু জানি যে জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেললে সেই আমার প্রাণরক্ষা করেছিল।

লোকটি সামনে এসে দাঁড়াল।

কে তুমি? ওয়েনি কোল্ট শুধাল।

আমি অরণ্যরাজ টারজন। এখানে যা কিছু ঘটেছে সব আমি দেখেছি, শুনেছি। জাভেরির মৃতদেহ দেখিয়ে বলল, ওই লোকটা যে মতলব ফেঁদেছিল তা ভেস্তে গেছে, সেও মারা গেছে। এই মেয়েটি নিজেই বলেছে সে তোমাদের কেউ নয়। একে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব; সে যাতে সভ্য জগতে ফিরে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করব। তোমরা আর যারা আছ তাদের জন্য আমার কোন সহানুভূতি নেই। তোমরা জঙ্গল থেকে চলে যেতে পার। আমার কথা শেষ।

কিন্তু এই মার্কিন ভদ্রলোক ওদের সঙ্গে যাবে না, জোরা বলল।

যাবে না? কেন? টারজন জানতে চাইল।

কারণ সে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন স্পেশ্যাল এজেন্ট।

সকলেই সবিস্ময়ে জোরার দিকে তাকাল।

কোল্ট বলল, এ কথা তুমি কেমন করে জানলে?

শিবিরে এসে প্রথম যে চিঠিটা তুমি পাঠিয়েছিলে সেটা জাভেরির একজন লোকের হাতে পড়েছিল। এখন বুঝতে পারলে?

হ্যাঁ।

সেইজন্যই জাভেরি তোমাকে বিশ্বাসঘাতক ভেবে খুন করতে চেয়েছিল।

কালা আদমিরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। তাদের ভাষায় টারজন বলল, তোমাদের দেশ আমি চিনি। উপকূলে যাবার রেলপথের শেষে সে দেশ অবস্থিত।

তাদের একজন বলল, ঠিক বলেছ হুজুর।

রেলপথের শেষ পর্যন্ত এই সাদা মানুষটিকে তোমরা সঙ্গে নিয়ে যাও। তার খাবার ব্যবস্থা করে দিও। আর কোন রকম ক্ষতি করো না। তারপর তোমাদের দেশ থেকে তাকে চলে যেতে বলো। তারপর সাদা মানুষদের দিকে ফিরে বলল, আপাতত তোমরা আমার সঙ্গে শিবিরেই চল।

সকলে ফিরে চলল। অন্যদের থেকে একটু পিছিয়ে পড়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল জোরা ড্রিনভ ও ওয়েনি কোল্ট।

জোরা বলল, আমি তো ভেবেছিলাম তুমি মরে গেছ।

আমি তো ভাবছিলাম তুমি মরে গেছ, কোল্ট বলল।

জোরা আবার বলল, আর সব চাইতে দুঃসংবাদ কি জান, জীবিত বা মৃত কোন অবস্থাতেই আমার মনের কথাটি তোমাকে বলতে পারব না।

কোল্ট নীচু গলায় বলল, আর আমি ভেবেছিলাম, তোমার-আমার মধ্যে যে ব্যবধান তার উপর একটা সেতু গড়ে তুলতে যে প্রশ্নটা তোমাকে করতে চাই তা কোন দিন করা হবে না।

জোরা ঘুরে দাঁড়াল। দুই চোখ জলে ভরা। ঠোঁট কাঁপছে। বলল, আর আমি ভাবছিলাম, জীবিত বা মৃত কোন অবস্থাতেই তোমার সে প্রশ্নের জবাবে কোন দিন হ্যাঁ বলতে পারব না।

একটা বাঁক ঘুরে তারা সকলের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল।

রহস্য-সন্ধানী টারজন

টারজনস্ কোয়েস্ট

অরণ্য-রাজ টারজন জঙ্গলের একটা পুরনো গাছের দো-ডালার ফাঁকে তৈরী পাতার বিছানায় উঠে বসল। আয়েস করে হাত-পা ছড়াল।

ছোট্ট নকিমা হাত-পা নেড়ে জেগে উঠল। কিচির-মিচির করে টারজনের কাঁধে চড়ে বসে লোমশ হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

এই বৃহৎ অরণ্যে নিজের এলাকা ছেড়ে টারজন গিয়েছিল বহুদূরের এক অঞ্চলে। সেখান থেকেই সে ফিরে চলেছে।

নানা রকম অদ্ভুত গুজব কানে আসায় সে বিষয়ে তদন্ত করতেই সে গিয়েছিল। অরণ্যের অনেক অনেক ভিতরে এমন সব পথবিহীন পরিত্যক্ত অঞ্চল আছে যেখানে মানুষের পদার্পণ কদাচিৎ ঘটেছে, আর যারাই সেখানে গেছে তাদের মধ্যেও অনেকেই জীবন্ত ফিরে আসে নি। এই রকম রহস্যময় বিচিত্র গুজব তার কানে এসেছে। ইদানীং তরুণী মেয়েদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঘটনা ভয়ংকরভাবে বেড়ে গেছে। চোদ্দ থেকে বিশ বছরের মেয়েগুলো হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। তাদের কোন খোঁজই মেলে না।

গাছ থেকে গাছে ঝুলতে ঝুলতে সে অনায়াসে এগিয়ে চলেছে। কখনও তার পাশে, কখনও বা মাথার উপরে, ছোট্ট নকিমা অনেক দূরে থেকেও মনিবকে অনুসরণ করে চলেছে।

একসময় সে দেখল, তার মনিব থেমে পড়েছে; বাতাস শুঁকছে; কান পেতে আছে। ছোট্ট নকিমা নিঃশব্দে টারজনের কাঁধে লাফিয়ে পড়ল।

মানুষ, টারজন বলল।

পিছন দিক থেকে এগিয়ে টারজন খুব দ্রুত তাদের ধরে ফেলল। বলল, ওরা ওয়াজিরি।

গাছের উপর থেকেই টারজন ওয়াজিরিদের ভাষায় বলল, মুভিরো, আমার ছেলেরা তাদের দেশ থেকে এতদূরে কেন এসেছে?

মুভিরো বলল, ওঃ, বাওয়ানা, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। আমার মেয়ে বুইরা নিখোঁজ হয়েছে। একলা নদীর দিকে যাচ্ছিল; তারপর তাকে আর দেখা যায় নি।

মনে হয় এর পিছনে শয়তান আছে, রহস্য আছে বাওয়ানা। কাভুরুদের কথা শুনেছি। হয় তো এসব তাদের কাজ, আমরা তাদের সন্ধানেই বেরিয়েছি।

টারজন বলল, তাদের দেশ তো অনেক দূরে। তারই কাছের একটা জায়গা থেকে আমি এইমাত্র ফিরছি। সেখানকার লোকগুলো সব ভীরু। কাভুরুদের কোথায় পাওয়া যাবে ভয়ে তারা সে কথা জানলেও আমাকে বলতে চাইল না।

টারজন বলল, চোরদের কোন হদিস পেয়েছ কি?

মুভিরো বলল, কোন হদিস নেই। তাই তো বুঝতে পারছি যে এ সব কাভুরুদের কাজ; তারা কোন হদিস রেখে যায় না।

টারজন বলল, আমরা প্রথমেই যাব বুকেনাদের গ্রামে। তাদের মেয়েরাই হারিয়েছে সবচাইতে বেশী। আমি দ্রুততর ছুটতে পারি; কাজেই আমি আগে যাচ্ছি। চার দফা যাত্রা, কোথাও আটকে পড়লে হয় তো তিন দফা যাত্রায়ই তোমরা সেখানে হাজির হতে পারবে।

মুভিরো বলল, এবার বড় বাওয়ানা যখন আমাদের সহায় তখন আর ভয় নেই, কারণ আমি জানি এবার বুইরাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

টারজন আকাশের দিকে মুখ তুলে বাতাস শুঁকল। বলল, একটা খারাপ ঝড় আসছে মুভিরো। সেই ঝড়ের মুখে তোমাদের চলতে হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল উষ্ণ গাছগুলোর মাথায়। মেঘের গর্জন তীব্রতর হতে লাগল। আঁধার নেমে এল বনের বুকে। চমকাতে লাগল বিদ্যুৎ। শুরু হলো নিদারুণ বর্ষণ।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। ঝড়ের বেগ কমল না। হঠাৎ টারজন উপরের দিকে কান খাড়া করল।

একজন সভয়ে জিজ্ঞাসা করল, আকাশে শোঁ-শোঁ আর্তনাদ করে ছুটে চলেছে ওটা কি বাওয়ানা?

টারজন বলল, অনেকটা বিমানের মত শব্দ; কিন্তু এখানে বিমান কি করতে এল তা তো বুঝতে পারছি না।
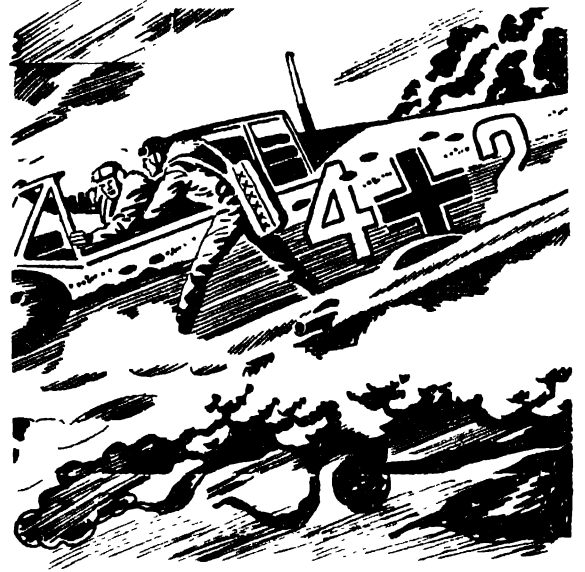
প্রিন্স এলেক্সিস বিমান-চালকের কানবরায় মাথাটা বাড়াল। তার বিবর্ণ মুখে আতংকের আভাষ। বিমানের পাখার গর্জনকে ছাপিয়ে সে চীৎকার করে বলল, কোন বিপদ ঘটবে কি ব্রাউন?

চালক খেঁকিয়ে উঠল, ঈশ্বরের দোহাই, চুপ করুন। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর একটা করে বোকা-বোকা প্রশ্ন শোনা ছাড়াও আমার অনেক কাজ আছে।

পাশের আসনে বসা লোকটি ভীত কণ্ঠে তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, স্-স্-শ্। হিজ হাইনেসের সঙ্গে ওভাবে কথা বলো না হে। কথাগুলি খুবই অশ্রদ্ধার।

ঘোড়ার ডিম, ব্রাউন মুখ ঝামটা দিল।

প্রিন্স স্খলিত পায়ে কেবিনে নিজের আসনে ফিরে এল।

প্রিন্সেস বলল, সেফটি বেল্টটা বেঁধে নাও লক্ষ্মীটি। যে কোন মুহূর্তে আমরা ডিগবাজি খেতে পারি। সত্যি বলছি, এ রকম ভয়ংকর অবস্থায় কখনও পড়েছ কি? এখন মনে হচ্ছে না এলেই ভাল ছিল।

আমারও তাই মনে হচ্ছে, এলেক্সিস গজরাতে লাগল। একবার যদি মাটিতে পা রাখতে পারি, তাহলে আমার প্রথম কাজ হবে এই নির্লজ্জ বেয়াদব লোকটিকে গুলি করে মারা।

একটা বিদ্যুতের ঝিলিকে কালো মেঘগুলো ঝলসে উঠল। উড়োজাহাজটা মাতালের মত কাৎ হয়ে হঠাৎ নীচের দিকে নামতে লাগল। চীৎকার করে উঠল আনেৎ; প্রিন্সেস স্বরভ মূর্ছা গেল।

প্রিন্সেস স্বরভ চেয়ারে বসেই ধাক্কা খেল। তার স্মেলিং সল্ট মেঝেতে ছিটকে পড়ল। টুপিটা নেমে এল একটা চোখের উপর; চুল এলোমেলো হয়ে গেল।

জেন বলল, তুমি বরং প্রিন্সেসকে দেখ আনেৎ।

কোন জবাব নেই। ভাল করে লক্ষ্য করে জেন বুঝতে পারল, আনেৎও মূর্ছা গেছে।

জেন মাথা নাড়ল। ডেকে বলল, টিব্‌স্‌, তুমি এখানে এসে প্রিন্সেসকে দেখ। আমি ব্রাউনের পাশে গিয়ে বসছি।

জেন বলল, শেষের ধাক্কাটা তুমি খুব সামলে নিয়েছ ব্রাউন। তোমার হাত খুব ভাল।

টিব্‌স্‌ বলল, ধন্যবাদ। সকলে আপনার মত হলে কাজটা অনেক সহজ হত।

জেন বলল, উড়োজাহাজে সত্যি কোন গোলমাল দেখা দিয়েছে নাকি ব্রাউন?

টিব্‌স্‌ জবাব দিল, হ্যাঁ। ঝড়ের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছি; কোথায় এসেছি, কোন্‌দিকে যাচ্ছি—কিছুই বুঝতে পারছি না। জানেন তো মিস, আফ্রিকায় অনেক পাহাড় আছে—বেশ উঁচু পাহাড়, যে কোন মুহূর্তে আমরা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে পারি।

এই বিপদ এড়াবার কোন পথ নেই? জেনের কণ্ঠস্বর শান্ত, কিন্তু চোখ দুটি ভয়গ্রস্ত। পেট্রল—গ্যাস কি সত্যি খুব নেমে গেছে ব্রাউন?

দেখুন, ব্রাউন ড্যাস-বোর্ডের কাটাটা দেখাল। বড় জোর আর ঘণ্টাখানেক চলবে। যেমন করে হোক, আধঘণ্টার মধ্যে কোথাও নামতেই হবে। শুধু ভয় হচ্ছে, একটা পাহাড়ের উপর না আছড়ে পড়ি।

কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত কেটে গেল। হঠাৎ জেন হর্ষধ্বনি করে উঠল। দেখ ব্রাউন—গাছ! আমরা অনেকটা নেমে এসেছি। আর কতটা গ্যাস আছে?

পনেরো-বিশ মিনিট চলার মত আছে।

নীচে তাকিয়ে হতাশ গলায় জেন বলল, কিন্তু নীচে যে শুধু বন আর বন; উড়োজাহাজ নিয়ে নামবার মত একটা জায়গাও নেই।

একটা কোন ফাঁক পেয়ে যাব। অন্তত পক্ষে গাছের উপরে তো নামতে পারব। তাতে আর যাই হোক, সকলে মিলে মারা পড়ব না।

ডালপালা ভাঙার খট্‌-মট্‌ শব্দ আর কাপড় ছেঁড়ার খস্‌-খস্‌ শব্দের মধ্যে উড়োজাহাজটা বৃষ্টি-ভেজা, আন্দোলিত বনের মাথায় খাড়া নেমে গেল।

ঝড়ের শব্দ আর উড়োজাহাজের ধাক্কার শব্দকে ছাপিয়ে শোনা গেল কেবিন-বন্দী যাত্রীদের আর্ত-নাদ আর গালমন্দ।

শেষ পর্যন্ত তাও থামল। উড়োজাহাজটা স্থির হয়ে গেল।

তারপর কয়েকটি ভয়ংকর মুহূর্ত ভয়ে শুধুই নিস্তব্ধতা।

ব্রাউন পিছনে কেবিনের দিকে তাকাল। সেফটি বেল্টে বাঁধা অবস্থায় চার যাত্রী চার ভঙ্গীতে ঝুলে আছে। ব্রাউন শুধাল, পিছনের সকলে ভাল তো? আনেৎ, তুমি কেমন আছ?

ফরাসী মেয়েটি আবার কেঁদে উঠল। হায় মনডিউ! আমি বোধ হয় মরেই গেছি।

প্রিন্সেস স্ববরভ আর্তকণ্ঠে বলল, ওঃ কী ভয়ংকর! কেউ আমার জন্য কিছু করছে না কেন? কেউ আমাকে একটু সাহায্য করছে না কেন? আনেৎ! এলেক্সিস! তোমরা কোথায়? আমি যে মরতে চলেছি।

এলেক্সিস গর্জে উঠল, সেটাই তোমার প্রাপ্য। যত সব পাগলের কাণ্ড-কারখানা! আমরা যে মরে যাই নি সেটাই আশ্চর্য। একজন ফরাসী পাইলট থাকলে এ রকমটা ঘটত না।

জেন বাধা দিয়ে বলল, বাজে কথা বলবেন না। ব্রাউন চমৎকারভাবে উড়োজাহাজটাকে নামিয়েছে।

তারপর নিজের বেল্টটা খুলে জেন কেবিনে উঠে গেল।

ওদিকে টারজন ও তার ওয়াজিরি সঙ্গীরাও ঝড় থামার অপেক্ষায় রইল।

কিছুক্ষণের জন্য ঝড়ের সঙ্গে একটা উড়ো-জাহাজের মোটরের শব্দ টারজন শুনতে পেয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে জাহাজটা ঘুরপাক খাচ্ছে; তারপর সে শব্দটা কমতে কমতে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল।

মুভিরো বলল, বাওয়ানা, ঝড়ের মাথায় চড়ে কি মানুষ এসেছিল?

টারজন জবাব দিল, হ্যাঁ, অন্তত একজন তো
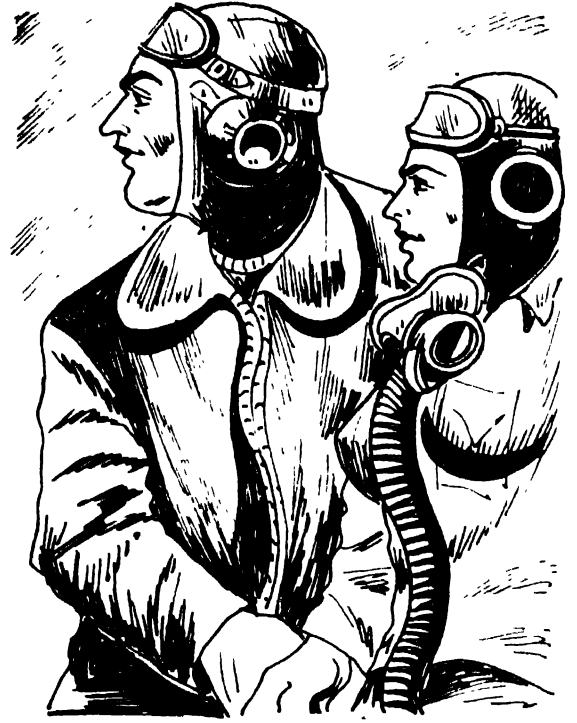
বটেই, তবে ঝড়ের মাথায় কি ভিতরে তা জানি না।

ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হল। সূর্য দেখা দিল।

টারজন উঠে দাঁড়িয়ে সিংহের মত শরীরটা ঝাড়া দিল। বলল, এবার আমি উকেনা যাত্রা করব, সেখানে যদি আমাকে না পাও তো জানবে যে আমি কাভুরু ও বুইরার খোঁজে গেছি। তোমাদের সাহায্যের দরকার হলে নকিমাকে পাঠিয়ে দেব তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে।

আর কোন কথা না বলে টারজন একটা জলে-ভেজা ডাল ধরে ঝুলে পড়ে পশ্চিম দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তৃতীয় দিন সকালে সে হাজির হল বুকেনাদের সর্দার উদালোর গ্রামে।

একটা বাচ্চা বানর কাঁধে তার দীর্ঘ শরীর দেখেই গ্রামের ফটকে তার চারপাশে অনেক লোকের জটলা শুরু হয়ে গেল। তাদের দিকে কোনরকম নজর না দিয়ে টারজন সোজা গিয়ে উঠল তাদের সর্দার উদালোর ঘরে।

তাকে দেখে উদালো মোটেই খুশি হল না; বলল, আমরা তো ভেবেছিলাম বড় বাওয়ানা চলেই গেছে, আর ফিরবে না; আবার ফেরা হল কেন?

উদালোর সঙ্গে কথা বলতে।

উদালোর সঙ্গে তো আগেই কথা হয়ে গেছে। উদালো যা জানে সবই তো তাকে বলেছে।

এবার উদালো তাকে আরও কিছু বলবে। কাভুকদের দেশ কোথায় সে কথাও বলবে।

বুড়ো বিরক্ত হল। উদালো তা জানে না।

তারা এই সব কথা বলতে বলতেই গ্রামের বর্শাধারী সৈনিকরা এসে তাদের ঘিরে ধরল।

চারপাশে সমবেত সৈনিকদের দেখিয়ে টারজন বলল, এ সবের অর্থ কি উদালো? আমি তো শান্তিতেই এসেছি ভাই হিসাবে তোমার সঙ্গে কথা বলতে।

গলা খাকারি দিয়ে উদালো বলল, তুমি এখান থেকে চলে যাবার পরে এখানে অনেক রকম কথা হয়েছে। কাভুকদের সম্পর্কে শোনা গল্পগুলো এখানকার লোকরা ভোলে নি। শোনা যায়, তারাও নাকি তোমার মতই সাদা মানুষ, আর উলঙ্গ হয়ে চলে। তোমার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না! আমার লোকরা অনেকেই মনে করে যে তুমিও একজন কাভুক; গুপ্তচরের কাজ নিয়ে এখানে এসেছ সুযোগ মত চুরির জন্য মেয়েদের বেছে রাখতে।

ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল। আমাদের আর কোন মেয়েকে তুমি চুরি করতে পারবে না। বলতে বলতেই সে সজোরে হাততালি দিল; সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকরা টারজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

টারজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। চারদিকে উদ্যত বর্শা; সে জানে, এই মুহূর্তে পালাতে চেষ্টা করলে একডজন বর্শা তাকে গেঁথে ফেলবে।

সঙ্গে সঙ্গে কালো মানুষগুলোর মধ্যে তর্ক বেঁধে গেল। একদল বলল, ওকে মেরে ফেল; আর একদল বলল, ওকে বন্দী কর; আবার আর একদল বলল, কাভুকদের খুশি করতে ওকে ছেড়ে দাও।

তর্কাতর্কির ফলে সামনের সারির বর্শাধারীরা কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। টারজন বুঝল, এই পালাবার সুযোগ। বিদ্যুৎ গতিতে সে পাশের

সৈনিকটির উপর লাফিয়ে পড়ল; বর্মের মত তাকে সামনে ধরে সে মানব-ব্যূহ ভেদ করে ছুটতে লাগল। এত দ্রুত সে এদিক-ওদিকে মোড় নিয়ে চলতে লাগল যে তাদের সঙ্গী কালো মানুষটার জীবনকে বিপন্ন না করে টারজনকে লক্ষ্য করে বর্শা ছোড়া একেবারেই অসম্ভব।

সমস্ত ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে কালো মানুষগুলো তাকে বাঁধা দেবার সময়টুকুও পেল না। টারজন প্রায় ফটকের কাছে পৌঁছে যাবে এমন সময় একটা কিছু এসে তার মাথায় সজোরে আঘাত করল।

জ্ঞান ফিরে এলে সে বুঝল, দুর্গন্ধভরা একটা ঘরের মধ্যে সে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সব কথাই তার মনে পড়ে গেল।

রাতের অন্ধকারে একটি মূর্তি নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে এল। ঘরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সভয়ে চারদিকে তাকাল।

সব চুপ। ভৌতিক ছায়ার মত মূর্তিটি নিঃশব্দে গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলল।

একটু আগেই টারজনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘরের দরজাটা যাতে দেখা যায় সেইভাবে টারজন পাশ ফিরল। সেখানে দেখা দিল একটি ছায়া-মূর্তি। কে যেন ঘরে ঢুকছে।

অন্ধকারে পথ হাতড়ে ছায়া-মূর্তি আরও কাছে এগিয়ে এল। হঠাৎ টারজন প্রশ্ন করল, কে তুমি?

স্-স্-শ্! অত জোরে কথা বলো না। আমি ওঝা গুপিংগু।

কি চাও?

তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি। তোমার দেশে ফিরে যাও কাভুরু; সেখানে গিয়ে তোমার লোকজনদের বলো যে গুপিংগু তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। বিনিময়ে তারা যেন গুপিংগুর কোন ক্ষতি না করে, তার মেয়েদের হরণ না করে।

টারজন হাসল। অন্ধকারে সে হাসি দেখা গেল না। বলল, তুমি বুদ্ধিমান গুপিংগু; এবার আমার বাঁধন কেটে দাও।

আর একটা কথা, গুপিংগু বলল।

কি?

উদালো বা আর কাউকে বলো না যে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছি।

আমার কাছ থেকে তারা কিছুই জানতে পারবে না; আমাকে শুধু বলে দাও—তোমার দেশের লোকরা কি কাভুরুদের দেশে যাবার পথ চেনে?

ওঝা বলল, আমি চিনি—কিন্তু কাউকে সেখানে নিয়ে যাব না বলে কথা দিয়েছি।

আচ্ছা বল তো, সে দেশের পথে কেমন করে যাওয়া যায়; তবে তো বুঝব সে পথ তুমি চেন কি না।

আমাদের গ্রামের উত্তর দিক থেকে আরও উত্তরে গেলে একটা পুরনো হাতি চলার পথ আছে। পথটা খুব ঘোরানো, তবে কাভুরুদের দেশের দিকেই চলে গেছে।

আমার বাঁধন কেটে দাও, টারজন বলল।

নিজের ছুরি বের করে গুপিংগু বন্দীর হাত-পায়ের শক্ত বাঁধন কেটে দিল। আমি ঘরে না পৌঁছা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা কর, বলে সে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেল।

টারজন উঠে দাঁড়িয়ে শরীরটাকে ঝাঁকি দিল। তারপর হাঁটুর উপর বসে হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সর্দারের কুটিরের কাছে এসে থামল। অস্ত্রশস্ত্রগুলোর জন্য খুব লোভ হচ্ছে। কুটিরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে। দরজার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল, সৈনিকটির অদূরেই ধুনির পাশে তার অস্ত্রশস্ত্রগুলো পড়ে আছে।

সতর্ক পদক্ষেপে ভিতরে ঢুকে সে ঘুমন্ত দেহটাকে পেরিয়ে গেল। প্রথমেই তুলে নিল তার মূল্যবান ছুরিটা; তারপর তীরপূর্ণ তূণীরটাকে ডান পিঠে ঝুলিয়ে বাঁ কাঁধে জড়িয়ে নিল দড়িটা। ছোট বর্শা ও ধনুকটাকে একহাতে নিয়ে আবার দরজার দিকে ঘুরল।

সারাটা দিন টারজন গুপিংগুর নির্দেশ মত হাতিদের পথ ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে গেল। বিকেলের দিকে একটা জন্তুকে মেরে ভোজন-পর্ব সমাধা করে সেখানেই রাতটা কাটিয়ে দিল।

পরদিন নিঃশব্দে চলতে চলতে একটা দমকা হাওয়া তার নাকে পৌঁছে দিল একটা বিচিত্র গন্ধ। টারজন থেমে গেল। গন্ধটা একজন টার্মাঙ্গানির, অথচ এ গন্ধ তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। তার সঙ্গে এসে মিশেছে একটি পরিচিত গন্ধ—সিংহ নুমার গন্ধ। এই দুটি গন্ধ একত্র হওয়া মানেই বিপদের সংকেত।

টারজন মানুষটিকেই প্রথম দেখতে পেল। লোকটি শ্বেতকায়; কিন্তু যত সাদা মানুষ সে এতকাল দেখেছে এ লোকটি তাদের চাইতে কত আলাদা! তার পরনে একটিমাত্র কটিবাস; তার কব্জি ও গোড়ালি ব্রেসলেটে ভর্তি; মানুষের দাঁতের সাত-নহরী হার ঝুলছে তার গলায়; হাড়ের বা হাতির দাঁতের সরু নল আড়াআড়ি ঢুকে আছে তার নাকের ডগায়; দুই কানে ঝুলছে ভারী ভারী আংটা। কপাল থেকে গলার পিছন পর্যন্ত প্রসারিত একগুচ্ছ চুল ছাড়া গোটা মাথাটা কামানো; আর সেই চুলের সঙ্গে বাঁধা পালকগুলো বীভৎসভাবে চিত্রিত মুখের উপর ঝুলছে।

একটি গাছে হেলান দিয়ে লোকটি বসে আছে। দেখলেই বোঝা যায় একটা সিংহের উপস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন।

তাহলে এই অপরিচিত লোকটি তো কাভুরু হতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করার আগেই একটু দূরের একটা গর্জন টারজনের কানে এল।

সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতকায় বর্বরটি উঠে দাঁড়াল। এক হাতে তুলে নিল ভারী বর্শা, অন্য হাতে একটা আদিম ছুরি।

ঝোপের ভিতর থেকে সিংহটা পূর্ণ বিক্রমে তেড়ে এল। গাছে উঠে আত্মরক্ষা করার সময়টুকু পর্যন্ত লোকটি পেল না। অতি দ্রুত তার হাতের বর্শা পিছনে সরে গিয়েই বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গেল লক্ষ্যের দিকে। তার হস্তনিক্ষিপ্ত বর্শা লক্ষ্যচ্যুত হল। সঙ্গে সঙ্গে টারজন গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ল সিংহটাকে লক্ষ্য করে।

শুরু হল দুই জানোয়ারের যুদ্ধ! মানুষের গর্জন ও গর্-গর্ শব্দ এক হয়ে মিশে যাচ্ছে সিংহের গর্জনের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত গর্জন থেমে গেল; মৃত্যু-যন্ত্রণায় শেষ বারের মত নড়ে উঠেই পশুরাজের দেহটা মাটিতে এলিয়ে পড়ল।

টারজন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। শত্রুর লাশের উপর একটা পা রেখে আকাশে মুখ তুলে বিজয়ী গোরিলার মত হুংকার দিতে লাগল।

সেই বীভৎস ভৌতিক হুংকার শুনে শ্বেতকায় বর্বরটি কুঁকড়ে পিছিয়ে গিয়ে নিজের ছুরির হাতলটাকে সজোরে চেপে ধরল।

হুংকারের শব্দ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। বুকেনাদের ভাষায় বর্বরটি প্রশ্ন করল, কে তুমি?

আমি অরণ্যরাজ টারজন। আর তুমি?

আমি ইয়েনি, কাভুরু।

টারজন খুশি হল। এবার সে হয়তো কাভুরুদের পরিচয় জানতে পারবে।

মাথা নেড়ে ইয়েনি বলল, তোমার মত লোক আমি আগে কখনও দেখি নি। তুমি কালো মানুষ নও, আবার কাভুরুও নও! তুমি কি?

আমি টারজন। কাভুরুদের গ্রামের খোঁজ করছি। তুমি তো আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পার। তোমাদের সর্দারের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

ইয়েনি মাথা নেড়ে বলল, মরবার ইচ্ছা না হলে কেউ কাভুরুদের গ্রামে যায় না। তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ, তাই আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব না। বা তোমাকে মারবও না। তুমি তোমার পথে চলে যাও টারজন;

বিমানের দলটি মাটিতে নেমে নিজেদের কাজে লেগে গেল। ছোট ঝর্ণাটার ধারে জেন খানিকটা খোলা জায়গা খুঁজে পেল। একটা বেড়া ও কিছু থাকার মত ঘর বানানো শুরু হয়ে গেল।

বিকেল নাগাদ একটা বড় ঘর তৈরীর কাজ শেষ হল। তাতে কোন রকমে দুটো ঘরের ব্যবস্থা করা হল, একটা মেয়েদের জন্য, আর একটা ছেলেদের।

ওদিকে জেন তখন অন্য এক ধরনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কিটি অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে তার কাজ দেখল। তারপর আর কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এসব কি করছ ভাই?

অস্ত্র তৈরী করছি—একটা ধনুক, তীর আর একটা বর্শা।

বাঃ, কী সুন্দর তোমার হাতের কাজ! এগুলি নিয়ে খেলা করে আমাদের সময় বেশ কেটে যাবে।

জেন মুখ তুলে বলল, আমি যা তৈরী করছি তা দিয়ে আমাদের খাবার সংস্থান হবে, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হবে।

একটা ধনুক ও ছ'টা তীর বানিয়ে নিয়ে জেন উঠে পড়ল। ঘর ও বেড়ার ব্যবস্থা দেখে বলল, বাঃ বেশ হয়েছে। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি ডান হাতের ব্যবস্থা করতে। ব্রাউন, তোমার ছুরিটা দাও।

পাশের ঝর্ণাটার উপর নজর রেখে জেন নিঃশব্দে গাছের ডালে-ডালে এগিয়ে চলল। এই সব ঝর্ণাতে জল খেতে জীবজন্তুরা অবশ্যই আসবে।

একটা অস্পষ্ট গন্ধ নাকে আসায় সে খুশি হয়ে উঠল। সামনে শিকার এসেছে।

আরও সতর্কতার সঙ্গে সে এগোতে লাগল, যাতে গাছের একটা পাতাও না নড়ে। ঠিক সেই সময় ডালপালার ফাঁক দিয়ে হরিণটাকে দেখতেও পেয়ে গেল। বিদ্যুৎগতিতে ধনুকে তীর জুড়ে ছুঁড়ে মারল। তীরটা গভীর হয়ে বিঁধল হরিণটার বাঁ কাঁধে। একটা লাফ দিয়েই সেটা মাটিতে পড়ে মরে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে জেন নীচে নেমে এসে মৃত শিকারের দিকে ছুটে গেল। পিছনে বেশ কাছেই ঝোপের ভিতরে কিসের যেন নড়াচড়ার শব্দ কানে এল। আচমকা একটা ক্রুদ্ধ গর্জনে বনভূমির স্তব্ধতা ভেঙে খান্‌খান্ হয়ে গেল। বিশ পা পিছনে চিতাবাঘ শীতা লাফিয়ে পড়ল রাস্তার উপরে।

হরিণটাকে নামিয়ে রেখে জেন ধনুকে পূর্ণ জ্যা

আরোপ করে তীর ছুঁড়ে দিল শীতার বুক লক্ষ্য করে। তীর বুকে বিঁধতেই যন্ত্রণায় ও ক্রোধে তীব্র আর্তনাদ করে শীতাও পাল্টা আক্রমণ করল।

আশ্রয়-শিবিরে বসে সকলেই সে আর্তনাদ শুনল। তাদের মনে হল যেন মানুষের কণ্ঠস্বর।

আমেৎ বলল, মন্ দিউ, ওটা যে নারী-কণ্ঠের আর্তনাদ!

ব্রাউন শংকিত গলায় বলল, লেডি গ্রেস্টোক!

ব্রাউন ছোট হাত-কুড়ুলটা নিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল।

টিব্‌স্ পকেট থেকে গুলিহীন পিস্তলটা বের করল। বলল, আমিও আপনার সঙ্গে যাব মিঃ ব্রাউন। মিলেডির কোন বিপদ ঘটতে আমরা দেব না।

যে দিক থেকে আর্তনাদটা এসেছিল ব্রাউন ও টিব্‌স্ সেই দিকেই এগিয়ে চলল।

একটু এগিয়েই ব্রাউন জেনকে দেখতে পেল। একটা চিতাবাঘের মৃতদেহ থেকে তিনটের মধ্যে শেষ তীরটা টেনে বের করছে। একটু দূরেই পড়ে আছে একটা হরিণের ক্ষত-বিক্ষত দেহ।

জেন বলল, সবে এই হরিণটাকে মেরেছি, এমন সময় শীতা এসে সেটাকে নিয়ে পালাতে যাচ্ছিল।

যে আর্তনাদ শুনে আমরা এসেছি সেটা কার— আপনার, না ওর?

শীতার। তেড়ে আসতেই ছুঁড়লাম তীর। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার!

কপালের ঘাম মুছে ব্রাউন বলল, কি জানেন মিস, আমার ইচ্ছা করছে আপনার সামনে টুপি খুলে দাঁড়াই।

তার চাইতে বরং হরিণটাকে শিবিরে নিয়ে চল। তাতে অনেক বেশী কাজ হবে।

খুব হৈ-চৈ করে হরিণের মাংস দিয়ে ভোজন-পর্ব শেষ হল। তখন টিব্‌স্ বলল, যদি অভয় দেন মিলেডি তো একটা কথা শুধাই। এখান থেকে আবার সভ্য জগতে ফিরে যাব কেমন করে তা বলুন।

জেন বলল, এ নিয়ে আমিও অনেক রকম ভাবছি। কি জান, আমরা সকলেই যদি সুস্থ সবল থাকতাম তাহলে ঝর্ণাটার তীর বরাবর এগিয়ে হয়তো একটা বড় নদীতে পড়তাম এবং এক সময় হয় তো একটা আদিবাসী গ্রামও পেয়ে যেতাম। সেখানে খাওয়া জুটত, গাইড পাওয়া যেত। তারপর তাদের সাহায্যে একটা ইওরোপীয় উপনিবেশ খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত হত না।

চমৎকার ব্যবস্থা মিলেডি; চলুন, এখনই রওনা হই।

না; আগে একজন কি দুজন বেরিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা করবে; বাকিরা এই শিবিরেই থাকবে।

ব্রাউন শুধাল, কিন্তু কে যাবে? আমি আর টিব্‌স্?

এই নিয়ে শুরু হল আর এক দফা তর্কাতর্কি, কথা কাটাকাটি। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, জেন একাই যাবে সাহায্যের ব্যবস্থা করতে।

জঙ্গলের বুকে নেমে এল নিস্তব্ধ রাত।

এক সময় জেন উঠে পড়ল, আমি এবার শুতে চললাম। কাল সকালেই উঠতে হবে। শুভরাত্রি।

জেন চলে গেলে হাতের ঘড়ি দেখে ব্রাউন বলল, ন'টা বাজে। টিব্‌স্, তুমি মাঝ রাত পর্যন্ত পাহারা দিয়ে আমাকে ডেকে দিও, আমি তিনটে পর্যন্ত

জাগব তারপর জাগবে আমাদের মহামান্য ডিউক—সকাল পর্যন্ত।

সুবরভ শিবিরের মুখেই বসেছিল। ব্রাউনকে দেখে বলল, তোমাদের সব কথা আমি শুনেছি। তিনটেয় আমাকে ডেকে দিও। তখন আমি পাহারায় থাকব। এখন শুতে চললাম।

মাঝ রাতে টিব্‌স্ যখন তাকে জাগিয়ে দিল তখন মনে হল, সে একটুও ঘুমোয় নি।

কয়েক মিনিট পাহারা দেবার পরেই আনেৎ এসে তার পাশে বসল।

ব্রাউন বলল, আচ্ছা, এত ভোরে তুমি কি করতে এখানে এলে ?

আনেৎ বলল, আধঘণ্টা আগে কিসে যেন আমার ঘুম ভেঙে গেল, আর ঘুম এল না। সেটা যে কি তা জানি না, কিন্তু আমি চমকে জেগে উঠলাম : শুধু মনে হল, কে যেন ঘরের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। জানেন তো, দরজার পর্দাটা নামিয়ে দিলে ভিতরটা খুব অন্ধকার হয়ে যায়।

তাহলে নির্ঘাৎ তুমি স্বপ্ন দেখেছ গো মেয়ে, ব্রাউন বলল।

মেয়েটি বলল, হয় তো তাই হবে ; কিন্তু একটা কোন অস্বাভাবিক শব্দেই আমার ঘুম ভেঙেছিল, কারণ আমার ঘুম খুব গাঢ়। তাছাড়া, একটু পরেই আমি কারও গলাও শুনেছিলাম।

ব্রাউন বলল, তুমি বরং ঘরে গিয়ে আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা কর গে।

সত্যি বলছি মিঃ ব্রাউন, এখন আর ঘুম আসবে না। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে যে ঘরের মধ্যে একটা ভয়ংকর কিছু ঘটেছে ; আমার খুব ভয় করছে। আপনার কাছে যদি একটু বসি তাতে আপনার কোন আপত্তি নেই তো মিঃ ব্রাউন ?

আপত্তির কি আছে ? এ দলে তুমি আর লেডি গ্রেস্টোকই তো একমাত্র মানুষ। আর সবই তো বাজে লোক।

একটু চুপ করে থেকে ব্রাউন বলল, কখনও যদি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি—। সে হঠাৎ থেমে গেল।

তাহলে কি ? মেয়েটি প্রশ্ন করল।

ব্রাউন ইতস্তত: করতে লাগল। ধুনিতে আর একটা কাঠ ফেলে দিয়ে বলল, ভাবছিলাম, এমনও তো হতে পারে যে তুমি আর আমি—মানে হতেও তো পারে—

হ্যাঁ ; তারপর ? মেয়েটি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।

ধর, আমাকে যদি মিঃ ব্রাউন বলে আর ডাকতে না হয়।

তাহলে কি বলে ডাকব ?

বন্ধুরা আমাকে চি বলে ডাকে।

কী মজার নাম। এরকম নাম আমি কখনও শুনি নি। এ নামের অর্থ কি ?

যে শহর থেকে আমি এসেছি এটা তারই সংক্ষেপ।

কোন্ শহর ?

চিকাগো।

মেয়েটি হেসে উঠল, ওহো, আপনি তাহলে বানান করেন C-h-i-, S-h-i নয়। কি বলেন মিঃ ব্রাউন ?

উঁহু। বল চি।

বটে ! আমার আসল নাম নীল।

খুব সুন্দর নাম।

আনেৎও সুন্দর। আনেৎ নামে তো আমি পাগল।

নামটা তোমার পছন্দ ?

হ্যাঁ, আর মেয়েটিকেও—তাকে আমার খুব ভল লাগে। ব্রাউন হাত বাড়িয়ে আনেৎকে কাছে টানল।

তিনটে বেজে যাবার অনেক পরে ব্রাউনের খেয়াল হল যে স্বরবভকে ডেকে দিতে হবে। প্রিন্স যখন আগুনের পাশে এসে বসল তখন তাকে কেমন যেন অস্বস্তিকর মনে হল।

ব্রাউন ও আনেৎ শিবিরেব দিকে এগিয়ে গেল। আনেৎ কাঁপা গলায় বলল, ওখানে ফিরে যেতে মন চাইছে না।

ব্রাউন বলল, কোন ভয় নেই। আমি বরং একটা চোখ খোলা রেখেই ঘুমব। কিছু শুনতে পেলেই আমাকে ডেকো।

পাশের ঘরে একটা তীব্র আর্তনাদে ব্রাউনের যখন ঘুম ভেঙে গেল তখন দিনের আলো দেখা দিয়েছে।

টিব্‌স্ বলল, ওটা কি ? ব্রাউন ততক্ষণে মেয়েদের ঘরের দিকে ছুটছে। সে দেখল, স্বরবভ ধুনির পাশে দাঁড়িয়ে আছে; সকালের আলোয় তাকে কেমন যেন ছাই-ছাই দেখাচ্ছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েদের ঘরের দিকে।

দরজায়ই আনেতের সঙ্গে দেখা। সে চীৎকার করে বলল, ও নীল, কাল রাতে একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে। কিটি স্বরবভ মারা গেছে; তার মাথার খুলিটা দু'ভাগ হয়ে গেছে।

জেন শুধাল, প্রিন্স কোথায় ?

তিনি তো পাহারায় ছিলেন। আমি যখন ভিতরে ঢুকি তখন তিনি আগুনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

তাকে একটা খবর দিতে হবে, জেন বলল।

আমার তো মনে হয় তাব কাছে এটা কোন খবর নয়, ব্রাউন বলল।

জেন চোখ তুলল। সবিস্ময়ে বলল, না, তিনি এ কাজ করতে পারেন না।

তাহলে কে পারে ? বিমান-চালকের প্রশ্ন।

টিব্‌স্ বলল, মি লেডি যদি বলেন তো আমি হিজ হাইনেসকে খবর দিতে পারি।

তাই দাও টিব্‌স্।

টিব্‌স্‌কে দেখে প্রিন্স বলল, ব্যাপার কি ? আনেৎ হঠাৎ চীৎকার করল কেন ?

হার হাইনেস—মানে—তিনি—তিনি মারা গেছেন।

কি ?—কে ?—না, এ সম্ভব নয়। কাল রাতে যখন শুতে যায় তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল।

টিব্‌স্ বলল, তাকে খুন করা হয়েছে ইয়োর হাইনেস। উঃ, কী ভয়ংকর !

খুন! বলে প্রিন্স সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। শিবির থেকে বেরিয়ে এল জেন ও ব্রাউন।

জেন বলল, কি ভয়ংকর কাণ্ড এলেক্সিস। এ কাজ কে করেছে, কেন করেছে তা তো আমি ভেবেই পাচ্ছি না।

প্রিন্স শুধাল, কি দিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে?

জেনকে বিচলিত বোধ হল। বলল, তা—তা, নিশ্চয় একটা টাঙ্গি দিয়ে। সে টাঙ্গিটা কোথায় গেল?

স্বরভ বলল, টাঙ্গিটা খুঁজে বার করুন, তাহলেই খুনীও ধরা পড়বে। তিনটে থেকে আমি এখানে পাহারায় আছি। এ কাজ যেই করে থাকুক টাঙ্গিটাকে লুকিয়ে ফেলেছে।

জেন বলল, ঠিক আছে। তাহলে আপনারা পুরুষরা চলে যান মেয়েদের ঘরটা খুঁজতে; আমি আর আনেৎ খুঁজে দেখি পুরুষদের ঘর।

স্বরভ বলল, ও ঘরে আমি যেতে পারব না।

খুঁজবার বিশেষ কিছু নেই। শুধু যে ঘাস-পাতা বিছিয়ে বিছানা তৈরী করা হয়েছে সেগুলো উল্টে-পাল্টে দেখা।

জেন খুঁজল এলেক্সিসের বিছানা। এলেক্সিসের হাত পড়ল টিব্‌সের বিছানায়। আর আনেৎ খুঁজতে লাগল ব্রাউনের বিছানা। ঘাসের তলায় শীতল ও শক্ত একটা কিছু আনেতের হাতে লাগল, তার আঙুলগুলো শক্ত হয়ে গেল। শিউরে উঠে সে হাত সরিয়ে নিল। মুহূর্তের জন্য কি যেন ভেবে উঠে দাঁড়াল। বলল, এখানে কিছু নেই।

স্বরভ দ্রুত চোখ তুলে তার দিকে তাকাল। জেন বলল, এখানেও কিছু নেই।

এলেক্সিস বলল, টিব্‌সের বিছানাতেও কিছু পেলাম না। কিন্তু আনেৎ, তুমি হয় তো ব্রাউনের বিছানাটা ভাল করে দেখ নি। আমি একবার দেখছি।

এক পা এগিয়ে আনেৎ বলল, কি হবে তাতে? ওখানে কিছু নেই; বৃথা সময় নষ্ট হবে।

তবু আমি একবার দেখব, এলেক্সিস বলল।

স্বরভ নীচু হয়ে ঘাসের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। বেশী সময় লাগল না। বলে উঠল, এই তো পেয়েছি। তুমি যে কি খুঁজেছ আনেৎ তা তুমিই জান।

ঘাসের ভিতর থেকে টাঙ্গিটা বের করে প্রিন্স সকলের চোখের সামনে তুলে ধরল। টাঙ্গিটা রক্তমাখা।

বলল, এবার সন্তুষ্ট হলেন তো জেন?

জেন বলল, ব্রাউনের বেলায় এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

দেখুন, এ কাজ কে করেছে তার যথেষ্ট প্রমাণ তো পেলেন। এবার বলুন, কি কববেন? লোক-টাকে এখনই শেষ করে দেওয়া উচিত।

ব্রাউন শক্ত গলায় বলল, কাকে শেষ করে দেওয়া উচিত? সে আর টিব্‌স্ তখন দরজায় দাঁড়িয়ে।

জেন বলল, টাঙ্গিটা তোমার বিছানার নীচে পাওয়া গেছে ব্রাউন। সেটা প্রিন্সের হাতেই আছে। দেখতেই পাচ্ছ টাঙ্গিটা রক্তমাখা।

ওঃ, তাহলে তুমিই ওটাকে আমার বিছানার নীচে রেখে দিয়েছিলে, তাই না ব্যাটা হতচ্ছাড়া বেঁটে বামন? আমাকে গাড্ডায় ফেলার চেষ্টা?

সপ্রশ্ন চোখে ব্রাউন একে একে সকলের দিকেই তাকাল। তবে কি এরা বিশ্বাস করেছে যে আমি এ কাজ করেছি? সে বুঝতে পারছে, যত তুচ্ছই হোক প্রমাণটা তারই বিরুদ্ধে।

বলল, কিন্তু একথা মনেও এনো যে তোমরা আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পাববে।

জঙ্গলের পথে চলতে চলতে এক জায়গায় টারজন ঘুমন্ত অবস্থায় ওঝা গুপিংগুর মেয়ে নৈকাকে দেখতে পেয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে হাজির হল বুকেনাদের গ্রামে।

হঠাৎ টারজনের কানের কাছে কিচির-মিচির করতে করতে নকিমা তাব কাঁধের উপর লাফাতে শুরু করল।

টারজন বলল, আমার কানের কাছে নকিমার এত দাপাদাপি কেন? কি হয়েছে?

নকিমা চেঁচিয়ে বলল, ওয়াজিরি! ওয়াজিরি!

টারজন চকিতে মুখ ফেরাল। ওয়াজিরি কি? তারা তো এখানে নেই।

নকিমা বলল, তারা ওখানে আছে। গোমাঙ্গানিদের গাঁয়ে। তাদের হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধেছে। যে ঘরে টারজনকে রেখেছিল তাদেরও সেখানেই রেখেছে। গোমাঙ্গানিরা তাদের মেরে খেয়ে ফেলবে।

টারজন চমকে উঠল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, টারজন যাবে উদালোর গাঁয়ে।

নৈকা আনন্দে হাততালি দিতে লাগল। টারজন বলল, নৈকা, এবার তুমি নিরাপদ। নির্ভয়ে ফিরে যাও; সেখানে সকলকে বলো যে অরণ্যরাজ টারজন তাদের শত্রু নয়।

বলেই সে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু তার আগেই দুটি ছোট চোখের দৃষ্টিকে সে এড়াতে পারল না। নৈকা যখন আনন্দে চেঁচাতে চেঁচাতে গ্রামের ফটকের দিকে ছুটে গেল, তখনই ছোট্ট নকিমা ডালে-ডালে দোল খেতে খেতে এক-সময় লাফিয়ে পড়ল তার মনিবের কাঁধে।

দুজন গ্রামের পিছন দিকে মাটিতে নামল। গ্রামবাসীরা সকলেই তখন ভিড় করেছে সর্দার উদালোর বাড়ির সামনের রাস্তায়। গ্রামের পিছনটা তাই অন্ধকার ও নির্জন।

এক লাফে বেড়া ডিঙিয়ে ছায়ার মত নিঃশব্দে দুজন সর্দারের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

সর্দারের কুটিরের পিছনে টারজন মাটিতে নামল।

যে ঘরে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল দ্রুত সেখানে পৌঁছে ভিতরে ঢুকে পড়ল। নাকই তাকে

বলে দিল ওয়াজিরিরা সেখানেই আছে। ফিস্-ফিসিয়ে বলল, চুপ। আমি টারজন। ওরা তোমাকে নিতে আসছে। আমি তোমাদের বাঁধন কেটে দিচ্ছি। ওরা আসামাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে ; মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে ওদের বেঁধে ফেলতে হবে, যাতে টুঁ শব্দটি না করতে পারে। তারপর টারজনের পিছন-পিছন ওদের নিয়ে যাবে সর্দারের কুটিরের পিছনে।

কথা বলতে বলতেই সে নিজের কাজ শেষ করল। তিনটি বুকেনা সৈনিক যখন বন্দীদের নিয়ে যেতে ঘরে ঢুকল তখন ওয়াজিরিরা সকলেই মুক্ত ; নিঃশব্দে তারা অপেক্ষা করে আছে।

স্বপ্নেও ভেবো না যে তোমরা আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে। ব্রাউনের কণ্ঠস্বরে একটা চ্যালেঞ্জের আভাষ।

জেন বলল, আমরা কাউকে ফাঁসিতে ঝোলাব না। আইনকে আমরা নিজেদের হাতে নিতে পারি না। যতদিন কোন উপযুক্ত আদালতে আমাদের দোষ বা নির্দোষিতা প্রমাণিত না হচ্ছে ততদিন আমরা সকলেই সমান সন্দেহভাজন।

টিব্‌স্ বলল, আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত মিলেডি।

বাধা দিল এলেক্সিস, কিন্তু আমি একমত নই। এই জনহীন পথে একজন খুনীকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলা মোটেই নিরাপদ নয়। তার বিরুদ্ধে সব সাক্ষীকে লোপাট করে দিতে সে অনায়াসে আমাদের সবাইকে খুন করতে পারে।

তাহলে আপনি কি করতে বলেন ? জেন প্রশ্ন করল।

খুনিকে এখানে রেখে আমরা নিকটবর্তী থানায় গিয়ে সব ব্যাপারটা জানাই ; তারপর তারা এসে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাক।

জেন মাথা নাড়ল। কিন্তু কে খুনি তা তো আমরা জানি না।

ব্রাউন বলল, আমি ওসবের মধ্যে নেই। এই সব বিদেশী বন্দরে বিচারের ঝুঁকি নিতে রাজী নই।

নিঃসম্বল একজন মার্কিন একজন কোটিপতি প্রিন্সের বিরুদ্ধে যুঝবে কিসের জোরে ? না মিস, ফাঁসির দড়িতে গলা বাড়িয়ে দিতে আমি পারব না।

জেন সরাসরি প্রশ্ন করল, তাহলে তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না ব্রাউন ? সত্যি, তুমি বড় বোকা।

আমি বোকা হতে পারি মিস, কিন্তু কোন বিদেশী আদালতের ঝুঁকি আমি নেব না। একটা ইংরেজ আদালত হলে তবু কথা ছিল।

জেন বলল, আমাদের দলে লোক এত কম, আর আমাদের অস্ত্রপাতি এতই যৎসামান্য যে আমাদের একসঙ্গে চলাই উচিত।

বিমান-চালক বলল, আপনাদের বিপদের মুখে ফেলে আমি যাব না মিস ; আনেৎ ও আপনি যতক্ষণ নিরাপদ না হচ্ছেন ততক্ষণ আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকব।

আমি জানতাম তুমি থাকবে, কিন্তু এবার আমাদের আর একটা কর্তব্য পালন করতে হবে—বড়ই অপ্রীতিকর কর্তব্য। প্রিন্সেসকে সমাধিস্থ করতে হবে।

মৃতদেহকে কবরে শুইয়ে দেওয়া হল। সকলে মাথা নীচু করে দাঁড়াল। আনেৎ কেবলই কাঁদতে লাগল। দুঃখে বুক ফেটে গেলেও জেনের চোখে জল নেই। তার সামনে অনেক কর্তব্য; ব্যক্তিগত দুঃখে সময় কাটানো তার চলবে না।

সে বলল, সব তো হয়ে গেল, এবার শিবির ভেঙে দেওয়া হোক; এখানে কেউ আর থাকতে চাইবে না।

আনেৎ রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অন্য সকলেই যার যার জিনিস পত্তর গুছিয়ে নিতে গেল।

ধুনির কয়লায় মাংস ঝলসাতে দগ্ধাবশেষ কয়লার মধ্যে একটা জিনিস তার নজরে পড়ল। ধুনির কিনারায় একটুকরো পোড়া কাপড়—তাতে তিনটে বোতাম লাগানো। একটা লাঠি দিয়ে সে কাপড়টা উল্টে দিল। কাপড়ের যে দিকটা নীচে ছিল সে দিকটা পোড়ে নি—রং ও নক্সা ঠিক আছে।

কাপড়টা যেন পরিচিত মনে হল; চিন্তা করতে গিয়ে তার চোখ দুটো অর্ধেক বুজে এল।

ব্রাউন এসে হাজির হল। বলল, রান্নার বাকিটা আমি শেষ করছি, তুমি বরং ততক্ষণে তোমার জিনিসপত্তর গুছিয়ে নাওগে।

আনেৎ বলল, ঠিক আছে; তুমি বরং এটা একবার ভাল করে দেখো। হাতের লাঠি দিয়ে সে ধুনির পাশের কাপড়ের টুকরোটা দেখাল।

ব্রাউন টুকরোটা তুলে ভাল করে দেখল। তার-পর প্রিন্স এলেক্সিস্ সুবরভের দিকে তাকিয়ে একটা শিস্ দিল। তাকে খুব খুশি দেখাচ্ছে।

সকলকে ডেকে বলল, আপনারা আসুন। সব তৈরী।

সকলে এসে আগুনের পাশে বসল। ধুনির পাশে গাছের পাতা পেতে ব্রাউন মাংসের টুকরো-গুলো সাজিয়ে রেখেছে।

ব্রাউন বলল, সকলে আরও ঘন হয়ে বসুন।

এলেক্সিস্ মাংসের একটা টুকরোয় কামড় দিয়েই বলল, কী সাংঘাতিক! এর তো একটা দিক পুড়ে গেছে। আরেকটা দিক কাঁচাই আছে। এ রকম রান্না আমার পেটে সহ্য হবে না! আমি খাব না।

ব্রাউন বলল, তা খেতে হয় খান। কিন্তু গ্র্যাণ্ড ডিউককে আমি একটা প্রশ্ন করছি। দেখতেই পাচ্ছি তিনি কোটটা বদলেছেন। কাল রাতে খুব সুন্দর একটা কোট তিনি পরেছিলেন। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে সেটা তিনি আর পরবেন না। তার কাছ থেকে আমি সেটা কিনে নিতে চাই।

এলেক্সিস্ দ্রুত চোখ তুলল, মুখটা ম্লান। বলল, পুরনো পোশাক আমি বিক্রি করি না। পরা শেষ হলে তোমাকে দান করে দেব।

ব্রাউন বলল, সে তো আপনার কৃপা। কোটটা একবার দেখতে পারি কি? গায়ে দিয়ে দেখতাম মাপে ঠিক হয় কি না।

এখন তো হবে না বাবা; অন্য সব জিনিসের সঙ্গে সেটাও প্যাক করা হয়ে গেছে।

সবটা? ব্রাউন প্রশ্ন করল।

সবটা? কি বলছ? সবটা তো বটেই।

তাই বুঝি ? কিন্তু একটা টুকরো প্যাক করতে যে ভুলে গেছেন মিস্টার। ব্রাউন তিন-বোতাম-ওয়ালা অংশটা তুলে ধরল।

স্ববভের মুখটা ভূতের মত সাদা হয়ে গেল। দুই চোখ বড় বড় করে কাপড়ের টুকরোটাকে দেখতে লাগল।

বলল, এ যে দেখছি মার্কিনী তামাসার আর এক নমুনা। ও টুকরোটা আমার কোটের নয়।

ব্রাউন বলল, কাল রাতে যে কোটটা আপনি পরেছিলেন এটা হুবহু সেই রকম দেখতে। আনেতেরও তাই ধারণা। তবে টিব্‌সের এটা চেনা উচিত; সে তো আপনার খানসামা। কি হে টিব্‌স, এটা আগে কখনও দেখেছ ?

টিব্‌স্ এগিয়ে এসে কাপড়ের টুকরোটা উল্টে পাল্টে দেখল, আঙুল দিয়ে ছাইটা ঝেড়ে ফেলল।

শেষ কখন সেটা দেখেছ ? ব্রাউন জোর গলায় প্রশ্ন করল।

আমি—সত্যি—সভয়ে সে স্ববভের দিকে তাকাল।

প্রিন্স চীৎকার করে উঠল। তুমি মিথ্যেবাদী টিবস্। ও রকম কোট কোন কালে আমার ছিল না। কোন দিন চোখেও দেখি নি। বল, ওটা আমার নয়।

ব্রাউন বলল, টিব্‌স্ কিছুই বলে নি। এটা যে আপনার কোটেরই টুকরো তাও বলে নি। কিন্তু এবার বলবে। কি বল টিব্‌স্ ?

টিব্‌স্ বলল, এটা সেই রকমই দেখতে।

এলেক্সিসের মুখের উপর চোখ রেখে ব্রাউন বলল, নিসেসের মাথায় আঘাত করার সময় নিশ্চয় ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটে কোটটাকে ভিজিয়ে দিয়েছিল।

এলেক্সিস্ আর্তকণ্ঠে বলল, খবরদার! ঈশ্বরের দোহাই, খবরদার। আমি বলছি, তার গায়ে আমি হাতও দেই নি।

ব্রাউন বলল, এ কথা জজকেই বলবেন। আনেৎ, তুমি এই সাক্ষীই দিও; জজ নিশ্চয় এটার কথাই

জানতে চাইবেন।

ততক্ষণে এলেক্সিস্ আবার আত্মসংযম ফিরে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি বলল, এটা আমার কোটই ছিল; আমার সামানের ভিতর থেকে কেউ চুরি করেছে।

জেন বলল, পুরো ব্যাপারটাই আদালতের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক।

ব্রাউন মাথা নেড়ে বলল, বরাবরের মত এবারও আপনার কথাই ঠিক মিস।

খুব ভাল কথা। সকলের খাওয়া শেষ হয়ে থাকলে এবার আমরা যাত্রা করব। আমাদের শিবিরের গায়ে আমি একটা চিরকুট লটকে রেখে এসেছি। তাতে এই দুর্ঘটনা, আমাদের গতিবিধি এবং দলের সকলের নাম লিখে দিয়েছি। যদি কখনও কোন শ্বেতকায় শিকারীর দল এই পথে আসে তাহলে তারা এ খবরটা বাইরে পৌছে দিতে পারবে। সকলে প্রস্তুত ?

এলেক্সিস্ বলল, প্রস্তুত।

তিন বুকেনা সৈনিক হামাগুড়ি দিয়ে কুটিরে ঢুকতেই টারজন সর্বশেষ সৈনিকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার কঠিন আঙুলগুলি সৈনিকটির গলায় ফাঁসের মত চেপে বসল। প্রায় একই সময়ে মুভিরো ও তার দলবল অপর দুজন সৈনিককেও মাটিতে ফেলে দিল। মুহূর্তের মধ্যে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে তিনজনেরই হাত-পা বেঁধে কেলা হল।

সর্দারের কুটিরের সামনের রাস্তায় তখন মাতাল আদিবাসীদের জমায়েত চলছে। তাদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে টারজন ও অন্য ওয়াজিরিরা মিলে তিন বুকেনা সৈনিককে কাঁধে করে নিয়ে গেল সেই কুটিরের এক কোণে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাছের কাছে। তাদের একজনকে কাঁধে নিয়েই টারজন গাছে উঠে গেল। ধীরে ধীরে তাদের তিন-জনকেই সমবেত নিগ্রোদের ঠিক মাথার উপরকার একটা চওড়া ডালে আরও ঘন পাতার আড়ালে নিয়ে শুইয়ে দিল।

তারপর তাদের মধ্যে একজনের গোড়ালির বেড়ির সঙ্গে নিজের দড়িটা বেঁধে তার মুখ থেকে কাপড়ের টুকরোটা বের করে নিয়ে মাথাটা নীচের দিকে রেখে টারজন তাকে মাটির দিকে নামিয়ে দিল। লোকটির মাথা পাতার আড়াল ভেদ করে নীচের নিগ্রোদের দৃষ্টিগোচর হবার আগেই টারজন-এর গলা থেকে বেরিয়ে এল গোরিলার সতর্ক-ধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে নাচ-গান থেমে গেল; নিগ্রোরা সভয়ে ইতস্তত তাকাতে লাগল।

চারদিক নিস্তব্ধ। মাথার উপরকার পাতার ফাঁকে দেখা দিল তাদেরই একজনের মুণ্ডু; ধীরে ধীরে তার দেহটাও নেমে এল। এ ধরনের রহস্যময় অলৌকিক ঘটনা তাদের জীবনে এর আগে কখনও ঘটে নি।

উপর থেকে ভেসে এল একটা গভীর কণ্ঠস্বর। আমি অরণ্যরাজ টারজন। ফটক খুলে আমার ওয়াজিরি লোকদের নিরাপদে যেতে দাও, নইলে টারজনের হাতে তোমাদের অনেকে মারা পড়বে।

এতক্ষণে ঝুলন্ত নিগ্রোটির মুখে কথা ফুটল, ফটক খুলে দাও; ওদের যেতে দাও; নইলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

নিগ্রোরা ইতস্তত করতে লাগল।

উদালো হুকুম দিল, ওয়াজিরিদের সব অস্ত্র এনে দাও; ফটক খুলে দাও; ওদের বেরিয়ে যেতে দাও।

টারজন বুকেনা সৈনিকটিকে টেনে তুলে তার সঙ্গীদের পাশেই শুইয়ে দিল।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক; তোমাদের কাউকে মারব না। এই কথা বলে মাটিতে নেমে টারজন ওয়াজিরিদের সঙ্গে যোগ দিল।

তারা নির্ভয়ে হেঁটে চলল। নিগ্রোরা সভয়ে তাদের জন্য পথ করে দিল।

উদালো বলল, আমার সৈনিক তিনজন কোথায়?

টারজন উত্তরে জানাল, তোমার ঘরের উপরকার গাছের ডালে তাদের তিনজনকেই জীবিত অবস্থায় পাবে। সর্দারের আরও কাছে গিয়ে বলল, দেখ উদালো, কোন বিদেশী যখন তোমাদের গাঁয়ে আসে, তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো—বিশেষত টারজন ও ওয়াজিরিদের সঙ্গে। মুহূর্তের মধ্যেই তারা বেড়ার ওপারের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ওঝা গুপিংগুর মেয়ে নৈকা হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে বলতে লাগল, এই তো সে! এই সাদা সৈনিকটিই তো আমাকে বাঁচিয়েছিল। সে যে দলবল নিয়ে চলে গেছে এতে আমি খুব খুশি হয়েছি।

পরদিন দুপুর। ওয়াজিরিরা শিবির ফেলেছে একটা নদীর ধারে। একটা গাছে হেলান দিয়ে টারজন কিছু তীর তৈরী করছে।

একসময় টারজন মাথাটা তুলে দক্ষিণ দিকে তাকাল। বলল, কে যেন আসছে।

অনেক দূরে লোকটিকে দেখা গেল। তার মাথায় ওয়াজিরিদের সাদা পালক উড়ছে; হাতে একটা লাঠি; তার একটা মাথা চিরে দু'ভাগ করে তার ফাঁকে একটা খাম বসানো রয়েছে।

লোকটি কাছে এসে খামটা টারজনকে দিল।

খাম খুলে পড়তে পড়তে টারজনের মুখে মেঘ নেমে এল।

মুভিরো শুধাল, কোন খারাপ খবর কি বাওয়ানা?

টারজন বলল, তা হতে পারে। তবে ঝড়টা ছিল খুবই খারাপ, আর পাইলটও পথ হারিয়ে ফেলেছিল। কোন বিপদে পড়েই সে একটা নামবার মত জায়গা খুঁজছিল, নইলে ওভাবে পাক খেয়ে ঘুরত না।

মুভিরো প্রশ্ন করল, তুমি কি এখনই নাইরোবী ফিরে যাবে বাওয়ানা?

তাতে লাভ কি হবে? টারজন উত্তর দিল।

মুভিরো শুধাল, আমরা কি তাহলে আমার মেয়ে বুইরার খোঁজেই চলতে থাকব?

টারজন বলল, হ্যাঁ। সকলেই খুব ক্লান্ত।

চলতে চলতে বেলা পড়ে এল। টিব্‌স্‌, এলেক্সিস ও আনেৎ খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তাই একটা

টারজন বলল, মেমসাব একটা বিমানে লণ্ডন থেকে নাইরোবী যাত্রা করেছে; আর ঠিক সেই বড় ঝড়টার আগে। তোমার মনে আছে মুভিরো, ঝড়ের ঠিক পরে একটা উড়োজাহাজ আমাদের মাথার উপরে পাক খাচ্ছিল? আমরা তখনই ভেবেছিলাম যে জাহাজটা খুব বিপদে পড়েছে। হয় তো সেই জাহাজেই মেমসাব ছিল।

মুভিরো বলল, একটু পরেই জাহাজটা চলে গেল। হয় তো সেটা নাইরোবী চলে গেছে।

সুবিধামত জায়গায় পৌঁছে জেন সকলকে থামতে বলল রাতের মত। একটা ধুনি জ্বালিয়ে সকলে পালা করে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করল। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখা গেল কেউ পাহারায় নেই। আনেৎও চলে গেছে।

আনেৎ শিবিরে নেই। অভিযাত্রীরা সকলেই কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

জেন বলল, তার কি হতে পারে? আমি জানি সে জঙ্গলে বেড়াতে যায় নি। জঙ্গলকে সে ভয় করে।

ব্রাউন ধীরে ধীরে স্ববরভের দিকে এগিয়ে চলল। তার মনে খুন চেপেছে; চোখে তারই স্ফুলিঙ্গ-দীপ্তি। বলল, আপনিই জানেন সে কোথায়। বলুন, তাকে কি করেছেন?

দুই হাত তুলে পিছনে সরে গিয়ে স্ববরভ বলল, আমি কিছু জানি না। আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম।

ব্রাউন বলল, আপনি মিথ্যেবাদী।

স্ববরভ চেঁচিয়ে বলল, দূরে সরে যাও। জেন, ওকে আর এগোতে দিও না; ও আমাকে মেরে ফেলবে।

ব্রাউন হুংকার দিয়ে উঠল, ঠিক বলেছেন; আমি আপনাকে খুন করব।

স্ববরভ মুখ ঘুরিয়ে দৌড়তে শুরু করল।

ব্রাউন এক লাফে তার পিছু নিল। ডজন খানেক পা ফেলেই ভয়ার্ত লোকটিকে ধরে ফেলল। তার কাঁধ চেপে ধরল। বেপরোয়া হয়ে স্ববরভও আঁচড়ে-কামড়ে, ঘুসি মেরে তাকে বাধা দিতে লাগল। কিন্তু মার্কিনীটি তাকে মাটিতে ফেলে তার গলা চেপে ধরল।

বলল, কোথায় সে? বলুন, কোথায় সে?

স্ববরভ ঢোক গিলে বলল, আমি জানি না। ঈশ্বরের নামে বলছি, আমি জানি না।

তাহলে মরুন। ব্রাউনের শক্ত মুঠি আরও চেপে বসল।

যে ঘটনাটা বলতে এত সময় লাগল সেটা কিন্তু ঘটে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই।

জেনও চুপ করে নেই। যে মুহূর্তে সে বুঝতে পারল যে ব্রাউন স্ববরভকে খুন করতে চাইছে, তখনই বর্শাটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল। বর্শার তীক্ষ্ণ মুখটা ব্রাউনের বাঁদিকে পাঁজরের উপর বসিয়ে বলল, ওকে ছেড়ে দাও ব্রাউন, নইলে এই বর্শা আমি তোমার হৃৎপিণ্ডে ঢুকিয়ে দেব।

ধীরে ধীরে ব্রাউনের মুঠি আলগা হয়ে গেল। স্ববরভকে ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। বলল, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন মিস। আপনার বিচার সব সময়ই সঠিক। কিন্তু বেচারী আনেৎ—এই ইঁদুর-টা সম্পর্কে কাল রাতে সে আমাকে যা বলেছিল তাতেই আমার মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল।

সে কি বলেছিল? জেন শুধাল।

ওই লোকটা কাল রাতে আনেতের কাছ থেকে সেই পোড়া কাপড়ের টুকরোটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছিল; তারপর তাকে ভয় দেখিয়ে বলেছিল যে এ কথা কাউকে বললে তাকে খুন করবে। কাল যে আনেৎ চীৎকার করেছিল সেটা ওকে দেখে। সে বেচারি ওকে ভীষণ ভয় করত মিস।

এলেক্সিসের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভয়ে কাঁপছে। কোন রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, না। আমি শুধু কাপড়টা চেয়েছিলাম সেটা আমার কিনা তাই দেখতে, আর অমনি আমাকে বিপদে ফেলার জন্যই ও চেঁচিয়ে উঠল।

জেন বলল, দেখুন, এভাবে কিছুই বোঝা যাবে না। আপনারা সকলেই যে যেখানে আছেন থাকুন, আমি একবার চারদিক ঘুরে পায়ের ছাপগুলো দেখে আসি। সকলে ঘোরাঘুরি শুরু করলে কোন ছাপ থাকলেও তা চাপা পড়ে যাবে।

জেন মুহূর্তকাল দাঁড়াল। প্রথমে পায়ের ছাপের দিকে তাকিয়ে পরে মাথার উপরকার গাছের ডালের দিকে তাকাল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে একটা ডাল ধরে ঝুলে সেই গাছে চড়ে বসল।

ব্রাউন ছুটে এসে শুধাল, কিছু কি দেখতে পেলেন মিস?

জেন উত্তর দিল, একটা মানুষ তো হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। আনেৎ পায়ে হেঁটে এই গাছের নীচ পর্যন্ত এসেছে; এখানেই তার পায়ের ছাপ শেষ হয়েছে; অথচ সে শিবিরেও ফিরে যায় নি। তাহলে একটিমাত্র স্থানেই সে যেতে পারে, আর সেটা হচ্ছে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি।

ব্রাউন বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু সে তো আপনার মত লাফিয়ে ওখানে উঠতে পারে নি; সেটা তার পক্ষে সম্ভবই নয়।

জেন বলল, সে লাফ দিয়ে ওঠে নি। তা করলে পায়ের ছাপ দেখেই বোঝা যেত। তাকে উপরে তুলে আনা হয়েছিল।

উপরে তুলে নিয়েছে! হায় ভগবান! কে তুলে নিয়েছে? ব্রাউনের গলা আবেগে কাঁপছে।

নিঃশব্দে কিছু মুখে দিয়ে সকলে আবার সেই ব্যর্থ অভিযানে পা বাড়াল। কারও মুখে কথা নেই।

সেদিন রাতের জন্য আবার তারা নদীর ধারে যাত্রা-বিরতি ঘটাল। সঙ্গে সঙ্গে স্বরভ ও টিব্‌স্ মাটির উপর ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিল। জেন ও ব্রাউন শিকারে বের হল রাতের খাবারের সন্ধানে।

সন্ধ্যা নাগাদ জেন ও ব্রাউন ফিরে এল একটা ছোট হরিণ মেরে। টিব্‌স্ সেটাকে কেটে-কুটে আগুনে ঝল্‌সাতে শুরু করে দিল। অন্যরা চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

সকলেই অল্পস্বল্প পেটে দিয়ে আগুনের পাশে শুয়ে পড়ল। জেগে রইল কেবল টিব্‌স্। স্থির হল, পুরুষরাই একের পর এক রাত জেগে পাহারা দেবে।

ভোর চারটের সময় পাহারার দ্বিতীয় পালা শেষ করে টিব্‌স্ ডেকে দিল এলেক্সিসকে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে স্বরভ ধুনিতে আরও কাঠ চাপিয়ে দিল। তারপর সেদিকে পিছন ফিরে রাতের অন্ধকারে চোখ রাখল।

ভয় পেয়ে জঙ্গলের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে ঘুমন্ত সঙ্গীদের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। ব্রাউনের পাশে রাখা

হাত-কুড়ুলটার দিকে নজর পড়ল। সেখান থেকে দৃষ্টি সরে গেল জেনের উপর। কি অপরূপ সুন্দরী!

হঠাৎ এলেক্সিসের মনে হল, এই লোকটা যদি মারা যেত তাহলে তার নিজের জীবন নিরাপদ হত—তার আর জেনের মাঝখানে দাঁড়াবার কেউ থাকত না।

উঠে পায়চারী করতে করতে সে বারে বারে ব্রাউন ও তার কুড়ুলটার দিকে তাকাতে লাগল।

টিব্‌সের কাছে গিয়ে কান পাতল। লোকটা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। জেন ঘুমিয়ে পড়েছে। ব্রাউনও।

ব্রাউন যদি মারা যেত! হঠাৎ একটা সংকল্প স্বরভের মনের মধ্যে শানিত হয়ে উঠল। চুপি চুপি এগিয়ে গেল ঘুমন্ত ব্রাউনের দিকে। তারপর এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল। খুব সাবধানে তার একটা হাত এগিয়ে গেল কুড়ুলটার দিকে।

হঠাৎ টিব্‌সের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে তাকাতেই দেখল, উদ্যত কুড়ুল হাতে স্বরভ ব্রাউনের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। চীৎকার করে সে লাফিয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে স্বরভ টিব্‌সের দিকে চোখ ফেরাল। আর তাতেই ব্রাউনের জীবন রক্ষা পেল।

টিব্‌সের চীৎকার শুনে জেনও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ব্রাউন মনস্থির কবার আগেই স্বরভ কুড়্‌লটা তুলে নিয়ে জঙ্গলের দিকে দৌড় দিল।

ব্রাউন তার পিছু নিতেই জেন বাঁধা দিয়ে বলল, ওর পিছু নিও না। কি লাভ হবে? এমনিতেই তো ওর হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলাম; ও আর ফিরে আসার সাহস পাবে না। বরং তুমি ওর পিছু নিলে আমরা সংখ্যায় কমে যাব।

ব্রাউন ঘুরে দাঁড়াল। হয়তো আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু মৃত্যুই ওর পাওনা ছিল।

এই জঙ্গলে একলা থাকলে সেটা ও এমনিতেই পাবে। জেন যেন ভবিষ্যদ্বাণী করল।

তিনজন আবার পূব দিকে যাত্রা শুরু করল। ঠিক সেই সময় সামান্য দূরের একটা গাছের পাতার আড়াল থেকে একজোড়া চোখ তাদের দিকে তাকিয়ে আছে; ছুটি মিটমিটে শয়তানী চোখ ছুটি পুরুষের উপর থাকলেও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে জেনের উপর।

ব্রাউন চলেছে সকলের আগে। তার পিছনে টিব্‌স্‌। তারপর চলেছে জেন। গাছের উপর থেকে নিঃশব্দে তাদের অনুসরণ করে চলেছে একটি ক্লান্তিহীন যাত্রী।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রাউন থামল। বলল, রাতের যাত্রা-বিরতির পক্ষে এই জায়গাটাই বেশ ভাল মনে হচ্ছে।

ইংরেজটি টল্‌তে টল্‌তে কোনরকমে মাটিতে এলিয়ে পড়ল। বলল, বড় ক্লান্ত!

ব্রাউন হেসে বলল, আমার অবস্থা কিন্তু অতটা শোচনীয় নয়। আরে তিনি কোথায়?

পিছনে তাকিয়ে টিব্‌স্ বলল, তিনি তো আমার ঠিক পিছনেই আসছিলেন। এক সেকেণ্ডের মধ্যেই এসে পড়বেন।

ব্রাউন যেন ভয় পেল। বলল, তার তো এতটা পিছিয়ে পড়ার কথা নয়। হাই, আপনি কোথায়! লেডি গ্রেস্টোক!

কোন সাড়া নেই। ছুজনেই সাগ্রহে পিছনের দিকে তাকাল। টিব্‌স্ কোনরকমে উঠে দাঁড়াল। ব্রাউন আবার ডাকল। টিব্‌স্ ব্রাউনের মুখের দিকে তাকাল। ভয়ে বিবর্ণ।

ব্রাউন পিছনের পথ ধরে দৌড়তে শুরু করল। টিব্‌স্ টলতে টলতে দৌড়তে লাগল। ব্রাউন মাঝে মাঝে থামছে আর জেনের নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু কোন সাড়া নেই। ক্রমে রাতের আঁধার তাদের ঘিরে ধরল।

আতংকের মধ্যে নকিমার রাতটা কাটল। নকিমা ডালে ডালে লাফিয়ে টারজন ও ওয়াজিরি-দের খোঁজে এগিয়ে চলেছে। ছোট একটা লাঠি তার হাতে; লাঠির মাথায় উড়ছে কাগজের একটা টুকরো।

কিছুদূর যেতেই মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। তার বুকের ভিতরটা টিপ্‌টিপ্ করে উঠল। শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল। সে জানে এ কণ্ঠস্বর টারজনের।

সত্যি তাই। গাছের উঁচু ডাল থেকে নেমে এল বন্ধুর কাঁধে। একহাতে জড়িয়ে ধবল টাবজনের গলা; অপর হাতের লাঠির ডগায় উড়ন্ত কাগজেব টুকরোটা এসে গেল সোজা টারজনের চোখের সামনে। লেখাগুলোব উপর দৃষ্টি পড়তেই সে হাতের লেখা সে চিনতে পারল। এ যে অবিশ্বাস্য; ছোট্ট নকিমার হাতে জেনের হাতের লেখা চিঠি--এ কথা কল্পনা করাও যে ভয়ংকব।

লাঠির মাথা থেকে টারজন চিঠিটা খুলে নিয়ে পড়তে লাগল।

মুভিরো বলল, নকিমা কি কোন খারাপ খবর এনেছে বাওয়ানা?

লেডি গ্রেস্টোকের চিঠি। একদল বন্ধুসহ সে বিমানসহ নামতে বাধ্য হয়েছে। কোন এক স্থানে তারা হারিয়ে গেছে। সঙ্গে না আছে খাবার, না আছে অস্ত্রশস্ত্র।

নকিমার দিকে ফিরে টারজন আবার বলল, এ চিঠি তোমাকে কে দিল?

কেউ এটা নকিমাকে দেয় নি। একটা ঝুপড়ির মধ্যে নকিমা এটা পেয়েছে।

টারজন বলল, সেটা কোথায়? মনে করতে চেষ্টা কর। আমাকে সেখানে নিয়ে চল।

অনেক---অনেক পথ ঘুরতে ঘুরতে দু'জন এগিয়ে চলল। সব পরিশ্রম একসময় সার্থক হল---গাছ-গাছালির ভিতর দিয়ে নকিমা তাকে সেই আস্তানায় নিয়ে গেল যেখানে পথহারা বিমানযাত্রীবা আশ্রয় নিয়েছিল।

এখানে টারজন এমন সব অভ্রান্ত প্রমাণ পেল যাতে পরিষ্কার বোঝা গেল যে সেই মন্দভাগ্য যাত্রী-দলের মধ্যে জেনও ছিল; নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়ে গাছের ডালে ডালে সেই অজ্ঞাত দেশের উদ্দেশ্যে সে যাত্রা করল যা তার জীবন-সঙ্গিনীকে গ্রাস করেছে।

সেদিন অপরাহ্ণে টিব্‌স্ ও ব্রাউনকে অনুসরণ করে গাছের ডালে-ডালে ঝুলতে ঝুলতে জেন

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। আর সেই ফাঁকে যে লোকটি জেনকে অনুসরণ করছিল, এবার জেনকে কাঁধে করে গাছ-পালার ভিতর দিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলল।

ধীরে ধীরে স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে জেন জেগে উঠল। বুঝতে পারল নিজের ভয়াবহ অবস্থার কথা।

জেন ইংরেজিতে শুধাল, তুমি কে?

লোকটি ঠোঁট বাঁকাল; বান্টু বুলিতে বলল, বুঝতে পারছি না।

জেন বান্টু বুলি জানে। সে তাই সোৎসাহে বলে উঠল, কিন্তু আমি তোমার কথা বুঝি। এবাব বল তুমি কে, আর আমাকে কেনই বা এনেছ। আমি তোমাদেব শত্রু নই; কিন্তু তুমি যদি আমাকে আটকে রাখ বা আমার ক্ষতি কর তাহলে আমার লোকরা এসে তোমাদের গ্রামকে ধ্বংস করে ফেলবে, তোমাদের অনেককে মেরে ফেলবে।

তোমার লোকরা আসবে না। কাভুরুদের গাঁয়ে কেউ আসে না। কেউ এলেই তাব জান চলে যায়।

আমাকে নিয়ে কি করবে?

কাবান্দাবান্দার কাছে নিয়ে যাব।

জেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বলল, আমাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দাও না। তাতে তোমারও সুবিধা। গাছের ভিতর দিয়ে চলার অভ্যাস আমার আছে।

একটু ইতস্তত করে লোকটি জেনকে নামিয়ে দিয়ে বলল, পালাবার চেষ্টা করো না। চেষ্টা করলেই মরবে।

হাত-পাগুলো ভাল করে টান-টান করে জেন লোকটিকে ভাল করে দেখল। আদিম অসভ্য মানুষের মতই দেখতে।

শুধাল, তোমার নাম কি ?

ওগ্‌লি, সে জবাব দিল।

তুমিই নিশ্চয় সর্দার ?

আমি সর্দার নই। মাত্র একজনই সর্দার। সে কাবান্দাবান্দা।

পরদিন দুপুর নাগাদ বনের পথ শেষ হয়ে গেল। সামনেই খোলা মাঠ। সম্মুখে একটা সুউচ্চ পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। পাহাড়ের গায়ে অনেকটা জায়গা পাথরের বেড়া দিয়ে শক্ত করে ঘেরা। খোলা জায়গাটাতে বড় বড় পাথরের চাঁই ইতস্তত ছড়ানো। তার ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে অনেকগুলো ঝর্ণা।

ওগ্‌লি চেঁচিয়ে ডাকতেই পাথরের দেয়ালের গায়ে দুটো বড় ফটক সামান্য খুলে গিয়ে তাদের দুজনকে ভিতরে ঢুকতে দিল। সংকীর্ণ রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট পাথরের বাড়ি।

চৌমাথায় পৌঁছে ওগ্‌লি জেনকে নিয়ে একটা গলি ধরে নীচু, বৃত্তাকার একটা বাড়িতে পৌঁছে গেল। বাড়িটার কোন জানালা নেই ; আছে শুধু ছাদে উঠবার একটা কাঠের মই। তাহলে এটা নিশ্চয় একটা কিভা—মন্দিরের মৃত্যু-কুঠুরি।

ওগ্‌লি বিরক্ত গলায় জেনকে মই বেয়ে উঠতে বলল। ছাদে পৌঁছে বাড়িটার এমন সব লক্ষণ জেনের চোখে পড়ল যাতে এটা একটা কিভা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না—ছাদের উপর একটা ছোট চতুষ্কোণ মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে আর একটা মইয়ের প্রথম ধাপ।

সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে ওগ্‌লি হুকুম করল, নীচে নেমে যাও। সেখানেই তুমি থাকবে। পালাবার চেষ্টা করো না। তাতে আরও খারাপ হবে।

জেন নীচের দিকে তাকাল। কিছুই চোখে পড়ল না—শুধুই একটা অন্ধকার গহ্বর।

জলদি ! ওগ্‌লি ধমক দিল।

মইয়ের প্রথম ধাপে পা রেখে জেন ধীরে ধীরে নামতে লাগল সেই রহস্যময় অন্ধকার মহাশূন্যতার মধ্যে। তার মনে তখন একটিমাত্র চিন্তা : কাভুরুদের গ্রামে কোন নারীকে সে দেখে নি। এই যোদ্ধারা যে সব মেয়েকে হরণ করেছে তাদের কি হয়েছে ? তারাও কি নেমে গেছে এই অন্ধকার অতল গহ্বরে ?

ওয়াজিরিদের নিয়ে মুভিরো বনের শেষ প্রান্তে হাজির হল। তাদের সামনে পাহাড়ের সানুদেশে একটি খোলা প্রান্তর।

একজন ওয়াজিরি আঙুল বাড়িয়ে বলল, উঁচু পাহাড়ের কোলে একটা গ্রাম দেখতে পাচ্ছি।

ভুরুর উপর হাত রেখে মুভিরো মাথা নেড়ে বলল, ওটা নিশ্চয় কাভুরুদের গ্রাম। শেষ পর্যন্ত তাহলে খুঁজে পেলাম। বুইরাকে আমরা হয়তো

পাব না, কিন্তু কাভুরুদের এমন শিক্ষা দিয়ে যাব যে আর কোনদিন ওয়াজিরি মেয়েদের গায়ে তারা হাত তুলবে না।

এগিয়ে চল, বলে মুভিরো সদলে কাভুরুদের গ্রামের দিকে অগ্রসর হল। হঠাৎ সে থামল। বলল, ওটা কি ?

ওয়াজিরিবা কান পাতল। একটা অস্পষ্ট এক-টানা শব্দ ক্রমেই উচ্চ হতে উচ্চতব হতে লাগল। সৈনিকবা নিঃশব্দে আকাশের দিকে তাকাল।

একজন বলল, ঐ তো সেই জিনিস। একটা উড়ন্ত নৌকো। ওয়াজিরিদের দেশেব উপর দিয়ে আগেও আমি একটাকে উড়ে যেতে দেখেছি। সেই একই শব্দ।

একটু পরেই উড়োজাহাজটা দৃষ্টিগোচর হল। তিন-চাব হাজাব ফুট উপবে সেটা পাক খেতে লাগল। ক্রমে মাটি থেকে শ' খানেক ফুট উপরে নেমে এল। কিন্তু তখনও পাক খেতে খেতে ঘুবতে লাগল। বিমান চালক নামবার মত একটা জায়গা খুঁজছে। ত্ব' ঘণ্টা ধরে সেই ব্যর্থ চেষ্টাই করে চলেছে।

অতটা নীচে নেমে আসাব দরুণ চালক ওয়াজিরিদের দেখতে পেল। মাথায় সাদা পালক গোঁজা লোকগুলো বন থেকে বেরিয়ে আসছে। ওদিকে আদিবাসীরা বেবিয়ে আসছে তাদের গ্রাম থেকে। চেহাবায় ও পোশাকে দুই দলের মধ্যে বিস্ময়কব পার্থক্য। সে বিমানটাকে আরও নীচে নামিয়ে আনল।

কক-পিট থেকে তাব সঙ্গী একটা চিবকুট লিখে তাকে দিল, ওরা কারা ? আমাব তো সাদা মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

চালক লিখল, ওরা সাদা মানুষই বটে।

সমস্ত প্রান্তর জুড়ে ইতস্তত ছড়ানো বড় বড় পাথরের চাঁই ও ঝর্ণা থাকার জন্য নিরাপদে নামবার মত জায়গা পাওয়াই ভার। তারই মধ্যে দুটো মাত্র জায়গা অপেক্ষাকৃত ভাল—একটা গ্রামেব ঠিক সামনে, আর অপরটি বনের কাছাকাছি। সেখানে ওয়াজিরিরা হাজির হয়েছে দেখে চালক স্থির করল গ্রামের কাছে সাদা মানুষদেব পাশেই নামবে। কী মারাত্মক ভুল !

মুভিরো সদলে এগিয়ে চলেছে গ্রামেব দিকে। তখন দেখতে পেল, ত্ব'জন আরোহী কক-পিট থেকে নামছে, আর কাভুরু গ্রামেব খোলা ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছে অসভ্য সাদা যোদ্ধার দল।

মুভিবো দেখেই বুঝতে পারল, ওরা শত্রুপক্ষ। সে বুঝতে পেরেছে যে ওরাই কাভুরু। বর্শা উঁচিয়ে চীৎকার করতে করতে ওবা ছুটে যাচ্ছে দুই বিমান-যাত্রীকে লক্ষ্য কবে। যতদূব মনে হয়, ওয়াজিবিদের উপস্থিতিটা ওবা তখনও টের পায়নি।

নীচু গলায় সঙ্গীদের কি সব বলে মুভিরো সদলবলে এগোতে লাগল। তারা মাত্র দশজন, কাভুরুরা সংখ্যায় অনেক বেশী, প্রতি একজনে দশজন; তবু তারা সাহস হাবায় নি।

বিমানযাত্রীরা যখন বুঝতে পাবল যে আদি-বাসীবা তাদেব আক্রমণ কবতে আসছে, তখন তাবাও বিমানেব দিকে ফিরে চলল। একজন কাভুরুদের মাথার উপব দিয়ে একটা গুলি ছুঁড়ল; তাতেও কাভুরুবা থামল না দেখে আবার গুলি ছুঁড়ল; এবার একজন কাভুরু মাটিতে পড়ে গেল। তবু তারা এগোতেই লাগল।
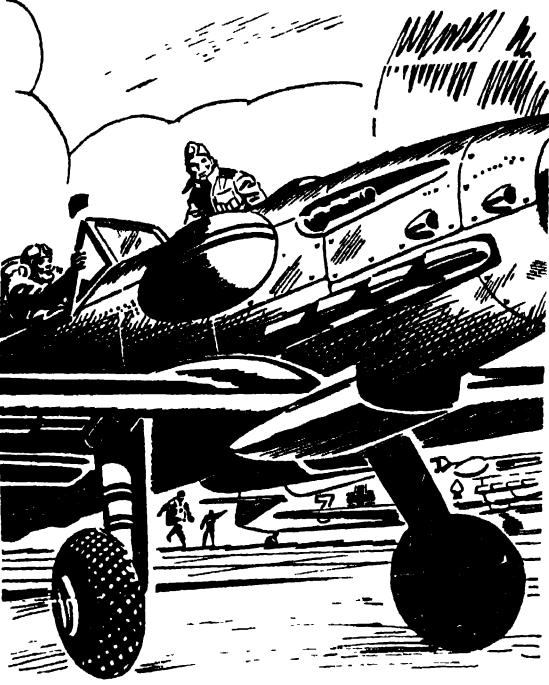
এবার দুই বিমানযাত্রীই গুলি ছুঁড়তে লাগল কিন্তু কাভুরুরা থামল না। অচিরেই তারা দুজন শত্রুর বর্শার আওতার মধ্যে যাবে। একটা সাময়িক আশ্রয়ের আশায় দুজনই পিছন ফিরে তাকাল, কিন্তু যা দেখল তাতে তারা প্রমাদ গুণল—একদল কালো সৈনিক সার বেঁধে নিঃশব্দে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা ততক্ষণে হয়ে গেছে—ওয়াজিরিরা এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেবার আগেই কাভুকরা তাদের আরও কাছে এসে পড়ল। দুজনের পিস্তলের গুলিতে কাভুকুদের আরও কয়েকজন ধরাশায়ী হল। তবু তারা এগোতে লাগল। একসময় কাভুক ও ওয়াজিরি দুই দলই তাদের কাছে এসে পড়ল।

কাভুকুদের হাতের বর্শা উড়তে লাগল। বুকে বর্শা বিঁধে নবাগতদের একজন পড়ে গেল। এবার বর্শা ছুঁড়তে লাগল ওয়াজিরিরা। সাময়িকভাবে কাভুকুদের গতিরোধ করা গেল।

কিন্তু সে তো মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই আবার তারা বর্শা ছুঁড়তে লাগল। এবার দ্বিতীয় বিমান-যাত্রীও পড়ে গেল। সেই সঙ্গে পড়ল তিনজন ওয়াজিরি। তারপরেই কাভুক ও ওয়াজিরিদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল হাতাহাতি যুদ্ধ।

ওয়াজিরিরা এখন সংখ্যায় সাত। সাহসে ভর করে তারা যুদ্ধ করছে। কিন্তু সংখ্যায় অনেক বেশী কাভুকদের সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারবে কেন? যুদ্ধ চালাতে চালাতেই মুভিরো ও তার অন্যতম সঙ্গী বালান্দো মৃত বিমানযাত্রীদের পিস্তল ও গুলি হাতিয়ে নিল। এবার মুখোমুখি যুদ্ধে পিস্তলের পাল্লাই ভারি হয়ে উঠল; কাভুকরা হকচকিয়ে গেল; সেই সুযোগে মুভিরো ও তার দলের লোকরা একটা আশ্রয় খুঁজে নেবার মত সময় পেয়ে গেল। এখন তারা দলে মাত্র চারজন—মুভিরো, বালান্দো ও আর দু'জন।

মুভিরো একটা উচু গ্র্যানিট পাথরের উপর উঠে গেল, তার একমাত্র সঙ্গী বালান্দো। মুভিরো গুলি চালিয়ে কাভুকুদের আটকাতে লাগল। আর সেই সুযোগে বালান্দো উঠে গেল একেবারে চুড়োয়। তারপর সে গুলি চালাতে লাগল, আর মুভিরো পাহাড় বেয়ে উঠে গেল তার পাশে।

ফলে কাভুরুরা রণে ভঙ্গ দিয়ে গ্রামের দিকে ফিরে গেল। গোধূলির আলোয় মুভিরো স্পষ্ট দেখতে পেল, তারা সকলেই সার বেঁধে গ্রামের ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

দুঃখিত মনে মুভিরো ও বালান্দো পাহাড়ের আশ্রয় থেকে নীচে নেমে এল। এবার রাতের মত একটা আশ্রয় দরকার।

গাছে উঠে চলতে চলতে হঠাৎ একটা গন্ধ এসে টারজনের নাকে লাগল। যে দিক থেকে গায়ের গন্ধ আসছিল টারজন সেই দিকেই দ্রুত এগোতে লাগল। নাকই তাকে বলে দিল এ গন্ধ দুটি সাদা পুরুষের। একটি নারীর দেহ-গন্ধের আশায় বৃথাই সে শ্বাস টানতে লাগল।

টারজন এবার গতি কমিয়ে দিল। এগোতে লাগল নিঃশব্দে। অবশেষে দেখতে পেল, দুটি মানুষ ক্লান্ত পদক্ষেপে তার নীচেকার পথ ধরেই চলেছে।

এক সময় দুজনই বসে পড়ল। উপরে ঘাপটি মেরে বসে টারজন তাদের সব কথাই শুনতে পেল। কোন কথাই বাদ গেল না।

টিব্‌স্ বলল, মিঃ এবুলমিস আনেৎকে তুলে নিয়ে চলে গেল, অথচ আনেৎ চীৎকার করল না, এটা তো হতে পারে না।

ব্রাউন বলল, আনেৎ হয় তো ভয়ে চীৎকার করে নি। লোকটাকে সে ভীষণ ভয় করত।

লেডি গ্রেস্টোক তো তাকে ভয় করত না। তাহলে সে কেন সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকল না?

টিব্‌স্ বলল, তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। লেডি গ্রেস্টোক একটি অসাধারণ মহিলা। আমি তো এখনও আশা রাখি তাকে খুঁজে পাব।

কিন্তু আনেতের কি হল? সে কথা যদি কেউ বলতে পারত—

টারজন তখন নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে তাদের দুজনের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সে বলল, আমি বলতে পারি।

তার গলা শুনে দুজনই ঘূরন্ত চাকার মত ঘুরে দাঁড়াল। দুজনই বিস্ময়ে বিমূঢ়।

একটু পরেই ব্রাউন বলল, কে তুমি? আর কোত্থেকেই বা এখানে উদয় হলে? আর কি বলতে পার তুমি?

বলতে পারি কি ভাবে তোমাদের দুটি স্ত্রীলোক উধাও হয়ে গেছে।

কি বলছ তুমি? এ যে এক আজব দেশরে বাবা। এখানে যখন-তখন মানুষ উধাও হয়ে যায়। আর তুমি হাওয়ার ভিতর থেকে লাফিয়ে নেমে এলে একটা জ্যান্ত ভূতের মত। তুমি কে? বন্ধু না—

বন্ধু, টারজন জবাব দিল।

এরকম বিনা পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? ব্রাউন জানতে চাইল; তোমার কি জামা-কাপড় নেই, না কি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই?

আমি বানররাজ টারজন।

আচ্ছা! তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম; আমি নেপোলিয়ান। কিন্তু এবার হড়হড় করে বলে ফেল তো আনেৎ সম্পর্কে কি জান— দুটি মহিলার কথাই বল। কে তাদের নিয়ে গেছে? স্বরভ কি? অবশ্য তুমি তো স্বরভকে চেনই না।

টারজন বলল, স্বরভকে আমি চিনি। তোমাদের বিমান দুর্ঘটনার কথাও জানি। আমি জানি যে প্রিন্সেস স্বরভ খুন হয়েছে। আর লেডি গ্রেস্টোক ও আনেতের কি হয়েছে সেটাও জানি বলেই মনে হয়।

ব্রাউন অবাক। বলল, এত কথা তুমি জানলে কেমন করে? এবার চটপট বল, মহিলা দুটির কি হয়েছে।

তারা কাভুকুদের হাতে ধরা পড়েছে। তোমরা এখন কাভুকুদের দেশে।

কাভুক কারা? ব্রাউন প্রশ্ন করল।

অসভ্য সাদা মানুষদের একটি উপজাতি। অদ্ভুতভাবে তারা মেয়েদের চুরি করে হয় তো কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাদের বলি দেয়।

কোথায় থাকে তারা ?

তা জানি না। তাদের গ্রামের খোঁজে এসেই তোমাদের বিমান-দুর্ঘটনার কথা জানতে পারি। আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই সেটাকে খুঁজে পাব। কাভুরুদের এমন কতকগুলি গুপ্ত ব্যাপার আছে যাকে তারা লুকিয়ে রাখতে চায় ; কাজেই তাদের গ্রামের ত্রিসীমানায় কাউকে ঘেঁসতে দেয় না।

কিসের গুপ্ত ব্যাপার ? ব্রাউন প্রশ্ন করল।

লোকের বিশ্বাস, তারা একরকম অমৃত আবিষ্কার করেছে যা খেলে বুড়ো মানুষ আবার যুবক হতে পারে।

ব্রাউন শিস দিয়ে উঠল। বটে ! আমরাও তো সেই খোঁজেই এসেছি।

অবিশ্বাসের সুরে টারজন বলল, তোমরা খুঁজছ কাভুরুদের ?

ব্রাউন বলল, বৃদ্ধ মহিলাটি সেই অমৃতের খোঁজেই এসেছিল ; আমিও তাই—হঠাৎ সে থেমে গেল। রাগে তার মুখ কালো হয়ে উঠল। চীৎকার করে ডাকল, সুবরভ !

বাঁকটা ঘুরেই ব্রাউনকে দেখে প্রিন্স থমকে দাঁড়াল। আমেরিকানটি এগিয়ে গেল তার দিকে।

সুবরভ টারজনকে লক্ষ্য করে বলল, ওকে থামাও।

এক লাফে এগিয়ে গিয়ে টারজন ব্রাউনের হাত চেপে ধরল। হুকুমের ভঙ্গীতে বলল, থাম !

নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে ব্রাউন বলল, আমাকে যেতে দাও মুখ্খু কোথাকার। নিজের চরকায় তেল দাও গে। একটা বিরাশী সিক্কার ঘুসি বাগিয়ে সে টারজনের চোয়াল লক্ষ্য করে হাত তুলল। চকিতে সরে গিয়ে সে ব্রাউনকে চেপে ধরে দুই হাতে শূন্যে তুলে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, নেপোলিয়ান হে, ওয়াটারলুর কথা বেমালুম ভুলে গেছ যে।

তার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে ব্রাউন বলল, সেটা এক আছাড়েই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না সেই উকুনটাকে মারতে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন।

কারণ তোমাদের ঝগড়াটা এখন বড় কথা নয়, আসল কথা হচ্ছে লেডি গ্রেস্টোকের পাত্তা করা।

আর আনেতের, ব্রাউন যোগ করল।

ঠিক, টারজন বলতে লাগল। তোমাদের তিনজনকে সভ্য জগতে ফেরৎ পাঠানোও দরকার। তোমরা কেউ জঙ্গলের লোক নও। তবু বোকার মত জঙ্গলে এসে নিজেরাও বিপদে পড়েছ, আর অন্যদেরও বিপদ ঘটিয়েছ।

টিব্স্ এতক্ষণে সাহস করে বলল, যদি অনুমতি কর তো বলি, আমিও তোমার সঙ্গে একমত।

এতক্ষণে টারজনের খেয়াল হল সবরভ সরে পড়েছে।

বারকয়েক তার নাম ধরে ডাকল, কিন্তু কোন সাড়া মিলল না।

ব্রাউন বলল, তার প্রতীক্ষায় আমরা কি এখানেই বসে থাকব ?

টারজন জবাব দিল, না। আমি যাচ্ছি কাভুরুদের গ্রামের খোঁজে। পূব দিকে কোথাও আমার লোকজনরা রয়েছে। তোমাদের নিয়ে তাদের কাছে যাব। চল।

মইটার শেষ ধাপে পৌঁছে একটা অস্পষ্ট শব্দ জেনের কানে এল। কাছেই কে যেন নড়াচড়া করছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ভাল করে কান পাতল। উপরের চতুষ্কোণ ফোঁকড় দিয়ে সামান্য আলো আসায় ঘরের অন্ধকার কিছুটা হাল্কা হয়েছে। একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর ইংরেজীতে বলল, ম্যাডাম তুমি! তারা তোমাকেও ধরেছে?

আনেৎ, তুমি এখানে? তাহলে প্রিন্স তোমাকে চুরি করে নি?

না ম্যাডাম। একটা ভয়ংকর সাদা মানুষ মন্ত্র-বলে আমাকে অসহায় করে এখানে তুলে এনেছে। সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে পারি নি। কোন রকম বাধা পর্যন্ত দেই নি। স্বেচ্ছায় তার কাছে এলাম আর সে আমাকে গাছের উপর তুলে নিয়ে চলে এল।

ওদেরই একজন আমাকেও ওই একই ভাবে এনেছে আনেৎ। ওরা যাদু জানে। ওরা কি তোমার কোন ক্ষতি করেছে আনেৎ?

তা করে নি। তবে আমি খুব ভয় পেয়ে গেছি। না জানি আমাকে নিয়ে ওরা কি করবে।

কি করবে বলে তোমার মনে হয়? জেন প্রশ্ন করল। কোন রকম আঁচ কিছু পেয়েছ?

না ম্যাডাম, কিছু বুঝতে পারছি না। তোমাকেও ওরা কিছু বলে নি?

যে লোকটি আমাকে ধরে এনেছে তার নাম ওগ্‌লি। সে শুধু বলেছে যে আমাকে কাবান্দা-বান্দার কাছে নিয়ে যাবে। যতদূর জেনেছি সেই তাদের সর্দার। তারা বড় বাজে লোক।

ওইটুকু বললে সব বলা হয় না ম্যাডাম। তারা ভয়ংকর লোক। এ সময় মঁসিয়ে ব্রাউন যদি এখানে থাকত। হায়, তার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। আমার মন বলছে, এখানেই আমার মরণ হবে।

বাজে কথা রাখ আনেৎ। ওসব কথা মুখেও এনো না। এখন আমাদের একমাত্র চিন্তা—কেমন করে এখান থেকে পালাব।

পালাব? তার কি কোন উপায় আছে ম্যাডাম?

জেন আশ্বাস দিয়ে বলল, আমি দেখেছি এই কুঠুরিতে ঢোকার মুখে কোন পাহারা নেই; রাতেও যদি কোন পাহারা না বসায় তাহলে সহজেই আমরা ছাদে উঠে যেতে পারব। তারপর সেখান থেকে কি ঘটবে কপালে তা ভবিতব্যই জানে; তবু একবার চেষ্টা করে তো দেখতে হবে।

আপনি যা বলবেন ম্যাডাম।

তাহলে আজ রাতেই।

স্-শ, ম্যাডাম! কে যেন আসছে।

মইয়ের মুখে একটা লোক এসে দাঁড়াল। হুকুম করল, চলে এস! দু'জনই।

জেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হায়রে দুরাশা!

দু'জন ছাদে উঠে গেল। লোকটিকে চিনতে পেরে জেন বলল, এবার কি হবে ওগ্‌লি? আমাদের মুক্তি দেবে কি?

চুপ কর, কাভুরুটি হুংকার দিল। তুমি বড় বেশী কথা বল। কাবান্দাবান্দা তোমাকে ডেকেছে। তার কাছে বেশী কথা বলোনা।

ওগ্‌লি জেনের হাত ধরে টান দিল—একখানি নরম, মসৃণ, রোদে-পোড়া হাত। হঠাৎ থেমে

গিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল। জেনেব মুখের দিকে তাকিয়ে একটা নতুন অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল তাব চোখে। আগে তোমাকে ভাল করে দেখি নি, চাপা গলায় সে বলল। আগে তোমাকে ভাল করে দেখি নি। প্রায় অশ্রুত তার কণ্ঠস্বর।

বিদ্যুৎ-ঝলকের মত দাঁত বেব করে জেন দেখাল। বলল, আমার দাঁতেব দিকে তাকাও। অচিরেই এই দাঁতেব মালা ঝুলবে তোমার গলায়। তোমাব হবে চাবনরী হার।

ফ্যাসফেঁসে গলায় ওগ্‌লি বলল, তোমাব দাঁত আমি চাইনা গো মেয়ে। তুমি আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছ। যে নাবীসঙ্গ আমি প্রতিজ্ঞা করে ত্যাগ করেছি, সেই নারীই আমাকে যাদু করেছে।

বিদ্যুৎগতিতে জেন অনেক কিছু ভেবে নিল। ফিস্‌-ফিস্‌ করে বলল, ওগ্‌লি, ইচ্ছা করলেই তুমি আমাকে সাহায্য করতে পাব। এ কথা কেউ কোন দিন জানবে না। রাত পর্যন্ত আমাদের সাহায্য করতে পার। এ কথা কেউ কোন দিন জানবে না। রাত পর্যন্ত আমাদের লুকিয়ে রাখ। কাবান্দাবান্দাকে বল যে আমাদের খুঁজে পাচ্ছ না, আমরা পালিয়েছি। তারপর অন্ধকার হলে আমাদের গ্রামের বাইবে রেখে এসো। কাল ফিরে এলেই তুমি আমাদেব—অন্তত আমাকে বনের মধ্যে দেখতে পাবে।

ওগ্‌লি বার কয়েক মাথা নাড়ল। তারপব হঠাৎ 'না! বলে চীৎকার করেই ওগ্‌লি কঠিন মুঠিতে জেনের হাত ধরে তাকে টানতে টানতে এগিয়ে চলল। তোমাকে কাবান্দাবান্দার কাছে নিয়ে যাবই।

জেন শুধাল, তুমি আমাকে এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তো একটি মেয়েমানুষ মাত্র।

তাই তো তোমাকে আমাব ভয়। দেখতে পাচ্ছ এখানে কোন মেয়েমানুষ নেই। যে সব মেয়েদেব কাবান্দাবান্দার জন্য আনা হয়েছে তারা ছাড়া আব কেউ নেই। আমি একজন পুবোহিত। আমরা সকলেই পুরোহিত। মেয়েমানুষরা আমাদের অপবিত্র কবে দেবে। যদি আমরা দুর্বল হয়ে তাদের ছলাকলায় ভুলে যাই, তাহলে মৃত্যুব পবে চিবকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে; আবার কাবান্দাবান্দা যদি সে কথা জানতে পাবে তাহলে অচিবেই আমাদের মৃত্যু হবে তীব্র যন্ত্রণায়।

দুটি মেয়েকে নিয়ে ওগ্‌লি রাজপথ ধরে ছুটতে লাগল গ্রামের পিছন দিক লক্ষ্য করে।

জেন বলল, তুমি তো কাবান্দার বন্ধু। তাকে বলে এই মন্দিবে তোমার থাকার ব্যবস্থা কর।

কেন? ওগ্‌লির স্বরে সন্দেহের ছোয়া।

কারণ এখানে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু। তুমি কাছে না থাকলে আমার ভয় করবে।

একটা চাপা গর্জন করে ভুরু কুঁচকে ওগ্‌লি বলল, আবার তুমি আমাকে মজাতে চেষ্টা করছ?

তার কাঁধে হাত রেখে জেন ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, কাবান্দাবান্দার অনুমতি চাইবে তো ?

ওগ্‌লি মুখ ঘুরিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল ; কিন্তু জেনের ঠোঁটে খুশির হাসি ফুটল। সে বুঝতে পেরেছে যে তারই জয় হয়েছে।

জেনকে হাজির করা হল কাবান্দাবান্দা মন্দিরের প্রশস্ত কেন্দ্রীয় কক্ষে। কক্ষটি বড়। গাছের গুঁড়ির উপর বসানো নীচু ছাদ। কাঠের মেঝেতে পালিশ। প্রতিটি স্তম্ভের উপরে একটা করে দাঁতবিহীন মাথার খুলি সাজানো। ছাদের মাঝখানে ঘরের একটি মাত্র খোলা জায়গা দিয়ে প্রচুর সূর্যের আলো এসে পড়েছে। চিতাবাঘের চামড়ায় মোড়া বেদীর উপর স্থাপিত প্রকাণ্ড সিংহাসনে উপবিষ্ট একটি মূর্তি।

সিংহাসনে উপবিষ্ট লোকটির দিকে প্রথম দৃষ্টিতে তাকিয়ে জেন বিস্ময়ে ঢোক গিলল। লোকটি সুদর্শন।

সঙ্গিনী দুটিকে বেদীর কাছে এনে ওগ্‌লি নতজানু হল ; কর্কশ গলায় তাদেরও নতজানু হতে হুকুম করল। আনেৎ ভয়ে ভয়ে হুকুম পালন করল, কিন্তু জেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নির্ভীক চোখে সিংহাসনারূঢ় লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল।

লোকটি যুবক ; চওড়া কটি-বন্ধনী ও নানা অলংকার ছাড়া প্রায় নগ্নদেহ। মানুষের দাঁতের হার গলা থেকে নেমে বুক পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে কটি-বস্ত্রের কাছে নেমে এসেছে। কব্জিতে, বাহুতে, গোড়ালিতে ধাতু, কাঠ ও হাতির দাঁতের নানা অলংকার। কিন্তু জেনের দৃষ্টি সে সবের দিকে নেই ; সে স্থির দৃষ্টিতে দেখছে যুবকটির দেবোপম মুখ ও সুগঠিত দেহখানিকে।

এক দৃষ্টিতে জেনের দিকে তাকিয়ে থেকে লোকটি রাজকীয় ভঙ্গীতে আদেশ করল, "নতজানু হও!"

এই তো কাবান্দাবান্দা, অথচ তার কল্পনার মূর্তির চাইতে কত আলাদা। এই তো সত্যিকারের রাজা ; শুধু রাজা নয়, একাধারে ত্রিশক্তি—কাভুরুদের রাজা, ওঝা ও ঈশ্বর। সিংহাসনের দুই পাশে দুটি চিতাবাঘ ছাড়া বেদীর উপরে সে একাই আসীন। তার নীচে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাভুরু সৈনিকরা ; আর আছে মোটা-সোটা ক্রীতদাসরা।

জেন জানতে চাইল, কেন ? কেন আমি তোমার সামনে নতজানু হব ?

আমি কাবান্দাবান্দা।

সেজন্য একটি ইংরেজ মহিলা তোমার সামনে নতজানু হবে কেন ?

যুবকটি বলল, তুমি নতজানু হবে না ?

নিশ্চয় না।

দুটি ক্রীতদাস জেনের দিকে এগিয়ে গেল।

কাবান্দাবান্দা হাতের ইশারায় তাদের সরে যেতে বলল। বিচিত্র ভঙ্গীতে তার ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল। সেটা খুশিতে, না ক্রোধে তা বুঝতে পারল না জেন।

ওগ্‌লি ও জেনকে উঠে দাঁড়াতে বলে যুবক জেনের দিকে ফিরে বলল, তুমি কে? আর কাভুরুদের দেশে কেন এসেছ?

আমি জেন ক্লেটন, লেডি গ্রেস্টোক। উড়োজাহাজ লণ্ডন থেকে নাইরোবি যাবার পথে আমরা মাঝখানে নামতে বাধ্য হই। সঙ্গীদের নিয়ে উপকূলে পৌছবার পথে তোমার সৈনিকরা এই মেয়েটিকে ও আমাকে অপহরণ করে। আমি চাই, তুমি আমাদের মুক্তি দিয়ে নিকটবর্তী কোন বন্ধু গ্রামে পৌঁছে দাও।

কাবান্দাবান্দার ঠোঁটে একটু বাঁকা হাসি খেলে গেল। বলল, তাহলে তোমরাও একটা দানব পক্ষির পিঠে চড়ে এসেছ। আরও দু'জন এসেছে কাল। দানব পক্ষিটার পাশেই তাদের মৃতদেহ পড়ে আছে। আমার লোকজন দানব পক্ষিটাকে ভয় করে। কিছুতেই তার কাছে যাবে না। বলতো, সেটা কি ওদের কোন ক্ষতি করবে?

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ওদের এই কুসংস্কারকে কাজে লাগাবার জন্য জেন বলল, ওটা থেকে দূরে থাকাই ভাল। ও রকম দানব পক্ষি আরও অনেক আসবে। তারা যদি দেখে তোমরা আমার বা সঙ্গিনীর কোন ক্ষতি করেছ, তোমার এই গ্রাম ও লোকজনদের তারা ধ্বংস করে ফেলবে। আমাদের নিরাপদে পাঠিয়ে দাও; আমরা তাদের বলে দেব, যেন তোমাদের কোন ক্ষতি না করে।

যুবক জবাব দিল, তোমরা যে এখানে আছ তারা তা জানতেই পারবে না। কাভুরুদের গ্রামে অথবা কাবান্দার মন্দিরে কি ঘটে কেউ জানতে পারে না।

তুমি আমাদের ছেড়ে দেবে না?

না। এ গ্রামের ফটক দিয়ে একবার যে ঢোকে সে আর বের হতে পারে না—আর তুমি তো পারবেই না। অনেক মেয়ে আমার কাছে এসেছে, কিন্তু তোমার মত কেউ আসে নি।

তোমার তো অনেক মেয়ে আছে। তাহলে আমাকে চাইছ কেন?

আধ-বোঝা চোখে জেনের দিকে তাকিয়ে সে বলল, আমি জানি না। ওগ্‌লি, এদের নিয়ে যাও তিন-সাপের ঘরে।

আনেৎ বলে উঠল, তিন-সাপের ঘর! সে ঘরে কি তিনটে সাপ থাকে?

যেতে যেতে জেন বলল, যে সব ঘর পার হয়ে যাবে তার দরজার উপরে চোখ রেখো। তাহলেই তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে। একটা দরজার মাথায় আছে শুয়োরের মাথা। আর একটাতে আছে দুটো মানুষের খুলি। একটাতে আছে চিতার মাথা। এই ভাবেই এরা ঘরের নামকরণ করে থাকে, ঠিক আমরা যেমন হোটেলের ঘরে সংখ্যা লিখে দেই।

মন্দিরের তিন তলায় উঠে ওগ্‌লি তাদের নিয়ে যে ঘরটায় ঢুকল, সত্যি তার দরজার উপরে তিনটে সাপের মাথা খোদাই করা।

ওগ্‌লি বলল, পালাবার চেষ্টা করো না, তাতে কোন লাভ হবে না।

জেন বলল, মোটেই সে চেষ্টা করছি না। তুমি সাহায্য না করলে আমাদের পক্ষে পালানো অসম্ভব। তুমিই আমাদের একমাত্র বন্ধু।

হঠাৎ লোকটি প্রশ্ন করল, কাবান্দাবান্দা কি ভাবে তোমাকে দেখছিল সেটা কি তুমি লক্ষ্য করেছ ?

না তো, জেন বলল।

আমি করেছি; আগে কখনও কোন বন্দীর দিকে ওভাবে তাকাতে তাকে আমি দেখি নি। কিন্তু সে যদি এ কাজ করতে চেষ্টা করে, তাহলে আমি—

বারান্দায় কিসের শব্দ শুনে ওগ্‌লি চুপ করে গেল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকল একটি ক্রীতদাস। সে পাশে সরে দাঁড়াতেই প্রকাশ পেল কাবান্দাবান্দাব মূর্তি।

সে ঘরে ঢুকতেই ওগ্‌লি নতজানু হল। আনেৎ তাকে অনুকরণ করল। কিন্তু জেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কাবান্দাবান্দা বলল, তোমরা উঠে দাঁড়াও। জেন নামক এই মেয়েটি ছাড়া বাকি সকলেই বারান্দায় বেরিয়ে যাও। আমি ওর সঙ্গে নির্জনে কথা বলতে চাই।

ওগ্‌লি সোজাসুজি কাবান্দাবান্দাব চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে; কাভুকুর পুরোহিতদের প্রধান পুরোহিত, আমি যাচ্ছি; কিন্তু আমি কাছাকাছিই থাকব।

মুহূর্তের জন্য কাবান্দাবান্দার মুখটা ক্রোধে লাল হয়ে উঠল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। সকলে বেরিয়ে গেলে একটা বেঞ্চি দেখিয়ে জেনকে বসতে বলে নিজে তার পাশে বসল। অনেকক্ষণ জেনের দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় বলল, তুমি খুব সুন্দর। তোমার চাইতে বেশী সুন্দর কাউকে আমি দেখি নি। বড়ই দুঃখের কথা; বড়ই দুঃখের কথা।

দুঃখের কথাটা কি ? জেন জানতে চাইল।

প্রসঙ্গ চাপা দিতে যুবক বলে উঠল, কিছু মনে করো না। আমার চিন্তাটা একটু সরব হয়ে গেছে। সে আবার চুপ করল; কিসের চিন্তায় ডুবে গেল।

পরে আবার বলতে লাগল, তোমাকে বলা যেতে পারে। তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি বুঝতে পারবে—অবশ্য আমি যদি যথেষ্ট শক্তিমান হই। কিন্তু যখন তোমার দিকে তাকাই, ওই দুটি চোখের গভীরে যখন দৃষ্টি মেলে দিই, তখন আমি বড় দুর্বল হয়ে পড়ি। না, না! আমি কর্তব্য পালনে বিচলিত হব না; জগৎ আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, আমাকে কর্তব্য সাধন করতেই হবে।

তুমি কি বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, জেন বলল।

পারবে—পারবে। অনেক কাল আগে মৃত্যুহীন যৌবনের গুপ্ত কথা আমি জানতে পারি। কতকগুলি বিশেষ ফুলের রেণু, কতকগুলি গাছের শিকড়, চিতাবাঘের শিরদাঁড়ার মজ্জা, আর প্রধানত নারীর —যুবতী নারীর গ্রন্থি ও রক্ত—এমনি সব বস্তুর মিশ্রনে তৈরী হয় সেই যৌবন-রসায়ন। বুঝতে পেরেছ ?

হ্যাঁ। জেন শিউরে উঠল।

চমকে উঠো না ; মনে রেখো, এই ভাবেই তুমি হবে জীবন্ত ঈশ্বরের অংশ। তুমি বেঁচে থাকবে চিরকাল। গৌরবে দীপ্ত হবে তুমি।

কিন্তু এসব কিছুই তো আমি জানতে পারব না; তাহলে তাতে আমার কি লাভ ?

আমি জানব যে তুমি আমার একটি অংশ। আর সেই ভাবেই আমি তোমাকে পাব। সে আরও ঝুঁকল। কিন্তু তুমি যেমন আছ তেমনি তোমাকে রাখতে চাই আমি। জেনের কপোলে লোকটির গরম নিঃশ্বাস পড়ছে। কেন নয় ? আমি কি প্রায় ঈশ্বর নই ? ঈশ্বর কি ইচ্ছামত কাজ করতে পারে না ? কে তাকে বাধা দেবে ?

জেনকে চেপে ধরে সে তাকে কাছে টানল।

অসহায় মেয়েটি কি করবে ! আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিবশেই লোকটির ঠোঁটকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চীৎকার করে ডাকল : ওগ্‌লি !

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা সপাটে খুলে গেল। কাবান্দাবান্দা জেনকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মেঝেটা পার হয়ে ওগ্‌লিও থামল। দু'জন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মুহূর্তের জন্য কাবান্দা-বান্দার মুখ ও গলা রাগে লাল হয়ে উঠল। তারপরেই মরার মত সাদা মুখে সে ওগ্‌লির পাশ দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। একটা কথাও বলল না।

সৈনিক অতি দ্রুত জেনের কাছে গিয়ে বলল, ও আমাদের দুজনকেই খুন করবে। আমাদের পালাতেই হবে ; তাহলেই তুমি আমার হবে। মন্দির চত্বর ও গ্রামের নীচ দিয়ে একটা গোপন সুড়ঙ্গ আমি চিনি। জড়ি-বুটির খোঁজে কাবান্দা-বান্দা মাঝে মাঝে সেই পথ দিয়ে যায়। অনেক রাত হলে আমরা যাব।

রাগে লাল হয়ে কাবান্দাবান্দা যখন প্রাসাদের অলিন্দপথে হেঁটে যাচ্ছে তখন একজন বন্দীসহ ইদেনির সঙ্গে তার দেখা হল।

তোমার সঙ্গে ও কে ?

ইদেনি নতজানু হয়ে বলল, এর ও মাথায় দানো ঢুকেছে। তাই তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।

প্রধান পুরোহিত হুংকার দিয়ে উঠল, এখান থেকে নিয়ে যাও। তালাবন্ধ করে রাখ। কাল সকালে নিয়ে এস।

স্ববরভকে নিয়ে তিন তলায় উঠে ইদেনি তাকে একটা অন্ধকার ঘরে ঠেলে দিল। এটা দুই-সাপের ঘর। পাশেই তিন-সাপের ঘর। বাইরে থেকে দরজায় খিল এঁটে ইদেনি চলে গেল।

পাশের ঘরে ওগ্‌লি বলল, আমি যাচ্ছি। এখন আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

কিন্তু—আনেৎ কোথায় ?

পাশের ঘরে।

তাকেও সঙ্গে নেবে তো ?

দেখি। তুমি কিন্তু পালাবার চেষ্টা করো না। গুপ্ত পথ ছাড়া অপর একমাত্র পথ চত্বরের ভিতর দিয়ে। সেখানে ঢুকলেই নিশ্চিত মৃত্যু। সাবধান !

বেরিয়ে যাবার আগে ওগ্‌লি দরজাটা বন্ধ করে বাইরে থেকে খিল এঁটে দিয়ে গেল।

দুই-সাপের ঘরে অন্ধকারে স্বরভ একা।

পাশের ঘরে অস্পষ্ট শব্দ শুনে হাতড়াতে হাতড়াতে একটা দরজা পেল। তালাবন্ধ। বৃথাই সেটা টানাটানি করল।

পাশের ঘরে জেন সে শব্দ শুনে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ওগ্‌লি বলেছে, আনেৎ আছে পাশের ঘরে। তাহলে তো সেই শব্দ করছে।

জেন দেখতে পেল, তার দিকে দরজায় একটা ভারী হুড়কো লাগানো। খুব সাবধানে সে একটু একটু করে হুড়কোটা সরাতে লাগল। ওপাশে আনেৎও তালা ধরে টানাটানি করছে। দুজনের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। অস্পষ্ট আলোয় একটি মূর্তিকে ঘরে ঢুকতে দেখে জেন ফিস্‌ফিস্ করে ডাকল, আনেৎ !

কথা বলল একটি পুরুষ কণ্ঠ। সে মারা গেছে। ব্রাউন তাকে খুন করেছে। জেনকেও সেই মেরে ফেলেছে। তুমি কে ?

এলেক্সিস ! জেন চেঁচিয়ে বলল।

তুমি কে ? স্বরভ প্রশ্ন করল।

আমি জেন—লেডি গ্রেস্টোক। তুমি কি আমার গলা শুনে বুঝতে পারছ না ?

তা পারছি, কিন্তু তুমি তো মৃত। কিটি কি তোমার সঙ্গে আছে ? হা ঈশ্বর !

উল্টো দিকের দরজা থেকে কে যেন ছুটে এল। শোনা গেল আনেতের গলা। মাডাম ! মাডাম ! এসব কি ? কি হয়েছে ?

স্বরভ সভয়ে বলে উঠল, ও কে ? আমি জানি —ও আনেৎ। তোমরা সবাই আমার উপর ভর করেছ।

জেন সান্ত্বনার সুরে বলল, শান্ত হও এলেক্সিস। কিটি এখানে নেই, আর আনেৎ ও আমি দুজনই বেঁচে আছি। বলতে বলতে সে আনেতের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে হুড়কোটা খুলে দিল।

স্বরভ আর্তনাদ করে উঠল, ওকে ঢুকতে দিও না ! তুমি ভূত হও আর যাই হও, ওকে ঘরে ঢুকতে দিলে আমি তোমাকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।
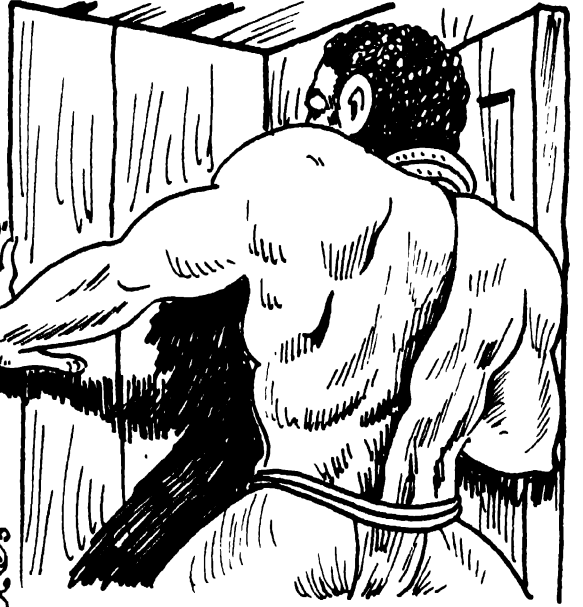
সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে আনেৎ ছুটে এল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বারান্দার দরজা খুলে ঘরে ঢুকল কালো ক্রীতদাস মেডেক।

সে বলল, কি হচ্ছে এখানে ? এ লোকটাকে কে এখানে আসতে দিল ?

আনেৎকে দেখে সুবরভ ভয়ে কুঁকড়ে সরে গেল। তার পরেই মেডেককে দেখে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, কিটি! না, আমি যাব না। তুমি চলে যাও!

মেডেক এগিয়ে গেল। সুবরভ ঘুরে ঘরের একমাত্র জানালাটার দিকে ছুটে গেল। একমুহূর্ত গোবরাটে দাঁড়িয়ে থেকে পিছনে তাকিয়ে মেডেকের অস্পষ্ট মূর্তিটাকে দেখতে পেয়ে আতংকে চীৎকার করতে করতে বাইরের অন্ধকার চত্বরে লাফিয়ে পড়ল।

বাইরে পায়ের শব্দ শুনে আনেৎ বলল, স্-স্-স্ ম্যাডাম! কে যেন আসছে।

জেন কান পেতে বলল, ধপাস্ করে কে যেন পড়ে গেল। শুনতে পেয়েছ?

হ্যাঁ। এ যে আর এক বিপদ।

দরজাটা সপাটে খুলে গেল; ঢুকল একটি মূর্তি। কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কোথায় তুমি? ওগ্‌লির কণ্ঠস্বর।

আমি এখানে, জেন জবাব দিল।

তাড়াতাড়ি চলে এস। সময় নষ্ট করো না।

মেডেক ছুটে গিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল। নীচ থেকে ভেসে এল সুবরভের আর্তকণ্ঠ। তাকেও ছাপিয়ে ভেসে এল অনেকগুলি চিতাবাঘের গর্জন ও হুংকার। বেচারি সুবরভ! সদ্য নিহত শিকারের মাংস নিয়ে চিতাদের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে গেল। তারপর সব শেষ। চুপ।

মেডেক জানালা থেকে ফিরে এসে বলল, এ পথে পালাবার চেষ্টা বৃথা। তারপর বাইরের বারান্দায় গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

আনেৎ বলল, কি দুঃখের ব্যাপার ম্যাডাম।

জেন বলল, সত্যি দুঃখের। তবে এ ভালই হল। প্রিন্স সুবরভ পাগল হয়ে গিয়েছিল।

চলে এস আনেৎ, জেন বলল।

অন্য মেয়েটিও এখানেই আছে? ওগ্‌লির প্রশ্ন।

জেন বলল, হ্যাঁ, আমি গেলে ও-ও যাবে।

কাভুরু বলল, তাই হবে। কিন্তু জলদি।

ওগ্‌লিকে অনুসরণ করে মেয়ে দুটি বারান্দায় বেরিয়ে এল।

অনেক বারান্দা ও ঘর পার হয়ে তিনজন এগিয়ে চলল সতর্ক পা ফেলে। ক্রমে রাত বাড়তে লাগল। তিনজনেরই একমাত্র লক্ষ্য জঙ্গলে পৌঁছবার গুপ্ত সুড়ঙ্গের মুখ।

এক সময় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওগ্‌লি বলল,

আমরা পৌঁছে গেছি। এই ঘরেই গুপ্ত সুড়ঙ্গের মুখ। কোন রকম শব্দ করো না।

সাবধানে দরজা ঠেলে তিনজন ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের ভিতর থেকে অনেকগুলো হাত বেরিয়ে এসে তাদের জাপ্‌টে ধরল। একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ জেন শুনতে পেল। শোনা গেল পলায়মান পদধ্বনি। তাকে টানতে টানতে বারান্দায় আনা হল। একজন নিয়ে এল একটা তৈল-প্রদীপ।

জেনের পাশে দাঁড়িয়ে আনেৎ ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচজন সৈনিক। ওগ্‌লি সেখানে নেই।

একজন সৈনিক বলল, কোথায় গেল ওগ্‌লি? নিশ্চয় সুড়ঙ্গ-পথে পালিয়েছে। ছুটে চল। তাকে ধরতেই হবে।

অপর সৈনিক বলল, এতক্ষণে সে অনেক দূরে চলে গেছে। আমরা ধরবার আগেই সে বনের মধ্যে পৌঁছে যাবে। রাতের অন্ধকারে সেখানে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সকাল হোক। তখন দেখা যাবে।

আর একজন বলল, সেই ভাল। আপাতত এই দুটিকে কাবান্দাবান্দার কাছে পৌঁছে দেওয়া যাক।

চিতাবাঘের চামড়ায় ঢাকা বিছানায় বসে ছিল কাবান্দাবান্দা। বড় বড় চোখে জেনের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা, এখান থেকে পালিয়ে যাবে? তা—ওগ্‌লি কোথায় গেল?

একজন সৈনিক জানাল, সে সুড়ঙ্গ-পথে পালিয়েছে।

বাঁকা হাসি হেসে কাবান্দাবান্দা বলল, ঠিক আছে। এটিকে নিয়ে আবার তিন-সাপের ঘরে আটকে রাখ। দেখ, যেন পালিয়ে না যায়। তারপর জেনকে দেখিয়ে বলল, এর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে; এই ষড়যন্ত্রে আর কারা লিপ্ত আছে তা আমাকে জানতে হবে। যাও।

আনেৎকে নিয়ে সকলে চলে গেল।

কাবান্দাবান্দা জেনকে একা পেয়ে বলল, বটে! ওগ্‌লির সঙ্গে পালাচ্ছিলে তার সঙ্গিনী হবার আশায়। তোমার জন্যই সে তার শপথ ভাঙতে যাচ্ছিল।

জেনের ঠোঁট ঘৃণায় বেঁকে গেল। বলল, ওগ্‌লি হয়তো তাই ভেবেছিল।

তুমিও তো তার সঙ্গী হয়েছিলে।

হয়েছিলাম, তবে জঙ্গল পর্যন্ত; তারপর হয় পালাতাম, নয়তো তাকে খুন করতাম।

প্রধান পুরোহিত বলল, কেন? তোমারও কোন শপথ আছে নাকি?

আছে—আনুগত্যের শপথ।

সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে প্রধান পুরোহিত বলল, কিন্তু সে শপথ তো ভাঙতে পারতে—ভালবাসার জন্য; আর তা না হলে মুক্তি-পণ হিসাবে।

জেন মাথা নাড়ল। কোন কিছুর জন্যই নয়।

আমি কিন্তু আমার শপথ ভাঙতে পারি। একসময় ভাবতাম কোনক্রমেই এ শপথ ভাঙা যায় না, কিন্তু তোমাকে দেখার পর থেকে—কাবান্দাবান্দা থামল, তারপর হঠাৎ বলল, কাবান্দাবান্দা হয়েও আমি যদি আমার শপথ ভাঙতে পারি, তাহলে তুমিও তো তোমার শপথ ভাঙতে পার।

তার জন্য যে মূল্য তুমি পাবে তার জন্য যে কোন নারী তার আত্মাকেই বেঁচে দিতে রাজী হবে—সে মূল্য অনন্ত যৌবন, শাশ্বত সৌন্দর্য।

জেন এবারও মাথা নাড়ল। না সে প্রশ্নই ওঠে না।

তুমি কাবান্দাবান্দাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ? তার মুখের নিষ্ঠুরতা দুটি চোখেও ছড়িয়ে পড়ল। মনে রেখো, তোমাকে ধ্বংস করবার, অথবা কোন কিছু না দিয়েই তোমাকে অধিকার করবার ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু আমি উদার। কেন জান কি?

কল্পনাও করতে পারি না।

কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে চিরদিনের মত এখানে রাখব; তোমাকে করব প্রধান ভৈরবী; যুগ যুগ ধরে তোমাকে যৌবনবতী করে রাখব; রূপবতী করে রাখব। তুমি আর আমি চিরকাল বেঁচে থাকব। মানবজাতিকে নবযৌবন দানের ক্ষমতা আমার আছে; সেই ক্ষমতাবলে সারা জগৎকে রাখব পায়ের নীচে। আমরা হব ঈশ্বর—আমি দেব, আর তুমি দেবী।

কাবান্দাবান্দা দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। চিত্র-বিচিত্র দেওয়াল, আলমারি খুলে একটা বড় বাক্স বের করল। বলল, এখানে এস; দেখ। বাক্সের ডালাটা খুলে জেনের সামনে মেলে ধরল। ভিতরে মটর দানার মত অনেকগুলি কালো রঙের বটিকা। জান এগুলো কি?

না।

এই সব বটিকা হাজার মানুষকে দেবে অনন্ত যৌবন ও রূপ। একটি মুখের কথায় এগুলি তোমার হবে। আকাশে ভরা চাঁদ ওঠার শুভক্ষণে এর একটি বটিকা খেলে তুমি পাবে সেই অমূল্য রত্ন যার জন্য জগতের প্রথম মানুষ থেকে শুরু করে গোটা মানবজাতি সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। জেনের হাত ধরে যুবক তাকে কাছে টানল।

ঘৃণায় চীৎকার করে জেন নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল। যুবক তাকে আরও জোরে চেপে ধরল। জেন সজোরে তার মুখে আঘাত করল। বিস্মিত যুবকের মুঠি শিথিল হল। আর সেই সুযোগে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জেন পাশের ছোট ঘরে ছুটে গেল।

ক্রোধে গর্জন করতে করতে কাবান্দাবান্দা তার পিছু নিল। বারান্দায় যাবার দরজার কাছেই তাকে ধরে ফেলল। জেনের আপ্রাণ বাধা সত্ত্বেও চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে তাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে চলল।

কেমন করে কিভাবে কাভুরুদের গ্রামে ঢোকা যায় তা নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করে টারজন ও ব্রাউন অনেক রাতে বনের প্রান্তে একটা গাছে চড়ে শুয়ে পড়ল।

টারজন বলল, তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। তুমি শুয়ে পড়। আমি তোমাকে ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেব।

টারজনও ঘুমোল। কিন্তু তার ঘুম খুব পাতলা। প্রয়োজন মতই ভেঙে যায়। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। একটা অস্বাভাবিক শব্দ যেন তার চেতনায় আঘাত করল।

গাছের ভিতর দিয়ে সে দ্রুত এগিয়ে গেল। কান থেকে এবার নাকে এসে লাগল একটা গন্ধ। বুঝতে পারল, কাছেই একটি কাভুরু আছে। ভাল করে তাকাতেই দেখতে পেল, একটা লোক জঙ্গলের পথে হেঁটে চলেছে। মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করে টারজন তার উপর লাফিয়ে পড়ল; তাকে মাটিতে ফেলে দিল। লোকটির দেহ শক্তপোক্ত। নিজেকে ছাড়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। জঙ্গলের রাজার হাতে সে তো মোমের পুতুলমাত্র।

লোকটির দুই হাত পিছমোড়া করে বেঁধে টারজন তাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। আধা অন্ধকারে টারজনের মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আর যাই হোক, এ লোকটি কাভুরু নয়।

বলল, কে তুমি? তুমি তো কাভুরু নও; তাহলে নিশ্চয় আমাকে কাবান্দাবান্দার কাছে নিয়ে যাবে না।

টারজন বলল, তুমি যদি আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দাও তাহলে তোমাকে কাবান্দাবান্দার কাছে নেব না, বা তোমার কোন ক্ষতিও করব না। তুমি কে?

আমি ওগ্‌লি।

সদ্য গ্রাম থেকে এসেছ?

হ্যাঁ।

গ্রামে ফিরে যেতে চাও?

না। কাবান্দাবান্দা আমাকে মেরে ফেলবে।

কাবান্দাবান্দা কি এতই বড় যোদ্ধা যে তুমি তাকে ভয় কর?

তা ঠিক নয়, তবে সে খুব শক্তিধর—কাভুরুদের প্রধান পুরোহিত।

একটু একটু করে টারজন ওগ্‌লির কাছ থেকে সব কথা জেনে নিয়ে বলল, তাহলে মেয়ে দুটি এখনও জীবিত আছে?

হ্যাঁ; অন্তত কয়েক মিনিট আগে পর্যন্তও বেঁচে ছিল।

তাদের কি এখনই কোন বিপদ ঘটতে পারে?

কাবান্দাবান্দা কি করবে তা কেউ বলতে পারে না। তবে আমার মনে হয় এখনই তাদের কোন বিপদ ঘটবে না, কারণ তাদের একজনকে সে সঙ্গিনীরূপে বেছে নেবে, হয়তো বা এতক্ষণ নিয়েছে।

গুপ্ত পথটা কোথায়? আমাকে সেখানে নিয়ে চল। দাঁড়াও; আগে আমার বন্ধুদের ডাকি।

টারজন সঙ্গীদের জাগিয়ে তুলল।

ওগ্‌লি বলল, আমি তোমাকে সুড়ঙ্গ-পথে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু সে পথে তোমরা মন্দিরে ঢুকতে পারবে না। গুপ্ত পথের হদিস যারা জানে না তাদের কাছে সুড়ঙ্গের উভয় মুখই একদিকে খোলে—বনের দিকে, একমাত্র কাবান্দাবান্দাই ফেরার হদিস জানে। তাই সহজেই মন্দির থেকে বেরিয়ে আসা যায়, কিন্তু ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

কয়েক মিনিট ধরে আরও অনেক প্রশ্ন করে ওগ্‌লির কাছ থেকে খবরাখবর জেনে নিয়ে টারজন সঙ্গীদের বলল, আনেৎ ও লেডি গ্রেস্টোক মন্দিরের মধ্যেই আছে। আমার বিশ্বাস লোকটি সত্য কথাই বলেছে। ওর কথায় যতদূর বুঝতে পারছি
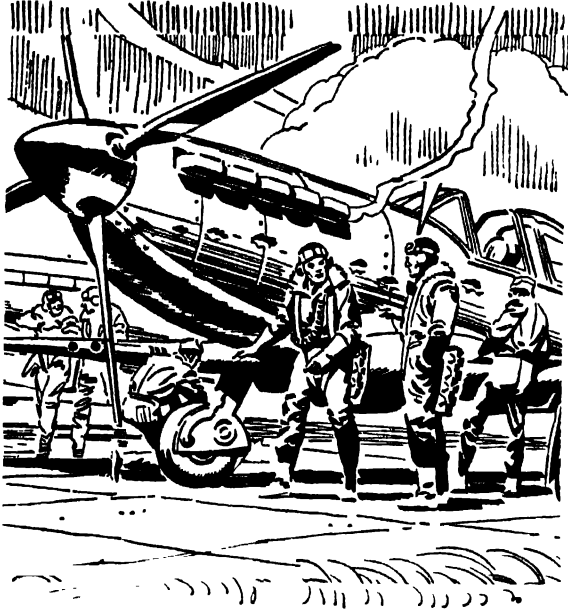
লেডি গ্রেস্টোকের সমূহ বিপদ, কাজেই সময় নষ্ট করা চলবে না। মুভিরোর দিকে ফিরে বলল, ব্রাউন ও আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই লোক-টিকে আটকে রাখ। অন্ধকার নামবার আগেই যদি ফিরে না আসি তো বুঝবে যে আমাদের সব চেষ্টা বিফল হয়েছে। তখন বিমান-যাত্রীদের কাছ থেকে যে সব অস্ত্র পেয়েছে সেগুলি আমাদের দিয়ে দাও। ব্রাউনের ধারণা জাহাজে আরও অস্ত্র আছে। চলে এস, ব্রাউন।

দু'জন নিঃশব্দে এগিয়ে চলল খোলা প্রান্তরের ভিতর দিয়ে। উড়োজাহাজের কাছে পৌঁছে ব্রাউন সোজা তাতে উঠে গেল। নেমে এসে এক বাক্স-ভর্তি কার্তুজ টারজনের হাতে দিয়ে বলল, তোমার তো পকেট নেই, এইটে দিয়েই কাজ চালাবে। আমি সব গুলি পকেটভর্তি করে এনেছি—প্রায় টনখানেক ওজন হয়েছে।

পেট্রল কতটা আছে? টারজন শুধাল।

একটা টুপি ভর্তি হবে, ব্রাউন জবাব দিল।

ওতে হবে?

তা—মেসিন গরম হতে যদি বেশী সময় না লাগে। প্যারাসুট পেয়েছ?

একটা প্যারাসুট নিজে পরে টারজন আর একটা দিল ব্রাউনকে। তারপর দুজনই ককপিটে উঠে গেল। মুখে কোন কথা বলল না। সব ব্যবস্থা রাতেই পাকা করা হয়েছিল।

অল্প চেষ্টাতেই প্রপেলার গর্জে উঠল। ব্রাউন হাসিমুখে বলল, যদি স্তবস্তুতি কিছু জানা থাকে তো সবগুলি আউড়ে যাও। যাত্রা শুরু হল।

বিমানটা স্বচ্ছন্দে উপরে উঠতে লাগল। বনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল মুভিরো, বালান্দো, টিব্‌স্ ও ওগ্‌লি। আর দেখতে লাগল কাভুরু সৈনিকরা; বিমানের গর্জন শুনে ইতিমধ্যেই তারা পথে পথে জড়ো হয়েছে।

একজন সৈনিক ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল, মরা মানুষ কি উড়তে পারে! তার ধারণা যে দুটি যাত্রী বিমানের পাশে মরে পড়ে ছিল তারাই ওটাকে চালাচ্ছে।

সে কথা শোনামাত্রই সব কাভুরুদের মনে গেঁথে গেল। ভয়ে তারা শিউরে উঠল।

উড়োজাহাজটা যখন গ্রামের দিকে চলল তখন তারা আরও ভয় পেল।

একজন বলল, ওরা প্রতিশোধ নিতে এসেছে।

আর একজন বলল, আমরা যদি কুটিরের মধ্যে ঢুকে যাই তাহলে ওরা আমাদের দেখতে পাবে না।

যে কথা সেই কাজ। দেখতে দেখতে পথঘাট ফাঁকা হয়ে গেল। প্রতিশোধ এড়াতে সকলেই ঘরে ঢুকে গেল।

জাহাজটা উপরে উঠতে লাগল—আরও উপরে।

একসময় ব্রাউন চীৎকার করে বলল, প্রস্তুত হও।

টারজন নিরাপত্তা-বেল্টের হুকটা খুলে দিল। হঠাৎ জাহাজটাকে ক্ষণিকের জন্য থামিয়ে দিয়ে ব্রাউন চীৎকার করে উঠল, লাফ দাও।

নীচের পাখ্‌নাটা ধরে টারজন লাফ দিল। পরমুহূর্তে ব্রাউনও লাফিয়ে পড়ল।

কাবান্দাবান্দার সঙ্গে জেন এ'টে উঠতে পারল না। ব্যাঘ্রীর মত বাধা দেওয়া সত্ত্বেও সে জেনকে টানতে টানতে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল।

তাকে কোচের উপরে ঠেলে দিয়ে কাবান্দাবান্দা বলল, শয়তানী, তোমাকে মেরে ফেলাই উচিত, কিন্তু আমি তোমাকে মারব না। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব ; পোষ মানাব—আর সে কাজ এখনই শুরু করব। বিকৃত মুখে সে জেনের দিকে এগিয়ে গেল।

ঠিক সেই সময় বাইরের দরজায় ঘা পড়তে লাগল। কে যেন ভয়ার্ত গলায় ডাকল, কাবান্দা-বান্দা ! কাবান্দাবান্দা ! আমাদের বাঁচাও ! আমাদের বাঁচাও !

প্রধান পুরোহিত সক্রোধে চীৎকার করে বলল, কার এত সাহস যে কাবান্দাবান্দাকে বিরক্ত করে ! তোমরা চলে যাও !

চলে যাওয়ার বদলে তারা দরজাটাকে সপাটে খুলে ফেলল। তাদের দলে সৈনিক ও ক্রীতদাস দুইই আছে।

প্রধান পুরোহিত শুধাল, তোমরা কি চাও ? কেন এখানে এসেছ ?

মরা মানুষরা উড়ছে ; তারা উড়ছে গ্রামের উপরে, মন্দিরের মাথার উপরে। তারা এসেছে প্রতিশোধ নিতে।

কাবান্দাবান্দা ধমক দিয়ে বলল, তোমরা মূর্খ, ভীরু। মরা মানুষ কখনও উড়তে পারে না।

একজন সৈনিক বলল, কিন্তু সত্যি তারা উড়ছে। যে দুজনকে কাল আমরা মেরেছিলাম তারাই এখন উড়ছে গ্রাম ও মন্দিরের উপরে। তুমি বাইরে চল কাবান্দাবান্দা ; মন্ত্রের বলে ওদের তাড়িয়ে দাও।

প্রধান পুরোহিত বলল, তাই যাব। ইদেনি, এই মেয়েটাকেও সঙ্গে নিয়ে চল। সুযোগ পেলেই ও পালাবে।

ওকে পালাতে দেব না, বলতে বলতে ইদেনি সজোরে জেনের কব্জি চেপে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল প্রধান পুরোহিতের পিছন-পিছন। সকলে গিয়ে হাজির হল মন্দির-চত্বরে।

উড়োজাহাজের মোটরের শব্দ শুনেই জেন আকাশে চোখ তুলল। একটা ছোট বিমান পাক খেয়ে ঘুরছে। কাভুরুরা বিস্মিত চোখে, ভীত চোখে সেইদিকেই তাকিয়ে আছে।

পরমুহূর্তেই জেন দেখল, বিমান থেকে একজন লাফ দিল। তার দেখাদেখি আরও একজন।

একজন সৈনিক চেঁচিয়ে উঠল, ওরা এসে পড়ল ! কাবান্দাবান্দা, মরা মানুষের প্রতিহিংসার হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর।

বাতাসে প্যারাসুট দুটো খুলে গেল। তা দেখে একটি ক্রীতদাস আর্তনাদ করে উঠল, এবার ওরা পাখনা মেলছে। শকুনের মত আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ওরা দুজন যখন ধীরে ধীরে মাটিতে নামছে তখন একটা হাল্কা হাওয়া ওদের বয়ে নিয়ে চলল মন্দিরের দিকে। ওরা দেখল, সমবেত জনতা মন্দির-চত্বরে ভিড় করে আছে। ওরা দেখল, বিমানটি তীব্র গতিতে নেমে যাচ্ছে। আরও দেখল হঠাৎ জনতা উধাও হয়ে মন্দিরে ঢুকে গেল, আর তখনই বিমানটি চত্বরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাতে আগুন ধরে গেল।

টারজনই প্রথম মাটিতে পা দিল। তারপর নামল ব্রাউন। দুজনই ছুটল মন্দিরের দিকে। বাঁধা দেবার কেউ নেই। রক্ষীরাও ভয়ে পালিয়েছে। কয়েকটা চিতাও ভয় পেয়ে ছুটে পালাল।

কিছুটা এগোতেই অনেক কণ্ঠের কল-গুঞ্জন কানে এল। সেই শব্দ লক্ষ্য করে টারজন বারান্দা ধরে এগিয়ে গেল।

তোমাকেও যাদু করেছে। এই মরা মানুষদের ওই লেলিয়ে দিয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে। ওকে শেষ করে দাও। নিজের হাতে ওকে শেষ করে দাও; তবেই আমরা রক্ষা পাব।

শত কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, ওকে সাবাড় কর! ওকে সাবাড় কর।

দুজন সৈনিক জেনকে চেপে ধরে টানতে টানতে বেদীর কাছে নিয়ে গেল। কম্পিতদেহ কাবান্দা-বান্দা চুলের মুঠি ধরে জেনকে বেদীর উপর তুলে নিল। কটিবন্ধ হতে তুলে নিল তার সুতীক্ষ্ণ ছুরি। মেয়েটির বুক লক্ষ্য করে ছুরি তুলতেই দ্বারপথে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। কাভুকদের প্রধান পুরোহিত কাবান্দাবান্দা বুক চেপে ধরে মর্মভেদী হাহাকার করে জেনের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল।

দরজার দিকে তাকিয়েই জেন বলল, টারজন! অরণ্যরাজ টারজন!

সকলে সমবেত হয়েছে কাবান্দাবান্দার দরবার-কক্ষে। প্রধান পুরোহিত সিংহাসনে বসে কাঁপছে—আতংকের প্রতিমূর্তি যেন।

অন্য সবাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একটি সৈনিক সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গেল। কাবান্দাবান্দার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, তোমার পাপেই আমাদের এই বিপদ। তুমি তোমার শপথ ভাঙতে চেয়েছ। এই মেয়েটা ওগ্‌লিকে যাদু করেছিল;

একশ' জোড়া চোখ পড়ল তাদের উপর—টারজন ও ব্রাউন নির্ভয়ে ঘরে ঢুকল। একজন সৈনিকের হাতে বর্শা উদ্যত হতেই কথা বলল ব্রাউনের পিস্তল; সৈনিক ধরাশায়ী হল।

টারজন কথা বলল স্থানীয় ভাষায়। আমরা এসেছি আমাদের মেয়েদের ফিরিয়ে নিতে। বিনা বাধায় তাদের তুলে দাও আমাদের হাতে, অন্যথায় তোমরা মরবে। মনে রেখো, আমরা অন্য লোকের মত নই। আমাদের রাগিও না।

কাভুকুরা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ আনেৎকে দেখতে পেয়ে ব্রাউন এক লাফে সেদিকে এগিয়ে গেল। সৈনিকরা দুই পাশে সরে গিয়ে তাকে পথ করে দিল। আবেগরুদ্ধ গলায় সে আনেৎকে জড়িয়ে ধরল।

টারজন একলাফে এগিয়ে গিয়ে জেনকে বলল, চলে এস। ওরা কোন কিছু ভাববার আগেই আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। নীচের ভয়ে জড়সড় মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, মুভিরোর মেয়ে বুইরা কি এখানে আছে?

একটি তরুণী ছুটে বেরিয়ে এল। চীৎকার করে বলল, বড় বাওয়ানা! এবার তাহলে বেঁচে গেলাম!

টারজন বলল, তাড়াতাড়ি চল। অন্য যে সব মেয়ে এখান থেকে পালাতে চায় তাদেরও সঙ্গে নাও।

পালাতে তো সকলেই চায়। পুরো দলটাই এসে টারজন ও ব্রাউনকে ঘিরে দাঁড়াল। মন্দিরের ফটকের কাছে যেতে না যেতেই তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল ধোঁয়ার ঘন কুণ্ডুলি; মাথার উপরে দেখতে পেল সশব্দ অগ্নিশিখা।

আনেৎ বলে উঠল, মন্দিরে আগুন লেগেছে।

ব্রাউন বলল, এটাও আমাদেরই কাজ। উড়ো জাহাজের আগুনেই মন্দির জ্বলছে। আমরাও বুঝি আটকা পড়ে গেলাম। এখান থেকে বের হবার অন্য কোন পথ কি কারও জানা আছে?

জেন বলল, আছে। মন্দির থেকে বনের মধ্যে যাবার একটা গুপ্ত পথ আছে। আমি তার প্রবেশ-পথটা জানি। এদিকে চল। মুখ ফিরিয়ে সে দরবারকক্ষের দিকে পা বাড়াল। অল্পক্ষণেই পৌছে গেল কাবান্দাবান্দার ঘরে। হঠাৎ একটা নতুন চিন্তা এল জেনের মাথায়। ব্রাউনের দিকে ফিরে বলল, আমরা সকলেই জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলাম, দুজন জীবনই দিয়েছে, চিরযৌবনের গুপ্ত রহস্য জানতে। সে জিনিস আছে এই ঘরে। চলে এস।

প্রধান পুরোহিতের অন্দরমহলে ঢুকে আলমারিটা দেখিয়ে জেন বলল, এর মধ্যে একটা রহস্য আছে; তাতেই আছে তোমাদের বাঞ্ছিত বস্তু। কিন্তু চাবিটা আছে কাবান্দাবান্দার কাছে।

ব্রাউন বলল, আমার কাছেও একটা চাবি আছে। পিস্তলের একগুলিতে তালাটাকে ভেঙে সে আলমারি খুলে ফেলল।

ব্রাউন ছোট বাক্সটাকে তুলে নিল। তারপর সকলে ছুটল সুড়ঙ্গ-পথের খোঁজে।

পাশের বারান্দা দিয়ে কিছুটা এগিয়ে সকলে ঢুকল একটা অন্ধকার ঘরে। সেটা পার হয়ে একটা দরজা খুলল। বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

জেন বলল, এই সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে বনের মধ্যে। এই পথে এগিয়ে চল।

*　*　*

তিন সপ্তাহ পরে। ছয়টি প্রাণীর একটি দল সমবেত হয়েছে কাভুকুদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে টারজনের বাংলোর বসবার ঘরের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে। সেখানে আছে অরণ্যরাজ ও তার স্ত্রী; হাতে হাত ধরে সিংহের চামড়ার আসনে বসে আছে ব্রাউন ও আনেৎ; পিছনে একটা চেয়ারে ঝাঁকিয়ে বসে আছে ঠিব্‌স্; আর ছোট্ট নকিমা গম্ভীরভাবে বসেছে একজন ভাইকাউন্টের কাঁধে।

ব্রাউন প্রশ্ন করল, বটিকাগুলি নিয়ে কি করতে চাও?

জেন বলল, তোমার যেমন ইচ্ছা। ওগুলো পাবার জন্য তুমি তো জীবনের ঝুঁকিও নিয়েছিলে। ওগুলো তুমিই নাও।

ব্রাউন বলল, না। জীবনের ঝুঁকি তো আমরা সকলেই নিয়েছিলাম; তাছাড়া আসলে তুমিই তো ওগুলো পেয়েছ। এ নিয়ে যত ভাবছি ততই নিজের ভুল বুঝতে পারছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা অনেকেই এত বেশীদিন বেঁচে থাকি যে তাতে জগতের কোন কল্যাণই হয় না। অনেকেরই আরও আগেই মরে যাওয়া উচিত।

কি করা হবে আমি বলছি। এগুলি আমরা ভাগাভাগি করে নেব। আমরা পাঁচজন হব চিরজীবী।

আর চিররূপসী, আনেৎ যোগ করল।

একটু কেশে টিব্‌স্ বলল, যদি ক্ষমা করেন তো একটা কথা বলি মিস। এত বছর ধরে ট্রাউজার ইস্তিরি করতে হবে—সে কথা ভাবতেও ভাল লাগে না আর রূপ—ওরে বাবা! তাহলে তো চাকরিই জুটবে না। সুন্দর খানসামার কথা কে কবে শুনেছে?

ব্রাউন তবু বলল, তাহলেও আমরা ভাগ করেই নেব। তুমি খেয়ো না। কিন্তু সাবধান, কোন প্রিন্সের কাছে যেন এগুলি বিক্রি করো না। এই নাও, পাচটা সমান ভাগ করেছি।

জেন হেসে বলল, তোমরা কি নকিমার কথা ভুলেই গেছ?

ব্রাউন বলল, ঠিক কথা। ভাগ হবে ছয়টা। অনেক মানুষের চাইতে এ জগতে নকিমার দরকার অনেক বেশী।

টারজন এ্যাণ্ড দি ম্যাডম্যান

টারজন ও জনৈক উন্মাদ

সেদিন টারজন বনের মাঝে একা পথ চলতে চলতে হঠাৎ বুঝতে পারল কারা যেন দূরে আসছে।

সেই শব্দ লক্ষ্য করে সে গাছের উপর উঠে ডালে ডালে এগিয়ে যেতে বাতাসে কিছু নিগ্রো আর অল্প দু-একজন শ্বেতাঙ্গের গন্ধ পেল। টারজন যখন আরো অনেকটা এগিয়ে গেল তখন সে দেখতে পেল অদূরে একজন নিগ্রো আর দুজন শ্বেতাঙ্গ একটা ফাঁকা জায়গায় একটা নদীর ধারে শিবির স্থাপন করছে। তাদের দেখে এক নির্দোষ শিকারীর দল মনে হলেও টারজন ঠিক করল অন্ধকার হলে সে তাদের কাছে থেকে তাদের কথাবার্তা শুনবে।

হঠাৎ নদীর উপর থেকে আর একটা শব্দ এল। টারজন গাছের উপর থেকে দেখল নদীর উপর দিয়ে কয়েকটা ডিঙ্গি নৌকো দাঁড় বেয়ে ঘাটের কাছে সেই শিবিরটার দিকে আসছে।

শিবিরের দুজন শ্বেতাঙ্গ এগিয়ে গিয়ে আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জানাল। পরে নৌকারোহীরা কূলে নেমে আগের শিবিরটার পাশে একটা শিবির স্থাপন করল। প্রথমে যারা নদীর ধারে শিবির স্থাপন করেছিল তাদের নেতা পেলহাম ডাটন আগন্তুকদের চিনত না এবং তাদেব দেখে খুব একটা ভাল মনে হলো না। কিন্তু তার শিকারী এবং পথপ্রদর্শক বিল গান্ট এগিয়ে গিয়ে আগন্তুক শ্বেতাঙ্গ দুজনের একজনকে দেখিয়ে ডাটনকে বলল, ইনি হচ্ছেন টম ক্রাম্প। অনেকদিন আফ্রিকার জঙ্গলে আছেন।

ক্রাম্প তার সঙ্গীকে দেখিয়ে ডাটনকে বলল, ইনি হচ্ছেন মিনস্কি।

ফাঁকা জায়গাটার ধারে যে একটা গাছ ছিল তার উপর থেকে টারজন ক্রাম্পকে চিনতে পারল। সে জানত ক্রাম্প একজন কুখ্যাত হাতির দাঁতের

কারবারী এবং বছর কতক আগে সে ক্রাম্পকে তার দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে একজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক এবং দুটো দেশের কর্তৃপক্ষ তার নানা কুকীর্তির জন্য তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাকি তিনজন শ্বেতাঙ্গকে সে চিনত না। তবে ডাটনকে তার ভাল লোক বলেই মনে হলো।

ক্রাম্প তার শিবিরে এসে গান্ট্রকে বলল, তুমি এখানে কি করছ বল? তোমার সঙ্গের লোকটি কে?

গান্ট্র আবাব বলতে লাগল, শিবিরে এলে টারজনকে পিকারেল এমনভাবে খাতির করতে লাগল যেন মনে হবে টারজন ওর নিজের ভাই। একদিন পিকারেল যখন ডাটন আর আমাকে নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিল তখন তার মেয়ে সান্দ্রা টারজনের সঙ্গে বেড়াতে চলে যায়। তারপর থেকে আর ফিরে আসেনি সান্দ্রা। আমরা ভাবছিলাম তাদের মৃত্যু ঘটেছে। এক সপ্তাহ হলো আমরা তাদের নানা জায়গায় খোঁজাখুঁজি করছি। খুঁজতে গিয়ে আমরা একজন আদিবাসীর

দেখা পাই। সে আমাদের বলল, সে দেখেছে টারজন মেয়েটাকে বেঁধে তার গলায় দড়ি দিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। এই কথা শুনে বুড়ো পিকারেল মৃতপ্রায় অবস্থায় আগের শিবিরেই রয়ে গেছে। সে তার মেয়ের জন্য এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করে। কেউ তার মেয়েকে এনে দিতে পারলে সে এই টাকাটা আর টারজনকে কেউ জীবিত বা মৃত এনে দিতে পারলে তাকে পাঁচশো পাউণ্ড দেবে। আমরা তাই ওদের খোঁজে এখানে এসে পড়েছি।

গোধূলি চলে যেতে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল শিবিরে নিগ্রোভৃত্যরা শিবিরের সামনে আগুন জ্বেলে তার চারপাশে বসল।

গান্ট্র বলল, উনি একজন আমেরিকান। উনি এডিনবরা থেকে আগত টিমথি পিকারেল নামে এক ধনী বৃদ্ধ ভদ্রলোকেব সঙ্গে শিকাবে বেরিয়েছিলেন। আমি ওদের শিকাবে সাহায্য কবছিলাম। বৃদ্ধ ভদ্রলোকেব সান্দ্রা নামে একটি যুবতী মেয়ে ছিল সঙ্গে। একদিন টাবজন অফ দি এপস্ নামে এক নগ্নপ্রায় দৈত্যাকার লোক আসে আমাদের শিবিরে। তুমি লোকটাকে চেন?

ক্রাম্প তাব মুখটা গম্ভীর এবং বিকৃত করে বলল, চিনি না মানে? বছব দুই আগে ও আমাকে এমন একটা অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেয় যেখানে অনেক ভাল ভাল হাতি ছিল।

জ্বলন্ত আগুনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল শিবিরের সামনেটা। হঠাৎ আগুনের ধারে বসে থাকতে থাকতে একজন নিগ্রোভৃত্য চীৎকার করে উঠল ভয়ে। তার চীৎকার শুনে শ্বেতাঙ্গরা মুখ তুলে দেখল দৈত্যাকার এক নগ্নপ্রায় শ্বেতাঙ্গ তাদের শিবিরের দিকে আসছে।

ক্রাম্প লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। সে টারজনকে চিনতে পারল। চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সে তার পিস্তলটা বার করে টারজনকে লক্ষ্য করে গুলি করল।

ক্রাম্পের গুলিটা লাগল না টারজনের গায়ে কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে টারজনের একটা তীর ক্রাম্পের ডানদিকের কাঁধটাকে বিদ্ধ করল।

ডাটন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ক্রাম্পকে বলল, তুমি একটা বোকা। ও শিবিরে আসছিল, তুমি গুলি করতে গেলে কেন?

ডাটন জোর গলায় টারজনকে ডাকতে লাগল। বলল, ফিরে এসো টারজন, তোমার কোন ক্ষতি করা হবে না। আমি কথা দিচ্ছি। মিস পিকারেল কোথায়? ফিরে এসে সব কথা বল আমাদের।

কথাগুলো কানে শুনতে পেলেও সে আর ফিরে এল না।

সেদিন রাতে একটা গাছের উপর রাত কাটাল টারজন। কিন্তু সে বারবার ভেবেও একটা কথা বুঝতে পারল না মিস পিকারেল নামে মেয়েটি কে এবং কেনই বা তারা তাকে তার অপহরণকারী বলে ভাবছে।

হঠাৎ একটা বর্শা একটা ঝোপের ভিতর থেকে ছুটে এসে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। সে বুঝল এটা তার প্রতি আক্রমণ। বর্শাটা তার গায়ে লাগল কি না আক্রমণকারী তা বোঝার আগেই একটা গাছের উপর উঠে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল টারজন।

তার আক্রমণকারী কে এবং কোথায় তারা আছে তা জানার জন্য গাছের উপর থেকে অদৃশ্য অবস্থায় লক্ষ্য করতে লাগল টারজন। সে দেখল কুড়িজন আদিবাসী একজায়গায় জটলা পাকিয়ে বসে আছে। তাদের চোখে মুখে স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন ফুটে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন বলছিল, বর্শাটা তার গায়ে লাগেনি এবং সে ঠিক এর প্রতিশোধ নেবার জন্য আসবে।

অন্য একজন বলল, সে আমাদের গাঁয়ে এলে প্রথমে তার সঙ্গে বন্ধুভাবে ব্যবহার করব। পরে অসতর্ক মুহূর্তে তাকে ধরে তার হাত-পা বেঁধে ফেলব।

আর একজন বলল, আমার কিন্তু ভয় করছে। টারজনকে আমি সত্যিই ভয় করি।

অন্য একজন বলল, কিন্তু ওরা বলেছে তার জন্য মোটা পুরস্কার দেবে। পুরস্কারটা এত বেশী যে তাতে আমরা প্রত্যেকে একশোজন করে মেয়ে কিনতে পারব এবং তার সঙ্গে অনেক গরু, ছাগল আর মুরগীও কিনতে পারব।

কথাগুলো শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল টারজন। সে ভাবল এই সমস্যার সমাধান তাকে করতেই হবে অন্য কোথাও যাবার আগে।

এই সব আদিবাসীদের গাঁটা কোথায় তা সে জানত। তাই সন্ধ্যার পর সে তাদের গাঁয়ের পাশে একটা গাছের উপর উঠে অপেক্ষা করতে লাগল।

ক্রমে রাত্রি হতে গাঁয়ের সবাই আপন আপন ঘরে শুয়ে পড়লে এবং গাঁটা একেবারে নীরব হয়ে গেলে গাঁয়ের গেট পার হয়ে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল টারজন। সে দেখল গেটের কাছে একটা গাছ রয়েছে যার ডালগুলো ঝুঁকে আছে গাঁয়েব ভিতর দিকে। সেইদিক দিয়ে সে সহজে পালাতে পারবে।

টারজন দেখল সে রাতে খুব ঠাণ্ডা থাকার জন্য প্রহরী তার সামনে আগুন জ্বেলে তার পাশে বসে ঝিমোচ্ছে। আশপাশের কুঁড়েগুলোতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

টারজন নিঃশব্দে সর্দারের কুঁড়ের কাছে গিয়ে তন্দ্রাহত প্রহরীটার পিছন দিক থেকে তার গলাটা টিপে ধরল। তারপর চাপা গলায় তাকে বলল, চুপ করে থাক, আমি তোমায় মারব না।

কিন্তু তার গলার উপর হাতটা একটু আলগা করে দিতেই প্রহরীটা ভয়ে চীৎকার করে উঠল। টারজন তখন তাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে গেটের দিকে ছুটে পালাতে লাগল। কিন্তু তার চীৎকারে গাঁয়ের অনেকেই তখন জেগে উঠেছে। একজন যোদ্ধা গেটের কাছে তার সামনে পথরোধ করে দাঁড়াতে টারজন তাকে ঘুষি মেরে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর পা দিয়ে সেই গাছটায় উঠে পড়ল। অন্য সব যোদ্ধারা তাকে আক্রমণ করার আগেই সে গাছের ডালে ডালে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেশকিছুটা দূরে গিয়ে লোকটার গলাটাকে ছেড়ে দিল টারজন। সে উঠে দাঁড়ালে টারজন তাকে বলল, তুমি আমার সঙ্গে চুপচাপ এস। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।

লোকটা অন্ধকারে টারজনকে চিনতে না পেরে বলল, কে তুমি ?

টারজন বলল, আমি টারজন।

লোকটা তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, আমাকে মেরো না বাওয়ানা। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

কোন কথা না বলে তাকে বনের আরো গভীরে নিয়ে গেল টারজন। একটা গাছের উপরে উঠে লোকটাকে তার সামনে বসিয়ে বলল, যদি বাঁচতে চাও ত আমার কথার ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। সত্যি কথা বলবে।

লোকটা বলল, হ্যাঁ বাওয়ানা। আমি সত্যি কথা বলব।

টারজন বলল, আজ তোমার গাঁয়ের লোকেরা কেন আমাকে আক্রমণ করেছিল ?

কারণ ঢেঁড়া পিটিয়ে আমাদের গাঁয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় টারজন আমাদের গাঁয়ের মেয়ে ও ছেলে-দের ধরতে আসছে।

কিন্তু তোমাদের গাঁয়ের লোকেরা জানে ত আমাকে। তারা জানে টারজন তাদের মেয়ে ও শিশুদের চুরি করে নিয়ে যায় না।

কাঁটাবনের ধারে রুতুরি পাহাড়ের তলায় যে গাঁ আছে তার সর্দার ওয়ারুতুরি আমাদের বলল, টারজন এখন খারাপ হয়ে গেছে। সে তাদের গাঁ থেকে মেয়ে চুরি করে নিয়ে গেছে।

টারজন বলল, তোমরা ওয়ারুতুরির কথা বিশ্বাস করো? তারা নরখাদক এবং মিথ্যাবাদী।

হ্যাঁ বাওয়ানা, আমরা তা জানি। কিন্তু আমাদের গাঁয়ের তিনটে লোক দেখেছে তুমি নাকি একটা শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে গলায় দড়ি দিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে।

টারজন বলল, এ কথা সত্যি নয়। আমি অনেকদিন তোমাদের গাঁয়ে যাইনি। আমি তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি তোমার গাঁয়ে চলে যাও। গাঁয়ের লোকদের বলগে, যে লোকটাকে তারা শ্বেতাঙ্গ মেয়েটাকে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছে সে টারজন নয়। বলবে, টারজন তাদের কোনদিন কোন ক্ষতি করবে না। যে লোকটা টারজনের নাম করে চুরি করে বেড়াচ্ছে টারজন তাকে খুঁজে বার করে খুন করবে। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই।

পরদিন সকালে রুতুরি পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল টারজন। এ রহস্যের সন্ধান তাকে করতেই হবে।

দুপুরের পর সে তার পথের সামনের দিক থেকে একটা আদিবাসীকে আসতে দেখল। তাকে দেখে টারজন লুকোবার কোন চেষ্টা করল না। কিন্তু আদিবাসী নিগ্রোটা টারজনকে দেখে চিনতে পেরেই ভয় পেয়ে তার দিকে তার হাতের বর্শাটা ছুঁড়ে দিল। ব্যাপারটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল টারজন। সে বুঝতে পারল কোন একটা লোক নিজেকে টারজন বলে চালাবার চেষ্টা করছে এবং লোকে যাকে টারজন ভাবছে তাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

আরো কিছু জানার জন্য পলাতক নিগ্রোটাকে ধরে ফেলল টারজন। গাছে গাছে সে এগিয়ে গিয়ে তার পথের সামনে হঠাৎ নেমে পড়ে তাকে ধরে ফেলল। লোকটা নিজেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করতে টারজন তাকে শক্ত করে ধরে রেখে বলল, কেন তুমি আমাকে মারতে গিয়েছিলে? তোমরা ত জান আমি তোমাদের বন্ধু।

আদিবাসী যোদ্ধাটা বলল, ঢেঁড়া পিটিয়ে আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে।

এরপর সে সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করল গতকাল সেই প্রহরীটা যে কথা বলেছিল টারজনকে।

টারজন এবার বুঝতে পারল ঐ হারিয়ে যাওয়া মেয়েটিই মিস পিকারেল এবং এই জন্যই ক্রাম্প তাকে গুলি করেছিল।

টারজন নিগ্রো লোকটাকে বলল, তোমাদের গাঁয়ে গিয়ে বলগে টারজন কখনো কোন গাঁয়ে গিয়ে কোন মেয়ে চুরি করেনি। কোন এক দুষ্ট প্রকৃতির লোকই এ কাজ করে তার নামে চালাবার চেষ্টা করছে।

নিগ্রো যোদ্ধাটি বলল, লোকটা একটা শয়তান।

টারজন বলল, শয়তান হোক বা দানব হোক টারজন তাকে খুঁজে বার করবেই। তোমার যাওয়ার পথে যদি শ্বেতাঙ্গরা আসে তাহলে তাদেরও এই কথা বলবে।

যেতে যেতে ওরা পথের উপরে বসে পড়তেই বনভূমির অন্ধকার অস্বস্তিকরভাবে ঘন হয়ে উঠল সান্দ্রার মনে।

যে লোকটা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল সে তাকে নিয়ে বিশ্রামের জন্য বসল। সে কে এবং কোথায় কি জন্য নিয়ে যাচ্ছে তাকে তা সে বলেনি এখনো পর্যন্ত। এর আগে জিজ্ঞাসা করেও কোন উত্তর পায়নি। তবু আজ আবার সেই একই প্রশ্ন করল সান্দ্রা পিকারেল।

লোকটা বলল, আমি হচ্ছি টারজন। আমি নিজেকে টারজন বলেই জানি। কিন্তু ওরা আমায় দেবতা বলে। কিন্তু আমি দেবতা নই। তবে তুমি যেন একথা বলো না তাদের।

সান্দ্রা বলল, ওরা কারা?

লোকটা বলল, আলেমতেজোরো। ওদের রাজা দা গামা আমাকে দেবতা বলে। কিন্তু ওদের প্রধান পুরোহিত বলে আমি দেবতা নই, একজন শয়তান এবং আলেমতেজোদের ধ্বংসের জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে ওদের দেশে। কাছে থাকলে প্রধান পুরোহিতের অসুবিধা হবে, তার ক্ষমতা খর্ব হবে এ জন্য সে আমাকে তাড়াতে চায়। এই নিয়ে রাজার সঙ্গে প্রধান পুরোহিত রুইজের ঝগড়া হয়। অবশেষে রুইজ আমার সম্বন্ধে রাজাকে বলে, ও যদি দেবতা হবে তাহলে ওর দেবী কোথায়? সব দেবতারই দেবী থাকে। আমি তাই তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। তুমিই হবে আমার দেবী। তা না হলে তারা আমায় খুন করবে। কিন্তু তোমাকে নিয়ে গেলে তারা আর খুন করবে না আমাকে।

সান্দ্রা বলল, ওখানে যেও না। আমাকে নিয়ে গেলেও কোন না কোন অজুহাতে রুইজ তোমাকে খুন করবে। তার থেকে যেখান থেকে তুমি এসেছ সেখানেই ফিরে যাও।

লোকটা বলল, আলেমতেজো ছাড়া আর কোথায় যাব আমি? যাবার মত কোন জায়গা নেই আমার। দা গামা বলে আমি স্বর্গ থেকে ভেসে এসেছি। তারা সবাই একথা বলে। কিন্তু আমি জানি না কেমন করে আবার স্বর্গে ভেসে যাব। আমি অবশ্য নিজেকে দেবতা মনে করি না। আমি শুধু জানি আমি টারজন।

আবার পথ চলা শুরু করল লোকটা। এবার সে নিজেই কথা বলে যেতে লাগল। সে বলল, তুমি খুব সুন্দরী, তোমাকে দেবী বলে ঠিক মানাবে।

সহসা কোথা থেকে একদল মুখে রংমাখা নিগ্রো যোদ্ধা এসে পড়ায় ওদের কথাবার্তা থেমে গেল। লোকটা সান্দ্রাকে বলল, ওরা ওয়ারুতুরি।

নিগ্রোদের সর্দার মুতিম্বোয়া বলল, এই হলো টারজন।

কথাটা বলতেই দুজন যোদ্ধা লাফ দিয়ে ধরে ফেলল টারজন নামধারী শ্বেতাঙ্গ লোকটাকে। মুতিম্বোয়া বলল, ওকে এখন মেরো না। আমরা ওদের গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে উৎসবে সবাইকে ডাকব।

একজন যোদ্ধা বলল, ও আমাদের গাঁয়ের অনেক মেয়ে ও শিশুদের চুরি করে নিয়ে গেছে।

মুতিম্বোয়া বলল, সেই জন্যই ওকে 'তিলে তিলে পীড়ন করে মারা হবে।

সান্দ্রা শ্বেতাঙ্গটাকে বলল, ওরা কি বলেছে বুঝতে পেরেছ?

লোকটা বলল, হ্যাঁ পেরেছি।

লোকটা বলল, আমি ঠিক পালিয়ে যাব। পরে এসে তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে যাব। কিছু ভেবো না।

কিছুক্ষণ পর জোর গলায় সে চীৎকার করে উঠলে দূর থেকে অদ্ভুত গলায় কে তার উত্তর দিল সেই রকম শব্দ করে। কিন্তু সে গলার স্বর কোন মানুষের নয়।

ওয়াকুতুরিরা ভয় পেয়ে গেল। তাদের চলার গতি মন্থর হয়ে উঠল। এইভাবে কিছুটা যেতেই গাঁয়ে বড় বড় লোমওয়ালা একদল বাঁদর-গোরিলা কোথা থেকে ছুটে এসে আক্রমণ করল নিগ্রোদের। নিগ্রো যোদ্ধারা তখন সান্দ্রাকে তুলে নিয়ে ওদের গাঁয়ের দিকে ছুটে পালাতে লাগল। বাঁদর-গোরিলারা ওদের তাড়া করে কিছুটা ছুটে এসে পরে ফিরে চলে গেল।

রাত্রি হতেই একটা গাছের উপর উঠে শুয়ে পড়ল টারজন। এমন সময় ঢাকের বাজনা শুনে চমকে উঠল সে। সে বুঝল আগামীকাল রাতে ওয়ারুতুরি গাঁয়ে কোন বন্দীহত্যাকে কেন্দ্র করে নর-মাংসভোজী এক উৎসব হবে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে ঢাকের শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল গাঁটার দিকে। তারপর একটা গাছের উপর উঠে শুয়ে পড়ল। আগামীকাল সে গাঁটায় যাবে।

পরদিন সকালে আশপাশ গাঁ থেকে বহু নারী পুরুষ ওয়ারুতুরি গাঁয়ে এসে ভিড় করতে লাগল।
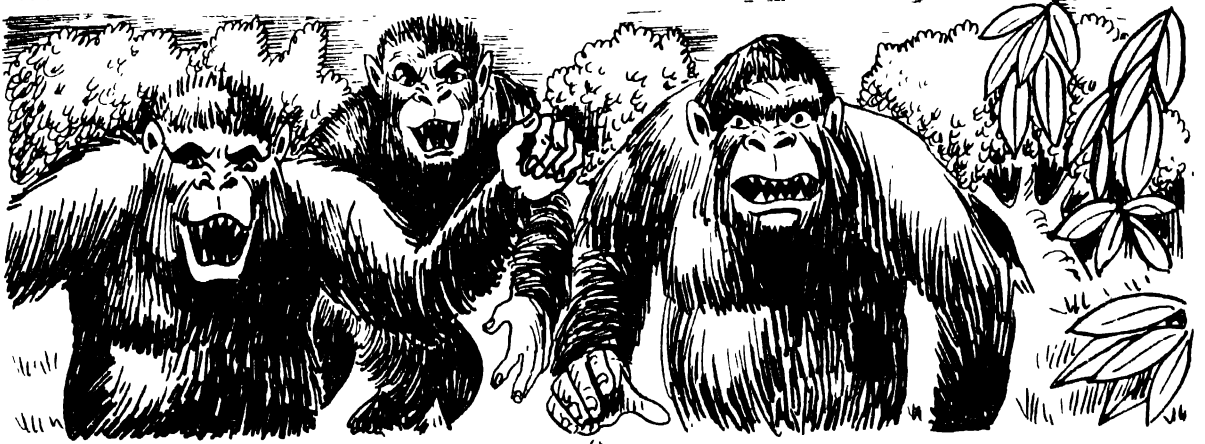
সান্দ্রাকে গাঁয়ের মধ্যে ওয়াকুতুরিরা নিয়ে গেলে সান্দ্রা মুতিম্বোয়াকে বলল, তুমি সর্দার, তুমি আমাকে আমার সঙ্গীদের কাছে পাঠিয়ে দাও। মুক্তিপণ হিসাবে যা চাইবে তোমাকে আমার বাবা তাই দেবে।

মুতিম্বোয়া কোন কথা না বলে রান্নার একটা বড় পাত্রের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তার পেটটা ঘষতে লাগল।

রুতুরি পাহাড়ের এদিকটায় এর আগে কখনো আসেনি টারজন। সে শুধু এখানকার নাম শুনেছে। সে জানে এখানকার ওয়াকতুরি নামে উপজাতিরা মানুষ খায়। সে তাই সাবধানে পথ চলতে লাগল।

সান্দ্রা বুঝল সেই হচ্ছে এই উৎসবের কেন্দ্র। সন্ধ্যে হতেই গাঁয়ের মাঝখানে এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল তাকে। জায়গাটা ছিল সর্দারের কুঁড়ের সামনে। সেখানে একটা গাছ ছিল। সেই গাছের তলায় পাঁচটা ছাগল এনে রাখা হলো।

পাঁচটা ছাগল বলি হবার পর যাদুকর পুরোহিত যেমনি একটা লাফ দিয়ে ছুরি হাতে সান্দ্রার গলা কাটতে গেল মুখ দিয়ে মন্ত্র বলতে বলতে অমনি একটা বিষাক্ত তীর এসে তার বুকটা বিদ্ধ করতেই সে পড়ে গেল।

এমন সময় ঘরের পাশের সেই গাছ থেকে দৈত্যের মত একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু গাঁয়ের সবাই তখন যাদুকর পুরোহিতের মৃত্যু নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সেদিকে খেয়াল করেনি। টারজন

একমুহূর্তে সান্দ্রাকে তুলে নিয়ে আবার লাফ দিয়ে গাছে উঠে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তীরবেগে কুতুরি পাহাড়ের দিকে ছুটে যেতে লাগল সে। অবশেষে পাহাড়ের ধারে একটা বনের মধ্যে নির্জন জায়গার মধ্যে এসে একটা গাছেব উপর উঠে বসল। সান্দ্রা তখন তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? দা গামা ঠিকই বলেছিল, তুমি দেবতা। তুমি গতকাল যা বলেছিলে তাই ঠিক।

টারজন গম্ভীর গলায় বলল, তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি·না। আমি হচ্ছি বাঁদরদলের রাজা টারজন। আমি গতকাল কেন জীবনে কখনো তোমাকে দেখিনি।

সান্দ্রা আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি তাহলে আমাকে শিবির থেকে চুরি করনি?

টারজন বলল, আমার নামে একটা ভণ্ড প্রতারক এই কাজ করেছে। আমি তাকে খুঁজছি। সে কোথায় তা জান?

সান্দ্রা বলল, ওয়াকুতুরিরা তাকেও ধরেছিল। কিন্তু সে পালিয়ে যায়।

টারজন বলল, তার সম্বন্ধে যা জান বলত।

সে বলছিল, আলেমতেজোদের রাজা দা গামা তাকে বলেছিল একজন দেবী চাই। একজন শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে দেবী হিসাবে দেখাতে হবে। তবে সে বলছিল সে-ই টারজন। কিন্তু তুমিই টারজন এটা ঠিক ত?

আমিই হচ্ছি টারজন।

তুমি জান আমার বাবাব সফরি কোথায় আছে?

টারজন হেসে বলল, চারজন শ্বেতাঙ্গের একটা সফরি আমাকে হত্যা করার জন্য খুঁজছে। এটাই যে তোমার বাবার সফরি সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমার বাবার দলে মোট তিনজন লোক ছিল—আমার বাবা, পেলহ্যাম ডাটন, আর শিকারী গান্ট্।

ক্রাম্প নামে একটা লোক ঐ দলে ছিল। সে আমাকে দেখেই গুলি করে। কিন্তু গুলিটা আমার লাগেনি।

ক্রাম্প বোধহয় পরে যোগদান করে।

সে রাতে সান্দ্রার শোবার জন্য একটা গাছের ডালের উপর জায়গা করে দিল টারজন। সকালে উঠে টারজন কিছু ফল নিয়ে এসে তাকে খেতে দিল। বলল, তোমার খাওয়া হয়ে গেলে আমি তোমাকে তোমার দলের লোকদের কাছে নিয়ে যাব।

সেদিন সকালে ডাটনদের শিবিরে খাবার না থাকায় ক্রাম্প একা শিবির থেকে মাইলখানেক দূরে শিকার করতে গিয়েছিল। জলেব ধারে একটা ঝোপের আড়ালে পশু শিকারের জন্য লুকিয়ে ছিল ক্রাম্প। হঠাৎ সে টারজন আর সান্দ্রাকে সেই পথে আসতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। ক্রাম্প নীরবে টারজনকে লক্ষ্য করে গুলি করল। গুলিটা টারজনের মাথায় লাগতে সে পড়ে গেল।

সান্দ্রা ক্রাম্পের কাছে এসে বলল, তুমি কে ?

ক্রাম্প বলল, আমার নাম টম ক্রাম্প। আমি তোমাকেই খুঁজছি।

সান্দ্রা বলল, কেন তুমি ওকে গুলি করলে ?

সে তোমাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।

সে আমাকে চুরি করেনি। সে আমাকে নরখাদকদের হাত থেকে উদ্ধার করে ডাটনের শিবিরে নিয়ে আসছিল।

যাই হোক, চলে এস। আমি তোমাকে ডাটনের শিবিরে নিয়ে যাব। এখান থেকে মাইলখানেক দূরে শিবিরটা।

সান্দ্রা বলল, ওর জন্য কিছু করবে না ? দেখ একবার লোকটাকে।

ক্রাম্প হেসে বলল, যা হবার হয়ে গেছে। তুমি এখন এস আমার সঙ্গে।

সান্দ্রা আর ক্রাম্প যখন শিবিরে গিয়ে পৌছল তখন বিকেল হয়ে গেছে। ডাটন সান্দ্রাকে দেখতে পেয়েই সে ছুটে এসে তার হাত ধরল।

আবেগের চাপে কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল, আমি ত তোমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

তার চোখে জল এসেছিল। সে বলল, কে তোমায় খুঁজে পায় ?

ক্রাম্প বলল, আমি। আমি টারজনকেও দেখতে পাই। সে আর চুরি করতে আসবে না কখনো।

সান্দ্রা বলল, সে আমাকে চুরি করেনি। আমি কতবার এই লোকটাকে তা বলেছি। সে-ই বরং আমাকে ওয়ারুতুরিদের গাঁ থেকে উদ্ধার করে গতরাতে। সে আমাকে এখানে নিয়ে আসছিল। অথচ এই লোকটা ঠাণ্ডা মাথায় শুধু শুধু গুলি করে তাকে। ডাটন, তুমি কিছু লোক নিয়ে একবার দেখবে চল। যদি মরে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে কবর দেবার অন্ততঃ একটা ব্যবস্থা করবে। জায়গাটা বেশী দূরে নয়।

ডাটন বলল, আমি এখনি যাব।

ডাটন ছয়জন নিগ্রোভৃত্য সঙ্গে নিল। শিবিরের সব শ্বেতাঙ্গরাই সঙ্গে গেল। ক্রাম্প আর সান্দ্রা দুজনে জায়গাটা দেখিয়ে দিল। কিন্তু টারজনের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

ডাটন সান্দ্রাকে বলল, ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যময়। একজন টারজন তোমায় চুরি করে নিয়ে গেল, আর একজন টারজন তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে এল।

সান্দ্রা বলল, চল, শিবিরে ফিরে চল। আগামীকালই আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাবে পেলহ্যাম।

ক্রাম্প বলল, আমি আর মিনস্কিও যাব তোমাদের সঙ্গে।

ডাটন বলল, তার আর দরকার হবে না।

ক্রাম্প বলল, তোমাদের দরকার না থাকলেও আমার দরকার আছে। আমার পুরস্কারের টাকাটা ত নিতে হবে।

সান্দ্রা বলল, পুরস্কার মানে ?

ডাটন বলল, তোমার বাবা তোমার ও টারজনের খোঁজ পাওয়ার জন্য দেড় হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।

সান্দ্রা ক্রাম্পকে বলল, তাহলে সে পুরস্কার এখন কেউ পাবে না। যে লোকটি পুরস্কার পাবার যোগ্য তাকে তুমি গুলি করে মেরেছ আর যে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সে এখনো নিরুদ্দেশ।

ক্রাম্প বলল, ঠিক আছে, দেখা যাবে।

যাই হোক, ওরা সবাই শিবিরে ফিরে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

এদিকে টারজন নামধারী লোকটা সান্দ্রার উপর নজর রেখে নীরবে অপেক্ষা করে যাচ্ছিল শিবিরের বাইরে থেকে। সে দেখল গাণ্টু ও শুতে চলে গেলে ক্রাম্প আর মিনস্কি নিগ্রোভৃত্যদের তাঁবুতে চলে গিয়ে তাদের কি সব বোঝাল আর সঙ্গে সঙ্গে তারা মালপত্র গুছিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা হয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ।

টারজন নামধারী লোকটা ভেবেছিল মালবাহক নিগ্রোদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গরাও শিবির ছেড়ে চলে যাবে আর সেই অবকাশে সে মেয়েটাকে নিয়ে পালাবে। কিন্তু সে যখন দেখল শ্বেতাঙ্গরা গেল না তখন সে অধৈর্য হয়ে পড়ল কিছুটা।

সান্দ্রার কিন্তু ঘুম এল না চোখে। সে শুধু টারজনের মৃত্যুর কথাটা ভাবতে লাগল বারবার।

সহসা তার ঘরে তাঁবুর পিছনের দিকটা কে তুলল, চমকে উঠে বসল সান্দ্রা। দেখল ক্রাম্প আর মিনস্কি চোরের মত চুপিসারে ঘরে ঢুকল দুজনে।

সান্দ্রা বলে উঠল, কে তুমি? কি চাও?

ক্রাম্প চাপা গলায় গর্জন করে উঠল, তুমি যদি চীৎকার না করো তাহলে তোমাকে আঘাত করব না। আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি এবং তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

সান্দ্রা বলল, ডাটন কোথায়?

ক্রাম্প বলল, তার ভাগ্য যদি ভাল হয় ত সে ঘুমোবে। যদি তুমি তাকে চেঁচামিচি করে ডাক তাহলে তাকে খুন করা হবে।

সান্দ্রা বলল, তোমরা কি চাও আমার কাছে? কোথায় নিয়ে যাবে আমায়?

মিনস্কি বলল, শোন মেয়ে, তোমাকে আমরা এমন এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি যেখানে তোমার বাবা তিন হাজার পাউণ্ড নিয়ে না গেলে কেউ খুঁজে পাবে না তোমাকে।

এদিকে সেই নকল টারজন শিবিরের বাইরে বাঁদর-গোরিলাদের নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ক্রাম্প, মিনস্কি আর সান্দ্রা শিবির হতে বার হবার সঙ্গে সঙ্গে নকল টারজন তার বাঁদর-গোরিলাদের নিয়ে শিবির আক্রমণ করল। গোরিলাগুলো যখন ক্রাম্প আর মিনস্কিকে ধরে কামড় দিচ্ছিল টারজন নামধারী লোকটা সান্দ্রাকে ধরে তুলে নিয়ে গেল। ক্রাম্প বা মিনস্কি গুলি করার কোন অবকাশই পেল না।

গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙে গেল ডাটনের। সে রাইফেল হাতে ছুটে এসে দেখে ক্রাম্প আর মিনস্কি রক্তাক্তদেহে শুয়ে আছে। তাদের দেহের কয়েক জায়গায় ক্ষত ছিল। ডাটনকে দেখে তারা উঠল।

ডাটন তাদের জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার?

মিনস্কি বলল, মিস পিকারেলের ঘরে একজনকে ঢুকতে দেখে আমি ক্রাম্পকে ডাকি। এমন সময় দশ-বারোটা বাঁদর-গোরিলা ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের উপর আর সেই অবসরে সেই টারজন সান্দ্রাকে তুলে নিয়ে যায়।

এদিকে টারজন নামধারী লোকটা সকালে রওনা হয়ে দুপুরবেলায় কুতুরি পাহাড়ের তলায় সেই কাঁটাবনের ধারে গিয়ে পৌছল। কাঁটাগাছগুলোকে এড়াবার জন্য ওরা হাতে পায়ে হেঁটে পাহাড়ের একটা চড়াই পার হয়ে একটা পথ পেল।

পথটা পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল টারজন। সান্দ্রাকে বলল, এতক্ষণে আমরা নিরাপদ। এবার আমি রাজা দা গামার কাছে নিয়ে গিয়ে তোমাকে দেবী বানাতে পারব।

সান্দ্রা বলল, আমি একজন ইংরেজ মেয়ে, আমি দেবী হতে চাই না।

লোকটা বলল, আমি তোমার এত উপকার করছি। অথচ তোমার কোন কৃতজ্ঞতাবোধ নেই।

আবার ওরা এগিয়ে চলতে লাগল। পথের সামনে সান্দ্রা একটা খাড়াই পাহাড় দেখতে পেল।

খাদটার পাশ দিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ওরা এগোতে লাগল। একটা বাঁদর-গোরিলা সান্দ্রার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু সে পাহাড়ের ভয়াবহ উচ্চতার কথা ভেবে আর উঠতে মন চাইছিল না সান্দ্রার। সে ভাবছিল যে সে পড়ে যাবে ইচ্ছে করে। সে উপর থেকে লাফিয়ে পড়বে।

কিন্তু তার আর দরকার হলো না। একসময় একটা বাঁদর-গোরিলা সান্দ্রাকে হাত ধরে টেনে তুলতে গিয়ে তার ভার সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। সান্দ্রাও পড়ে গেল তার সঙ্গে।

বনের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গায় সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। তার উপর টারজনের অচেতন দেহটা পড়ে ছিল। তাকে ঘিরে দশ-বারোটা বাঁদর-গোরিলা বসে কথা বলছিল।

গয়ান বলল, মারা গেছে!

উঙ্গো বলল, না মরেনি।

একটা মেয়ে বাঁদর-গোরিলা মুখে করে কিছুটা জল নিয়ে সে টারজনের কপালে ও চোখে মুখে দিয়ে দিল। টারজন ধীরে ধীরে চোখের পাতা খুলল। সে কোথায় আছে তা একবার দেখে নিয়ে বলল, উঙ্গো, কি ঘটেছিল?

উঙ্গো বলল, একটা শ্বেতাঙ্গ তোমাকে বন্দুক থেকে গুলি করেছিল।

টারজন এবার ভাবতে লাগল কে তাকে গুলি করেছিল। তার এবার মনে পড়ল ক্রাম্পকে সে দেখতে পেয়েছিল। এবার তার আর বুঝতে বাকি রইল না যে ক্রাম্পই তাকে আবার গুলি করেছে। সে বলল, সেই মেয়েটি কোথায়?

উঙ্গো বলল, সে টার্মাঙ্গানীর সঙ্গে চলে গেছে।

টারজন আশ্বস্ত হলো। মেয়েটি তাহলে তার দলের লোকদের কাছে তাদের শিবিরেই ফিরে গেছে। তবে সে একবার সেই ভণ্ড প্রতারক লোকটাকে ধরার সংকল্প করল মনে মনে যে লোকটা এই সবকিছুর জন্য দায়ী।

দিনকতকের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠায় টারজন একদিন উঙ্গোকে বলল, আচ্ছা টারজনের মত নগ্ন হয়ে টারজনের নাম ধারণ করে একটা শ্বেতাঙ্গ ঘুরে বেড়ায়। তুমি তাকে দেখেছ?

উঙ্গো বলল, দুবার দেখেছি লোকটাকে। সে একদল বাঁদর-গোরিলার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

টারজন বলল, সে কোন্‌দিকে গেছে?

উঙ্গো দূরে কস্তুরি পাহাড়েব ধারে কাঁটাবনের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখাল।

পরদিনই টারজন বাঁদর-গোবিলাদের সঙ্গে নিয়ে কস্তুরি পাহাড়েব দিকে রওনা হয়ে পড়ল।

সান্দ্রা দেখল সে পড়তে পড়তে পাহাড়েব গায়েই এক জায়গায় আটকে যায়।

পাহাড়ের গায়ে একটা জায়গায় টারজন নামধারী লোকটা একটা বাঁদর-গোরিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে তাকে দেখাচ্ছে। লোকটা তার দড়িটা সান্দ্রার উপব ফেলে দিয়ে বলল, এই দড়িটা তোমার কোমরে বেঁধে দাও। আমি আর সাঁচো নামে এই গোরিলাটা দুজনে মিলে তোমাকে টেনে তুলব।

সান্দ্রা সঙ্গে সঙ্গে কোমরে দড়িটা বেঁধে নিল। ওরা দুজনে দড়িটা ধরে সান্দ্রাকে টেনে তাদের কাছে তুলে নিল।

লোকটা সান্দ্রাকে বলল, তুমি খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছ।

আরো কিছুটা উপরে উঠে ওরা একটা ঘাসে ঢাকা জায়গা পেল। টারজন নামধারী লোকটা সান্দ্রাকে বলল, এইখানে শুয়ে কিছুটা বিশ্রাম করে নাও।

এরপর ওরা পাহাড় পার হয়ে ওদিকে একটা নদীর ধার দিয়ে সামনের একটা বনকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। ক্রমে বনের মধ্যে ঢুকে মাইলখানেক এগিয়ে যাবার পর ফাঁকা জায়গার উপর এক বিরাট প্রাসাদ দেখতে পেল সান্দ্রা।

সান্দ্রা বলল, এ প্রাসাদ হয়ত পর্তুগীজদের দ্বারাই নির্মিত। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল রাজা দা গামার নামটাও পর্তুগীজ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রুইজ আর দেবতার অন্যতম সেবক মৃত ফার্ণান্দো নামটাও পর্তুগীজ। একটা রহস্য দানা বেঁধে উঠল তার মনে।

সকালে উঠে ডাটন সান্দ্রার খোঁজে যাবার জন্য প্রথমে নিগ্রোভৃত্যদের সর্দারকে ডাকল। বলল, তোমাদের সকলকে যাবার জন্য তৈরী হতে বল।

এরপর সে দুজন শ্বেতাঙ্গকে ডাকল। ক্রাম্প আগেই উঠেছিল।

কিন্তু সর্দার নিগ্রোভৃত্যদের পেল না। সে এসে ডাটনকে বলল, ওরা ভয় পেয়ে গত রাতে শিবির ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

ডাটন আশ্চর্য হয়ে বলল, ভয়! কিসের ভয়?

সর্দার বলল, ওরা টারজন আর বাঁদর-গোরিলাদের ভয় করছে। আমার মনে হয় খোঁজ করতে না যাওয়াই ভাল।

ক্রাম্প বলল, ভয়ের কিছু নেই। টারজনকে আমি মেরে ফেলেছি। আর ওয়াকস্তুরিদের গাঁ দিয়ে আমরা যাব না। তাছাড়া আমি পুরস্কারটা ছাড়তে পারব না।

মিনস্কি বলল, আমিও ছাড়ব না।

ডাটন বলল, আমিও সান্দ্রাকে খুঁজে বার না করে ছাড়ব না।

অবশেষে টারজন শ্বেতাঙ্গ আর কিছু বিক্ষুব্ধ নিগ্রোভৃত্য মিলে সান্দ্রার খোঁজে বার হলো। সর্দার নিগ্রোভৃত্যদের কোনরকমে রাজী করালেও তারা

বিক্ষুব্ধ ছিল মনে মনে। সর্দার নিজেও ক্ষুব্ধ ছিল। সে নীরবে পথ চলছিল।

বিকালের দিকে একজন নিগ্রোযোদ্ধাকে দেখতে পেয়ে ক্রাম্প গুলি করল তার রাইফেল থেকে।

ক্রাম্প আর গাণ্ট্র মৃতদেহটা পরীক্ষা করে বলল, ওর দাঁতগুলো দেখ, ওরা নরখাদক। ওর গায়ে কত সোনার গয়না।

সর্দারও বলল, হ্যাঁ, ওয়াকুতুরি নরখাদক।

রাতের মত ওরা এক জায়গায় শিবির স্থাপন করল। কিন্তু পরদিন সকালে শিবিরে একটা নিগ্রোভৃত্যকেও পাওয়া গেল না।

গাণ্ট্র বলল, তুমি নরখাদক ওয়ারুতুরিকে মারার পরই তারা ভয় পেয়ে যায়। ওদের ভয় পাওয়া স্বাভাবিক।

ক্রাম্প বলল, তার মানে পুরস্কারটা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে?

ডাটন বলল, তার মানে মিস পিকারেলের খোঁজ না করেই ফিরে যাব?

ক্রাম্প বলল, শুধু কতকগুলো পাউণ্ডের কথা নয়। ওয়ারুতুরিটার গাঁয়ে কত সোনার গয়না দেখেছ? আমার মনে হয় রুতুরি পাহাড়ের কোন এক জায়গায় ভাল ভাল সোনা আছে।

গাণ্ট্র বলল, সোনা পাওয়া গেলে তার ভাগ দিতে হবে।

ক্রাম্প বলল, এই সোনা সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। শোনা যায় হাজার সিংহ সোনার জায়গাটা পাহারা দিয়ে রেখেছে। আর আছে দুটো উপজাতি।

মিনস্কি বলল, তাহলে ওয়ারুতুরিরা কি করে সে সোনা পায়?

ক্রাম্প বলল, সেই উপজাতিদের দেশে লবণ আর লোহার বড় অভাব। ওরা তাই ওয়ারুতুরিদের কাছ থেকে সোনার বিনিময়ে লবণ আর লোহা নেয় ওয়ারুতুরিরা আবার হাতির দাঁতের বিনিময়ে লবণ আর লোহা যোগাড় করে।

তুমি ফিরে যাও। আমি একা যাব।

ক্রাম্প বলল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

গাণ্ট্র বলল, কতকগুলো পাউণ্ডের জন্য তোমরা সবকিছু করতে পার।

গাণ্ট্র বলল, কিন্তু কি করে সোনা পাবে তুমি?

ক্রাম্প বলল, আমার মনে হয় রুতুরি পাহাড়ের উপর কোন এক জায়গায় সোনা আছে।

গাণ্ট্র এবার ডাটনকে বলল, তোমার মতলব কি? তুমি কি করবে?

ডাটন বলল, আমি মিস পিকারেলের খোঁজে যাব ওখানে। আমার মতে ওখানেই ওকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পরদিন সকালে শিকারের খোঁজে শিবির থেকে চারজন চারদিকে বেরিয়ে গেল। ডাটন গেল পশ্চিম দিকে।

বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে চার-দিকে শিকারের আশায় তাকাচ্ছিল ডাটন। কিন্তু কোথাও কোন শিকারের সন্ধান পেল না। সে বুঝতে পারেনি তার পিছন দিকে একটা ঝোপের আড়ালে একটা ক্ষুধার্ত সিংহ ওৎ পেতে বসে আছে।

ডাটনের রাইফেলের গুলিতে আগেই জখম হয়েছিল সিংহটা। এবার টারজনের ছুরির আঘাতে সে লুটিয়ে পড়ল। এবার তার মৃতদেহটার উপর একটা পা রেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে বাঁদর-গোরিলাদের মত বিজয়-সূচক চীৎকার করল। ডাটন তা দেখে ভয় পেয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে টারজনের মুখ থেকে সেই ভয়ঙ্কর পাশবিক ভাবটা চলে গেল। সে মৃদু হেসে ডাটনকে বলল, তোমার নাম পেলহ্যাম ডাটন?

ডাটন বলল, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি আমাব নাম জানলে কি করে? তুমি কে?

টারজন বলল, আমিই বাঁদর-দলের টারজন।
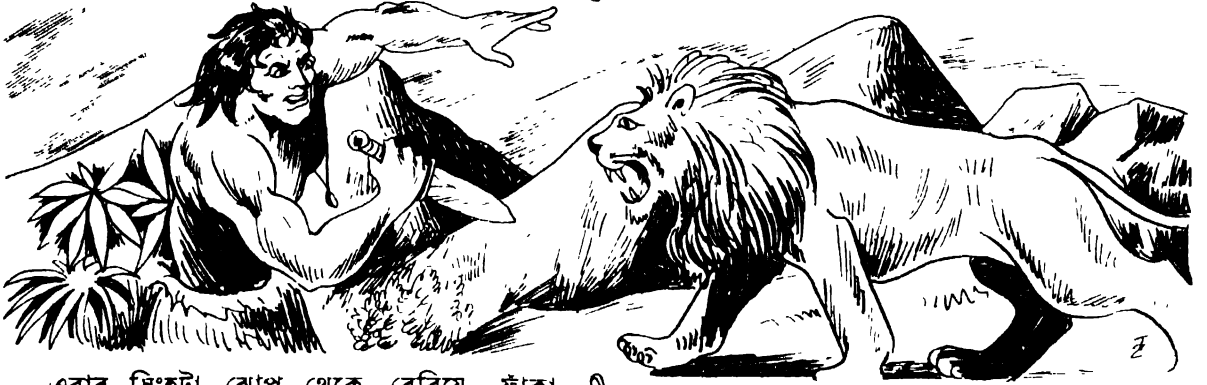
এবার সিংহটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় এসে ডাটনের পিছনে বসে রইল।

পিছন ফিরে সিংহটাকে দেখতে পেয়েই একটা গাছের কাছে ছুটে চলে গেল ডাটন। কিন্তু সে দেখল গাছের সবচেয়ে নীচু ডালটা দশ ফুট উপরে। সে তাই উঠতে পারল না। সে তার রাইফেল থেকে গুলি করল। গুলিটা সিংহের গায়ে লেগে সে উল্টে পড়ে গেলেও ডাটনকে ধরার জন্য লাফ দিল। ডাটন আবার গুলি করল কিন্তু গুলিটা এবার লাগল। সিংহটা এবার ডাটনের উপর ঝাঁপ দেবার জন্য উদ্যোগ করতেই ডাটন দেখল নগ্নপ্রায় এক শ্বেতাঙ্গ সেই গাছটা থেকে লাফিয়ে পড়ল সিংহটার ঘাড়ের উপর। তার পিঠের উপর উঠে তার পাগুলো সিংহটার পায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তার ছুরিটা বারবার বসিয়ে দিতে লাগল তার গায়ে।

তোমার কথা মেয়েটি আমাকে বলেছিল।

ডাটন বলল, কোন্ টাবজন।

টারজন বলল, টারজন একটাই আছে। অন্য একটা লোক আমার নাম নিয়ে কুকর্ম করে বেড়াচ্ছে। আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ডাটন বলল, তুমিই তাহলে মিস পিকারেলকে উদ্ধার করেছিলে এবং তোমাকেই ক্রাম্প গুলি করেছিল?

টারজন বলল, হ্যাঁ, ক্রাম্প আমায় গুলি করেছিল। সে অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক। সে শুধু পুরস্কার আর প্রতিশোধের কথা ভাবছে। আমি তাকে একদিন হাতে পাবই। কিন্তু তুমি একা বনের মধ্যে কি করছিলে?

ডাটন বলল, নিগ্রোভৃত্যরা আমাদের সব খাবার নিয়ে পালিয়েছে শিবির ছেড়ে। তাই

শিকার করতে বেরিয়েছি।

টারজন বলল, শিবিরে আর কে কে আছে? ক্রাম্প, মিনস্কি আর গাণ্ট্রু?

ডাটন বলল, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কি করে ওদের নাম জানলে?

টারজন বলল, মেয়েটি আমাকে সব বলেছিল। বলেছিল একমাত্র তোমাকেই সে বিশ্বাস করে।

ডাটন বলল, আমিও ক্রাম্প আর মিনস্কিকে বিশ্বাস করি না। সম্প্রতি গাণ্ট্রুকেও ভাল মনে হচ্ছে না, কারণ ও প্রায়ই ওদের সঙ্গে চুপি চুপি সলাপরামর্শ করে। ওদের সবার লোভ পুরস্কারটার উপর। এখন আবার ক্রাম্প বলছে কতুরি পাহাড়ে ভাল ভাল সোনা আছে।

টারজন বলল, কিন্তু সে সোনা ওরা কোনদিনও পাবে না। মেয়েটি এখন শিবিরে আছে ত?

ডাটন বলল, টারজন নামধারী একজন শ্বেতাঙ্গ কয়েকটা বাঁদর-গোরিলা নিয়ে এসে তাকে আবার চুরি করে নিয়ে গেছে শিবির থেকে।

টারজন বলল, তোমরা তার খোঁজে বেরিয়েছ?

ডাটন বলল, হ্যাঁ।

টারজন বলল, তাহলে আমরা একই পথের পথিক। আমি আমার নামধারী সেই লোকটাকে খুঁজে বার করবই। আমি তাকে শেষ করব।

ডাটন বলল, তাহলে আমাদের সঙ্গে যাবে?

টারজন বলল, না, আমি একা যাব। তোমার সঙ্গীদের আমার ভাল লাগে না। ওরা আমায় হত্যা করার চেষ্টা করবে পুরস্কারের লোভে।

ডাটন বলল, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে যাব। তুমি লোকটাকে খুঁজে বা'র করবে আর তাহলেই আমি মিস পিকারেলকে খুঁজে পাব। আমার সঙ্গীরা শুধু সোনার খোঁজ করবে। তারা আমাকে সাহায্য করবে না।

টারজন বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। তাহলে তুমি আমার সঙ্গে আসতে পার।

ডাটন টারজনের সঙ্গে যোগ দিল। তখনই যাত্রা শুরু করল ওরা। সেই ফাঁকা জায়গাটা পার

হয়ে বনের মাঝে ঢুকে একটা পথ পেল। কিছুদূর গিয়েই একদল বাঁদর-গোরিলা দেখে গুলি করতে যাচ্ছিল ডাটন। কিন্তু টারজন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ওরা তোমার কোন ক্ষতি করবে না। ওরা আমার বন্ধু। ওদের আমি বুঝিয়ে বলব।

ডাটন বলল, ক'দিন ধরে আমরা মাংস পাইনি। শুধু কিছু ফল খেয়ে আছি।

টারজন তখনই চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সে একটা হরিণ মেরে নিয়ে এসে ডাটনকে বলল, আগুন জ্বালাও।

ডাটন আগুন জ্বালিয়ে তার খাবার মাংসটা আগুনে ঝলসিয়ে সিদ্ধ করে নিল। টারজন বাঁদর-গোরিলাদের সঙ্গে কাঁচা মাংস ছুরি দিয়ে কেটে খেয়ে নিল। তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সে।

খাওয়ার পর রাত্রি হলে টারজন ডাটনকে বলল, তুমি থাক, এইখানেই শুয়ে পড়। বাঁদর-গোরিলাগুলো পাহারা দেবে। কোন বিপদ দেখলে তোমাকে জাগিয়ে দেবে। আমি এক জায়গায় যাচ্ছি। এখনি ফিরে আসব।

এদিকে ক্রাম্প, মিনস্কি আর গাণ্ট্রু শিবিরে ফিরে এসে দেখল ডাটন ফেরেনি। তারা কেউ কোন শিকার পায়নি। সবাই শুধু কিছু করে ফল এনে-

ছিল যোগাড় করে। তাই খেয়ে আগুন জ্বালল শিবির পাহারার জন্য।

ক্রাম্প বলল, ডাটন না আসুক। বাঁচা গেছে।

গাণ্ট্ৰ বলল, লোকটা কিন্তু ভালই ছিল।

ক্রাম্প গাণ্ট্ৰকে বলল, তোমরা শুয়ে পড়। আমি চার ঘণ্টা আগুনের পাশে বসে পাহারা দেব।

কিন্তু ওরা শুয়ে পড়তেই বনের ভিতর থেকে অদৃশ্য অবস্থায় কে ওদের উদ্দেশ্যে বারবার বলতে লাগল, তোমরা ফিরে যাও। বাঁচতে চাও ত ফিরে যাও। তা না হলে মৃত্যু তোমাদের অনিবার্য।

সে রাতে গাণ্ট্ৰ একটুও ঘুমোতে পারেনি। বনের ভিতর থেকে আসা সেই রহস্যময় কণ্ঠের কথাগুলো শুনে ভয় পেয়ে যায় তারা সবাই।

সকালে উঠে গাণ্ট্ৰ দেখল ক্রাম্প আর মিনস্কি আগেই উঠে পড়েছে। গাণ্ট্ৰ বলল, কাল রাতে শুনেছ? লোকটা কে কিছু বুঝতে পারছ?

ক্রাম্প বলল, ওসব কথা বাদ দাও। এখন আমাদের খাবার নেই। এখনি বার হতে হবে।

গাণ্ট্ৰ বলল, কোন্‌দিকে যাবে?

ক্রাম্প বলল, আমরা যাব রুতুরি পাহাড়ের দিকে।

গাণ্ট্ৰ বলল, তাহলে আমি যাব না।

ক্রাম্প বলল, না যাও, ভালই হবে। একটা লোকের ভাগ বেঁচে যাবে।

গাণ্ট্ৰ বলল, মরা লোকে কখনো কোন পুরস্কার দিতে বা নিতে পারে না।

ক্রাম্প বলল, এখনি চলে যাও।

গাণ্ট্ৰ তার রাইফেলটা নিয়ে শিবির ছেড়ে দক্ষিণ দিকে রওনা হয়ে পড়ল।

টারজন বাঁদর-গোরিলাদের কাছে ডাটনকে রেখে সে রাতে চলে গেলে ঘুম এল না ডাটনের। বাঁদর-গোরিলাগুলোকে টারজনের দলে দেখার পর থেকেই সন্দেহ জাগে ডাটনের। সুতরাং এই মুহূর্তেই চলে যাওয়া ভাল।

এই ভেবে তখনি উঠে পড়ল ডাটন। যে বাঁদর-গোরিলাগুলোর উপর ডাটনের নিরাপত্তার ভার দিয়ে গিয়েছিল টারজন তাদের অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর যারা জেগে ছিল তারা তত গ্রাহ্য করল না।

টারজন ফিরে এসে ডাটনকে দেখতে না পেয়ে বাঁদর-গোরিলাদের কাছ থেকে সবকিছু জানল। সে তাদের কথা বিশ্বাস করল। কারণ সে জানত পশুরা কখনো মিথ্যা কথা বলে না মানুষদের মত। সে ডাটনের নাম ধরে বারকতক ডাকল। কিন্তু সাড়া পেল না। সে এগিয়ে গিয়ে বনটার আশেপাশে একবার দেখল। কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পেল না।

ডাটন তখন একাই অন্ধকার বনপথে রুতুরি পর্বতের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ এক-সময় তার সামনে একদল নিগ্রো যোদ্ধা পথরোধ করে দাঁড়াল। সে তার রাইফেল তুলে গুলি করার আগেই তাদের একজন রাইফেলটা কেড়ে নিল তার হাত থেকে। ডাটন অসহায় হয়ে পড়ল একেবারে।

নিগ্রো যোদ্ধাগুলোর গায়ে গয়না ছিল। তাদের বড় বড় দাঁতগুলো দেখে সে বুঝল তারা নরখাদক। তাদের ভাষা সে জানত না বলে কোন কথাই বলতে

পারল না। তারা তাকে তাদের দিকে ধরে নিয়ে যেতে লাগল। পথে তার রাইফেলটা নিয়ে একটা যোদ্ধা নড়াচড়া করায় তার থেকে গুলি বেরিয়ে সামনের একটা লোকের বুকে লাগতেই সে মারা গেল। তখন একটা লোক ডাটনকে মারতে লাগল রেগে গিয়ে। মৃত লোকটা তার আত্মীয় ছিল।

কিন্তু তাদের সর্দার তাকে বাধা দিল। তাদের বোঝাল বন্দীকে গাঁয়ে নিয়ে গেলে তারা তার মাংস খেতে পারবে।

টারজন যখন তার বাঁদর-গোরিলা দল নিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ রাইফেলের একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেল।

সহসা ওয়ারুতুরিদের দলের একটা লোকের কাঁধে একটা তীর এসে লাগায় সে চীৎকার করে পড়ে গেল। দলের সবাই তখন থেমে গেল। চারদিকে কাউকে দেখতে পেল না। তখন যে লোকটার আত্মীয় মারা যায় সে ডাটনকে দেখিয়ে বলল, এই শ্বেতাঙ্গটার কারসাজি এটা।

এই বলে সে তার বর্শাটা ডাটনের বুকে বসিয়ে দিতে যেতেই আবার একটা তীর এসে তার বুকে লাগল। সেও পড়ে গেল।

তখন এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পেল তারা, শ্বেতাঙ্গকে ছেড়ে দাও তোমরা। না হলে মরবে। নিগ্রোরা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা করার পর মৃতদের ফেলে বন্দীকে নিয়ে তাড়াতাড়ি পথ

ব্যাপারটা কি তা দেখার জন্য কাছের একটা উঁচু গাছের উপর উঠে পড়ল টারজন। সবচেয়ে উঁচু ডালের উপর থেকে দেখল একদল ওয়ারুতুরি যোদ্ধা একজন শ্বেতাঙ্গকে বর্শা দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে নিয়ে যাচ্ছে। একটা ডুলিতে করে একটা মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা। টারজন এবার বুঝতে পারল ঐ শ্বেতাঙ্গই হলো ডাটন।

ডাটন যে তার প্রতি সন্দেহবশতঃ ইচ্ছে করে তার দল ছেড়ে পালিয়ে যায় এটা জানত না টারজন। সে ভাবল ডাটনের কোন দোষ নেই এবং সে বনে ইতস্তত: ঘুরতে ঘুরতে পথ হারিয়ে ফেলে এবং পরে ধরা পড়ে ওয়ারুতুরিদের হাতে।

চলতে লাগল। আবার সেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল, শ্বেতাঙ্গ বন্দীকে ছেড়ে দাও।

কিন্তু নিগ্রোরা এবার ছুটতে লাগল। তখন আবার একটা তীর এসে বিদ্ধ করল একজনকে। এবার বন্দীকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালাল নিগ্রোরা।

এতক্ষণে ডাটনের পথের সামনে নেমে পড়ল টারজন। ডাটন বলল, তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছ, কি দিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করব তা জানি না।

টারজন বলল, শিবির ছেড়ে আসা উচিত হয়নি তোমার। বাঁদর-গোরিলারা তোমায় রক্ষা করত যে কোন বিপদ থেকে।

ডাটন বুঝল এই টারজনের কাছে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ তার পক্ষে।

পরদিন সকালেই টারজন কতুরি পাহাড়ের কোণে সেই কাঁটাবনটায় গিয়ে পৌঁছল। একটা সোজা পথ ধরে সেই খাদের পাশে খাড়াই পাহাড়ের পাদদেশে চলে গেল।

এই পাহাড়টা পার হতে হবে ওদের। বাঁদিকের খাদটায় বহু ক্ষুধার্ত সিংহ ঘোরাফেরা করছিল।

ডাটন বলল, মিস পিকারেলও নিশ্চয় এই পাহাড় পার হয়েছে।

টারজন বলল, খাদে সিংহের মুখে না পড়লে নিশ্চয় পাহাড়ে উঠতে হয়েছে তাকে।

ডাটন বলল, ওদের সঙ্গে বাঁদর-গোরিলাগুলো তাহলে কি এখান থেকে ফিরে গেছে?

টারজন তখন এ কথার উত্তর না দিয়ে উঙ্গোকে কি বলতে সে আবার তার দলের বাঁদর-গোরিলাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। তখন বাঁদর-গোরিলাগুলো অনায়াসে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল। টারজনও অবলীলাক্রমে ওদের মতই উঠে গেল পাহাড়ের চূড়ায়।

পাহাড়টার মাথায় উঠে ডাটন কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল। টারজন উপর থেকে দেখল, পাহাড়ের ওপারে একটা উপত্যকা। উপত্যকার ওধারে একটা বন। পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকার উপর দিয়ে যেতে যেতে টারজন বলল, ঐ সামনের বনটায় দুদলে যুদ্ধ হচ্ছে। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখব কারা যুদ্ধ করছে। আমার মনে হয় সেই লোকটা মেয়েটিকে নিয়ে ওর মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

উপত্যকাটা পার হয়ে বনের কাছে যেতেই ওরা দেখল দুই দলে যুদ্ধ হচ্ছে। দেখল বনটা যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে একটা ফাঁকা জায়গায় এক বিরাট প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। তার উপর থেকে বাদামী রঙের সৈনিকরা মাথায় শিরস্ত্রাণ আর গায়ে বর্ম পরে তীর আর বর্শা ছুঁড়ছে আর প্রাসাদের নিচে কুড়িটা মোষে-টানা একটা উঁচু রথে করে অনেক কৃষ্ণকায় সৈনিক ঘুরে ঘুরে যুদ্ধ করছে। তাদের হাতে ছিল তীর ধনুক আর বর্শা।

ওরা দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে যুদ্ধ দেখছিল বলে কোন কিছু খেয়াল করেনি। কখন একদল কৃষ্ণকায় সৈনিক এসে ওদের ঘিরে ফেলেছে তা জানতে পারেনি। টারজন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পালিয়ে গেল। কিন্তু ডাটন ধরা পড়ল আর দুজন বাঁদর-গোরিলা মারা গেল।

এদিকে ক্রাম্প আর মিনস্কি কতুরি পাহাড়ের কাছে এসে ওয়াকতুরি গাঁয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

ওয়াকতুরি গাঁটা ফেলে রেখে ঠিক পথেই যাচ্ছিল ওরা। কিন্তু ওদের ডান দিকের উপত্যকায় একদল যোদ্ধার একটা সফরি দেখতে পেয়ে মিনস্কি ক্রাম্পকে তা দেখাল।

ওরা বনের মধ্যে লুকিয়ে দেখল সেই সফরিতে মোট পনেরজন লোক ছিল। তাদের চেহারাগুলো লালচে ধরনের বলে তাদের শ্বেতাঙ্গ ভাবল। তাদের সঙ্গে যে মালপত্র ছিল তা পাঁচজন বাহক বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

ক্রাম্প বলল, ওরা ওয়াকতুরি নয়। ওরা শ্বেতাঙ্গ ; ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। ওরা

নিশ্চয় রুতুরি পাহাড়ের কোথায় সোনা পাওয়া যায় তা জানে।

মিনস্কির ইচ্ছা ছিল না। তবু ক্রাম্পের সঙ্গে যেতে হলো। ওরা তাদের কাছে যাবার আগেই তাদের সফরির একজন শ্বেতাঙ্গ মালবাহককে ইংরিজিতে বলল, তোমরা ইংরিজি ভাষা জান?

ক্রাম্প বলল, জানি।

সেই মালবাহককে শ্বেতাঙ্গ বলল, এদের কাছে এস না। ভাল চাও ত পালিয়ে যাও এখান থেকে। নিকটবর্তী কোন বন্দরে কোন ইংরেজ অফিসারকে জানিয়ে দেবে, ফ্রান্সিস বোল্টন শিল্টন রুতুরি পাহাড়ে বন্দী হয়ে আছে।

ক্রাম্প বলল, ধরতে পারলে ওরা আমাদের কি খুন করবে?

বোল্টন বলল, না, তোমাদের ক্রীতদাস করে রাখবে।

মিনস্কি বলল, ওদের হাতে বন্দুক নেই। আমরা গুলি করে ওদের সবাইকে খতম করে শ্বেতাঙ্গ বন্দী-টাকে মুক্ত করতে পারি।

মিনস্কি রাইফেল তুলতেই ক্রাম্প বলল, থাম, থাম। আমরা সোনার খনিটা খুঁজছি। আমাদের খনিটা পাওয়া নিয়ে দরকার। ওরা আমায় ক্রীত-দাস বানায় ত বানাবে। কিন্তু একবার সোনার খনিটার সন্ধান পেলেই আমরা পালিয়ে যেতে পারব।

ক্রাম্প আবার এগোতে বোল্টন তাকে সাবধান করে দিল। কিন্তু ক্রাম্প তাকে থামিয়ে দিল। ধমক দিয়ে বলল, তুমি থাম, বাজে বকো না। আমরা জেনেশুনেই যাচ্ছি।

ক্রাম্প আর মিনস্কি দলটার কাছে যেতেই তারা ওদের ঘিরে ফেলল। বোল্টন বলল, ওরা বলছে তোমরা ওদের বন্দী। বন্দুকগুলো দিয়ে দাও।

বনের মধ্যে গাছের আড়াল থেকে যুদ্ধটা দেখল টারজন। হঠাৎ অদূরে বনের মধ্যে দুদল বাঁদর-গোরিলার লড়াইয়ের শব্দ শুনতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল সে। গিয়ে দেখল দুদল বাঁদর-গোরিলা সামনাসামনি দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। একদলের সামনে আছে মালগাশ নামে তাদের রাজা। দুজনেই নিজেদের বাঁদরদলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা বলে বুক চাপড়াচ্ছে।

দুদলের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে টারজন বলল, আমি হচ্ছি টারজন, সব বাঁদর-দলের রাজা।

টারজনকে দেখে উঙ্গো সরে গেল। মালগাশ হচ্ছে আলেমতেজোর দেবতার সেবক বাঁদর-গোরিলাদের নেতা। সে প্রথমে টারজনকে তাদের দেবতা ভেবেছিল। কিন্তু পরে বুঝল তাদের দেবতা পালিয়ে গেছে। প্রথমে তার দলের সবার সঙ্গে কি আলোচনা করল। তারপর ফিরে এসে টারজনকে মালাগাশ বলল, না, তুমি টারজন নও। মালগাশ তোমাকে মারবে।

এই বলে সে টারজনের গলাটা ধরার জন্য হাতদুটো বাড়িয়ে দিল। কিন্তু টারজন তার তলা দিয়ে গলে গিয়ে তার মাথায় এমন একটা জোর ঘুষি মারল যার আঘাতে সে ঘুরে পড়ে গেল। টার-জন তার হাতদুটো ধরে তাকে তুলে আছাড় মেরে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর তার বুকের উপর বসে বলল, 'কাগোদা'? অর্থাৎ হার মেনেছ?

মালগাশ বলল, 'কাগোদা' অর্থাৎ হার মেনেছি।

টারজন এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি হচ্ছি সমস্ত বাঁদর-দলের রাজা, আমি যা বলব তাই তোমাদের করতে হবে।

মালগাশ তার দলের সবাইয়ের সঙ্গে মাথা নীচু করে চলে যাচ্ছিল। টারজন তাদের ডাকল। বলল, মালগাশ তার দলের রাজা থাকবে আর উঙ্গোও তার দলের রাজা থাকবে। তবে যতদিন উঙ্গো তাদের দেশে থাকবে ততদিন তার ও দলের সঙ্গে শান্তিতে মিলেমিশে বাস করতে হবে। আমি যখনই ডাকব তখনই তোমরা সবাই আসবে। দুজনে মিলে তোমাদের সাধারণ শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করবে।

বাকি দিনটা বাঁদর-গোরিলাদের সঙ্গে কাটিয়ে রাত্রি হতেই তাদের কাছ থেকে চলে গেল টারজন। আলেমতেজোর রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি একটা গাছের উপর উঠে লক্ষ্য করতে লাগল প্রাসাদটাকে।

সকাল হতেই প্রাসাদের সামনের দিকের গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রহরী তাকে তাদের দেবতা ভেবে সম্ভ্রমের সঙ্গে পথ ছেড়ে দিল। ভিতরের সৈনিকরাও তাকে কিছু বলল না বা তার পথ আটকাল না। এমন সময় একটা জোর গোলমালের শব্দে সকলেই ছোটাছুটি করতে লাগল।

টারজনও তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখল প্রাসাদের পিছন দিকে যে একটা ফাঁকা জায়গা ছিল তার উপর অনেকে জড়ো হয়েছে। গাঁয়ের দিক থেকে একটা পাগলা মোষ ছুটে আসছিল। সবাই বলছিল বুনো মোষটা পাগলা হয়ে গেছে, পোষ মানছে না। সামনে যাকে পাবে তাকেই মেরে ফেলবে। আলেমতেজোর সামন্ত এবং প্রধান সেনাপতি আসোরিও দা সেরার বীর এবং সাহসী হিসাবে খ্যাতি ছিল। সে তাই তার তরবারি হাতে মোষটার পথের সামনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যখন দেখল ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করতে থাকা মোষটাকে সে আটকাতে বা মারতে পারবে না তখন পিছন ফিরে ছুটে পালাতে লাগল। মোষটা এবার তাকেই তাড়া করল।

পাশ থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে টারজন বুঝল মোষটা অল্প সময়ের মধ্যেই ধরে ফেলবে লোকটাকে। মোষটার হাত থেকে তার কোন পরিত্রাণ নেই। তখন সে পাশ থেকে একটা লাফ দিয়ে মোষটার পিঠের উপর উঠে পড়ে তার একটা শিং ধরে মাথাটা ঘুরিয়ে দিল। ঘাড়টা এমনভাবে বাঁকিয়ে দিল যে মোষটা উল্টে পড়ে গেল। টারজন তখন মাটিতে নেমে পড়ল। মোষটা এবার ছাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে গেলে টারজন এবার সামনে এসে দুটো শিং ধরে আবার ঘাড়টা ঘুরিয়ে দিল। ফলে মোষটা এগোতে বা ছুটতে পারল না। মোষটাকে আবার ঘাড় ধরে উল্টে ফেলে দিল টারজন। তখন কুড়িজন যোদ্ধা মোটা দড়ি নিয়ে এসে তাকে বেঁধে ফেলল।

দা সেরা টারজনের সাহস আর অতিমানবিক শক্তি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কোন মানুষের এত শক্তি ও সাহস থাকতে পারে তা সে কল্পনা করতে পারেনি কোনদিন।

এবার টারজনের কাছে গিয়ে দা সেরা বলল, তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। কে তুমি এবং কিভাবে তোমার এ ঋণ আমি পরিশোধ করব?

টারজন বলল, আমি হচ্ছি বাঁদরদলের টারজন।

দা সেরা বলল, সে ত দু'বছর আলেমতেজোর দেবতা হিসাবে ছিল। এখন চলে গেছে। তার নামই ত টারজন।

টারজন বলল, না, আমিই টারজন। সে হচ্ছে ভণ্ড, প্রতারক, আমার নাম নিয়ে কুকর্ম করে বেড়ায়। তুমি কে?

দা সেরা বলল, আমি আলেমতেজোর সৈন্য-দলের প্রধান সেনাপতি অসোরিও দা সেরা। তুমি আমার অতিথি হয়ে এখানে থাকবে।

এবার সে তার সৈনিকদের বলল, এই দেখ, এই বিদেশীই হচ্ছে আসল দেবতা। আগের সেই দেবতা ভণ্ড, প্রতারক।

দা গামা বলল, ওদের দু'জনকেই ডাক।

এদিকে দা সেরা টারজনকে বলেছিল, তুমি এখানে থেকে যাও। আমি তোমাকে মৃত্যু ও দাসত্ব—দুটোর হাত থেকেই রক্ষা করব।

টারজন বলল, তাব মানে?

দা সেরা বলল, এখানে বন্দীদের হয় বলি দেওয়া হয় অথবা ক্রীতদাস করে রাখা হয়।

টারজন বলল, আমি ও সব কিছুরই ভয় করি না।

দা সেরা বলল, তুমি কি জন্য এখানে এসেছ?

টারজন বলল, আমি এখানে তোমাদের সেই দেবতা ভণ্ড লোকটাকে মারতে এসেছি।

এ কথায় সবাই নতজানু হয়ে সম্মান দেখাল টারজনকে।

দা সেরা বলল, তুমি আমার ঘরে চল।

এই বলে সে তাকে প্রাসাদের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

এদিকে রাজা দা গামা তার ঘরে বসে একজন ক্রীতদাসকে ডেকে বলল, সে নাকি একটা পাগলা মোষকে ঘায়েল করেছে। দা সেরা তার ঘরে দেবতার সঙ্গে কথা বলছে।

দা সেরা বলল, তুমি আমাদেব দেবতাকে মারতে এসেছ? সত্যিই তুমি বীর। কিন্তু মনে কর আমরা যদি সত্যি সত্যিই তাকে দেবতা বলে বিশ্বাস করে থাকি?

টারজন বলল, আমি জানি তুমি, তোমাদের রাজা দা গামা বা প্রধান পুবোহিত রুইজ কেউ তাকে দেবতা বলে বিশ্বাস কবে না। লোকটা এখন কোথায়? যে মেয়েটি এসেছিল সে-ই বা কোথায়?

দা সেরা বলল, ওরা এখান থেকে পালিয়ে যাবার সময় নিগ্রো মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে। উপত্যকার শেষ প্রান্তে পাহাড়ের তলায় ওদের গাঁ।

টারজন বলল, আমি সেখানে যাব।

দা সেরা বলল, ওরা বড় ভয়ঙ্কর, তোমাকে মেরে ফেলবে।

তবু আমি যাব।

এত তাড়াতাড়ি করার কিছু নেই। তাকে যদি তারা হত্যা না করে থাকে তাহলে তাকে ক্রীতদাস করে রেখেছে। সে ক্রীতদাস হয়েই থাকবে সেখানে। তুমি কিছুদিন আলেমতেজোতে থাকার পর সেখানে যাবে। এখান থেকে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পাব।

টারজন বলল, কি ভাবে আমি সাহায্য করব তোমায় ?

দা সেরা বলল, দা গামা আর কুইজ দুজনেই খুব খারাপ লোক। আমরা তাদের জায়গায় এক নতুন রাজা ও প্রধান পুরোহিতকে বসাতে চাই। রাজ্যের লোকেরা তোমাকে তাদের দেবতা বলে বিশ্বাস করলে রাজা দা গামার বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহী করে তোলাটা কঠিন হবে না।

টারজন বলল, তাহলে তুমি রাজা হবে ?

দা সেরা বলল, রাজ্যের সামন্ত আর যোদ্ধারা যাকে রাজা কববে সেই রাজা হবে।

দা সেরার কথা শেষ হতেই একজন দূত এসে বলল, দেবতা আব আপনাকে দরবারঘরে বাজা ডাকছেন।

দূত টাবজনকে দেখেই তাকে দেবতা ভেবে নতজানু হলো।

দা সেরা বলল, রাজাকে বলগে, তিনি যেন দরবারঘবে রাজ্যের সব সামন্ত আর যোদ্ধাদেব ডাকেন যাতে তারা আমাদের আসল দেবতাকে বরণ করে নিতে পারে।

এদিকে নতুন দেবতার কথাটা শোনার পর থেকে ক্ষেপে গিয়েছিল দা গামা। সে বলছিল, এটা দা সেরাব চালাকি।

প্রধান পুরোহিত কুইজ তখন বলল, তাহলে কেন তাদের বলছ না যে লোকটা দেবতা নয়, একটা ভণ্ড প্রতারক ?

বাজা বলল, সেটা বলবে তুমি। তুমি প্রধান পুরোহিত। তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে কে দেবতা বা দেবতা নয়।

দরবারঘরে গিয়ে দা গামা সিংহাসনে বসল। কুইজ বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, তোমরা সবাই জান, আমাদের আসল দেবতাকে মুসলমানরা ধরে নিয়ে গেছে। সেই আসল দেবতা যদি ফিরে আসে তাহলে কৃতজ্ঞচিত্তে তাকে বরণ করে নেব আমরা। আর যদি সে ভণ্ড হয় তাহলে তাকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা হবে চিরদিনের জন্য অথবা আলেমতেজোর অভিভাবকদের মুখে ফেলে দেওয়া হবে।

দরবারঘরে সমবেত জনতার মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল।

এমন সময় ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে দা সেরা বলল, আসল দেবতা এসে গেছেন।

উপস্থিত সকলেই দা সেরা ও টারজনের দিকে তাকাতে লাগল।

টারজনকে দেখে অনেকেই নতজানু হয়ে বলল, আসল দেবতা। কেউ কেউ আবার নতজানু হলো না, বলল, ভণ্ড।

দা সেরা আবার বলতে লাগল, তোমরা সবাই দেখেছ এই দেবতা কি ভাবে একটা পাগলা মোষকে থামিয়ে দেয় এবং তার সঙ্গে লড়াই করে তাকে ফেলে দিয়ে বশীভূত করে। কোন মানুষ কখনো এ কাজ করতে পারে না। আর আমরা যাকে আসল দেবতা ভাবতাম সেই ভণ্ড লোকটা নিগ্রো মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে।

এ কথা সামন্ত আর যোদ্ধারা মেনে নিল। তাদের প্রায় সবাই নতজানু হয়ে টারজনকে আসল দেবতা হিসাবে বরণ করে নিল।

রুইজ বলল, ও দেবতা নয়, ভণ্ড।

দা গামা বলল, ওদের দুজনকেই ধরে সিংহের মুখে ফেলে দাও। ওদের মধ্যে একজন ভণ্ড আর একজন বিশ্বাসঘাতক।

এ কথা শুনে রাজার অনুগত একজন যোদ্ধা টারজনকে তার মুক্ত তরবারি দিয়ে আঘাত করতে গেল। কিন্তু টারজন তাকে তুলে মেঝের উপর আছড়ে ফেলে দিল।

এরপর দরবার ঘরটা স্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই ভয় পেয়ে গেল। মোষের সঙ্গে টারজনের লড়াই তারা দেখেছিল, তার উপর আবার তারা তার শক্তির পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। এবার দুই-একজন বাদে সবাই একবাক্যে বলে উঠল, দা গামা নিপাত যাক, দা সেরা দীর্ঘজীবী হোক।

তারা সবাই ধ্বনি দিতে দিতে টারজন আর দা সেরাকে ঘিরে দাঁড়াল। দা গামার অনুগত দুই চারজন অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। রুইজ যোদ্ধাদের কাছে রাজা দা গামা আর আসল দেবতার প্রতি অনুগত থাকার জন্য আহ্বান জানাল। কিন্তু রুইজকে সবাই ভয় আর ঘৃণা করত। এই জন্য অনেকে রুইজকে মারার জন্য ধরতে গেল। রুইজ পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল। তার পিছু পিছু দা গামাও পালাল।

এইভাবে আসারিও দা সেরা আলেমতেজোর রাজসিংহাসনে আরোহণ করল। দা সেরা সিংহাসনের পাশে বসে তার পাশে টারজনকে আসল দেবতা হিসাবে বসাল। এবার তাদের সামনে কেসাদা নামে একজন পুরোহিত এসে টারজনের সামনে নতজানু হয়ে বসল। দা সেরা টারজনকে বলল, এই হচ্ছে তোমার প্রধান পুরোহিত। জনতার সামনে ঘোষণা করে দাও।

সেই রাতেই প্রাসাদের মধ্যে এক ভোজসভার আয়োজন করল দা সেরা।

এমন সময় একদল দূত এসে নতুন রাজা দা সেরাকে খবর দিল ওয়াকুতুরিদের গাঁ থেকে সোনার বিনিময়ে লোহা আর লবণ আনার সময় আমাদের যোদ্ধারা তিনজন শ্বেতাঙ্গকে বন্দী করে এনেছে।

টারজনের এ সব ভাল লাগছিল না। তবু ব্যাপারটা দেখার জন্য বসল। দা সেরা বন্দী তিনজনকে সেখানে আনার জন্য হুকুম দিলে তাদের আনা হলো। বন্দী তিনজন হলো ক্রাম্প, মিনস্কি আর বোল্টন। ক্রাম্প টারজনকে দেখেই আশ্চর্য হয়ে মিনস্কিকে বলল, ঐ দেখ, সেই বাঁদরলোকটা।

মিনস্কি বলল, লোকটা আবার সিংহাসনে বসে আছে। সোনার খনিটা আর খুঁজে পাব না।

টারজন ক্রাম্প ও মিনস্কিকে কিছু না বলে বোল্টনকে বলল, তুমি একজন ইংরেজ, তুমি এদের সঙ্গে কি করে এলে ?

বোল্টন বলল, যারা আমাকে বন্দী করেছিল তারাই ওদের ধরে। আমি এদের এখনো দেখিনি। দুবছর আগে নিগ্রো মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ি আমি। ওদেব সুলতান আমাকে সেখানে ক্রীতদাস করে রেখেছিল।

টারজন বলল, তুমি তাহলে ওদের দেশে দু'বছর ছিলে ?

বোল্টন বলল, হ্যাঁ জানি।

টারজন বলল, আমি তোমাকে ওখানে নিয়ে যাব। ওখানে একটা লোক একটা মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে। আমি লোকটাকে খুন করে মেয়েটাকে উদ্ধার করতে চাই।

টারজন এবার দা সেরাকে বলল, নিগ্রো মুসলমানদের গাঁয়ে যাচ্ছি। সেই ভণ্ড লোকটাকে খুন করে মেয়েটিকে উদ্ধার করতে চাই। ইংরেজ মেয়েটিকে সে জোর করে ধবে এনে এখানে দেবী বানায়।

দা সেরা বলল, আজ সকালে ওখানকার সুলতান একজন দূত পাঠিয়েছিল। ও বলেছে এখানকার রাজা যদি দু'শো মোষ দেয় তাহলে ওরা ওদের দু'জনকে ছেড়ে দেবে।

দা সেরা টারজনকে বলল, ঠিক আছে, তুমি এই লোকটাকে তোমার ক্রীতদাস হিসাবে রাখতে পার। বাকি দু'জন বন্দী হয়ে থাকবে।

দা সেরার হুকুমে ক্রাম্প আর মিনস্কিকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হল।

ভোজসভা শেষ হয়ে গেলে টারজন বোল্টনকে তার ঘরে নিয়ে গেল। টারজন জানালার কাছে বোল্টনকে নিয়ে গিয়ে বলল, নিগ্রো মুসলমানদের দেশটা কোথায় জান ? ওরা কি ভাবে কি রীতিতে যুদ্ধ করে তা দেখেছ ?

টারজন বলল, তুমি এখন সম্প্রতি রাজা হয়েছ। এখন যদি তোমাদের শত্রুদেশকে জয় করতে পার এই সুযোগে তাহলে এ দেশের জনগণ ও যোদ্ধারা সব তোমাকে দারুণ খাতির করবে। যুদ্ধ ও দেশ জয়ই রাজার মান-সম্মান বাড়িয়ে দেয়।

দা সেরা কথাটা মেনে নিল।

নিগ্রো মুসলমানদের গাঁয়ে একটা কুঁড়ে ঘরে বন্দী ছিল সান্দ্রা পিকারেল। টারজনের নামধারী লোকটা ক্রীতদাস হিসাবে কাজ করতে গিয়েছিল খনিতে।

সেদিন দুপুরবেলায় একজন যোদ্ধা এসে সুলতানকে খবর দিল, সে নিজে দেখেছে, আলেমতেজোর এক বিরাট সৈন্যদল উপত্যকার ওধারে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে। ওরা ঠিক আমাদের গাঁ আক্রমণ করবে। সুলতান সব ক্রীতদাসদের কাজ বন্ধ করে তাদের যুদ্ধের সাজে সজ্জিত করতে বলল।

টারজনের পরামর্শে আলেমতেজোর যোদ্ধারা লুকিয়ে ছিল পাহাড়ের পাশে একহাজার মোষ নিয়ে।

এদিকে সন্ধ্যা হতেই দা সেরা আক্রমণ করল। সুলতান যুদ্ধের জন্য সবাইকে প্রস্তুত হবার জন্য হুকুম দিতে লাগল। সব ক্রীতদাসদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হল। মুসলমান যোদ্ধারা বর্শা আর তীর ধনুক নিয়ে রুখে দাঁড়াল। টারজনের বাঁদর-গোরিলারাও নিগ্রোদের ধরে ধরে কামড়াতে লাগল। বহু নিগ্রো মারা গেল। অনেকে যুদ্ধ ছেড়ে পরিবার নিয়ে পালাতে লাগল গাঁ ছেড়ে।

সান্দ্রা দেখল সুলতানের যোদ্ধারা হেরে যাচ্ছে। আলেমতেজোর যোদ্ধারা জয়ের ধ্বনি দিচ্ছে। তারা তাকে আবার বন্দী করে নিয়ে যাবে। সে তাই যুদ্ধের গোলমালের মধ্যে একসময় পালাল একদিকে। তাকে দেখতে পেয়ে টারজন নামধারী লোকটা তাকে গিয়ে ধরে ফেলল। ডাটনও তাদের কাছে চলে এল। সন্ধ্যার অন্ধকারে গাঁ পার হয়ে তারা বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

যুদ্ধে সুলতানের বাহিনীকে একেবারে হারিয়ে দিয়ে আলেমতেজো জয়লাভ করল। সুলতান লুকিয়ে পড়েছিল। দা সেরা তাকে খুঁজে বার করে রাখল আলেমতেজোতে ধরে নিয়ে যাবার জন্য। টারজন সেই ভণ্ড লোকটা বা সান্দ্রাকে অনেক খুঁজেও কোথাও পেল না। তখন সে বলল, এখন রাত্রিকাল। কাল সকালে আবার খোঁজ করব।

এদিকে আলেমতেজোর রাজপ্রাসাদে দা সেরা যখন যুদ্ধের প্রস্তুতির ব্যাপারে ব্যস্ত ছিল তখন এক-

ফাঁকে ক্রাম্প আর মিনস্কি প্রাসাদের বাইরে বনের মধ্যে পালিয়ে যায়।

ওরা আলেমতেজোর যোদ্ধাদের সঙ্গে যাতে দেখা না হয় তার জন্য ঘুরপথে এগিয়ে যাচ্ছিল। এজন্য সারারাত ধরে পথ চলার পর সকালে ওরা কতুরি পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছল। সেই পাহাড়ের মধ্যেই এক জায়গায় টারজন নামধারী লোকটা, ডাটন আর সান্দ্রা লুকিয়েছিল।

এদিকে সান্দ্রা সেই পাহাড়ের কোলে এক জায়গায় সকাল হতেই জেগে উঠল ঘুম থেকে।

ওরা তিনজনই আর দেরী না করে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোতে লাগল।

সান্দ্রা ক্লান্তি আর ক্ষুধাজনিত দুর্বলতায় পথ চলতে পারছিল না। ডাটন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

টারজন নামধারী লোকটা হঠাৎ বলল, মনে হচ্ছে সামনের ঐ বাঁশবনটায় কি একটা বড় জন্তু রয়েছে। দেখি কোন শিকার পাওয়া যায় কি না।

এই বলে সে একটা তীর ছুঁড়ে দিল বাঁশবনটার ভিতরে।

কিন্তু বাঁশবনের মধ্যে মালগাশের বাঁদর-গোরিলাদের দলটা আহার খুঁজছিল, ওরা বুঝতে পারেনি।

একটা বাঁদর-গোরিলার গায়ে তীরটা লাগায় ওরা ক্ষেপে গিয়ে বেরিয়ে এল।

টারজন নামধারী লোকটা বলল, ওরা দেবতার সেবক।

সে বাঁদর-গোরিলাগুলোকে থামতে বলল। বলল আমি হচ্ছি তোমাদের দেবতা। তোমরা থাম। আমার কথা শোন। কিন্তু ওরা থামল না। ওরা ওদের তিনজনকেই আক্রমণ করল ভয়ঙ্করভাবে।

ডাটন বর্শা দিয়ে যাকে আঘাত করল সেই বাঁদর-গোরিলাটা তার বর্শাটা কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে দিল। ডাটন তার বর্শাটা দিয়ে আঘাত করতে সেও সেটা ভেঙে দিল। বাঁদর-গোরিলাগুলো এর-পর বর্শার বাঁট দিয়ে টারজন-নামধারী লোকটার মাথায় জোর আঘাত করায় সে অচেতন হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। তাদের একজন ডাটনকে তুলে নিয়ে ঘাড়ে একটা জোর কামড় দিতে সেও লুটিয়ে পড়ল।

এবার একজন সান্দ্রাকে তুলে নিয়ে পালাতে লাগল।

সারাদিন ধরে অনেক খুঁজেও আহারের কোন সন্ধান পেল না ক্রাম্পরা। রাত্রি হতেই শীতে কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়ল তারা দু'জনে।

সকাল হলে ক্রাম্প বলল, ঐ দেখ, একটা মানুষ হয়ত ঘুমোচ্ছে।

মিনস্কি বলল, আরে, এই লোকটাই ত টারজন যে মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।

এদিকে টারজন নামধারী লোকটা চেতনা ফিরে পেয়ে তৎক্ষণে উঠে বসে চারদিকে তাকাচ্ছিল। সে সান্দ্রা আর ডাটনের খোঁজ করছিল। কিন্তু তাদের কাউকে দেখতে পেল না। শুধু দেখল দু'জন শ্বেতাঙ্গ তার দিকেই আসছে।

ওরা কাছে এলে নকল টারজন বলল, তোমরা কি করে এলে এখানে? মিস পিকারেলকে দেখেছ? কোন খবর জান তার?

ক্রাম্প বলল, তুমি আমাদের শিবির থেকে তাকে চুরি করে নিয়ে যাবার পর থেকে তাকে আর দেখিনি।

টারজন নামধারী লোকটা বলল, গতকাল বিকেলে আমরা তিনজনে এইখানে এসে পড়ি। তারপর একদল বাঁদর-গোরিলা আমাদের আক্রমণ করে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তারপর কি হয় তা আমি জানি না।

ক্রাম্প বলল, নিশ্চয় মেয়েটাকে তারা নিয়ে গেছে।

এরপর তারা বনের দিকে চলে গেল সান্দ্রার খোঁজে।

সান্দ্রাকে বাঁদর-গোরিলাটা যখন বনের ভিতর দিয়ে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ তাদের পথে উঙ্গো তার দলবল নিয়ে এসে পড়ে। উঙ্গো দেখল সাঁচো নামে আলেমতেজোর এক বাঁদর-গোরিলা একটা শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছে।

উঙ্গো সাঁচোর পথরোধ করে দাঁড়াতেই সে তার দলের বাঁদর-গোরিলাদের ডাকতে থাকে। তারা এসে পড়লে দুদলে আবার লড়াই শুরু হয়ে যায়। সাঁচো সান্দ্রাকে নামিয়ে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখে। সান্দ্রা যখন দেখল দু'দলের সব বাঁদর-গোরিলারা পরস্পরকে কামড়াচ্ছে এবং ভীষণভাবে মারামারি করছে তখন সে আর দাঁড়াল না সেখানে। সে চলে গেল।

ক্রাম্প, মিনস্কি আর নকল টারজন একই সঙ্গে আহার আর সান্দ্রার অনেক খোঁজ করেও কিছুই পেল না।

ওরা ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের মধ্যে একটা খনির কাছে এসে পড়ল। ওরা দেখল খনির মুখটা বেশ বড়। উপর থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে ধাপে ধাপে। খনির ভিতরটা পঁচিশ ফুট গভীর এবং খনিটা আধ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত।

নকল টারজনের পাশে ক্রাম্প আর মিনস্কি দাঁড়িয়েছিল। ক্রাম্প আনন্দের আবেগে চীৎকার করে উঠল, খনি, সোনার খনি পেয়ে গেছি। দেখ, দেখ।

ক্রাম্প সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মিনস্কি তার পিছু পিছু গেল।

সোনার তালগুলোর লোভে উন্মত্ত হয়ে ক্রাম্প এক জায়গায় কুড়িয়ে জড়ো করে রাখতে রাখতে বলল, এগুলো সব আমার।

নকল টারজন আশ্চর্য হয়ে বলল, এগুলো নিয়ে কি করবে?

ক্রাম্প বলল, তুমি একটা বোকা। কি করব? এগুলো ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে বিরাট ধনী হব। এই বলে সে তার গায়ের কোটটা খুলে তার মধ্যে সোনার তালগুলো তুলে রাখতে লাগল।

নকল টারজন বলল, এগুলো বয়ে নিয়ে যাবে কি করে?

ক্রাম্প বলল, কি বলছ তুমি। এগুলো সব খাঁটি সোনা।

নকল টারজন বলল, এ সবে আমার কোন আগ্রহ নেই, এই বলে খনির মুখ থেকে সে চলে গেল।

ক্রাম্প তার কোট ও প্যান্টের মধ্যে সোনাগুলো ভরে একটা পুঁটলি করে বলল, আমার মনে হয় এর বেশী আর বইতে পারব না আমি।

সোনার পুঁটলিটা কাঁধের উপর তোলার চেষ্টা করল ক্রাম্প। কিন্তু মাটি থেকেই সেটা তুলতে পারল না।

অনেক চেষ্টায়ও ক্রাম্প তার পুঁটলিটা কাঁধে তুলতে না পারায় কতকগুলো সোনার তাল ফেলে দিয়ে সেটা কাঁধে তুলল।

দুজনেই খনির মুখটার বাইরে এসে বোঝার ভাবে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল।

এদিকে আহারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে নকল টারজন ভাবতে লাগল সান্দ্রা পিকারেলের হাতে মারা গেছে।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনতে পেল

নকল টারজন। মানবতার খাতিরে সেই আর্তনাদের শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল। ঘটনাস্থলে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ভূত দেখে যেন চমকে উঠল। দেখল সান্দ্রা পিকাবেল মরার মত পড়ে রয়েছে আর তার উপর একটা নিগ্রো আদিবাসী মরে পড়ে আছে। তার পিঠে একটা তীর গাঁথা ছিল।

ছুটে গিয়ে সান্দ্রার উপব থেকে মৃতদেহটা সরিয়ে দিল নকল টাবজন। তাবপব সান্দ্রাব দেহটা নিজেব কোলেব উপর তুলে নিল।

ক্রমে জ্ঞান ফিরে এলে চোখ মেলে চাইল সান্দ্রা। নকল টাবজনকে দেখেই সে আশ্চর্য হয়ে গেল।

ক্রাম্প আর মিনস্কি সেই খনির মুখটার বাইরে জ্বলন্ত রোদে শুয়ে রইল। অবশেষে মিনস্কি তার কনুইএর উপর ভর দিয়ে মুখটা তুলে চারদিকে তাকিয়ে দেখল অদূরে একটা গাছ রয়েছে। সে তাই অতি কষ্টে তার বোঝাটা নিয়ে সেই গাছটার ছায়ায় চলে গেল।

তার দেখাদেখি ক্রাম্পও সেখানে চলে গেল। জ্বলন্ত সূর্যের কড়া রোদে ওদের দেহের অবশিষ্ট শক্তিটুকু শোষণ করে নিল। পিপাসায় বুকটা ওদের ফেটে যাচ্ছিল। আরও এক ঘণ্টা থাকার পর উঠে বসল মিনস্কি। বলল, আমি জলের স্রোতের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আমাদেব ডান দিকে একটা গিরিখাতে জল আছে।

নকল টাবজন বলল, ক্রাম্প আর মিনস্কিও বেঁচে আছে। তারা সোনার খনি থেকে এত সোনা তুলেছে যা তারা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

নকল টাবজন বলল, এখন আমাদের সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা আছে। এক হলো, আলেমতেজোতে ফিরে গিয়ে আবার দেবদেবী সেজে থাকা আর একটা পথ হলো ঐ পাহাড়টা পার হয়ে তোমার বাবার কাছে ফিরে যাওয়া। আমি মনে করছি তাই যাব। এখন আমাদের কিছু খাওয়া দরকার।

মিনস্কি বলল, এইখানে সোনার পুঁটলিগুলো রেখে যাব। জল খেয়ে আবার ফিরে আসব।

এই কথা বলে সে উঠতে গিয়ে আবাব পড়ে গেল। ক্রাম্পও উঠতে গিয়ে উঠতে পারল না।

ক্রাম্প তখন চীৎকার করে বলল, মিনস্কি, আমায় জল এনে দাও।

আবার ওঠার চেষ্টা করল মিনস্কি। ক্রাম্প তাকে ধরে সাহায্য করতে লাগল। কিন্তু কোন-রকমে উঠে দাঁড়াতেই সে পাশ চেপে আবার পড়ে গিয়ে তার দেহটা একবার জোর কেঁপে স্থির হয়ে গেল। এবাব ক্রাম্প গর্জন করতে করতে বলল, তোকে এবার উচিত শিক্ষা দেব।

এই কথা বলে সেই সোনার ভারী তালটা দিয়ে পাগলের মত মিনস্কির মাথাটা ভাঙ্গতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথার খুলিটা ভেঙ্গে থেঁতো হয়ে গেল।

ক্রাম্প হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, এবার তোর আর আমার সব সোনা আমি একা ভোগ করব।

আলেমতেজোর সীমানা থেকে বেরিয়ে যাবার সহজ পথটা খুঁজে পেতে দেরী হলো না টারজনের। কিন্তু পথটা পেলেও সে পথ ধরে বেশীদূর গেল না। সে বুঝল এখনো তাকে এই পাহাড় এলাকাতেই থাকতে হবে। কারণ এই পাহাড়ের কোথাও সেই টারজন নামধারী লোকটা সান্দ্রা পিকারেল নামে মেয়েটিকে নিয়ে আছে।

টারজন একটা হরিণ মেরে এনে তার খানিকটা মাংস বোল্টনকে দিল।

হঠাৎ বাতাসে দুটো মরা মানুষের গন্ধ পেল টারজন। বোল্টন কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেল না। টারজন বলল, অদূরে দুজন শ্বেতাঙ্গ মরে পড়ে আছে।

এ কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল বোল্টন। সে টারজনের সঙ্গে পাহাড়ের উপর দিকে কিছুটা উঠে দেখল সত্যিই দুজন শ্বেতাঙ্গের মৃতদেহ পড়ে আছে। সে বলল, কি করে তুমি জানতে পারলে ?

লোকদুটো অদূরে জল থাকা সত্ত্বেও পিপাসায় মারা গেছে। এই পুঁটলি দুটোয় খাঁটি সোনার অনেক তাল আছে।

বোল্টন বলল, এদের তুমি চিনতে ?

টারজন বলল, হ্যাঁ। এদের একজন আমাকে দুবার হত্যা করতে গিয়েছিল।

সে ক্রাম্পের মৃতদেহটাকে পা দিয়ে দেখিয়ে দিল। বলল, তুমি কি এই সোনাগুলো বয়ে নিয়ে যেতে চাও ?

বোল্টন বলল, না, ওদের মত আমিও কি মরব ? আমার ওতে দরকার নেই। আমি শুধু এ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বোল্টন দেখল, টারজন নেই। সে ভয় পেয়ে গেল। টারজন কোথায় গেছে তা ভেবে পেল না কিছু।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা শুয়োর শিকার করে নিয়ে এল টারজন। সে বলল, খাওয়ার পরই আমরা যে পথে এসেছি সেই পথে কিছুটা গিয়ে লোকটার খোঁজ করব।

সান্দ্রা আর নকল টারজন তখন হাত ধরাধরি করে পাহাড় থেকে উপত্যকার দিকে সেই পথেই নেমে আসছিল।

হঠাৎ টারজন তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সান্দ্রা বলে উঠল, টারজন তুমি ? আমি ত ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ মাথায় গুলি লেগে।

কথাটার কোন উত্তর দিল না টারজন। তার চোখ দুটো তখন সান্দ্রার সঙ্গী লোকটার উপর নিবদ্ধ ছিল। সে তাকে জীবনে দেখেনি কখনো এর আগে। এই লোকটাকেই সে খুঁজে বেড়াচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে।

সে তার সামনে গিয়ে বলল, তুমি তোমার তীর ধনুক ফেলে দাও।

লোকটা বলল, কেন?

টারজন বলল, কারণ আমি তোমাকে খুন করব।

লোকটা তার তীর ধনুক ফেলে দিয়ে বলল, আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও?

কিন্তু সে ভয় পেল না। ভয়ের কোন চিহ্ন বা লক্ষণ পাওয়া গেল না তার মুখে।

টারজন বলল, আমি তোমায় খুন করব, কারণ তুমি আমার নাম ধারণ করে আমার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন গাঁ থেকে অনেক নারী ও শিশু চুরি করে হয় তাদের হত্যা করেছ অথবা শত্রুদের হাতে ক্রীতদাস হিসাবে তুলে দিয়েছ। আমার বন্ধুরা ভাবছে আমিই এ কাজ করেছি।

সান্দ্রা তাদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে বলল, আমার কথা শোন টারজন, তুমি একে খুন করো না।

টারজন বলল, কেন করব না? সে ত তোমাকেও চুরি করেছিল।

সান্দ্রা বলল, দয়া করে আমার কথাটা শোন। লোকটা আসলে খারাপ নয়। কোন কারণে সে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে। ও জানত ও-ই টারজন। আমিই ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি ও টারজন নয়। আলেমতেজোর রাজা দা গামাই ওকে দিয়ে এই সব কাজ করিয়েছে।

টারজান বলল, আর কিছু তোমার বলার আছে?

সান্দ্রা বলল, আমি ওকে ভালবাসি।

টারজন এবার লোকটার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমার কিছু বলার আছে?

লোকটা বলল, মিস পিকারেল যা বলেছে তা সব সত্যি। আমি জানি না আমি কে, কি আমার পরিচয়? আমি জানতাম না আমি যা যা করেছি তা অন্যায়। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আমি পিকারেলকে তার বাবার কাছে দিয়ে আসতে চাই। আমি যাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী তাদের জীবন অবশ্য ফিরিয়ে দিতে পারব না। কিন্তু এখন আমি সত্যিই অনুতপ্ত।

টারজন লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল। লোকচরিত্র সে বুঝত। সে বুঝল লোকটা আসলে খাঁটি এবং সে যা বলছে তা সত্যি এবং বিশ্বাসযোগ্য।

টারজন বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাদের ফিরে যেতে সাহায্য করব। তোমাদের দলের অন্য সব লোকরা কোথায়?

সান্দ্রা বলল, পেলহ্যাম ডাটন মারা গেছে বাঁদরগোরিলাদের হাতে। অন্য দুজনকে আমি দেখিনি।

টারজন বলল, ক্রাম্প আর মিনস্কি তৃষ্ণায় মারা গেছে। গতকাল তাদের মৃতদেহ আমি দেখেছি।

সেদিন সকালে উঠে টারজনকে দেখতে না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল বোল্টন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন সে ফিরে এল না তখন সে নিজেই বেরিয়ে পড়ল টারজনের খোঁজে।

টারজন কোন্‌দিকে যেতে পারে তা অনুমান করে সেইদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

সান্ড্রা বোল্টনকে প্রথম দেখতে পায়। টারজনও তখন তাকে দেখতে পেয়ে বলে, ও আমার বন্ধু।

বোল্টন টারজনের মত অনেকটা দেখতে আর একটা লোককে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। সে তাদের কাছে আরো এগিয়ে এসে টারজনের মত লোকটাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, র‍্যাণ্ড তুমি! আমি ত ভেবেছিলাম দু'বছর আগেই তুমি মারা গেছ।

র‍্যাণ্ড হতবুদ্ধি হয়ে বলল, তুমি হয়ত ভুল করছ। আমি তোমাকে কখনো দেখিনি।

বোল্টন হতাশ হয়ে বলল, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি ফ্রান্সিস বোল্টন শিল্টন।

সান্ড্রা আগ্রহের সঙ্গে বোল্টনকে বলল, আপনি একে চেনেন?

বোল্টন বলল, আমি অবশ্যই ওকে চিনি। ও আমাকে চিনতে পারছে না কেন বুঝতে পারছি না।

সান্ড্রা বলল, কিছু একটা হয়েছে। ও মাত্র দু'বছরের ঘটনা ছাড়া তার আগের কোন কিছু মনে করতে পারছে না।

বোল্টন বলল, আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় ওর বাড়ি। ওর নাম কলিন র‍্যাণ্ডল্ফ।

সান্ড্রা র‍্যাণ্ডকে বলল, দেখলে আমি তোমায় বলেছিলাম তুমি একজন আমেরিকান।

র‍্যাণ্ড বলল, তবু ভাল একজন আমাকে চেনে। হয়ত আমার স্মৃতিশক্তি অচিরেই ফিরে আসবে।

সান্ড্রা বোল্টনকে বলল, আপনি তাহলে ওর বিষয়ে সব জানেন? ও কি বিবাহিত?

বোল্টন বলল, না, বিবাহিত নয়। আমি ওর সবকিছু জানি। স্পেনে আমরা একসঙ্গে বছর-খানেক ছিলাম আফ্রিকায় আসার আগে।

টারজন সবকিছু শুনে ভাবল সে লোকটাকে খুন না করে ভালই করেছে। এখন যেমন করে হোক এখান থেকে তাদের নিরাপদে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সে তাই বলল, এখন চল। এখান থেকে বেরিয়ে যাবার সহজ পথ একটা খুঁজছি।

টারজন পা চালিয়ে পথ চলতে লাগল। কেউ কোন কথা বলার সুযোগ পেল না। সন্ধ্যার আগে ওরা একটা জায়গায় রাতটা কাটাবার জন্য বিশ্রাম করতে লাগল। খুব ঠাণ্ডা থাকায় ওরা আগুন জ্বালাল।

সান্ড্রা বোল্টন আর র‍্যাণ্ডের কাছে বসল। সে র‍্যাণ্ডকে বলল, অবশেষে তোমার একটা নাম পেলাম। এতদিন তোমায় নাম ধরে ডাকতে পাইনি।

বোল্টন বলল, ও খুব কথায় কথায় বাজী ধরত। এই বাজী ধরাই হলো ওর আফ্রিকা আসার কারণ।

সান্ড্রা বলল, কিন্তু আফ্রিকায় এসে আমাকে অপহরণ কবার জন্য নিশ্চয় বাজী বাখেনি। ও ত আমার নামই জানত না।

বোল্টন বলল, তাহলে তার আগেব কথা সব খুলে বলতে হবে। ব্যাণ্ড টারজনের খুব ভক্ত ছিল। টারজনের বই পড়ে ও টাবজনের মত হবার চেষ্টা করে। ওব দেহটা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ও ধনুর্বিদ্যা শিখতে শিখতে পারদর্শী হয়ে ওঠে তাতে। ও আফ্রিকায় এসে টারজনের মত একা একা বন্যজীবন যাপন কবার কথা বলে। স্পেন থেকে আমরা ইংলণ্ডে এলাম। সেখানে একদিন একটা ক্লাবে বসে থাকতে থাকতে একটা কাগজে পড়লাম দক্ষিণ আফ্রিকায় একটা আদিবাসী ছেলে একদল বেবুন বা বনমানুষ জাতীয় জন্তুর হাতে ধবা পড়ে। তারপর ছেলেটা মানুষ হয়েও ঐ বেবুন-দের দলে থাকত। ছেলেটা আদিবাসী জংলী বলেই পেরেছিল। র‍্যাণ্ড তখন এক হাজার পাউণ্ড বাজী রাখল।

আমিও তাতে রাজী হয়ে গেলাম। একঘণ্টা ধরে আলোচনার পর ঠিক হলো র‍্যাণ্ড আর আমি দুজনে তার ছোট বিমানটায় করে মধ্য আফ্রিকায় গিয়ে ভাল শিকার পাওয়া যায় এমন একটা জায়গায় নামব। তাবপব আমি বিমানে করে অন্য জায়গায় চলে যাব। একমাস পবে আমি তাকে তুলে নিয়ে যাব সেখান থেকে। আরো ঠিক হলো, ধোঁয়ার কুণ্ডলির মাধ্যমে সে আমাকে তার অবস্থার কথা জানাবে। যদি উপর থেকে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখতে পাই তাহলে বুঝতে হবে সে ভালই আছে আব যদি দুটো কুণ্ডলি দেখা যায় তাহলে বুঝব সে বিপদে পড়েছে এবং সাহায্য চায়। সে যদি টারজনের মত বেশভূষা কবে একমাস সেখানে টিকে থাকতে পাবে তাহলে সে বাজীতে জিতে যাবে এবং আমি তাকে এক হাজাব পাউণ্ড দেব আর না পাবলে সে আমাকে এক হাজার পাউণ্ড দেবে।

আমবা মধ্য আফ্রিকায় গিয়ে নামবাব মত একটা ভাল জায়গাব খোঁজ করতে লাগলাম। কিন্তু ক্রমেই কুয়াশায় ঢাকা এক পার্বত্য এলাকায় গিয়ে পড়লাম। বিমানটা কোথায় নামাব তা ঠিক কবতে পাবলাম না। তার আগেই র‍্যাণ্ড টারজনের মত বেশভূষা পবে ও অস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়েছিল। একসময় র‍্যাণ্ড আমাকে ঝাঁপ দিতে বলল। বলল, পাহাড়ের উপর দিয়ে আমবা যাচ্ছি। তখনই ঝাঁপ দিলাম আমি। তারপর দু'বছর ধবে আর র‍্যাণ্ডের দেখা পাইনি।

সেখানে আমি র‍্যাণ্ডের জন্য অপেক্ষা করলাম অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু সে না আসায় আমি একটা গাঁয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। পরে বুঝলাম সেটা নিগ্রো মুসলমানদের গাঁ। সুলতান আলি আমাকে বন্দী করে রাখল। ক্রীতদাস হিসাবে আমি সোনাব খনিতে কাজ করতাম। তারপর আলেম-তেজোব যোদ্ধারা আমায় বন্দী করে। সেখান থেকে যুদ্ধের সময় পালিয়ে এলে টাবজনেব সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

সান্ড্রা র‍্যাণ্ডের কাছে গিয়ে বলল, তারপর তোমার কি হলো র‍্যাণ্ড? তোমার কি সে কথা কিছুই মনে নেই?

র‍্যাণ্ড বলল, আমি ঝাঁপ দিয়ে আলেমতেজোর রাজপ্রাসাদের কাছে গিয়ে পড়ি। ওখানকার লোকরা বলতে থাকে আমি আকাশ থেকে পড়ি; আমি মানুষ নই, দেবতা। এরপর আর কিছু মনে নেই আমার। বিমান চালানোর কথাও মনে নেই আমার।

সান্দ্রা বলল, কিন্তু বিমানটা পড়ল কোথায়? এও এক রহস্য।

সে রাতটা সেখানে কাটিয়ে পরদিন সকাল হতেই উপত্যকার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ওরা।

ওরা কিন্তু সহজ পথটা খুঁজে পেল না। তার থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়ল। মালভূমি থেকে অনেকটা নীচে এক মাইল বিস্তৃত গাছপালাহীন একটা জায়গায় ওরা যেতেই টারজন ওদের দেখাল, ঐ দেখ বিমানটা।

বোল্টন লাফিয়ে উঠল আবেগের সঙ্গে। বলল, এটাই ত র‍্যাণ্ডের বিমান।

সান্দ্রা বলল, তা কি করে হবে? এটা ত ভেঙেচুরে যায় নি।

বোল্টন বলল, আমি বইতে পড়েছি বিমান-বাহিনীর অনেক বিমান আপনা থেকে নেমে পড়ে।

কি মনে হতেই র‍্যাণ্ড বিমানটার মধ্যে ঢুকে কেবিনে গিয়ে পাইলটের সীটে বসে পড়ল। সে যন্ত্রপাতি সব পরীক্ষা করে দেখল। কেবিনের ভিতরে নানারকম যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ পূর্ব জীবনের কথা সব মনে পড়ে গেল র‍্যাণ্ডের। সে চীৎকার করে বলতে লাগল, ও সান্দ্রা! আমার সব কথা মনে পড়েছে।

বোল্টন বলল, আমি জানতাম মনে পড়বে। এই কেবিনটাতে তুমি জীবনের অনেকগুলি দিন কাটিয়েছ। তুমি সত্যিই বিমানটাকে ভালবাসতে।

র‍্যাণ্ড বলল, একে একে এবার সব মনে পড়ছে আমার। বোল্টন ঝাঁপ দেবার পর মিনিট পাঁচেক আমি বিমানেই ছিলাম। তারপর আমি ঝাঁপ দিয়ে আলেমতেজোর প্রাসাদের উঠোনে গিয়ে পড়ি। আমার মাথায় আঘাত লাগে। আর তার জন্যই আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়।
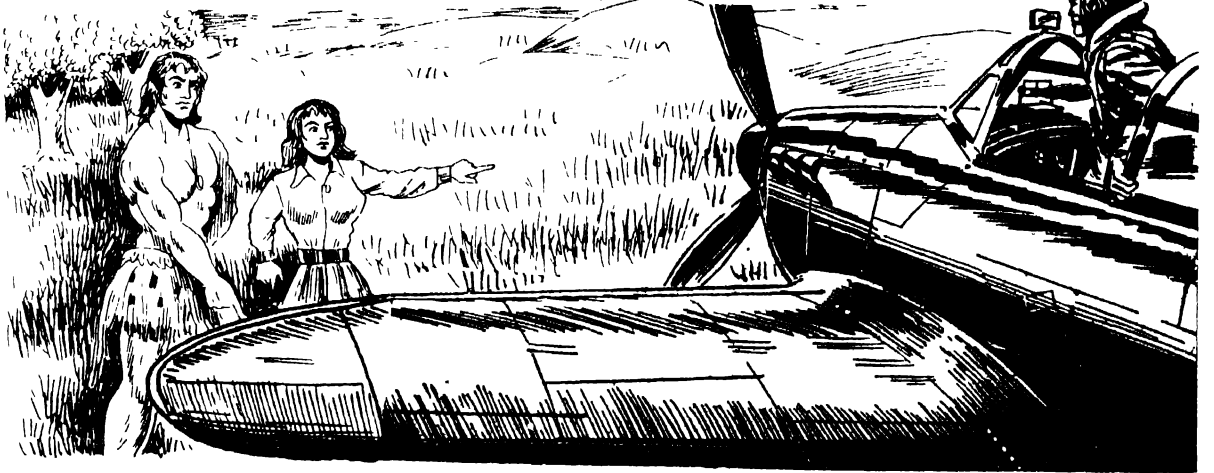
বোল্টন বলল, বিমানটা যদি কোন রকমে আবার চালাতে পারতাম।

একঘণ্টা ধরে চেষ্টা করার পর বিমানটার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে পারল বোল্টন। দরজাটায় জং ধরেছিল। পরে দেখল বিমানটার যন্ত্রপাতি সব ঠিকই আছে। শুধু চাকার টায়ারগুলো বসে গেছে।

সান্দ্রা র‍্যাণ্ডকে বলল, তোমার কি মনে হয় বিমানটা আবার উড়তে পারবে?

র‍্যাণ্ড বলল, ও না চাইলেও আমি ওকে ওড়াব।

দু'ঘণ্টা কেটে গেল। র‍্যাণ্ড প্রথমে কার্বুরেটারের মধ্যে যে জট পাকিয়ে গিয়েছিল তা ঠিক করল। তারপর তেল কতটা আছে দেখে নিল।

তারপর এঞ্জিনটায় স্টার্ট দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রপেলারের ঘর্ঘর আওয়াজ শোনা গেল। টায়ারে পাম্প দেওয়া হল।

র‍্যাণ্ড বলল, তোমরা কেউ সোনার পুঁটলিগুলো নিতে চাও ত নিতে পার।

বোল্টন বলল, আমার কোন দরকার নেই। র‍্যাণ্ড বা টিমথি পিকারেলের মেয়ে সান্দ্রারও কোন সোনার দরকার হবে না। টারজন মনে করলে নিতে পারে।

টারজন হেসে বলল, আমি সোনা নিয়ে কি করব?

টায়ারগুলো ঠিক হয়ে যেতেই বিমান ছেড়ে দিল র‍্যাণ্ড। বিমানটা মাটি ছেড়ে উপরে উঠলে সান্দ্রা বলল, ঈশ্বরকে সবকিছুর জন্যই ধন্যবাদ।

চিতা-মানুষের দেশে টারজন

টারজন এণ্ড দি লিওপার্ড মেন

মেয়েটি অস্বস্তির সঙ্গে বিছানায় পাশ ফিরল। বাতাসের বেগে পেট-মোটা মাছিগুলো সশব্দে তাঁবুর চাদোয়ার উপর আছড়ে পড়ছে। খোঁটায় টান লেগে তাঁবুর দড়িগুলো কড়্‌কড়্‌ শব্দ করছে। খোলা পর্দাগুলো বাতাসে উড়ছে। তবু ঘুমন্ত মানুষটি পুরো জাগল না। সারা দিন অনেক ধকল গেছে। ভাপসা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একঘেঁয়ে দীর্ঘ পদযাত্রায় সে ক্লান্ত। শুধু একদিন তো নয়, অনেক দূর অতীতে যেদিন সে রেলের পথ ছেড়ে এসেছে তারপর থেকেই চলেছে এই একটানা পথ চলা।

না জানি কি অনিবার্য প্রয়োজন তাকে এই পথে নিয়ে এসেছে! বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের পথ ছেড়ে কোন্ প্রয়োজনে সে এসেছে এই আদিম অরণ্যে; বিপদ, রোদ-বৃষ্টি ও ক্লান্তির এই অনভ্যস্ত জীবনে? কেন সে এসেছে?

এই প্রচণ্ড ঝড়ের রাতে একটিমাত্র আস্কারি প্রহরী ঘুম-ঘুম চোখে জেগে আছে। দুটি প্রাণী ছাড়া তাঁবুর অন্য সকলেই ঘুমিয়ে আছে। বিশাল বপু আদিবাসীটি চুপি চুপি এগিয়ে চলেছে ঘুমন্ত মেয়েটির তাঁবুর দিকে।

মেয়েটির ঘুম ভেঙে গেল। বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেল, একটা লোক তাঁবুতে ঢুকল। সর্দার গোলাটোর বিশাল দেহকে চিনতে তার ভুল হল না। কনুইতে ভর দিয়ে পাশ ফিরে প্রশ্ন করল, কিছু কি গোলমাল হয়েছে গোলাটো? কি চাও তুমি?

লোকটি চাপা গলায় জবাব দিল, তোমাকে চাই কালি বাওয়ানা।

তাহলে শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। দুদিন যাবৎ এই ভয়ই সে করছিল। দলের অন্য সকলের মুখেই সে দেখেছে চাপা ঘৃণার প্রকাশ। সেই একই ঘৃণা ফুটে উঠেছে এই লোকটির চোখে।

খাটিয়ার পাশে রাখা খাপ থেকে রিভলবারটা বের করে মেয়েটি বলল, বেরিয়ে যাও; নইলে তোমাকে মেরে ফেলব।

লোকটি একলাফে তার দিকে এগিয়ে এল। মেয়েটি গুলি ছুঁড়ল।

একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে আশ্রয় নিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ। তার এক বগলে শীতে কুঁকড়ে গায়ের সঙ্গে কি একটা যেন লেপ্টে রয়েছে। লোকটি মাঝে মাঝে তার সঙ্গে কথা বলছে; অন্য হাত দিয়ে আদর করছে। দেখে মনে হয় তার ছেলে বুঝি। কিন্তু তা নয়, একটা ছোট বানর। বাতাসের প্রতিটি ঝাপ্টা, বিদ্যুতের প্রতিটি ঝলকানি, আর বজ্রের প্রতিটি হুংকারের সঙ্গে সঙ্গে সে কেঁপে কেঁপে আরও কুঁকড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ঝড়ের দাপট চরমে উঠল। যে গাছের নীচে তারা আশ্রয় নিয়েছিল সেটা ভেঙে পড়ল। বিড়ালের মত লোকটা এক পাশে লাফিয়ে পড়ল। বানরটা ছিটকে পড়ল বেশ খানিকটা দূরে। কিন্তু একটা মোটা ডাল এসে লাগল লোকটার মাথায়; সে মাটিতে পড়ে গেল; ডালটা তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলল।

ঝড় থেমে গেল। বানরটা মনিবকে ডেকে ডেকে অনেক খুঁজল। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না। তারই মধ্যে এক সময় গাছের নীচে খুঁজে পেল মনিবকে, নিশ্চল ও নিষ্প্রাণ।

কিববু গ্রামের ছোট দলটির প্রাণ-পুরুষ ছিল নিয়ামওয়েগি। নিজের গ্রাম টুম্বাই থেকে সে সেখানে গিয়েছিল একটি কৃষ্ণা সুন্দরীর পানিগ্রহণ করতে। মনের ফূর্তিতে চলতে চলতে খেয়ালই ছিল না; হঠাৎ এক সময় নেমে এল নিরক্ষবৃত্তাঞ্চলের রাত।

সৈনিকটি নিঃশব্দ পদক্ষেপে টুম্বাইয়ের পরিচিত পথ ধরে চলতে লাগল। সঙ্গে বর্শা ও ঢাল; কোমরে ঝুলছে লম্বা ছুরি। তার গলার তাবিজটা অনেক শক্তি ধরে। মাঝে মাঝেই সেটাতে আঙুল ঝুলিয়ে সে তার কুল-দেবতা মুজিমোর স্তব করছে।

অর্ধেক পথ পার হবার পরেই হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন তাকে আক্রমণ করল। তার ধারালো নখর বসে গেল তার কাঁধের মাংসের মধ্যে। যন্ত্রণায় ও আতংকে আর্তনাদ করে দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণকারীদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল। কাঁধের উপর থেকে থাবাটা সরিয়ে ছুরিটা বের করতেই আবার বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল; আর সেই আলোয় তার চোখে পড়ল চিতাবাঘের মুখোশে ঢাকা একটা মানুষের বীভৎস মুখ।

নিয়ামওয়েগি অন্ধকারেই আবোল-তাবোল ছুরি চালাতে লাগল; সেই লোকটি পুনরায় পিছন থেকে নখর বসিয়ে দিল তার বুকে ও পেটে; পিছন থেকে সে তাকে জড়িয়ে ধরেছে লোমশ হাত দিয়ে। আবার ঝল্‌সে উঠল বিদ্যুৎ। যে তাকে জরিয়ে ধরেছে তাকে নিয়ামওয়েগি দেখতে পেল না, কিন্তু দেখতে পেল আরও তিনজনকে—একজন তার সামনে, আর দু'জন দুই পাশে। এবার সে আশা ছেড়ে দিল; আক্রমণকারীদের সে চিনতে পেরেছে; চিতাবাঘের চামড়া ও মুখোশপরা এই লোকগুলি চিতা-মানুষদের গুপ্ত সংঘের সদস্য।

এইভাবে উটেন্‌গান নিয়ামওয়েগির মৃত্যু হল।

উষার আলো পড়েছে গাছের মাথায়। নীচে টুম্বাই গ্রামের খড়ের ঘরে ঘুম ভাঙল গ্রাম-প্রধানের ছেলে ওরাণ্ডোর। খড়ের বিছানা ছেড়ে সে বাইরে এসে পথের উপর দাঁড়ালো। যে কুলদেবতার নামে তার নাম রাখা হয়েছে দুই হাত তুলে সেই মুজিমোর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল।

যে পথ ধরে ওরাণ্ডো একাকি শিকারে চলল দুই মাইল পর্যন্ত সেটা কিববু গ্রামে যাবারও পথ। পরিচিত পথ, কিন্তু আগের রাতের ঝড়ে পথের এত ক্ষতি হয়েছে যে অনেক জায়গায় সে পথে চলাই দুষ্কর। পথের উপর গাছপালা পড়ে থাকায় পথের পাশের ঝোপের ভিতর দিয়ে ঘুরে যাবার পথে এক বার তার চোখে পড়ল, একটা ভূপাতিত গাছের ডালপাতার নীচে থেকে মানুষের একটা পা বেরিয়ে আছে।

ওরাণ্ডো থামল। একটু পিছিয়ে এল। মানুষটা যেখানে পড়ে আছে সেখানকার ডালপালাগুলো নড়ে উঠল। সেখান থেকে মাথা বের করল একটা ছোট্ট বানর।

ওরাঙোকে দেখে ভয় পেয়ে বানরটা কিচির-মিচির করতে করতে ছুটে গিয়ে একটা বড় গাছের ডালে উঠে পড়ল। ওরাঙো তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পায়ের দিকেই নজর দিল। সাবধানে অগ্রসর হয়ে ঝুঁকে পড়ে বাকি দেহটা দেখতে চেষ্টা করল।

দৈত্য বিশেষ একটি সাদা মানুষ; চিতাবাঘের চামড়ার কটি-বন্ধনী ছাড়া প্রায় নগ্নদেহ; গাছের একটা ভারী ডালের নীচে চাপা পড়ে আছে। দুটি ধূসর চোখের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ; লোকটি মারা যায় নি।

ওরাঙো কিববু গ্রামের পথ ধরেই এগিয়ে চলল। পিছনে নিঃশব্দ পায়ে চলল নবাগত লোকটি। চলতে চলতে আর একটা বানরের গলা শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে ওরাঙো দেখল, বানরটা বসে আছে লোকটার কাঁধে, আর দুজনে অনবরত কথা বলে চলেছে বানরদের ভাষায়

একটা ছোট ডালের নীচে সে চাপা পড়ে আছে। ওরাঙো ডালটাকে একটু তুলে ধরতেই লোকটি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ছোট বানরটা গাছের ডালে নিরাপদ দূরত্বে বসে মুখ ভেংচে কিচিরমিচির করতে লাগল।

কাজটা ভাল হল কি মন্দ হল বুঝতে না পেরে ওরাঙো বর্শাটা হাতে নিয়ে নবাগতকে ভাল করে দেখতে লাগল। নবাগতও গাছটার নীচ থেকে ধনুক ও বর্শা তুলে নিল। তার কাঁধে তীরভর্তি তূণীর। অন্য কাঁধে একটা লম্বা, পাকানো দড়ি। কোমরে খাপে ঢাকা ছুরি।

অবাক কাণ্ড! এ কেমন ধারা লোক যে ভয় কাকে বলে জানে না, যে বানরদের ভাষায় কথা বলতে পারে। প্রশ্নটা মনে আসতেই আর একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন জাগল তার মনেঃ এই জীবটি মানুষ তো?

পথের একটা বাঁক ঘুরতেই একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ওরাঙোর চিন্তায় বাধা পড়ল। তার চোখের সামনে পড়ে আছে একটি সৈনিকের বিকৃত মৃতদেহ। বন্ধু ও সহকর্মী নিয়ামওয়েগিকে চিনতে বিলম্ব হল না। কিন্তু কেমন করে তার মৃত্যু হল।

নবাগত লোকটি এসে তার পাশে দাঁড়াল। নীচু হয়ে মৃতদেহটাকে ভাল করে পরীক্ষা করতে সেটাকে উল্টে দিতেই চোখে পড়ল মুখময় ইস্পাত-নখরের নির্মম আঘাতের চিহ্নগুলি।

নিরুত্তাপ গলায় সে শুধু বলল, চিতা-মানুষের কাজ।

কিন্তু ওরাণ্ডো তখন থর্থর্ করে কাঁপছে। বন্ধুর মৃতদেহটা দেখামাত্রই চিতা-মানুষদের কথা তার মনে হয়েছিল। এই নৃশংস গুপ্ত সমিতির ভীতি বাসা বেঁধে আছে তার মনের গভীরে। তাদের রহস্যময় নরহস্তারক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আরও বেশী ভয়ংকর এই কারণে যে তাদের সংঘবহির্ভূত কোন মানুষ সে সব কখনও চোখে দেখে নি, বা দেখলে আর বেঁচে থাকে নি।

মৃতদেহটাকে সেই একইভাবে বিকৃত করা হয়েছে; নরমেধ যজ্ঞের জন্য দেহের কতকগুলি বিশেষ অঙ্গকে কেটে নিয়েছে। ওরাণ্ডো শিউরে উঠল; কিন্তু সে শিহরণ যত না ভয়ের, তার চাইতে বেশী ক্রোধের। নিয়ামওয়েগি তার বন্ধু। শৈশব থেকে দুজন এক সঙ্গে বড় হয়েছে। এই পৈশাচিক আক্রমণ যারা হেনেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা সাধনের জন্য তার আত্মা চীৎকার করে উঠল। কিন্তু অনেকের বিরুদ্ধে সে একা কি করবে? নরম মাটিতে অনেক পায়ের ছাপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে অনেকে মিলে তাকে হত্যা করেছে।

নবাগত লোকটি বর্শায় ভর রেখে নিঃশব্দে সৈনিকটিকে দেখছিল—দেখছিল তার মুখের শোক ও ক্রোধের প্রকাশ। বলল, তুমি একে চিনতে?

আমার বন্ধু।

নবাগত কোন কথা বলল না; দক্ষিণের পথে পা বাড়াল।

ওরাণ্ডো তাকে অনুসরণ করে বলল, কোথায় যাচ্ছ?

যারা তোমার বন্ধুকে মেরেছে তাদের শাস্তি দিতে।

ওরাণ্ডো প্রতিবাদ করে বলল, তারা সংখ্যায় অনেক; আমাদেরই মেরে ফেলবে।

নবাগত জবাব দিল, তারা চারজন। আমিই মারতে পারব।

তারা যে চারজন তা জানলে কেমন করে?

পায়ের কাছের পথটা দেখিয়ে নবাগত বলল, একজন বৃদ্ধ খুঁড়িয়ে হাঁটে; একজন ঢ্যাঙা ও সরু; অপর দুজন যুবক সৈনিক। তারা হাঁটে হাল্কা পায়ে, যদিও একজনের শরীর বেশ ভারী।

তুমি তাদের দেখেছ?

তাদের পায়ের ছাপ দেখেছি; সেটাই যথেষ্ট।

কথাগুলি ওরাণ্ডোর মনে ধরল। লোকটা পথের হদিস বোঝে বটে। আর দ্বিধা নয়। যা থাকে কপালে, ওর সঙ্গেই সে যাবে।

বলল, অন্তত ওরা কোন্ গ্রামে ফিরে গেল সেটা তো জেনে আসতে পারব। আমার বাবা লুম্বাই গ্রামের সর্দার। সারা ওয়াটেঙ্গা দেশে সে হরকরা পাঠাবে; যুদ্ধের ঢাক বেজে উঠবে; উটেঙ্গা যোদ্ধারা দলে দলে আসবে। তখন আমরা চিতা-মানুষদের গ্রাম আক্রমণ করে নিয়ামওয়েগির রক্তের প্রতিশোধ নেব।

দুজনে পথ চলতে লাগল। এক সময় ওরাণ্ডোর

মনে হল, তার সঙ্গীটি কোন সাধারণ মানুষ নয়; অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। বিদ্যুৎ-চমকের মত সহসা একটা নতুন চিন্তা তার মনে দেখা দিল: যে পরলোকগত পূর্বপুরুষের নামে তার নামকরণ হয়েছে তার আত্মাই বুঝি এসে দেখা দিয়েছে এই নবাগতের রূপ ধরে—এই লোকটিই তার মুজিমো। তাছাড়া মুজিমোর কাঁধের উপরকার ছোট বানরটিও একটি আত্মা। হয়তো বা নিয়ামওয়েগির যেমন সারা জীবনের বন্ধু ছিল, তেমনি এরা দুজনও খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সে ডাকল, মুজিমো!

নবাগত মুখ ফিরিয়ে চারদিকে তাকিয়ে বলল, তুমি মুজিমোকে ডাকলে কেন?

ওরাণ্ডো জবাব দিল, আমি তোমাকেই ডেকেছি মুজিমো।

মুজিমো বলে?

হ্যা।

তুমি কি চাও?

ওরাণ্ডো বুঝল, সে ভুল করে নি; এই তো তার মুজিমো।

তুমি আমাকে ডাকছিলে কেন?

কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে ওরাণ্ডো শুধাল, আমরা কি চিতা-মানুষদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি মুজিমো?

আমরা সেইদিকেই চলেছি। এক কাজ করা যাক। গাছের ডালে ডালে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া যাক। চলে এস।

বলেই একটা বড় গাছের ডাল ধরে সে ঝুলে পড়ল।

ওরাণ্ডো চেঁচিয়ে বলল, দাঁড়াও। আমি তো গাছে-গাছে চলতে পারব না।

তাহলে হেঁটেই এস। আমি এগিয়ে গিয়ে চিতা-মানুষদের ধরে ফেলব।

ওরাণ্ডোকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বানরটাকে কাঁধে নিয়ে নবাগত লোকটি মুহূর্তের মধ্যে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। সবিস্ময়ে তার কথা ভাবতে ভাবতেই ওরাণ্ডো পায়ে হেঁটে এগোতে লাগল।

সে যদি আরও বেশী সতর্ক থাকত তাহলেই বুঝতে পারত যে চার জোড়া হিংস্র লোলুপ চোখ গাছপালার আড়াল থেকে তার উপর নজর রেখে চলেছে। যেই সে খোলা জায়গাটার মাঝখানে পৌঁছে গেল অমনি ভয়ংকর চীৎকার করতে করতে বীভৎসভাবে সজ্জিত চারজন সৈনিক লাফিয়ে পড়ে তার দিকে ছুটে এল।

লোবোঙ্গোর ছেলে ওরাণ্ডো আগে কখনও চিতা-মানুষদের সংঘের ভয়ঙ্কর কোন সদস্যকে চোখে দেখে নি; তবু এই চারজনকে চিনতে তার কোন অসুবিধা হল না। তখন তারা চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছে।

মেয়েটি গুলি ছুঁড়তেই গোলাটো যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল ; ডান হাতের কনুইয়ের উপরটা বাঁ হাতে চেপে ধরে ছুটে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। কালি ওয়ানা উঠে পোশাক পরল, খাপে-ঢাকা পিস্তলসহ কার্তুজের বেল্টটা বেঁধে নিল।

লণ্ঠনটা জ্বেলে চেয়ারে বসল ; রাইফেলটাকে পাশে রাখল। বাকি রাতটা জেগেই পাহারা দেবে। কিন্তু সে রাতে আর কিছুই ঘটল না। একসময় সে তন্দ্রায় ঢলে পড়ল।

যখন ঘুম ভাঙল তখন ঘণ্টাখানেক মত বেলা হয়েছে। ঝড় থেমে গেছে, কিন্তু তাঁবুর চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তার চিহ্ন। তাঁবুর দরজার কাছে এগিয়ে মেয়েটি তার চাকরকে ডেকে স্নানের জল ও প্রাতরাশ দিতে বলল। দেখল, কুলিরা বাঁধা-ছাদা করছে। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটা গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে গোলাটো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কুলিরা মালপত্র বেঁধে যাত্রার আয়োজন করছে, অথচ সে তো যাত্রার হুকুম জারি করে নি।

এগিয়ে গিয়ে গোলাটোর বদলে আর একটি লোককে জিজ্ঞাসা করল, এ সবের অর্থ কি ?

লোকটি জবাব দিল, আমরা ফিরে যাচ্ছি।

আমাকে একা রেখে তোমরা ফিরে যেতে পার না।

লোকটি বলল, তুমিও আমাদের সঙ্গে আসতে পার। তবে তোমাব ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।

বেপরোয়া ভঙ্গীতে মেয়েটি বলল, এ কাজ তোমরা করতে পার না। আমি যেখানে যাব সেখানেই তোমব। আমার সঙ্গে যাবে—এই শর্তেই তোমরা রাজী হয়েছিলে। মালপত্র নামাও, আমি হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কব।

লোকটি তবু ইতস্তত কবছে দেখে মেয়েটি রিভলবার বের করল। এবার গোলাটো হস্তক্ষেপ করল। রাইফেলধারী অস্কারিদের দিকে এগিয়ে এসে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, থাম! তোমরা তাঁবুতে ফিরে যাও। আমরা নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছি। গোলাটোব সঙ্গে যদি ভাল ব্যবহার করতে তাহলে এসব ঘটত না ; কিন্তু তা তুমি কর নি, আর এটা তারই শাস্তি।

মেয়েটির চোখের সামনে সকলে সার বেঁধে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভগ্নহৃদয়ে সে তাঁবুতে ফিরে গেল।

ওদিকে সংঘের প্রতীক চিতাবাঘের চামড়ায় সজ্জিত চারমূর্তি ওরাণ্ডোকে ঘিরে ধরতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল বন্ধুর বিকৃত মৃতদেহের ছবি। মনের পটে আঁকা পড়ল নিজের শোচনীয় পরিণতির ছবি। কিন্তু সে ঘাবড়াল না। সে সৈনিক ; মরতে

হয় মরবে, তবু নিয়ামওয়েগির মৃত্যুর প্রতিশোধ সে নেবে। প্রাণপণ শক্তিতে বর্শাটাকে চেপে ধরে আঘাত হানল। একজন শত্রু আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল। বাকি তিনজন ধীর পায়ে এগোতে লাগল।

দ্রুত মুখ ফিরিয়ে এনে সে বাকি শত্রুদের মোকাবিলার জন্য রুখে দাঁড়াল। পিছন থেকে কানে এল একটা বর্বর হুংকার। তা শুনে তার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। ফিরে তাকাবার অবসর নেই। বীভৎস মূর্তিগুলো ইস্পাতের বাঁকা নখরগুলো থাবার মত মেলে ধরে এগিয়ে আসছে তাকে ধরতে।

পিছন থেকে একটা মূর্তি হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠে ওরাণ্ডোকে পাশ কাটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রথম চিতা-মানুষটার উপর। মূর্তিটি ওরাণ্ডোর মুজিমো। এও কি সম্ভব যে তার গলা থেকেই বেরিয়েছে সেই পাশবিক ভয়ংকর হুংকার! যাই হোক, বেগতিক বুঝে চতুর্থ শত্রুটি মুখ ঘুরিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুট দিল; শেষ সঙ্গীটিকে ছেড়ে দিয়ে গেল তার ভাগ্যের হাতে।

মুজিমো তখন দুটি যুবক চিতা-মানুষের বড়টির সঙ্গে লড়ছে। শক্ত মুঠোয় দুটো থাবাওয়ালা হাতকে একসঙ্গে চেপে ধরে আর এক হাতে মুজিমো চেপে ধরেছে তার গলা। একটু একটু করে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ক্রমে তার হাত-পা সহ গোটা শরীরটাই শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ল। মৃত-দেহটাকে সে মাটিতে ফেলে দিল।

তার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওরাণ্ডো ভয়ে ভয়ে বলল, মুজিমো, আজ তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ। এ প্রাণ তোমার।

মুজিমো বলল, এখন মনে পড়ছে, তুমিও আমার প্রাণ রক্ষা করেছ।

হ্যাঁ মুজিমো, আজ সকালেই।

আজই সকালে! হ্যাঁ, তাই। আমরা শিকারে যাচ্ছিলাম। আমি সত্যি ক্ষুধার্ত; শিকারে চল।

ওরাণ্ডো বলল, যে পালিয়ে গেল তার পিছু নেব না? ওদের গ্রামটা চিনে আসতে হবে না?

মুজিমো বলল, আগে মরা মানুষদের সঙ্গে কথা বলে দেখি, তারা কতটা কি বলতে পারে।

ভয়কম্পিত গলায় ওরাণ্ডো শুধাল, তুমি মরা মানুষের সঙ্গেও কথা বলতে পার?

মুজিমো বলল, শব্দ দিয়ে কথা না বললেও অনেক সময় তারা অনেক কিছু বলতে পারে। ওদের ধারালো দাঁত বলেছে ওরা নরমাংস খায়; ওদের কবচ আর থলের জিনিসপত্র বলেছে যে ওরা জেলে; কোন বড় নদীর ধারে বাস করে, আর কুমীর গিমলাকে ভীষণ ভয় করে। ওদের থলের বড়শি ও কবচই সে কথা আমাকে বলে দিয়েছে। ওদের অলংকার অস্ত্র এবং কপাল ও থুতনির কাটা দাগ থেকেই জানতে পেরেছি ওরা কি জাতি, আর কোন্ দেশে বাস করে। যে পালিয়ে গেছে তাকে অনুসরণ করার কোন দরকার নেই; তার বন্ধুরাই সব কথা বলে দিয়েছে। তাই আপাতত শিকারে চল। চিতা-মানুষদের গ্রামে পরে যাওয়া যাবে।

দুটি সাদা মানুষ একটা তালি-মারা জীর্ণ তাঁবুর সামনে বসেছিল। কোন চেয়ার না থাকায় তারা মাটিতেই বসে ছিল। তাদের জামাকাপড় আরও বেশী তালি-মারা, আরও বেশী জীর্ণ। পাঁচটি আদিবাসী কিছুদূরে চুল্লীর পাশে বসে আছে। অপর একটি আদিবাসী তাঁবুর কাছে ছোট উনুনে সাদা মানুষদের জন্য আহার্য তৈরী করছে '

আর পারা যায় না, বয়স্ক লোকটি বলল।

একুশ-বাইশ বছরের যুবকটি বলল, তাহলে ফিরে যাচ্ছনা কেন?

যুবকটি বলে উঠল, থাক! এমন ভাবে কথা বলছ যেন তুমি একটা একশ' বছরের বুড়ো। তোমার বয়স তো তিরিশও হয় নি। আমাদের দেখা হবার পরেই তোমার বয়সটা আমাকে বলেছিলে।

অপরজন বলল, আরে, তিরিশ হলেই তো বুড়ো। মানুষ হতে হলে তিরিশের অনেক আগেই শুরু করতে হয়। আরে, এমন অনেক লোককে আমি জানি যারা মাল-কড়ি কামিয়ে তিরিশ বছরেই অবসর নিয়ে বসেছে। আমার বাবার কথাই ধর না—হঠাৎ সে চুপ করে গেল। হাসতে হাসতে যুবকটি বলে উঠল, মনে হচ্ছে ফিরে গেলে আমরা যুগল নিষ্কর্মা বনে যাব।

বয়স্ক সঙ্গীটি কাঁধ ঝাঁকাল। কোথায় যাব? দেশে ফিরে গেলে একটা নোংরা বাউণ্ডুলে বনে যাব। শ্রদ্ধা করুক' আর নাই করুক, তবু তো এখানে ক'টা চাকর রাখতে পেরেছি; নিজেকে একজন কেউ-কেটা বলে ভাবতে পারি। আর সেখানে গেলে তো অন্যের হুকুম-বরদার হতে হবে। কিন্তু তুমি—তুমি কেন যে এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে ছারপোকা ও জ্বরের সঙ্গে লড়াই করে চলেছ তা তো বুঝি না। তুমি যুবক। তোমার সামনে রয়েছে একটা পুরো জীবন—একটা গোটা জগৎ।

বুড়ো টাইমার বলল, কিন্তু এভাবে কতদিন কাটবে? দেখেশুনে মনে হচ্ছে আফ্রিকার সব হাতি কোন অজ্ঞাত জগতে চলে গেছে।

কিড বলল, বুড়ো বোবোলো দিব্যি গেলে বলেছিল যে এখানেই হাতির দেখা পাব; এখন বুঝছি লোকটা মিথ্যাবাদী।

টাইমার বুড়ো বলল, সে সন্দেহ আমার মনেও জেগেছে। কিন্তু তাই বলে চুপচাপ বসে থাকলে তো চলবে না। এই সব অনুগত লোকগুলো যদি অবিলম্বে কিছু হাতির দাঁত চোখে না দেখে তাহলে

নির্ঘাৎ আমাদের মত তারাও ভাল করেই জানে যে এখানে হাতির দাঁত নেই তো মাইনেও নেই।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমরা করবটা কি? হাতি বানাব?

খুঁজে বের কর। দূরের পাহাড়ে হাতি আছে; কিন্তু তারা তো তোমার গুলি খাবার জন্য নাচতে নাচতে এই শিবিরে এসে হাজির হবে না। কাজেই দু'জন করে লোক আর দিন কয়েকের খাবার সঙ্গে নিয়ে আমাদেরই বের হতে হবে। তাতে যদি হাতির খোঁজ না মেলে তো আমার নামে একটা জেব্রা পুষো।

কিড বলল, আমি রাজী।

টাইমার বুড়ো বলল, বেশ, কালই যাত্রা করব।

অনেক নিজন দিন। অনেক আতংকের রাত। সঙ্গী লোকজনদের দ্বারা পরিত্যক্ত হবার পরে একমাত্র অন্তরের নির্ভিকতাই মেয়েটিকে পাগল হয়ে যাবার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তারপর অনন্তকাল বুঝি পার হয়ে গেছে; প্রতিটি দিন যেন এক একটি যুগ।

আজ সে একটা শিকার করেছে। রাইফেল চালিয়ে মেরেছে একটা শুয়োর।

কাজ করতে করতেই একটা শব্দ শুনে চোখ তুলতেই দেখতে পেল চারটি লোক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তাকেই দেখছে। একজন সাদা, বাকি তিনজন আদিবাসী। একটা যেন আশার আলো দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। ওরা এগিয়ে এল। সাদা মানুষটি সকলের আগে। ভাল করে তাকাতেই আশার আলো যেন নিভে এল। কোন সাদা মানুষের এ রকম অভদ্র চেহারা সে আগে কখনও দেখে নি। নোংরা জামা-কাপড় শতছিন্ন ও তালিমারা; মুখময় দাড়ি; টুপিটার এতই ভগ্নদশা যে মাথায় পরা আছে বলেই সেটাকে টুপি বলে

চেনা যাচ্ছে; মুখটাও রুক্ষ, কঠিন।

বলল, তুমি কে? এখানে কি করছ?

ও দুটোর কোনটা নিয়েই তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল।

লোকটির মুখ আরও বিকৃত হল; কিছু কড়া কথা ঠোঁটের ডগায় এসেওছিল; কিন্তু নিজেকে সংযত করে সে মেয়েটিকেই দেখতে লাগল। মেয়েটি সুন্দরী। নোংরা পোশাক, মুখ ঘামে ভেজা, শরীরে রক্তের দাগ; তবু তাকে সুন্দরী দেখাচ্ছে। দুই বছর পরে বুড়ো টাইমার এই প্রথম একটি সাদা মেয়েমানুষকে দেখল।

সে প্রশ্ন করল, নিশ্চয় তুমি একাকি এ দেশের এত ভিতরে ঢোক নি। দলের অন্য সকলে কোথায় গেল?

তারা আমাকে ফেলে চলে গেছে।

আর তোমার সাদা সঙ্গীরা—তারা?

সে রকম সঙ্গী কেউ ছিল না। মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল।

এখন তুমি কি করবে? একা তো এখানে থাকতে পারবে না। তাছাড়া কুলির সাহায্য ছাড়া থাকবেই বা কেমন করে?

একাই তিন দিন কাটিয়েছি, আরও কাটাব যতদিন—

যতদিন মানে?

জানি না।

লোকটি বলল, আমার কথা শোন। বল তো, এখানে থেকে তুমি কি করছ?

একটু আসার আলো যেন দেখতে পেল মেয়েটি। বলল, একজনের খোঁজ করছি। তুমি হয় তো তার কথা শুনেছ, হয় তো সে কোথায় আছে তাও জান। আগ্রহে মেয়েটির গলা কাঁপছে।

তার নাম কি? বুড়ো টাইমার জিজ্ঞাসা করল।

জেরি জেরোম। মেয়েটি অনেক আশা নিয়ে চোখ তুলল।

লোকটি মাথা নাড়ল। তার কথা কখনও শুনি নি।

মেয়েটির চোখ থেকে আশার সামান্য আলোটুকুও নিভে গেল। দুই চোখ বুঝি বা তার অজ্ঞাতেই জলে ভরে উঠল। তা দেখে বুড়ো টাইমার বলল, খুব হয়েছে; এখন চল।

কোথায়?

আমার সঙ্গে।

কেন?

এই জঙ্গলে একটা সাদা ইঁদুরকেও আমি রেখে যেতে পারতাম না; আর তুমি তো একটা সাদা মেয়ে।

মেয়েটি উদ্ধত ভঙ্গীতে বলল, তোমার সঙ্গে যদি না যাই তাহলে?

না যাই-টাই নয়, তোমাকে যেতেই হবে। মাথায় ঘিলু থাকলে সে জন্য তোমার কৃতজ্ঞ হবার কথা। কিন্তু তোমাদের কাছে তো ও সব কথা বলাই বৃথা। তুমিও তো অন্য সব মেয়েরই মত—স্বার্থপর, অবিবেচক, অকৃতজ্ঞ।

মেয়েদের সম্পর্কে তোমার ধারণা দেখছি খুব ভাল, কি বল?

ঠিক ধরেছ।

এবার নরম সুরে মেয়েটি শুধাল, আচ্ছা তোমার শিবিরে গেলে আমাকে নিয়ে কি করবে?

সঙ্গী-সাথী পেলেই যত তাড়াতাড়ি পারি আফ্রিকার বাইরে পাঠিয়ে দেব।

আফ্রিকা ছেড়ে আমি যাব না। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে এসেছি।

তোমার উদ্দেশ্য তো সেই জেরোম নামক ভদ্দর-লোককে খুঁজে বের করা; কিন্তু তার ভালর জন্যই একটি পুরুষ মানুষ হিসাবে আমার কর্তব্য তুমি তাকে খুঁজে পাবার আগেই তোমাকে এ দেশ থেকে বের করে দেওয়া।

লোকটা পাগল নাকি? মেয়েটি শুনেছে, পাগলের কথামত চলতে হয়; নইলে তারা হিংস্র হয়ে ওঠে। তাই সে ভয়ে ভয়ে বলল, হয় তো তোমার কথাই ঠিক। আমি যাব তোমার সঙ্গে।

লোকটি বলল, খুব ভাল কথা। এই তো বেশ মীমাংশা হয়ে গেল। তাহলে বাকি কথাটাও খোলসা হয়ে যাক। এখানকার কাজ শেষ করে আগামী-কাল অথবা পরশু আমি শিবিরে ফিরে যাব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না। আমার একটি চাকর তোমার দেখাশুনা করবে—রান্না করবে, সব কাজ করে দেবে। কোন ময়ের হেপা আমি পোহাতে পারব না। তুমি আমাকে ঘাটাবে না, আমিও তোমাকে ঘাটাব না। তোমার সঙ্গে কথাও বলব না।

সেটা আমারও কথা, মেয়েটি সায় দিল।

লোকটি আবার বলল, আর একটা কথা। সর্দার বোবোলোর দেশে আমার শিবির। আমার যদি একটা কিছু হয় তাহলে একটা লোককে সঙ্গে নিয়ে সেখানে চলে যেয়ো। সেখানে আমার অংশীদার তোমার দেখাশুনা করবে। শুধু আমার নাম ক'রো, তাহলেই হবে।

বুড়ো টাইমার ও তার সঙ্গীরা সে রাতের মত সেখানেই তাঁবু খাটাল। সন্ধ্যার পরে নিজের তাঁবু থেকেই মেয়েটি দেখল, লোকটি আগুনের পাশে বসে পাইপ টানছে। হঠাৎ তার মনে এমন একটা নিরাপত্তার ভাব জাগল যা আফ্রিকায় ঢোকার পর থেকে কখনও অনুভব করে নি। তার মন বলল, একেবারে একা থাকার চাইতে একটি সাদা পাগলা মানুষও ভাল। কিন্তু লোকটি কি সত্যিই পাগল?

কী আশ্চর্য, ওদিকে বুড়ো টাইমারও মেয়েটির কথাই ভাবছে। পাইপের ধোঁয়ার মধ্যে ভেসে উঠছে তারই মুখ—এক অপরূপা সুন্দরীর মুখ।

নিজের মনেই সে বলে উঠল,. মলো যা! কেন যে মরতে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

পরদিন সকালে উঠেই সে তাঁবু ছেড়ে চলে গেল। সঙ্গে নিল দুটো চাকর। একটা পুরনো রাইফেল দিয়ে অপর চাকরটিকে রেখে গেল মেয়েটির রক্ষী হিসাবে। সে যাবার আগেই মেয়েটি ঘুম থেকে উঠে এসে দাড়াল; কিন্তু তার দিকে না তাকিয়েই সে চলে গেল।

মনের ক্ষোভ চেপে রাখতে না পেরে মেয়েটি হিস্‌হিস্‌ করে বলে উঠল, অসভ্য কোথাকার!

বুড়ো টাইমারের সারাটা দিন কঠোর পরিশ্রমে কেটে গেল। অনেক খুঁজেও একটা হাতির চিহ্ন মাত্রও দেখতে পেল না। এমন একটা আদিবাসীর দেখা পর্যন্ত পেল না যে হাতির দলের চলাফেরার হদিসটাও অন্তত দিতে পারে। অগত্যা ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে সে আবার শিবিরেই ফিরে চলল।

দূর থেকে যখন খোলা জায়গাটা দেখতে পেল

সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ল মেয়েটির তাঁবু। তাঁবুর বাইরে কি যেন পড়ে আছে দেখেই তার শরীর ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এল। দ্রুত ছুটে গেল সেইদিকে। চাকর দুটিও ছুটল তার পিছনে। মেয়েটির রক্ষী হিসাবে যাকে রেখে গিয়েছিল তার ভয়ংকরভাবে বিকৃত মৃতদেহটা সেখানে পড়ে আছে। নিষ্ঠুর নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়েছে তার দেহ।

ওরাঙ্গোর ডাকে উটেঙ্গা সৈনিকদের কাছ থেকে ভাল করে সাড়া পাওয়া গেল না। যুদ্ধের নামে সকলেই নাচে; কিন্তু চিতা-মানুষদের গুপ্ত সংঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথায় সকলেরই বুক কাঁপে। তাই দেখা গেল, যুদ্ধযাত্রার ডাক পড়লে শ' খানেক লোক এসে হাজির হল।

এদিকে আর এক বিপদ। মুজিমোকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সঙ্গে নিয়ামওয়াগির
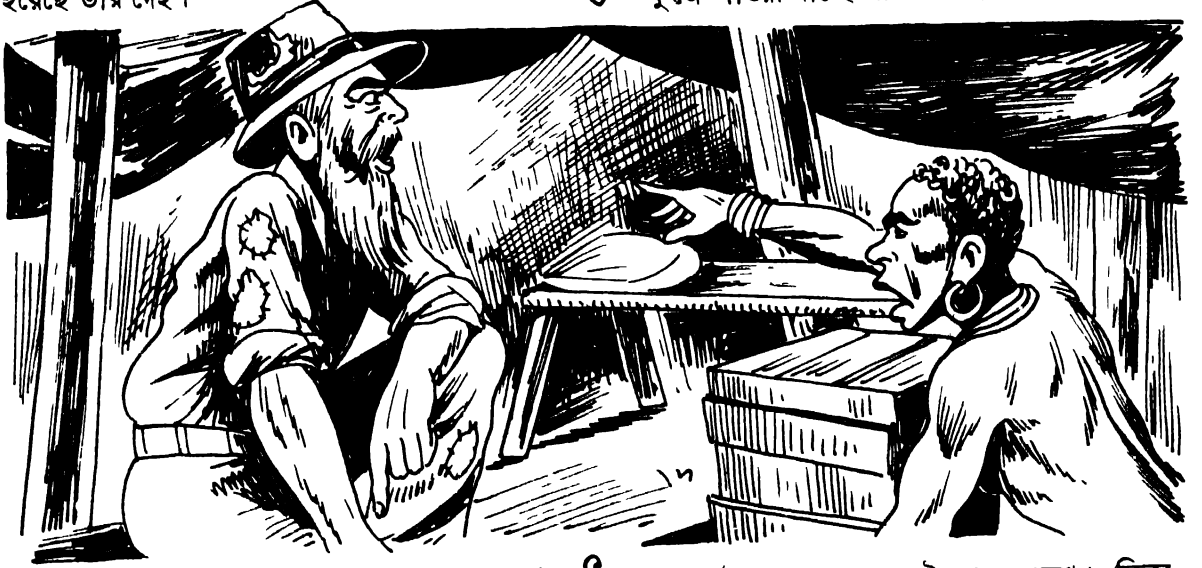
সঙ্গীর দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে নিগ্রো দুটি নিজেদের ভাষায় কি যেন বলল; তারপর বুড়ো টাইমারের দিকে ফিরে বলল, চিতা-মানুষরা এসেছিল বাওয়ানা।

বুড়ো টাইমার ভয়ে ভয়ে তাঁবুর দিকে পা বাড়াল। মেয়েটি তাঁবুর মধ্যে নেই। প্রথমেই তার মনে হল, গলা ছেড়ে তাকে ডাকবে। কিন্তু কেমন করে ডাকবে? তার নামটাই ত জানা হয় নি। পরমুহূর্তেই মনে হল, তাকে ডাকা বৃথা। সে যদি বেঁচেও থাকে তাহলেও এতক্ষণে সে অনেক দূর চলে গেছে—রক্তপিপাসু শয়তানরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। যেমন করে হোক তাকে উদ্ধার করতেই হবে—প্রতিশোধ নিতে হবে।

আত্মাও উধাও হয়েছে। বড়ই অশুভ লক্ষণ। কিবব্ু গ্রামের লুপিঙ্গুও যুদ্ধের বিপক্ষে। সুযোগ বুঝে সে ওরাঙ্গোকে শুধাল, তোমার মুজিমো তো চলে গেল। এখন কে আমাদের চিত-মানুষদের গ্রামের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে?

ওরাঙ্গো প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলল, সে আমাকে ছেড়ে যাবে তা আমি বিশ্বাস করি না।

বুঝি বা তার কথা রাখতেই কাছের একটা গাছের ডাল থেকে নেমে এল একটা দৈত্যাকার মূর্তি। সে মুজিমো। এক কাঁধে একটা মরা হরিণ, অন্য কাঁধে নিয়ামওয়েগির আত্মা।

ওরাঙ্গো শুধাল, কোথায় ছিলে মুজিমো? ওরা বলছিল, সোবিটো তোমাকে মেরে ফেলেছে।

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে মুজিমো বলল, শুধু মুখের কথায় মানুষ মরে না। সোবিটো তো কথার বস্তা।

একটি বুড়ো প্রশ্ন করল, তুমি কি সোবিটোকে মেরে ফেলেছ?

তাকে বাধা দিয়ে মুজিমো বলল, আমি শিকারে বেরিয়েছিলাম। তোমাদের খাদ্য ভাল নয়; আগুনে পুড়িয়ে তোমরা সব নষ্ট করে ফেল।

একটা গাছের নীচে বসে শিকারের শরীর থেকে খানিকটা মাংস কেটে নিয়ে সে খেতে শুরু করল। মাঝে মাঝে গলার মধ্যে গর্-গর্ শব্দ হচ্ছে। বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে সৈনিকরা সভয়ে তাকে দেখতে লাগল।

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল। শরীরের আড়মোড়া ভাঙল। তারপর বলল, মুজিমো প্রস্তুত। উটেঙ্গারা প্রস্তুত থাকলে এবার যাত্রা শুরু হোক।

তিন দিন ধরে চলল একটানা অভিযান। মুজিমো পথ-প্রদর্শক; ওরাণ্ডো নেতা। যত এগিয়ে যাচ্ছে, সৈনিকদের মনোবল ততই বাড়ছে। সকলেরই ঠাট্টা বিদ্রূপের ফলে লুপিঙ্গুও চুপচাপ পথ চলেছে।

চতুর্থ দিন সকালে মুজিমো জানাল, তারা চিতা-মানুষদের গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছে। পরদিন সকালেই সে একা এগিয়ে গিয়ে সব কিছু ভাল করে দেখে আসবে।

প্রাতরাশের পরে আগুনকে ঘিরে বসে গল্প করতে করতে এক সময় সকলের খেয়াল হল লুপিঙ্গু সেখানে নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া গেল না। তখন সকলেই ধরে নিল যে শত্রুর কাছাকাছি এসে সে ভয়ে পালিয়ে গেছে। সেই ফাঁকে মুজিমো ও নিয়ামওয়েগির আত্মা নিঃশব্দে গাছের ডালে ডালে ঝুলে চিতা-মানুষদের গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল।

গলায় দড়ি বেঁধে মেয়েটিকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। দড়ির অপর প্রান্ত ধরে আছে একটি বলিষ্ঠ আদিবাসী যুবক; তার আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে একটি বুড়ো; তার পিছনে আছে আর একটি যুবক। তিনজনেরই শরীর চিতাবাঘের চামড়ায় ঢাকা; মাথায় বেশ ভাল করে বসানো চিতাবাঘের মাথা; ইস্পাতের বাঁকা নখ বসানো তাদের আঙুলের ডগায়; দাঁতগুলি ঘসে ঘসে ধারালো করা হয়েছে; আর সারা মুখ চিত্র-বিচিত্র করে আঁকা। তিনজনের মধ্যে বুড়োটাই সর্দার; দেখতেও ভয়ংকর। যুবক দুটি তার কথায় উঠছে-বসছে।

সকলের কুটিল, কঠোর দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে আদিবাসীরা মেয়েটিকে নিয়ে হাজির হল একটা বড় কুটিরের সামনে। বাড়ির সামনে বসে আছে একটি পেটমোটা বুড়ো নিগ্রো; তার সারা মুখ বলীরেখায় ভরা। চিতা-মানুষদের সর্দার গাটো মুঙ্গু। চোখ তুলে তাকাতেই সাদা মেয়েটিকে দেখে তার রক্ত-রাঙা চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল।

বুড়ো লোকটিকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি আমার জন্য উপহার এনেছ লুলিমি?

বুড়ো জবাব দিল, উপহার এনেছি, তবে কেবলমাত্র গাটো মুঙ্গুর জন্য নয়।

তার মানে? সর্দার ভেংচে উঠল।

উপহার এনেছি গোটা জাতির জন্য—চিতা-দেবতার জন্য।

মেয়েটিকে মন্দিরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা চলতে লাগল। এমন সময় একটি সৈনিক ঘর্মাক্ত দেহে রুদ্ধশ্বাসে এসে হাজির হল।

গাটো মুঙ্গু বলল, তুমি কি সংবাদ এনেছ?

উটেঙ্গাদের সর্দার লোবোঙ্গোর ছেলে ওরাণ্ডোর নেতৃত্বে একশ' সৈনিক এখান থেকে কয়েক ঘণ্টার পথ দূরে হাজির হয়েছে। তারা আক্রমণ করবে তোমার গ্রাম। এখনই যদি কিছু সৈনিক পাঠিয়ে তাদের পথের পাশে লুকিয়ে রাখতে পার তাহলে অতর্কিতে আক্রমণ করে তার সব উটেঙ্গাকে মেরে ফেলতে পারবে।

কোথায় তাঁবু ফেলেছে তারা?

বার্তাবহ সে স্থানের বিস্তারিত বিবরণ দিল। গাটো মুঙ্গু একজন উপ-প্রধানকে হুকুম দিল, তিনশ' সৈনিক নিয়ে সে আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করুক। তারপর বলল, আজ রাতে আমাদের মহাভোজ হবে, আর এই অতিথি সেখানে আমার পাশে বসে পানাহার করবে।

বার্তাবহ বলল, আমি তো থাকতে পারব না। এখনই আমাকে ফিরে যেতে হবে, নইলে সকলে আমাকে সন্দেহ করবে।

তুমি কে? গাটো মুঙ্গু প্রশ্ন করল।

বার্তাবহ জবাব দিল, আমি ওয়াটেঙ্গা দেশের কিব্বু গ্রামের লুপিঙ্গু।

রাত নামছে। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। বনের পথ ধরে ছিন্নবসন একটি সাদা মানুষ এসে দাঁড়াল একটা ফসলের ক্ষেতের শেষ প্রান্তে। ক্ষেতের ওপারে একটা বেড়া দিয়ে ঘেরা গ্রামের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে মাঠের উপরে। লোকটির সঙ্গে দুটি কালো মানুষ।

তাদের একজন বলল, আর যেয়োনা বাওয়ানা। ওটা চিতা-মানুষদের গ্রাম।

বুড়ো টাইমার বলল, ওটা গাটো মুঙ্গুর গ্রাম। আগেও আমি তার সঙ্গে ব্যবসা করেছি।

তখন তুমি এসেছিলে অনেক লোকজন ও বন্দুক নিয়ে। আর তখন গাটো মুঙ্গু ছিল ব্যবসাদার। আজ তুমি এসেছ মাত্র দুটি চাকর নিয়ে; আর আজ তুমি দেখবে বুড়ো গাটো মুঙ্গু চিতা-মানুষ হয়ে গেছে।

বাজে কথা! সাদা মানুষটি চেঁচিয়ে বলল। একজন সাদা মানুষের কোন ক্ষতি করার সাহস তার হবে না। তাছাড়া, সব কিছু দেখে মনে হচ্ছে যে

মেয়েটিকে এখানেই আনা হয়েছে। আমি ঐ গ্রামে যাবই।

নিগ্রোরা মাথা নাড়ল। তুমি যেয়োনা বাওয়ানা। সাদা মেয়েটি তোমার স্ত্রী নয়, মা নয়, বোন নয়। তাহলে তার জন্য তুমি কেন জীবনটা দেবে।

বুড়ো টাইমারও মাথা নাড়ল। সে তোমরা বুঝবে না। সে নিজেই কি বুঝেছে। হাত নেড়ে বলল, তাহলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

বুড়ো টাইমার মাঠ পেরিয়ে ফটকের দিকে এগিয়ে চলল। নিগ্রো দুটির চোখ জলে ভরে এল।

বুড়ো টাইমারকে দেখে গাটো মুঙ্গু উদ্ধত ভঙ্গীতে বলল, এখানে কি করতে এসেছ?

বুড়ো টাইমার বুঝল, অবস্থা সুবিধার নয়। এখানে নরম কথায় কোন কাজ হবে না। সে সরাসরি বলল, আমি এসেছি সাদা মেয়েটিকে নিয়ে যেতে।

কোন্ সাদা মেয়ে?

মিথ্যা প্রশ্ন করে আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করোনা। মেয়েটি এখানেই আছে। তাকে আমার হাতে তুলে দাও।

গাটো মুঙ্গু হুংকার দিয়ে উঠল, এ গাঁয়ে কোন সাদা মেয়ে নেই। আর আমি সর্দার গাটো মুঙ্গু, হুকুম করি, কারও হুকুম শুনি না।

হুকুম তোমাকে শুনতে হবে বদমাস। অন্যথায় একদল সৈন্য নিয়ে এসে তোমার গ্রামটাকে আমি মানচিত্রের বুক থেকে মুছে ফেলব।

গাটো মুঙ্গু ঘৃণাভরে বলল, তোমাদের আমি চিনি। তোমরা তো মাত্র দুজন, আর বাকি পাঁচজন তো এখানকার মানুষ। তোমরা তো গরিব। হাতির দাঁত চুরি করে বেড়াও। মুখেই শুধু বড় বড় কথা বল। গাটো মুঙ্গু তোমার কথায় ভয় পায়

না। তুমি তো এখন আমার বন্দী। একে এখান থেকে নিয়ে যাও। দেখো যেন পালিয়ে না যায়।

দুজন সৈনিক এসে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। একটা নোংরা ছোট ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে তার অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিল। হাত-পা শক্ত করে বেঁধে রেখে চলে গেল। একজন মাত্র শাস্ত্রী রইল দরজার পাশে পাহারায়। কিন্তু লোকটির পাজামার পকেটে যে একটা ছোট ছুরি ছিল সেটা খেয়ালই করল না।

অন্ধকার কারাগারে বসে বুড়ো টাইমার মেয়েটির কথাই ভাবছিল। এদের কবল থেকে কেমন করে তাকে উদ্ধার করবে সেই চিন্তাই এখন তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। এমন সময় কে যেন ঘরে ঢুকল। অন্ধকারে তাকে চিনতে পারল না, কিন্তু কথা শুনেই বুঝতে পারল যে লোকটি তার পূর্ব-পরিচিত সর্দার বোবোলো।

বোবোলো বলল, আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারি। এখান থেকে বাইরে যেতে চাও তো?

নিশ্চয় চাই।

আমি তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু তার জন্য দাম চাই।

কত?

দশটা হাতির দাঁত।

বুড়ো টাইমার শিস দিয়ে উঠল। বলল, সেই সঙ্গে একটা স্টিম-ইয়াট আর একটা রোল্‌স্‌ রয়েসও চাই তো?

ওদিকে গাটো মুঙ্গু অন্য সর্দারদের নিয়ে আলোচনায় বসেছে, নতুন বন্দীকে নিয়ে কি করা যায়। বোবোলো এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। নানা জনের নানা মত। সকলেরই গলা সপ্তমে চড়া।

হঠাৎ তাদের আলোচনায় বাধা পড়ল। যে গাছের নীচে বসে আলোচনা চলছিল তার ডালে একটা সর্‌ সর্‌ শব্দ উঠল, আর পরক্ষণেই একটা ভারী জিনিস কে যেন ছুঁড়ে দিল তাদের ঠিক

কিছু না বুঝেই বোবোলো ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

অনেক কথা-কাটাকাটির পর স্থির হল, বুড়ো টাইমার তার আংটিটা দেবে। সেই আংটি নিয়ে বোবোলো যাবে তার সঙ্গী কিডের কাছে। সেটা দেখেই কিড চিনতে পারবে এবং বোবোলোর দাবীমত তাকে দশটা দাঁত দিয়ে দেবে। আর বুড়ো টাইমারও ছাড়া পাবে।

বুড়ো টাইমারের পিছনে গিয়ে বোবোলো তার আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মনে মনে বলল, আংটি আর হাতির দাঁত দুইই হাতিয়ে নেব। বুড়ো টাইমার এবার গভীর গাড্ডায়।

মাঝখানে। সভয়ে তারা উপরে তাকাল; অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না। নীচে তাকিয়ে দেখল, তাদের পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা মানুষের মৃতদেহ। তার হাত-পা বাঁধা, আর গলাটা এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত কাটা।

গাটো মুঙ্গু ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, এ তো সেই উটেঙ্গা লুপিঙ্গু। এই তো আমাদের গোপনে খবর এনে দিয়েছিল।

একজন বলল, তারা বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দিয়েছে।

বোবোলো বলল, কিন্তু তাকে গাছের উপর তুলে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিল কে?

সকলেই একে-অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। বোবোলোই আবার মুখ খুলল, ওরাঙ্গোর এক মুজিমোর কথা আমরা শুনেছি। সেই সাদা মানুষটা নাকি টুম্বাইয়ের ওঝা সোবিটোর চাইতেও বেশী শক্তিশালী। হয় তো সেই লুপিঙ্গুকে এখানে ফেলে দিয়েছে। আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে। কাজেই বন্দীকে অবিলম্বে প্রধান পুরোহিতের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। সে যা ভাল বোঝে তাই করবে। বন্দীকে যদি মেরেও ফেলে তো সে দোষ আমাদের উপর বর্তাবে না।

একজন বলল, খুব বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছ।

পাতার ফাঁক দিয়ে মুজিমো সবই দেখতে পাচ্ছিল। নিয়ামওয়েগির আত্মা ঘুমিয়ে পড়েছে তার কাঁধের উপরে। সে দেখল, সাদা বন্দীটিকে সকলে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। তার পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে। নদীর তীরে পৌঁছে ছোট ছোট ডোঙ্গার একটা বহর (প্রায় ত্রিশটা ডোঙ্গা) তারা জলে ভাসিয়ে দিল। প্রায় তিনশ' সৈনিক তাতে চড়ে বসল। গায়ে-মুখে রং-করা অসভ্য লোকগুলিকে নিয়ে সবগুলি ডোঙ্গা ভাঁটির স্রোতে তরতর করে চলতে লাগল।

নিয়ামওয়েগির আত্মাকে কাঁধে নিয়ে মুজিমোও গাছ থেকে নেমে নদীর সমান্তরাল পথটা ধরে এগোতে লাগল।

ঘটনাক্রমে বুড়ো টাইমার ও বোবোলো এক ডোঙ্গাতেই উঠেছে।

মন্দিরের কাছে পৌঁছে সকলে ডোঙ্গা থেকে নামল। সকলে মিলে মিছিল করে ঢুকল মন্দিরের সেই বড় ঘরটায়। ঘরটা লোকজনে ভর্তি। সকলে যার যার নির্দিষ্ট আসনে বসল। বুড়ো টাইমারের সাগ্রহ চোখ দুটি বৃথাই সাদা মেয়েটির সন্ধানে

চারদিকে ঘুরতে লাগল। সেখানে সে নেই।

ছোট বেদীটার উপর দাঁড়িয়ে আছে প্রধান পুরোহিত। তার নীচে ও চারদিকে অনেক ছোট পুরোহিতের ভিড়। পাশেই ভারী দণ্ডের সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা প্রকাণ্ড চিতাবাঘ; নীচের জনতার দিকে তাকিয়ে গর্-গর্ করছে। বুড়ো টাইমারের মনে হল, সেটা যেন এই সব কালো মানুষদের পাশবিক ধর্মের এক মূর্ত প্রতীক।

প্রধান পুরোহিত তাদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, হে চিতা-দেবতা, তোমার সন্তানরা তাদের এক শত্রুকে বন্দী করেছে। তোমার মহামন্দিরে তাকে নিয়ে এসেছে। এখন তোমার কি ইচ্ছা?

মুহূর্তের জন্য সব নিশ্চুপ। সকলেরই চোখ প্রধান পুরোহিত ও চিতাবাঘের উপর নিবদ্ধ। তারপরই ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। সাদা মানুষটির শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল; চুল উঠল খাড়া হয়ে। চিতাবাঘের মুখ থেকে বের হল মানুষের ভাষা। এ যে অবিশ্বাস্য; অথচ সে তো নিজের কানেই শুনল: চিতা-দেবতার সন্তানরা যাতে খেতে পারে তার জন্য তাকে মেরে ফেলা হোক। কিন্তু তার আগে মন্দিরের নতুন প্রধানা সন্ন্যাসিনীকে এখানে আনা হোক; আমার ভাইয়ের নির্দেশে লুলিমি তাকে এনেছে বহু দূর দেশ থেকে; আমার সন্তানরা তাকে একবার দেখুক।

অন্য তিনশ' জনের সঙ্গে বুড়ো টাইমারের দৃষ্টি পড়ল বেদীর পিছনকার খোলা দরজার উপরে। অস্পষ্ট একটি মূর্তি অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দ্বারপথে দাঁড়াল: মশালের আলো পড়ল তার উপর।

বিস্ময় ও আতংকের একটা চীৎকার স্তব্ধ হয়ে গেল সাদা মানুষটির কণ্ঠতালুতে। এ মূর্তি যে সেই মেয়ের যাকে সে খুঁজছে।

অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। বেদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইমিগেগ অনবরত বিড় বিড় করে কি যেন বলতে লাগল; কখনও কোন ছোট সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীকে উদ্দেশ্য করে, কখনও বা চিতা-দেবতার উদ্দেশে। আর যখনই চিতা-দেবতা জবাব দেয় তখনই সমবেত সৈনিকরা ভয়ে আঁতকে ওঠে।

চিতার মুখে কথা শুনে আরও একজন বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে। ঘরটার ছাদের একটা বরগা সামনের দেয়াল ভেদ করে বাইরে খানিকটা বেরিয়ে আছে। তার উপরে বসে একটা ফোঁকড়ের ভিতর দিয়ে সব কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে।

সে লোকটি মুজিমো। তার পাশে নিয়ামওয়েগির আত্মা। এত চিতাবাঘ দেখে সে বেচারি ভয়ে কাঁপছে।

মুজিমো আবার নীচে তাকাল। ঐ সাদা পুরুষ ও সাদা মেয়েটির কি হবে তা সে অনুমান করতে পারছে। কিন্তু তা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু হঠাৎ একটা কিছু দেখে তার আগ্রহ বেড়ে গেল। বীভৎস মুখোশগুলির আড়ালে একটা পরিচিত মুখ যেন তার চোখে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরেই তার উপর সে নজর রেখেছিল। কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। মুজিমোর ঠোঁটে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। 'চলে এস।' বলে সঙ্গীকে ডেকে সে কোন রকমে ছাদে উঠে গেল। বিড়ালের মত পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী একটা গাছের ডালে লাফিয়ে পড়ল। বনের অন্ধকার দুজনকেই ঢেকে দিল।

নীচের বড় ঘরে সন্ন্যাসিনীরা তখন বেদীর উপর অনেক উনুন জ্বেলে দিয়েছে, তার উপর মাটির পাত্রে নরমাংস রান্না হচ্ছে। ওদিকে সন্ন্যাসীরা ভাড়ে ভর্তি করে নিয়ে এসেছে ঘোল আর চোলাই। সেগুলো খেয়ে সকলেই নাচতে শুরু করেছে। চোলাই পেটে

পড়ায় প্রধান সন্ন্যাসীও পাগলের মত নাচতে শুরু করে দিল।

বুড়ো টাইমারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বোবোলো বলল, আমার সঙ্গে চলে এসো।

কোথায়?

তোমাকে পালাতে সাহায্য করব।

মেয়েটিকে সঙ্গে না নিয়ে আমি যাব না।

বেশ তো, সে ব্যবস্থাও করা হবে। কিন্তু তোমাদের দুজনকে তো একসঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না। বুঝতে পারলে ইমিগেগ আমাকে মেরে ফেলবে। আগে তুমি এস। মন্দিরের পিছনে একটা ঘরে তোমাকে লুকিয়ে রেখে আসি। তারপর মেয়েটিকে নিয়ে যাব।

বুড়ো টাইমারকে মন্দিরের পিছনের একটা ঘরে নিয়ে গেলে সে বলল, ফিরে যাবার আগে আমার হাতের বাঁধন কেটে দাও।

মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে বোবোলো বলল বেশ তো তাই দিচ্ছি। এখান থেকে তুমি একা তো পালাতে পারবে না। মন্দির একটা দ্বীপের মাঝখানে অবস্থিত। চারদিকের নদী কুমীরে ভর্তি; নদীপথে ছাড়া এখান থেকে বের হবার আর কোন পথ নেই।

বুড়ো টাইমার অধৈর্য গলায় বলল, বুঝেছি। এখন যাও; শিগ্‌গির মেয়েটিকে নিয়ে এস।

বোবোলো চলে গেল.

মন্দিরে তখন হুলুস্থূল কাণ্ড চলেছে। হাড়ির মাংস বিলি করা হচ্ছে; পাত্রের পর পাত্র চোলাই উজাড় হয়ে যাচ্ছে; উপরের বেদীতে প্রধান সন্ন্যাসী আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে। চিতা-দেবতা উপুর হয়ে একটা মানুষের হাড় চিবুচ্ছে। প্রধান সন্ন্যাসিনী দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালে হেলান দিয়ে।

বোবোলো তার কাঁধে হাত রাখল। মেয়েটি চমকে চোখ ফেরাল।

বোবোলো ইসারা করে চুপি চুপি বলল, চলে এস।

মেয়েটি একটু আগেই দেখেছে, এই মেয়েটি বুড়ো টাইমারকে এখান থেকে নিয়ে গেছে। সে বোবোলোকে অনুসরণ করল।

মেয়েটিকে বুড়ো টাইমারের ঘরে পৌঁছে দিয়ে বোবোলো বলল, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর।

মন্দিরে ফিরে গিয়ে বোবোলো দেখল সেখানকার হৈ-হল্লা অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কৃতকর্মের জন্য তার কেমন ভয় করতে লাগল। মনে জোর আনবার জন্য তার চোলাইয়ের একটা বড় পাত্র তুলে মুখে ঢেলে দিল। ফল ফলতে দেরী হল না। এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল বোবোলো মেঝেতে পড়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

গাটো মুগুরও একই অবস্থা। অগত্যা সে হুকুম জারি করল, খাদ্য-পানীয় যখন নেই, তখন ফিরে চল বাড়ি। সকলেই সম্মত হল। এমন কি বোবোলো পর্যন্ত। তারও মাথার মধ্যে সব কিছু গুলিয়ে গেছে। কি যেন তার করার ছিল, কিন্তু কিছু মনে করতে পারছে না। অগত্যা অন্য সর্দারদের সঙ্গে সেও তার দলবল নিয়ে ডোঙায় উঠে পড়ল।

কিছু সৈনিকের নেশা তখনো ভাঙে নি। মন্দিরের চত্বরে সকলেই ছড়িয়ে পড়ে আছে। কিছু ছোট সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীও আছে তাদের মধ্যে। তাদের জন্য একটা ডোঙ্গা সর্দাররা রেখে গেছে। বেদীর এক কোণে ইম্গিগেগ গভীর ঘুমে কুঁকড়ে পড়ে আছে। পেট ভরা থাকায় চিতা-দেবতাও ঘুমিয়ে পড়েছে।

কালি বাওয়ানা ও বুড়ো টাইমার বোবোলোর অপেক্ষায় বসে আছে মন্দিরের পিছনের অন্ধকার ঘরে। বাড়িটা ক্রমেই চুপচাপ হয়ে আসছে; সকলের ফিরে যাবার আয়োজনও কানে আসছে। নদীতীরের হৈ-হল্লা শুনেও তারা বুঝতে পেরেছে যে আদিবাসীরা নদীতে ডোঙ্গা ভাসিয়েছে।

বুড়ো টাইমার বলল, বোবোলোর তো এতক্ষণে আসা উচিত।

কালি বাওয়ানা বলল, সে হয় তো আমাদের ফেলেই চলে গেছে।

টাইমার বলল, তাহলে তুমিও চলে এস। সময় নষ্ট করো না। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে আবার বলল, হাতে হাত দাও; আমরা যেন কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ি।

অনেক কষ্টে মন্দির থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে তারা নদীর তীরে পৌঁছে গেল। মনে ভয় ছিল, নদীতে ডোঙ্গা না পেলে সব পরিশ্রমই বৃথা হয়ে যাবে। কিন্তু না, উল্লাসে তাদের মন নেচে উঠল। তীরে কাদার মধ্যে একটা ডোঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়ো টাইমার হাত ধরে কালি বাওয়ানাকে ডোঙ্গায় তুলে দিল; তারপর নিজেও উঠে বসল। নীরবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তারা বড় নদীর দিকে ভেসে চলল।

মধ্যরাতের ঘণ্টাখানেক পরে মুজিমো ও

নিয়ামওয়েগির আত্মা ঘুমন্ত উটেঙ্গাদের মাঝখানে এসে নামল। শাস্ত্রীদের ঘাঁটিগুলি পরিদর্শন করে ওরাঙ্গো সবেমাত্র ফিরেছে। সে জেগেই ছিল। বলল, কি সংবাদ নিয়ে এলে মুজিমো? শত্রুপক্ষের খবর কি?

প্রধান সন্ন্যাসী ও চিতা-দেবতার সঙ্গে পরামর্শ করতে তারা অনেকেই মন্দিরে চলে গেছে। আমরাও সেখানে গেলাম। কিন্তু এত বেশী পরিমাণ দেশী চোলাই তারা গিলল যে কিছু জানতেই পারল না। তাই তো তোমাকে বলতে এলাম, তাদের গ্রাম এখন প্রায় ফাঁকা; নারী, শিশু ও সামান্য কিছু সৈনিকমাত্র আছে। সে গ্রাম আক্রমণ করার এই উপযুক্ত সময়।

ঠিক বলেছ। ঘুমন্ত সৈনিকদের জাগিয়ে তুলতে ওরাঙ্গো হাততালি দিল।

বনের আঁকাবাঁকা পথ ধরে ওরাণ্ডোর সৈন্যদলকে সে নিয়ে চলল গাটো মুঙ্গুর গ্রামের দিকে। বনের শেষে ফসলের মাঠে পৌঁছে তারা একটু থামল, তারপর নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে নদীর দিকে গেল। এতক্ষণে মুজিমো বুঝতে পারল যে চিতা-মানুষেরা মন্দির থেকে ফেরে নি। মুজিমোর কথামত সৈন্যদের নদীর ধারে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে ওরাণ্ডো প্রতিটি সৈনিককে নির্দেশ দিল, সংকেত পেলেই যেন তারা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে। ডোঙ্গার শব্দ কানে আসছে—ছলাৎ, ছলাৎ, ছলাৎ। উটেঙ্গারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। একে একে বিশটা ডোঙ্গা এসে ভিড়ল; সব সৈনিক ডোঙ্গা থেকে নেমে সারিবদ্ধভাবে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল। আর দেরী নয়। ওরাণ্ডো সংকেত করল। সঙ্গে সঙ্গে নবব্ুইটি উটেঙ্গা সৈনিকের কণ্ঠে ধ্বনিত হল রণহুংকার; তাদের বর্শা ও তীর বৃষ্টিধারার মত ঝরে পড়তে লাগল চিতা-মানুষদের উপর।

চিতা-মানুষদের লম্বা সারি তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেল। অতর্কিত আক্রমণের ফলে পলায়ন ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই তাদের মাথায় এল না। নদীর তীরে যারা পড়েছিল তারা আবার ডোঙ্গা ভাসাবার চেষ্টা করল; যারা তখনও তীরে নামে নি তারা ডোঙ্গার মুখ ঘুরিয়ে দিল মন্দিরের দিকে। বাকিরা পালাতে লাগল গ্রামের দিকে। তাদের পিছু ধাওয়া করল উটেঙ্গা সৈনিকরা। গ্রামের ফটক বন্ধ; ভিতরের রক্ষীরা ফটক খুলতে সাহস করল না। তুমুল যুদ্ধ হল সেখানেই। নদীর তীরে যারা পড়ে ছিল উটেঙ্গা সৈনিকদের হাতে তারা একেবারে কচুকাটা হয়ে গেল। আর অনেকক্ষণ যুদ্ধের পরে ভিতরের রক্ষীরা যখন ফটক খুলে দিল বাইরে তখন তাদের

দলের আর কেউ অবশিষ্ট নেই, হয় মরেছে, না হয় তো পালিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উটেঙ্গা সৈন্যরা হৈ-হৈ করতে করতে ভিতরে ঢুকে গেল। তাদের হাতের জ্বলন্ত মশালের আগুনে গাটো মুঙ্গুর গ্রামের খড়ের ঘরগুলো দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল। জয় সম্পূর্ণ হল।

ওরাণ্ডো তখন সেই ঘর-পোড়া আলোয় খুঁজে খুঁজে নিজের ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব করতে লাগল। ওরাণ্ডো দেখল, হতাহত সৈনিকদের পাশে একদলা কাদার মত চিৎ হয়ে পড়ে আছে মুজিমো।

সে দৃশ্য দেখে সর্দারের ছেলে বিস্মিত হল, শোকাহত হল: তার অনুচররাও মর্মাহত। তাদের ধারণা ছিল, মুজিমো প্রেতলোকের জীব, কাজেই তার মৃত্যু নেই। কিন্তু সেও তো মানুষের মতই মরণশীল। এতদিন লোকটা তাদের ধোঁকা দিয়েছে।

ওরাণ্ডো বলল, মানুষই হোক আর প্রেতই হোক, আমার প্রতি সে বিশ্বস্ত ছিল; তোমরাই তো চোখে দেখেছ, সে যুদ্ধ করেছে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে।

সকলেই সে কথা মেনে নিল।

ওদিকে শেষ ডোঙ্গাটাতে চেপে বুড়ো টাইমার প্রাণপণে বৈঠা চালিয়ে যাচ্ছে ছোট খালের জলে। কালি বাওয়ানা বসে আছে ডোঙ্গার মধ্যে। অসভ্য লোকদের পরানো মাথার ঢাকনা খুলে ফেলেছে; ছিঁড়ে ফেলেছে গলার দাঁতের হার।

মনের সুখে ডোঙ্গা বাইছে বুড়ো টাইমার। হঠাৎ বৈঠার ছপ-ছপাৎ শব্দ তার কানে এল। টাইমারের বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। তাড়াতাড়ি ডোঙ্গার মুখ দক্ষিণ তীরের দিকে ঘুরিয়ে দিল। সেখানে গাছপালার ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

দিকে। সাদা মানুষটির মুখ শুকিয়ে গেল। মেয়েটাকে প্রায় উদ্ধার করে এনেছিল। এমন সুযোগ আর আসবে না।

মেয়েটিকে ডাকল। কোন সাড়া এল না।

বোবোলোর ডোঙ্গা যখন বুড়ো টাইমার ও মেয়েটির ডোঙ্গার কাছাকাছি চলছিল তখন সাদা চামড়া ও নীল চুল দেখে বোবোলো মেয়েটিকে চিনতে পেরে অন্ধকারেই সবল হাত বাড়িয়ে তাকে নিয়ে এসেছিল তার নিজের ডোঙ্গায়। বোবোলোর হুকুমেই ডোঙ্গাটা বিদ্যুৎগতিতে তার গ্রামের দিকে ছুটে গিয়েছিল।

ঠিক তখনই আর একটা ডোঙ্গা পিছনে এসে হাজির হল। বোবোলোর গলা চিনতে বুড়ো টাইমারের ভুল হবার কথা নয়। কয়েকজন সৈনিক লাফিয়ে তাদের ডোঙ্গায় চড়ে তার মাথায় আঘাত করল, টেনে-হিঁচড়ে তাকে ফেলে দিল। আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল।

আবার বোবোলোর গলা। জলদি কর। ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে। উটেঙ্গারা আসছে।

অনেকগুলো শক্ত হাত ডোঙ্গার বৈঠা চেপে ধরল। বিদ্যুৎ বেগে ডোঙ্গাটা ছুটে চলল মন্দিরের দিকে।

ঘটনার আকস্মিকতায় মেয়েটি তখন একেবারেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একমাত্র যে মানুষটির উপর এতক্ষণ পর্যন্ত সে ভরসা করে ছিল এবার সেও হারিয়ে গেল।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অসহায় বুড়ো টাইমার ফিরে চলল মন্দিরের দিকে। সকলে তাকে টানতে টানতে মন্দিরে নিয়ে গেল। মাতাল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা ইতস্তত পড়ে আছে মন্দিরের মেঝেতে। গণ্ডগোল কানে যেতে প্রধান সন্ন্যাসী ইম্গিগে ঘুম থেকে জেগে উঠল। দুই হাতে চোখ মুছতে মুছতে বলল, কি হয়েছে?

ততক্ষণে গাটো মুঙ্গু ঢুকেছে মন্দিরে। সেই জবাব দিল, অনেক কিছু ঘটেছে। তোমরা সকলে যখন মাতাল হয়ে পড়ে ছিলে, এই সাদা মানুষটা তখন পালিয়েছিল। উটেঙ্গারা আমার সৈনিকদের হত্যা করেছে, আমার গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

প্রধান সন্ন্যাসী আবছা চোখে চারদিকে তাকাল।

গাটো মুঙ্গু বিনীত গলায় বলল, বন্দীকে তাহলে ভাল করে বেঁধে মন্দিরের পিছনেই রেখে আসি?

ইমিগেগ বলল, তাই যাও। এমন করে বেঁধো যেন পালাতে না পারে।

মাটিতে শুয়েই শ্বেতকায় দানব চোখ মেলে তাকাল। দেখল, ওরাণ্ডো ও তার সৈনিকরা দাঁড়িয়ে আছে। কি যেন মনে পড়ায় হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বানরদের ভাষায় বলল, নকিমা! নকিমা! কোথায় তুমি নকিমা? টারজন এখানে।

ছোট বানরটি একলাফে গাছ থেকে নেমে ছুটে এসে সাদা মানুষটির কাঁধে চড়ে বসল; তার গলা জড়িয়ে ধরে মনিবের গালে গাল রেখে আনন্দে কিচির-মিচির করতে লাগল।

ওরাণ্ডো সঙ্গীদের বলল, দেখছ তো মুভিমো মরে নি।

সাদা মানুষটি ওরাণ্ডোর দিকে ফিরে বলল, আমি মুভিমো নই; আমি অরণ্যরাজ টারজন। বানরটিকে ছুঁয়ে বলল, এও নিয়ামওয়েগির আত্মা নয়; এ হল নকিমা। এখন আমার সব কথা মনে পড়ছে। অনেকদিন থেকে মনে করার চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারি নি—যেমনি একটা গাছের নীচে চাপা পড়েছিলাম সেদিন থেকেই সব কিছু ভুলে ছিলাম।

সারা দিন বসে বসে অনেক কথাই টারজনের মনে পড়তে লাগল: কেন সে এ দেশে এসেছিল, কেমন করে একটা দুর্ঘটনার ফলে বাঞ্ছিত পথ ধরে সেই দেশেই সে এসে পড়েছে, আর যে দেশের মন্দিরের সন্ধানে সে একদা পথে নেমেছিল তার সন্ধানও সে পেয়ে গেছে। এ জন্য সেই দুর্ঘটনার কাছে সে চিরকৃতজ্ঞ।
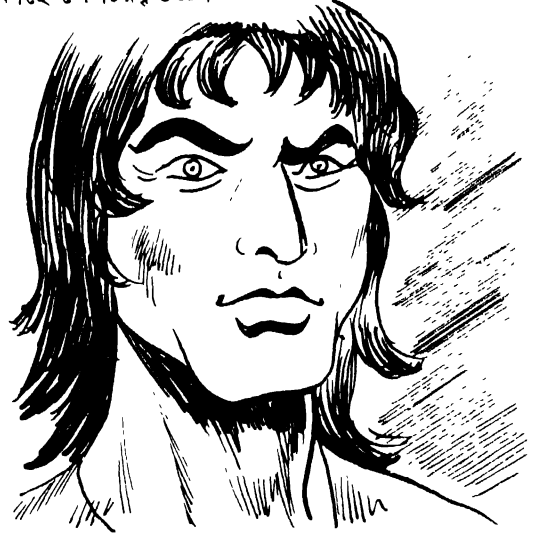
সন্ধ্যার পরে রাতের খাবার খেতে বসে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল চিতা-দেবতার মন্দিরে দেখা সাদা মানুষ ও সাদা মেয়েটির কথা। ওরাণ্ডোকে তাদের কথা জিজ্ঞাসা করলে সেও কিছুই বলতে পারল না।

টারজন অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নকিমাকে ডাকল।

কোথায় চললে? ওরাণ্ডো শুধাল।

চিতা-দেবতার মন্দিরে, টারজন জবাব দিল।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বুড়ো টাইমার সারা দিন সেখানে পড়ে রইল। না খাবার, না পানীয়। মাঝে মাঝে মন্দির-কক্ষ থেকে ভেসে আসছে মন্ত্রের শব্দ, প্রধান সন্ন্যাসীর কর্কশ কণ্ঠস্বর আর চিতাবাঘের গর্জন।

মশাল হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল এক সন্ন্যাসী। শয়তানের মত দেখতে এক বুড়ো: মুখে রং মাখানোর ফলে আরও বীভৎস দেখাচ্ছে। লোকটি টম্বাই গ্রামের ওঝা সোবিটো। উপুর হয়ে সে বুড়ো টাইমারের পায়ের বাঁধন খুলতে লাগল।

আমাকে নিয়ে তোমরা কি করবে? বুড়ো টাইমার প্রশ্ন করল।

ঠোঁট চাটতে চাটতে সোবিটো বলল, প্রথমে তোমার হাত-পা ভেঙে দেওয়া হবে; তারপর জলাভূমির উপর থেকে তোমাকে এমন ভাবে হেঁট-মুণ্ডে ঝুলিয়ে রাখা হবে যাতে তোমার নাক-মুখ জলের নীচে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে তোমার মৃত্যু না ঘটে। এই ভাবে তোমাকে তিন দিন রাখা হবে, আর তাতেই তোমার মাংস হবে নরম, সুস্বাদু।

বীভৎস-দর্শন সন্ন্যাসিনীরা তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে এমনভাবে লাফিয়ে এল বুঝি সাদা মানুষটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

সোবিটো একধাক্কায় বন্দীকে নীচু বেদীর উপর ফেলে দিয়ে টানতে টানতে প্রধান সন্ন্যাসীর সামনে নিয়ে এসে বলল, বলি এনেছি!

চিতা-দেবতাকে উদ্দেশ্য করে ইমিগেগ বলল, বলি এসে গেছে! চিতা-সন্তানদের হে পরম পিতা, এবার বল তোমার কি আদেশ?

ইমিগেগের হাতের ধারালো লাঠির খোঁচা খেয়ে পশুটার দাঁত বের করা মুখ থেকেই বেরিয়ে এল আদেশ। ওর হাত-পা ভেঙে দেওয়া হোক, আর তৃতীয় রাতে একটা ভোজের আয়োজন করা হোক!

আর বোবোলো ও সাদা সন্ন্যাসিনীর কি হবে? ইমিগেগ প্রশ্ন করল

বুড়ো টাইমার শিউরে উঠল। তিন তিন! হা ভগবান, এও কপালে ছিল!

বুড়ো টাইমারকে একটা লাথি মেরে বলল, আমার সঙ্গে এস।

অন্ধকার বারান্দা পার হয়ে তারা সেই বড় ঘরটায় হাজির হল। বন্দীকে দেখামাত্রই দেড়শ' কণ্ঠ একযোগে চীৎকার করে উঠল, চিতাবাঘ গর্জে উঠল, প্রধান সন্ন্যাসী উপরের বেদীতে নাচতে লাগল.

তাদের মন্দিরে নিয়ে আসতে সৈনিক পাঠাও। আরেকটা ভোজের জন্য তার হাত-পা ভেঙে দাও। আর সাদা মেয়েটিকে পাবে প্রধান সন্ন্যাসী ইমিগেগ। তারপর সেও ভোজে লাগবে।

ইমিগেগ চেঁচিয়ে বলল, চিতা-দেবতার বাণী শোনা হল। তার হুকুম মতই কাজ হবে।

সঙ্গে সঙ্গে আটজন সন্ন্যাসী লাফিয়ে পড়ে বন্দীকে চেপে ধরল, তাকে বেদীর উপর ছুঁড়ে

ফেলল, হাত-পা ছড়িয়ে তাকে চিং করে ধরে রাখল, আর চারজন সন্ন্যাসিনী ছুটে এল ভারী মুগুর হাতে নিয়ে।

মেঝেতে চিং করে ধরে রাখা বুড়ো টাইমারকে লক্ষ্য করে সন্ন্যাসিনীদের হাতের মুগুরগুলো একসঙ্গে উদ্যত হওয়া মাত্রই একটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ঘরের মৃত্যু-স্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রায়-নগ্নদেহ সেই দৈত্যাকার সাদা মানুষটি বানরের মত স্বচ্ছন্দ গতিতে মন্দিরের একটা থাম বেয়ে নীচে নেমে এল। এক লাফে নীচু বেদীটার উপর গিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে ও বিস্ময়ে লোকগুলো যেন হতভম্ব হয়ে পড়ল। সোবিটোর মুখেও কথা নেই। পা কাঁপছে। সে ঘোর কাটিয়ে আর্তনাদ করতে করতে বেদীর উপর থেকে সে ছুটে নীচে গেল সৈনিকদের পাশে।

বুড়ো টাইমারও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। বিচিত্র মানুষটি সোবিটোকে ধরবার চেষ্টা না করে তার কাছেই এগিয়ে এল। বলল, আমাকে অনুসরণ কর। মন্দিরের পিছন দিক দিয়ে আমি বেরিয়ে যাব। পিছনের দরজা দিয়ে দুজনই অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুহূর্তের জন্য থেমে বলল, সাদা মেয়েটি কোথায়? তাকেও সঙ্গে নিতে হবে।

বুড়ো টাইমার জবাব দিল, সে এখানে নেই; একজন সর্দার তাকে চুরি করেছে; মনে হয়, ভাটির দিকে তার গ্রামে নিয়ে গেছে।

তাহলে এই দিকে এস। টারজন তীরের মত বাঁ দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দুজন ছুটে চলল নদীর দিকে। সেখানে পৌঁছে ডোঙ্গাটা দেখিয়ে বলল, চড়ে বস। এখানে একটা ডোঙ্গাই আছে। কেউ তোমার পিছু নিতে পারবে না।

তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে না?

না। ডোঙ্গাটাকে ঠেলে দিয়ে প্রশ্ন করল, যে সর্দার মেয়েটিকে চুরি করেছে তার নাম জান?

তার নাম বোবোলো। ডোঙ্গা জলে ভাসিয়ে বুড়ো টাইমার আরও বলল, তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে পারলাম না; ইংরেজি ভাষায় সেরকম কোন শব্দ নেই।

নীরব মূর্তিটি কোন কথা বলল না। স্রোতের টানে ডোঙ্গা ভেসে চলল। বুড়ো টাইমার বৈঠা তুলে নিল হাতে। সাধ্যমত গতি বাড়াতে হবে।

ওরাণ্ডোর সৈনিকরা তাঁবুতে বসে আগুন পোয়াচ্ছে। তাদের পেট ভরা, তাই তারা খুশি। কাল দেশে ফিরে যাবে। সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে বিজয়ীর সম্বর্ধনা।

এমন সময় একটি দৈত্যাকার মূর্তি যেন বাতাস থেকে নেমে এল তাদের সামনে। সকলেই তাকে

চিনল। অরণ্যরাজ টারজন। কাঁধে হাত-পা বাঁধা একটা লোক।

কয়েকজন বলে উঠল, অরণ্যরাজ টারজন!

কেউ বলল, মুজিমো!

ওরাণ্ডো বলল, কাকে নিয়ে এসেছ?

লোকটাকে মাটিতে ফেলে টারজন বলল, তোমাদের ওঝাকে ফিরিয়ে এনেছি। ফিরিয়ে এনেছি সোবিটোকে—সে যে চিতা-দেবতার একজন সন্ন্যাসী।

মিথ্যা কথা! সোবিটো আর্তনাদ করে উঠল।

টারজন বলল, চিতা-মানুষদের মন্দিরে আমি ওকে পেয়েছি। ভাবলাম, তোমরা হয়তো তোমাদের ওঝাকে ফিরে পেতেই চাও যাতে খুব কড়া ওষুধ বানিয়ে চিতা-মানুষদের হাত থেকে সে তোমাদের রক্ষা করতে পারে।

একজন সৈনিক গর্জে উঠল, ওকে খুন কর!

সোবিটোকে খুন কর! খুন কর! চার-কুড়ি কণ্ঠ একসঙ্গে গর্জে উঠল।

টারজন বলল, তোমাদের যা ইচ্ছা হয় তাই কর। সে তো আমার ওঝা নয়। আমার অন্য কাজ আছে। আমি চলি। যদি আর দেখা না পাও তবু টারজনকে মনে রেখো; তার জন্যই সাদা মানুষদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো, কারণ টারজন তোমাদের বন্ধু, আর তোমরা তার বন্ধু।

যেমন নিঃশব্দে সে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দেই অদৃশ্য হয়ে গেল। তার সঙ্গে নকিমাও চলে গেল—চলে গেল নিয়ামওয়েগির আত্মা।

রাতের অন্ধকারে পথ চলতে চলতে এক সময় বুড়ো টাইমার একটা বড় গাছে চড়ে বসল। সেখান থেকেই পাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল—গ্রামের মাঝখানে অনেকগুলো লোক গোল হয়ে নাচছে। তারই একটু ফাঁক দিয়ে চোখ ফেলতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তাতে ভয়ে তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

হাত-পা বাঁধা একটি মেয়ে মাটিতে পড়ে আছে, আর একটি কুৎসিত মেয়েমানুষ ওয়ালালা তার উপর ঝুঁকে হাতের বড় ছুরিটা ঘোরাচ্ছে। বুড়ো টাইমারের আতংকিত দৃষ্টির সামনে মুহূর্তের মধ্যে অভিনীত হল একটা বীভৎস নির্বাক দৃশ্য: সেই কুৎসিত মেয়েমানুষটা সাদা মেয়েটির চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল, আর তার হাতের উদ্যত ছুরিটা আগুনের আলোয় ঝলসে উঠল। একটিমাত্র ছুরি ছাড়া সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও বুড়ো টাইমার ছুটে গিয়ে আসন্ন নারীহত্যার সেই দৃশ্যের সামিল হয়ে পড়ল।

তার কণ্ঠে ধ্বনিত হল রণ-হুংকার; আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা তীর এসে বিঁধল ওয়ালালার বুকে। বুড়ো টাইমারের দৃষ্টি তখন হত্যাকারীর উপরেই নিবদ্ধ; তীরটা সে দেখতে পেল; কিন্তু সে তীর কে ছুঁড়েছে—কোন বন্ধু না শত্রু, সেটা সেও যেমন বুঝতে পারল না তেমনি বামনরাও বুঝতে পারল না।

মুহূর্তের জন্য বামনরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বুড়ো টাইমার বুঝতে পারল যে তাদের এই নিষ্ক্রিয় অবস্থা বেশীক্ষণ থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে একটা চালাকি খেলে গেল তার মনে। খোলা ফটকের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, গ্রাম ঘিরে ফেল! কাউকে পালাতে দিও না! তবে আমাকে না মারলে কাউকে মেরো না! সে কথাগুলি বলল বোবোলোদের ভাষায়। কাজেই সকলেই তার কথা বুঝতে পারল। এবার তার দিকে ফিরে বলল, একপাশে সরে দাঁড়াও। সাদা মেয়েটিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। কেউ তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না।

কেউ কিছু বলার আগেই এক লাফে এগিয়ে গিয়ে সে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিল। ততক্ষণে দলের সর্দারের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেছে। তার সামনে মাত্র একটি লোক। গ্রামের বাইরে আরও লোক থাকতে পারে। কিন্তু তার সৈনিকরাও কি যুদ্ধ জানে না? লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে সে চীৎকার করে বলল, সাদা লোকটাকে মেরে ফেল!

আর একটা তীর এসে বিঁধল তার বুকে; সে মাটিতে পড়ে গেল। আর তিনটে তীর এসে পর পর তিনটে বামনকে খতম করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাকি লোকগুলো সভয়ে চীৎকার করতে করতে নিজেদের ঘরে ঢুকে গেল।

মেয়েটিকে কাঁধে ফেলে বুড়ো টাইমার বিদ্যুৎ-গতিতে ফটক পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিসের যেন একটা মড়্-মড়্ শব্দ তার কানে এল, কিন্তু সেটা কিসের শব্দ তা বুঝতে পারল না, বুঝবার চেষ্টাও করল না।

বন্দিনী সাদা মেয়েটির খোঁজে বোবোলোদের গ্রামে পৌঁছে একটা দৃশ্য দেখে টারজন অবাক হয়ে

গেল। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটি সাদা মেয়ে মাটিতে পড়ে আছে। আর তাকে ঘিরে রান্না-বান্না ও নাচ গানের মৌজ চলেছে।

এখন তার একমাত্র কাজ মেয়েটিকে উদ্ধার করা। মাটিতে নেমে বেড়া টপকে সে গ্রামের ভিতরে ঢুকল পিছন দিক দিয়ে; তারপর কাছেই একটা গাছে চড়ে লুকিয়ে সব দেখতে লাগল। আর ঠিক তখনই একটি কুৎসিত বুড়ি মেয়েটির চুলের মুঠি ধরে হাতের ছুরিটা তুলল তার গলায় বসিয়ে দিতে।

মুহূর্তমাত্র সময় নেই; টারজন সঙ্গে সঙ্গে ধনুকে তীর ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ফটকের দিকে হুংকার দিয়ে ছুটে এল একটি সাদা মানুষ। বুঝতে পারল, মেয়েটিকে উদ্ধার করতেই সে এসেছে। তারপরের ঘটনা তো সকলেরই জানা।

টারজন গাছ থেকে নামবার আগেই যে ডালে সে দাঁড়িয়ে ছিল সেটা সশব্দে ভেঙে পড়ল। সেই সঙ্গে টারজনও মাটিতে ছিটকে পড়ল। তার জ্ঞান হারিয়ে গেল। আবার জ্ঞান ফিরে আসতে দেখল, তার শরীরের উপর চেপে বসে বামনরা তার হাত-পাকে বেশ শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে। টারজন একবার আড়মোড়া ভাঙতেই বামনরা চারদিকে ছিটকে পড়ে গেল, কিন্তু তার হাত-পায়ের বাঁধন ছিঁড়ল না। সে বুঝল, একদল নির্মম, নিষ্ঠুর মানুষের হাতে সে বন্দী হয়েছে।

আত্মরক্ষা ও ফটক রক্ষার যথেষ্ট আয়োজন করা সত্ত্বেও বামনরা ভীষণ ভয় পেয়েছে। তাদের সর্দার মরেছে; মুখের গ্রাস সাদা মেয়েটা উধাও হয়েছে; দৈত্যের মত একটা সাদা মানুষ আকাশ থেকে নেমে এসে তাদের হাতে বন্দী হয়েছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এতগুলি ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তারা বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

দূর থেকে ভেসে আসা এ ধরনের রহস্যময়, ভয়-জাগানো ডাক তারা আগেও শুনেছে, কিন্তু আগে কখনও গ্রামের এত কাছ থেকে শোনে নি; এ যে প্রায় গ্রামের মধ্যে।

যে দুটি বামন বন্দী দৈত্যটির পাহারায় ছিল তারাই ছুটতে ছুটতে এসে জানাল, শব্দটা এসেছে তাদেরই ফাঁকা ঘরটার ভিতর থেকে। তাদের চোখ বিস্ফারিত, শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, যাকে আমরা বন্দী করেছি সে মানুষ নয়, একটা দৈত্য। শোন নি তার হুংকার?

এদিকে বামনদের নতুন সর্দার নিয়ালওয়া দলবল নিয়ে টারজনের ঘরটাকে ঘিরে দাঁড়াল। সকলেরই হাতে বিষ-মাখানো তীর ও বর্শা। নিয়ালওয়ার সংকেত পেলেই সেই সব ছোঁড়া হবে। টারজনের জীবন মুহূর্তকালের সুতোয় ঝুলছে। এমন সময় বেড়ার ওপাশ থেকে ভেসে এল অনেক ক্রুদ্ধ কণ্ঠের গর্জন। নিয়ালওয়ার মুখের হুকুম তার

এই সব ভাবতে ভাবতেই নীচের গ্রাম থেকে একটা অদ্ভুত হুংকার তাদের কানে এসে লাগল। ওটা কিসের শব্দ ভাল করে বুঝতে না পেরে আদিবাসীরাও ভয়ে আঁতকে উঠল। জঙ্গলের অন্ধকারে অনেক

ঠোঁটে এসেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

চীৎকার করে সে বলে উঠল, ও কি?

বেড়ার দিকে তাকিয়ে বামনরা সভয়ে দেখল, কালো কালো সব মূর্তি বেড়া ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকছে। সকলেই একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল, দৈত্যরা আসছে।

আর একজন চেঁচিয়ে বলল, ওরা সব জঙ্গলের লোমশ মানুষের দল।

হাতের বর্শা ছুঁড়ে ফেলে বামনরা পালাতে লাগল। একটা বাড়ির ছাদে উঠে নকিমা চেঁচাতে শুরু করে দিল, এই পথে জু-টো! গোমাঙ্গানির বাসায় এখানেই আছে অরণ্যরাজ টারজন।

একটা প্রকাণ্ড থল্‌থলে মূর্তি সেই বাড়িটার দিকে দুলে দুলে এগোতে লাগল। যেমন চওড়া তার কাঁধ, তেমনি লম্বা তার হাত। তার পিছু নিল আধ ডজন মস্ত বড় বড় গোরিলা।

টারজন ডাক দিয়ে বলল, এখানে! টারজন এখানে আছে জু-টো!

বড় গোরিলাটা নীচু হয়ে দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাল। তার ভিতর দিয়ে তার প্রকাণ্ড শরীরটা ঢুকল না। দুই হাত দিয়ে দরজার চৌ-কাঠ ধরে গোটা বাড়িটাকেই মাটি থেকে তুলে নিজের পিঠের উপরে আছড়ে ভেঙে ফেলল।

টারজন হুকুম করল, আমাকে জঙ্গলে নিয়ে চল্।

জু-টো তাকে কোলে করে বেড়ার কাছে নিয়ে গেল। রাগে গর-গর্ করতে করতে অন্য গোরিলারাও তাকে অনুসরণ করল। মানুষের গন্ধ তাদের ভাল লাগছে না। তারা যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। মুহূর্তকাল পরেই তারা জঙ্গলের ঘন অন্ধকারে মিশে গেল।

বুড়ো টাইমার ও মেয়েটি নিঃশব্দে অনেকটা পথ হাঁটল। কারও মুখে কথা নেই। থম্‌থমে ভাব। কালি বাওয়ানা হাঁটছে একটু পিছনে থেকে। বারবার সে লোকটিকে দেখছে। কি যেন গভীর চিন্তায় সে মগ্ন।

একটা খোলা জায়গায় পৌঁছে বুড়ো টাইমার

থামল। পাশেই নদী। নদীর তীরে একটা বড় গাছ। বলল, এখানেই আমরা বিশ্রাম নেব।

মেয়েটি কিছুই বলল না।

গাছের ডালপালা ও পাতা দিয়ে একটা আস্তানা বানাতে শুরু করে দিল বুড়ো টাইমার। তা দেখে কালি বাওয়ানাও সে কাজে হাত লাগাল। কাজ হয়ে গেলে দুজনে মিলে শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বালাল। কারও মুখে কথা নেই।

এক সময় জঙ্গলের দিকে চোখ পড়তেই মেয়েটি চীৎকার করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

হা ঈশ্বর! দেখ! দেখ!

চীৎকার শুনেই লোকটিও চোখ তুলে তাকাল। পরক্ষণে সেও লাফিয়ে উঠে বলল, পালাও! ঈশ্বরের দোহাই কালি, পালাও! মেয়েটি কিন্তু পালাল না। ছোট লাঠিটা হাতে নিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। একটা বড় মুগুর হাতে নিয়ে লোকটিও অপেক্ষা করতে লাগল।

অদ্ভুত ভঙ্গীতে দুলতে দুলতে তাদের দিকে এগিয়ে এল একটা প্রকাণ্ড গোরিলা। এতবড় গোরিলা বুড়ো টাইমার আগে কখনও দেখে নি। মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে মিনতিভরা গলায় বলল, কালি, দয়া করে পালাও। ঐ জন্তুটাকে আমি কিছুক্ষণ আটকে রাখতে হয়তো পারবো, কিন্তু ওকে থামাতে পারব না। তুমি কি বুঝতে পারছ না কালি যে ও তোমাকেই চাইছে? মেয়েটি তবু নড়ল না। গোরিলাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। দোহাই তোমার! লোকটি আবার মিনতি জানাল।

আঘাতের জের কাটিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটি বুঝল সে একেবারে একা; বুড়ো টাইমার ও জন্তুটা উধাও। চেঁচিয়ে ডাকল; কোন সাড়া নেই। ভাবল, তাকে খুঁজতে যাবে, কিন্তু তারা কোন্ পথে গেছে তাই তো সে জানে না। তাহলে? এই প্রথম কালি বাওয়ানার মনে একটা নতুন অনুভূতি জাগল। এই মানুষটি তো তারই মানুষ। সেই তো তাকে ডেকেছিল—আমার কালি।

মেয়েটি বলল, আমি যখন বিপদে পড়েছিলাম তখন তুমি তো পালিয়ে যাও নি।

লোকটি কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই গোরিলাটা আক্রমণ করে বসল। বুড়ো টাইমার মুগুর দিয়ে তাকে আঘাত করল; মেয়েটিও আঘাত করতে লাগল। সব বৃথা! জন্তুটা বুড়ো টাইমারের হাত থেকে মুগুরটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর অন্য হাতে আঘাত করল কালি বাওয়ানাকে; মেয়েটির মাথা ঘুরতে লাগল। গোরিলাটা মুহূর্তের মধ্যে বুড়ো টাইমারকে একটা ভাঙ্গা পুতুলের মত তুলে নিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল।

অরণ্যরাজ টারজন ভাগ্যের হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। হাতপায়ের যে বন্ধন আছেতো তাকে ছিন্ন করার ব্যর্থ চেষ্টায় সে শক্তিক্ষয় করে নি, আবার অকারণ অনুশোচনার গ্লানিও ভোগ করে নি। সে চুপচাপ শুয়ে থাকে। নকিমাও মন-মরা হয়ে তার পাশেই বসে থাকে।

বেলা পড়ে আসছে। এমন সময় কার যেন পদধ্বনি টারজনের কানে এল। নকিমা বা বড় গোরিলা সে শব্দ শোনার আগেই সে শুনতে পেল; সঙ্গে সঙ্গে গর্-র্, গর্-র্ শব্দ করে সে সকলকে সজাগ করে দিল। লোমশ জন্তুগুলো কান খাড়া করল। মেয়ে জন্তুগুলোও এসে হাজির হল।

একটা প্রকাণ্ড মূর্তি হেলে-দুলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। সে গা-ইয়াট। তার এক বগলে একটা মানুষ।

বুড়ো টাইমারকে নিয়ে গা-ইয়াট টারজনের সামনে মাটিতে নামিয়ে দিল। বলল, আমি গা-ইয়াট। এই নাও একটা টার্মাঙ্গানি। কোন গোমাঙ্গানির দেখা পেলাম না।

গোরিলারা ক্রমেই বুড়ো টাইমারের কাছাকাছি আসতে লাগল। গোরিলাদের এত বড় দল সে আগে কখনও দেখে নি, গোরিলা যে এত বড় হয় তাও সে জানত না। হয়তো এগুলো গোরিলাই নয়; এরা গোরিলার চাইতে অনেক বেশী মানুষের মত দেখতে। আদিবাসীরা এই সব লোমশ মানুষদের কথা বলে বটে, কিন্তু সে সব গল্প বিশ্বাস করত না। সে আরও দেখল, হাত-পা বাঁধা একটি অসহায় সাদা মানুষ গোরিলাদের মাঝখানে শুয়ে আছে। প্রথমে সে তাকে চিনতে পারে নি। ভাবল, সেও হয়তো এই সব বন-মানুষদের হাতে বন্দী। বন-মানুষটা যে কালির বদলে তাকে ধরে এনেছে সে জন্য সে কৃতজ্ঞ। বেচারী কালি! না জানি তার কপালে কি ঘটেছে!

গোরিলারা বুড়ো টাইমারকে ঘিরে ধরেছে। তাদের উদ্দেশ্যও স্পষ্ট। সে বেশ বুঝল, তার শেষের দিন সমাগত। তার পরই—কী আশ্চর্য! পাশেই মানুষটি গর্জন করে উঠল; ঠোঁট উল্টে যাওয়ায় তার ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল। বলল, সাবধান! এই টার্মাঙ্গানি টারজনের সম্পত্তি; কেউ তার কোন ক্ষতি করো না।

গা-ইয়াট ও জু-টো ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্য সব গোরিলাদের তাড়িয়ে দিল। বুড়ো টাইমার অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। টারজনের কথা সে বুঝতে পারে নি; সে যে গোরিলাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে এটা তার বিশ্বাস হয় না; কিন্তু নিজের চোখকে সে অবিশ্বাস করবে কেমন করে?

গম্ভীর নীচু গলায় ইংরেজি ভাষায় কে যেন বলে উঠল, এক বিপদ পার হয়ে আসার সঙ্গে

সঙ্গেই তুমি আর এক বিপদে পড়েছ।

বুড়ো টাইমার বক্তার দিকে ফিরে তাকাল। গলাটা যেন চেনা-চেনা লাগছে। এতক্ষণে চিনতে পেরেই সোল্লাসে বলে উঠল, তুমিই তো আমাকে মন্দিরের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলে!

আর এখন আমিই পড়েছি বিপদে, টারজন বলল।

বুড়ো টাইমার বলল, বিপদ তো দুজনেরই। ওরা আমাদের নিয়ে কি করবে বলে তোমার ধারণা?

কিছুই করবে না, টারজন বলল।

তাহলে আমাকে এখানে এনেছ কেন?

টারজন বলল, আমিই ওদের বলেছিলাম একটি মানুষকে ধরে আনতে। ঘটনাক্রমে তোমাকেই সে প্রথম দেখতে পেয়েছিল:

ওই জানোয়ারটাকে তুমি পাঠিয়েছিলে? তুমি যা বল তাই ওরা করে? তুমি কে? আর কেনই বা একটা মানুষকে আনতে ওকে পাঠিয়েছিলে?

আমি অরণ্যরাজ টারজন। আমার হাত-পায়ের এই তারের বাঁধনগুলি খুলতে পারে এরকম এক-জনকে আমার প্রয়োজন। এই সব গোরিলা বা নকিমাকে দিয়ে সে কাজটা হয় নি।

বুড়ো টাইমার বলে উঠল, তুমিই অরণ্যরাজ টারজন! আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আদিবাসী-দের উপকথার এক নায়ক। বলতে বলতেই সে অতি সহজে টারজনের হাত-পায়ের তামার তারের বাঁধন খুলতে লাগল।

টারজন শুধাল, সেই সাদা মেয়েটির কি হল? তুমি তো তাকে নিয়ে বামনদের গাঁ থেকে বেরিয়ে গেলে, কিন্তু আমি পারলাম না, বেঁটে শয়তানরা আমাকে আটক করল।

তুমি সেখানে ছিলে! ওহো, এবার বুঝতে পেরেছি; তুমিই তীরগুলি ছুঁড়েছিলে।

হ্যাঁ।

তারা তোমাকে ধরল কেমন করে, আর তুমি ছাড়াই বা পেলে কেমন করে?

আমি ছিলাম একটা গাছের উপরে। ডালটা ভেঙে পড়ল। মুহূর্তের জন্য আমি জ্ঞান হারিয়ে-ছিলাম। সেই সুযোগে তারা আমাকে বেঁধে ফেলে।

ঠিক বটে। গ্রাম ছেড়ে আসার সময় একটা মড়-মড় শব্দ শুনেছিলাম।

টারজন বলল, নিঃসন্দেহে বড় গোরিলাদের আমি ডেকেছিলাম, আর তারাই গিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে এসেছে। ভাল কথা, সাদা মেয়েটি কোথায়?

আমরা দুজন শিবিরের দিকেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় গোরিলাটা আমাকে পাকড়াও করল, বুড়ো টাইমার বলল। সেখানে, সে এখন একা রয়েছে। তার খুলে দেবার পরে আমি তার কাছে ফিরে যেতে পারব তো?

আমিও তোমার সঙ্গে যাব। জায়গাটা কোথায়? চিনতে পারবে তো?

বেশী দূর নয়, কয়েক মাইলের বেশী হবে না; তবু খুঁজে নাও পেতে পারি।

আমি পারব, টারজন বলল।

কেমন করে? বুড়ো টাইমার শুধাল।

গা-ইয়াটের পায়ের ছাপ দেখে; সেটা এখনও স্পষ্টই আছে।

বুড়ো টাইমার তখন টারজনের কব্জির তার খুলে গোড়ালির তার খুলতে ব্যস্ত। একমুহূর্ত পরেই টারজনের বন্ধন-মুক্তি ঘটল। একলাফে সে উঠে দাঁড়াল।

চলে এস! গা-ইয়াট যেখানে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই দিকটা দেখিয়ে টারজন জোর কদমে ছুটল।

বুড়ো টাইমার তার সঙ্গে সমান তালে ছুটতে পারল না; ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। বলল, তুমি এগিয়ে যাও। তোমার সঙ্গে সমান গতিতে আমি ছুটতে পারছি না। কিন্তু সময় নষ্ট করা চলবে না। মেয়েটি সেখানে একা রয়েছে।

টারজন আপত্তি জানিয়ে বলল, একা রেখে গেলে তুমি পথ হারিয়ে ফেলবে। দাঁড়াও ব্যবস্থা

করছি। নকিমাকে ডাকতেই সে গাছ থেকে লাফ দিয়ে টারজনের কাঁধে এসে বসল। টারজন বলল, তুমি টার্মাঙ্গানির কাছে থাক। ওকে পথ দেখিয়ে আমার পিছু পিছু নিয়ে এস।

তুজনকে আলাপ করতে দেখে বুড়ো টাইমার তো অবাক। মানুষ আর বানরে কথা বলছে, এ যে অবিশ্বাস্য অথচ যা সে চোখে দেখছে, কানে শুনছে তাতো মায়া নয়, খাঁটি সত্য ঘটনা।

অসহায় সংকটে পড়ে কালি বাওয়ানা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়ল। লোকটি যখন বামনদের হাত থেকে উদ্ধার করে আনল তখন তবু তার মনে কিছুটা স্বস্তির ভাব এসেছিল; তার সঙ্গে তুলনায় এখন তার পরিস্থিতি আরও অসহ্য মনে হতে লাগল। পরন্তু, বিপদের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে ব্যক্তিগত তুঃখ।

বুড়ো টাইমার যে অস্থায়ী আস্তানাটা তার জন্য বানিয়েছিল সে দিকে তাকিয়ে মেয়েটির তুই গাল বেয়ে চোখের জল ঝরতে লাগল। তার হাতের তৈরী ধনুকটা তুলে তাতে ঠোঁট তুটি ছোয়াল। আর কোনদিন তার সঙ্গে দেখা হবে না। এ-কথা ভাবতেই অবরুদ্ধ কান্নায় তার গলা আটকে এল। অনেক—অনেক দিন সে কাঁদে নি। সাহসের সঙ্গে কত তুঃখ, তুর্দশা ও বিপদের মোকাবিলা করেছে; কিন্তু এখন আস্তানার ভিতরে ঢুকে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সব কিছুই কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে। জেরির সন্ধান ব্যর্থ হয়েছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মানুষ তার সঙ্গে জড়িয়ে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে গেছে। তুঃখে ও অনুশোচনায় এখন তারই মূল্য তাকে শুধতে হচ্ছে।

বেশ কিছু সময় সেখানে শুয়ে হা-হুতাশ করল। তারপর এক সময় বুঝল এতে কোন ফল হবে না। হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। এই শেষ আঘাতের পরেও থেমে যাওয়া চলবে না। এখনও সে বেঁচে আছে, অথচ জেরিকে খুঁজে পায় নি। তাকে এগিয়ে যেতে হবে। নদীতে পৌঁছতে হবে। যেমন করে

হোক নদী পার হতে হবে। বুড়ো টাইমারের শিবির খুঁজে বের করতে হবে। তার অংশীদারটির সাহায্য নিতে হবে কিন্তু তার জন্য তো খাদ্য চাই; বলকারক মাংস চাই। এই তুর্বল দেহ নিয়ে সে তো চলতে পারবে না। যে ধনুক সে তৈরী করে রেখে গেছে সেটার সাহায্যেই তাকে মাংসের ব্যবস্থা করতে হবে। তীরগুলি নিতে সে বাইরে বেরিয়ে এল। এখনও শিকারের সময় পার হয়ে যায় নি।

ঘর থেকে বেরিয়েই সে চমকে উঠল। ওটা কি? মনে মনে এই ভয়ই সে করছিল। জঙ্গলের কাছে দাঁড়িয়ে একটা চিতাবাঘ তার দিকেই তাকিয়ে আছে। চিতার হলুদে চোখ তুটি তার উপর পড়তেই তার পেটটা মাটিতে নেমে গেল, বিকৃত মুখে একটা ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ শব্দ হতে লাগল। জন্তুটা গুঁড়ি-মেরে তার দিকেই এগিয়ে আসছে; লেজটা বেঁকে বেঁকে নড়ছে।

ক্রমেই কাছে আসছে—আরও কাছে। মেয়েটি ধনুকে তীর লাগাল। এ চেষ্টা বৃথা তা সে জানে। একটা বিধ্বংসী কামানকে এত ছোট একটা গুলিতে বিদ্ধ করা যাবে না। তবু শেষ চেষ্টা করতেই হবে।

চিতাটা এগিয়ে আসছে। এখন শুধু লাফিয়ে পড়ার অপেক্ষা। এমন সময় মেয়েটি দেখল, চিতাটার ঠিক পিছনে একটি মনুষ্য-মূর্তি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল—একটি দৈত্যাকার সাদা মানুষ, শুধুমাত্র কটিবস্ত্র পরিহিত।

কোন রকম ইতস্তত না করে লোকটি ছুটে আসছে চিতাটাকে লক্ষ্য করে। নরম ঘাসের উপর তার পায়ের কোন শব্দও হচ্ছে না। হঠাৎ মেয়েটি সভয়ে লক্ষ্য করল, লোকটি নিরস্ত্র।

চিতা শরীরটাকে মাটি থেকে একটুখানি তুলল। পিছনের পা দুটি শরীরের নীচে টেনে আনল। এবার একটা লাফ। বাস, তাহলেই মেয়েটির ভব-লীলা সাঙ্গ। ঠিক তখনই লোকটি যেন বাতাসে ভেসে এসে জন্তুটার পিঠের উপর চেপে বসল।

তারপর যা ঘটল সে অবিশ্বাস্য ঘটনা। দাগ-দাগ চামড়া ও বাদামী চামড়া, হাত ও পা, নখর ও দাঁতের অতি দ্রুত ওলোট-পালোট ও জড়াজড়ি; আর সে সব কিছুকে ছাপিয়ে শোনা যেতে লাগল দুটি রক্তপাগল জন্তুর বীভৎস চীৎকার।

জড়াজড়ি করতে করতে মানুষটি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। পিছন থেকে চিতাটার গলা পেঁচিয়ে ধরে সেটাকেও টেনে তুলল। সেই মৃত্যু-মুষ্টি থেকে নিজেকে ছাড়াতে জন্তুটা আপ্রাণ চেষ্টা করছে; কিন্তু তার গলা দিয়ে এখন আর স্বর বেরুচ্ছে না। ধীরে ধীরে জন্তুটার দেহ শান্ত হয়ে এল। তখন চিতাটার গলাটা মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলে লোকটি তার মৃতদেহ-টাকে মাটিতে ফেলে দিল। মুহূর্তের জন্য লোকটি তার উপর পা রেখে দাঁড়াল। গোরিলার বিজয়-চীৎকারে সারা বনভূমি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

কালি বাওয়ানা শিউরে উঠল। তার শরীরের ভিতরটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। একবার ভাবল এই জংলী মানুষটার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু তখনই সে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল; পালাবার সুযোগই হল না। ভাবল, তীর-ধনুক তো হাতেই আছে; কিন্তু তা দিয়ে কি এই মানুষটাকে ভয় দেখানো যাবে!

লোকটি কিন্তু সহজভাবেই বলল, ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। তোমার বন্ধুটিও এখনই এসে পড়বে; একটু থেমে বলল, ধনুকটা নামিয়ে রাখ, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।

ধনুকটা পাশে রেখে মেয়েটি বলল, আমার বন্ধু! কে? তুমি কার কথা বলছ?

নাম তো জানি না। তোমার কি অনেক বন্ধু আছে?

বন্ধু তো একজনই আছে। কিন্তু আমি তো ভেবেছি সে মারা গেছে। একটা মস্ত গোরিলা তাকে তুলে নিয়ে গেছে।

টারজন আশ্বাস দিয়ে বলল, সে ভালই আছে। এখনই আসবে।

কালি বাওয়ানা মাটিতে বসে পড়ল। অস্ফুট স্বরে বলল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

বুকের উপর দুই হাত রেখে টারজন মেয়েটিকে দেখছে। কী সুন্দর দেখতে! এই নরম শরীরে এত কষ্ট সে সহ্য করেছে? অরণ্যরাজ সাহসের প্রশংসা করে; সে জানে, যে বিপদের ভিতর দিয়ে

মেয়েটি এসেছে তাতে কতখানি সাহস থাকা দরকার।

কার যেন পায়ের শব্দ কানে এল। টারজন বুঝতে পারল। পরিশ্রমের ফলে লোকটি হাঁপাচ্ছে। মেয়েটিকে দেখেই ছুটে গিয়ে বলে উঠল, তুমি ভাল আছ? মরা চিতাটা তার পাশেই পড়ে আছে।

হ্যাঁ, মেয়েটি জবাব দিল।

দুজনই কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কার মনে কি আছে তা কেউ জানে না। লোকটিকে নিরাপদ দেখে মেয়েটি তার মনের ভাবটা চেপেই রাখল। আবার ওদিকে বুড়ো টাইমারের কানে তখনও বাজছে কালি বাওয়ানার সেই কঠোর উক্তি, আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

টারজন বলল, তাদের দুজনকে সে বুড়ো টাইমারের শিবিরে পৌঁছে দিতে পারে, অথবা নদীর ভাটিতে প্রথম থানায় তাদের রেখে আসতে পারে। মেয়েটি কিন্তু জিদ ধরল, সে শিবিরেই ফিরে যাবে; তারপর সেখান থেকে নতুন করে যাত্রার আয়োজন করবে; তখন বুড়ো টাইমার তার সঙ্গে নদীর ভাটিতেও যেতে পারে, অথবা জেবি জেরোমের অনুসন্ধানে তার সঙ্গীও হতে পারে।

রাত হবার আগেই টারজন মাংস নিয়ে ফিরে এল। দুজনে সেই মাংস রান্না করতে বসল, আর টারজন একটু দূরে বসে শক্ত সাদা হাত দিয়ে কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। তার কাঁধে বসে ছোট্ট নকিমা ঘুমে ঢুলতে লাগল।

পশ্চিম অরণ্যের ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বোবোলোর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বড় নদীটার খরস্রোতে তার আলো পড়ে ঝিলমিল করছে। একটি পুরুষ ও একটি নারী সেই স্রোতধারার দিকে তাকিয়ে আছে। এই অন্ধকার গহন অরণ্য তার সভ্য জগতের মধ্যে এই নদীই একমাত্র যোগসূত্র; অনেক নগর, বন্দর পার হয়ে সে দীর্ঘ যাত্রায় চলেছে পশ্চিম দিকে সাগরের ডাকে।

লোকটি বলল, কালই আমরা যাত্রা করব। ছয় বা আট সপ্তাহের মধ্যেই তোমরা দুজন বাড়ি পৌঁছে যাবে। 'বাড়ি' এই একটি মাত্র ছোট শব্দের মধ্যে কত না ইচ্ছাপূরণের আনন্দ লুকিয়ে আছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটি বলল, তোমাদের দুজনের জন্য আমার কত আনন্দ।

মেয়েটি আরও কাছে এসে তার মুখোমুখি দাঁড়াল। চোখে চোখ রেখে বলল, তুমিও তো আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছ?

এ কথা কেন ভাবছ? লোকটি শুধাল।

যেহেতু আমি তোমাকে ভালবাসি, তাই তুমি যাবে।

সেদিন সাইগন নামে একটা মালবাহী ছোট জাহাজ আমেরিকায় যাবার পথে জীবজন্তু বোঝাই-এর জন্য অপেক্ষা করছিল মোম্বাসা বন্দরে। ডেকের ভিতর থেকে সিংহ, হাতি, হায়েনা প্রভৃতি বিভিন্ন জীবজন্তুর বিচিত্র ক্ষুব্ধ ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

জাহাজের রেলিংয়ের ধারে দুজন লোক কথা বলছিল। তাদের মধ্যে একজন বলছিল, জাহাজ ছাড়ার জন্য আমরা প্রায় প্রস্তুত। প্রতিদিন আমার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। যদি তাকে ধরতে পার তাহলেও তাকে আনতে এক মাস লেগে যাবে।

আবদুল্লা আবু নেজিম বলল, শোন ক্রাউজ সাহেব, এ কাজ আমি পারবই। সে এখন নদালোদের দেশেই আছে। ফলে তাকে ধরা সহজ হবে। তার কথাটা একবার ভেবে দেখ সাহেব। একটা আসল বন্য লোক, ছোট থেকে বাঁদরদের কাছে মানুষ হয়েছে। সে কত সিংহ মেরেছে, বুনো হাতিরা তার খেলার সাথী। তুমি জাহাজে বোঝাই করে যত জীবজন্তু নাসারায় নিয়ে যাবে, তার একার দাম হবে সেই সব জীবজন্তুর থেকে বেশী। তার থেকে তুমি ধনী হয়ে উঠবে সাহেব।

পরদিন সকাল থেকে আবহাওয়াটা ভালই ছিল। অনুকূল বাতাসে সাইগন জাহাজটা ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে উত্তর-পূর্বদিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ডেকের উপর জন্তু-জানোয়ারগুলো শান্ত ও নীরব হয়েই ছিল। মাদুরঢাকা কাঠের বিরাট খাঁচাটা থেকে বন্য লোকটির কোন সাড়া শব্দ আসছিল না।

জেনেত্তে লাঁও নামে মহিলাটি ক্রাউজের সঙ্গে ডেকের উপর এসে হাজির হলো।

সাইগনের দু নম্বর মেট উইলহেম স্মিৎস রেলিং-এর ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল আধখোলা চোখে।

মহিলাটি তাকে বলল, বন্য লোকটাকে দেখতে পারি ?

স্নিৎস বলল, মনে হয় লোকটা এখনো বেঁচেই আছে। গতকাল জাহাজে তোলার সময় লোকটাকে প্রচুর মারা হয়েছে। আবদুল্লা আমাকে যা বলল তাতে বোঝা গেল লোকটাকে পোষ মানানো কষ্টকর হবে। চল, লোকটাকে দেখে আসি।

এই বলে সে জাহাজের লস্কর নাবিককে ডেকে বলল, খাঁচা থেকে মাদুরটা সরাও।

খাঁচার উপর থেকে যখন মাদুরটা সরাচ্ছিল তখন স্নিৎস এসে ক্রাউজকে জিজ্ঞাসা করল, খাঁচার ভিতরে কি আছে মিস্টার ক্রাউজ ?

একটা বুনো লোক।

খাঁচার উপর থেকে মাদুরের ঢাকনাটা সরাতেই খাঁচার ভিতরে দৈত্যাকার একটা লোককে দেখা গেল। লোকটা তাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল।

মেয়েটি বলল, লোকটা ত শ্বেতাঙ্গ।

ক্রাউজ বলল, হ্যাঁ তাই।

তুমি পশুর মত একটা লোককে খাঁচায় ভরে রাখবে ?

লোকটা ইংরেজ।

স্নিৎস কথাটা শুনে ঘৃণাভরে থুথু ফেলল খাঁচার ভিতরে।

জেনেত্তে রাগের সঙ্গে পা ঠুঁকে বলল, এমন কাজ কখনো করো না।

ক্রাউজ চড়া গলায় বলল, তোমার তাতে কি ? আমি বলেছি না লোকটা একটা নোংরা ইংরেজ শুয়োর।

লোকটা একজন মানুষ এবং শ্বেতাঙ্গ।

লোকটা মানুষের একটা মূর্তিমাত্র। কোন একটা কথাও বলতে বা বুঝতে পারে না। একজন জার্মান তার উপর থুথু ফেলেছে এটা তার পক্ষে সম্মানের কথা।

তা হলেও স্নিৎসকে এ কাজ আর কখনো করতে দেব না।

ঘণ্টা বাজতেই তার কাজে চলে গেল স্নিৎস। তার পিছন পানে তাকিয়ে জেনেত্তে বলল, লোকটা একটা শুয়োর।

এই সময় হ্যান্স ড গ্রাত্তে নামে এক ওলন্দাজ নাবিক এসে দাঁড়াল তাদের কাছে। হ্যান্স কুড়ি বাইশ বছরের এক সুদর্শন যুবক। ও হলো জাহাজের প্রথম মেট। স্নিৎস তাকে হিংসা করে।

জাহাজের ক্যাপ্টেন লার্সেল তখন প্রবল জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়েছিল তার কেবিনে। ক্রাউজ জাহাজটা ভাড়া করলেও ক্যাপ্টেন লার্সেল তার সঙ্গে কথা বলত না। নাবিকদের বেশীরভাগ ছিল লস্কর আর চীনা। তাদের মধ্যে প্রায়ই ছুরি মারামারি চলত। সে তুলনায় ডেকের ভিতরে বন্দী পশুগুলো ছিল বেশ শান্ত।

হ্যান্স খাঁচাটার দিকে তাকিয়েই বলে উঠল, লোকটা শ্বেতাঙ্গ! ওকে বনের পশুর মত এভাবে আটকে রাখতে পারেন না।

জেনেত্তের মত সেও প্রতিবাদ করল।

ক্রাউজ সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি তাই করব। আমি কি করি না করি সেটা তোমাদের কাউকে দেখতে হবে না।

কথাটা বলার সময় জেনেত্তের উপর কটাক্ষপাত করল ক্রাউজ।

হ্যান্স বলল, অন্ততঃ ওর হাতদুটোর বাঁধন

খুলে দিন। এইভাবে বেঁধে রাখাটা এক অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা।

ক্রাউজ বলল, আমি ওর হাতের বাঁধন খুলে দিতে পারি যদি কেউ একটা লোহার খাঁচা এনে দিতে পারে এখানে। এই অবস্থায় ওকে খাওয়ানো একটা কঠিন কাজ।

জেনেত্তে বলল, গতকাল থেকে কোন খাদ্য বা পানীয় পেটে পড়েনি ওর। ও যেই হোক, তুমি একটা অসহায় মানুষেব উপর যে ব্যবহার করছ আমি একটা কুকুরের সঙ্গেও তা করব না।

এমন সময় পিছন থেকে আবদুল্লা এসে বলল, লোকটা কুকুরের থেকেও হীন।

এই বলে খাঁচার কাছে গিয়ে থুথু ফেলল সে। সঙ্গে সঙ্গে তার গালেব উপর জোরে একটা চড় বসিয়ে দিল জেনেত্তে। আবদুল্লা রাগেব মাথায় তাব ছোরাটা বার করতে যেতেই হ্যান্স ছুটে এসে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আবদুল্লার হাতটা ধরে ফেলল।

ক্রাউজ বলল, এটা তোমার করা উচিত হয়নি জেনেত্তে।

আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছিল জেনেত্তের চোখ থেকে। আমি লোকটাকে এভাবে অপমান করতে কিছুতেই দেব না।

হ্যান্স বলল, আর আমি ওকে সাহায্য করব এ বিষয়ে। আপনি ওকে খাঁচায় ভরে রাখবেন কিনা তা দেখতে যাব না। কিন্তু ওব সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছেন কি না সেটা অবশ্যই আমি দেখব।

ক্রাউজ জোর গলায় বলল, কি করতে চাও তোমরা?

হ্যান্স বলল, প্রথমে তোমাকে মেরে ফাটিয়ে দেব, তাবপর যে বন্দরে আমাদের জাহাজ থামবে সেখানকার কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেব তোমায়।

জেনেত্তে বলল, লোহাব খাঁচা এসে গেছে। ওকে ওটাব মধ্যে ঢুকিয়ে ওর হাতের বাঁধন খুলে দাও।

হ্যান্স কর্তৃপক্ষের হাতে তাকে তুলে দেবার কথা বলায় ভয় পেয়ে গেল ক্রাউজ। তাই সে তার সুরটা নরম কবে বলল, ঠিক আছে, ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহাবই আমি করব। ওব পিছনে অনেক টাকা

ঢেলেছি আমি। ওব সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করাটা বোকামি হবে আমার পক্ষে।

একটা বড় লোহাব খাঁচা কাঠেব খাঁচাটাব পাশে এনে রাখা হল। ক্রাউজ হাতে একটা রিভলবার নিয়ে খাঁচাব ভিতরকাব লোকটাকে বলল, এই খাঁচাটায় ঢুকে পড। বোকা বোবা কোথাকার।

কিন্তু লোকটা ক্রাউজের দিকে একবার তাকালও না।

ক্রাউজ তাব লোকদেব বলল, একটা বড় এনে ওকে খুঁচিয়ে দাও।

জেনেত্তে বলল, আমাকে দেখতে দাও।

এই বলে সে খাঁচাব কাছে গিয়ে বলতেই ভিতরের লোকটা কাঠের খাঁচা থেকে গুড়ি মেরে লোহার খাঁচায় এসে ঢুকল। হ্যান্সের কাছ থেকে ছুরিটা নিয়ে সে লোকটার হাতের বাঁধনটা কেটে দিল।

মুখে কোন কথা না বললেও নীরবে মুখটা তুলে দৃষ্টির মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানাল জেনেত্তের প্রতি।

হ্যান্স জেনেত্তের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, লোকটির চেহারাটা এক সত্যিকারের পুরুষের মত।

জেনেত্তে বলল, আবার সুন্দরও বটে।

এরপর ক্রাউজের দিকে তাকিয়ে সে বলল, কিছু খাদ্য আর পানীয় নিয়ে এস।

ক্রাউজ আবদুল্লাকে বলল, ও কি খায় আবদুল্লা?

আবদুল্লা বলল, কুকুরটা দুদিন খায়নি। এখন ও হাতের কাছে যা পাবে তাই খাবে। জঙ্গলে থাকার সময় ও পশুবধ করে কাঁচা মাংস খেত পশুর মত।

ক্রাউজ বলল, আমরা সেটা পরীক্ষা করে দেখব।

একজন নাবিক মাংস আর জল নিয়ে এলে জেনেত্তে তা নিয়ে বন্দীর হাতে দিল। বন্দী লোকটা মাংস নিয়ে খাঁচার এক কোণে গিয়ে দাঁত দিয়ে একটা বড় মাংস খণ্ড কামড়ে কামড়ে খেতে লাগল আর গর্জন করতে লাগল।

আবদুল্লা বলল, এল আদ্রিয়া জাতীয় সিংহেরা এইভাবে খায়।

ক্রাউজ বলল, ও সিংহের মত গর্জন করে। আদিবাসীরা ওকে কি নামে ডাকে আবদুল্লা?

আবদুল্লা বলল, বাঁদরদলের টারজন বলে ডাকে ওকে।

ভারত মহাসাগর পার হয়ে সুমাত্রা দ্বীপে গিয়ে থামল সাইগন। সেখানে আরো কিছু পশু বোঝাই করল ক্রাউজ। সে নিল একটা গণ্ডার, তিনটে ওরাং ওটাং, দুটো বাঘ, একটা চিতাবাঘ, আর একটা হাতি।

হ্যান্স তাকে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছিল বলে বাটাভিয়াতে নামল না ক্রাউজ। সুমাত্রা থেকে সে এগিয়ে যেতে লাগল

সিঙ্গাপুরের দিকে। সাইগন যাবে দক্ষিণ চীন সমুদ্র দিয়ে ম্যানিলায়।

ক্রাউজ খুশি হলো। এতক্ষণ পর্যন্ত তার পরিকল্পনা ভালভাবেই কাজ করেছে। সে যদি একবার নিউ ইয়র্কে জাহাজটা নিয়ে যেতে পারে তাহলে মোটা লাভ করবে। তবে সে এত খুশি হত না যদি সে জানত কি ব্যাপার চলছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন লার্সেল তখনো তার কেবিনে শয্যাগত ছিল। হ্যান্স দ্য গ্রোত্তে একজন ভাল অফিসার হলেও সে নতুন। সাইগন জাহাজে কি গোপন ষড়যন্ত্র চলছিল সে বিষয়ে তারও কোন জ্ঞান ছিল না। রাত্রিবেলায় ডেকের উপর সামনের দিকে জাহাজের দ্বিতীয় মেট স্মিৎস আর জবু সিং ও অন্যান্য লস্কর বা নাবিকদের মধ্যে কি সব গোপন কথাবার্তা হত, ক্রাউজের মত সেও তার কিছুই জানত না।

একদিন লস্কর জবু সিংকে চাঁদ নামে এক লস্কর জিজ্ঞাসা করল, পশুগুলোর কি হবে?

জবু সিং বলল, স্মিৎস বলেছে পশুগুলোকে আমরা সমুদ্রে ফেলে দেব জাহাজ থেকে।

চাঁদ আপত্তির স্বরে বলল, কিন্তু ওগুলোর অনেক দাম। আমরা পশুগুলোকে রেখে দিয়ে পরে বিক্রি করতে পারি।

অন্য একজন লস্কর বলল, আমরা ধরা পড়ে যাব এবং আমাদের ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে তার জন্য।

জবু সিং বলল, আমরা যখন সিঙ্গাপুরে ছিলাম তখন স্মিৎস জানতে পারে ইংলণ্ড ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ চলেছে। এটা এক ইংরেজ জাহাজ। স্মিৎস বলেছে একজন জার্মান হিসাবে ইংরেজ জাহাজ দখল করার অধিকার আছে তার। আমরা তাহলে পুরস্কার হিসাবে কিছু করে টাকা পাব। তবে তার মতে এক্ষেত্রে জন্তু জানোয়ারগুলোর কোন দাম হবে না, ওগুলো শুধু এক আবর্জনা মাত্র।

না, বরং তাদের ঘৃণা করত কারণ তারা একবার ফেলুক্কা জাহাজটা দখল করে তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। তারা যা যা লুঠ করে তার ভাগ দেয়নি তাকে।

তবে নাবিকদের ষড়যন্ত্রের কথাগুলো শোনার সময় উদাসীনভাবে পাইপ খেয়ে যাচ্ছিল সে। তার মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছিল না সে তাদের সব কথা শুনেছে কিনা।

এদিকে খাঁচার ভিতরে বন্দী লোকটা খাঁচার ভিতরে ইতস্ততঃ পায়চারি করতে করতে মাথার উপর লোহার রড্‌টা ধরে প্রায়ই ঝুলত। খাঁচার কাছে কেউ এলে সে থেমে যেত।

জেনেত্তে ল'ও প্রায়ই তার খাঁচাটার কাছে এসে দেখত তার খাওয়া হয়েছে কিনা। তারপর তাকে ফরাসী ভাষা শেখাবার চেষ্টা করত। কিন্তু বন্দী টারজনের তাতে বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল

চাঁদ বলল, ইল্লিনি দ্বীপে একজন লোক আছে সে পশুগুলোকে কিনবে। সুতরাং স্মিৎসকে তাদের সমুদ্রে ফেলে দিতে দেব না।

নাবিকরা এইভাবে তাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলত। তারা ভাবত জাহাজের চীনা নাবিকরা বুঝতে পারবে না তাদের কথা। কিন্তু তাদের এ ধারণা ভুল ছিল। সাইগন জাহাজে লুম চিপ নামে এক চীনা নাবিক ছিল। সে চীন উপসাগরে ফেলুক্কা নামে একটা জাহাজে কাজ করেছে। তখন সে লস্করদের ভাষা শেখে। সে লস্করদের বিশ্বাস করত

না। সে মুখে কোন কথা কারো সঙ্গে না বললেও মনে মনে ঠিক সঙ্গতভাবেই চিন্তা করে যেত। তার একমাত্র চিন্তা ছিল সে কি ভাবে উদ্ধার করবে নিজেকে এই অবস্থা হতে। তাকে নিয়ে ভবিষ্যতে এরা কি করবে তা সে সব বুঝতে পেরেছে। তবে সে যে এই খাঁচা থেকে যেমন করে হোক পালাবেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তার।

খাঁচার লোহার রেলিংগুলোকে পরীক্ষা করে সে দেখে সেগুলোকে বাঁকিয়ে তার দেহটাকে খাঁচা থেকে বার করতে এমন কোন কষ্ট হবে

না। কিন্তু জাহাজ থেকে সমুদ্রে সে ঝাঁপ দিলেই তাকে গুলি করা হবে। কারণ ওরা তাকে ভয় করে। গুলির কথা ভেবেই সে নীরবে বন্য পশুর মত ধৈর্য ধরে থাকে।

আবদুল্লা বা স্মিৎস যখন ডেকের উপর আসে টারজন তখন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। কারণ তারা দুজনই তার উপর থুথু ফেলে। তাকে ঘৃণা করার কারণ ছিল আবদুল্লার। আবদুল্লার দাস ব্যবসা আর হাতির দাঁতের কারবারের সে-ই অবসান ঘটায়। আর স্মিৎসের সে জাতীয় শত্রু।

আবদুল্লা ক্রাউজ আর জেনেত্তেকে ঘৃণার চোখে দেখত আর হান্স তাকে ঘৃণা করত। সে তাই স্মিৎসের পক্ষে চলে আসে। ক্রমে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে পরস্পরের। আবদুল্লা ক্রাউজের উপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজছিল বলে সে স্মিৎসের দ্বারা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে ফেলে নিজেকে।

সেদিন বিকালবেলায় লুম চিপ হান্সের কাছে এসে বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রের কথা সব বলল। বলল, বিদ্রোহীরা আজ রাতেই জাহাজ দখল করবে। তারা লার্সেল, ক্রাউজ, আর তোমাকে খুন করবে। শুধু চীনাদের বাদ দেবে।

হান্স চিন্তান্বিত হয়ে বলল, কিন্তু চীনা নাবিকরা? তারা কি করবে?

তারা তোমাদের মারবে না। তারা ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়নি।

তারা কি বিদ্রোহী নাবিকদের সঙ্গে লড়াই করবে?

তাদের হাতে বন্দুক দাও। তাহলেই লড়াই করবে।

তারা বন্দুক পাবে না। রড্ আর ছুরি দিয়ে লড়াই করতে বল। তোমাকে ধন্যবাদ লুম। তোমার কথা কখনো ভুলব না।

হান্স সঙ্গে সঙ্গে লার্সেলের কেবিনে চলে গেল। কিন্তু দেখল লার্সেল জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে। তারপর ক্রাউজের কেবিনে চলে গেল। সেখানে ক্রাউজ আর জেনেত্তের কাছে লুম চিপের কথাগুলো সব বলল।

ক্রাউজ বলল, এখন আমরা কি করব?

হান্স বলল, আমি এখনি স্মিৎসকে গ্রেপ্তার করব।

হঠাৎ কেবিনের দরজাটা খুলে গেল। দেখা গেল স্মিৎস একটা স্বয়ংক্রিয় রিভলবার হাতে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। তার পিছনে ছয়জন বিদ্রোহী।

স্মিৎস হান্সকে বলল, তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করবে না? চীনাটা যখন তোমার সঙ্গে কথা বলছিল তখন আমি তা দেখি। সে যা বলেছে তা আমি জানি।

এরপর সে লস্করদের বলল, ওদের সবাইকে বেঁধে ফেল।

বিদ্রোহী নাবিকরা কেবিনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ক্রাউজ কাপুরুষের মত বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করল। হান্স জেনেত্তের সামনে গিয়ে লস্করদের বলল, খবরদার, মেয়েছেলের গায়ে হাত দেবে না। লস্কর বা বিদ্রোহী নাবিকরা জেনেত্তেকে বাঁধতে গেলে ঘুষি মেরে দুজনকে ফেলে দিল হান্স। জেনেত্তেও তার ভারী একজোড়া বায়নাকুলার দিয়ে মেরে ফেলে দিল দুজনকে।

তবে লড়াই শেষ হলে দেখা গেল আঘাতে অচেতন হয়ে পড়েছে হান্স। বাকি সবাইকে বেঁধে ফেলেছে বিদ্রোহীরা।

ক্রাউজ অবশেষে স্মিৎসকে বলল, এটা বিদ্রোহ স্মিৎস। মনে রেখো, আমাকে যদি ছেড়ে না দাও তাহলে এর জন্য ফাঁসিতে মরতে হবে তোমায়।

স্মিৎস বলল, এটা বিদ্রোহ নয়, আমি আমাদের রাষ্ট্রের নামে এই ইংরেজ জাহাজটিকে দখল করলাম।

ক্রাউজ বলল, আমিও জার্মান। আমি জাহাজটিকে ভাড়া করি। সুতরাং এটা জার্মান জাহাজ, ইংরেজ জাহাজ নয়।

স্মিৎস বলল, তা নয়, এটা ইংলণ্ডেই রেজেষ্ট্রি করা হয় এবং এই জাহাজ ইংরেজ পতাকা বহন করেই ভেসে চলেছে। তুমি যদি জার্মান হও তাহলে তুমি বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী। তোমাকে কি করতে হবে তা আমরা জানি।

টারজন বুঝতে পারল জাহাজে রীতিমত একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি তা জানতে পারেনি সে। জেনেত্তে নামে সেই মেয়েটিকে ও ছোকরা অফিসার হান্সকে দুদিন দেখেনি সে। দেখছে যে মেটটা তার উপর থুথু ফেলেছিল একদিন জাহাজটা এখন তারই দখলে।

চীনা নাবিকরা মুখ বুজে জাহাজ চালানোর কাজ করে যাচ্ছে। আবদুল্লা তার ভয়ে খাঁচার কাছে আসে না।

এখন বিদ্রোহী নাবিকরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় জাহাজে। চীনা নাবিকরা সব কাজ করলেও অল্প কোন ত্রুটি অথবা বিনা দোষেই স্মিৎস তাদের লাথি মারে। একদিন এক চীনাকে বেত মেরে লঘু দোষে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেওয়া হয়।

স্মিৎস খাঁচার কাছে গিয়ে টারজনকে গালাগালি দেয় দাঁত খিঁচিয়ে। তার প্রতি স্মিৎসের এই ঘৃণার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পায় না টারজন।

একদিন স্মিৎস একটা হারপুন নিয়ে এসে খাঁচার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে টারজনকে মারার জন্য সেটা খাঁচার ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়। টারজন সেটা ধরে সঙ্গে সঙ্গে এক হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নেয় স্মিৎসের হাত থেকে। সেই থেকে সশস্ত্র টারজনের কাছে আসতে ভয় পায় স্মিৎস।

একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখল নিজের চোখে। নিচের থেকে কয়েকজন নাবিক একটা কাঠের আর একটা লোহার খাঁচা উঠিয়ে এনে তার খাঁচাটার পাশে রাখল। তারপর জেনেত্তে নামে সেই দয়ালু মেয়েটাকে কাঠের খাঁচাতে আর ক্রাউজ ও হান্সকে লোহার খাঁচাটাতে ভরে রাখা হলো।

হান্স স্মিৎসকে প্রশ্ন করল, এ সবের অর্থ কি স্মিৎস?

স্মিৎস বলল, নিচের তলায় তালাবদ্ধ থাকার জন্য অভিযোগ করছিলে তোমরা। তাই এখানে এনে রাখা হলো। অনেক আলো হাওয়া পাবে। এ জন্য আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত তোমাদের।

এই বলে হাসতে লাগল স্মিৎস।

হান্স বলল, আমাদের নিয়ে যা খুশি করো। কিন্তু একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে এভাবে লস্করদের চোখের সামনে রাখা উচিৎ কি ?

স্মিৎস হান্সের কথার উত্তরে বলল, জেনেত্তে চাইলে আমার কেবিনে এসে থাকতে পারে। লার্সেলকে অন্য জায়গায় রাখা হয়েছে।

জেনেত্তে এমন সময় পিছন থেকে বলে উঠল, তার থেকে জেনেত্তে থাকবে বন্য লোকটির সঙ্গে একই খাঁচায়।

স্মিৎস বলল, আমি তোমাদের সবাইকে বন্য পশুদের সঙ্গে বার্লিনে নিয়ে গিয়ে সবাইকে দেখাবার জন্য এক প্রদর্শনীর আয়োজন করব। তুমি যদি তোমার প্রিয় বন্য লোকটির সঙ্গে এক খাঁচাতে থাক তাহলে সে দৃশ্য দেখে লোকে আনন্দ পাবে। আবদুল্লা বলেছে লোকটা নাকি নরখাদক। তোমাকে ওর কাছে রাখলে ও তোমাকেই খাবে। আমাকে খাবার দিতে হবে না।

হান্স স্মিৎসকে দেখে আপন মনে হাসতে হাসতে বলল, লোকটা পাগল।

একটু পরেই পিস্তল হাতে লোকজন নিয়ে ফিরে এল স্মিৎস। প্রথমে জেনেত্তের খাঁচার দরজা খুলে দেওয়া হলো, তারপর টারজনের খাঁচার দরজা খোলা হলো। শেষে স্মিৎস জেনেত্তেকে হুকুম করল, যাও, লোহার খাঁচার মধ্যে চলে যাও।

হান্স চীৎকার করে বলতে লাগল, এ কাজ করো না স্মিৎস।

ধমক দিয়ে হান্সকে থামিয়ে দিয়ে স্মিৎস আবার বলল, যাও বলছি।

এরপর তার লোকদের বলল, রড্ দিয়ে ওকে খুঁচিয়ে খাঁচায় ঢুকিয়ে দাও।

কিন্তু একজন জেনেত্তেকে লোহার রড্ দিয়ে খোঁচাতে গেলে টারজন গর্জন করতে করতে এগিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে তিনটে পিস্তল তার দিকে ধরা হলো।

জেনেত্তে ভয় পেয়ে গেলেও সে ওদের পীড়নের ভয়ে ঢুকে পড়ল খাঁচার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

হান্স, স্মিৎস, ক্রাউজ, নাবিকরা সবাই স্তব্ধ-বিস্ময়ে দেখতে লাগল ব্যাপারটাকে।

খাঁচার ভিতরে ঢুকেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কি হয় তা দেখতে লাগল জেনেত্তে। সে টারজনের মুখপানে তাকাল এবং টারজনও তার মুখপানে তাকাল। জেনেত্তে দেখল টারজনের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে একফালি। হাসিটা দেখে আশ্বস্ত হলো জেনেত্তে। তার মনে হলো টারজনের হাসিটা বন্ধুত্ব-পূর্ণ। তা দেখে সে নিজেও হাসল।

টারজন এবার স্মিৎসের দেওয়া হারপুনটা তুলে নিয়ে জেনেত্তের হাতে দিল সেটা।

হান্স প্রথমে ভাবল টারজন হয়ত খুন করতে যাচ্ছে জেনেত্তেকে। তাই সে চীৎকার করে উঠে-ছিল ভয়ে। স্মিৎসকে বলল, লোকটাকে গুলি করো স্মিৎস।

কিন্তু টারজন কিছুই করল না দেখে সকলেই আশ্বস্ত হলো।

জেনেত্তের প্রতি টারজনের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখে হতাশ হয়ে পড়ল স্মিৎস। সে ভেবেছিল তাকে হয়ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে টারজন। তাই সে আবদুল্লাকে বলল, লোকটা আসলে বন্য নয়, ওর বেশ টনটনে জ্ঞান আছে। আবদুল্লা তুমি একটা মিথ্যাবাদী।

আবতুল্লা স্নিৎসকে বলল, তুমি যদি মনে করো লোকটা বন্য বর্বর নয়, তাহলে তুমি নিজে তার খাঁচায় গিয়ে ঢুকতে পার।

পরদিন সকালে লোহাব খাঁচার তুজন বন্দী হাসিখুশিতে মেতে উঠল। যে বন্য লোকটিকে আবতুল্লা নরখাদক বলে অভিহিত করেছে, যে কাঁচা মাংস খাবাব সময় সিংহের মত গর্জন করে, যে তিনজন আফ্রিকান যোদ্ধাকে হত্যা করেছে সেই লোকটির সঙ্গে খাঁচার ভিতরে একটি রাত্রি কাটানো সত্ত্বেও জেনেত্তে দেখল তাব দেহ অক্ষত আছে। কোন ক্ষতি হয়নি তার।

তা দেখে জেনেত্তে সকালে উঠেই এত খুশি হলো যে আনন্দের আবেগে একটা জনপ্রিয় ফরাসী গান গাইতে লাগল।

এদিকে টারজন খুশি হলো মেয়েটির ফরাসী বুঝতে পারার জন্য।

ফরাসী ভাষায় টারজন জেনেত্তেকে বলল, সুপ্রভাত!

বহুদিন আগে একজন ফরাসী লেফটন্যান্টের কাছে ফরাসী ভাষা শেখার সময় কথাটা শেখে টারজন।

জেনেত্তে তাকে সুপ্রভাত জানিয়ে আশ্চর্য হয়ে টারজনের মুখপানে তাকাল। তারপর বলল, ওরা যে বলেছিল তুমি নাকি কথা বলতে পার না।

টাবজন বলল, একটা তুর্ঘটনায় আমি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখন ঠিক হয়ে গেছি।

এতে আমি আনন্দিত।

টারজন বলল, তুমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলে। আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই।

ওরা কত ভয়ঙ্কর কথা বলেছিল। তুমি হয়ত শুনেছ তাদের কথা।

আমি কোন কথা বলতে পাবিনি। তাদের কথা বুঝতেও পারিনি। তারা কি কি বলেছিল?

তারা বলেছিল তুমি বড় হিংস্র। তুমি নাকি মানুষ খাও।

টারজনের মুখে আবাব হাসি ফুটে উঠল। বলল, তারা তাই তোমাকে আমার খাঁচায় ভবে দেয়। ভেবেছিল আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব। কে তোমাকে খাঁচায় ভরেছিল?

স্নিৎস, যে বিদ্রোহী হয়ে উঠে জাহাজ দখল করবে।

টারজন বলল, ঐ লোকটাই আমার মুখের উপব থুথু ফেলেছিল।

টাবজনের গলার মধ্যে সিংহগর্জনেব একটা আভাস পেল জেনেত্তে। আবতুল্লা ঠিকই বলেছে। লোকটা সিংহের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তবে এখন আর কোন ভয় পায় না সে।

স্নিৎস কেন তোমায় ঘৃণা করে?

জেনেত্তে বলল, আমি তা জানি না। সে এক তুঃখবাদী বাতিকগ্রস্ত লোক। সে বেচারা লুম চিপের কি অবস্থা করেছে তা তুমি দেখেছ। সে অন্যান্য চীনা নাবিকদের কথায় কথায় লাথি মারে ও আঘাত করে।

আমি আশা করি জাহাজে কি কি ঘটেছে তা তুমি আমায় বলবে। আমি তা বুঝতে পারিনি। ওরা আমাকে নিয়ে কি করতে চায় তা যদি জেনে থাক তাও বলবে।

ক্রাউজ তোমাকে তার অন্যান্য পশুদের সঙ্গে একজন লোক হিসাবে শহরের লোকদের দেখাবার জন্য আমেরিকায় নিয়ে যাচ্ছিল।

ক্রাউজই ত এখন প্রথম মেটের সঙ্গে একটা খাঁচায় বন্দী হয়ে আছে। তাই না ?

হ্যাঁ।

এবার তুমি ওদের বিদ্রোহের কথাটা ভেঙ্গে বল। স্মিৎসের পরিকল্পনাটাই বা কি সে সম্বন্ধে যা জান বল।

জেনেত্তের সব কথা বলা শেষ হলে টারজন বুঝতে পারল সাইগন জাহাজে কি নাটক চলছে। সে বুঝল জেনেত্তে, খাঁচায় ভরা হ্যান্স দ্য গ্রোত্তে, ক্রাউজ আর চীনা নাবিকরা তাদের দিকে।

হ্যান্স ঘুম থেকে উঠেই জেনেত্তেকে ডেকে বলল, তুমি ভাল আছ ত? ও তোমার কোন ক্ষতি করেনি ত ?

জেনেত্তে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, না, কোন-ভাবে কোন ক্ষতি করেনি।

হ্যান্স বলল, আমি আজ স্মিৎসের সঙ্গে কথা বলব। আমি ও ক্রাউজ যদি তাকে কথা দিই তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনব না তাহলে সে হয়ত তোমাকে খাঁচা থেকে মুক্ত করে দিতে পারে।

জেনেত্তে বলল, জাহাজের মধ্যে এইটাই আমার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। স্মিৎস যতদিন জাহাজের কর্তা হয়ে থাকবে ততদিন আমি খাঁচা থেকে বেরোব না।

স্মিৎস এসে দেখল টারজন খাঁচার ভিতরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

স্মিৎস জেনেত্তেকে বলল, তুমি এখনো বেঁচে আছ দেখছি। আমাব মনে হয় বাঁদরটার সঙ্গে রাতটা ভালভাবেই কাটিয়েছ এবং ওকে কিছু খেলা শিখিয়েছ। আমি তাহলে তোমায় ওর প্রশিক্ষক হিসাবে প্রদর্শনীতে দেখাতে পারব।

এরপর স্মিৎস খাঁচাটার কাছে এসে টারজনকে ভাল করে দেখে বলল, ও কি ঘুমোচ্ছে না কি ওকে খুন করেছ তুমি ?

সহসা টারজন তার একটা হাত খাঁচা থেকে বার করে স্মিৎসের হাঁটুটা ধরে ফেলল। টারজন তখন স্মিৎসের হাঁটুটা খাঁচার ভিতরে টেনে আনতে স্মিৎস পড়ে গেল। সে চীৎকার করে উঠতে টারজন আর একটা হাত দিয়ে তার পিস্তলটা টেনে নিল।

স্মিৎস চীৎকার করতে লাগল, বাঁচাও, বাঁচাও। আবদুল্লা, জবু সিং, চাঁদ, বাঁচাও।

আবদুল্লা, জবু সিং, চাঁদ স্মিৎসের চীৎকার শুনে ছুটে এল। কিন্তু টারজন তাদের দিকে পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরতে তারা থেমে গেল।

টারজন বলল, খাবার আর জল এনে দাও, তা না হলে তোমার হাঁটুটা ভেঙ্গে দেব।

ক্রাউজ আর হ্যান্স দ্য গ্রোত্তে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

স্মিৎস খাবার আর জল আনার জন্য চীৎকার করতে লাগল। সহসা হ্যান্স টারজনকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, দেখ, তোমার পিছনে কি ?

কিন্তু টারজন পিছন ফিরে দেখার আগেই একটা পিস্তল গর্জে উঠল এবং টারজন পড়ে গেল। জবু সিং খাঁচার পিছন দিক দিয়ে চুপি চুপি গিয়ে গুলি করে তার পিস্তল থেকে।

স্মিৎস ছাড়া পেয়ে সরে গেল। জবু সিং টারজনের উপর আবার গুলি করতে গেলে জেনেত্তে টারজনের পিস্তলটা তুলে নিয়ে জবু সিংকে লক্ষ্য করে গুলি করল। গুলিটা তার ডান হাতে লাগল। তার পিস্তলটা হাত থেকে পড়ে যেতে জেনেত্তে খাঁচার ধার থেকে সেটা তুলে নিল।

জেনেত্তে এবার হাঁটু গেড়ে বসে টারজনের বুকের উপর কান পেতে তার হৃৎস্পন্দন শোনার চেষ্টা করতে লাগল।

স্মিৎস উঠে দাঁড়িয়ে এক নিষ্ফল আক্রোশে চেঁচামেচি করছিল। এমন সময় সে একটা জাহাজ দেখতে পেয়ে ভাল করে সেটা দেখার জন্য উপরে উঠে গেল। সাইগন জাহাজের উপর কোন পতাকা ছিল না তখন। দরকারমত যে কোন একটা জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেবে সে।

জাহাজটার কাছে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা জাহাজে উঠে পড়ল। এমন সময় দেখা গেল সাইগনে জার্মান পতাকা উড়ছে।

জাহাজটাতে ছিল পঁচিশ তিরিশজন লোক আর দুজন মহিলা। স্মিৎসের জলদস্যুসুলভ কারবার দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল জাহাজের ক্যাপ্টেন। স্মিৎসকে বলল, এ সবের মানে কি ?

স্মিৎস তার সাইগন জাহাজে উড়তে থাকা জার্মান পতাকাটা দেখিয়ে বলল, এর মানে হলো আমি জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে তোমাদের গ্রেপ্তার করলাম। এ জাহাজ এখন আমাদের দখলে। তোমাদের এঞ্জিনীয়ার এবং জাহাজ চালক জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে। আমার প্রথম মেট জবু সিং দেখাশোনা করবে। সে কিছুটা আহত।
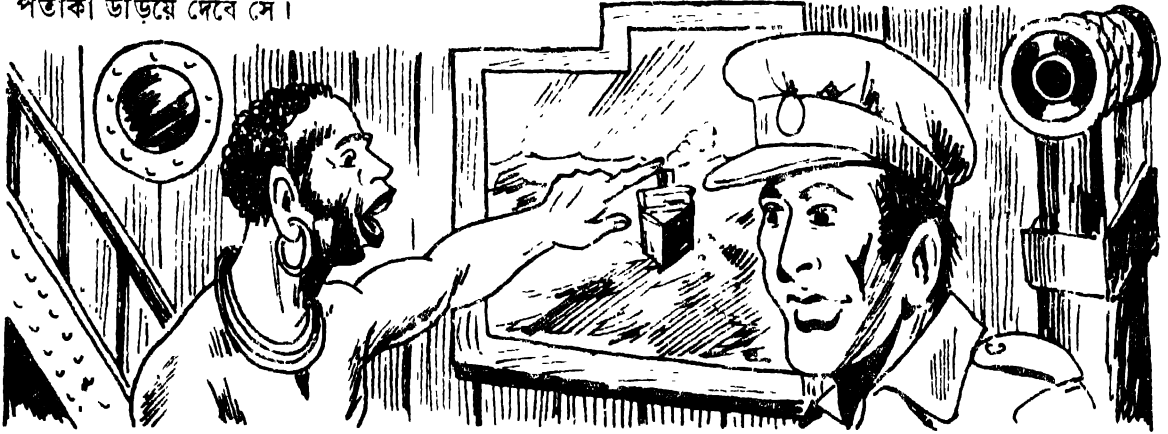
দেখা গেল দূরে দেখতে পাওয়া জাহাজটা এক ইংরেজ জাহাজ। সে সঙ্গে সঙ্গে সাইগনের উপর একটা ইংরেজ পতাকা উড়িয়ে দিল। তারপর বেতারে সেই জাহাজের কাছে খবর পাঠিয়ে একজন ডাক্তার পাঠাতে বলল।

সেই অচেনা জাহাজটা জানাল তাদের সঙ্গে একজন ডাক্তার আছে। স্মিৎস জানাল, সে এখনি একটা নৌকো পাঠাচ্ছে।

স্মিৎস তখন বেশ কিছু পিস্তল, রাইফেল, ছোরা, রড্ প্রভৃতি অস্ত্র গোপনে একটা নৌকোর উপর তুলে নিয়ে সে নিজে কয়েকজন নাবিককে নিয়ে নৌকোটায় উঠে বসল।

তোমাদের ডাক্তার তার ক্ষতটা বেঁধে দেবে। বাকি তোমরা সবাই আমার সঙ্গে জাহাজে গিয়ে উঠবে। মনে রাখবে এখন তোমরা যুদ্ধবন্দী। সেইমত আচরণ করবে।

দখল-করা জাহাজের ক্যাপ্টেন স্মিৎসকে বলল, কিন্তু আমাদের জাহাজ ত যুদ্ধজাহাজ নয়, কোন পণ্যবাহী জাহাজও নয়। এটাকে কি জন্য দখল করবেন ?

লম্বা চেহারার একজন যুবক বলল, হ্যাঁ, এটা দখল করতে পারেন না।

স্মিৎস তাকে ধমক দিয়ে বলল, চুপ করো। তোমরা ইংরেজ। এইটাই জাহাজ দখল করার

যথেষ্ট কারণ। এখন এস। তোমাদের ডাক্তার কই?

ডাক্তার যখন জবু সিংএর ক্ষতটা বেঁধে দিচ্ছিল তখন শ্মিৎস আর তার লোকজন জাহাজের ভিতরটা খোঁজাখুঁজি করে কতকগুলো পিস্তল আর শিকারের রাইফেল পেল। সেগুলো নিয়ে তার লোকজনকে কিছু নির্দেশ দিয়ে সে বন্দীদের নিয়ে তার জাহাজে চলে গেল।

জবু সিংএর গুলিটা টারজনের মাথার একটুখানি চামড়া ছিঁড়ে দিয়ে চলে যায়।

সে তাই কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে থাকে। আঘাতটা জোর হয়নি। তাই সে কিছুক্ষণ পরেই উঠে বসল।

অন্য জাহাজ থেকে শ্মিৎস কয়েকজন লোককে বন্দী করে নিয়ে এলে জেনেত্তে বলল, শ্মিৎস জলদস্যু হয়ে গেছে। ঐ সব লোকগুলোকে নিয়ে ও কি করবে তা বুঝতে পারছি না। ওরা সংখ্যায় প্রায় পনেরজন হবে।

বন্দীদের মধ্যে থেকে আটজনকে শ্মিৎস জাহাজ চালানোর কাজে পাঠিয়ে দিল। তারপর ছুটো খাঁচা এনে বন্দীদের বলল, কে কার সঙ্গে কোন্ খাঁচায় থাকবে বেছে নাও।

একটি মেয়ে তার কাকা ও কাকিমাকে নিয়ে একটি খাঁচাটায় ঢুকল। অন্য খাঁচাটায় ঢুকল দখলকরা জাহাজের ক্যাপ্টেন বোল্টন, দ্বিতীয় মেট টিবেট, ডাক্তার ক্রোক আর অ্যালজারনন নামে এক যুবক।

যে খাঁচাটায় কর্নেল উইলিয়াম সিসিল লে, তার স্ত্রী পেনিলোপ লে আর ভাইঝি প্যাট্রিসিয়া ছিল সেই খাঁচাটা ছিল টারজনদের খাঁচাটার ঠিক পাশে। ৭৭

পেনিলোপ লে টারজনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাইঝিকে বলল, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! লোকটা প্রায় উলঙ্গ।

প্যাট্রিসিয়া বলল, লোকটা কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর কাকিমা।

শ্মিৎস এবার চীৎকার করে বলতে লাগল, এবার এই সব জন্তুদের খাবার দেওয়া হবে।

কয়েকজন নাবিক ও লস্কর খাবার ও জল নিয়ে এল বন্দীদের জন্য।

খাবারগুলো ছিল পরিমাণে কম এবং বাজে। টারজনকে একখণ্ড কাঁচা মাংস দেওয়া হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টারজনের গলা থেকে বেরিয়ে আসা সিংহের গর্জনের মত একটা শব্দ শুনতে পেয়ে পেনিলোপ বলে উঠল আশ্চর্য হয়ে, দেখ, দেখ, লোকটা কাঁচা মাংস খাচ্ছে আর সিংহের মত গর্জন করছে।

টারজন জেনেত্তের মুখপানে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

টারজন প্রতিদিন লক্ষ্য করত রাতের একজন প্রহরী রোজ রাত চারটের সময় খাঁচার বন্দীদের পরিদর্শন করে যায়। সে তখন একাই আসে। তবে শ্মিৎস তার নিরাপত্তার জন্য একটা পিস্তল দিয়েছিল তাকে।

রাত গভীর হলে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। ঝড়ের বেগ হয়ে উঠল প্রবল। ভয়ানকভাবে দুলতে লাগল সাইগন জাহাজটা।

টারজন তার খাঁচার মধ্যে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে এই দুর্যোগটা দেখছিল। সে দেখল তাদের পাশের খাঁচাটায় সেই ইংরেজ মেয়ে প্যাট্রিসিয়াও দাঁড়িয়ে আছে।

টারজন অপেক্ষা করছিল পরিদর্শনকারী সেই পাহারাদারটার জন্য। কিন্তু সে রাতে পাহারাদার এল না।

ইংরেজ মেয়েটিকে পায়চারি করতে দেখে টারজনের মনে হলো, সত্যিই কাজের। যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে সাহসের সঙ্গে। মুখ বুজে সব দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারে।

টারজন বুঝতে পারল মেয়েটি সুযোগ আসার অপেক্ষায় আছে। সুযোগ এলেই সাহস আর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করে যাবে সে।

টারজন প্যাট্রিসিয়ার খাঁচার কাছে এসে দেখল, মেয়েটি ঝড় বৃষ্টির বেগ ও জাহাজের দোলানিটাকে সহজভাবে মেনে নিচ্ছে।

টারজন মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি একজন ইংরেজ ?

আমার খাঁচার পাশে একটা খাঁচায় বন্দী আছে ক্রাউজ। স্মিৎস একদিন ক্রাউজের এই জাহাজের দ্বিতীয় মেট ছিল। সে ক্রাউজের জাহাজ দখল করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ও তার জন্তু জানোয়ারগুলো সব তার দখলে আসে। ক্রাউজও এখন তার হাতে বন্দী।

তবে সমুদ্রের অবস্থা যদি আরো খারাপ হয় তাহলে সে আ৹াদের বেশীদিন আটকে রাখতে পারবে বলে মনে হয় না।

প্রচণ্ড ঝড়ে ও তুফানে জাহাজটা তখন দুলছিল ভীষণভাবে।

রাত্রি শেষ হলো অবশেষে। কিন্তু ঝড়েব বেগ কমল না। মাঝে মাঝে এক একটা ঢেউ এসে জাহাজের ডেকটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। যারা খাঁচার ভিতরে বন্দী ছিল তারা সবাই ভিজে গেল।

হ্যাঁ।

আমার নাম প্যাট্রিসিয়া লে বার্ডেল। আপনার নামটি জানতে পারি কি ?

আমার নাম টারজন।

আপনাকে কিভাবে খাঁচায় ভবা হলো তা বলবেন কি মিস্টাব টারজন ?

আবদুল্লা আবু নেজিম আমার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই আমাকে এই খাঁচায় এনে ভরে। সে আমাকে আফ্রিকার এক সর্দারের সহায়তায় ধরে। আবদুল্লা আমাকে ক্রাউজ নামে একটা লোকের কাছে বিক্রি করে। ক্রাউজ আমেরিকায় বিক্রি করার জন্য কিছু জন্তু জানোয়ার সংগ্রহ করে।

সেদিন বন্দীদের কেউ খাবার দিয়ে গেল না। ডেকেব নিচে ক্ষুধার্ত পশুগুলো গর্জন করতে লাগল। দুর্যোগের তৃতীয় দিনের বিকালের দিকে দুজন চীনা নাবিক বন্দীদের কিছু খাবার দিয়ে গেল। খাবার বলতে ছিল ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে বিস্কুট।

এদিকে টারজন যার জন্য অপেক্ষা করছিল সে এসে গেল অবশেষে। অশোকা নামে এক লস্কর খাঁচাগুলো পরিদর্শন করতে এল।

অশোকা ডেকের উপর এলে জাহাজের আলোয় তাকে দেখতে পেল টারজন।

অশোকা যখন খাঁচাগুলোর সামনে দিয়ে চলে গেল টারজন তখন খাঁচার দুটো রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে

ছিল। জেনেত্তেও তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বুঝতে পারল কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে।

জেনেত্তে দেখল টারজন খাঁচার রেলিং দুটোর উপর তার গায়ের সব শক্তি প্রয়োগ করছে। খাঁচার রেলিং দুটো বেঁকে ফাঁক হয়ে গেল এক সময়।

টারজন বেরিয়ে পড়ল খাঁচা থেকে।

অশোকা যখন শেষ খাঁচাটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন তার পিছন থেকে কে এসে তার গলাটা টিপে ধরল। তার বন্দুকটা ছিনিয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে।

তা দেখে জেনেত্তে খাঁচার সেই ফাঁক দিয়ে দুহাতে দুটো পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে এল।

অশোকা চীৎকার করার চেষ্টা করলে টারজন তাকে বলল, চেঁচালে মেরে ফেলব।

টারজন পিছন ফিরে দেখল জেনেত্তে তার পিছু পিছু আসছে। সে তখন অশোকার কাছ থেকে খাঁচাগুলোর চাবির গোছাটা নিয়ে জেনেত্তের হাতে দিয়ে বলল, সব খাঁচার দরজাগুলো খুলে দাও।

টারজন নিচু গলায় বন্দীদের বলল, তোমরা আমার সঙ্গে চলে এস। শুধু কর্নেল আর মেয়েরা থাকবে।

তারপর অশোকাকে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে জেনেত্তেকে বলল, খাঁচাটায় চাবি দিয়ে দাও।

নাইয়াদ জাহাজ থেকে আসা লোকগুলোকে পিছন ফিরে দেখে চিনতে পারল টারজন। অশোকার থেকে উদ্ধার করা পিস্তলটা হান্স দ্য গ্রোত্তেকে দিল টারজন। তারপর জেনেত্তেকে বলল, দখল করা নাইয়াদ জাহাজের দ্বিতীয় মেট টিবেটকে একটা পিস্তল দিতে বল।

টারজন টিবেটকে বলল, তুমি আমার সঙ্গে এস। হান্স জাহাজ চালাবে।

এরপর সে অন্যান্য লোকদের বলল, তোমরা যে যা পার যা হোক একটা করে অস্ত্র তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে এস। কারণ লড়াই হবেই।

ঝড়টা আবার নতুন করে শুরু হল। সাইগন জাহাজটা আবার দুলতে লাগল আগের মত। টারজন তার দলবল নিয়ে মই বেয়ে ব্রিজের উপরে উঠল। সেখানে লস্কর চাঁদ চাকা ধরে ছিল আর স্মিৎস পাহারা দিচ্ছিল।

টারজনকে দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে চাঁদকে সাবধান করে দিয়ে বন্দুকের ঘোড়াটা টিপে দিল। গুলিটা ছাদে গিয়ে লাগল। টারজন তার বন্দুকটা আর টিবেট চাঁদের বন্দুকটা ছিনিয়ে নিল।

এরপর স্মিৎস আর চাঁদকে টারজন একটা খালি খাঁচার কাছে এনে তার চাবি খুলে বন্দী স্মিৎস আর চাঁদকে তার মধ্যে ঢুকতে বলল।

এমন সময় ঝড়ের গর্জনকে ছাপিয়ে একটা গুলির শব্দ নিচের থেকে কানে এল টারজনের। সে তখন সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেল।

ঘটনাস্থলে গিয়ে টারজন দেখল কয়েকজন সশস্ত্র লস্কর আর তার লোকদের আক্রমণ করেছিল। কিন্তু কোন ক্ষতি করতে পাবেনি।

টারজন দেখল তিনচারজন লস্কর পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। টারজন দুটো পিস্তল হাতে তাদের পিছন দিকে গিয়ে বলল, পিস্তলগুলো ফেলে দাও। তা না হলে গুলি করব।

মুখ ঘুরিয়ে টারজনের দুহাতে দুটো পিস্তল দেখে দুজন লস্কর তাদের পিস্তল দুটো ফেলে দিল।

এরপর প্রতিপক্ষদের সকলকে নিরস্ত্র করা হল। যার কাছে যা কিছু ছিল সব কেড়ে নেওয়া হলো। সাইগনের চীনা নাবিকরা ও নাইয়াদ জাহাজের নাবিকরা কোন বাধা না দিয়ে খুশি হয়ে চলে এল টারজনের দলে। আধপাগলা শ্মিৎসের অধীনে তারা আর কাজ করতে চাইছিল না।

জাহাজটাকে সম্পূর্ণরূপে দখল করার পর টারজন একটা সেলুনের মধ্যে সবাইকে ডাকল।

টারজন দখলকরা নাইয়াদ জাহাজের ক্যাপ্টেন বোল্টনকে বলল, তুমি এই জাহাজের ক্যাপ্টেন হবে। হ্যান্স দ্য গ্রোত্তে হবে তোমার প্রথম মেট আর টিবেট হবে দ্বিতীয় মেট। হ্যান্স বলেছে এ জাহাজে দুটো কেবিন আছে। একটাতে থাকবে কর্নেল আর তার স্ত্রী আর অন্যটাতে থাকবে প্যাট্রিসিয়া আর জেনেত্তে।

টারজন এবার হ্যান্স দ্য গ্রোত্তের কাছে গিয়ে সব কথা বলে বলল, উবানোভিচের খবর কি?

আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি। এখনি এসে পড়বে।

গ্রোত্তে বলল, লোকটা কোন পক্ষেই নেই। ও লোকটা হাড়ে হাড়ে কমিউনিস্ট। এই যে এসে গেছে।

উবানোভিচকে দেখে রাগান্বিত আর সন্দিগ্ধ মনে হলো। সে রুষ্ট হয়ে বলল, তোমরা এখানে সব দাঁড়িয়ে কি করছ? শ্মিৎস কোথায়?

সে আছে ক্রাউজের সঙ্গে একই খাঁচাতে। বিদ্রোহের সঙ্গে তোমার কোন যোগাযোগ ছিল কি না তা আমি জানি না। এখন তুমি যদি জাহাজের এঞ্জিনীয়ার হিসাবে আগের মত কাজ করে যেতে চাও তাহলে কেউ কোন প্রশ্ন করবে না।

উবানোভিচ বলল, ঠিক আছে। তাই হবে।

টারজন বলল, বোল্টন এখন এ জাহাজের ক্যাপ্টেন। তার কাছে বল যে তুমি এঞ্জিনীয়ার।

এমন সময় তাদের পিছন থেকে একটা গুলির শব্দ এল। ডেকের সামনের কাঁচের জানালাটা ভেঙ্গে গেল সেই গুলিটা লাগায়। তারা মুখ ঘুরিয়ে দেখল আবদুল্লা মইএর সবচেয়ে উপরের ধাপে একটা ধূমায়িত পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

আবদুল্লা আবার একটা গুলি করল। কিন্তু জাহাজটা প্রবলভাবে দুলছিল বলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল তার গুলি। সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজন। টাল সামলাতে না পেরে মইএর উপর থেকে পিছন দিকের ডেকে চিৎ হয়ে পড়ে গেল আবদুল্লা। তার উপর টারজন পড়ে গেল।

ক্যাপ্টেন বোল্টন যে দুজন লোককে টারজনের কাছে পাঠিয়েছিল তারা এই ঘটনা দেখতে ছুটে গেল। দেখল টারজনের গায়ে কোন আঘাত লাগেনি। সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। কিন্তু আবদুল্লা অচেতন হয়ে পড়ে আছে।

জেনেত্তের কাছ থেকে খাঁচার চাবি আনতে পাঠিয়ে দিল টারজন। তারপর যে খাঁচাতে ক্রাউজ আর শ্মিৎস ছিল সেটা খুলতে বলে আবদুল্লার অচেতন দেহটাকে টানতে টানতে এনে সেই খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

ঝড়ের বেগ প্রচণ্ড হয়ে উঠল আবার। টারজন বুঝতে পারল নির্দিষ্ট পথ হতে অন্য দিকে সরে যাচ্ছে সাইগন। মাস্তুল ঝড়ে উড়ে গেছে।

তখন ভোর হয়ে আসছিল। বোল্টনের কথায় টারজন দূরে তাকিয়ে দেখল ঝড় আর স্রোতের আঘাতে মাস্তুলহারা সাইগন দুর্বার বেগে পাহাড়-ঘেরা এক দ্বীপের দিকে ভেসে চলেছে।

বোল্টন বলল, জাহাজটা জোরে গিয়ে ঐ সব পাহাড় প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা লাগলে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তার থেকে এখন থেকে নৌকো নামিয়ে সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। ডান দিকে একটা ফাঁক আছে খাড়ির মত। সেখান থেকে কূলে ওঠা সহজ হবে।

বোল্টন নৌকো নামানোর হুকুম দিতেই কয়েক-জন লস্কর একটা নৌকো নামিয়ে তারা কূলের দিকে চলে গেল। হ্যান্স দ্য গ্রোত্তে বাধা দেবার সুযোগ পেল না। অন্যান্য লস্বররা নৌকো নামানোর চেষ্টা করতেই বোল্টন ও টিবেট পিস্তল উঁচিয়ে তাদের সামনে দাঁড়াতেই তারা থেমে গেল।

বোল্টন বলল, যে আমাদের কথা মানবে না তাকেই গুলি করবে। এখন আমরা দেখব ওরা কোথায় কিভাবে গিয়ে কূলে ওঠে।

সাইগন অসহায়ভাবে পাহাড়প্রাচীব দিয়ে ঘেরা দ্বীপটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ওদিকে লস্করদের নৌকোটাও উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগোতে লাগল।

টারজন বলল, ঝড় আর সমুদ্রের তুফান দুটোই শান্ত হয়ে আসছে। দ্বীপের কাছে সমুদ্র অনেক শান্ত। সেখানে গেলে নৌকো নামালে কূলে ওঠা সহজ হবে।

বোল্টন বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে ক্যাপ্টেন হিসাবে আমি একা জাহাজে থাকব। আমাদের সকলের জীবন যেখানে বিপন্ন তখন চারটে নৌকো নামিয়ে যাত্রীদের যেতে বলব।

কিন্তু সকলেই লস্করদের নৌকোটার কি হয় তা দেখার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠল। কেউ নৌকোয় করে যাবার ঝুঁকি নিতে চাইল না।

ওরা দেখল লস্করদের নৌকোটা খাড়ির কাছে যেতে পারল না। দ্বীপটার কাছে ঢেউএর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে একসময় উল্টে গেল। লস্কররা সাঁতার কাটতে কাটতে এগোতে লাগল।

বোল্টন বলল, এখানকার জল অগভীর।

ঝড় আর তুফানের বেগ কমে যাওয়ায় সাইগন ধীর গতিতে এগোচ্ছিল দ্বীপের দিকে। পাহাড়ে

গিয়ে ধাক্কা লাগার আর দেরী নেই। তাই এবার নৌকো নামাবার হুকুম দেওয়া হলো।

নাবিকরা যখন নৌকো নামানোর কাজে ব্যস্ত ছিল তখন ক্রাউজ চীৎকার করে উঠল খাঁচা থেকে, শোন গ্রোত্তে, তোমরা কি আমাদের ফেলে চলে যাবে? আমরা কি খাঁচার মধ্যে ইঁদুরের মত ডুবে মরব?

গ্রোত্তে টারজনের মুখপানে তাকাল। টারজন জেনেত্তের কাছ থেকে চাবি নিয়ে খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে বলল, তোমাদের ছেড়ে দিলাম। এর বেশী কিছু করতে পারব না। তোমরা তোমাদের জীবন রক্ষা করবে। তোমাদের আচরণ যেন ভাল হয়। তোমাদের হত্যা করার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু করব না।

খাঁচা খুলে দিতে ক্রাউজ, স্মিৎস আর আবদুল্লা বেরিয়ে এল রাগে গর্জন করতে করতে।

বোল্টন চীৎকার করে উঠল, নৌকো ও ভেলা ঠিক করে রাখ। এবার জাহাজে ধাক্কা লাগবে।

জাহাজের যাত্রীরা সবাই এক গভীর ভয় আর উদ্বেগের সঙ্গে শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

পাহাড়ের উপর সাইগন জাহাজটা সরাসরি ধাক্কা লাগল না। অবশেষে একটা বিশাল ঢেউ এসে জাহাজটাকে মারতে জাহাজটা আটকে গেল পাহাড়ে। আবার পাহাড়ের কাছে টেনে আনতে থাকে।

টারজন এবার বোল্টনকে বলল, আমি ওখানে গিয়ে দেখি জল কতটা। যাঁরা সাঁতার জানে না আমি তাদের কোন নৌকো বা ভেলায় চাপিয়ে দিয়ে কূলে উঠতে সাহায্য করব।

রেলিংএর উপর তুলে ঝাঁপ দিল টারজন। সকলে জাহাজের উপর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল টারজনকে।

প্যাট্রিসিয়াও জলে ঝাঁপ দিয়ে টারজনের পাশে গিয়ে বলল, আমি সাঁতার জানি, আমি আপনাকে সাহায্য করব।

জেনেত্তেও ঝাঁপ দিল। কিন্তু সে সাঁতার জানত না। টারজন তাকে ধরে একটা নৌকোর উপর চাপিয়ে দিল।

তারপর বড় বড় জন্তুর খাঁচাগুলো খুলে দেওয়া হলো। প্রথমে তিনটে পোষা ভারতীয় হাতিকে ছেড়ে দেওয়া হল। মাহুত একটা হাতির পিঠে চেপে রইল। হাতিটা সাঁতার কেটে কূলে গিয়ে পৌছলে তা দেখে বাকি হাতিদুটোও তাই করল, তা দেখে আফ্রিকার বুনো হাতিগুলোও তাই করল।

এরপর বাঘ আর সিংহদের খাঁচাগুলো খুলে দেওয়া হল। বিপদ বুঝে তারাও নির্বিবাদে জল কেটে কূলে গিয়ে উঠল।

সকলে দেখতে লাগল। জন্তুগুলো ছাড়া পেয়ে কূলে উঠে জঙ্গল দেখতে পেয়ে একে একে সেই জঙ্গলে চলে গেল।

বাকি রইল শুধু সাপগুলো। টাবজন বলল, ওরা আমার চিরকালের শত্রু, ওরা মরে মরুক।

যাত্রীদের সকলকে কূলে নামিয়ে দিয়ে নাবিকরা খালি নৌকো আর ভেলাগুলো নিয়ে আবার জাহাজে ফিরে এল।

এরপর অনেকেই এগিয়ে এল টারজনের সাহায্যে। হান্স, টিবেট, ক্রোচ, চীনা নাবিকরা আর নাইয়াদ জাহাজের অনেকেই এগিয়ে এল। বাকি সবাই জাহাজ থেকে নেমে কূলে উঠে গেছে।

টারজন প্রথমে ওরাং ওটাংদের ছেড়ে দিল। টারজন তাদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কি সব কথা বলল, তারা ভয়ে টারজনকে জড়িয়ে ধরল। টারজন তাদের নামিয়ে দিল।

বোল্টন তাই আদেশ দিয়েছিল।

এরপর দুদিন ধরে জাহাজের মালপত্র সব নৌকোয় করে কূলে নিয়ে যাওয়া হলো।

তৃতীয় দিন বিকালের দিকে যখন শিবির তৈরীর সব কাজ হয়ে গেল তখন সকলের অলক্ষ্যে পাহাড়ের মাথা থেকে একডজন লোক বেলাভূমিতে বসে থাকা একদল অচেনা বিদেশী লোকদের দেখতে লাগল। এই প্রথম তারা তাদের দ্বীপে বিদেশী মানুষ দেখল।

পাহাড় থেকে যারা সাইগন জাহাজের বিপন্ন যাত্রীদের লক্ষ্য করছিল তারা ছিল সেই দ্বীপের আদিবাসী যোদ্ধা। তাদের কোমরে এক ধরনের লাল ছোট কাপড় জড়ানো ছিল, পায়ে ছিল চামড়ার চটি। মাথায় পালক, হাতে গয়না। তাদের সর্দার জালন দিনের বেশভূষা ছিল সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ।

তাদের হাতে ছিল তীর ধনুক। প্রত্যেকের পিঠে ছিল দুটো করে তূণ। আর ছিল একটা বর্শা আর পাথর ছোঁড়ার গুলতি। এছাড়া ছিল একটি করে কাঠের তরোয়াল, বর্শা আর চামড়া দিয়ে মোড়া কাঠের ঢাল।

সেদিন দুপুরবেলায় জাহাজ থেকে আনা মানচিত্রটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ক্যাপ্টেন বোল্টন। কিন্তু দেখল মানচিত্রে সমুদ্রের একশো মাইলের মধ্যে কোন দ্বীপের উল্লেখ নেই।

বোল্টন বলল, এমন হতে পারে যে এই দ্বীপটা এখনো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।

উবানোভিচ বলল, ঠিক আছে, আমরা যাব। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ও খাবারের ভাগ নিয়ে যাব আমাদের সঙ্গে।

টারজন বলল, তোমরা জীবন নিয়ে যেতে পারছ এটাই যথেষ্ট।

শিবির গড়ার কাজ হয়ে গেলে অস্ত্র তৈরীর কাজে মন দিল টারজন।

একদিন খুব সকালে অন্যরা ঘুম থেকে না উঠতেই তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল টারজন। নদীটার গতিপথ ধরে এগিয়ে চলল সে। কিন্তু নিচে অনেক ঘন ঝোপঝাড় থাকায় গাছের ডালে ডালে এগিয়ে চলল সে।

কিছুদূর এইভাবে যাবার পর টারজন দেখল দুটো ওরাং ওটাং তার পিছু পিছু আসছে। তারা ওর ভাষা বুঝত এবং শিবিরেই ছিল। টারজন তাদের বলল, গোলমাল করো না। টারজন শিকার করবে।

দলের সবাইকে ডেকে টারজন বলতে লাগল, এই শিবিরে স্মিৎস, ক্রাউজ, আবদুল্লা আর উবানোভিচকে থাকতে দেব না। ক্যাপ্টেন বোল্টন বলেছে, এ দ্বীপে হয়ত আমাদের সারাজীবন কাটাতে হবে। ওরা থাকলে আবার গোলমাল বাধবে।

এরপর সে ক্রাউজ, আবদুল্লা, স্মিৎস আর উবানোভিচকে বলল, তোমরা এখান থেকে উত্তর দিকে চলে যাও। এখান থেকে দশ মাইলের মধ্যে আসতে পাবে না তোমরা। এলে হত্যা করব আমি তোমাদের।

তারা তাই গাছে চড়ে ডালে ডালে বনের গভীরে চলে গেল।

পাহাড়ের ঢালু জায়গায় টারজন দেখল কয়েকটা হাতি গাছের ডালপালা খাচ্ছে। একটা হাতির গায়ে হাত বুলোতে সে টারজনকে শুঁড় দিয়ে তার পিঠে চাপিয়ে নিল।

টারজন তখন 'নালা নালা' বলে চীৎকার করতেই সে তাকে নামিয়ে দিল।

এরপর সে কিছুদূর গিয়ে হাতিটাকে ডাকতেই সে উত্তর দিল।

ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় ঘন জঙ্গল আর কাছে জল দেখে টারজন বুঝল এটা শিকারের একটা ভাল জায়গা।

সকাল হতেই নাকে শুয়োরের গন্ধ পেল টারজন। এর পরই সে পেল আরো দুটো গন্ধ—একটা সিংহের আর একটা মানুষের।

টারজন এবার গাছের উপর ডালে ডালে সেই গন্ধের সূত্র ধরে এগোতে লাগল।

এদিকে যে লোকটা একটা সিংহ ধরতে যাচ্ছিল সে হলো ঠাক চান। ঠাক চান সিংহ শিকার করতে আসেনি। জীবনে সে সিংহ দেখেনি কখনো। সে এসেছিল একটা শুয়োর শিকার করতে। কিন্তু শিকার করতে এসে হঠাৎ একটা সিংহকে দেখে ছুটে পালাতে থাকে সে।

চাক টুটুল জিউ নামে ঠাক চানের এক পূর্ব-পুরুষ জুকাতান থেকে এই দ্বীপে এসে চিচেন ইৎজা নামে এক নগর স্থাপন করে। তার আগে সমুদ্রের মধ্যে এই দ্বীপটা দেখে সে তার নাম দেয় উকজান বা উক্সনাল।

ঠাক চান শিকারে এসেছিল সেই চিচেন ইৎজা নগর থেকে।

সিংহটাকে দেখে ভয়ে পালাতে থাকে ঠাক চান। ক্ষুধিত সিংহটার গতির সঙ্গে পেরে ওঠেনি সে। তাই একটা ফাঁকা জায়গা দেখে সেখানে হতাশ হয়ে বসে পড়ে। মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকে। সিংহটা তার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

এমন সময় ঠাক চান দেখল দেবতার মত দেখতে গৌরবর্ণ এক নগ্ন মানুষ গাছ থেকে হঠাৎ সিংহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সিংহটা মাটিতে পড়ে যেতেই তার গলাটা একটা হাত দিয়ে ধরে আর একটা হাতে ধরা ছুরিটা সিংহটার পাঁজরে বসিয়ে দিতে লাগল বার-বার। সিংহটা কিছুতেই পেরে উঠল না। অবশেষে বারবার ছুরির আঘাতে লুটিয়ে পড়ল সিংহটা।

সিংহটা মরে যেতেই লোকটা তার মৃতদেহের উপর একটা পা রেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে এমন ভয়ঙ্করভাবে চীৎকার করে উঠল যা শুনে ভয় পেয়ে গেল ঠাক চান। লোকটা আসলে দেবতা না শয়তান তা বুঝতে পারল না। ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল তার মনটা।

টারজনকে বনদেবতা ভেবে ঠাক চান মধুর সম্ভাষণে কৃতজ্ঞতা জানাল তাকে। কিন্তু তার উত্তরে টারজন যা বলল তার কিছুই বুঝতে পারল না সে। ভাবল দেবতারা হয়ত এই ভাষাতেই কথা বলে।

এরপর বনদেবতা টারজনকে সঙ্গে করে সে চিচেন ইৎজা নগরের প্রান্তে এসে হাজির হলো। ঠাক চান হাত বাড়িয়ে নগরটাকে দেখিয়ে বলল, চিচেন ইৎজা।

নগরের বাইরের মাঠে অনেক নারী পুরুষ চাষের কাজ করছিল। নগরদ্বারে যোদ্ধারা পাহারা দিচ্ছিল।

টারজন দেখল এক বিরাট প্রাচীর দিয়ে গোটা নগরটা ঘেরা। নগরের মাঝখানে আছে পিরামিডের মত একটা উঁচু মন্দির। নগরের মধ্যে অনেক বড় বড় বাড়ি আছে। নগরের লোকগুলো ঠাক চানের মত বেঁটে খাটো আর বাদামী রঙের।

টারজনের নগ্ন দৈত্যাকার মূর্তির পানে তাকিয়ে

সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল। ঠাক চান নগরদ্বারের প্রহরীদের কাছে গিয়ে বনদেবতা চে হিসাবে টারজনের পরিচয় দিল। বলল, একটা বিরাট আকারের হিংস্র জন্তুর কবল থেকে এই দেবতা বাঁচিয়েছে তাকে।

কিছুদিন আগে পাহাড় থেকে যে একদল আদিবাসী সাইগন জাহাজের বিপন্ন যাত্রীদের দেখতে পায় সেই দলের সর্দার জালন দিনও নগরদ্বারের প্রহরীদের মধ্যে ছিল।

জালন দিন টারজনকে বলল, তুমি যদি বনদেবতা চে হও তাহলে তার প্রমাণ দাও। তাহলে আমাদের রাজা তোমাকে ভক্তি ও সম্মানের সঙ্গে বরণ করে নেবে।

ঠাক চান বলল, দেবতারা মানুষের ভাষা বুঝতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলে না।

ঠাক চানের কথায় আর টারজনের দেবতার মত চেহারাটা দেখে কিছুটা মুগ্ধ হলো জালন দিন। সে তাই তাদের সঙ্গে করে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন মন্দিরে নিয়ে গেল তাদের।

সেখানে অনেক যোদ্ধা, পুরোহিত ও সর্দার ছিল। জালন দিন একজন পুরোহিতকে ঠাকচানের সব কথা বুঝিয়ে বলল।

টারজন যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ভাবল এই নগরে প্রবেশ করা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। তাকে তারা ফাঁদে ফেলতে পারে এবং তার থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

এরপর প্রধান পুরোহিত চান ইপ প্রথমে টারজনের চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তাকে সম্মানের সঙ্গে সম্বোধন করল। কিন্তু সর্দার জালন দিন তাকে জানাল এই দেবতা কোন মর্ত্য মানবের সঙ্গে কথা বলেন না।

চান ইপ তাকে বলল, তুমি সমুদ্রের বেলাভূমিতে একদল বিদেশীকে দেখেছিলে। এ তাদেরই একজন নয় ত?

সর্দার জালন দিন বলল, তা হতে পারে হুঁজুর।

চান ইপ বলল, এ যদি দেবতা হয় তাহলে তারাও সবাই দেবতা। কিন্তু তুমি বলেছিলে এক ভগ্ন জাহাজ কূলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

জালন দিন বলল, এ কথা সত্য।

প্রধান পুরোহিত বলল, তাহলে এরা সবাই মানুষ। কারণ দেবতা হলে তারা ঝড় তুফানকে জয় করতে পারত।

এ কথা খুব সত্য।

চান ইপ তখন বলল, তাহলে এই লোকটাকে দেবতার কাছে বলি দেওয়া হবে। একে নিয়ে যাও এখান থেকে।

ঘটনার স্রোত এইভাবে প্রতিকূলে যাওয়ায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল ঠাক চান। তবু সে প্রতিবাদের সুরে বলল, এঁর কাজ আপনি দেখেননি হুঁজুর। আপনি দেখেননি একটা জন্তু আমাকে গ্রাস করতে এলে ইনি তার পিঠের উপর লাফ দিয়ে পড়ে তাকে মেরে ফেলেন। দেবতা ছাড়া কোন মানুষ সে কাজ করতে পারে না।

প্রধান পুরোহিত ঠাক চানকে বলল, এখান থেকে চলে যাও, তা না হলে তোমাকেও বলি দেওয়া হবে অথবা কূয়োর জলে ডুবিয়ে মারা হবে।

ঠাক চান ভয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

প্রধান পুরোহিতের কথা টারজন বুঝতে না পারলেও তার হাবভাব এবং ঠাক চানের চলে যাওয়ার অর্থ সে বুঝতে পেরেছিল।

টারজন চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিল, মন্দিরের বাইরে একটা বাগান আছে। তার ওপারে নগরপ্রাচীরের ওধারে শুরু হয়েছে গভীর বন। টারজন দেখল সেখান থেকে নগরপ্রাচীর খুব একটা দূরে নয়।

টারজন এবার প্রধান পুরোহিতকে ফেলে দিয়ে যোদ্ধাদের হাতগুলো সরিয়ে দিয়ে মন্দিরের পাঁচিলে উঠে লাফ দিয়ে বাগানে পড়ল। তারপর বাগান থেকে একটা বড় বাড়ির ছাদে উঠে ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নগরের রাজপথে পড়ল।

চেতনা ফিরে পেয়ে টারজন দেখল সে একটা ঘরে একটা কাঠের খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। ঘরের মধ্যে ছিল একটামাত্র জানালা। সেই জানালা দিয়ে অল্প কিছু আলো আসছিল বাইরে থেকে।

টারজন দেখল তার খাঁচার রেলিংগুলো কাঠের এবং সে চেষ্টা করলেই খাঁচা থেকে মুক্ত করতে পারে নিজেকে। কিন্তু খাঁচা থেকে কি করে বেরোবে সেইটাই হলো সমস্যা।

খাঁচার দুটো কাঠের রেলিং খুলে খাঁচা থেকে বার হলো টারজন। একটি রেলিং হাতে লাঠির মত ধরে দরজার কাছে অপেক্ষা করতে লাগল।

রাজপথে যে সব মানুষ ছিল তারা টারজনের নগ্নপ্রায় বাদামী রঙের চেহারাটা দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

রাজপথের প্রান্তে ছিল নগরদ্বার। সে দ্বারে কয়েকজন প্রহরী পাহারা দিচ্ছিল। নগরদ্বারের ওপারেই ছিল বন। নগরদ্বারটা কোনরকমে পার হয়ে গেলেই মুক্ত হয়ে যাবে টারজন। কিন্তু প্রহরীরা তাকে বাধা দিল।

টারজন তখন তাদের একজনকে ধরে তার দেহটা দিয়ে ঠেলে অন্যদের সরিয়ে পার হয়ে এগিয়ে যেতে থাকল। কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে একটা পাথরখণ্ড এসে সজোরে তার মাথার পিছন দিকে লাগতেই অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেল টারজন।

সহসা দরজা খুলে একজন যোদ্ধা ঘরের মধ্যে ঢুকতেই টারজন তাকে এমনভাবে মেরে ফেলল যে সে কোন শব্দই করতে পারল না। খোলা দরজা দিয়ে মুখ বার করে সে দেখল বাইরে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। কতকগুলো জয়ঢাক রয়েছে এক-জায়গায়। তাদের কোন একটা উৎসব হচ্ছে।

এমন সময় টারজনের চোখ পড়ল সেই ঘরের দরজার বাইরে, একটা মেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তাকে ঘিরে আছে চারজন পুরোহিত। একজন পুরোহিত একটা ছুরি ধরে আছে শায়িত মেয়েটির বুকের উপর। মেয়েটিকে তারা হয়ত বলি দেবে। তারই জন্য এ উৎসবের আয়োজন।

যে পুরোহিতের হাতে ছুরি ছিল সে তার ছুরিটা মেয়েটির বুকে বসিয়ে দেবার জন্য হাতটা তুলতেই

তার হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিল টারজন।

তারপর সেই পুরোহিতটাকে দুহাতে ধরে অন্য দুজন পুরোহিতের উপর এমনভাবে ফেলে দিল যে তারা মন্দিরের মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বাকি দুজনকে সে তার হাতের লাঠি দিয়ে মেরে ধরাশায়ী করে দিল।

সমবেত জনতা টারজনের কাণ্ড দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ ও হতবাক হয়ে গেল। তারা তাকে কোনরকম বাধা দিতে পারল না।

টারজন তখন বন্দিনী মেয়েটিকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে যে পথে এসেছিল সেই পথে নগর-প্রাচীরের দিকে এগিয়ে চলল।

ইৎজল চা নামে যে মেয়েটিকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছিল সে নিজেকে মুক্ত করার কোন চেষ্টা করল না। সে ভাবল বনদেবতা চে তাকে উদ্ধার করে যখন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন তাকে বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না।

নগর প্রাচীর পার হয়ে মাঠে গিয়ে পড়ল টারজন। মাঠের ওপারেই বন। অবাধে বনের ভিতরে চলে গেল টারজন।

ইৎজল চাকে নিয়ে বনের গভীরে ঢুকে বনদেবতা চে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। সে একটা গাছে উঠে তার মুখ দিয়ে জোর গলায় এক বিকট চীৎকার করল। সেই চীৎকার শুনে দুটো কিম্ভূতকিমাকার জন্তু এসে বনদেবতা চে-র সঙ্গে মিলিত হলো। ইৎজল চা ভাবল ওই দুটো জন্তুও দেবতা; বনদেবতার সহচর। তাদের ভাষা ইৎজল চা কিছুই বুঝতে পারল না।

এবার টারজন চাকে বন থেকে এক পার্বত্য-পথে নিয়ে নামিয়ে দিল। ইশারায় তাকে হাঁটতে বলল।

যেতে যেতে পথে এক জায়গায় টারজন 'ট্যান্টর ট্যান্টর' বলে ডাকতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার এক পুরুষ হাতি ডালপালা ভেঙে ছুটে এল। তার বিরাট চেহারা দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়ল ইৎজল চা।

চেতনা ফিরে পেয়ে চা দেখল তারা এক বিরাটাকার জন্তুর পিঠে চেপে আছে। বনদেবতা তার পিছনে বসে আছে তাকে ধরে। তার সঙ্গী দুজন অপদেবতা জন্তুটার পাশে পাশে পথ চলছে।

এইভাবে মাত্র দু-এক ঘণ্টার মধ্যে জীবনে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভ করল ইৎজল।

তখন বিকাল শেষ হয়ে আসছিল। প্যাট্রিসিয়া ও জেনেত্তে কয়েকজন লোকের সঙ্গে শিবিরের উঠোনে বসে টারজনের কথাটা তখন সকলেই আলোচনা করতে লাগল।

প্যাট্রিসিয়া বলল, ঐ দেখ।

সকলে দেখল বনের ভিতর থেকে এক বিরাট হাতি এগিয়ে আসছে তাদের শিবিরের দিকে। হাতির পিঠে ছিল টারজন। দুটো ওরাং ওটাং হাতিটার দুপাশে হেঁটে আসছিল।

হাতিটা শিবিরের সামনে থামতেই টারজন মেয়েটিকে ধরে নামাল হাতির পিঠ থেকে।

ইৎজল চা ভাবল এরা সবাই দেবতা। তাই তার আর ভয় হলো না।

শিবিরের সকলে বিস্ময়ে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে কেউ কোন কথা বলতে পারল না।

টারজন প্যাট্রিসিয়ার কাছে গিয়ে বলল, আমি আশা করি এই মেয়েটির তুমি দেখাশোনা করবে।

প্যাট্রিসিয়া প্রতিবাদের সুরে প্রশ্ন করল, আমি?

হ্যাঁ তুমি।

কর্ণেল তখন টারজনকে বললেন, এ সবের মানে কি স্যার?

টারজন বলল, আমাদের দক্ষিণে এক নগর আছে। ওখানকার লোকরা নরবলি দেয় ওদের দেবতার কাছে। এই মেয়েটাকে ওরা বলি দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ আমি সেখানে গিয়ে পড়ি। আমি তখন ওকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি।

প্যাট্রিসিয়া বলল, আমিই ওকে দেখব।

কোন বৈচিত্র্য দেখা গেল না। প্যাট্রিসিয়া ইৎজল চাকে ইংরেজি শেখাতে লাগল। টারজনও ইৎজলের কাছ থেকে তাদের ভাষা শিখতে লাগল।

টারজন মাঝে মাঝে বনের মধ্যে শিকারে গিয়ে একটা করে বনশুয়োর শিকার করে আনত। সে ছাড়া অন্য কেউ শিকারে যেত না।

এদিকে চিচেন ইৎজা নগরে প্রধান পুরোহিত চান ইপ জিউ তখনো রেগে ছিল প্রচণ্ডভাবে। মন্দির থেকে বলি চুরি হয়ে গেছে। মন্দির অপবিত্র হয়ে গেছে। দেবতারা রেগে যাবেন।

সংগ্রহ করতে যাচ্ছিল। তখন শিবিরের অন্য সকলে প্রাতরাশ খাবার জন্য একজায়গায় জড়ো হয়েছিল।

কর্ণেল বলল, প্যাট্রিসিয়া কোথায়?

জেনেত্তে বলল, আমি উঠে তাকে দেখতে পাইনি। তার আগেই সে কোথায় চলে গেছে।

ইৎজল চা বলল, প্যাট্রিসিয়া ও টারজন আলাদা আলাদা সময়ে বেরিয়ে গিয়ে জঙ্গলে মিলিত হয়।

কর্ণেল বললেন, প্যাট্রিসিয়া যদি জঙ্গলে যায় তাহলে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব টারজন যেন তার পাশে থাকে।

এদিকে প্যাট্রিসিয়া নদীটা ধরে উত্তর-পূর্ব দিকে এগোতে লাগল। ভাবল টারজনও গাছের ডালে ডালে সেই দিক দিয়েই দ্বীপটার অন্য প্রান্তে এগিয়ে চলেছে।

প্যাট্রিসিয়া দেখল তার পাহাড়ী পথটা ক্রমশঃ

রাজা চিং কং জিউ বলল, মনে হয় বনদেবতা চেই তোমার বলিকে নিয়ে গেছে।

প্রধান পুরোহিত বলল, না না বনদেবতা নয়, সেদিন জালন দিন সমুদ্রের ধারে যে সব বিদেশীদের দেখেছিল ও তাদেরই একজন। তুমি একশো-জন যোদ্ধা পাঠিয়ে বিদেশীদের শিবির থেকে ইৎজল চাকে ধরে আনাও।

সেদিন সকালে টিবেট কয়েকজন নাবিককে নিয়ে সাইগন জাহাজ থেকে নৌকোর জন্য কাঠ

উঁচু হয়ে গেছে সামনে। সে ভাবল পাহাড়টায় উঠে দ্বীপটার কোথায় কি আছে ভাল করে দেখবে। উঠতে উঠতে এক জায়গায় গিয়ে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল প্যাট্রিসিয়া।

এমন সময় ক্রোচ বলল, সমুদ্রের বেলাভূমি দিয়ে যেন কারা আসছে?

বোল্টন বলল, এ যে দেখছি ক্রাউজ আর স্মিৎস আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে উবানোভিচ আর আবদুল্লাও আছে।

তারা সকলেই তখন খাপ থেকে পিস্তল বার করে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল।

ক্রাউজ শিবিরে তাদের সামনে এসে বলল, আমাদের কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই। দুজন লোককে আমরা আপনাদের এখানে পাঠিয়েছিলাম। তারা ফিরে যায়নি। আমাদের আরো দুজন লোককে সিংহতে ধরে নিয়ে গেছে। আপনারা আমাদের এভাবে বিপদের মধ্যে ছেড়ে দেবেন না। দয়া করে আমাদের এই শিবিরে থাকতে দিন। আমরা আপনাদেব আদেশ মেনে চলব।

কর্ণেল বলল, টারজন ফিরে এলে গোলমাল ও অশান্তির সৃষ্টি হবে।

ক্রোচ বলল, আমার মনে হয় ওদের তাড়িয়ে দেওয়া অমানুষিকতার কাজ হবে।

কর্ণেল বললেন, অন্ততঃ টারজন ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমবা এখানে থাক ক্রাউজ।

ক্রাউজ বলল, ধন্যবাদ কর্ণেল। আমরা সত্যিই ভাল ব্যবহার করব।

প্যাট্রিসিয়া কিছুক্ষণ সেখানে বসে থাকার পব আবাব কিছুটা এগিয়ে চলল। সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। জায়গাটা বড় শান্ত আর সুন্দর। সে ভাবল শিবির থেকে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসবে এখানে।

হঠাৎ ঝোপ থেকে একটা বাঘ বেরিয়ে পড়ল তার সামনে। তার লেজটা নাড়ছিল।

তার কাঁধ হতে রাইফেলটা নামিয়ে পর পর দুবার গুলি করল প্যাট্রিসিয়া।

শিবিরে তখন জেনেত্তে বলছিল, আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না। ওদের থাকতে দেওয়া মোটেই উচিত হয়নি।

হান্স ড গ্রোত্তে বলল, আমি ওদের দিকে নজর রাখব।

এমন সময় ওরা সকলে রাইফেলের দুটো গুলির শব্দ শুনতে পেলেন। কর্নেল বললেন, প্যাট্রিসিয়া নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে।

এই বলে তিনি ঘর থেকে তাঁর রাইফেলটা এনে যেদিক থেকে গুলির শব্দ এসেছিল সেইদিকে ছুটে গেলেন। তার পিছু পিছু রাইফেল হাতে হান্স, ক্রোচ, আলজি ও বোল্টনও ছুটে বেরিয়ে গেল।

ওরা সবাই জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলে স্মিৎস ক্রাউজের দিকে ঘুরে বলল, কি মজা। এবার দেখা যাক অস্ত্রশস্ত্র কি আছে। এটা আমাদের সুবর্ণ সুযোগ।

জেনেত্তে ভার ঘরে ছুটে গিয়ে তার রাইফেলটা তুলে নিতেই স্মিৎস তাকে বাধা দিল।

ওরা চারজন তখন একে একে সব অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ বার করল। তারপর পিস্তল উঁচিয়ে ওদের লস্করদের বাধ্য করল ওদের সব মালপত্র বয়ে নিয়ে যেতে। ক্রাউজ বলল, আমাদের যা যা দরকার সব পেয়ে গেছি।

জেনেত্তে বাধা দিতে ক্রাউজ তাকে আঘাত করল।

জেনেত্তের সব বাধাদানকে অগ্রাহ্য করে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ক্রাউজ।

জালন দিন আর তার একশোজন যোদ্ধা যখন সমুদ্রতীরবর্তী বিদেশীদের শিবিরের দিকে এগিয়ে আসছিল বনের মধ্য দিয়ে তখন তারা দুটো রাই-ফেলের গুলির আওয়াজ পায়। কিন্তু বন্দুকের গুলি সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না তাদের, জালন দিন ছিল সবার আগে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াল দিন। দেখল তাদের সামনে কিছু দূরে বিরাট একটা জন্তু পড়ে রয়েছে। জন্তুটা মৃত আর তার উপর একটা পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত একটা অস্ত্র হাতে-এক আশ্চর্য পোশাকপরা এক নারীমূর্তি।

জালন বুদ্ধিমান। সে তাই সামনে না গিয়ে বনের আড়াল থেকে লুকিয়ে ঘিরে ফেলতে বলল সেই নারীকে।

তারপর একদিক থেকে জালন দিন তার তরোয়ালে একটা শব্দ করতে সেদিকে তাকাল প্যাট্রিসিয়া আর সঙ্গে সঙ্গে জালন দিনের দুজন যোদ্ধা গিয়ে তার পিছন থেকে একটানে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল তার রাইফেলটা।

এরপর একমুহূর্তে চারদিক থেকে একশোজন যোদ্ধা এসে ঘিরে ফেলল তাকে।

প্যাট্রিসিয়া তাদের দেখে তারা কারা তা বুঝতে পারল। সে শুধু টারজনের মুখ থেকে এই ধরনের লোকদের কথা শোনেনি সে প্রাচীন মায়া সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক বইও পড়েছে।

ইৎজল চার কাছ থেকে শেখা মায়াদের ভাষায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে সে বলল, তোমরা আমাকে নিয়ে কি করবে?

জালন দিন বলল, সেটা আমাদের প্রধান পুরোহিত জিউ ঠিক করবে।

এই বলে সে তার চারজন যোদ্ধাকে চিচেন ইৎজা নগরে বন্দিনীকে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

প্যাট্রিসিয়াকে চারজন যোদ্ধা ধরে নিয়ে গেলে জালন দিন তার বাকি যোদ্ধাদের নিয়ে শিবির সাইগনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

এদিকে কর্নেল লে ও তাঁর সঙ্গীরা যে পথে প্যাট্রিসিয়া নেমে এসেছিল পাহাড় থেকে সেই পথে দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ তারা মাথায় পালকের পোশাকপরা একদল আদিবাসী যোদ্ধার সম্মুখীন হলো।

আদিবাসী যোদ্ধারা তাদের দেখতে পেয়েই পাথর ছুঁড়তে লাগল চীৎকার করতে করতে।

কর্নেল তাঁর সঙ্গীদের বললেন, এমনভাবে গুলি করো যাতে গুলিগুলো ওদের মাথার উপর দিয়ে চলে যায়।

কিন্তু জালন দিন যখন দেখল ওদের অস্ত্রগুলো শুধু শব্দ করছে, আঘাত করতে পারছে না তখন সে তার যোদ্ধাদের আক্রমণ চালিয়ে যেতে বলল।

কর্নেল তখন হুকুম দিলেন, ওদের হত্যা করার জন্য গুলি করো।

ওদের রাইফেলগুলো গর্জে উঠল। একঝাঁক গুলি ছুটে গেল। তাতে চারজন যোদ্ধা মারা গেল।

জালন দিন তবু এগিয়ে যেতে থাকলেও তার যোদ্ধারা গুলির ভয়ে পালাতে লাগল। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন দিকে বনের মধ্য দিয়ে ছুটে পালাতে লাগল।

কর্নেলরা প্রথমে পথ হারিয়ে উল্টোদিকে যাচ্ছিল। তারপর কিছুটা ঘোরাঘুরি করার পর অবশেষে তারা সমুদ্রের বেলাভূমিতে তাদের শিবিরের কাছে এসে পড়ল।

তারা শিবিরের কাছে এলে টিবেট বিষণ্ণ মুখে এগিয়ে এসে একটা দুঃসংবাদ দিল।

টিবেট বলল, বড়ই দুঃসংবাদ স্যার। আমি এইমাত্র শিবির থেকে আসছি। স্মিৎস আর তার বন্দীরা আমাদের শিবির থেকে সব অস্ত্রশস্ত্র এবং বেশ কিছু রসদ নিয়ে পালিয়ে গেছে। শুধু তাই

নয়, ওরা জেনেস্তেকেও ধরে নিয়ে গেছে।

হান্স ভ গ্রোত্তে টিবেটকে বলল, কোন্ পথে তারা গেছে টিবেট ?

সমুদ্রের তীর দিয়ে তাদের পুরনো শিবিরে বোধ হয়।

হান্স মর্মাহত ও ক্রুদ্ধ হয়ে সেই পথে যেতে লাগল।

কর্নেল বললেন, কোথায় যাচ্ছ ?

হান্স বলল, আমি তাদের ধরব।

কিন্তু তাদের হাতে এখন অনেক অস্ত্রশস্ত্র। তুমি একা কিছু করতে পারবে না। এখন আমাদের হাতে বাড়তি লোক নেই। ওরা যে কোন সময় আমাদের শিবির আক্রমণ করতে পারে।

গ্রোত্তে অনমনীয়ভাবে বলল, আমি যাবই।

তখন টিবেট বলল, আমিও যাব।

নাইয়াদ জাহাজের দুজন নাবিকও যেতে চাইল তাদের সঙ্গে। কর্নেল ওদের সাবধান করে দিলেন, খুব সাবধান। সামনের দিকে ওদের শিবিরে না গিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে ওদের শিবিরে যাবে।

ওরা চারজন তখনি সমুদ্রের ধার দিয়ে যাত্রা শুরু করল।

আদিবাসীদের সঙ্গে কর্নেলদের যখন যুদ্ধ হয় তখন রাইফেলের গুলির যে শব্দ হয় সেই শব্দ বনের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল টারজন। সেই শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে থাকে সে। কিন্তু শব্দটা ঠিক কোন্ দিক থেকে আসছিল তা ধরতে না পেরে ভুল পথে গিয়ে পড়ে সে।

টারজন দেখল সে শিবির সাইগনের পরিবর্তে স্মিৎসদের শিবিরের কাছে এসে পড়েছে। সে অতি সাবধানে বনের ভিতর দিয়ে ওদের শিবিরের কাছে এসে পড়ল। দেখল স্মিৎসরা প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র ও মালপত্র নিয়ে কোথা হতে ফিরল শিবিরে। সে আরও দেখল ক্রাউজ জেনেস্তেকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। সে তখন বুঝল স্মিৎসদের সঙ্গেই তার শিবিরের লোকদের যুদ্ধ হয়েছে এবং স্মিৎস-

রাই জয়ী হয়েছে। তবে কি তাদের শিবিরের সব লোক নিহত হয়েছে ?

প্যাট্রিসিয়া কোথায় ? ইংজল চারই বা কি হলো ?

এদিকে উভয় সংকটে পড়লেন কর্নেল। এখন তাঁর হাতে মাত্র চারজন সশস্ত্র লোক। এই লোক দিয়ে শিবির রক্ষা করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় প্যাট্রিসিয়ার খোঁজে চিচেন ইংজা নগরেও যাওয়া সম্ভব নয়।

কর্নেল যখন এই সব ভাবছিলেন তখন প্যাট্রিসিয়াকে চারজন যোদ্ধা উক্সমাল দ্বীপের রাজা আর প্রধান পুরোহিতের সামনে হাজির করল।

যোদ্ধারা রাজাকে বলল, জালন দিন এই বিদেশী বন্দিনীকে পাঠিয়ে দিল। জালন দিন বাকি যোদ্ধাদের নিয়ে বিদেশীদের শিবিরের দিকে এগিয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে। আমরা শব্দ শুনতে পেয়েছি।

রাজা বলল, জালন দিন ভালই কাজ করেছে।

প্রধান পুরোহিত জিউ বলল, এই নারীকেই বলি দেওয়া হবে দেবতার কাছে।

রাজা প্রধান পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটা কি কোন দেবী ?

ওদের কথাবার্তা বুঝতে পেরে প্যাট্রিসিয়া বলল, আমি বনদেবতা চের জীবনসঙ্গিনী। তিনি যখন এর আগে এই নগরে এসেছিলেন তখন তোমরা তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করায় তিনি রেগে আছেন তোমাদের উপর। তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও তাহলে আমাকে পাঠিয়ে দাও তাঁর কাছে। যদি তা না করো তাহলে তিনি তোমাদের ধ্বংস করবেন।

রাজা মাথা চুলকাতে চুলকাতে জিউকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা ত দেবতাদের চেন। বনদেবতা চে কি চিচেন ইৎজাতে এসেছিল? তোমরা কি সে দেবতাকে কাঠের খাঁচায় ভরে রেখেছিলে? আর সেই দেবতাই বন্দির মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে যায়?

প্রধান পুরোহিত জিউ বলল, না, সে ছিল একজন মানুষ।

তথাপি আমাদের তাড়াহুড়ো করে কোন কাজ করা উচিত হবে না। মেয়েটাকে এখন কুমারীদের মন্দিরে রেখে দাও কিছুকালের জন্য।

এই বলে রাজা দুজন পুরোহিতকে ডেকে প্যাট্রিসিয়াকে কুমারীদের মন্দিরে নিয়ে যেতে বলল, সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিল, তার সঙ্গে যেন ভাল ব্যবহার করা হয়।

প্যাট্রিসিয়া কিছুটা খুশি হলো এই অবস্থায়। সে ভাবল তার কথাগুলো প্রধান পুরোহিত বিশ্বাস না করলেও কিছুটা রেখাপাত করেছে রাজার মনে। যাই হোক কিছুদিনের জন্য অন্তত অব্যাহতি। তাতে টারজন তাকে উদ্ধার করার কিছুটা সময় পাবে অন্তত:।

টারজন বনের ভিতর থেকে স্মিৎসদের শিবির-টার অবস্থা দেখতে লাগল। সে ভাবল টারজন সশস্ত্র লোকের সামনে যাওয়া ঠিক হবে না। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো জেনেত্তেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া।

গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ওরা আরো কাছে এলে এবং লস্কররা মালপত্র নামিয়ে রাখলে টারজন প্রস্তুত হলো তার তীর ধনুক নিয়ে।

সহসা টারজনের ধনুক থেকে একটা তীর ছুটে গিয়ে ক্রাউজের বুকে বিঁধল। তীরটা বুকে গাঁথা অবস্থাতেই সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে ক্রাউজ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে মরে গেল।

অন্য সকলে ভয় পেয়ে গেল। উবানোভিচ বলল, কি হলো?

স্মিৎস বলল, ক্রাউজ মৃত। কেউ তীর মেরেছে বন থেকে।

আবদুল্লা বলল, টারজন ছাড়া আর কে?

স্মিৎস বলল, কোথায় সে?

টারজন বলল, এই যে এখানে আমি। আমার আরো অনেক তীর আছে। জেনেত্তে, তুমি সোজা আবার বনের ভিতরে চলে এস। কেউ তোমাকে বাধা দিতে এলে তার অবস্থা ক্রাউজের মতই হবে।

জেনেত্তে তাড়াতাড়ি শিবির থেকে বনের ভিতরে চলে এল। তাকে বাধা দেবার জন্য কেউ হাত তুলল না।

স্মিৎস চীৎকার করতে লাগল, আমি তাকে দেখে নেব।

এই বলে সে রাইফেল তুলে টারজনের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে গুলি করল।

আবার একটা তীর গিয়ে স্মিৎসের বুকটাকে বিদ্ধ করল। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বুকে হাত দিয়ে।

জেনেত্তে তার কাছে আসতেই গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল টারজন। তাকে বলল, শিবিরের অবস্থা কি?

জেনেত্তে যা যা ঘটেছিল সব বলল। টারজন তখন বলল, ওরা তাহলে স্মিৎস আর তার সঙ্গীদের শিবিরে থাকতে দিয়েছিল। কর্নেলের নির্বুদ্ধিতায় আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। এই বলে জেনেত্তেকে কাঁধে তুলে নিয়ে গাছের উপরে উঠে গাছে গাছে ডাল ধরে ধরে শিবিরের দিকে এগিয়ে চলল টারজন।

এদিকে বনের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে হ্যান্স আর টিবেট যখন স্মিৎসদের শিবিরের কাছে পৌঁছল তখন সে দেখল শিবিরের সামনে দুজন লোক মরে পড়ে আছে।

আবদুল্লা হ্যান্স আর টিবেটকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল থেকে গুলি চালাল। কিন্তু কোন গুলিই লাগল না তাদের গায়ে।

হ্যান্স তখন হাঁটু গেড়ে বসে টিবেটকে বলল, তুমি উবানোভিচকে আর আমি আবদুল্লাকে মারব।

এই বলে তারা গুলি চালাতেই উবানোভিচ ও আবদুল্লা মাটিতে পড়ে গেল।

কিন্তু জেনেত্তেকে দেখা গেল না শিবিরে। হ্যান্স দেখল, ক্রাউজ, আবদুল্লা আর উবানোভিচ মরে গেছে। কিন্তু স্মিৎস তখনো যন্ত্রণায় ছটফট করছে। হ্যান্স তাকে বলল, জেনেত্তে কোথায়?

স্মিৎস কোনরকমে বলল, বন্য লোকটা তাকে নিয়ে গেছে।

হ্যান্স বলল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে এখন নিরাপদ।

হ্যান্স আর টিবেটের সঙ্গে যে তিনজন নাবিক এসেছিল তারা সবাই মিলে অস্ত্রশস্ত্রগুলো নিল। বাকি সব মালপত্র স্মিৎসদের লস্করদের শিবির সাইগনে নিয়ে যেতে বলল।

এইভাবে তারা শিবির সাইগনের দিকে রওনা হলো।

এদিকে শিবিরের অবস্থা দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল টারজন। সে বলল, শিবিরে ওদের ঢুকতে দেওয়া উচিত হয়নি।

কর্নেল বললেন, দোষটা আমার। ওরা নিরস্ত্র, একটা নরখাদক সিংহ কাছেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাই মানবতার খাতিরে আমি ওদের থাকতে দিই।

এমন সময় স্মিৎসদের শিবির থেকে গুলি বিনিময়ের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।

টারজন বলল, এখন প্যাট্রিসিয়াকে খুঁজে বার করতে হবে। তোমরা ঠিক জান আদিবাসীরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে তাদের নগরে?

কর্নেল বললেন, আমি দুটো গুলির শব্দ পেয়ে ছুটে যাই সেইদিকে। কিন্তু একশোজন আদিবাসী যোদ্ধা ঘিরে ফেলে আমাদের। ওদের চারজন আমাদের গুলিতে মারা যেতে ওরা পালিয়ে যায়। তখন আমরা তাদের আর অনুসরণ করতে পারিনি। আমরা প্যাটকে দেখতে পাইনি বটে, তবে মনে হয় আমাদের সঙ্গে ওদের দেখা হওয়ার আগেই ওকে ওদের একটা দল তাকে ধরে নিয়ে যায়।

এরপর টারজন ইৎজল চাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের নগরের লোকরা প্যাট্রিসিয়াকে কি করবে বলত?

ইৎজল বলল, দু তিন দিন পর অথবা মাসখানেক পরে ওকে বলি দেবে। ততদিন আমার মনে হয় ওকে পিরামিডের উপরে কুমারীদের মন্দিরে রাখবে। ভাল পাহারার ব্যবস্থা থাকবে।

আজ রাতেই যাব।

ইৎজল চা এবার তার দুহাত দিয়ে টারজনের গলাটা জড়িয়ে ধরে অনুনয় বিনয়ের স্বরে বলল, তুমি যেও না। মেয়েটাকে তুমি উদ্ধার করতে পারবে না। ওরা তোমায় মেরে ফেলবে। আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমাকে বনে নিয়ে যাও! এখানে আমার কাউকে ভাল লাগে না।

টারজন বলল, ওরা ত সবাই তোমাকে দয়া করে।

ওদের দয়া আমি চাই না। আজ রাতে তুমি চিচেন ইৎজায় যেও না।

তার কাঁধে হাত বুলিয়ে টারজন বলল, আজ রাতেই আমি যাচ্ছি।

ইৎজল চা তখন রেগে বলল, আসলে তুমি তাকে ভালবাস এটাই হলো তোমার যাওয়ার কারণ।

টারজন বলল, এ কথা আর কখনো যেন বলো না।

এই বলে সে অন্য সকলের কাছে চলে গেল।

ইৎজল চা প্রচণ্ড রাগে গজগজ করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেল। মাটিতে পড়ে সে নিস্ফল আক্রোশে ছটফট করতে লাগল। তীব্র প্রতিহিংসা জাগল তার মনে।

এই সময় সে দরজার দিকে তাকাতেই দেখল হ্যান্সের দল ফিরে আসছে জয়ী হয়ে। শিবিরের সকলের দৃষ্টি তাদের উপরে পড়তেই তার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে বনের ভিতর চলে গেল ইৎজল চা।

হ্যান্স দেখতে পেয়েই ছুটে গিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল জেনেত্তে। বলল, আমি ভেবেছিলাম তুমি আর বেঁচে নেই।

হ্যান্স বলল, না না, আমি বেঁচে আছি। আর তোমাকে স্মিৎস বা তার দলকে ভয় করতে হবে না। ওরা সবাই এখন মৃত।

টারজন বলল, শুনে খুশি হলাম। ওরা অত্যন্ত পাজী লোক ছিল।

এদিকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চিচেন ইৎজা নগরের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল ইৎজল চা। তখন অন্ধকার হয়ে আসছিল বলে ভয় করছিল তার। কিন্তু একই সঙ্গে ঘৃণা, প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধ বাসনায় উন্মত্ত হয়ে সব ভয় ঝেড়ে ফেলে ছুটছিল সে।

প্রধান পুরোহিতের কাছে গিয়ে তার পায়ে পড়ে গেল ইৎজল চা। তাকে চিনতে পেরে প্রধান পুরোহিত জিউ বলল, আবার কেন ফিরে এলি?

আমি এই কথা তোমাদের জানাতে এসেছি, যে লোকটা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল সে আজ রাতে শ্বেতাঙ্গ মেয়েটাকে উদ্ধার করতে আসবে।

প্রধান পুরোহিত জিউ বলল, এই কথা আমাদের জানানোর জন্য তোমাকে এক বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে। তোমার সম্মানের জন্যই বলি দেওয়া হবে তোমাকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে।

এরপর ইৎজল চাকে বন্দিনী হিসাবে বলির জন্য একটা খাঁচায় রাখা হলো।

টারজন সন্ধ্যের সময় চিচেন ইৎজা নগরের কাছাকাছি এসে ঠিক করল, নগরের সকলে ঘুমিয়ে না পড়লে সে নগরে ঢুকবে না।

বাতাসে গন্ধ শুঁকে টারজন বুঝল, তার বন্ধু

হাতিটা নগরের আশে পাশেই আছে। টারজন হাতিটাকে ডাকতেই সে তার কাছে এল। তারপর তাকে পিঠে চাপিয়ে নগরদ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

নগরপ্রাচীরে উঠে প্রাচীর থেকে লাফ দিয়ে ওদিকের রাস্তার উপর পড়ল টারজন। রাস্তাগুলো তখন ছিল একেবারে ফাঁকা। টারজন অবাধে পিরামিডের মত দেখতে সেই মন্দিরটার তলায় এসে দাঁড়াল।

এদিকে কুমারীদের মন্দিরের দ্বারপথে বারোজন যোদ্ধা ছায়ায় গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে ছিল। তারা জানত আজ রাতে টারজন আসবে।

কিন্তু টারজন কাউকে দেখতে না পেয়ে মন্দিরের ভিতরে পা দিতেই একটা বড় জাল এসে ঢেকে ফেলল তাকে। সে তখন অসহায়।

তারপর প্রধান পুরোহিত চান ইপ জিউএর নেতৃত্বে টারজন ও প্যাট্রিসিয়াকে নিয়ে এক বিরাট মিছিল বার হলো।

মিছিলটা সমস্ত নগর পরিক্রমা করে নগর-সীমানার বাইরে একটা মৃত আগ্নেয়গিরির গহ্বরের পাশে থামল। সেই গহ্বরের তলায় অনেক জল ছিল।

ঢাক, ঢোল, ভেরী প্রভৃতি বাজনার সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। তারপর একসময় তারা টারজনকে ধরে ফেলে দিল সেই গহ্বরের মধ্যে।

প্যাট্রিসিয়া এই ঘটনাতে মর্মাহত হলেও ভেঙ্গে পড়ার মত মেয়ে সে নয়। টারজনকে গহ্বরের

দুজন পুরোহিত তখন ভেরী বাজাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল সমস্ত শহর। অসংখ্য মানুষ চারদিক থেকে আলো হাতে ছুটে আসতে লাগল।

টারজনকে ধরে সিঁড়ি বেয়ে নিচেতে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর প্যাট্রিসিয়াকে আনানো হলো কুমারী মন্দির থেকে।

জলে ফেলে দেওয়ার পর সে গহ্বরের উপর মুখ বাড়িয়ে বলল, টারজন, তুমি কোনরকমে জলে ভেসে থাক। আমি মায়া সভ্যতার লোকদের প্রথা জানি। যদি কোন অপরাধীকে এই পবিত্র কূয়োর জলে ভোরবেলায় ফেলে দিয়ে সে দুপুর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে তাহলে তাকে দেবতা হিসাবে দেখে ওরা।

টারজন হাসিমুখে হাত নাড়ল। প্যাট্রিসিয়ার ভাষা বুঝতে পারল না পুরোহিতরা।

অবশেষে সূর্য মধ্য আকাশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিবোধ করতে লাগল প্রধান পুরোহিত চান ইপ জিউ। দুপুর হলেও যদি লোকটা বেঁচে থাকে তাহলে এটাই প্রমাণিত হবে যে সে-ই বন-দেবতা চে। সেটা তার পক্ষে ক্ষতিকর হবে। তখন বন-দেবতাই হয়ে উঠবে সর্বেসর্বা।

দুপুর গত হতেই জনতা এক প্রবল উল্লাসে ফেটে পড়ল। কারণ তারা নিজের চোখে দেখল বন্দী তখনো বেঁচে আছে পবিত্র কূয়োর জলে।

একটা দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে সেটা ফেলে দেওয়া হলো টারজনের কাছে। টারজন ফাঁসটা ছাড়াই দড়ি ধরে উঠে এল।

টারজন উঠেই রাজা ও প্রধান পুরোহিতের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, আমিই বনদেবতা চে, আমি একজন মানুষের বেশ ধারণ করে মর্ত্যে নেমে এসেছিলাম কিভাবে তোমরা রাজ্যশাসন করছ তা দেখার জন্য। কিন্তু তোমাদের শাসন-কার্যে সন্তুষ্ট নই আমি। এখন আমি যাচ্ছি। দিনকতক পর আবার এসে দেখব তোমরা কোন উন্নতি করতে পেরেছ কি না। এখন আমি এই মেয়েটিকে নিয়ে যাচ্ছি। ইৎজল চাকে ছেড়ে দাও। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কাউকে যেন বলি দেওয়া না হয়।

এই বলে টারজন প্যাট্রিসিয়ার হাত ধরে পাহাড় থেকে নামতে লাগল। তাদের পিছনে এক বিরাট জনতা গান গাইতে গাইতে আসতে লাগল। নগর-দ্বারের কাছে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল টারজন।

টারজন এক অদ্ভুত চীৎকার করল। একটা হাতির নাম ধরে ডাকতে লাগল। তার ডাক শুনে একটা হাতিও চীৎকার করতে করতে ছুটে এল।

প্যাট্রিসিয়া ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু টারজন বলল, আমার বন্ধু। ভয়ের কিছু নেই।

এই বলে হাতিটার শুঁড়ের উপর হাত রাখল টারজন। তারপর সে তাদের একে একে শুঁড় দিয়ে তুলে নিতে বলল।

তারা হাতির পিঠে চাপলে হাতিটা ঘুরে যাত্রা শুরু করতেই ওরা দুজনেই পিছন ফিরে দেখল চিচেন ইৎজার সব লোক নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছে এবং তাদের মাথাগুলো মাটিতে ঠেকানো আছে।

এদিকে শিবির সাইগনে তখন সকলেই টার-জনের আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছে। তারা ভাবছিল টারজন আর প্যাট্রিসিয়াকে আর তারা দেখতে পাবে না কখনো।

কর্ণেল বললেন, কেন তুমি লোকটার বিরুদ্ধে শুধু শুধু তিক্ত হয়ে উঠছ। সে ত আমাদের সঙ্গে মিত্রতা ছাড়া কখনো শত্রুতা করেনি।

এমন সময় জেনেত্তে বলল, টারজন এসে গেছে। সঙ্গে প্যাট্রিসিয়া।

হাতির পিঠ থেকে নেমে ছুটে শিবিরে চলে এল প্যাট্রিসিয়া।

এমন সময় দূরে সমুদ্রের উপর একটা জাহাজ দেখা গেল।

ক্যাপ্টেন বোল্টন চোখে বাইনাকুলার দিয়ে দেখে বলল, আরে এটা ত নাইয়াদ জাহাজ, ভাসতে ভাসতে এইদিকেই আসছে।

হয়তো হল্যাণ্ডের সব মানুষই জেদী নয়, যদিও অন্য অনেক গুণের সঙ্গে জেদী মানসিকতাকেও তাদের অন্যতম জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। হেন্‌ড্রিক ভ্যান ডের মিয়ার-এর চরিত্রে এই জেদটা পুরোপুরিই আছে। কর্মসূত্রে সে সুমাত্রার একজন রবার ব্যবসায়ী। আর ব্যবসাতে সফলও বটে।

ফিলিফিন আক্রান্ত হল। হংকং সিঙ্গাপুরের পতন ঘটল। সে কিন্তু তখনও স্বীকার করল না যে জাপানীরা নেদারল্যাণ্ড পূর্ব ভারতকে দখল করতে পারবে। ফলে, স্ত্রী ও কন্যাকে সে অন্যত্র সরিয়ে দিল না।

তাছাড়া হেন্‌ড্রিক ভ্যান ডের মিয়ার জাপানীদের ঘৃণা করত। সে বলল, আরে দেখই না দুদিন পরে আমরাই ওদের ঠেঙিয়ে গাছে চড়িয়ে দেব। ইতিহাস কিন্তু প্রমাণ করে দিল যে তার এই ভবিষ্যদ্বাণী একেবারেই ভুল।

জাপানীরা এসে হাজির হল। হেন্‌ড্রিক ভ্যান ডের মিয়ার পাহাড়ে আশ্রয় নিল। সঙ্গে তার স্ত্রী এলজে ভাশ্চূর্র; আঠারো বছর আগে তাকে সে হল্যাণ্ড থেকে সঙ্গে করে এনেছিল; আর ছিল তার মেয়ে কোরি। দুটি চীনা চাকর লুম্ কাম্ এবং সিংতাইও ওদের সঙ্গ নিল। সঙ্গ নিল দুটি কারণে—প্রথমটা জাপানী-ভীতি: তাদের হাতে যে কী হাল হবে সেটা তারা ভালই জানে; আর দ্বিতীয় কারণ, ভ্যান ডের মিয়ার পরিবারের প্রতি তাদের সত্যিকারের ভালবাসা। জাপানী রবার-শ্রমিকরা থেকেই গেল। তারা জানত, আক্রমণকারীরা রবারের ব্যবসা চালাবে, আর তাদেরও কাজ জুটবে।

যাই হোক, জাপানীরা এল, আর হেন্‌ড্রিক ভ্যান ডের মিয়াররাও পাহাড়ে আশ্রয় নিল। কিন্তু কিছুটা দেরী করে ফেলল। জাপানীরা তাদের তাড়া করে ফিরতে লাগল। সব নেদারল্যাণ্ডবাসীদেরই তাড়া করতে লাগল।

পাহাড়ের আরও উপরে উঠতে গিয়ে ক্রমেই কষ্ট বাড়তে লাগল। রোজ বৃষ্টি হচ্ছে। পথঘাট কর্দমাক্ত। ভ্যান ডের মিয়ারের যৌবন পার হয়েছে; তবু এখনও সে কর্মক্ষম আছে। কোরির বয়স ষোল।

স্বাস্থ্য, শক্তি ও পরিশ্রমের অভ্যাস তার আছে। সে দলের অন্য সকলের সঙ্গে সমান তালেই চলেছে। কিন্তু এল্‌জে ভ্যান ডের মিয়ারের কথা আলাদা। মনের বল থাকলেও দেহের বল নেই। তার উপর বিশ্রামের অভাব। একটা গ্রামে পৌঁছে কুঁড়ে ঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে সবে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়েছে, এমন সময় আদিবাসীরা এসে খবর দিল, এই মুহূর্তে পালাতে হবে।

তিন সপ্তাহ ধরে চলল একটানা হাঁটা একটা নির্ভরযোগ্য গ্রামের সন্ধানে। এল্‌জে ভ্যান ডের মিয়ার আর চলতে পারছে না। দু'দিন কোন গ্রামের দেখা মেলে নি। বন-জঙ্গলে যা জোটে তাই একমাত্র খাদ্য। জামা-কাপড় সব সময়ই বৃষ্টিতে ভেজা।

মাঝে মাঝেই পাহাড়ি নদী। কখনও হেঁটে পার হল, কখনও বা ভঙ্গুর দড়ির ঝুলন্ত সেতু বেয়ে।

এল্‌জে ভ্যান ডের মিয়ার আর হাঁটতে পারল না। লুম্ কাম্ তাকে পিঠে তুলে নিল। গাইডরা বার বার তাড়া দিচ্ছে তাড়াতাড়ি পথ চলতে, কারণ ইতিমধ্যেই দু'দুবার তারা বাঘের ডাক শুনেছে।

বার বার থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড়ের মাথায় উঠে কুকুরের ডাক শুনেই বুঝতে পারল তারা একটা গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। গাইডদের মুখে সব কথা শুনে গ্রামের সর্দার তাকু মুদা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

তারা তাদের খাবার দিল; ঘুমবার জন্য শুকনো ঘর দিল। কিন্তু এল্‌জে ভ্যান ডের মিয়ার কিছুই খেতে পারল না। জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। হেন্‌ড্রিক ভ্যান ডের মিয়ার ও কোরি সারা রাত তার পাশে জেগে কাটাল। দুপুরের আগেই এল্‌জে ভ্যান ডের মিয়ার মারা গেল।

বাপ-মেয়েতে শুকনো চোখে পাথরের মত মৃতার পাশেই বসে রইল। এমন সময় বাইরে একটা হৈ-চৈ শোনা গেল। ছুটে ঘরে ঢুকল সিংতাই।

বলল, শিগ্‌গির কর। জাপানীরা এসে পড়েছে।

ভ্যান ডের মিয়ার উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি যাচ্ছি ওদের সঙ্গে কথা বলতে। আমরা তো ওদের কোন ক্ষতি করি নি। হয় তো ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করবে না।

সিংতাই বলল, ওই বাঁদর-মুখোদের তুমি চেন না।

কিন্তু আমার তো আর কিছু করার নেই। দেখ সিংতাই, আমি যদি বিফল হই, তাহলে মিসিকে নিয়ে তুমি পালিয়ে যেয়ো। সে যেন জাপানীদের হাতে না পড়ে।

সে মই বেয়ে নেমে গেল। লুম্ কাম্ গেল তার সঙ্গে; দুজনই নিরস্ত্র। কোরি ও সিংতাই ঘরের ভিতর থেকেই তাদের উপর নজর রাখল।

কানে এল সাদা মানুষটির কণ্ঠস্বর আর জাপানীদের বকবকানি। তার কিছুই তারা বুঝতে পারল না। হঠাৎ দেখতে পেল, একটা রাইফেলের কুঁদো লোক দুটির মাথার উপরে উঠল আবার হঠাৎ নেমে এল। তারা জানে, রাইফেলের মাথায় আছে বেয়নেট। কানে এল একটা আর্তনাদ। আরও রাইফেলের কুঁদো উঠল ও নামল। আর্তনাদ

থেমে গেল। কানে এল শুধু অমানুষদের উচ্চ হাসি।

সিংতাই মেয়েটির হাত ধরে 'চলে এস' বলে টানতে টানতে তাকে ঘরের পিছন দিকে নিয়ে গেল। সেখানে একটা দরজা আছে, নীচে আছে শক্ত মাটি।

সিংতাই তাকে ধরে নামাল। তারপর তাকে নিয়ে চলল গ্রামের বাইরের জঙ্গলের দিকে।

অন্ধকার নেমে আসার আগেই একটা গুহা খুঁজে পেয়ে দুদিন সেখানেই লুকিয়ে রইল। তারপর ব্যাপারটা জানতে সিংতাই গ্রামে ফিরে গেল।

দুটি বছর কেটে গেছে। কোরি ও সিংতাই আশ্রয় পেয়েছে অনেক দূরের একটা পাহাড়ি গ্রামে। সেখানকার সর্দার তিয়েং উমর।

একদিন অন্য গ্রামের একটি লোক সেখানে এল। কোরি ও সিংতাইকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল, কিন্তু কিছু না বলেই চলে গেল। সিংতাই বলল, অবস্থা খুব খারাপ। ও গিয়ে আমাদের কথা বলে দেবে আর বাঁদর-মুখোরা চলে আসবে। তুমি বরং ছেলে সাজ, তারপর আমরা অন্য কোথাও গিয়ে লুকিয়ে পড়ি।

সিংতাই কোরির সোনালী চুলকে মাপ মত করে কেটে দিল; কলপ লাগিয়ে কালো করে দিল। ভুরুও রং করে দিল। নীল ট্রাউজার ও ঢিলে ব্লাউজে তাকে একটি আদিবাসী ছেলের মতই দেখতে লাগল। তারপর দুজন নামল এক সীমাহীন যাত্রাপথে। নতুন আশ্রয় খুঁজে দেবার জন্য তিয়াং উমর তাদের সঙ্গে কয়েকজন গাইড দিয়ে দিল। গ্রামের অনতিদূরে একটা ছোট পাহাড়ি ঝর্ণার ধারে একটা গুহায় তারা আশ্রয় পেল। সুমাত্রার জঙ্গলে নানা রকম ফল-মূল পাওয়া যায়। ঝর্ণায় মাছ পাওয়া যায়। তাছাড়া তিয়াং উমর মাঝে মাঝে তাদের জন্য মুরগি ও ডিম পাঠায়। আলাম নামে একটি যুবক সে সব নিয়ে আসে। অচিরেই তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠল।

উপকূলরক্ষী ভারী কামান বসাবার উপযুক্ত জায়গার খোঁজে এবং সেখানে যাতায়াতের পথের জরিপ করতে ক্যাপ্টেন তোকুজো মাৎসুয়ো এবং লেফটেন্যান্ট হাইদিয়ো সোকাবে একদল সৈন্য নিয়ে হুসিনের গ্রামে এসে হাজির হল। এই হুসিনই ভ্যান ডের মিয়ার পরিবারকে ধরিয়ে দিয়েছিল। তারা সর্দার হুসিনকে জানিয়ে দিল, আপাতত এই গ্রামেই তারা ছাউনি ফেলবে। হুসিন যেন তাদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে।

কোরি ও সিংতাই গুহার মুখে বসে আছে। এক সপ্তাহ আগে আলাম তাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছিল। তারপর আর আসে নি। তাই খাবারের অপেক্ষাতেই দুজন বসে আছে।

কান পেতে সিংতাই বলল, কারা যেন আসছে। অনেক লোক। ভিতরে চল।

হাইদিয়ো সোকাবে সসৈন্যে গুহায় ঢুকল। তার

হাতে উদ্যত তরবারি আর সৈন্যদের হাতে বেয়নেট। অস্পষ্ট আলোয় সোকাবে দেখতে পেল একটা চীনা ও একটা স্থানীয় ছেলেকে। সোকাবে চেঁচিয়ে বলল, মেয়েটা কোথায়? এর জন্য তোমরা সব্বাই মরবে। এটাকে শেষ করে দাও।

কে যেন বলে উঠল, এটাই মেয়ে। ছেলের পোশাক পরে আছে।

সোকাবে কোরির ব্লাউজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল। মুখে ফুটে উঠল কুটিল হাসি। একটি সৈনিকের বেয়নেট বিঁধল সিংতাই-এর বুকে। সৈন্যদল ফিরে চলল বন্দিনীকে নিয়ে।

গোলন্দাজ বাহিনীর সহকারী ইঞ্জিনীয়ার ব্রুক্‌লিনের এসি সার্জেন্ট জো 'ডাইনেম' বুবোনোভিচ অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে 'লাভলি লেডি'র ডানার ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল।

মার্কিন কর্ণেল শুধাল, সব ঠিক আছে জেরি?

সব ঠিক স্যার।

বিদ্যুৎ ও মেরামত কর্মীরা তাদের গ্যাজেট ও কামানকে শেষ বারের মত পরীক্ষা করে পিছনের দরজা দিয়ে উঠে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধযাত্রীরাও বিমানে চড়ে বসল।

আগাম পর্যবেক্ষণ ও ফটো তোলার উদ্দেশ্যে কর্ণেল জন ক্লেটন একটি বিমান-ঘাটি (সেন্সর বিমান-ঘাটির নামটা কেটে দিয়েছে) থেকে উড়ে চলেছে নেদারল্যাণ্ড পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জাপ-অধিকৃত সুমাত্রার আকাশপথে। বিমানে উঠে প্রথমে সে দাঁড়াল পাইলটের পিছনে। তারপর দীর্ঘ যাত্রাপথে কখনও বসল সহ-পাইলটের আসনে, কখনও বা পাইলটের আসনে। কথা বলল চালক ও রেডিও ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে বিমানে কোথাও কোন বোমা নেই।

একটা জিপ এসে দাঁড়াল বি-২৪-এর ডানার নীচে। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল তিন অফিসার —আর-এ-এফ কর্ণেল, এ-এ-এফ কর্ণেল, ও এ-এ-এফ মেজর। 'লাভলি লেডি'-র পাইলট ওকলাহোমা সিটির ক্যাপ্টেন জেরি লুকাস এগিয়ে গেল; এ-এ-এফ কর্ণেল তাকে পরিচয় করিয়ে দিল কর্ণেল ক্লেটনের সঙ্গে।

ফটোগ্রাফার জনৈক এস সি সার্জেন্ট হাতের ক্যামেরাটা ঠিকঠাক করছিল। সে মুখ তুলে হাসলে ক্লেটনও হাসতে হাসতে গিয়ে তার পাশে বসে পড়ল।

প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছে। মোটরের শব্দে কানে তালা লাগছে। ফটোগ্রাফারের কানের কাছে মুখ নিয়ে ক্লেটন চীৎকার করে ক্যামেরা-সংক্রান্ত কয়েকটা প্রশ্ন করল। ফটোগ্রাফারও চীৎকার করে

জবাব দিল। বি-২৪ যখন আকাশে ওড়ে তখন কথাবার্তা বলাই দায়। তবু ক্লেটন তার দরকারী তথ্যগুলি জেনে নিল।

ভোরের দিকে সুমাত্রার উত্তর-পশ্চিম ভূখণ্ড তাদের চোখে পড়ল। দিনটিও ফটো তোলার পক্ষে চমৎকার। মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত এগারোশ' মাইল দীর্ঘ এই ভূখণ্ডটির মেরুদণ্ড স্বরূপ পর্বত শ্রেণীর মাথার উপরে মেঘ জমেছে; কিন্তু যতদূর দৃষ্টি যায় উপকূলরেখা সম্পূর্ণ নির্মেঘ। আর তাদের কাজ তো উপকূলকে নিয়েই।

জাপানীরা নিশ্চয় তাদের আগমনের খবর রাখে না। তাই প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তারা নির্বিঘ্নে ফটো তুলল। তার পরই বাধা এল। সে বাধা কাটিয়ে আরও নীচে নামতেই শত্রুর আক্রমণ তীব্রতর হল। কয়েকটি গোলা অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বিমানটা আরও বেশ কিছুক্ষণ নির্বিঘ্নেই উড়ে চলল।

পাডাং-এর কাছে তিনটি জিরো-বিমান যেন সূর্যের বুক থেকে গর্জে উঠে নেমে এল তাদের উপর। বুবোনোভিচের পাল্টা আক্রমণে একটা বিমান আগুন লেগে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। অপর দুটি বিমান সরে গিয়ে বেশ কিছুটা দূর থেকে উড়তে লাগল। তার পরই আবার নেমে এসে অ্যাক-অ্যাক শব্দে গোলা ছুঁড়তে লাগল। ইঞ্জিনের মাথায় পড়ে বোমাটা ছিটকে এসে পড়ল ককপিটে। লুকাস রক্ষা পেল, কিন্তু তার সহপাইলটের আঘাত লাগল মুখে। পাশে বসা পর্যবেক্ষকটি তার সেফ্‌টি-বেল্টটা খুলে দিয়ে টানতে টানতে তাকে ককপিটের বাইরে নিয়ে গেল প্রাথমিক সাহায্যের জন্য। কিন্তু ততক্ষণে তার মৃত্যু ঘটেছে।

ক্রমেই আক্রমণ এত তীব্র হয়ে উঠল যে, মস্ত বড় বিমানটা গোঁ-গোঁ শব্দ করতে লাগল। অগত্যা আক্রমণের হাত এড়াতে লুকাস সেটাকে চালিয়ে দিল তীরভূমির ভিতর দিকে, কারণ সে জানে যে বিমানধ্বংসী কামানগুলি বসানো আছে তটরেখা বরাবর। তাছাড়া পাহাড়ের মাথার উপরকার মেঘের আড়ালে লুকিয়ে তারা সেখান থেকে দেশের দিকে পাড়ি দিতে পারবে।

দেশ! মুক্তি-যোদ্ধারা অতীতেও অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিয়েছে। তেইশ বছর বয়সের ক্যাপ্টেন একটি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল। দ্রুত হলেও সঠিক সিদ্ধান্ত। হুকুম দিল, একমাত্র প্যারাসুট ছাড়া বিমানে আর যা কিছু আছে—কামান, গোলা, লাইফ বেল্ট—সব ফেলে দেওয়া হোক। ঘাঁটিতে ফিরে যাবার সেটাই একমাত্র পথ।

যেই তারা মেঘে ঢাকা পাহাড়ের দিকে মুখ ফেরাল অমনি আক্রমণকারীরাও সেই দিকেই এগিয়ে এল। লুকাসের মতলবটা জাপানীরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। লুকাস জানে এখানকার পাহাড়ের অনেক চূড়াই বারো হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু। তাই সে উড়তে লাগল বিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে। ধীরে ধীরে সে উচ্চতা কমাতে লাগল।

একটা পাহাড়ের ঠিক উপরে পৌঁছতেই চূড়ার উপর থেকে গর্জে উঠল কামান। লুকাসের কানে এল একটা প্রচণ্ড শব্দ। একটা আহত জন্তুর মত বিমানটা কাত হয়ে পড়ল। লুকাস সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল বিমানটাকে চালিয়ে নিতে। সংযোগ-রক্ষাকারীর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করল। কোন জবাব এল না। লোকটি মারা গেছে। সহ-পাইলটের আসনে বসে ক্লেটনও সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল। পর্যবেক্ষককে ডেকে বলল, সব কিছু দেখে নাও। সকলেই যাতে লাফিয়ে পড়ে সেদিকে নজর রেখো। তারপর তুমি লাফ দিও।

পর্যবেক্ষক মুখ বাড়িয়ে দেখল, সামনের গোলন্দাজটিও মারা গেছে। বেতারে লোকটি ডেকে ফিরে গিয়ে বলল, পিছনদিকটাও উড়ে গেছে। সেই সঙ্গে বুচ ও ফটোগ্রাফারও হাওয়া।

লুকাস বলল, ও. কে.। তুমি লাফ দাও। ক্লেটনের দিকে ফিরে বলল, এবার আপনার পালা স্যার।

ক্লেটন বলল, তোমার আপত্তি না থাকলে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব ক্যাপ্টেন।

লুকাস সঙ্গে সঙ্গে বলল, লাফ দিন।

ক্লেটন হেসে বলল, রাইট-ও!

লুকাস বলল, বোমা ছুঁড়বার জানালাটা খুলে দিয়েছি; সেদিক দিয়েই সহজ হবে। তাড়াতাড়ি করুন।

ক্লেটন জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। বিমানটি কাত হয়ে নীচে পড়ছে। তার ইচ্ছা, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত—লুকাস লাফ দেওয়ার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। শেষ মুহূর্ত সমাগত। বিমানটি উল্টে গেল। ক্লেটন ছিটকে পড়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

অজ্ঞান অবস্থায় সে ছুটে চলল মৃত্যুর দিকে। ভারী মেঘের ভিতর দিয়ে সে চলেছে। তিনটে গর্জনমুখর ইঞ্জিন নিয়ে 'লাভলি লেডি' গর্জন করতে করতে তার পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল। মাটিতে ভেঙে পড়ার আগেই সেটা জ্বলে-পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শত্রুরা কিছুই জানতে পারবে না, কিছুই উদ্ধার করতে পারবে না।

কিছুক্ষণ পরেই ক্লেটনের জ্ঞান ফিরে এল। মেঘের স্তর পার হয়ে এখন সে পড়ছে মুষলধারা বর্ষণের মধ্যে। হয়ত সেই ঠাণ্ডা বৃষ্টির জন্যই সে বেঁচে গেল। জ্ঞান হতেই সে প্যারাসুটের দড়িটা ধরে টান দিল।

প্যারাসুটটা ফুলে উঠল। অদ্ভুতভাবে ঝুলতে লাগল তার শরীরটা। নীচে বৃষ্টি-ভেজা সবুজের সমুদ্র। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার শরীরটা নীচে ডালপালা ও লতার মধ্যে ছিটকে পড়ল। প্যারাসুটটা আটকে গেল। সে নিজে ঝুলতে লাগল মাটি থেকে শ' দুই ফুট উপরে। মৃত্যু আর দূরে নয়।

একই সঙ্গে কয়েকশ' গজ দূরে একটা প্রচণ্ড শব্দ হল—একটা বিস্ফোরণে আগুন জ্বলে উঠল দাউ-দাউ করে। 'লাভলি লেডি'-র অন্তিম চিতার আগুনে জলে-ভেজা অরণ্য ঝিলমিল করতে লাগল।

একটা ছোট ডাল ধরে ক্রেটন একটা বড় ডালে উঠে সেখানে আশ্রয় নিল। প্যারাসুটের বাঁধন খুলে ফেলল। ইউনিফর্ম ও তলবাস ভিজে জপজপ করছে। টুপিটা আগেই কোথায় পড়ে গেছে। এবার জুতো জোড়াও খুলে ছুঁড়ে দিল। তারপর ফেলে দিল পিস্তল ও গুলি। তারপর মোজা, ট্রাউজার ও তলবাস। রইল শুধু বেল্ট ও খাপবদ্ধ ছুরিটা।

তারপর আরও উপরে উঠে সবগুলো দড়ি কেটে দিয়ে প্যারাসুটটা খুলে নিল। ভাঁজ করে বেঁধে সেটাকে কাঁধে ফেলল। ডাল থেকে ডালে ঝুলতে ঝুলতে নীচে নেমে গেল।

বিমান-দুর্ঘটনার ফলে কে যে কোথায় ছিটকে পড়ল, কে বেঁচে রইল আর কে মারা গেল, কে তার হিসাব রাখে।

বন্দী অবস্থায় লোকগুলির সঙ্গে চলতে চলতে কোরি ভ্যান ডের মিয়ার দুটি সমস্যার কথাই ভাবতে লাগল : কেমন করে পালাবে, আর পালাতে না পারলে কেমন করে মরবে।

সকাল গড়িয়ে গেল। আকাশে ঘন মেঘ। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে তারা পথ চলতে লাগল। পচা ঘাস-পাতার গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। মাটি থেকে উঠে আসছে ভ্যাপ্‌সা মৃত্যু-বাষ্প! মেয়েটি জানে প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে এগিয়ে দিচ্ছে মৃত্যুর মুখে; যদি না—

মাথার উপরে মোটরের গর্জন শোনা গেল। এ রকম শব্দ তো হামেশাই শোনা যায়। জাপানীরা তো সর্বদাই উড়ে বেড়াচ্ছে। পরক্ষণেই কানে এল বিস্ফোরণের একটা কান-ফাটা শব্দ। হয়তো শত্রু-পক্ষের কোন বিমানই ভেঙে পড়েছে—এ কথা ভেবে কোরি মনে মনে খুশিই হল।

ক্যাপ্টেন তোকুজো মাৎসুয়ো যে গ্রামে বাসা নিয়েছে সেখানে পৌঁছতে তাদের রাত হয়ে গেল। তাদের দেখেই ক্যাপ্টেন বলল, বন্দীরা কোথায়?

কোরির হাত ধরে ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সোকাবে বলল, এই নিন।

আমি তোমাকে পাঠালাম একটা চীনা ও একটা সোনালী চুল ওলন্দাজ মেয়েকে আনতে আর তুমি এনে হাজির করলে একটা কালো চুল ছোকরাকে। ব্যাপারটা কি?

সোকাবে বলল, চীনাটাকে আমরা মেরে ফেলেছি। আর এটিই সেই ওলন্দাজ মেয়ে।

সোকাবে সব কথা খুলে বলল। মেয়েটির মাথার চুল তুলে নীচেকার সোনালী চুল বের করে বলল, দেখুন।

মেয়েটিকে ভাল করে দেখে মাথা নেড়ে মাৎসুয়ো বলল, ওকে আমি রেখে দিলাম।

গাছের ডালটা প্রবলভাবে নড়ে উঠতেই জেরি লুকাসের ঘুম ভেঙে গেল। বুবোনোভিচ ও রসেটিরও ঘুম ভাঙল। রসেটি বলল, কথা বলো না।

চারদিকে তাকিয়ে বুবোনোভিচ বলল, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।

জেরি মাথাটা বের করে উপরে তাকাল। মস্ত বড় একটা কালো জন্তু কয়েক ফুট উপরে বসে গাছটাকে দোলাচ্ছে। জেরি বলল, এবার দেখতে পাচ্ছ?

রসেটি বলল, গীজ! বাঁদর কখনও এত বড় হয় তা তো জানতাম না।

বুবোনোভিচ বলল, ওটা বাদর নয়। ওকে বলে বেঁটে পঙ্গো। কেন যে বেঁটে বলে তা তো বুঝি না। বলাতো উচিত পঙ্গো দানব।

শ্রীম্প বলে উঠল, মার্কিনী ভাষায় কথা বল।

লুকাস বলল, তাহলে বলি, ওটা ওরাংউটান।

মালয় ভাষায় ওরাংউটান মানে বনমানুষ; কথাটা তার থেকেই এসেছে, বুবোনোভিচ যোগ করল।

শ্রীম্প শুধাল, ওটা কি মানুষ খায় অধ্যাপক-বুবোনোভিচ?

না; ওরা প্রধানত শাকপাতা খায়।

ওরাংউটানটা ধীরে ধীরে সেখান থেকে প্রস্থান করল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে শ্রীম্প বলল, আরে, আমাদের ডিউক কোথায় গেল?

লুকাস বলল, তাই তো। কখন গেল খেয়াল করি নি তো।

শ্রীম্প বলল, কাল রাতে নির্ঘাৎ বাঘের পেটে গেছে।

বুবোনোভিচ আঙুল বাড়িয়ে বলল, ওটা তাহলে তার ভূত আসছে।

সকলেই তাকাল। রসেটি বলল, হায় পিটার! কী মানুষরে বাবা!

গাছের ডালে ডালে ঝুলতে ঝুলতে কাঁধে একটা মরা হরিণ নিয়ে ক্লেটন এসে নামল গাছের ডালে। বলল, এই নাও প্রাতরাশ। লেগে যাও।

হরিণটাকে নামিয়ে ছুরি বের করে একটা বড় টুকরো সে কেটে নিল নিজের জন্য। তারপর একটু সরে গিয়ে তাতে দাঁত বসিয়ে দিল।

সিংতাই মরে নি। জাপানী বেয়নেট তার বুকে বিঁধেছিল কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে বিদীর্ণ করে নি। দুদিন সিংতাই সেই রক্তাপ্লুত গুহার মধ্যেই পড়ে ছিল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। প্রচুর রক্তপাত এবং খাদ্য-পানীয়ের অভাবে দুর্বল দেহে কোন রকমে টলতে টলতে এগিয়ে চলল তিয়াং উমরের গ্রামের দিকে।

ভাবতে ভাবতে পথ চলছে, এমন সময় প্রায় উলঙ্গ একটি দৈত্য তার পথের সামনে এসে হাজির হল। দৈত্যটার দেহ ব্রোঞ্জ-কঠিন, কালো চুল, ধূসর চোখ। সিংতাই ভাবল, এখানেই তার জীবনের অবসান হবে।

গাছ থেকে লাফিয়ে নেমেই ক্লেটন ইংরেজীতে

সিংতাইএর সঙ্গে কথা বলল। সিংতাইও ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে জবাব দিল। হংকং-এ থাকতে অনেক বছর সে একটি ইংরেজ পরিবারে বাস করেছিল।

ক্লেটন জিজ্ঞাসা করল, তোমার এ অবস্থা কি করে হল?

জাপানী বাঁদরগুলো একটা বেয়নেট বসিয়ে দিয়েছিল—ঠিক এইখানে।

কেন?

সিংতাই সব ঘটনা খুলে বলল।

জাপানীরা কি কাছাকাছি আছে?

মনে তো হয় না।

তুমি যে গ্রামের দিকে চলেছ সেটা কতদূর?

আর বেশী দূর নয়—এক কিলোমিটারের মত হতে পারে।

সে গ্রামের লোকেরা কি জাপানীদের বন্ধু?

না। জাপানীদের তারা ঘৃণা করে।

ক্লেটনের সঙ্গীরা এতক্ষণে রাস্তার মোড় ঘুরে তাদের দেখতে পেল।

লুকাস বলল, দেখছ, এবারও সে ভুল করে নি।

সকলে এগিয়ে আসতেই সিংতাই সভয়ে তাদের দিকে তাকাল।

ক্লেটন বলল, ভয় নেই। এরা আমার বন্ধু—মার্কিন বৈমানিক।

মার্কিন! সিংতাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এতক্ষণে মনে হচ্ছে মিসিকে বাঁচাতে পারব।

এবার ক্লেটনই সব কথা সকলকে শুনিয়ে দিল। সকলেই একমত হয়ে তিয়াং উমরের গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল।

সিংতাইএর মুখে সব কথা শুনে তিয়াং উমর সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। সিংতাইকে দো-ভাষী করে বলল, আগের দিন সকালেই ওলন্দাজ মেয়েটি ও তাদের গাঁয়ের একটি যুবককে নিয়ে জাপানীরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে তা সে জানে না।

সিংতাই অশ্রুসিক্ত চোখে ক্লেটনকে মিনতি জানাল, কোরিকে তারা জাপানীদের হাত থেকে উদ্ধার করে দিক। আলোচনার পরে সকলেই তাতে সম্মত হল।

তারা চলেছে ধীরে ধীরে, খুব সতর্ক হয়ে। সকলের আগে ক্লেটন।

গ্রামে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেল। সকলকে অপেক্ষা করতে বলে ক্লেটন এগিয়ে গেল। গ্রামের মুখে কোন রক্ষীই নেই। সহজেই ভিতরে ঢুকে গেল। আকাশে চাঁদ নেই। তারাগুলি মেঘে ঢাকা পড়েছে। কয়েকটি ঘরে আবছা আলো জ্বলছে।

ক্লেটনের তীক্ষ্ণ নাকে যে গন্ধ এল তাতেই সে সাদা মেয়েটির অবস্থান বুঝতে পারল। দুটি জাপানীর ক্রুদ্ধ তর্জন-গর্জনও কানে এল। নিশ্চয় সেই দুই অফিসার এখনও ঝগড়া করছে।

ক্লেটন সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল। ফিস্‌ফিস্ করে কিছু নির্দেশ দিয়ে তাদের নিয়ে গ্রামের পিছন দিকটায় ফিরে গেল। বলল, তোমাদের '৪৫ গুলোতে যে কার্তুজ ভরা সেগুলি নিশ্চয় ছোঁড়া যাবে। যতক্ষণ পারবে গুলি ছুঁড়বে। আটকে গেলে সমানে পাথর ছুঁড়তে থাকবে। আর সারাক্ষণ নারকীয় চীৎকার করতে থাকবে। মোটকথা এই দিকেই সকলের মনোযোগ টেনে রাখবে। তিন মিনিটের মধ্যে কাজ শুরু করবে, আর চতুর্থ মিনিটেই এখান থেকে সরে পড়বে। বলেই সে চলে গেল।

জঙ্গলের পথে কিছুদূর চলেই ক্লেটন মেয়েটিকে নামিয়ে দিল। তার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে ফেলল।

ওলন্দাজ ভাষায় মেয়েটি বলল, কে তুমি?

চুপ! ক্লেটন ধমক দিল।

আরও চারজন এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। অন্ধকার পথ বেয়ে তারা নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। ইংরেজি ভাষায় 'চুপ' কথাটা মেয়েটিকে কিছুটা আশ্বস্ত করেছে। আর যাই হোক, এরা জাপানী নয়।

গ্রামের উঁচু দিকটায় পৌঁছে সে অফিসারদের বাড়িটার পিছনে লুকিয়ে পড়ল। এক মিনিট পরেই অপর প্রান্তে গুলি ছোঁড়া শুরু হয়ে গেল। হৈ-চৈ চীৎকারে রাতের স্তব্ধতা ভেঙে খান্‌খান্ হয়ে গেল। ক্লেটনের মুখে হাসি দেখা দিল।

এক সেকেণ্ড পরেই অফিসার দুজন হাঁক-ডাক করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সব বাড়ি থেকে সৈনিকরা ছুটল শব্দ লক্ষ্য করে। ক্লেটন ছুটে গিয়ে মই বেয়ে উপরে উঠে গেল। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মেয়েটি মাদুরে শুয়ে আছে। নীচু হয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ক্লেটন ছুটল জঙ্গলের দিকে। মেয়েটি ভয়ে সারা। এ আবার কি নতুন বিপদ!

একটি ঘণ্টা তারা নীরবে পথ চলল, এবার কোরি ইংরেজীতে শুধাল, তোমরা কারা?

ক্লেটন বলল, বন্ধু। সিংতাই তোমার কথা আমাদের জানিয়েছে। তাই আমরা এসেছি।

তাহলে সিংতাই মারা যায় নি?

না; তবে মারাত্মক রকম জখম হয়েছে।

তিয়াং উমরের গ্রামে পৌঁছতে ভোর হয়ে গেল। সেখানে কিছু সময় অপেক্ষা করে খাওয়া-দাওয়া সেরে তারা আবার যাত্রা করল।

দীর্ঘ পথ হাঁটার মত অবস্থা সিংতাইএর ছিল না; তাই তাকেও তিয়াং উমরের গ্রামে রেখে যেতে তারা বাধ্য হল।

একদিন সকালে দলের পুরুষরা সকলেই শিকারে বেরিয়ে গেল। কোরি একা বসে হরিণের চামড়া দিয়ে একটা চটি বানাতে বসল। সেই সুযোগে জনদশেক সুমাত্রাবাসী এসে কোরিকে তুলে নিয়ে গেল। তাদের কথাবার্তা থেকেই কোরি জানতে পারল, তাকে ও সিংতাইকে ধরে দেবার জন্য জাপানীরা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

সূর্যাস্তের পরেই শিকারীরা গুহায় ফিরল। ঘরে ঢুকতেই বুঝতে পারল, মেয়েটি নেই। কোথায় গেল?

নানা জনে নানা কথা বলতে লাগল। তাদের থামিয়ে দিয়ে ক্লেটন বলল, না, সে শিকারেও যায় নি, পালিয়েও যায় নি। একদল আদিবাসী তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। পায়ের দাগ দেখিয়ে বলল, তারা ঐদিকে গেছে। যেমন করে হোক, মেয়েটিকে আমরা উদ্ধার করবই। রাতটা কাটিয়ে ভোরেই আমরা যাত্রা করব।

আলো ফুটে উঠতেই কোরির অপহরণকারীদের পথ ধরে তারা যাত্রা করল। আমেরিকানদের চোখে কোন পায়ের দাগ দেখা না দিলেও ইংরেজটির অভ্যস্ত চোখে তা স্পষ্ট হয়েই ধরা দিল।

রাতের অন্ধকার নেমে আসতেই কোরির অপহরণকারীরা একটা পাহাড়ি উপত্যকার একপ্রান্তে ছাউনি ফেলল। বড় বিড়ালকে দূরে রাখতে একটা ধুনি জ্বালিয়ে সকলে সেটাকে ঘিরে বসল; শুধু একটি লোক পাহারায় রইল।

ক্লান্ত মেয়েটি বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমল। যখন ঘুম ভাঙল তখন ধুনি নিভে গেছে, পাহারাদারটিও ঘুমিয়ে পড়েছে। এই সুযোগে পালাতে হবে। বাইরে জঙ্গল—বিপদসংকুল ঘন অন্ধকার, অন্ধকারের একটা নিরেট প্রাচীর যেন। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে সম্ভাবিত মৃত্যু। কোরি সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করল না।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। রক্ষীটি শুয়ে আছে নেভা আগুনের ছাইয়ের পাশে। সকলকে পাশ কাটিয়ে কোরি জঙ্গলে প্রবেশ করল। হোঁচট খেতে খেতে অন্ধকারে এগিয়ে চলল।

পথের উপরকার গাছের ডালে বসে 'লাভলি লেডি'র জীবিত যাত্রীরা বাঘের জন্য অপেক্ষা করে আছে। কতক্ষণে সে এসে চলে যাবে, তবে তারা গাছ থেকে নামতে পারবে।

গাছের উপর থেকে নীচে পথের দুদিকের দুটো মোড় পর্যন্ত শ'খানেক ফুট পরিষ্কার দেখা যায়—যে কোন দিকেই প্রায় পঞ্চাশ ফুট করে। হঠাৎ নিঃশব্দ পায়ে দেখা দিল সেই বাঘ। আর সঙ্গে সঙ্গে উল্টো-দিকে মোড়ে দেখা দিল কোরির চিকন দেহ। বাঘ ও মেয়েটি যুগপৎ দাঁড়িয়ে পড়ল—দুজনের মধ্যে ব্যবধান একশ' ফুটেরও কম। চাপা গর্জন করে বাঘটা সামনে পা বাড়াল। কোরি বুঝি বা ভয়ে জমে গেল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দেখল, একটি প্রায়-উলঙ্গ মানুষ গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল বাঘটার পিঠে। সঙ্গে সঙ্গে আরও তিনটি লোক খাপ-খোলা ছুরি হাতে ছুটে এল বড় বিড়ালের সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষটির দিকে। তাদেরই একজন এস সার্জেন্ট রসেটি।

দেখতে দেখতে বাঘটা নিস্তেজ হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। লোকটি তার উপর একটা পা রেখে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে একটা বীভৎস হুংকার ছাড়ল—গোরিলার বিজয়-হুংকার।

সভ্য ও সংস্কৃতিবান এই মানুষটিকে দেখে কোরি হঠাৎ ভীষণ ভয় পেল। অন্য তিনজনের অবস্থাও তথৈবচ।

হঠাৎ জেরি লুকাস তাকে চিনতে পারল। বলে উঠল, জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোক—গোরিলাদের টারজন।

শ্রীম্পের চোয়াল ঝুলে পড়ল। সে জানতে চাইল, এই কি সেই জনি উইস্‌মুলার?

হাঁটতে শুরু করল। আগে বুবোনোভিচ, তার পিছনে রসেটি। জেরি ও কোরি চলেছে কয়েক গজ পিছনে। মোকাসিনের ফিতেটা বাঁধতে কোরি একটু থামল; জেরিও তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। আঁকাবাঁকা পথের মোড়ে বাকি দুজন অদৃশ্য হয়ে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে কোরি বলল, টারজন না থাকলে কেমন যেন অসহায় লাগে। তোমার লাগে না?

·· না, না, তোমার, বুবোনোভিচ বা রসেটির উপরও আমার পুরো ভরসা আছে, তবু—

জেরি হেসে বলল, এতো কিন্তু-কিন্তু করার কিছু নেই। আমারও তাই মনে হয়। কি জান, এখানে

বুঝিবা পরিস্থিতিটাকে ঠিকমত বুঝবার জন্যই টারজন মাথাটাকে বার কয়েক ঝাঁকি দিল।

সহাস্যে কোরিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, তাহলে শেষ পর্যন্ত ওদের হাত থেকে ছাড়া পেলে?

কোরি মাথা নাড়ল; তখনও সে ভয়ে কাঁপছে। বলল, হ্যাঁ, কাল রাতেই পালিয়েছি।

পরদিন দিনের আলো ফুটতেই পাহাড়ের উৎরাই ধরে সকলে হাঁটতে লাগল। এক জায়গায় পথটা দুভাগ হয়ে গেছে। টারজন সেখানে থেমে হঠাৎ একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। পরমুহূর্তেই সে উধাও। অবাক হয়ে বাকি সকলে আবার

আমাদের সকলের অবস্থাই ডাঙ্গায় মাছের মত। কিন্তু টারজনের বেলায় তা নয়। এখানেই তাকে ভাল মানায়। সে না থাকলে আমাদের কি যে হত।

এই জঙ্গলে আমাদের অবস্থা হত মায়ের কোল ছাড়া ছোট শিশুর মত—

হঠাৎ কান খাড়া করে জেরি বলে উঠল, শুনতে পাচ্ছ! বিচিত্র ভাষায় কর্কশ চেঁচামেচি। জাপানী! সে চেঁচিয়ে বলল। সেই দিকে ছুটে যাবার উদ্যোগ করেও সে থেমে গেল। কোন্ দিক সে রক্ষা করবে? দুই সহকর্মীকে, না এই মেয়েটিকে? দ্রুত সিদ্ধান্ত

নিতে সে সিদ্ধহস্ত। কোরির হাতটা চেপে ধরে তাকে টানতে টানতে পথের পাশের ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটতে লাগল। খানিকটা গিয়ে একটা ঝোপের নীচে এমনভাবে শুয়ে পড়ল যে তাদের খোঁজে কেউ এক ফুট দূর দিয়ে চলে গেলেও তাদের দুজনকে দেখতে পাবে না।

একডজন সৈনিক বুবোনোভিচ ও রসেটিকে আচমকা আক্রমণ করে বেঁধে ফেলল। আত্মরক্ষার কোন সুযোগই তারা পেল না। জাপানীরা তাদের চড়-চাপড় মারল, বেয়নেট দিয়ে খোঁচা দিল। এমন সময় লেঃ তাদা তাদের কাছে ডাকল। তাদা ইংরেজি ভাষা বলতে পারে। ও কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ইউজেন-এর একটা হোটেলে কাপ-ডিস ধোয়ার কাজ করত। দেখামাত্রই সে তাদের আমেরিকান বলে চিনতে পারল। তার প্রশ্নের জবাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ নাম, পদবি ও ক্রমিক সংখ্যা জানিয়ে দিল।

যে বিমানটিকে আমরা গুলি করে নামিয়েছি তোমরা সেটাতেই ছিলে? তাদা প্রশ্ন করল।

যা কিছু বলা সম্ভব সবই বলেছি।

জাপানী ভাষায় তাদা একটি সৈনিককে কি যেন বলল। লোকটি এগিয়ে গিয়ে বুবোনোভিচের পেটে বেয়নেটটা ঠেকাল। তাদা বলল, এবার আমার প্রশ্নের জবাব দেবে তো?

রসেটি জবাব দিল, বলার তো কিছু নেই।

তোমাদের দলে পাঁচজন ছিল—চারটি পুরুষ ও একটি মেয়ে। বাকি তিনজন কোথায়? মেয়েটিই বা কোথায়?

আমাদের দলে ক'জন ছিল তা তো দেখতেই পাচ্ছ। আমাদের কি পাঁচজন বলে মনে হয়? না কি তুমি গুণতেই জান না? আমাদের দু'জনকে দেখে কি সুন্দরী বলে মনে হয়? না, দেখছি তোমার

মাথাটি কেউ খেয়েছে তোজো।

তাদা বলল, ও. কে.। কাল সকাল পর্যন্ত ভাববার সময় দিলাম। কাল সকালে হয় আমার প্রশ্নের জবাব দেবে, আর না হয় তোমাদের দুজনেরই মাথা কাটা যাবে। তাদা কোমরে ঝোলানো অফিসারদের লম্বা তলোয়ারে হাত রাখল। ৬৬৫

দু'জনকে দলের অন্য লোকদের খোঁজে পাঠিয়ে বাকি সৈন্যদের নিয়ে তাদা বন্দীদ্বয়সহ আমাতের গ্রামের দিকে যাত্রা করল।

জেরি ও কোরি ঝোপের নীচে শুয়ে সব কথাই শুনল। দলটা যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই তাদের চলে যাবার শব্দ তারা শুনতে পেল, কিন্তু দু'জনকে যে তাদের খোঁজেই পাঠানো হয়েছে সেটা জানতে পারল না। আর ধরা পড়ার ভয় নেই ভেবে ঝোপের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে তারা আবার পথে পা বাড়াল।

চলতে চলতে এক সময় হঠাৎ কে যেন আসছে, বলে মেয়েটিকে টেনে নিয়ে জেরি আবার ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

একটু পরেই দুটি জাপানী সৈন্য আলস্যভরে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এল। রাইফেল দুটো ঝুলছে তাদের পিঠের উপর।

জেরির আরও কাছে মাথাটা নিয়ে কোরি চুপি চুপি বলল, আমি বাঁদিককার লোকটিকে তাক করছি, তুমি অন্যটিকে নাও। জেরি মাথা নেড়ে ধনুক তুলল। বলল, ওদের বিশ ফুটের মধ্যে আসতে দাও। তারপর আমি 'এবার' বলতেই দুজন এক-সঙ্গে তীর ছুঁড়ব।

তারা অপেক্ষা করতে লাগল। আপন মনে বক্‌বক্‌ করতে করতে জাপানীরা এগিয়ে এল।

জাপানীরা মৃত্যু নিশানার মধ্যে এসে গেল। জেরি বলল, 'এবার!' শা করে দুটো তীর ছুটে গেল। লক্ষ্যভেদ হল। কোরির তীরটা বিঁধল বুকে। জেরির তীরটা বিঁধল গলায়।

জেরি এক লাফে পথে নামল। খোলা ছুরিটা দু'দু'বার বসিয়ে দিল তার বুকে। লোকটা বার দুই হেঁচকি তুলেই নিথর হয়ে গেল।

অপর জাপানীর দেহ থেকে কোরি তার রাই-ফেলটা খুলে নিল। পর পর তিনবার বেয়নেটটাকে ঢুকিয়ে দিল মৃতদেহের বুকে। জেরির দিকে তাকিয়ে বলল, আমি নিজের চোখে দেখেছি এই-ভাবে আমার বাবাকে ওরা খুন করেছিল। আজ আমি তৃপ্ত। আহা, আজ যদি বাবা বেঁচে থাকত!

পথের উপরকার গাছ থেকে গাছে ঝুলতে ঝুলতে টারজন হঠাৎ থেমে গেল; জমাট বরফের মত নিশ্চল হয়ে গেল। তার ঠিক আগেই গাছের ডালের উপর লতাপাতা বিছানো মঞ্চের উপর বসে আছে একটি লোক। তার মুখময় ঘন দাঁড়ি-গোঁফ, সঙ্গে বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র। লোকটি শ্বেতকায়। নিশ্চয়ই সে কোন শত্রুর গমনাগমনের উপর লক্ষ্য রেখেছে।

পথ থেকে সরে গিয়ে টারজন একটা ঘুর-পথে শান্ত্রীটিকে এড়িয়ে পিছনের দিকে চলে গেল। সেখানে একটা ছোট পাহাড়ি উপত্যকার এক প্রান্তে দেখতে পেল একটা নোংরা, পুরোনো ছাউনি। জনা বিশেক লোক গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে। একটা বোতল তাদের হাত থেকে হাতে, মুখ থেকে মুখে ঘুরছে। পুরুষদের সকলের সঙ্গেই আছে পিস্তল ও ছুরি; হাতের কাছেই একটা করে রাইফেল। দলটা সুবিধার নয়।

টারজন স্থির করল, এদের সঙ্গ যত এড়ানো যায় ততই মঙ্গল। হঠাৎ যে ডালে সে বসেছিল সেটা ভেঙে পড়ল। টারজন শ'খানেক ফুট নীচে মাটিতে পড়ে গেল। মাথায় চোট লেগে সে জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান ফিরে এলে দেখল সে একটা গাছের নীচে শুয়ে আছে। হাত-পা বাঁধা। তাকে ঘিরে অনেক পুরুষ ও নারী বসে আছে, নয়তো দাঁড়িয়ে আছে।

জ্ঞান ফিরে এসেছে বুঝতে পেরে তাদের একজন ওলন্দাজ ভাষায় কি যেন বলল। টারজন তার কথা বুঝল, কিন্তু না বোঝার ভান করে মাথা নাড়ল।

আর একজন ফরাসী ভাষায় কথা বলল। টারজন এবারও মাথা নাড়ল। যুবকটি ইংরেজীতে কিছু বলল। টারজন এবারও না বোঝার ভান করল।

তাকে নিয়ে আর বেশীক্ষণ মাথা না ঘামিয়ে লোকগুলি গাছতলার দিকে চলে গেল নতুন করে গলা ভেজাতে। রয়ে গেল শুধু একটি যুবক। সকলে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেলে যুবকটি নীচু গলায় ইংরেজিতে বলল, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার। আমি নিজেও ওদের হাতে একজন বন্দী। একদল নরঘাতক ডাকাতের হাতে তুমি পড়েছ। দু'একজন ছাড়া তারা সকলেই জেল-ফেরৎ আসামী; জাপানীরা এ দ্বীপ আক্রমণ করার পরেই তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। দলের অধিকাংশ নারীও জেল-ফেরৎ আসামী। আর কিছু এসেছে সমাজের একেবারে নীচুতলা থেকে।

কি জান, এই পাহাড়ে অনেক দেশভক্ত গোরিলাও আত্মগোপন করে আছে। তারা জাপানী-দের মত এই দেশদ্রোহীদের পেলেও খুন করে ফেলবে। তাদের ভয়, আমি হয় তো গোরিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের ধরিয়ে দেব। আসল কথা হল, তারা তোমাকেও জাপানীদের হাতে তুলে দেবে। তুমি যখন অজ্ঞান হয়ে ছিলে তখনই তারা এটা স্থির করেছে। তোমাকে হাতে পেলে জাপানীরা ভাল দামই দেবে।

টারজন ভাবল, তার ভাগ্য যখন স্থির হয়েই গেছে তখন আর এই যুবকটিকে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে কি হবে।

বলল, আমি একজন ইংরেজ।

যুবকটি মুচকি হাসল। আমাকে বিশ্বাস করার জন্য ধন্যবাদ। আমার নাম টাক ভ্যান ডের বস। আমি একজন রিজার্ভ অফিসার।

আমার নাম ক্লেটন। তুমি এই লোকগুলোর হাত থেকে পালাতে চাও?

চাই। কিন্তু কোথায় যাব? সেই তো জাপানী-দের হাতেই গিয়ে পড়ব, নয় তো বাঘের পেটে। আমাদের গোরিলাদের কোন খোঁজ যদি জানতাম তাহলে নিশ্চয় পালাবার ঝুঁকি নিতাম। কিন্তু আমি যে কিছুই জানি না।

টারজন বলল, আমার দলে আছে পাঁচজন। আমরা চেষ্টা করছি এই দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছতে। ভাগ্য প্রসন্ন হলে একটা জাহাজ ভাড়া করে একদিন অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছতে পারব।

ভ্যান ডের বস কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে মাথা তুলে বলল, আমিও আছি তোমাদের সঙ্গে। সাধ্যে যতটা কুলোয় তা আমি করব।

যত্র-তত্র চড়-থাপ্পড়, পাছায় বেয়নেটের খোঁচা, গায়ে থুথু—সব কিছু সয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে রসেটি ও বুবোনোভিচ এক সময় একটা আদিবাসী গ্রামে

পৌঁছে গেল। সেখানে জনৈক আদিবাসীর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে ঘরের কোণে দুজনকে ঠেলে দিল।

সারা রাত ঘুম হল না। হাত পায়ের বাঁধন শরীরে কেটে বসে গেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। না খাদ্য, না পানীয়। রাতটা যেন অন্তহীন। তবু এক সময় রাত শেষ হল।

ঘরে ঢুকল দুটি সৈনিক। হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দুজনকে টেনে তুলল। দুজনই টলতে টলতে মাটিতে পড়ে গেল। হো-হো করে হাসতে হাসতে সৈনিকরা তাদের টানতে টানতে মইয়ের মাথায় নিয়ে ছেড়ে দিল। গড়াতে গড়াতে দুজন মাটিতে পড়ে গেল।

তাদা এসে তাদের পরীক্ষা করে শুধাল, আমার প্রশ্নের জবাব দিতে তোমরা রাজী?

না, বুবোনোভিচ জবাব দিল।

তাদের নিয়ে যাওয়া হল গ্রামের মাঝখানে। সৈনিক ও আদিবাসীরা তাদের ঘিরে দাঁড়াল। খোলা তলোয়ার হাতে তাদা এসে দাঁড়াল তাদের পাশে। তার হুকুমে দুজনকে নতজানু করানো হল। তাদের মাথা দুটি এগিয়ে দেওয়া হল। তাদার হাতের তলোয়ার ঝলসে উঠল।

জেরি ও কোরি সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত তাদের খোঁজে পথে নামল।

দুজন পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। মাঝে মাঝেই তাদের হাতে হাত ছুঁয়ে গেল। একবার কোরি কাদার মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল, জেরি তাড়াতাড়ি তাকে জড়িয়ে ধরে ফেলল। তারপর ঘন অন্ধকারে দুজন অনেক কষ্টে এগোতে লাগল।

সাবধানে এগিয়ে একটা ছোট উপত্যকার মুখে এসে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। শ'খানেক গজ দূরেই একটা ছোট গ্রাম। সেখানে আদিবাসী ও জাপানী সৈনিকদের দেখা যাচ্ছে।

আমাদের ছেলে দুটো নিশ্চয় ওখানেই আছে, জেরি বলল।

কোরি ফিস্ ফিস্ করে বলল, ওই তো তারা। হায় ঈশ্বর! লোকটা যে ওদের খুন করবে!

তাদার হাতের তলোয়ার উদ্যত হতেই জেরির রাইফেল থেকে আগুন ছুটল; লেঃ কুমাজিরো তাদা ছিটকে পড়ল তাদেরই পায়ের কাছে এইমাত্র যাদের মারতে সে তলোয়ার তুলেছিল। একটা জাপানী সৈনিক বন্দীদের দিকে ছুটে যেতেই কোরির গুলিতে তারও ভবলীলা সাঙ্গ হল। দুজনের অবিরাম গুলি-বর্ষণে একের পর এক সৈনিকরা ধরাশায়ী হল; গোটা গ্রাম আতংকে অভিভূত হয়ে পড়ল।

প্রথম গুলির শব্দেই টারজন ছুটে এসে তাদের পাশে দাঁড়াল। একমুহূর্ত পরে এসে যোগ দিল ভ্যান ডের বস। যোগ হল আর একটা রাইফেল ও পিস্তল। পিস্তলটা টারজনের হাতে। সকলেই দে ছুট।

দুজন বনের প্রান্তে ছোট দলটার কাছে যখন পৌঁছে গেল ততক্ষণে গোলা-গুলি বন্ধ হয়ে গেছে। জাপানীরা হয় রণে ভঙ্গ দিয়েছে, নয়তো মরেছে। সাময়িকভাবে হলেও এখানকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটেছে।

খণ্ডযুদ্ধ নিয়ে এতক্ষণ সকলেই এত ব্যতিব্যস্ত ছিল যে কেউ কারও দিকে তাকাবার সময়ও পায় নি। এবার সকলেই পরস্পরকে দেখতে লাগল। কোরি ও টাক ভ্যান ডের বস পরস্পরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপরেই দুজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ঃ কোরি! টাক!

ওলন্দাজ যুবকটিকে জড়িয়ে ধরে কোরি বলে উঠল, প্রিয়তম!

আদিবাসীদের কাছ থেকে টারজন গোরিলাদের সম্পর্কে বেশী কিছু জানতে পারে নি। তারা কেবল বলেছে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দূরে একটা আগ্নেয়গিরির পাশে তাদের একটা দল আছে। মাত্র সেইটুকু তথ্য সম্বল করেই টারজন গোরিলাদের খোঁজে বেরিয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় একটা ছোট খাদের মধ্যে তাঁবু দেখতে পেল। একটি শাস্ত্রী খাদের ঠিক মুখেই দাঁড়িয়ে আছে। একজন দাড়িওয়ালা ওলন্দাজ। টারজন পঁচিশ-ত্রিশ গজের মধ্যে পৌঁছলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তুমি কে? এখানে কেন এসেছ?

আমি একজন ইংরেজ। তোমাদের সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

টারজনকে ভাল করে দেখে নিয়ে লোকটি নীচের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিল, ডি লেটেনহোভ! একটি বুনো মানুষ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

ইতিমধ্যে তিনটি লোক উপরে উঠে এল। সকলেই সশস্ত্র। মুখময় দাড়ি; দেখতে শক্ত-সমর্থ। জোড়াতালি মারা শতচ্ছিন্ন পোশাক; কিছুটা বেসামরিক, কিছুটা সামরিক, আবার কিছুটা পশুর চামড়া দিয়ে তৈরী। একজনের জামার কাঁধের উপর ফার্স্ট লেফটেন্যান্টের প্রতীক ছুটো তারা বসানো। সেই ডি লেটেনহোভ।

টারজনের দিকে ফিরে ডি লেটেনহোভ ইংরেজিতে শুধাল, তুমি কে? এখানে কি করছ?

আমার নাম ক্লেটন। আর-এ এফ এর একজন কর্ণেল। আমি জানতে পেরেছি, একদল ওলন্দাজ গোরিলা এখানে আস্তানা গেড়েছে। তাদের সি. ও-র সঙ্গে কথা বলতেই আমি এখানে এসেছি।

ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্স্ আমাদের দলপতি। আজ সে এখানে নেই। আশা করছি কালই এসে পড়বে। তাকে তোমার কি দরকার?

এমন কিছু লোকের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে চাই যারা আমাকে জাপানী ঘাঁটির অবস্থান এবং বন্ধুস্থানীয় আদিবাসীদের খবর দিতে পারবে। আমি চেষ্টা করছি, কোন রকমে উপকূলে পৌঁছে একটা জাহাজ যোগাড় করে এ দ্বীপ থেকে পালাব।

ডি লেটেনহোভ টারজনকে নিয়ে নীচের তাঁবুতে গেল। শিবিরটা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত। সামরিক কায়দায় নির্মিত একসারি খড়ো ঘর। একটা ঘরের সামনে উড়ছে নেদারল্যাণ্ডের লাল-সাদা-নীল পতাকা। বিশ-ত্রিশটি লোক নানা কাজে ব্যস্ত, অধিকাংশই রাইফেল ও পিস্তল পরিস্কার করছে। তাদের পরনে শতচ্ছিন্ন নোংরা পোশাক, কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্রগুলি ঝকঝক করছে। টারজন বুঝল, এটা একটা সুপরিচালিত সামরিক শিবির। এদের বিশ্বাস করা চলে।

টারজন ঢুকতে সকলেই কাজ থামিয়ে তাকে দেখতে লাগল। কেউ কেউ তার সঙ্গের লোকদের নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল।

ডি লেটেনহোভ বলল, তার আগে বল তুমি সুমাত্রায় এলে কেমন করে? আর আমেরিকানরাই বা এখানে কি করছে? আমাদের এই ডেরার খবরই বা তুমি জানলে কেমন করে?

টারজন বলল, যে বোমারু বিমানটাকে গুলি করে নামানো হয়েছে আমিও সেটাতে ছিলাম। যে তিনজন জীবিত আমেরিকানের কথা বলেছি তারাও সেই বিমানে ছিল। গতকাল একটা গ্রামে গিয়ে তোমাদের এই শিবিরের একটা মোটামুটি ধারণা আমি পাই।

ডি লেটেনহোভ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এবার তোমাকে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু একটা কথা জানতে বড়ই ইচ্ছা করছে; সত্যিকারের টারজনের

মতই তুমি এরকম প্রায় নগ্নদেহে থাক কেন?

টারজন লেটেনহোভের দিকে ফিরে বলল, নিজেকে সনাক্ত করার মত কোন প্রমাণ আমার সঙ্গে নেই; কিন্তু আমার এমন সব বন্ধু আছে যারা আমাকে সনাক্ত করতে পারবে—তিনজন আমেরিকান ও দুজন ওলন্দাজ বন্ধু। শেষের দুজনকে তুমি হয়তো চেন।

কোরি ভ্যান ডের মিয়ার এবং টাক ভ্যান ডের বস। তাদের তুমি চেন?

খুব ভাল চিনি; কিন্তু তারা তো মারা গেছে।

গতকাল পর্যন্তও তারা মরে নি, টারজন বলল।

কারণ আমি সত্যি টারজন। তোমরা কেউ কেউ হয় তো জান যে টারজন একজন ইংরেজ, আর তার নাম ক্লেটন। আমি তো সেই নামটাই তোমাদের বলেছি।

একজন চেঁচিয়ে বলল, ঠিক কথা। জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোক।

আর একজন বলে উঠল, ওর কপালে ওই তো সেই কাটা দাগ; ছোটবেলায় এক গোরিলার সঙ্গে যুদ্ধে ওখানটা কেটে গিয়েছিল।

সকলে টারজনকে ঘিরে ধরল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের সময় ভ্যান প্রিন্স্ বলল, কিছু আগাম খবর পাবার ব্যবস্থা করতে হবে, অন্যথায় হয়তো আমরাই অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়ে পড়ব।

টারজন বলল, আমি তোমাকে আগাম সংবাদ এনে দেব। চার-পাঁচ মাইল এগিয়ে গিয়ে আমি লুকিয়ে থাকব। জাপানীদের দেখতে পেলেই তারা এখানে আসার অনেক আগে তোমাকে সে খবর পৌঁছে দেব।

কিন্তু তারা যদি তোমাকে দেখতে পায়?

দেখতে পাবে না।

টারজন এক লাফে গাছে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওলন্দাজটি মাথা নেড়ে বলল, ওর মত একদল সৈন্য হাতে পেলে জাপানীদের আমি এ দ্বীপ থেকেই তাড়িয়ে দিতে পারতাম।

জেরি, বুবোনোভিচ ও রসেটি গোরিলাদের আগেই অস্ত্রশস্ত্র ও হাত-বোমা নিয়ে নতুন পথে আত্মগোপন করল। ডালপালা ও দ্রাক্ষালতা দিয়ে ঘাড় ও মাথা ঢেকে তারা যেন জঙ্গলেরই একটা অংশ হয়ে গেল। মূল পথ ও তাদের মধ্যে যদি কয়েক ফুট ঝোপঝাড়ের ব্যবধান না থাকত তাহলে জাপানীরা এগিয়ে আসতে আসতে তাদের একেবার ঘাড়ের উপর পা দেবার আগে কিছুই বুঝতে পারত না।

অচিরেই গোরিলারাও পৌঁছে গেল এবং আত্মগোপনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এই সময় টারজন ফিরে এসে ভ্যান প্রিন্স্‌কে বলল, তোমার বেঁটে বাদামী ভাইরা আসছে। এখন তারা মাইল দুইয়েক দূরে, দেখে মনে হল দুটো বড় কোম্পানি। সঙ্গে হাল্কা মেসিন-গান ও ছোট কামান আছে। সেনাপতি একজন কর্ণেল।

ভ্যান প্রিন্স্ বলল, তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই। সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, আর কোন কথা নয়। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই শত্রুরা এসে পড়বে। পরে টারজনের দিকে ফিরে বলল, একটা কথা স্যার; ওরা আসলে বাদামী নয়। ও শালারা হলদে পাখি।

গ্রামে যে সব গোরিলাদের রেখে যাওয়া হয়েছে তাদের দলপতি গ্রোয়েন ডি লেটেনহোভ। সে কোরিকে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলল। কিন্তু কোরি বাধা দিয়ে বলল, প্রতিটি রাইফেলই তোমার দরকার সেনাপতি। তাছাড়া, জাপানীদের সঙ্গে আমার বোঝাপড়াটা এখনও বাকি আছে।

কিন্তু কোরি, তোমার আঘাত লাগতে পারে, মৃত্যুও ঘটতে পারে।

সে তো তোমার বা তোমার সৈন্যদের বেলায়ও ঘটতে পারে। তাহলে তো আমাদের সকলেরই লুকিয়ে পড়া উচিত।

তোমাকে নিয়ে পারা যায় না! আমারই ভুল হয়েছে। মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা।

আমাকে মেয়েমানুষ ভেবো না। আমি একটি জীবন্ত রাইফেল। আর আমার নিশানাও অব্যর্থ।

বনের দিক থেকে একটা রাইফেলের শব্দ আসায় তাদের কথায় বাধা পড়ল।

জেরি দেখল, মূল সেনাদল এগিয়ে আসছে। সকলের সামনে উদ্যত সামুরাই তরবারি হাতে কর্ণেল স্বয়ং। বাকি পথটা প্রথম কোম্পানির সৈন্যে আগাগোড়া ঠাসা। তখনই গর্জে উঠল ভ্যান প্রিন্স্ এর রাইফেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়তে লাগল বিস্মিত সৈন্যদের উপর। জেরি পর পর তিনটে হাত-বোমা ছুঁড়ল দ্বিতীয় কোম্পানিকে লক্ষ্য করে।

জাপানীরা এলোপাথারি গুলি চালাতে লাগল জঙ্গলের দিকে। যারা গুলি খেল তারা সারি ভেঙে পালাতে লাগল।

যারা পাগলের মত দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটে পালাল তাদের মধ্যে ছিল কর্ণেল। তাকে পালাতে দেখে রসেটি চেঁচিয়ে বলল, এবার আর পার পাবি না হলদে ভুঁড়ি। তার পিস্তলের গুলি কর্ণেলকে বিদ্ধ করল।

সম্পূর্ণ বিশৃংখল অবস্থায় বাকি জাপানীরা জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল। মৃত ও আহতরা সেখানেই পড়ে রইল। ভ্যান প্রিন্স্ কয়েকজন গোরিলাকে পশ্চাৎ-রক্ষী হিসাবে মোতায়েন করল, কয়েকজনকে লাগাল শত্রুপক্ষের অস্ত্র ও গুলি-গোলা হাতাবার কাজে, আর বাকিদের লাগাল উভয় পক্ষের আহতদের গ্রামে নিয়ে যাবার কাজে।

জাপানীদের অস্ত্রশস্ত্রগুলি সংগ্রহ করতে করতেই রসেটি ও বুবোনোভিচের হঠাৎ খেয়াল হল, জেরি কোথাও নেই। ছুটে ঝোপের ভিতরে গিয়ে দেখল, রক্তাপ্লুত দেহে জেরি চিৎ হয়ে পড়ে আছে। দুজনই তার পাশে নতজানু হয়ে বসল।

রসেটি বলল, মরে নি, এখনও নিঃশ্বাস পড়ছে।

বুবোনোভিচ বলল, ওকে মরতে দেওয়া হবে না।

সযত্নে তাকে তুলে নিয়ে দুজন গ্রামের দিকে চলল। ওলন্দাজরা তাদের তিনজন মৃত ও পাঁচজন আহতকে বয়ে নিয়ে চলল।

নিহত ও আহতদের নিয়ে তারা গ্রামে ঢুকল সেখানকার গোরিলারা তাদের ঘিরে দাঁড়াল। নিহতদের দেহ ঢেকে দেওয়া হল, আর আহতদের শুইয়ে দেওয়া হল গাছের ছায়ায়। গোরিলাদের মধ্যে একজন ছিল ডাক্তার। কিন্তু তার কাছে না আছে ওষুধ, না আছে অ্যানেস্থেটিক। তবু সে যথাসাধ্য করতে লাগল। কোরি তাকে সাহায্য করল।

বুবোনোভিচ ও রসেটি জেরির পাশেই বসে ছিল। কোরিকে নিয়ে ডাক্তার সেখানে এল।

ডাক্তার পরীক্ষা করতে বসল।

কোরি শুধাল, অবস্থা কি খুবই খারাপ?

সে রকম মনে হচ্ছে না। গুলি হৃৎপিণ্ডে লাগে নি। ফুসফুসটাও বেঁচে গেছে। শিগ্‌গিরই ভাল হয়ে উঠবে। এস তো, ওকে একটু উপুড় করে শুইয়ে দি।

গরম জল দিয়ে ঘাটা ধুইয়ে দিয়ে হাল্কা করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে ডাক্তার বলল, একজন ওর কাছে থাক। জ্ঞান ফিরলে চুপচাপ থাকতে বলো।

কোরি বলল, আমি আছি।

ইতিমধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেরি চোখ মেলল। বারকয়েক চোখ পিট-পিট করল; যেন কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে না। জেরির মুখে হাসি ফুটল; হাত বাড়িয়ে সে কোরির হাতটা চেপে ধরল।

কোরি বলল, এবার তুমি ভাল হয়ে যাবে জেরি।

জেরি বলল, আমি তো ভাল হয়েই গেছি।

দুজন দুজনের দিকে তাকাল। পৃথিবীটা কী সুন্দর!

ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্‌স্ আহতদের জন্য ডুলি বানাবার কাজে ব্যস্ত ছিল। সে এসে জেরিকে শুধাল, কেমন আছ?

খুব ভাল।

যাত্রার সময় হল। জেরি কিছুতেই ডুলিতে উঠবে না; সে হেঁটেই যেতে পারবে। শেষে ডাক্তারের ধমক খেয়ে ডুলিতে চাপল।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে ভ্যান প্রিন্‌স্ বলল, টারজন কোথায়?

বুবোনোভিচ বলল, ঠিকই তো। কোথায় সে?

রসেটি বলল, গীজ, লড়াইয়ের পরে সে তো গ্রামেই ফেরে নি। কিন্তু সে তো আহতও হয় নি।

বুবোনোভিচ বলল, তার জন্য মাথা ঘামাতে হবে না। নিজের ও অন্য সকলের জন্য ঘামাবার মত মাথা তার আছে।

ভ্যান প্রিন্‌স্ বলল, ঠিক আছে। আমাদের যাত্রা শুরু হোক।

উপত্যকার একেবারে মাথায় একটা চুনা পাথরের পাহাড়ের নীচে অবিরাম উৎসারিত হচ্ছে একটা ঝর্ণার জলধারা। সেখানেই অনেকগুলি গুহাও আছে। ভ্যান প্রিন্‌স্ স্থির করেছে সেখানেই একটা মোটামুটি স্থায়ী ঘাঁটি তৈরী করে ম্যাক আর্থারের অধীনে মিত্রশক্তির আগমনের প্রতীক্ষায় থাকবে। আমেরিকানদের কাছেই সে সর্বপ্রথম জেনেছে ম্যাক আর্থার ক্রমশই এগিয়ে আসছে।

যে ছোট দলটা অস্ট্রেলিয়া পৌঁছতে ইচ্ছুক তাদের মধ্যে আমেরিকান, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ইউরেশিয়ান থাকায় গোরিলারা তাদের নাম দিয়েছে বিদেশী সেনাদল। নামটাকে আরও সার্থক করে তুলতে জেরি আরও জানিয়েছে যে বুবোনোভিচ একজন রুশ, বসেটি ইতালীয়, আর সে নিজে আধা-ভারতীয়।

কোরি বলল, বেচারি বুড়ো সিং যদি আমাদের সঙ্গে থাকত তাহলে মিত্রশক্তির চার প্রধান দেশের প্রতিনিধিই সেনাদলে থাকত।

শিবিরের ঠিক মাথার উপরে একটা পাহাড়ের চূড়ায় একটি শান্ত্রীকে মোতায়েন রাখা হয়েছে। সেখান থেকে উপত্যকার বহুদূর পর্যন্ত নজর রাখা যায়। ফলে দূর থেকে কাউকে আসতে দেখে সংকেত করা মাত্রই সকলে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে তাকে তাড়া করতে পারে।

তিয়াং উমরের গ্রামে সিং তাইকে লুকিয়ে রেখে আসার পর থেকেই কোরি তাকে নিয়ে অনেক ভাবে ; তার কি হয়েছে জানতে চায়। তাই টারজন স্থির করল, গোরিলাদের শিবিরে ফিরে যাবার আগে একবার গ্রামটাকে দেখে যাবে। ফলে তাকে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হবে ; কিন্তু সময় বা দূরত্ব টারজনের কাছে কোন ব্যাপারই নয় ; যখন যে কাজ সে করতে চায়, সময় অথবা দূরত্বের হিসাব না করেই তা করে।

ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। পথে একটা হরিণ মেরে খেয়ে রাতটা ঘুমিয়ে কাটাল। তিয়াং উমরের গ্রামের কাছে যখন পৌঁছল তখন অনেকটা বেলা হয়েছে। বন্য প্রাণীর স্বাভাবিক সতর্কতা ও সন্দেহের বশে টারজন গাছে চড়ে নিঃশব্দে এগোতে লাগল। আদিবাসীরা দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যস্ত।

এই শিবিরে এসে বিদেশী সেনাদলটি বেশ নিরাপদ বোধ করছে। বেশ আরামের সঙ্গে তারা দিন কাটাতে লাগল।

টারজন প্রায়ই সুলুক-সন্ধান জানতে বেরিয়ে পড়ে। কখনও বা শিকারে যায়। তার কৃপাতেই শিবিরের লোকদের মুখে তাজা মাংস জুটছে।

তাকে চিনতে পেরে গ্রামবাসীরা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল। কিন্তু টারজন তাদের কথা বুঝতে না পেরে সিংতাইয়ের খবর জানতে চাইল।

তাকে বলা হল, সে এখনও গ্রামেই আছে, তবে দিনের বেলা বাইরে আসতে সাহস পায় না। কারণ জাপানী স্কাউটরা অতর্কিতে গ্রামে ঢুকে পড়ে।

টারজনকে সিংতাইএর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তার আঘাত সম্পূর্ণ সেরে গেছে; বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। কোরি ভাল আছে জেনে খুশিতে তার মুখটা ঝলমলিয়ে উঠল।

টারজন বলল, সিংতাই, তুমি কি এখানে থাকতে চাও, না আমাদের সঙ্গে যেতে চাও? আমরা এই দ্বীপ থেকে পালাবার চেষ্টা করছি।

আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, সিংতাই জবাব দিল।

বেশ ভাল কথা, টারজন বলল। আমরা এখনই রওনা হব।

বিদেশী সেনাদল ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে। জেরি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে, গায়ে জোর পাচ্ছে, সেও এখান থেকে চলে যেতে চাইছে। এখন অপেক্ষা কেবল টারজনের।

পাহাড়ের চূড়া থেকে শান্ত্রী হাঁক দিল, দুটি লোক আসছে। এখনও ঠিক চিনতে পারছি না। কেমন যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

কয়েক মিনিট পরে আবার হাঁক দিল: প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে বোঝা। একজন উলঙ্গ।

নির্ঘাৎ টারজন, জেরি বলল।

সত্যি টারজন। সঙ্গে সিংতাই। শিবিরে পৌঁছে দুজনেই কাঁধ থেকে একটা করে হরিণ মাটিতে রাখল। সুস্থদেহে সিংতাইকে দেখে কোরির সুখের সীমা নেই। আর টারজনকে পেয়ে জেরি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, তুমি এসে পড়েছ, ভালই হয়েছে। আমরা যাবার জন্য প্রস্তুত, কেবল তোমার জন্যই অপেক্ষা করে আছি।

টারজন বলল, যাবার আগে আর একটা কাজ করার আছে। উপত্যকার ভাঁটিতে হুফ্টের দলের আস্তানা দেখে এসেছি। জাপানীরা এখনও সেখানে আছে। সেখানে কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে দুটি বন্দীকে দেখে এসেছি। তাদের আমি চিনতে পারি নি, কিন্তু এখানে আসতে আসতে সিংতাই বলেছে, কয়েকদিন আগে দুটি আমেরিকান বন্দীকে সঙ্গে নিয়ে জাপানীরা গ্রামে এসেছিল। তারা নাকি গ্রামবাসীদের বলেছে, কিছুদিন আগে যে বিমানটিকে তারা গুলি করে নামিয়েছিল ওরা সেই বিমানের যাত্রী।

ডগলাস আর ডেভিস! বুবোনোভিচ চেঁচিয়ে বলল।

ঠিক। জেরি মাথা নাড়ল। একমাত্র ঐ দুজনেরই খোঁজ পাওয়া যায় নি।

বুলেটের বেল্টটা বেঁধে রাইফেলটা হাতে নিয়ে বুবোনোভিচ বলল, চল ক্যাপ্টেন।

সূর্যের দিকে তাকিয়ে টারজন বলল, দ্রুত ছুটতে পারলে অন্ধকার হবার আগেই কাজ ফতে করা যাবে। কিন্তু একমাত্র তাদেরই সঙ্গে নিতে হবে যারা দ্রুত হাঁটতে পারে।

কতজন চাই? ভ্যান প্রিন্স্ প্রশ্ন করল।

বিশজনই যথেষ্ট। সব কিছু ঠিকমত চললে এ কাজ আমি একাই করতে পারি। ৬৮২

ভ্যান প্রিন্‌স্‌ বলল, যথেষ্ট লোকজন নিয়ে আমি নিজেই যাব তোমার সঙ্গে।

বিদেশী সেনাদলের সকলেই যাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু টারজন কোরি ও সারিনাকে নিষেধ করল। তারা তর্ক করল, কিন্তু টারজন কোন কথা শুনল না।

ডাক্তার রেড বলল, আরও একজনের যাওয়া উচিত হবে না। ক্যাপ্টেন লুকাস অসুস্থ মানুষ। এত দীর্ঘ পথ ছুটাছুটি করলে আসন্ন দক্ষিণ অভিযানে যোগ দেবার মত শরীরের অবস্থা তার থাকবে না।

জেরি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে টারজনের দিকে তাকাল। টারজন বলল, আমারও ইচ্ছা এ নিয়ে তুমি পীড়াপীড়ি করো না জেরি।

দশ মিনিট পরে বিশজনের দলটি দ্রুত পায়ে উপত্যকার পথে হাঁটতে শুরু করল। সকলের আগে টারজন ও ভ্যান প্রিন্‌স্‌।

ক্যাপ্টেন তোকুজো মাৎসুয়ো এবং লেফ্‌টেন্যান্ট হাইদিও সোকাবে সারা রাত মদ গিলেছে—মদ গিলেছে আর ঝগড়া করেছে। সৈনিকরাও কম যায় নি। মাতাল সৈনিকদের পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে গ্রামের লোকেরা মেয়েছেলেদের নিয়ে জঙ্গলে পালিয়েছে। সুতরাং জনশূন্য গ্রামে মাতাল জাপানীদের পরাস্ত করে দুই বন্দী মার্কিন ডগলাস ও ডেভিসকে উদ্ধার করতে টারজন ও ভ্যান প্রিন্সের বিশেষ কোন অসুবিধা হল না।

দুদিন পরে।

এখন দশজনে গড়া 'বিদেশী বাহিনী' গোরিলাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে এক অজানা গন্তব্যের পথে পা বাড়াল। ডগলাস ও ডেভিস সকলেই ছোট দলটার সঙ্গে মানিয়ে নিল। ডগলাস এটার নাম দিল 'জাতিসংঘ'।

যাত্রাপথ নির্মম, নিষ্ঠুর। হাতের ছুরি দিয়ে ভয়ংকর গভীর জঙ্গলকে কেটে কেটে পথ করে অগ্রসর হতে হচ্ছে। গভীর খাদ আর পাহাড়ি ঝর্ণা বার বার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অনেক সময় পাহাড়ের দেওয়াল শত শত মাইল খাড়া; না আছে ধরার কিছু, না আছে পা রাখার জায়গা; অগত্যা অনেক পথ ঘুরে যেতে হচ্ছে। বৃষ্টি তো লেগেই আছে—একেবারে ধারাসারে প্রচণ্ড বর্ষণ। কি পথচলা কি ঘুম, দুই কাজই করতে হচ্ছে ভিজে জামা-কাপড়ে। পায়ের জুতো ও স্যাণ্ডেল ছিঁড়ে আসছে।

ভ্যান প্রিন্‌স্‌ যে মানচিত্রটা এঁকে দিয়েছিল, জেরি, বুবোনোভিচ, রোসেটি সেটাই মনোযোগ দিয়ে দেখছে।

জেরি বলল, এখানে আমরা পাহাড়টা পার হয়ে পূবদিকে এসে পড়েছি—আলাহান্‌ পান্তজাং-এর ঠিক নীচে।

রসেটি বলল, এদিকে দেখ ; এই যেখানে আবার আমরা পাহাড়টা পার হব সেটা নাকি ১৭০ কিলো-মিটার। যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবে কত হয়?

তা—একশ' পাঁচ-ছয় মাইল। ওটা বিমান-পথের একটা ঘাঁটি।

আমরা গড়ে দৈনিক কতটা চলেছি? বুবোনোভিচ শুধাল।

পাঁচ মাইলও হয় কিনা সন্দেহ।

রসেটি বলে উঠল, গীজ! 'লাভলি লেডি' হলে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটেই আমাদের ওখানে পৌঁছে দিত। আর যে ভাবে আমরা চলেছি তাতে তো এক মাস লেগে যাবে। ৬৮৫

বেশীও হতে পারে, জেরি যোগ করল।

বুবোনোভিচ বলল, যাই বল, দৃশ্যটা কিন্তু চমৎকার। স্যুপ খেতে খেতে নীচে তাকালে কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে।

রসেটি সায় দিয়ে বলল, তা ঠিক। দেখে তো মনেই হয় না যে এমন সুন্দর একটা দেশে যুদ্ধবিগ্রহ থাকতে পারে।

টাক ভ্যান ডের বস বলল, অথচ গত একশ' বছরের আগে এ দেশে কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহই চলত। ইতিহাসের আদি থেকে, হয় তো বা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই গোটা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জকে চষে বেড়িয়েছে একের পর এক যত সব যুদ্ধবাজের দল—উপস্থিত-প্রধানরা, ছোট প্রিন্‌স্‌রা, ছোট রাজারা, আর সুলতানরা। ভারতবর্ষ থেকে এসেছে হিন্দুরা, এসেছে চীনারা, পর্তুগিজরা আর স্পেনিয়ার্ডরা, এসেছে ইংরেজ ও ওলন্দাজরা, আর এখন এসেছে জাপানীরা। তারা নিয়ে এসেছে নৌবহর, সেনাদল, আর যুদ্ধ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কুব্‌লা খানের রাজদূতকে গ্রেপ্তার ও মুখমণ্ডল বিকৃত করে চীনে ফেরৎ পাঠানোর অপরাধে জাভার রাজাকে শাস্তি

দিতে মহান খানসাহেব এ দেশে পাঠিয়েছিল ১০০,০০০ সৈন্যসহ এক হাজার জাহাজের এক নৌ-বহর।

ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায় যে, আমরা নাকি ইন্দোনেশীয়দের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করি। কিন্তু তাদের নিজের দেশের সুলতানরা যে রকম চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দেশটাকে ধ্বংস করেছে, দেশের লোকজনদের ক্রীতদাস করে রেখেছে, হত্যা করেছে, সে রকমটা আমরা তো করিই নি, আমাদের আগে যারা এ দেশে এসেছে তারাও করে নি। এই সব পানাসক্ত, ইন্দ্রিয়সর্বস্ব জীবগুলো শুধুমাত্র নিজেদের খেয়াল মেটাতে নিজের প্রজাদেরই খুন করেছে। সুন্দরী নারী ও কুমারীদের নিয়ে গেছে। তাদের একজনের হারেমে নাকি ছিল চোদ্দ হাজার মেয়ে।

গীজ! রসেটি সবিস্ময়ে শব্দটা উচ্চারণ করল।

টাক মুচকি হেসে আবার বলতে শুরু করল। ক্ষমতায় থাকলে আজও তারা তাই করত। আমা-দের হাতে আসার পরেই ইন্দোনেশীয়রা পেয়েছে

ক্রীতদাসত্বের কবল থেকে প্রথম মুক্তির স্বাদ, পেয়েছে প্রথম শান্তি, প্রথম সমৃদ্ধি। জাপানীদের এ দেশ থেকে তাড়াবার পরে তাদের স্বাধীনতা দিয়ে দেখো, এক প্রজন্মের মধ্যেই তারা যেখানে ছিল আবার সেখানেই ফিরে যাবে।

কিন্তু সব মানুষেরই কি স্বাধীনতার অধিকার নেই? বুবোনোভিচ প্রশ্ন করল।

স্বাধীনতার অধিকার যারা অর্জন করে ওটা তাদের প্রাপ্য। খৃস্টপূর্ব ২৩ শতাব্দীতে হান বংশের চীনা সম্রাট ওয়াং মাং-এর রাজত্বকালেই আমরা সুমাত্রার কথা প্রথম জানতে পারি। ইন্দোনেশীয় সভ্যতা তখন বেশ প্রাচীন। সেই প্রাচীন সভ্যতা এবং ওলন্দাজ শক্তি কর্তৃক এই দ্বীপটি পুরোপুরি দখলের আগেকার প্রায় দু'হাজার বছরের পরিপ্রেক্ষিতেও যদি দেখা যায় যে এ দেশের মানুষ তখনও অত্যাচারী শাসকদের হাতে ক্রীতদাস হয়েই আছে, তাহলে বলতেই হবে যে স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত তারা তো সর্ব রকমে স্বাধীন। আর কি তারা চায়?

বুবোনোভিচ মুচকি হেসে বলল, সহজ কথায় বলে রাখি, আমি কিন্তু কম্যুনিস্ট নই। আমার কথা হল: যে লক্ষ্য সম্মুখে রেখে আমরা এই যুদ্ধ করছি, মানুষের মুক্তি তার অন্যতম।

জেরি বলল, বাজে কথা। আমরা কেউ জানি না কেন আমরা যুদ্ধ করছি। শুধু জানি, জাপানীদের মারতে হবে, যুদ্ধটা শেষ করতে হবে, এবং তারপর বাড়ি ফিরতে হবে। তারপর? তারপর হয় তো ধুরন্ধর রাজনীতিকরা আবার একটা তালগোল পাকিয়ে বসবে।

আর অসিধারীরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পায়তাড়া কসতে থাকবে, ভ্যান ডের বস বলল।

তারপর সব চুপচাপ। কারও মুখে কথা নেই।

গোরিলাদের শিবির ছেড়ে আসার পরে এক মাস কেটে গেছে। অনেক দুঃখ-কষ্ট সইলেও বিদেশী বাহিনী কোন বড় রকমের বিপদে পড়ে নি; নিজেদের মুখ ছাড়া অন্য কোন মানুষের মুখও দেখে নি। তারপরেই নীল আকাশ থেকে বজ্র নেমে এল। টারজন জাপানীদের হাতে বন্দী হল।

আগাগোড়াই টারজন গাছের উপর দিয়ে সকলের আগে আগেই চলেছে। হঠাৎ একটা জাপানী সেনাদলকে দেখতে পেল। পথের উপর বসে তারা বিশ্রাম করছে। দলে কতজন আছে জানবার জন্য টারজন আরও নীচে নেমে এল।

টারজনের সব মনোযোগ জাপানীদের উপর নিবদ্ধ। মাথার ঠিক উপরে যে সমূহ বিপদ ঝুলছে সেদিকে তার খেয়ালই নেই। একটা প্রকাণ্ড ময়াল সাপ পাকে পাকে তার শরীরটাকে জড়িয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের ছুরি ঝলসে উঠল। আহত সাপটা বেদনায় ও ক্রোধে ছটফট করতে লাগল। যে ডাল ধরে সাপটা ঝুলছিল সেটাকে ছেড়ে দিল। দুজনেই হুড়মুড় করে এসে পড়ল পথের উপরে জাপানীদের পায়ের কাছে।

জাপানীদের বেয়নেট ও তরবারির আঘাতে সাপটা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল। তখন টারজন তাদের হাতের মুঠোয়। সংখ্যায় তারা অনেক। একডজন

বেয়নেট তার দিকে উদ্যত। অসহায়ভাবে সে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। তার তীর, ধনুক ও ছুরি কেড়ে নেওয়া হল।

একটি অফিসার এগিয়ে এসে পেটে লাথি মেরে বলল, কে তুমি?

কর্ণেল জন ক্লেটন। রাজকীয় বিমান বাহিনী।

তুমি তো আমেরিকান; এখানে কি করছ?

টারজন জবাব দিল না।

দেখাচ্ছি মজা, বলে অফিসার জাপানী ভাষায় কি যেন নির্দেশ দিল। সার্জেন্টটি বন্দীর সামনে অর্ধেক ও পিছনে অর্ধেক সৈন্য সাজিয়ে যাত্রা করল। টারজন বুঝল, বিদেশী বাহিনী যে পথ ধরে এসেছিল তারা এখন সেই পথেই ফিরে চলেছে।

ওদিকে অনেকক্ষণ টারজনকে ফিরতে না দেখে জেরি বলল, টারজনের কোন বিপদ ঘটেছে।

রসেটি বলল, আমি কি এগিয়ে দেখব ব্যাপারটা কি? আমি তোমাদের সকলের চাইতে জোরে ছুটতে পারি।

বেশ, এগিয়ে যাও; আমরা পিছনে আসছি।

কিছুদূর এগিয়েই রসেটি অনেক মানুষের গলা শুনতে পেল। বিপদের কোন আশংকা না থাকায় জাপানীরা হেলাফেলাভাবেই এগোচ্ছে। আরও কিছুটা এগিয়ে সে বেঁটে মানুষগুলোর মাঝখানে টারজনের উন্নত দেহটা দেখতে পেল। টারজন জাপানীদের হাতে বন্দী! এ যে অবিশ্বাস্য।

রসেটির মুখে সব কথা শুনে সকলেই হতাশায় ভেঙে পড়ল। অরণ্য-রাজকে হারানো যে ছোট দলটার পক্ষে কত বড় ক্ষতি তা তারা বোঝে।

দলে কতজন জাপানী আছে রসেটি? জেরি শুধাল।

প্রায় বিশজন। আর আমরা আছি ন'জন। সেটাই যথেষ্ট ক্যাপ্টেন।

বুবোনোভিচ বলল, তাহলে এগিয়ে চল।

সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যান্ট কেন্‌জো কানেকোর নির্দেশে একজন সার্জেন্ট বন্দীর হাত পা এত বেশী মোটা দড়ি দিয়ে এমন শক্ত করে বাঁধল যে অরণ্য-রাজের বলিষ্ঠ মাংসপেশীও তাকে ছিঁড়তে অক্ষম। বাঁধাছাঁদা শেষ করে সে একধাক্কায় টারজনকে মাটিতে ফেলে দিল। একটা ঘোড়া এনে জিন পরানো হল। নিজের সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে তার একটা দিক বেঁধে দেওয়া হল টারজনের পায়ের সঙ্গে।

কানেকো বলল, তুমি যদি আমার প্রশ্নের জবাব দাও তাহলে দড়িটা খুলে দেওয়া হবে, আর ঘোড়াটাকেও চাবুক মারা হবে না। তোমরা দলে কতজন আছ, আর তারা কোথায়?

টারজন নীরব। কানেকোর মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। এগিয়ে গিয়ে সে টারজনের পেটে একটা লাথি কসাল।

জবাব দেবে না ?

টারজন নিঃশব্দে চোখ তুলে তাকাল। দারুণ রেগে কানেকো অশ্বারোহীকে হুকুম দিল। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের চাবুক উদ্যত হল। একটা রাইফেলের গর্জন শোনা গেল। ঘোড়াটা পাক খেয়ে উল্টে পড়ে গেল। আর একটা গুলি। সেকেণ্ড লেফঃ কেন্‌জো কানেকো আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তারপর গুলির পর গুলি। একের পর এক জাপানী সৈন্যরা ধরাশায়ী হতে লাগল। যারা পারল উপত্যকার দিকে পালিয়ে গেল। ন'জন রাইফেলধারী উঁচু রাস্তা থেকে লাফিয়ে নেমে শিবিরে ঢুকল।

ওরা সংখ্যায় কতজন ছিল বলতে পার ?

প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশজন। কতজনকে আমরা মেরেছি ?

রসেটি জবাব দিল, ষোলজন ; আমি গুনেছি।

মৃত জাপানীর রাইফেল ও বুলেটের বেল্টটা হাতে নিয়ে টারজন বলল, আমি গাছের উপর দিয়ে এগিয়ে সুমুখ থেকে তাদের মহড়া নেব, আর তোমরা পিছন দিক থেকে এসে গুলি করবে।

তাই হল। দু'মুখো আক্রমণের চাপে পড়ে দিশেহারা জাপানীরা কতক গুলিতে মরল, আর বাকিরা নিজেদের হাত-বোমার সাহায্যে হারাকিরি করল।

একজন আহত জাপানী তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তেই কোরি এক গুলিতে তাকে খতম করে দিল। বেয়নেট ও ছুরি হাতে ঢুকল রসেটি ও সারিনা। একটি আহত জাপানীও অবশিষ্ট রইল না।

জেরি টারজনের বাঁধন কেটে দিল। টারজন বলল, তুমি ঠিক সময় মতই এসে পড়েছিলে।

ঠিক সার্কাসের ঘোড়ার মত, বুবোনোভিচ বলল।

জেরি শুধাল, এখন আমাদের কি কর্তব্য ?

টারজন বলল, বাকিদেরও খতম করতে হবে। এদের কোন একজনও যদি মূল ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে খবর দেয় তো তারাই আমাদের তাড়া করবে।

আরও ছ'সপ্তাহ পরে বিদেশী বাহিনী মোয়েকে-মোয়েকোর ভাঁটিতে সমুদ্রের তীরে পৌঁছে গেল। অনেক ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে অবশেষে বাঞ্ছিত উপকূল। যেখানে তারা আত্মগোপন করল সেখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে আছে জাপানীদের একটা বিমান-বিধ্বংসী কামানের ঘাঁটি। কাছেই আছে একটা আদিবাসী গ্রাম। সেই গ্রামের বুড়ো সর্দার জাপানীদের খুব ঘৃণা করে। জাপানীরা তাকে অনেক লাথি-চড় মেরেছে, সকলের সামনে তাকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছে।

বুড়ো বলল, সে যাত্রা-পথ বড়ই বিপদ-সংকুল। এখানকার সমুদ্রে অনেক শত্রু-জাহাজ চলাচল করে। অস্ট্রেলিয়াও তো অনেক দূরের পথ। তবে তুমি ও তোমার বন্ধুরা যদি এই ঝুঁকি নিতে চাও, তাহলে আমি তোমাদের সাহায্য করব। এই গ্রাম থেকে কয়েক মাইল ভাঁটিতে একটা বড় প্রোয়া (দুদিকে ছুঁচলো মুখ দ্রুতগামী বড় জাহাজ) নদীতে লুকনো আছে। আমরাই তাতে খাবার-দাবার তুলে দেব। তবে সময় লাগবে। জাপানীরা আমাদের উপর কড়া নজর রেখেছে। মাঝে মাঝেই এ গ্রামে আসে।

একটি মাস কেটে গেল। এই এক মাসে অনেক-বার তারা ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে; স্নায়ুর অনেক চাপ সহ্য করেছে। শেষ পর্যন্ত জাহাজ বোঝাইয়ের কাজ সারা হল। এবার এক অন্ধকার অমাবস্যার রাত ও অনুকূল বাতাসের অপেক্ষা।

অবশেষে এল সেই শুভরাত্রি। জোয়ার এল। আকাশে চাঁদ নেই। তীরভূমি থেকে জোর হাওয়া বইছে। ধীরে ধীরে লগি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে তারা জাহাজটাকে সাগরে নিয়ে গেল। বড় ত্রি-কোণ পালটা তুলে দেওয়া হল। প্রথমে তাতে অল্প হাওয়া লাগল, কিন্তু বার-দরিয়ায় পড়তেই জোরালো হাওয়ায় পাল ফুলে-ফেঁপে উঠল। প্রোয়া তরতর করে ছুটল।

সকাল হতেই তারা একটা ফাঁকা সমুদ্রে এসে পড়েছে—চারদিকে শুধু দূর-বিস্তার ফেনিল জলরাশি। খোলা হাওয়া বইছে; সমুদ্রও যেন ছুটে চলেছে। তারা কিলিং দ্বীপ পেরিয়ে এসেছে। একটাও শত্রু-জাহাজ চোখে পড়ে নি।

এবারে পড়ল। ডগলাস পাহারায় ছিল। সে এসে বলল, জল ছাড়াও একটা কিছু যেন দেখা যাচ্ছে।

সে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল। সকলের দৃষ্টিই সেই দিকে ঝুঁকল। দিকচক্ররেখার ঠিক উপরে একটা কালো দাগ।

সকলেরই ভীতু দৃষ্টি সেই কালো দাগটার উপর নিবদ্ধ। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেটার কোন পরিবর্তন ঘটল না। টারজনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই প্রথম ধরা পড়ল দিকচক্ররেখার উপরে উঠে-আসা একটা জাহাজের ছবি।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে টারজন বলল, জাহাজটা গতি বদলেছে। আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। এবার তার পতাকাও দেখতে পাচ্ছি। নির্ঘাৎ জাপানী জাহাজ।

জেরি বলল, আমাদের সকলেরই হাতের টিপ ভাল। কিন্তু আমাদের হাতে যা অস্ত্র আছে তা দিয়ে তো একটা জাহাজকে ডুবিয়ে দেওয়া যাবে না।

টারজন বলল, ওটা একটা সশস্ত্র ছোট বাণিজ্য জাহাজ। সম্ভবত ওতে আছে ২০ মি. মি. বিমান-বিধ্বংসী কামান আর '৩০ ক্যালিবারের মেসিন-গান।

জেরি বলল, ২০ মি. মি. কামানের রেঞ্জ মাত্র ১২০০ গজের মত। আমাদের এই সব বন্দুকের রেঞ্জ তার চাইতে বেশী। কাজেই ওরা আমাদের শেষ করবার আগে বেশ কিছু নিপকে আমরা খতম করতে পারব—অবশ্য তোমরা যদি যুদ্ধ করতে রাজী হও।

সকলেই একবাক্যে যুদ্ধে সম্মতি জানাল। সকলেরই মত, আত্মসমর্পণ করার চাইতে যুদ্ধে মৃত্যুই শ্রেয়।

বাণিজ্য-জাহাজটি দ্রুত এগিয়ে আসছে। হঠাৎ বাতাসও পড়ে গেল। প্রোয়ার ত্রি-কোণ পালটাও সে হাওয়ায় ফুলে উঠল না।

জাপানী জাহাজে একটা লাল আলোর ঝলকানি দেখা গেল। তারপরেই একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি। মুহূর্তকাল পরে একটা গোলা এসে ফাটল তাদের বেশ কিছুটা দূরে।

রসেটি বলে উঠল, ভাগ্যঠাকুরাণি অনুকুল হাওয়া নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত যা ঘটাব তাই ঘটল—একটা গোলা সোজা এসে প্রোয়ার উপর ফাটল। জেরি দেখল, সিংতাইএর দেহের অর্ধেকটা পঞ্চাশ ফুট উপরে উড়ে গেল। টাক ভ্যান ডের বসের ডান পাটা ছিঁড়ে বেবিয়ে গেল। গোটা দল সাগরের জলে ছিটকে পড়ল। আর জাপানীরা আরও কাছে এসে তাদের লক্ষ্য করে মেসিন-গান চালাতে লাগল। তারা তখন কেউ সাঁতরাচ্ছে, কেউ বা ভাঙা কাঠের টুকরো আঁকড়ে ধরে ভাসছে। সকলেই বুঝতে পারছে—'বিদেশী বাঘিনী' এখানেই ইতি।

বুবোনোভিচ ও ডগলাস ভ্যান ডের বসের অচেতন দেহটা ধরে ভাসিয়ে রেখেছে। জেরি চেষ্টা করছে মেসিন-গান ও কোরির মাঝখানে থাকতে। হঠাৎ কে যেন ভ্যান ডের বসের দেহটাকে নীচের দিকে টানতে লাগল। জলের নীচে একটা শক্ত দেহ বুবোনোভিচের পায়ে লাগল। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, মাই গড! একটা হাঙর টাককে ধরেছে।

গোলার ধাক্কায় টারজন বেশ কিছুটা দূরে ছিটকে পড়েছিল। সাঁতার কেটে বুবোনোভিচ ও ডগলাসের দিকে এগোতেই তারা তাকে সাবধান করে দিল। তাড়াতাড়ি ডুব দিয়ে সে ছুরিটা বের করল। দ্রুত হাত-পা ছুঁড়ে সে হাঙরটার কাছে পৌঁছেই ছুরির এক কোপে হাঙরের পেটটা দু-ফালা করে ফেলল।

ফলে সেটা ভ্যান ডের বসকে ছেড়ে টারজনকে আক্রমণ করল। টারজন তাব বিরাট হাটাকে এড়িয়ে বারবার ছুরি চালাতে লাগল।

এমন সময় আব একটা হাঙর এসে আগেরটাকে আক্রমণ করল। সমুদ্রের জল রক্তে লাল হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য আক্রান্ত লোকগুলি সাময়িক স্বস্তি পেলেও গুলি-গোলা সমানেই চলতে লাগল।

টারজনের সাহায্যে বুবোনোভিচ ও ডগলাস টাকের দেহটাকে ভাঙা জাহাজের একটা বড় তক্তার উপর তুলে নিল। তার ট্রাউজারের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে তাই দিয়ে টারজন ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিল। তখনও টাকের নিঃশ্বাস পড়ছে। তবে সে সম্পূর্ণ অচেতন।

হঠাৎ একটা ভয়ংকর শব্দ শোনা গেল। সকলে জাপানী জাহাজটার দিকে তাকাল। একটা বড় মাপের আগুনের শিখা বাণিজ্য-জাহাজটার মাঝখান থেকে কয়েক শ' ফুট উপরে আকাশের দিকে উঠে গেছে। একটা ধোঁয়ার স্তম্ভ উঠে গেছে আরও কয়েক শ' ফুট উপরে। পরক্ষণেই আর একটা বিস্ফোরণ ঘটল। জাহাজটা দুই ভাগে ফাঁক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল। জ্বলন্ত তেলের মধ্যে কতকগুলি অর্ধদগ্ধ মানুষ আর্তনাদ করতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত প্রোয়ার জীবিত যাত্রীরা বিস্ময়বিমূঢ় হতবাক হয়ে নিঃশব্দে সে দৃশ্য দেখল। প্রথম কথা বলল রসেটি, ভাগ্যঠাকুরাণি আমার কথা শুনেছে।

জেরি বলল, আমরা ডুবে যাবার বা হাঙরের পেটে যাবার আগে ভারত মহাসাগরের মাঝখান থেকে আমাদের উদ্ধার করতে হলে তোমার ভাগ্যঠাকুরাণি-কে আরও কিছু খেল্ দেখাতে হবে শ্রীম্প।

সঙ্গে সঙ্গে রসেটি চেঁচিয়ে বলল, ঐ দেখ ক্যাপ, তার আর এক করুণার খেলা!

কোরিও আঙুল বাড়িয়ে বলে উঠল, দেখ, দেখ।

জ্বলন্ত আগুন থেকে প্রায় তিনশ' গজ দূরে একটা সাবমেরিন ভেসে উঠেছে! তার মাথায় ইউনিয়ন জ্যাক আঁকা। ৬৯৭

টারজন হেসে বলল, বৃটিশদের এখন কেমন লাগছে সার্জেন্ট?

আমি তাদের ভালবাসি।

সাবমেরিনটা ঘুরে এসে প্রোয়ার সব যাত্রীদেরই তুলে নিল। টারজন ও বুবোনোভিচ ভ্যান ডের বসকেই প্রথম তুলে দিল। ডেকের উপর শুইয়ে দিতেই সে মারা গেল। কোরি তার পাশে নতজানু হয়ে বসল। চোখের জল বাধা মানল না। জেরিও বসল তার পাশে।

কোরি বলল, হতভাগ্য টাক।

সাবমেরিনের দলপতি লেফ কম্যাণ্ডার বোল্টন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সব জেনে নিল। টাকের দেহটাকে নীচে না নিয়ে সমুদ্রেই তাকে সমাধি দেওয়া হল। বোল্টনই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালনা করল।

বর্ষাকাল শেষ হতে চলেছে ; সময়টা সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ; কিন্তু নদীতে এখনও অনেক জল, সাম্প্রতিক বর্ষণের ফলে মাটি বেশ নরম।

এরই মধ্যে সুদূর কাফা পর্বতশ্রেণীর বাসিন্দা একটি ছোট দস্যুদল ঘোড়ায় চেপে চলেছে নিঃসঙ্গ পথিক, দলবদ্ধ যাত্রী ও গ্রামবাসীদের লুট করার ধান্ধায়।

তাদের থেকে কিছুটা দূরে একটা শিকারী শিকারকে তাড়া করে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। এ ক্ষেত্রে শিকারীটি মোটেই শিকারী প্রাণীর মত দেখতে নয়, অথচ সে তো শিকারী প্রাণীই বটে ; কারণ একমাত্র শিকার ধরেই সে তার পেট ভরায় ; আবার একজন বিশিষ্ট বৃটিশ লর্ডের যে ছবি আমাদের চোখে ভাসে সে তার মতও নয়, অথচ সে তো একজন বৃটিশ লর্ডই বটে—সে হল বানর-দলের টারজন।

দুদিন যাবৎ বৃষ্টি পড়ছে ; ফলে টারজন ক্ষুধার্ত। একটা হরিণ-শিশু ঝোপ ঝাড় ও লম্বা নলবনের আড়ালে দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছে। আর টারজন হেঁটে এমনভাবে এগিয়ে চলেছে যাতে হরিণটাকে আক্রমণ করতে পারে। সে বুঝতেই পারে নি যে একদল অশ্বারোহী তার পিছনে উঁচু জায়গায় ঘোড়া থামিয়ে নিঃশব্দে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

সাদা পোশাক পরা দস্যুরা নীচে নামতে লাগল ; তাদের হাতে বর্শা ও লম্বা নলের গাদা বন্দুক। তারাও অবাক হয়ে গেছে। এ ধরনের কোন সাদা মানুষকে তারা আগে কখনও দেখে নি।

হরিণটা মাঝে মাঝে মাথা তুলছে। হঠাৎ তার দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য নর-বানরটির উপর পড়তেই সে এক পাক ঘুরে ছুট দিল। সঙ্গে সঙ্গে টারজনও পিছন ফিরে তাকাল ; দেখল, আধ ডজন অশ্বারোহী ধীরে ধীরে তার দিকেই এগিয়ে আসছে ; সে বুঝতে পারল এরা কারা, আর এদের উদ্দেশ্যই বা কি।

এরা সব দস্যু, লুণ্ঠন ও হত্যাই এদের একমাত্র কাজ—শত্রু হিসাবে এরা "নুমা"-র চাইতেও নির্মম।

দস্যুরা যখন বুঝল টারজন তাদের দেখতে পেয়েছে তখন তারা হাতের অস্ত্র ঘোরাতে ঘোরাতে চীৎকার করে জোর কদমে সবেগে তার দিকে ছুটে গেল।

কিন্তু টারজন না মুখ ফেরাল, না ছুট দিল। সে ভাল করেই জানত যে ছুটে পালিয়ে অশ্বারোহীদের হাত থেকে পার পাওয়া যাবে না। তাই বলে সে যে খুব ভয় পেয়েছে তাও নয়।

দীর্ঘ সুসমঞ্জস দেহ, মাংসপেশী হারকিউলিসের মত নয়, অনেকটা এপোলোর মত ; পরনে একটিমাত্র সিংহের চামড়া ; পিঠের উপর ঝুলছে তীরভর্তি তূণীর ও একটা ছোট হাল্কা বর্শা ; কোমরে ঝুলছে বাবার শিকারী ছুরিটা ; তার বাঁ হাতে রয়েছে ধনুক, আর আঙুলের মাঝখানে চারটি বাড়তি তীর।

২

যে মুহূর্তে সে বুঝতে পারল যে পিছন থেকে এগিয়ে আসা অশ্বারোহীদের হাতে তার বিপদের সম্ভাবনা আছে, সঙ্গে সঙ্গেই সে লাফ দিয়ে উঠে ধনুকে টংকার দিল। দস্যুরা আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন হবার আগেই টারজন ধনুকটাকে বাঁকিয়ে তীর ছুঁড়ল।

প্রথম তীরটি সোজা এসে বিঁধল সামনের দস্যুটার বুকে ; দুই হাত উপরে তুলে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে নীচে পড়ে গেল। ততক্ষণে বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে এল আরও চারটি তীর ; কোনটিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। মাটিতে ছিটকে পড়ল আরও এক দস্যু ; তিনজন আহত হল।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই চার অশ্বারোহী এসে তাকে ঘিরে ফেলল। আহত তিনজন নিজেদের শরীর থেকে পালকওয়ালা তীর টেনে তুলতেই ব্যস্ত,

কিন্তু চতুর্থ অনাহত দস্যুটি বর্শা উঁচিয়ে সশব্দে টারজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

টারজনও ধনুকের ছিলাটাকে গলা থেকে খুলে নিয়ে সেটা দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত করল শত্রুর বর্শার হাতলে ; তারপর লোকটির হাত চেপে ধরে একলাফে তারই ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল।

মুহূর্তকাল পরেই টারজন ঘোড়ার পিঠে চেপে নদী পেরিয়ে ওপারের শক্ত মাটিতে পা দিল। এবার সে নিরাপদ। ওপারের ক্রুদ্ধ দস্যুদের লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়ল। তীরটা গিয়ে বিঁধল আহত দস্যুটার উরুতে।

৩

বনের মধ্যে ঢুকবার পরেই মাথার উপরকার একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ে টারজন ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল। সে খুব রেগে গেছে ; দস্যুরা এসে পড়ায় তার মুখের খাবার হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন আবার নতুন করে তাকে খাবার খুঁজতে হবে। তাই সে অন্য জীবের খোঁজ-করতে করতে অচিরেই তা পেয়ে গেল এবং ভোজন-পর্ব সমাধা করল।

এবার বেশ হৃষ্ট চিত্তে টারজন নদীর দিকেই ফিরে চলল। নদীটা পার হয়ে দস্যুদের পথটাই ধরল। তাদের সঙ্গে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া করতেই হবে।

টারজন যখন বনেব প্রান্তে পৌঁছে গেল একটা সিংহ তখন তার দক্ষিণে সামান্য দূরে এগিয়ে চলেছে। তাই টারজন গাছে চড়ে ডাল থেকে ডালে চলে নিঃশব্দে দস্যুদের শিবিরের দিকে এগিয়ে চলল।

টারজন শিবিরের ঠিক মাথার উপরকার একটা গাছে পৌঁছে গেল। নীচে জনা বিশেক লোক এবং তাদের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র দেখতে পেল। বন্য জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ডালপালা ও ঝোপঝাড় দিয়ে একটা বেড়ামতন তৈরী করা হয়েছে।

একবার চকিতে চোখ বুলিয়েই টারজন নীচেকার সব কিছু ভাল করে দেখে নিল; কিন্তু তার সাগ্রহ দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ হল একটি জিনিসের উপব; অগ্নিকুণ্ডের কিছু দূরেই একটি সাদা মানুষকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হচ্ছে এতকাল যত সাদা মানুষ সে দেখেছে তাদের চাইতে এই বন্দী সাদা মানুষটি স্বতন্ত্র। গোড়ালি, কব্জি, গলা ও মাথার অলংকার ছাড়া তার সারা দেহের একমাত্র আচ্ছাদন হাতির দাঁতের গোলাকার চাকৃতি পর পর সাজিয়ে তৈরী এক-রকম গ্রীবা ও বক্ষস্ত্রান। এ ছাড়া তার দুই বাহু ও দুই পা সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

শিবিরের উপর নজর রাখতে গিয়ে টারজনের হঠাৎ মনে হল, এই দস্যুরা যেমন তার মুখের গ্রাস হরিণটাকে হাতছাড়া করে দিয়েছে, তেমনি সেও ওদের কাছ থেকে একটা কিছু হরণ করবে। একথা ভাবতে গিয়েই তার মনে হল, আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ওই সাদা মানুষটাকে চুরি করতে পারলেই তো ব্যাটাদের বোকা বানানো যায়।

গাছের ছায়ার আড়ালে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল টারজন। কতক্ষণে দস্যুরা গভীর ঘুমে ঢুলে পড়বে, কতক্ষণে তাদের শিকারকে নিয়ে সে পালাতে পারবে - তারই অপেক্ষা। এক সময় "নুমা"র তীব্র গন্ধ তার নাকে এল। অবশ্য সে ভালভাবেই জানে, ঘোড়ার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে "নুমা" শিবিরের কাছে এলেও যতক্ষণ আগুনটা ভালভাবে জ্বলতে থাকবে ততক্ষণ সে কিছুতেই শিবিরে ঢুকবে না।

শেষ পর্যন্ত একসময় সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল। শান্ত্রীও ঘুমে ঢুলছে। ছায়ার মত নিঃশব্দে টারজন গাছ থেকে নেমে এল।

ক্রমেই সে শান্ত্রীটি আরও কাছে এগিয়ে চলল। এবার ঠিক তার পিছনে। একটা কঠিন হাত দ্রুত বেরিয়ে এল, ইস্পাত-কঠিন কয়েকটা আঙুল চেপে বসল শান্ত্রীর বাদামী গলায়, আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ছুরি আমূল বিদ্ধ হল তার বাঁ কাঁধ থেকে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত।

অসাড় দেহ থেকে টারজন ছুরিটা তুলে নিল; তারপর এগিয়ে চলল বন্দীর দিকে। সে খোলা জায়গাতেই শুয়ে আছে। নিভন্ত আগুনের অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেল বন্দীর চোখ ছুটি ফোলা; সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে টারজনের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটের উপর আঙুল তুলে টারজন তাকে চুপ করে থাকতে বলল। হাঁটু ভেঙে তার পাশে বসে হাত-পায়ের শক্ত চামড়ার দড়ি কেটে দিল; টারজন তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল।

মুহূর্তকাল পরেই সে ইসারায় বন্দীকে বলল তাকে অনুসরণ করতে। কিন্তু দস্যুরাও স্থির-সংকল্প—তাদের কিছুতেই পালাতে দেবে না। বন্দুকের কুঁদো ও বর্শা বাগিয়ে তারাও রুখে দাঁড়াল। অরণ্যের রাজা ও তার সঙ্গী বুঝল, অবস্থা বড়ই সঙ্গীন।

একজন দস্যু এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল যেখান থেকে সঙ্গীদের কোন বিপদ না ঘটিয়েই গুলি ছোঁড়া যায়। গাদা বন্দুকটা কাঁধের উপর তুলে সে টারজনের দিকে নিশানা স্থির করল।

টারজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বার জন্য লোকটি সবে বন্দুকটা কাঁধের উপর তুলেছে এমন সময় অপর এক দস্যু সহসা আর্তনাদ করে উঠল, আর সে আর্তনাদকে ছাপিয়ে শোনা গেল সিংহ নুমার গর্জন; একলাফে সে এসে হাজির হল শিবিরের মাঝখানে।

যে দস্যুটি টারজনকে গুলি করতে উদ্যত হয়েছিল সে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে সিংহটাকে দেখেই ভয়ে চীৎকার করে উঠল। উত্তেজনাবশে রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সিংহের থাবা থেকে পালাতে গিয়ে ছিটকে পড়ল টারজনের হাতের মধ্যে।

টারজনও পলায়মান দস্যুটাকে ছুই হাতে মাথার উপর তুলে নুমার মুখের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। নুমাও সঙ্গে সঙ্গে বিরাট হা করে হতভাগ্য লোকটির মাথা ও গলা ঢুকিয়ে দিল মুখের ভিতরে। এদিকে টারজনও সঙ্গীটিকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত করে এক ছুটে সিংহটাকে পাশ কাটিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল গাছের সেই দো-ডালায় যেখান থেকে নুমা লাফিয়ে নেমে এসেছিল। শ্বেতকায় বন্দীটিও সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু নিল। সিংহের আকস্মিক আবির্ভাবে হতচকিত দস্যুরা সঠিক বুঝে ওঠার আগেই সাদা মানুষ ছুটি রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দিনের পর দিন দুটি মানুষ বিরাট এক পর্বতমালার গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করতে লাগল। দীর্ঘ দিন ধরে একসঙ্গে চলাফেরার সুযোগে সে সঙ্গীর ভাষাটি আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হল।

টারজন প্রথমেই জেনে নিল যে তার সঙ্গীটির নাম ভাল্‌তোর, আর ভাল্‌তোর গোড়া থেকেই টারজনের অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। সঙ্গীটি নিরস্ত্র হওয়ায় টারজন তার জন্য একটা বর্শা ও তীর-ধনুক তৈরী করে দিল। তারপর থেকেই ভাল্‌তোর জঙ্গলের রাজাকে শেখাতে শুরু করল তার ভাষায় কথা বলতে, আর টারজন শেখাতে লাগল ধনুর্বিদ্যা।

যে শিবিরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সেখান থেকে তোমার দেশটা কোন্ দিকে বলতে পার? টারজন শুধাল।

ভাল্‌তোর জবাব দিল, সেখান থেকে থেনার সোজা পূবদিকে; সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

টারজন আশ্বাস দিয়ে বলল, পূবদিকে আমি ঠিকই যেতে পারব, কিন্তু ঠিক আমাদের পথের উপর না পড়লে তো তোমার দেশটাকে আমি চিনে নিতে পারব না।

ভাল্‌তোর বলল, আমরা যদি সে দেশের পঞ্চাশ বা এক শ' মাইলের মধ্যে পৌঁছতে পারি তাহলে কোন উঁচু জায়গা থেকে জারাটরকে আমরা দেখতে

পাবই। সেখান থেকে থেনারের পথ আমি চিনতে পারব, কারণ এথ্‌নি শহরটা জারাটর থেকে প্রায় খাড়া পশ্চিমে।

জারাটর ও এথ্‌নিটা কি? টারজন জানতে চাইল।

জারাটর একটা বিরাট পর্বত-শিখর; তার কেন্দ্রস্থল অগ্নি ও গলিত পাথরে পরিপূর্ণ। সেটা ওন্‌থার উপত্যকার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত; স্বর্ণ-শহর কাথ্‌নির লোকরাই সেটার মালিক। আমি

এই ভাবে অনেক সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু ভাল্‌তোরের দেশটা তখনও যে দূরে সেই দূরেই রয়ে গেল। পাহাড়ে শিকারের অভাব নেই, তাই খাদ্যের কোন সমস্যা নেই।

কিন্তু ভাল্‌তোরের অত ধৈর্য নেই; অবশেষে একদা দিনশেষে পথরোধকারী একটা সুউচ্চ পাহাড়-প্রাচীরের সামনে পৌঁছে সে অসংকোচে বলল, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমরা কি করব?

নিজে গজদন্তের শহর এথ্‌নির অধিবাসী। ওন্‌থার উপত্যকার অন্তর্গত কাথ্‌নির অধিবাসী আমাদের চিরশত্রু।

টারজন বলল, তাহলে কাল আমরা থেনার উপত্যকার এথ্‌নি শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব।

নতুন দিনের শুরু হল মেঘমেদুর ভয়ংকর পরিবেশে। বর্ষাকল পার হয়ে গেছে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, যে পাহাড় শ্রেণীর ভিতর দিয়ে টারজন ও ভাল্‌তোর হারানো থেনার উপত্যকার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে তারই সুউচ্চ শিখরের মাথায় বিলম্বিত ঝড় যেন পুঞ্জীভূত হচ্ছে। রোদের উত্তাপেও রাতের ঠাণ্ডা কাটে নি। ডালপালার বিছানা ছেড়ে উঠে মানুষ দুটি শীতে কাঁপছে।

পড়ন্ত বিকেলে একটা গভীর খাদ বেয়ে উঠে উঁচু উপত্যকার উপর এসে তারা দাঁড়াল। হঠাৎ ভাল্‌তোর সানন্দে চীৎকার করে উঠল, পেয়েছি পেয়েছি! ঐ তো জারাটর!

টারজন সেদিকে তাকিয়ে দেখল দূরে একটা চওড়া-মাথা পর্বত-শিখর মেঘ-ভাঙা রাঙা আলোয় ঝলমল করছে। বলল, তাহলে ওটাই জারাটর! আর থেনার ওর ঠিক পুব দিকে?

ভাল্‌তোর জবাব দিল, হ্যাঁ; তার অর্থ এই উপত্যকার নীচে ঠিক আমাদের সামনেই ওন্‌থার। ওন্‌থারের প্রায় দক্ষিণ সীমান্তে আমরা পৌঁছে গেছি। ঐ তো স্বর্ণ-শহর কাথ্‌নি। খুবই সমৃদ্ধ শহর, কিন্তু অধিবাসীরা আমার জাতির শত্রু।

টারজন আর একবার কাথ্‌নি শহরের উপর চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করল, ওটাকে তোমরা স্বর্ণ-শহর বল কেন?

ভাল্‌তোর বলল, সোনালী গম্বুজ আর সোনার সেতুটা দেখতে পাচ্ছ না? ওগুলো নিরেট সোনা

দিয়ে মোড়া। কোন কোন গম্বুজের সোনা এক ইঞ্চি পুরু, আর সেতুটা নিরেট সোনার ইঁট দিয়ে তৈরী।

টারজন প্রশ্ন করল, এত সোনা ওরা পায় কোথায়?

শহর থেকে সোজা দক্ষিণের পাহাড়ে সোনার খনি আছে, ভাল্‌তোর জবাব দিল।

আর তোমার দেশ থেনার কোথায়?

ওন্‌থারের পুব দিকের পাহাড়ের ঠিক ওপারে। শহরের প্রায় পাঁচ মাইল উপরে যেখানে নদী ও রাস্তাটা বনের মধ্যে ঢুকে গেছে দেখতে পাচ্ছ?

এথ্‌নি থেকে আমরা কতদূরে আছি? টারজন শুধাল।

প্রায় পঁচিশ মাইল, ভাল্‌তোর জবাব দিল।

টারজন বলল, তাহলে তো আমরা এখনই রওনা দিতে পারি।

ভালতোর বলে উঠল, অবশ্যই পার ; কিন্তু দিনের আলোয় ওন্থার পার হবার চেষ্টা করাটা নিরাপদ হবে না। কাথ্নির ফটকে শাস্ত্রীরা নিশ্চয় আমাদের দেখতে পেলে আমাদের খুন করবে, নয় তো বন্দী করবে। রাতেও ও পথে সিংহের ভয় আছে, কিন্তু দিনের বেলায় অবস্থা আরও শোচনীয়।

কোন্ সিংহ ? টারজন জানতে চাইল।

ভাল্তোর বলল, কাথনির মানুষরা সিংহ পালে ; গোটা উপত্যকায় অনেক সিংহ ঘুরে বেড়ায়। নীচে নদীর এপারে যে বিস্তীর্ণ উপত্যকা দেখতে পাচ্ছ ওটার নাম 'সিংহ-ক্ষেত্র'। ও জায়গাটা সন্ধ্যার পরে পার হওয়াই নিরাপদ।

তোমার যেমন ইচ্ছা, কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে টারজন বলল। এখনই যাত্রা করা অথবা রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমার কাছে দুই-ই সমান।

একসময় অদৃশ্য সূর্য পশ্চিম দিগন্তে আরো ঢলে পড়ল ; ঘন কালো মেঘ উত্তরের পর্বত শিখরকে ঢেকে ফেলল। ভাল্তোর বলল, এবার আমরা যাত্রা করতে পারি।

একটা গিরিপথ ধরে দুজনে নীচে নামতে লাগল। দু'পাশের খাড়া পাহাড় কাথ্নি শহরের দৃষ্টি থেকে তাদের আড়াল করে রাখল। ঝড়ের সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সঙ্গে বজ্রের গর্জন। অকস্মাৎ বিদ্যুতের একটা প্রচণ্ড ঝিলিক কয়েক সেকেণ্ডের জন্য গোটা উপত্যকাটিকে ঝল্সে দিল ; প্রচণ্ড এক জলধারার ধাক্কায় দুজনেই মাটিতে পড়ে গেল।

কোন রকমে আবার যখন উঠে দাঁড়াল তখন তারা দাঁড়িয়ে আছে প্রচণ্ড জলস্রোতের মধ্যে। কিন্তু ঝড়ের দেবতার সব জারিজুরির বুঝি সেখানেই ইতি ঘটল। বৃষ্টি থেমে গেল। ভাল্তোর আবার পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল।

থেনারের রাস্তাটা যেখানে নদীকে অতিক্রম করেছে সেই জায়গাটা স্বর্ণ সেতু অর্থাৎ কাথ্নি শহরের ফটক থেকে সাত মাইল দূরে। তিন ঘণ্টায় সেই পথটা পার হয়ে দুজনে এসে দাঁড়াল নদীতীরে।

ভাল্তোর ইতস্ততঃ করে বলল, সাধারণত জল থাকে ফুটখানেক গভীর। এখন তিন ফুট গভীর।

টারজন বলল, অচিরেই জল গভীরতর হবে। পাহাড় ও উপত্যকার উপর থেকে ঝড়ের সব জল এখনও এসে পৌঁছয়নি। আজ রাতেই যদি নদী পার হতে হয় তো এখনই পার হতে হবে।

ভাল্তোর বলল, ঠিক আছে। আমাকে অনুসরণ কর ; আমি খালটাকে চিনি।

জলে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের মুখ আবার মেঘে ঢেকে গেল। খালটা ভাল্তোরের পরিচিত, তাই সে বেশ দ্রুতগতিতেই সেটা পার হতে লাগল।

ফলে টারজন ক্রমেই তার থেকে পিছিয়ে পড়তে লাগল। তবু প্রাণপণ শক্তিতে সে খালটা পার হতে লাগল।

জলের স্রোত প্রবল ; টারজনের মাংসপেশীও প্রবল শক্তিধর। তিন ফুট গভীব জল ক্রমে ফুলে-ফেঁপে টারজনের কোমর পর্যন্ত উঠল। হঠাৎ পথ ভুল করে সে একটা গর্তে পা দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

ওদিকে ভাল্‌তোর নিরাপদে অপর তীরে পৌঁছে টারজনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। একটা নির্দিষ্ট সময়েব মধ্যেও সে যখন এল না তখন ভাল্‌তোর তার নাম ধরে অনেক ডাকল, কিন্তু কোন সাড়া মিলল না।

একটু একটু করে সে নিজের দেহটাকে টেনে তুলল নদীর তীরে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ; সিংহের মত শরীরটাকে একবার ঝেড়ে নিল ; ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে একটা অস্পষ্ট আলোর রেখা যেন চোখে পড়ল। টারজন সতর্ক পায়ে এগিয়ে চলল।

নদী থেকে কয়েক পা এগোতেই সামনে একটা প্রাচীর। প্রাচীরের কাছাকাছি হতেই আলোটা আর চোখে পড়ল না। কয়েক পা পিছিয়ে এক দৌড়ে প্রাচীরের কাছে গিয়ে দিল লাফ। বাড়ানো আঙুল দিয়ে প্রাচীরের মাথাটা ধরে ঝুলে পড়ল। ধীরে ধীরে উপরে উঠে ঘোড়ার মত প্রাচীরের দুই-পাশে দুটি পা ঝুলিয়ে বসে প্রাচীরের অপর পারে তাকাল।

সারাটা রাত সে অপেক্ষা করে রইল ভোরের আলো ফুটল। তবু বন্ধুব দেখা নেই। অবশেষে তার দৃঢ় ধারণা হল, উন্মত্ত বন্যার টান টারজনকে মৃত্যুর মুখে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে নদীর তীর ছেড়ে সে আবার যাত্রা শুরু করল থেনার উপত্যকার দিকে।

উচ্ছসিত নদীর ক্রুদ্ধ জলধারার সঙ্গে প্রাণরক্ষার যুদ্ধে সতত ব্যস্ত টারজন সময়জ্ঞান একেবারেই হারিয়ে ফেলল। মৃত্যুর বিরুদ্ধে এ সংগ্রামের যেন শুরু নেই, শেষ নেই।

আলোর দিকে অর্ধেক পথ পৌঁছনো মাত্রই অবসিতপ্রায় ঝড়ের শেষ বিদ্যুৎটি ঝলসে উঠল। টাবজনের সামনে দেখা দিল একটা নীচু বাড়ি, একটা আলোকিত জানালা, একটা ঢাকা-দেওয়া দরজা ও তার আশ্রয়ে দণ্ডায়মান একটি মানুষ। সেই ক্ষণিক আলোয় টারজনও সেই মানুষটির দৃষ্টিকে এড়াতে পারল না।

সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার কর্কশ শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা খান্‌খান্ হয়ে ভেঙে পড়ল। দরজাটা সপাটে খুলে গেল, বাইরে বেরিয়ে এল মশালধারী অনেক মানুষ।

পশুর স্বাভাবিক সতর্কতা বশেই টারজন উল্টোদিকে ছুট দিল; টারজন বুঝতে পারল, পালাবার চেষ্টা বৃথা। দুই হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে সে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে রইল। তিন দিক থেকে লোকজন এসে তাকে ঘিরে ধরল। সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে নিশ্চয় এটা স্বর্ণ শহর।

টারজন বন্দী হল স্বর্ণ-শহরের রক্ষীদের হাতে। রক্ষীরা চত্বর পেরিয়ে একটা বাড়িতে টারজনকে নিয়ে গেল। মশালের আলোয় যে ঘরে তাকে ঢুকিয়ে দিল সেখানে আরও একটি লোককে সে দেখতে পেল।

ঘর অন্ধকার। টারজন সঙ্গীকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

তবু সময় নষ্ট না করে টারজন তখনই ঘরটি পরীক্ষা করতে শুরু করল। প্রথমেই গেল দরজার কাছে। সেখান থেকে দেয়াল বরাবর ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। সে জানে, ঘরের অপর লোকটি দূর কোণে একটা বেঞ্চিতে বসে আছে।

অন্ধকারে কে যেন বলে উঠল, কি করছ?

ঘরটা পরীক্ষা করছি—টারজন বলল।

লোকটি বলল, আমার নাম ফোবেগ। তোমার?

টারজন।

তুমি কি কাথ্‌নির লোক, না এথ্‌নির?

কোনটাই না; আমি এসেছি সুদূর দক্ষিণের একটা দেশ থেকে।

এই কাথ্‌নিতে এলে কেমন করে?

পথ হারিয়ে এসে পড়েছি, পুরো সত্য কথাটা টারজন বলতে চাইল না; শুধু বলল, বন্যার তোড়ে ভাসতে ভাসতে তোমাদের শহরে এসে পড়েছি। এখানে ওরা আমাকে বন্দী করেছে; ওদের অভিযোগ, আমি ওদের রাণীকে হত্যা করতে এসেছি।

অর্থাৎ ওদের ধারণা তুমি নেমোনকে হত্যা করতে এসেছ। কি জান, যে কোন অবস্থায়ই নেমোনকে খুশি করতে ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।

নেমোন কি তোমাদের রাণী?

ফোবেগ আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, ঈশ্বরের কেশরের নামে বলছি, সে রাণী তো বটেই, তার চাইতেও অনেক কিছু বেশী! ওন্থার বা থেনারে আগে কখনও এমন রাণী হয় নি, আর ভবিষ্যতেও কখনও হবে না।

রাণী কি সুন্দরী? টারজন প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, আমাদের রাণী পৃথিবীর সেরা সুন্দরী। কিন্তু—এবার ফোবেগ গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, কিন্তু সে একটি শয়তানী! আমি যে এত বছর ধরে তার সেবা করেছি আমিও তার কাছে করুণা ভিক্ষা করতে চাই না।

টারজন শুধাল, কোন্ অপরাধে তুমি এখানে এসেছ?

ফোবেগ বিষণ্ণ গলায় বলল, ভুলক্রমে আমি ঈশ্বরের লেজে পা দিয়েছিলাম।

লোকটির কথা শুনেই টারজনের খটকা লেগেছিল, কিন্তু এই শেষের কথা শুনে সে হতভম্ব হয়ে গেল।

টারজন লোকটির ভাষা বুঝতে পারলেও তার কথার তাৎপর্য কিছুই তার বোধগম্য হচ্ছে না: রাণীর খুশির সঙ্গে ন্যায়-বিচারের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ?

সে যখন এই সব চিন্তা করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল, ঠিক সেই সময় বহুদূর দক্ষিণে আর একটি বন্য প্রাণী ঝড়ের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছে। তারপর দিনের আলো ফুটলে সে বাইরেব রোদে বেরিয়ে এল। বন্য প্রাণীটি আর কেউ নয়—আমাদের পূর্ব পরিচিত কালো কেশরওয়ালা সেই সিংহটি। নতুন-ওঠা রোদে হল্‌দে-সবুজ চোখ দুটো মিট্‌ মিট্‌ করতে করতে প্রাতরাশের খোঁজে নীচে নেমে গেল। আবার ঠিক সেই সময়ই দুটি সৈনিকের সঙ্গে একজন কালো ক্রীতদাস জঙ্গলে রাজার জন্য প্রাতরাশ নিয়ে কাথ্‌নির কারা-কক্ষে প্রবেশ করল।

বিনা প্রতিবাদে কাথ্‌নির কারাকক্ষে ঢুকবার সময় টারজন ভেবেছিল যে পরদিন সকালেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু পরদিন সকালে ওরা তাকে বাইরে নিয়ে যায় নি; তার পর-দিনও নয়, এবং তার পরের দিনও নয়। সেও মুক্তির আশায় আশায় অপেক্ষা করেই আছে।

তারপর একদিন চারজন সৈনিক এসে দরজাটা সপাটে খুলে ফেলল। তাদের একজন হাঁক দিল, আমাদের সঙ্গে চলে এস—দুজনই।

ফোবেগ বিষণ্ণ মনে, আর টারজন নুমার মত আরণ্য মর্যাদার সঙ্গে তাদের পিছু পিছু চলতে লাগল। চত্বর পেরিয়ে একটা দরজার ভিতর দিয়ে দীর্ঘ বারান্দার শেষে একটা বড় ঘরে সকলে ঢুকল। সেখানে হস্তিদন্ত ও স্বর্ণখচিত পোশাকে সজ্জিত সাতজন অফিসার একটা টেবিলের ওপারে বসে ছিল। তাদের মধ্যে দু'জনকে টারজন চিনতে পারল—প্রবীণ টমোস ও তরুণ গেম্‌নন।

ফোবেগ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, এরা সকলেই সম্ভ্রান্ত লোক। টেবিলের ঠিক মাঝখানে বসেছে বুড়ো টমোস, রাণীর মন্ত্রী; তার ডাইনে বসেছে এরোট; সে আমার মত সাধারণ সৈনিকই ছিল, কিন্তু নেমোনের নজর পড়ায় সে এখন রাণীর প্রিয়-পাত্র। তার বাঁ দিকে বসে আছে যুবক গেম্‌নন। তার অধীনে যে সব সৈনিক কাজ করে তারা সকলেই বলে তার মত লোক হয় না।

তার কথা শেষ হতেই ঘরের একদিকের দরজা খুলে হাতির দাঁত ও সোনার ঝলমলে পোশাক পরিহিত একটি লোক উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল: রাণী। বলেই আবার সরে গেল।

সবগুলো চোখ পড়ল দরজার দিকে ; সম্ভ্রান্ত লোকগুলি উঠে দাঁড়াল, তারপর দরজার দিকে মুখ করে নতজানু হল। শুধু বানর-রাজ টারজন নতজানু হল না।

জনৈক রক্ষী গর্জন করে উঠল, নীচু হ শেয়াল! পরমুহূর্তেই মৃত্যু-কঠিন নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রবেশ করল রাণী। অলসভাবে একবার চারদিকে তাকাল। তার চোখ পড়ল টারজনের উপর। ভুরু দুটি ঈষৎ কুঁচকে গেল।

দীর্ঘ পল্লবে ঢাকা কালো চোখ তুলে রাণী টারজনের দিকে তাকাল। দেখল তার ব্রোঞ্জ রঙের চামড়া, আর মাংসপেশীসমৃদ্ধ দেহ। শুধাল, তুমি নতজানু হলে না কেন?

টারজন নির্ভয়ে জবাব দিল, ওরা বলেছে তুমি আমাকে মেরে ফেলবে; তাহলে তোমার সামনে আমি নতজানু হব কেন? তুমি তো আমার রাণী নও?

টমোস চীৎকার করে উঠল, থাম! মূর্খ ক্রীতদাস, অসভ্য বর্বর, তুমি কি জান না যে রাণী নেমোনের সঙ্গে কথা বলছ?

আণ্ডার অফিসারের দিকে মুখ ফিরিয়ে টমোস হুকুম করল, ওদের এখান থেকে নিয়ে যাও; মৃত্যুর ব্যবস্থা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত সেলেই আটকে রাখবে।

নেমোন বলল, দাঁড়াও। এই লোকটি সম্পর্কে আমি আরও কিছু জানতে চাই। টারজনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আদর-ভরা সরল গলায় বলল, তাহলে তুমি আমাকে মেরে ফেলতেই এসেছিলে?

টারজন জবাব দিল, আমি স্ত্রীলোককে মারি না। তোমাকে মারতে আমি এখানে আসি নি।

তাহলে কেন তুমি ওনথারে এসেছিলে?

টমোসের দিকে মাথাটা নেড়ে টারজন জবাব দিল, ওই লালমুখ বুড়োকে তো সে কথা দু'বার বলেছি। ওকেই জিজ্ঞাসা কর; যারা আমাকে মেরে ফেলাই স্থির করেছে তাদের কাছে আমি আর কৈফিয়ৎ দিতে পারি না।

টারজনের কথায় নেমোনের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে সংযম হারাল না। ঠাণ্ডা গলায় শুধাল, অপর লোকটি কে?
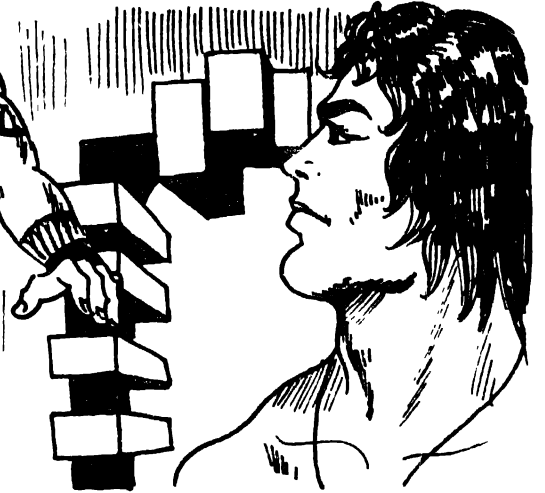
এবার জবাব দিল এরোট, ও একজন মন্দির-রক্ষী, নাম ফোবেগ। ও দেবতা টুসকে অপবিত্র করেছে।

নেমোন বলল, সিংহ-ক্ষেত্রে ওদের দুজনের লড়াই দেখতে আমাদের বেশ মজাই লাগবে। দেবতা টুস-এর দেওয়া দেহ ছাড়া অপর কোন অস্ত্র ছাড়াই ওদের যুদ্ধ করতে হবে। যে জিতবে সে মুক্তি পাবে।

সিংহ-ক্ষেত্র নামে পরিচিত একটা সমতল ভূমিতে বহু দর্শক এসে জমা হয়েছে। রক্ষীরা দুই যোদ্ধাকে সেই দিকে নিয়ে চলল।

সমতলভূমির মাঝখানে বিশ বা ত্রিশ ফুট মাটি খুঁড়ে নীচে একটা ডিম্বাকৃতি মল্লক্ষেত্র তৈরী করা হয়েছে। সেই মাটি গর্তের চারদিকে ফেলে ক্রমশ উঁচু করা হয়েছে।

খিলানের নীচ দিয়ে মল্ল-ক্ষেত্রের দিকে নামবার সময় টারজন দেখল, প্রায় অর্ধেক আসন এর মধ্যেই ভর্তি হয়ে গেছে। নিশ্চয় এটা একটা মহাফূর্তির দিন। সে ফোবেগের কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইল। ফোবেগ বলল, বর্ষাকাল শেষ হলে প্রতি বছরই একটা অনুষ্ঠান হয়; এটা তারই অংশ।

ইতিমধ্যে শহরের দিক থেকে ঢাক ও শিঙার শব্দ ভেসে এল। বাজনা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। কাছে এলে ঢালু জায়গা বেয়ে বাজনাদাররা মল্ল-ক্ষেত্রের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল।

বাজনার পরেই মার্চ করে এল একদল সৈনিক, প্রত্যেকের বর্শার মাথায় উড়ছে রঙিন পতাকা। দৃশ্য মনোরম, কিন্তু এর পরে যা এল তার তুলনায় কিছুই নয়।

সৈনিকদের কয়েক গজ পিছনেই এল চার সিংহে টানা সোনার রথ; তার উপরে লোম ও বিচিত্র রঙের কাপড়ে সাজানো আসনে অর্ধশায়িত ভঙ্গিতে বসে আছে রাণী নেমোন। ষোলটি কালো ক্রীতদাস ধরে আছে সিংহের রাশ; রথের দুই পাশে মার্চ করে চলেছে সোনা ও হাতির দাঁতের ঝকঝকে পোশাক পরা দু'জন করে সম্ভ্রান্ত লোক; দীর্ঘদেহী একটি কালো মানুষ একটা বড় লাল ছাতা ধরে আছে রাণীর মাথায়।

শোভাযাত্রা মল্ল-ক্ষেত্রে পৌঁছবার পরে নেমোন রথ থেকে নেমে সমবেত সকলের জয়ধ্বনির মধ্যে তার নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসল।

বেজে উঠল শিঙা। সৈনিকরা টারজন ও ফোবেগকে সঙ্গে নিয়ে মল্ল-ক্ষেত্রের চারদিকে ঘুরতে লাগল। রাণীর আসনের সামনে দিয়ে যাবার সময় নেমোন আধ-বোজা চোখে নবাগত লোকটিকে ও মোটা কাথ্‌নীয়কে ভাল করে লক্ষ্য করল।

ক্যাপ্টেন ঘোষণা করল, শিঙা বাজলেই তোমরা লড়াই শুরু করতে পার। দেবতা টুস্‌ তোমাদের সহায় হোন।

শিঙা বেজে উঠল। সারা রঙ্গালয় উৎকণ্ঠায় নিশ্চুপ। দুজন এগিয়ে গেল দুজনের দিকে। ফোবেগ গর্বোদ্ধত, আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়। টারজনের গতি সিংহের মত সহজ, সাবলীল।

ফোবেগ টারজনের একেবারে কাছে এগিয়ে গেল। টারজন গলাটা বাড়িয়ে দিল। ফোবেগ সেটা চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে টারজন দুই হাতের মুঠো এক করে হঠাৎ সেটাকে তুলে সজোরে আঘাত করল ফোবেগের থুত্‌নিতে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঠেলে দিল। ফোবেগের ভারী দেহটা সবেগে ছিটকে গেল ডজন খানেক পা দূরে; সে ধপাস করে বসে পড়ল।

হতভম্ব জনতার মুখ থেকে একটা সবিস্ময় আর্তনাদ বেরিয়ে এল। যারা টারজনের উপর বাজি ধরেছিল তারা সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল।

ফোবেগ কোনরকমে উঠে দাঁড়াল। তীব্র ক্রোধে মুখখানা লাল। গর্জে উঠে সে আবার টারজনকে আক্রমণ করল, আর রেহাই নেই। এবার তোকে শেষ করব।

মৃত্যু! মৃত্যু! ফোবেগের সমর্থকরা চেঁচাতে লাগল। মৃত্যু! মৃত্যু! আমরা চাই মৃত্যু!

টারজন আবারও ফোবেগের দেহটা মাথার উপর তুলে নিল। অসহায় ফোবেগ বৃথাই হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। টারজন মল্ল-ক্ষেত্রের একপ্রান্তে রাণীর আসনের কাছে পৌঁছে ভারী দেহটাকে জনতার মধ্যে ছুঁড়ে দিল।

বলল, তোমাদের শক্তিমানকে ফিরিয়ে নাও। টারজনের ওকে কোন দরকার নেই।

কী আশ্চর্য, হায়েনার মত চীৎকার করতে করতে জনতা সেই দেহটাকে আবার মল্ল-ক্ষেত্রের মধ্যেই

লঘু পদক্ষেপে একপাশে সরে গিয়ে টারজন তার বাড়ানো হাত দুটি চেপে ধরে দুই দিকে সরিয়ে দিল; তারপরেই একটা ব্রোঞ্জকঠিন হাত ফোবেগের গলাটা চেপে ধরল; পরমুহূর্তেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে টারজন প্রতিপক্ষকে মাথার উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল। ফোবেগ সবেগে মল্ল-ক্ষেত্রের উপর ছিটকে পড়ল।

নেমোন বাজির আসনে ঝুঁকে বসল; তার চোখ দুটো জ্বলছে; বুকটা উঠছে নামছে। অন্য অনেকের মতই এরোটের বুকটা যেন চেপে বসেছে।

ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠল, ওকে মেরে ফেল! মেরে ফেল!

আসন থেকে ঝুঁকে নেমোনও চেঁচিয়ে বলল, ওকে মেরে ফেল! মেরে ফেল।

বিরক্তিতে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে টারজন ফিরে চলল।

টারজন জবাব দিল, আমি ওকে মারব না।

নেমোন উত্তেজনায় লাল হয়ে আসনে উঠে দাঁড়াল। টারজন মুখ তুলতেই বলল, টারজন! কেন তুমি ওকে মারবে না?

টারজন পাল্টা প্রশ্ন করল, কেন মারব? ও তো আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি হত্যা করি কেবল আত্মরক্ষা বা খাদ্যের জন্য; কিন্তু আমি তো মানুষের মাংস খাই না, কাজেই ওকে মেরে ফেলব কেন?

এরোটের মুখে আতংকের ছায়া। রাণীর দিকে তাকিয়ে বলল, এই উদ্ধত বর্বরটাকে শেষ করে দেবার হুকুম কি দেব?

নেমোন মাথা নাড়ল। তার মুখে অজ্ঞাত রহস্যের আবরণ, কিন্তু দুই চোখে এক বিচিত্র অগ্নি-জ্বালা। বলল, দুজনকেই আমরা জীবন ফিরিয়ে দিলাম। ফোবেগকে মুক্ত করে দাও। আর অপর-জনকে প্রাসাদে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে রাণী উঠে পড়ল।

সিংহ-ক্ষেত্রের অনেক মাইল দক্ষিণে ওন্থার উপত্যকায় একটি সিংহ তখন অরণ্যের মধ্যে অস্থির-ভাবে পায়চারি করে চলেছে। মনে হচ্ছে সে যেন কাকে খুঁজছে। একবার সে মাথা তুলে এমন-ভাবে গর্জন করে উঠল যে মাটি কাঁপতে লাগল। আর বানর 'মানু' তার ভাই-বোনদের নিয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে গেল। অনেক দূরে একটা হাতি ডেকে উঠল; তারপরেই জঙ্গলের বুকে নেমে এল নিস্তব্ধতা।

একজন আণ্ডার-অফিসারের নেতৃত্বে একদল সাধারণ সৈনিক টারজনকে সঙ্গে করে স্টেডিয়ামে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে সে শহরে ফিরল সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গী হয়ে। নেমোনের হাবভাবে তারা বুঝতে পেরেছিল যে এই নবাগতই হয় তো রাণীর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবে; তাই অনেক সম্ভ্রান্ত লোকই তার সঙ্গে মাখামাখি শুরু করে দিল। মল্ল-ক্ষেত্র থেকেই যারা টারজনের সঙ্গ নিল, নানা ভাবে তারা তার প্রশস্তি গাইতে লাগল। গেম্নন তাদের অন্যতম।

শহরে পৌঁছে গেম্নন টারজনকে তার নিজের বাসায় নিয়ে তুলল। তার বাসা বলতে একটা শোবার

ঘর ও স্নানের ঘর; অন্য সব ব্যবস্থা অপর একজন অফিসারের সঙ্গে ভাগাভাগি করে চালাতে হয়। দেওয়ালে রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম-চর্ম, নানা পশুর মাথা, আর চামড়ার উপর আঁকা ছবি। কিন্তু ঘরের মধ্যে লেখার সরঞ্জাম কিছুই চোখে পড়ল না। গেম্ননকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে টারজন জানতে পারল, লেখার মত কোন শব্দ বা কোন লিখিত ভাষাই সে শেখে নি।

স্নান সেরে বেরিয়ে এসেই দেখল আহার প্রস্তুত। টারজন সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসে গেল। গেম্নন কাছে বসে কথা বলতে লাগল।

হঠাৎ টারজন প্রশ্ন করল, তোমার সিংহ আছে?

নিশ্চয়। আমি একজন সিংহ-পুরুষ; সিংহ রাখতেই হবে। রাণীর প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে প্রত্যেক সিংহ-পুরুষকে সিংহ রাখতেই হবে। আমার পাঁচটা সিংহ আছে।

সূর্য অস্ত গেলে ঘরে ঢুকল একটি ক্রীতদাস; হাতে জ্বলন্ত প্রদীপ; সিলিং থেকে ঝোলানো শিকলে প্রদীপটাকে ঝুলিয়ে দিল।

গেম্নন দাঁড়িয়ে বলল, সান্ধ্য ভোজের সময় হয়েছে।

আমি খেয়েছি, টারজন বলল।

তবু চল ; সেখানে অনেকের সঙ্গে আলাপ হবে।

টারজন উঠল। গেম্‌ননের পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাজপ্রাসাদ। তুজন একসঙ্গে সেখানে ঢুকলেও বসবার ঘর থেকেই গেম্‌নন বিদায় নিল। রাণীর ঘরে ঢুকল টারজন একা।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে টারজন ঘরটা দেখে নিল। ঘরটা বড় নয়, কিন্তু চমৎকারভাবে সাজানো। নিরেট সোনার স্তম্ভের উপর ছাদটা দাঁড়িয়ে আছে। দেওয়ালে হাতির দাঁতের টালি বসানো ; রঙিন পাথরে মোজাইক করা মেঝেতে নানা রঙের কম্বল ও জীব-জন্তুর চামড়া ছড়ানো ; তার মধ্যে একটি মানুষের মাথাশুদ্ধ টান-করা চামড়াও রয়েছে।

আমি তোমাকে পছন্দ করি। নেমোনের কণ্ঠস্বর নীচু ও আদর মাখানো।

এবার আমার প্রশ্নের জবাব দাও। নিজের দেশে তুমি কি একজন সিংহ-পুরুষ ?

সেখানে আমি একজন সম্ভ্রান্ত লোক ; তবে সেটা নিজের গুণে নয়, বংশগত অধিকারে।

নেমোন উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, আঃ ! আমিও তাই ভেবেছিলাম ; তুমি একটি সিংহ-পুরুষ !

তাতে কি হল ? টারজন প্রশ্ন করল।

নেমোন হাতটা বাড়িয়ে টারজনের হাতের উপর রাখল ; নরম ও গরম হাতখানা একটু কেঁপে উঠল। নেমোন বলল, আমি তোমাকে মুক্তি দেব, কিন্তু এক শর্তে।

ঘরের এক প্রান্তে একটা বড় সিংহ তুটো স্তম্ভের মাঝখানে শিকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে। সিংহটা প্রকাণ্ড ; টারজন ঘরে ঢোকার মুহূর্ত থেকেই সিংহটা হিংস্র চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এরোট ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করতে না করতেই সিংহটা ভয়ংকর গর্জন করে টারজনের দিকে লাফ দিল। কিন্তু সিংহটা শিকলে বাঁধা ; মেঝেতে পড়ে গজরাতে লাগল।

নেমোন বলল, বেল্‌থার তোমাকে পছন্দ করছে না।

ওর মধ্যে তো কাথ্‌নির সব লোকের মনোভাবই প্রতিফলিত হচ্ছে, টারজন জবাব দিল।

সেটা সত্যি নয়, রাণী আপত্তি জানাল।

নয় ?

সেটা কি ?

তুমি এখানেই থাকবে ; ওন্‌থারকে—আমাকে ছেড়ে যাবে না। রাণীর কণ্ঠস্বর আগ্রহে ভাঙা।

টারজন চুপ। এ কথা সে দিতে পারে না বলেই কথা বলল না।

নেমোন ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, আমি তোমাকে কাথ্‌নির সম্ভ্রান্ত নাগরিক করে দেব। সোনার শিরস্ত্রাণ, হাতির দাঁতের বক্ষস্ত্রাণ বানিয়ে দেব। তোমাকে সিংহ দেব পঞ্চাশটা, একশ'টা—যত চাও। তুমি হবে আমার দরবারের ধনীশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী।

আর ঠিক তখনই দূর প্রান্তের একটা দরজা খুলে ঘরে ঢুকল এক নিগ্রো রমণী। একসময়ে সে খুবই লম্বা ছিল। এখন বয়সের ভারে ন্যুব্জ দেহ,

মাথায় যৎসামান্য সাদা চুল। শুকনো ঠোঁট দুটি বেঁকে গিয়ে দাঁতবিহীন মাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। দ্বারপথে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ছে যেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু একটি বিকৃতদর্শন ডাইনি।

বাধা পেয়ে নেমোন শরীরটাকে সোজা করে চারদিকে তাকাল।

বুড়ি ডাইনি মেঝেতে লাঠিটা ঠুকতে লাগল, আর অদ্ভুত ভয়ংকর একটা পুতুলের মত মাথাটা অবিরাম নাড়তে লাগল। ঠোঁট দুটি তখনও বেঁকে আছে। ক্যাক-ক্যাক করে বলল, আয়! আয়! আয়!

নেমোন লাফ দিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চীৎকার করে বলল, ম'তুজে! আমি তোমাকে মেরে ফেলব; টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব! চলে যাও এখান থেকে।

বুড়ি কিন্তু তবু লাঠি ঠক্‌ঠকিয়ে বলতে লাগল, আয়! আয়! আয়!

ধীরে ধীরে নেমোন তার দিকে এগিয়ে গেল। যেন কোন অদৃশ্য শক্তির দুর্বার টানে সে ঘরটা পার হয়ে গেল; বুড়ি সরে দাঁড়াল; আর রাণী দরজা পার হয়ে অন্ধকার বারান্দায় মিশে গেল। একবার টারজনের দিকে তাকিয়ে বুড়িও দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

নেমোনের সঙ্গে সঙ্গে টারজনও উঠে দাঁড়িয়েছিল। মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করে রাণী ও বুড়িকে অনুসরণ করে সেও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিকল-বাঁধা সিংহটা বজ্রের মত হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল।

পরদিন সকালে বাসায় ঢুকেই গেম্‌নন দেখল, বসার ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে টারজন প্রাসাদ-চত্বরের দিকে তাকিয়ে আছে।

বলল, সকালেই তোমাকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছি।

নিশ্চয় বিস্মিতও হয়েছ? জঙ্গলের রাজা বলল।

গেম্‌নন জবাব দিল, তোমাকে আর কোনদিন

না দেখতে পেলেও বিস্মিত হতাম না। তারপর রাণী কি বলল? আর এরোট, সে নিশ্চয় তোমাকে সেখানে দেখে খুশি হয় নি?

টারজন হাসল, তা হয় কি; তবে রাণী তো তাকে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

আর সারা সময়টা তুমি তার সঙ্গে একা ছিলে? গেম্‌ননের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর।

টারজন তার কথাকে সংশোধন করে দিয়ে বলল, না। বেল্‌থার ও আমি ছিলাম।

হ্যাঁ, বেল্‌থারের থাকারই কথা। আচ্ছা! তাহলে ম'তুজেকেও দেখেছ? সে নিশ্চয় জামাই-আদর করে নি।

টারজন বলল, না। আসলে সে আমার দিকে তাকায়ই নি। শুধু নেমোনকে বেরিয়ে যেতে বলল। আর নেমোনও বেরিয়ে গেল। কালো বুড়িটার হুকুম সে সহজেই মেনে নিল।

গেম্‌নন বলতে লাগল, ম'তুজ সম্পর্কে অনেক কথা এখানে চালু আছে। তার মধ্যে একটা হল, নেমোনের ঠাকুর্দার আমল থেকেই ম'তুজে রাজবাড়িতে ক্রীতদাসী হয়ে আছে; তৎকালীন রাজার ছেলে নেমোনের বাবার চাইতে কয়েক বছরের

বড়। প্রবীণরা আজও বলে যে নিগ্রো হলেও তরুণী ম'তুজে দেখতে সুশ্রী ছিল, আর কানাঘুষায় এও শোনা যায় যে নেমোন তারই মেয়ে।

নেমোনের জন্মের প্রায় এক বছর আগে তার বাবার রাজত্বের দশম বছরে গর্ভাবস্থায় রহস্যজনক পরিস্থিতিতে রাণী মারা যায়। মৃত্যুর ঠিক আগে একটি শিশুপুত্র জন্মলাভ করে। তার নাম আলেক-স্টার; সে আজও বেঁচে আছে।

তাহলে সে রাজা হল না কেন? টারজন জানতে চাইল।

রাজ-দরবারে ষড়যন্ত্র ও নরহত্যার সে এক দীর্ঘ রহস্যে-ঢাকা কাহিনী; তার কতটা সত্য আর কতটা অনুমান কে জানে। জীবিত লোকদের মধ্যে মাত্র দুজন সেটা জানে। হয় তো নেমোনও জানে।

রাণীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ম'তুজের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ম'তুজের অনুগ্রহ পেয়ে টমোসের প্রভাব-প্রতিপত্তিও বাড়তে লাগল। বছরখানেক পরে রাজার মৃত্যু হল। তাকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে এই অভিযোগে সম্ভ্রান্ত লোকরাও বিদ্রোহ করে বসল; কিন্তু ম'তুজের প্ররোচনায় টমোস সব দোষ আর একটি ক্রীতদাসীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বিদ্রোহীদের শান্ত করল; সেই ক্রীতদাসীর প্রাণদণ্ড দেওয়া হল।

শিশু রাজপুত্রের রিজেন্ট হিসাবে টমোস দশ বছর রাজত্ব চালাল। আর আলেক্স্টারকে পাগল সাব্যস্ত করে মন্দিরের মধ্যে বন্দী করে রেখে বারো বছর বয়সে নেমোনকে কাথ্‌নির রাণীর পদে অভিষিক্ত করা হল।

ওদিকে এরোট হচ্ছে ম'তুজে ও টমোসের সৃষ্টি, আর তার ফলে এমন একটা গোলমেলে ব্যাপারের সৃষ্টি হয়েছে যেটা যেমন মজাদার তেমনই শোচনীয়। টমোস চায় নেমোনকে বিয়ে করতে, অথচ ম'তুজের তাতে মত নেই। তাই ম'তুজে চায় নেমোন এরোটকে বিয়ে করুক, কিন্তু যেহেতু এরোট সিংহ-পুরুষ নয়, এবং যেহেতু রাণীর বিয়ে সর্বোচ্চ সম্প্রদায়ে হওয়াটাই চিরাচরিত প্রথা, তাই নেমোন রাণী হিসাবে সে প্রথা ভাঙতে নারাজ।

ম'তুজে চায় এরোটের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে, কারণ এরোট তার হাতের পুতুল।

একটা কথা স্থির জেনো, ম'তুজে তোমার শত্রু। মনে রেখো, এই কুৎসিত বুড়ির ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে দাঁড়িয়েছে তারই ভাগ্যে জুটেছে নির্মম মৃত্যু। কাজেই ম'তুজে, টমোস ও এরোট সম্পর্কে সাবধান; আর বন্ধু হিসাবে তোমাকে চুপি চুপি বলি, নেমোন সম্পর্কেও সাবধান।

তারপর দুই বন্ধু বের হল শহর দেখতে। বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা প্রশস্ত পথ। দুই পাশে সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের সাদা ও সোনালী বাড়ি। এক-জায়গায় দেখা গেল ক্রীতদাস কেনা-বেচা চলছে। দোকানে-দোকানে নানারকম পসরাও সাজানো রয়েছে।

বাজারের যেখানে যায় সেখানেই টারজন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; দেখামাত্রই সকলে তাকে চিনতে পারে; সে তো সকলের চোখেই স্টেডিয়ামের নায়ক।

জঙ্গলের রাজা একসময় বলল, এখান থেকে বেরিয়ে যাই চল; এত ভিড় আমার ভাল লাগে না।

বেশ তো, প্রাসাদে ফিরে চল; সেখানে রাণীর সিংহগুলো দেখা যাবে।

টারজন বলল, সেই ভাল; ভিড় দেখার চাইতে সিংহ দেখা অনেক ভাল।

ভোর হতেই টারজন ও ভাল্‌তোর ঘুম থেকে উঠে পড়ল, কারণ একটু সকাল-সকালই ভাল্‌তোরকে এথ্‌নি-যাত্রা করতে হবে। পাশের ঘরে তাদের প্রাতরাশ তৈরী হচ্ছে।

গজদন্তের গুল্‌ফ-বন্ধনীর সঙ্গে স্যাণ্ডেলের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে ভাল্‌তোর বলল, আবার আমাদের দেখা হল, আবারও এল বিদায়ের পালা। আহা বন্ধু, তুমি যদি আমার সঙ্গী হতে তো কী ভালই হত।

টারজন তাকে বুঝিয়ে বলল, দেখ, গেম্‌ননের হেপাজতে থাকাকালে আমি যদি কাথ্‌নি ছেড়ে

চলে যাই তাহলে গেম্‌ননের জীবন বিপন্ন হবে; তাই আমি এখন যেতে পারছি না। কিন্তু তুমি নিশ্চিত জেন, এথ্‌নিতে তোমাব সঙ্গে আমি দেখা করবই।

ভাল্‌তোর বলতে লাগল, বন্যার ফলে আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম তখন আশাই করতে পারি নি যে আর কোন দিন জীবিত অবস্থায় তোমাকে দেখতে পাব। সিংহের মুখে দাঁড়িয়ে তোমাকে চিনতে পেরেও নিজের চোখকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারি নি। টারজন, চার-চার বার তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ; আমার পিতৃগৃহে সাদর অভ্যর্থনা তোমার জন্য সর্বদাই অপেক্ষা করে থাকবে।

একটি বড় সিংহ দক্ষিণ দিক থেকে নিঃশব্দে কাফা-সীমান্ত পার হয়ে গেল। সে সিংহটি এমন নিশ্চিতভাবে পথ চলছে যে তার মনে সন্দেহের লেশমাত্র আছে বলে মনে হয় না।

সে কেন চলেছে? এই বিঘ্নসংকুল দীর্ঘ পথে কিসের প্রেরণায় সে চলেছে? চলেছেই বা কোথায়? কি বা কাকে সে খুঁজছে? একমাত্র সে— পশুরাজ সিংহ 'নুমা'ই তা জানে।

সে রাতে গেম্‌নন ও টারজন তাদের বাসাতেই রাতের খাওয়া শেষ করল। ভাল্‌তোর জানাল, সে ঘুমতে যাচ্ছে, সকালের আগে যেন ঘুম ভাঙানো না হয়।

টারজন ও ভাল্‌তোরের খাওয়া শেষ হতেই একজন এসে খবর দিল, ভাল্‌তোরের পথ-প্রদর্শক যাত্রার জন্য তৈরী ; একমুহূর্ত পরে সংক্ষেপে বিদায়-পর্ব শেষ করে ভাল্‌তোরও স্বদেশের পথে যাত্রা করল।

সেদিন সন্ধ্যায় টারজন সবে গেম্‌নন ও তার বাবা ও মায়ের সঙ্গে রাতের খাবার খেতে বসেছে এমন সময় একটি ক্রীতদাস এসে জানাল, ডোরিয়ার বাবা টুডোস-এর বাড়ি থেকে একজন বার্তাবহ এসেছে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে।

তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও, গেম্‌নন বলল।

একটু পরেই ঘরে ঢুকল একটি দীর্ঘকায় নিগ্রো।

গেম্‌নন সাদরে বলল, আরে গেম্বা ! কি খবর এনেছ বল ?

ক্রীতদাস বলল, খবরটি গুরুতর এবং গোপনীয়।

এদের সামনেই সব কথা বলতে পার গেম্বা।

গেম্‌নন পকেটের থলি থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে গেম্বাকে দিল। তোমার মনিব-কন্যার কাছে ফিরে গিয়ে বল, কাল তাদের বাড়িতে গিয়ে আমি তার বাবার সঙ্গে কথা বলব।

ক্রীতদাস চলে গেলে গেম্‌নন অসহায়ভাবে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কি করতে পারি ? টুডোসই বা কি করবে ? কেই বা কি করতে পারে ? আমরা অসহায়।

টারজন বলল, হয়তো আমি কিছু করতে পারি। বর্তমানে আমি তোমাদের রাণীর বিশ্বাস-ভাজনদের একজন ; রাণীর সঙ্গে আমি কথা বলব ; দরকার হলে তোমাদের পক্ষে ওকালতি করব।

আমার মালিক টুডোস-এর কন্যা ডোরিয়া আমাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে, এরোট আজ কৌশল করে তার পিতৃগৃহে ঢুকে তার সঙ্গে কথা বলেছে। কি কথা বলেছে সেটা কিছু নয়, কিন্তু সে যে ডোরিয়াকে দেখেছে সেটাই গুরুতর।

গেম্‌ননের বাবা বলে উঠল, ব্যাটা শেয়াল !

গেম্‌ননের মুখে ছায়া পড়ল। আর কোন কথা আছে ?

না মালিক ; এই সব, গেম্বা জবাব দিল।

গেম্‌ননের চোখে নতুন আশার আলো দেখা দিল। তা যদি কর ! রাণী তোমার কথা শুনবে। আমার বিশ্বাস, একমাত্র তুমিই ডোরিয়াকে বাঁচাতে পার। কিন্তু মনে রেখ, কোনক্রমেই রাণী যেন তাকে দেখতে না পায় ; তাহলে আর রক্ষা নেই—রাণী হয় তাকে বিকলাঙ্গ করে দেবে, নয় তো মেরে ফেলবে।

পরদিন সকালে রাজপ্রাসাদ থেকেই দূত এসে জানাল, রাণীর হুকুম দুপুরে টারজনকে তার সঙ্গে

দেখা করতে হবে ; সেই সঙ্গে গেমননের প্রতি তার নির্দেশ, সে যেন শক্তিশালী রক্ষী নিয়ে টারজনের অনুগমন করে, কারণ রাণীর আশংকা টারজনের শত্রুরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

গেমননের বাবা বলল, নেমোনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার মত সাহস যাদের আছে তারা নিশ্চয় খুব শক্তিমান শত্রু।

গেমনন বলল, গোটা কাথ্‌নিতে সে সাহস শুধু একজনই রাখে।

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল। বলল, বুড়ি শয়তানী! আহা! টুস্ যদি তাকে ধ্বংস করে ফেলত! একটা ক্রীতদাসী বুড়ি শাসন করবে কাথ্‌নি রাজ্য—সেটা বড়ই লজ্জার কথা!

কথা বলল টারজন, নেমোনকে দেখে আমার কিন্তু মনে হয়েছে যে সেও ঐ বুড়ির মৃত্যু চায়।

গেমননের বাবা বলল, ঠিক কথা, কিন্তু সে কাজ করার সাহস তার নেই। ঐ বুড়ি ডাইনি আর টমোস মিলে রাণীর মাথার উপর এমন একটা ভয়ের খড়্গ ঝুলিয়ে রেখেছে যে তাদের কাউকে ধ্বংস করার সাহস তার হবে না। তবু আমি স্থির জানি সে ওদের দুজনকেই ঘৃণা করে, আর সে যাকে ঘৃণা করে তাকে কদাপি বেঁচে থাকতে দেয় না।

গেমনন বলল, শোনা যায় যে তারা দুজনই রাণীর জন্মের গোপন কথাটি জানে, আর সে কথা জনসমক্ষে প্রচার হলে রাণীর সর্বনাশ অনিবার্য। কিন্তু সে কথা এখন থাক ; তুমি নেমোনের সঙ্গে কথা বলার আগে আমি টুডোস্‌-এর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি না।

টারজন ও গেমননের শহরে ফিরতে দুপুর হয়ে গেল ; তখনি টারজনকে নিয়ে নেমোনের কাছে যেতে হবে। একদল রক্ষী-সৈনিক নিয়ে তারা প্রাসাদে পৌঁছামাত্রই রাণীর কাছ থেকে শুধুমাত্র টারজনের ডাক পড়ল।

কোথায় ছিলে? রাণী প্রশ্ন করল।

টারজন বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

কাল রাতে কোথায় ছিলে?

গেমননের বাড়িতে, টারজন জবাব দিল।

ডোরিয়ার সঙ্গে কাটিয়েছ? নেমোনের গলায় অভিযোগ।

টারজন বলল, না সে আগের রাতে।

টুডোস্‌-এর বাড়িতে গিয়েছিলে কেন? এবার রাণীর গলায় কোন অভিযোগ নেই।

কি জান, পাছে আমি পালিয়ে যাই বা আমার কোন বিপদ ঘটে এই আশংকায় গেমনন আমাকে একলা ছেড়ে দিতে সাহস পায় না ; তাই সে যেখানেই যায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

এবার রাণী শান্ত গলায় বলল, আমাকে বলা হয়েছিল যে তুমি ডোরিয়াকে ভালবাস, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি নি। সে কি খুব সুন্দরী?

টারজন হেসে বলল, হয় তো গেমনন তাই মনে করে।

রাণী তবু জানতে চাইল, তুমি কি মনে কর?

কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে টারজন বলল, তা দেখতে মন্দ নয়।

নেমোনের মত সুন্দরী কি?

কোথায় সূর্য, আর কোথায় দূরতম নক্ষত্র!

এ জবাবে নেমোন খুশি হল। টারজনের আরও কাছে গিয়ে মোহিনী কটাক্ষে বলল, তুমি কি আমাকে সুন্দরী ভাব?

তুমি খুব সুন্দরী। টারজন সত্য কথাই বলল।

টারজনের গা ঘেঁসে বসে মসৃণ, গরম হাতে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে নেমোন ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, আমাকে ভালবাস টারজন?

বিষণ্ণ চোখ তুলে সে টারজনের দিকে তাকাল; বলল, বন্ধু আমার, চল, দুজনে মিলে মন্দিরে যাই; টুস্ হয়তো নেমোনের অন্তরের সব প্রশ্নের জবাব দেবে।

সিলিং থেকে ঝোলানো ব্রোঞ্জের একটা থালায় আঘাত করতেই তার শব্দ সারা ঘরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। একটা দরজা খুলে জনৈক সম্ভ্রান্ত নাগরিক দ্বারপথেই আভূমি নত হল।

রাণী হুকুম দিল, রক্ষীদের খবর দাও। আমরা মন্দিরে যাব টুস্‌কে দর্শন করতে।
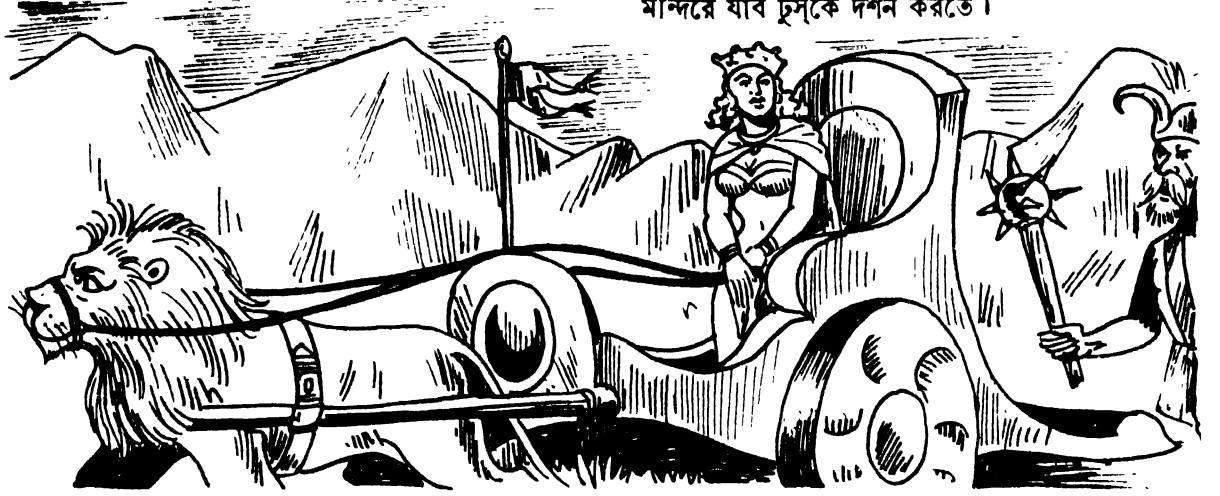
ঘরের দূর কোণে শিকলের ঝন্‌ঝন্ শব্দ হল; হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বেল্‌থার ভয়ংকরভাবে গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নেমোন টারজনের কাছ থেকে সরে গেল; তার শরীরের ভিতরে একটা শিহরণ বয়ে গেল; মুখে দেখা দিল কিছুটা আতংক, কিছুটা ক্রোধ।

ঈষৎ কেঁপে উঠে বিরক্ত গলায় রাণী বলল, বেল্‌থারের মনে ঈর্ষা জেগেছে। এই পশুটার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের কোথায় যেন একটা আশ্চর্য বন্ধন আছে। সেটা যে কি তা আমি জানি না। যদি জানতে পারতাম! তার চোখে ফুটে উঠল উন্মাদের ঝিলিক। এক এক সময় মনে হয় টুস্ হয় তো ওকেই আমার স্বামী করে পাঠিয়েছে; কখনও মনে হয় অন্যরূপে ও যেন আমারই প্রকাশ। তবে একটা কথা জানি; যেদিন বেল্‌থার মরবে, সেদিন আমারও মৃত্যু হবে।

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে মন্দিরের দিকে—বর্শাগ্রে পতাকা উড়িয়ে মার্চ করে চলেছে সৈনিকদল, ঝলমলে পরিচ্ছদে শোভিত হয়ে চলেছে নাগরিকগণ, সিংহবাহিত সোনার রথে চলেছে রাণী। রথের এক পাশে হাঁটছে টমোস, অন্য পাশে এরোটের জায়গায় হেঁটে চলেছে টারজন।

মন্দিরের কাছে পৌঁছে সে দেখতে পেল, শিকলে বাঁধা একটি ক্রীতদাসী মেয়েকে নিয়ে একদল পুরোহিত এগিয়ে আসছে। মেয়েটিকে নেমোনের রথের কাছে এনে পুরোহিতরা দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ করার পরে মেয়েটিকে রথের পিছনে বেঁধে দিল। আবার শোভাযাত্রা শুরু হল। পুরোহিতরা মেয়েটির পিছন পিছন হাঁটতে লাগল।

মন্দিরের সামনে এসে নেমোন রথ থেকে নেমে প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে সুসজ্জিত দ্বারপথে উঠে গেল।

তার পিছনে উঠল পুরোহিতরা ; সেই সঙ্গে ভীত, বিস্ফারিত নেত্র, ক্রন্দনরতা মেয়েটিও উঠল। তার-পর উঠে এল পারিষদবর্গ। রক্ষী সৈনিকদল বাইরেই অপেক্ষা করতে লাগল।

মন্দিরটি তিন-তলা ; মাঝখানে একটা সুউচ্চ গম্বুজ। গম্বুজের ভিতরটা সোনায় মোড়া ; স্তম্ভ-গুলিও সোনার ; দেওয়ালে বিচিত্রবর্ণের কারুকার্য। প্রধান ফটকের ঠিক বিপরীত দিকে উঁচু বেদীর উপর একটা বড় খাঁচা, আর খাঁচার দুই পাশে দুটো নিরেট সোনার সিংহ-মূর্তি দণ্ডায়মান। বেদীর সামনে পাথরের রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা সিংহাসন এবং খাঁচার মুখোমুখি একসারি পাথরের বেঞ্চি।

নেমোন এগিয়ে এসে সিংহাসনে বসল ; সম্ভ্রান্ত নাগরিকরা বসল বেঞ্চিতে। টারজনের দিকে কেউ নজরই দিল না ; সে রয়ে গেল রেলিংয়ের বাইরে।

টারজন দেখল, পুরোহিতরা মেয়েটিকে নিয়ে বেদীতে উঠল আর তাদের পিছনে খাঁচার মধ্যে উঠে এল একটি বৃদ্ধ ও রুগ্ন সিংহ। প্রধান পুরোহিত সুরেলা গলায় অর্থহীন মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল ; অন্য পুরোহিতরা মাঝে মাঝে তার সঙ্গে গলা মেলাল। নেমোন সাগ্রহে সামনে ঝুঁকে বসল ; তার দুই চোখ বৃদ্ধ সিংহের উপর স্থিরনিবদ্ধ।

সহসা মন্ত্র থেমে গেল। রাণী উঠে দাঁড়াল। রুগ্ন ও বৃদ্ধ সিংহটার দিকে দুই হাত বাড়িয়ে বলতে লাগল, হে টুস্। নেমোন তোমাকে অভি-বাদন জানাচ্ছে ; তোমার জন্য সে নৈবেদ্যও এনেছে। নেমোনের সে নৈবেদ্য তুমি গ্রহণ কর, তাকে আশীর্বাদ কর। তার বন্ধুদের তুমি রক্ষা কর, আর ধ্বংস কর তার শত্রুদের। হে টুস্, তাকে দাও সেই বস্তু যা তার অন্তরের প্রধান কামনা—তাকে ভালবাসা দাও, পৃথিবীর সেই একটিমাত্র মানুষের ভালবাসা তাকে দাও যাকে সে ভালবেসেছে। খাঁচার গরাদের ফাঁক দিয়ে সিংহটা তার দিকে তাকাল।

নেমোন অলস ভঙ্গীতে সোনার সিংহাসনে গিয়ে বসল। খাঁচার অপর পাশের দরজা দিয়ে পুরো-হিতরা মেয়েটিকে বের করে নিয়ে গেল।

নিঃশব্দে কাঠ হয়ে সিংহাসনে বসে নেমোন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে খাঁচার ভিতরের সিংহটার দিকে। পুরোহিতরা এবং নাগরিকদের অনেকেই একঘেয়ে সুরে মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে। টারজন পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে তারা সিংহের কাছেই প্রার্থনা করছে, কারণ সকলেরই দৃষ্টি সেই বৃদ্ধ পশুরাজের দিকে। কাথ্‌নিতে প্রথম আসার পরে যে সব প্রশ্ন তাকে বিচলিত করেছিল সে সব কিছুর জবাব সে এতক্ষণে খুঁজে পেয়েছে। ফোবেগের বিচিত্র সব শপথ, তার দেবতার লেজে পা দেবার কথা—সবই সে বুঝতে পারছে।

সহসা একটা উজ্জল আলোর রেখা উপর থেকে খাঁচার মধ্যে নেমে এসে জানোয়ার-দেবতাটিকে সোনালী আলোয় ভাসিয়ে দিল। সিংহটা এতক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল ; এবার সে থেমে উপরের দিকে তাকাল, তার দুটি চোয়াল ফাঁক হয়ে গেল, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে লালা গড়াতে লাগল। সমবেত দর্শকবৃন্দ এক সুরে মন্ত্র উচ্চারণ করল। কি ঘটতে যাচ্ছে সেটা আংশিক আঁচ করে টারজন সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু তার মনে যাই থাকুক, মুহূর্তের মধ্যে যে শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল তাকে রোধ করার চেষ্টায় সে তখন বড় বেশী দেরী করে ফেলেছে।

সে দাঁড়ানোমাত্রই ক্রীতদাসী মেয়েটির দেহ উপর থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে অপেক্ষমান সিংহের খাবার মধ্যে বন্দী হল। নরমাংসাশীর ভয়ংকর গর্জনের সঙ্গে মিশে গেল একটি মাত্র হৃদয়-বিদারক আর্তনাদ। পরমুহূর্তেই সে আর্তনাদ বাতাসে মিলিয়ে গেল। মেয়েটি মারা গেল।

বিরক্তিতে ক্ষোভে টারজন মন্দির থেকে বেরিয়ে তাজা বাতাস ও সূর্যের আলোয় এসে দাঁড়াল, আর তখনই ফটক থেকে জনৈক সৈনিক অস্ফুট স্বরে তার নাম ধরে ডাকল। সেই দিকে তাকিয়ে সে ফোবেগকে দেখতে পেল।

ঠোঁট নড়ে-কি-নড়ে-না এমনি ভাবে নীচু গলায় ফোবেগ বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে! সূর্যাস্তের দু'ঘণ্টা পরে মন্দিরের পিছন দিকে এসো। এখন কোন জবাব দিও না; যদি আমার কথা শুনে থাক আর আসতে রাজী থাক তাহলে শুধু ডানদিকে মাথাটা নাড়াও।

টারজন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তেই রাজকীয় শোভাযাত্রা সারিবদ্ধভাবে মন্দির থেকে বের হতে লাগল; আর সেও সুযোগ মত নেমোনের ঠিক পিছনে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। রাণী তখন শান্ত, আত্মস্থ। প্রাসাদে পৌঁছে সে টারজনসহ সকলকেই ছুটি দিল।

ওদিকে পিতৃগৃহে গেম্নন অস্থিরভাবে মেঝেতে পায়চারি করছে। একটা পাথরের বেঞ্চিতে টারজন অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে আছে। বন্ধু যে খুবই চিন্তিত তা সে বুঝতে পারছে। তবু গেম্ননের মনকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যাবার জন্য মন্দিরের আজকের ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলল, মন্দিরটা চমৎকার, কিন্তু আজ সেখানে যে নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান হতে দেখলাম সেটা ওখানে মানায় না।

গেম্নন বলল, টুস্-এর কাছে নৈবেদ্য দেওয়া কিন্তু অন্যায় কাজ নয়; কিন্তু একটা সত্যিকারের অন্যায়কে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ঐ মন্দিরে। মন্দিরেরই কোনখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে নেমোনের ভাই আলেক্সটারকে; সে সেখানে পচে মরছে, আর ব্যভিচারী টমোস ও নিষ্ঠুর ম'তুজে কাথ্‌নিকে শাসন করছে উন্মাদিনী নেমোনের বকলমে।

অনেকেই এ ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়, আলেক্সটারকে সিংহাসনে বসাতে চায় কিন্তু ভয়ংকর ত্রিমূর্তির ক্রোধ-বহ্নিকে তারা ভয় করে। তাই দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুই করা হচ্ছে না।

খেতে খেতেই টারজন ফোবেগের সঙ্গে দেখা করার মতলব আঁটতে লাগল। যেমন করেই হোক তাকে একাই যেতে হবে, আর যেতে হবে গেম্ননকে না জানিয়ে গোপনে।

খাবার পরেই ক্লান্তির অজুহাতে নিজের ঘরে চলে গেল টারজন। সামনেই বাগান। সেখানে বড় বড় গাছেরও অভাব নেই। একটু পরেই দেখা গেল জঙ্গলের রাজা ডাল থেকে ডালে ঝুলতে ঝুলতে টুস্-এর স্বর্ণমন্দিরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

মন্দিরের পিছনকার একটা গাছে পৌঁছেই সে দেখতে পেল, দীর্ঘকায় ফোবেগ একটা গাছের ছায়ায় অপেক্ষা করছে। ঠিক তার সম্মুখে নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে সে ফোবেগকে অবাক করে দিল।

ফোবেগ বলল, তুমি এসে গেছ ভালই হয়েছে। অনেক কথা বলার আছে। ইতিমধ্যে আমি আরও অনেক কিছু জেনেছি।

টারজন বলল, আমি কান পেতে আছি।

ফোবেগ বলতে আরম্ভ করল, রাণীর দাসীদের একজন আড়াল থেকে নেমোন ও টমোসের কথা-বার্তা শুনে ফেলেছে। টমোস অভিযোগ করেছে, তুমি, গেমনন ও টুডোস নাকি রাণীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছ। টমোস আরও বলেছে যে ডোরিয়া খুব সুন্দরী, আর তুমি তার প্রেমে পড়েছ।

তাহলে এবার আমি ফিরে যাব গেমননের কাছে; তাকে সতর্ক করে দেব। হয় তো নেমোনকে নরম করতে বা বুদ্ধিভ্রংশ হারিয়ে দিতে কোন পথ আমরা বের করতে পারব।

ও দুটোই সমান শক্ত, ফোবেগ মন্তব্য করল; তবু আপাতত জানাই বিদায় ও শুভ-কামনা।

সৈনিকটির মাথার উপরকার একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ে টারজন রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিস্ময়ে মাথা নাড়তে নাড়তে ফোবেগ মন্দিরে তার বাসার দিকে ফিরে গেল।

অনেক রাতে ফোবেগ এল টারজনের সঙ্গে দেখা করতে।

টারজন জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার? তুমি কি দুঃসংবাদ এনেছ?

খুব খারাপ খবর, ফোবেগ জবাব দিল। গেমনন, টুডোস ও তাদের বেশ কিছু বন্ধুকে গ্রেপ্তার করে প্রাসাদের অন্ধকূপে আটক করা হয়েছে। ডোরিয়াকে ধরে নিয়ে মন্দিরে বন্দী করা হয়েছে। তোমাকেও বাইরে দেখতে পাব আশা করি নি। যাই হোক, যদি কাথ্নি থেকে পালাতে পার তো এই মুহূর্তে পালাও। যে কোন মুহূর্তে রাণীর মত পাল্টে যেতে পারে; সে এখন রেগে কাঁই হয়ে আছে।

টারজন বলল, ধন্যবাদ ফোবেগ। কিন্তু যাবার আগে বলে যাও ডোরিয়াকে কোথায় বন্দী করে রাখা হয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় যে বাড়িটার দরজায় আমি দাঁড়িয়েছিলাম তার পিছন দিকে মন্দিরের তিন-তলায়।

টারজন ফোবেগের সঙ্গে ফটক পর্যন্ত গিয়ে পথে নামল। কোথায় যাচ্ছ? ফোবেগ জানতে চাইল।

রাজপ্রাসাদে।

ফোবেগ বাধা দিয়ে বলল, তুমিও পাগল হয়েছ দেখছি। কিন্তু ততক্ষণে টারজন পথে নেমে দ্রুত পদক্ষেপে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলেছে।

বেশ রাত হয়েছে; কিন্তু প্রাসাদ-রক্ষীরা এতদিন টারজনকে ভালভাবেই চিনে নিয়েছে; তাই কেউ তাকে বাধা দিল না। দরজা খুলে গেলে টারজন অতি-পরিচিত গজদন্ত-কক্ষে পা বাড়াল।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে রাণী। চুল এলোমেলো, মুখ ঈষৎ রক্তিম। বোঝা যাচ্ছে, ঘুম থেকে সদ্য উঠে এসেছে। ক্রীতদাসীকে দরজাটা বন্ধ করে ঘর থেকে চলে যেতে বলল। তারপর নরম কোচে বসে টারজনকে ইসারায় পাশে বসতে বলল। তুমি আসায় বড় খুশি হয়েছি। ঘুমতে পারছিলাম না; কেবলি তোমার কথা মনে হচ্ছিল। এবার বল তো তুমি কেন এসেছ? তুমিও কি আমার কথাই ভাবছিলে?

টারজন জবাব দিল, তোমার কথাই ভাবছিলাম, নেমোন তুমি আমাকে সাহায্য করবে?

রাণী নরম গলায় বলল, শুধু তোমার চাওয়ার অপেক্ষা। তোমাকে অদেয় নেমোনের কিছুই নেই।

দুই বাহু মেলে দিয়ে সে টারজনের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'টারজন! প্রায় চাপা কান্নার সুর তার গলায়। আর তখনই ঘরের দূর প্রান্তের সেই মারাত্মক দরজাটা খুলে গেল; পাথরের মেঝেতে ধাতুনির্মিত লাঠির খট্ খট্ শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে দুজনই সোজা হয়ে বসে তাকাল ম'তুজের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে।

বিকৃতদর্শন বুড়ি কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে বলল, বোকার ডিম কোথাকার! লোকটাকে বাইরে পাঠিয়ে দে! নইলে চোখের সামনেই তার মৃত্যু তোকে দেখতে হবে।

নেমোন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। বুড়ি তখন তীব্র রোষে থর্ থর্ করে কাঁপছে। ঠাণ্ডা গলায় নেমোন বলল, তুমি অনেক দূর এগিয়েছ ম'তুজে। তোমার ঘরে চলে যাও; মনে রেখো যে আমিই রাণী।

বীভৎস বুড়ি ধারালো গলায় ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, রাণী! তোর সব পরিচয় ওকে বলে দেব।

নেমোন দ্রুত পায়ে বুড়ির দিকে এগিয়ে গেল। যাবার সময় নীচু টুলটার উপর ঝুঁকে পড়ে সেখান থেকে কি যেন তুলে নিল। সহসা বুড়ি আর্তনাদ করে কুঁকড়ে সরে গেল; কিন্তু ঘর থেকে পালিয়ে যাবার আগেই নেমোন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার চুলের মুঠি চেপে ধরল। হাতের লাঠি তুলে ম'তুজে রাণীকে আঘাত করল। তাতে রাণীর ক্রোধের আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল।

চীৎকার করে বলল, চিরকাল তুমি আমার জীবনটা নষ্ট করে এসেছ—তুমি আর পাপাত্মা টমোস। সব সুখ থেকে তোমরা আমাকে বঞ্চিত করেছ, আর তার জন্য এই নাও! মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ছুরির সুতীক্ষ্ণ ফলাটাকে সে বসিয়ে দিল আর্তকণ্ঠ বুড়ির লোল বক্ষে; আরও নাও! এই নাও! এই নাও! প্রতি বারেই ছুরির ফলাটা গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করে রাণী নেমোনের মুখের কথা আর বুকের ব্যথার বিষকে তীব্রতর করে তুলল।

ধীরে ধীরে ম'তুজের আর্তনাদ থেমে গেল; সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

নেমোন আবার টারজনের মুখোমুখি দাঁড়াল। বলল, হ্যাঁ, তুমি সাহায্যের কথা কি বলছিলে, সেটা আর একবার বল; নেমোন আজ মুক্তহস্ত।

টারজন বলল, তোমার দরবারের একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক আমার প্রতি খুবই সদয় ব্যবহার করেছে। আজ সে বিপদগ্রস্ত; তুমি তাকে বাঁচাও। এটাই আমার প্রার্থনা।

নেমোনের ভুরু কুঞ্চিত হল। কে সে?

গেম্নন। টুডোস, টুডোসের কন্যা ও কয়েকজন বন্ধুসহ সে গ্রেপ্তার হয়েছে। এটা আমার সর্বনাশ করার ষড়যন্ত্র মাত্র।

হঠাৎ তীব্র ক্রোধে জ্বলে উঠে রাণী চীৎকার করে বলল, তোমার এত সাহস যে বিশ্বাসঘাতকদের হয়ে ওকালতি করতে এসেছ! কিন্তু এ সবের কারণ আমি জানি; তুমি ডোরিয়াকে ভালবাস।

তাকে আমি ভালবাসি না; তাকে ভালবাসে গেম্নন। তুমি তাদের সুখী হতে দাও নেমোন।

নেমোন সরে গেল; কোচে বসে দুই হাতে মুখ ঢাকল; চাপা কান্নায় তার দুই কাঁধ কাঁপতে লাগল; তা দেখে টারজনের দয়া হল; তাকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে গেল। কিন্তু কিছু বলার অবকাশই পেল না; নেমোন হঠাৎ তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল; ভেজা চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করছে। চীৎকার করে বলে উঠল, ডোরিয়া মেয়েটা মরবে! কাল জারাটর তাকে গ্রহণ করবে!

কখন তার মৃত্যু ঘটবে? টারজন প্রশ্ন করল।

আজ রাতে চামড়ায় ভরে সেলাই করে কাল তাকে নিয়ে যাওয়া হবে জারাটরের কাছে। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে, বুঝলে?

টারজন মাথা নাড়ল। আবার প্রশ্ন করল, আর আমার অন্য বন্ধুরা? তারা বেঁচে যাবে তো?

বলল, আহা, ডোরিয়া! কোন্ দুর্ভাগ্য তোমাকে এখানে এনে হাজির করেছে?

ডোরিয়া বলল, এ প্রশ্নের জবাব তো মহামান্য এরোটই আমার চাইতে ভাল জানে।

হাঁা, আমি জানি। আমিই তোমাকে এখানে আনিয়েছি; তোমার বাবাকে বন্দী করেছি; আর গেম্‌ননকেও সেখানে পাঠিয়েছি।

গেম্‌নন বন্দী! মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল। ধীরে ধীরে নিজেকে সংযত করে শুধাল, আমাকে নিয়ে কি করবে?

এরোট জবাব দিল, নেমোনের হুকুমে তোমাকে জারাটরের কাছে সমর্পণ করা হবে। তারপর হেসে বলল, কালই তোমার মৃত্যু হবে।

নেমোন উত্তর দিল, কাল রাতে তুমি আমার কাছে আসবে। তখন দেখব, নেমোনের প্রতি তুমি কি ব্যবহার কর; তখনই নেমোনও স্থির করবে, তোমার বন্ধুদের প্রতি কি রকম ব্যবহার সে করবে।

টুডোস-কন্যা ডোরিয়া হাত-পা বাঁধা অবস্থায় টুস-এর মন্দিরের তিনতলার একটা ঘরে চামড়ার স্তূপের উপর শুয়ে আছে।

একসময় দরজা খুলে গেল। মশালের আলোয় ঘর আলোকিত হল। ঘরে ঢুকল এরোট। দরজা বন্ধ করে দিল। দেওয়ালের গর্তে মশালটা বসিয়ে রাখল।

উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে এরোট ডোরিয়ার পায়ের বেড়ি খুলে দিল। তাকে বলল, তুমি নেমোনের চাইতেও সুন্দরী।

জানালার দিক থেকে একটা অস্পষ্ট গর্জন ভেসে এল। ডোরিয়া সেদিকে তাকাতেই এরোটের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। তার ভীরু বুক ভয়ে উথাল-পাথাল। একলাফে সে দরজার দিকে ছুটে গেল।

যে শোভাযাত্রা মৃত্যুপথযাত্রী ডোরিয়াকে নিয়ে জারাটরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে, খুবই সকালেই সেটা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। ওন্‌থার উপত্যকার শেষ প্রান্তে অবস্থিত পর্বতমালায় জারাটরের অবস্থান; কাথ্‌নি শহর থেকে ষোল মাইল দূরে।

জারাটরের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আবার শহরে ফিরে আসতে বেশ রাত হয়ে যাবে। তাই শত শত মশালধারী ক্রীতদাস যাবে শোভাযাত্রার সঙ্গে।

নেমোন টারজনকে শুধাল, জারাটরকে কখনও দেখেছ?

না।

জারাটর একটি পবিত্র পর্বত; কাথ্‌নির রাজা ও রাণীদের শত্রুদের জন্য টুস্ সেটা সৃষ্টি করেছে; সারা পৃথিবীতে এরকম দ্বিতীয়টি নেই।

টারজন বলল, সেটা দেখলে আমার ভালই লাগবে।

দুপুরে জলপানের জন্য যাত্রার বিরতি হল। আধঘণ্টা পরেই আবার শুরু হল যাত্রা। অচিরেই তারা পর্বতমালার ভিতরে ঢুকে পাকানো পথে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল।

ক্রমে গন্ধকের ধোঁয়া এসে নাকে লাগল। একটু পরেই আগ্নেয়গিরিতে চড়ে পুরো দলটাই প্রকাণ্ড বড় এক গিরি-বিবরের প্রান্তে পৌছে গেল। অনেক নীচে গলিত পাথর টগ্‌বগ্ করে ফুটছে; আগুনের শিখা ছিট্‌কে উঠছে; ছিট্‌কে বের হচ্ছে বাষ্প ও হলুদ ধূমের কুণ্ডলী। সে দৃশ্য যেমন আকর্ষক, তেমনই ভয়াল, ভয়ংকর। কাথ্‌নি সৃষ্টির আগে থেকেই সব ছোট ছোট শিখরের ঊর্দ্ধে একক মহত্ত্বে দাঁড়িয়ে আছে জারাটর। দুই হাত এক করে নত মস্তকে টারজন অপলক নয়নে তাকিয়ে রইল সেই বিক্ষুব্ধ নরকের দিকে।

দু'জন সন্ন্যাসী ডোরিয়ার চামড়ার ভিতরে সেলাই-করা দেহটাকে রথ থেকে তুলে নিয়ে আগ্নেয়-গিরির মুখ-বিবরের প্রান্তে রাণীর পায়ের কাছে রাখল। তারপর ডজনখানেক পুরোহিত তাকে ঘিরে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগল।

নেমোন যাতে টুডোস ও গেমননের যন্ত্রণাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে সে জন্য তাদের দুজনকেই ঘটনাস্থলের আরও কাছে নিয়ে আসা হল; কারণ এ অনুষ্ঠান তো শুধু মাত্র তাদের শাস্তি নয়, রাণীর উপভোগের বিষয়ও বটে।

পুরোহিত দুজন ডোরিয়ার দেহটাকে তুলে ফুটন্ত আগ্নেয়গিরির মুখে ছুঁড়ে ফেলতে উদ্যত হতেই সে চীৎকার করে বলে উঠল, থাম! বিশ্বাসঘাতক টুডোসের কন্যার অপরূপ রূপ-লাবণ্য আমরা দেখতে চাই; তার বাবা ও প্রেমিকও দুই চোখ ভরে তাকে দেখুক; আর তাদের দেখে সকলে বুঝুক যে নেমোনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ফল কী ভয়ংকর।

একজন পুরোহিত ছুরি হাতে নিয়ে থলের সেলাইটা কেটে ফেলল, সিংহের বাদামী চামড়ার নীচে নিশ্চল দেহটার রূপরেখার উপর টুডোস ও গেমননের দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল তাদের কপালে; কঠিন হয়ে উঠল তাদের চোয়াল ও মুষ্টি।

পুরোহিতরা থলির চামড়াটাকে একদিক থেকে গুটিয়ে তুলে নিতেই মৃতদেহটা গড়িয়ে মাটিতে পড়ল সকলের চোখের সামনে। শোনা গেল একান্ত বিস্ময়ের একটা অব্যক্ত ধ্বনি। তীব্র রোষে চীৎকার করে উঠল নেমোন। দেহটা এরোটের মৃতদেহ!

এ সবের অর্থ কি? রাণীর কণ্ঠস্বর তার কোষ-বদ্ধ ইস্পাতের মতই শীতল।

বিরক্ত মুখভঙ্গী করে নেমোন হুকুম দিল, এরোটের দেহটাকে জাবাটবের মুখে ফেলে দেওয়া হোক; আর অগ্নিগর্ভ মুখ-বিবর যখন দেহটাকে গিলে ফেলল তখন সে আবার হুকুম দিল, এই মুহূর্তে ফিরে চল কাথ্‌নিতে।

সমবেত সকলকে সঙ্গে নিয়ে রাণীর রথ পাহাড়ের পথে ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল। রাণী একেবারে নীরব। মাঝে মাঝে শুধু তাকিয়ে দেখছে রথের পাশের চলমান দানব-মূর্তিটাকে।

একঘেয়ে ক্লান্ত কাথ্‌নি-প্রত্যাবর্তন একসময় শেষ হল। স্বর্ণ-সেতু পার হয়ে সকলে শহরে ঢুকল। রাণী হুকুম দিল, ডোরিয়াকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হোক।

টুডোস ও গেমননকে পাঠান হল কারাকক্ষে। টারজনের প্রতি হুকুম হল, প্রাসাদে গিয়ে রাণীর সঙ্গে খানা খেতে হবে। টমোসকে বলা হল ডোরিয়াকে খুঁজে বের করতে; না পারলে তার কপাল মন্দ!

টারজন স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, এই মিষ্টি, মোহিনী নারীই হয়ে ওঠে রাণী নেমোনের মত এক নিষ্ঠুর অত্যাচারী।

তারপর গভীর আবেগে বলে উঠল, আমাকে ভালবাস টারজন! আমাকে ভালবাস! ভালবাস! ভালবাস!

একটু একটু করে মেঝেতে নেমে গিয়ে নেমোন নতজানু হল টারজনের পদপ্রান্তে। অস্ফুট স্বরে বলল, হে পরমেশ্বর টুস!

জঙ্গল-রাজ তার দিকে তাকাল। এক রাণী তার পদপ্রান্তে। মুহূর্তে তার মোহ ভঙ্গ হল। অস্পষ্ট শব্দ করে টারজন উঠে দাঁড়াল। নেমোন গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে; নিঃশব্দে সেখানেই পড়ে রইল। টারজন দরজার দিকে এগিয়েও ফিরে এল। নেমোনকে তুলে কোচে শুইয়ে দিল। গর্জে উঠল শৃঙ্খলাবদ্ধ বেল্‌থার; সে গর্জনে ঘরটা কেঁপে উঠল।

একটা ছোট খাবার ঘরে শুধুমাত্র টারজন ও রাণী একত্রে আহার-পর্ব সমাধা করল। তারপর নেমোন তাকে নিয়ে গেল অতি-পরিচিত গজদন্ত-কক্ষে।

রাণী বলল, এরোট ও ম'তুজে বেঁচে নেই। টমোসকে কাজে পাঠিয়েছি। আজ রাতে কেউ আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না।

নেমোন চোখ মেলল। মুহূর্তের জন্য তাকাল ঝুঁকে-পড়া টারজনের দিকে। তারপরেই তার চোখে জ্বলে উঠল উন্মাদ ক্রোধের অগ্নিশিখা। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় চীৎকার করে বলতে লাগল, আমার ভালবাসাকে তুমি প্রত্যাখ্যান করলে! আমাকে পায়ে ঠেললে! হায় টুস্! আর আমি মাথা নুইয়েছি তোমার পায়ে! এক লাফে

ঘরের কোণে ঝোলানো ঘণ্টার কাছে গিয়ে কাঠি দিয়ে তিনবার তাতে আঘাত করল। কাংস্যধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। তার সঙ্গে মিলল ক্রুদ্ধ সিংহের গর্জন।

টারজন দরজার দিকে পা বাড়াল। ঠিক তখনই দরজাটা সপাটে খুলে গেল। দুই সম্ভ্রান্ত নাগরিকসহ বিশজন সৈনিক ঘরে ঢুকল।

নেমোন হুকুম করল, একে ধর! রাণীর অপর শত্রুদের সঙ্গে একেও কারাগারে নিক্ষেপ কর।

টারজন নিরস্ত্র। একমাত্র সঙ্গী তরবারিখানাও গজদন্তকক্ষে ঢুকবার সময় খুলে রেখে এসেছে দরজার কাছে। বিশটা বর্শা তার দিকে উদ্যত; সে হাল ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল।

কারাগারে বসে টুডোস ও গেম্‌নন বহুদূর থেকে সৈনিকদের পায়ের শব্দ শুনতে পেল। তাদের ঘরের সম্মুখে এসেই পায়ের শব্দ থেমে গেল। খোলা দরজা দিয়ে একজন ঘরে ঢুকল। সৈনিকদের হাতে মশাল ছিল না। তাই কেউ কাউকে চিনতে পারল না।

রক্ষী-সৈনিকরা চলে গেলে নতুন বন্দী সানন্দে বলে উঠল, অভিবাদন জানাই টুডোস ও গেম্‌নন!

টারজন! গেম্‌নন উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠল।

তা ছাড়া আর কে হবে, টারজন বলল।

কেন তুমি এখানে এলে? টুডোস প্রশ্ন করল।

তা জানি না।

কঠিন হেসে টুডোস বলল, নেমোনের এই নরকে আশার কোন স্থান নেই।

টারজন মাথা নেড়ে বলল, হয় তো নেই, কিন্তু আমি আশা ছাড়ব না। কাল রাতে মন্দিরের কারাকক্ষে ডোরিয়াও তো সব আশা ছেড়ে দিয়েছিল। তবু জারাটরের হাত থেকে সে তো পালাতে পেরেছে।

সে রহস্য আমার বুদ্ধির অতীত, গেম্‌নন বলল।

টারজন ভরসা দিয়ে বলল, কিন্তু খুবই সরল। একটি বিশ্বস্ত বন্ধু এসে আমাকে জানিয়ে গেল যে ডোরিয়াকে বন্দী করে রাখা হয়েছে মন্দিরে। সঙ্গে সঙ্গে তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। ভাগ্যক্রমে কাথ্‌নিতে বড় বড় গাছপালার অভাব নেই; একটা তো মন্দিরের গায়েই দাঁড়িয়ে আছে; তার ডালপালা ছড়িয়ে আছে ডোরিয়ার কারা-কক্ষের জানালা পর্যন্ত। সেখানে পৌঁছে দেখলাম এরোট ডোরিয়াকে উত্যক্ত করছে। যে চামড়ার বস্তায় বেঁধে ডোরিয়াকে জারাটর যাত্রায় পাঠাবার কথা ছিল সেটাও হাতের কাছে পেয়ে গেলাম। এর চাইতে সরল ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে? যে রথযাত্রা ছিল ডোরিয়ার কপালে সেটাই জুটে গেল এরোটের ভাগ্যে।

টুডোস আবেগাপ্লুত গলায় বলে উঠল, তুমি তাকে উদ্ধার করেছ! কোথায় সে?

টারজন সাবধানে বলল, কাছে সরে এস। দেওয়ালও শত্রুতা করতে পারে। শোন গেম্‌নন, ডোরিয়া নিরাপদ আশ্রয়েই আছে। কোন ভয় নেই।

গেম্‌নন বলল, ডোরিয়া নিরাপদ! এবার সুখে মরতে পারব।

টুডোস অন্ধকারে হাতটা বাড়িয়ে টারজনের কাঁধে রেখে বলল, আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার কোন উপায় নেই, কারণ জানাবার মত কোন ভাষা নেই।

ভোর হল।

দুপুরের পরে একটি বন্দী এসে টারজনকে নিয়ে গেল। সঙ্গের অফিসারটি তিন বন্দীরই পরিচিত; লোকটি ভাল, সহানুভূতিশীল।

রক্ষীদের ঘরে নিয়ে গিয়ে টারজনকে শক্ত শিকল দিয়ে বাঁধা হল। একটা সোনার কলার পরানো হল গলায়; তার দু'দিকে দুটো শিকলে ধরা রইল দুজন সৈনিকের হাতে।

এত বেশী সতর্কতা কেন? টারজন জানতে চাইল।

অফিসার বলল, এটাই রীতি। রাণীর শিকারকে সব সময় এইভাবে নিয়ে যাওয়া হয় ওন্থার উপত্যকার সিংহ-ক্ষেত্রে।

আর একবার টারজনকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল কাথ্নির রাণীর রথের কাছে। কিন্তু এবার সে হাঁটতে লাগল রথের পিছনে—দুই দীর্ঘদেহ সৈনিক ও জনবিশেক রক্ষী-পরিবেষ্টিত এক শৃংখলাবদ্ধ বন্দীরূপে। আর একবার স্বর্ণ-সেতু পার হয়ে ওন্থার উপত্যকার সিংহ-ক্ষেত্রে পৌঁছে গেল।

সঙ্গে এক বিরাট জনতা। যে মানুষ নেমোনের ভালবাসাকে পায়ে ঠেলেছে তার দুরবস্থা ও মৃত্যু দেখার জন্য রাণী গোটা শহরকেই আমন্ত্রণ করে এনেছে।

নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে নেমোন রক্ষীদের হুকুম দিল, বন্দীকে তার কাছে আনা হোক। টারজন এসে দাঁড়াল। নেমোন বলল, তোমরা যেতে পার; বন্দীর সঙ্গে আমি একা কথা বলতে চাই।

রক্ষীরা কিছুটা দূরে যেতেই নেমোন টারজনের দিকে তাকাল; টারজন হাসছে। বন্ধুত্বপূর্ণ সহজ সুরে টারজন বলল, এমনি করেই তুমি আরও অনেককে মারবে, আরও বেশী অসুখী হবে। তারপর একদিন আসবে তোমার মরবার পালা।

নেমোন শিউরে উঠল। আমার মরবার পালা! হ্যাঁ, অতীতে সকলেই নিহত হয়েছে, কাথ্নির সব রাজা, সব রাণী। কিন্তু আমার পালা এখনও আসে নি। যতদিন বেল্থার বেঁচে আছে ততদিন আমিও বেঁচে আছি। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, শিকারী সিংহটাকে এনে শিকারের গন্ধ শুঁকিয়ে দাও।

সমবেত সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দ, সেনাদল ও জনতা দুই ভাগ হয়ে শিকারী সিংহ ও তাদের রক্ষীদের আসার পথ করে দিল। টারজন দেখতে পেল, স্বর্ণ রজ্জুতে বাঁধা একটা প্রকাণ্ড সিংহ সেই পথে এগিয়ে আসছে, আর আটজন রক্ষী সে রজ্জুটা টান করে ধরে আছে।

অগ্নি-চক্ষু সেই শয়তান নেমোনের রথের দিকে এগিয়ে চলল; অনেক দূর থেকেই তার দুই কানের মাঝখানে একগুচ্ছ শ্বেত কেশর দেখেই টারজন তাকে চিনতে পারল। সিংহটি বেল্থার!

একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক টারজনের কাছে এগিয়ে গেল। সে ফরডোস, গেমননের বাবা। চাপা নীচু স্বরে সে টারজনকে বলল, এতে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু এটা করতে আমি বাধ্য। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, রাণীর নামে বলছি, সকলে চুপ কর! কাথ্নির রাণী নেমোনের বড় শিকারের নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত হও: সৈনিকদের মধ্যস্থিত পথের মাঝখান দিয়ে শিকার চলবে উত্তর দিকে; সে একশ' পা এগিয়ে যাবার পরে রক্ষীরা শিকারী সিংহ বেল্থারকে ছেড়ে দেবে। সিংহ যখন শিকারকে ধরে খেতে শুরু করবে তখন রক্ষীরা আবার বেল্থারকে বেঁধে ফেলবে।

টারজনের দিকে ঘুরে বলল, যতক্ষণ বেল্‌থাব তোমাকে ধরতে না পারবে ততক্ষণ তুমি সোজা উত্তর দিকে ছুটতে থাকবে।

টারজন প্রশ্ন করল, আমি যদি তাকে এড়িয়ে পালাতে পারি? তাহলে কি মুক্তি পাব?

ফরডোস সক্রোধে বলল, সব প্রস্তুত ইয়োর ম্যাজেস্টি। শিকার কি শুরু হবে?

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেমোন বলল, সিংহকে আর একবার শিকার শুঁকতে দাও; তারপরই শুরু হোক শিকার।

রক্ষীরা বেল্‌থারকে নিয়ে গেল টারজনের কাছে।

কিন্তু বেল্‌থার তাকে ধরে ফেলার আগে সে কি জঙ্গলে পৌঁছতে পারবে? একশ' পা আগে থেকে দৌড় শুরু করে যে কোন সাধারণ সিংহকে টারজন হয় তো দৌড়ে মেরে দিতে পারে; কিন্তু বেল্‌থার তো সাধারণ সিংহ নয়; কাথ্‌নির সব শিকারী সিংহদের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ।

একশ'তম পদটি ফেলার সময় সে পরিপূর্ণ গতিতে একটা লাফ দিল। তার পিছনে শিকল-ছাড়া সিংহের গর্জন; তার সঙ্গে মিশেছে জনতার হল্লা।

ছুটে আসছে বেল্‌থার। তার পিছনে ছুটছে রাণীর রথ; তারও পিছনে সম্ভ্রান্ত নাগরিক, সৈনিক ও সাধারণ মানুষের দল।

কাথ্‌নির পাশ দিয়ে যে নদীটা বয়ে চলেছে তারই একটা গহ্বরের মধ্যে ঘন ঝোপের ভিতরে আছে আর একটি সিংহ। বিশালদেহ সেই সিংহের গায়ের রং হলুদ, আর কেশর কালো। চোখ দুটি বুজে থাকলেও আসলে "নুমা" জেগেই আছে।

মাঠের মধ্যে টারজন তখন বর্শা-ঘেরা পথ ধরে ছুটছে। প্রতিটি পদক্ষেপ সে গুণছে, কারণ সে জানে, একশ' পদক্ষেপ শেষ হতেই বেল্‌থারকে ছেড়ে দেওয়া হবে তার পিছনে। একটা ফন্দী সে এঁটেছে। পূব দিকের নদী বরাবর রয়েছে একটা গভীর জঙ্গল। একবার সেখানে পৌঁছতে পারলেই সে নিরাপদ। একবার সেই সব গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়তে পারলে কোন সিংহ বা মানুষই অরণ্য-রাজকে ধরতে পারবে না।

এই বুঝি বেলথার শিকারকে ধরে ফেলল।

পিছনে তাকিয়ে টারজনও বুঝল, তার শেষ ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। নদী এখনও দু'শ' গজ দূরে, আর সিংহের দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ গজ।

টারজন ঘুরে দাঁড়াল। অপেক্ষা করতে লাগল। সে জানে এ পরিস্থিতিতে কি করতে হবে। আরও অনেকবার সে সিংহের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। বুঝতে পারছে মৃত্যু অনিবার্য। তবু সে লড়াই করে মরবে।

শুরু হল সেই মৃত্যু-সংগ্রাম। গর্জন করে লাফিয়ে পড়ল বেল্‌থার।

হঠাৎ ঘটল অঘটন। বেল্‌থার প্রায় টারজনের উপর এসে পড়েছে এমন সময় একটি বাদামী দেহ বিদ্যুৎগতিতে তাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে এল পিছন থেকে; দুই পিছনের পায়ে ভর দিয়ে বেল্‌থার টারজনের মুখোমুখি দাঁড়াতেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল উদ্যত নখর ও থাবা—সোনালী শরীর ও কালো কেশর ঢাকা একটি বিশাল সিংহ।

নবাগত সিংহটি বেল্‌থারের চাইতে বিশালকায় এবং অধিকতর শক্তিশালী; শক্তি ও হিংস্রতার একেবারে তুঙ্গে অবস্থিত। একবার সুযোগ পেতেই তার বিরাট চোয়াল সজোরে বসে গেল নেমোনের শিকারী সিংহের গলায়। তার বড় বড় দাঁত কেশরের ফাঁক দিয়ে বসে গেল বেল্‌থারের চামড়া ও মাংস ছিন্নভিন্ন করে। তারপর বিড়াল যেভাবে ইঁদুরকে ঝাঁকায় সেইভাবে বেলথারের ঘাড় মটকে তার পা ধরে ঝাঁকাতে লাগল।

মৃতদেহটাকে সজোরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিজয়ী সিংহটি কাথ্‌নি-বাসীদের দিকে মুখ খিঁচিয়ে দাঁড়াল; তারপর ধীরে ধীরে ফিরে গেল টারজনের পাশে। টারজন সস্নেহে সোনালী সিংহ জাদ্‌-বাল্‌জার কালো কেশরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

চারদিক নিস্তব্ধ। তারপরই শোনা গেল নারী-কণ্ঠের এক বিচিত্র আর্তনাদ। নেমোনের আর্তনাদ। সোনার রথের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে পরিপূর্ণ নৈঃশব্দের মধ্যে সে গিয়ে দাঁড়াল মৃত বেল্‌থার-এর পাশে। বিস্মিত, নিশ্চল জনতা হাঁ করে তাকে দেখতে লাগল।

নেমোনের চটি পরা পা দুটি স্পর্শ করল শিকারী সিংহের রক্তাক্ত কেশর; একদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল তার দিকে। হয় তো এক মিনিট নীরবে প্রার্থনাও করল। তারপর সহসা মুখ তুলে চারদিকে তাকাল। দুই চোখে উন্মাদ ঝিলিক; মুখখানি একেবারে সাদা।

'বেল্‌থার মরে গেল'! আর্তকণ্ঠে কথাগুলি বলে ক্ষিপ্রগতিতে নিজের ছুরিখানাকে কোষমুক্ত করে তার সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগকে বসিয়ে দিল নিজের বুকের গভীরে। নিঃশব্দে নতজানু হয়ে সে উল্টে পড়ে গেল মৃত বেল্‌থারের দেহের পাশে।

* * *

ফর্‌ডোসের নেতৃত্বে সৈনিকদল, নাগরিকবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষরা শহরে ফিরে গিয়ে নেমোনের কারাগার থেকে সব বন্দীদের মুক্ত করে দিল; আলেক্সটারকে রাজা রূপে ঘোষণা করল; তাদের মৃত রাণী পড়ে রইল সিংহ-ক্ষেত্রের এক প্রান্তে মৃত বেল্‌থারের পাশে।

যে মানবিক কর্তব্যকে তারা অবহেলা করেছিল, অরণ্যরাজ তাই পালন করল; আফ্রিকার আকাশের নীচে চাঁদের নরম আলোয় একটি নারীর সমাধির পাশে সে মাথা নীচু করে দাঁড়াল।
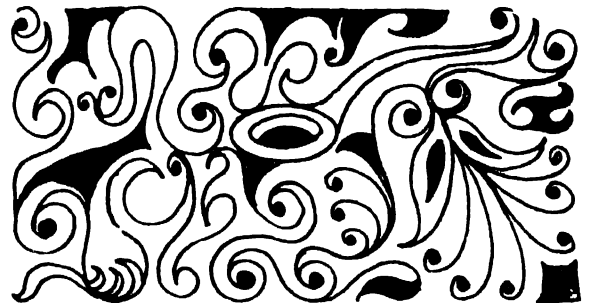
স্টুডিওর অফিস ঘরে বসে প্রযোজনা সমিতির সহ-সভাপতি মিল্টন স্মিথ তার সহকারীদেব সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। ছয়জন সহকারীর কাছে তার নতুন ছবির পরিকল্পনা সম্বন্ধে তার বক্তব্য বোঝাচ্ছিল হাত নেড়ে।

একজন সেক্রেটাবি এসে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে খবর দিল, ওরমান এসে গেছেন।

এবপর ঘরেব দরজা ঠেলে সেক্রেটারি ওরমানকে নিয়ে এলে স্মিথ উঠে গিয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করল। ঘরের সকলেই তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

স্মিথ কবমর্দন করে বলল, তোমাকে দেখে খুশি হলাম ওরমান। তুমি বোনিও থেকে আসার পব আর তোমার দেখা পাইনি। সেখানে তুমি একটা বড় কাজ করেছ। কিন্তু তার থেকে আরো বড় একটা কাজ তোমার জন্য রেখেছি। তুমি জঙ্গলের উপর তোলা কিছু ভাল ছবি দেখেছ আশা করি।

ওরমান বলল, হ্যাঁ, দেখেছি। এখন অনেকেই জঙ্গলের উপর ছবি তৈরী করছে।

স্মিথ বলল, এই সব জঙ্গলের উপর তোলা ছবি হলিউডের পঁচিশ মাইলের মধ্যেই কোন না কোন জায়গা থেকে তোলা হয়। তার মধ্যে শুধু আফ্রিকার ছবি আর গলার স্বর জুড়ে দেওয়া হয়।

ওরমান বলল, কোথায় ছবি তোলা হবে? হলিউডের আশেপাশে?

স্মিথ বলল, না স্যার। আমরা একটা দলকে আফ্রিকার জঙ্গলের গভীরে পাঠাচ্ছি। সে জঙ্গলটার নাম ইতুরি জঙ্গল। তাছাড়া এ ছবি করে তুমি বিখ্যাত হয়ে যাবে।

ওরমান বলল, এই ছবিতে বিখ্যাত হব কিনা জানি না। তবে আমি আফ্রিকা কখনো যাইনি। তাই সেখানে যেতে আমার ভাল লাগবে।

স্মিথ বলল, আমরা সব ব্যাপারটা আলোচনা করে দেখছি। আমরা তাই মেজর হোয়াইটকে বসিয়ে রেখেছি। মেজর হোয়াইট, ইনিই হলেন পরিচালক ওরমান। মেজর একজন নামকরা শিকারী এবং আফ্রিকার জঙ্গলের সবকিছু পড়া

বইএর পাতার মত জানা আছে ওর। ও আমাদের দলের সঙ্গে টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজার হিসাবে যাচ্ছে। এখন চিত্রকাহিনীটা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলছি। আমাদের যে কাহিনীটা জো লিখেছে তার নায়ক হলো এমনই একজন মানুষ যার আফ্রিকার জঙ্গলে জন্ম হয় এবং সে সেখানেই লালিত পালিত হয়। সে একটা সিংহের দুধ খেয়েই মানুষ হয়। সে সিংহদের মাঝেই থাকত। বড় হয়ে সে সিংহদের রাজা হয়। তারপর একটি মেয়ের সংস্পর্শে এল সে। সে জীবনে মেয়ে কখনো দেখেনি। মেয়েটি একদিন একটা পুকুরে স্নান করছিল। এমন সময় সেই সিংহমানুষ তার কাছে এল। কেমন লাগছে?

ওরমান বলল, ভালই ত মনে হচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে সেই সিংহমানুষের ভূমিকায় কে অভিনয় করবে?

স্মিথ বলল, তার নাম স্ট্যানলি ওবরস্কি। আর ওবরস্কির নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছে নাওমি ম্যাডিসন। গর্ডন মার্কাস ম্যাডিসনের বাবার ভূমিকায় অভিনয় করছে। ভূমিকাটা হলো এক শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীর। মেজর হোয়াইট যিনি এখানে এখন বসে রয়েছেন তিনি অভিনয় করছেন এক শ্বেতাঙ্গ শিকারীর ভূমিকায়।

ওরমান বলল, আমার ক্যামেরাম্যান কে হবে?

বিল ওয়েস্ট।

চমৎকার।

এছাড়া পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশজন ড্রাইভার থাকবে। জেনারেটার ট্রাক আর শব্দযন্ত্রের ট্রাক ছাড়া থাকবে কুড়িটা ট্রাক। পাঁচটা প্রাইভেট কার যাবে যাত্রীদের নিয়ে।

স্মিথের কথা শেষ হতে ওরমান বলল, কিন্তু কবে আমরা আফ্রিকা রওনা হচ্ছি?

আজ হতে দশ দিনের মধ্যে।

শেখ আবেল বেনেম আর তার আরব অনুচরেরা দলের পিছন থেকে সব দেখছিল। তারা দেখছিল দু'শো জন নিগ্রোভৃত্য কিভাবে ন'টন মালবোঝাই একটা ভারী ট্রাককে একটা ছোট্ট হাঁটুভোর কাদা জলে ভর্তি নদীর বুক থেকে টেনে তুলছিল। ওরমান সবকিছুর তদারক করছিল।

তার কিছুটা দূরে একটা যাত্রীগাড়ির ভিতরে দুটি মেয়ে বসেছিল আর সেই গাড়ির দরজা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে জেরল্ড বেন একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ নাওমি?

খুব খারাপ।

আবার জ্বর হয়েছে?

জিঙ্গা ছেড়ে আসার পর থেকে আর জ্বর হয়নি।
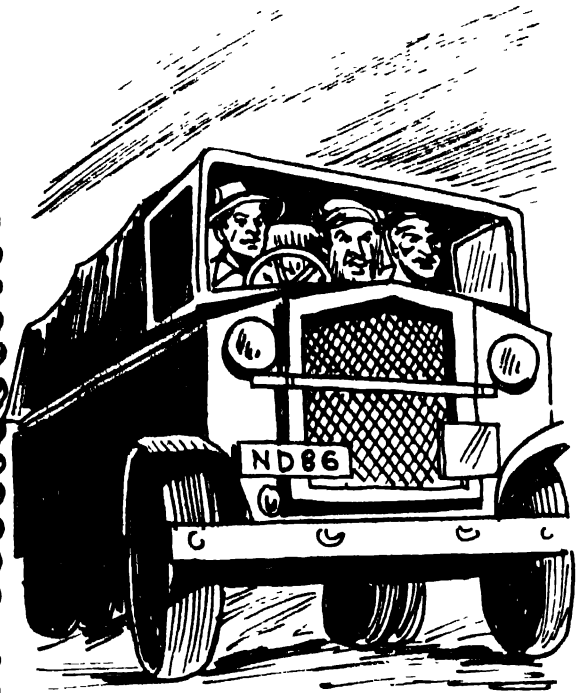
তবে আমার মনে হচ্ছে আমি এখানি হলিউডে চলে যাই। কিন্তু মনে হচ্ছে আর সেখানে কোনদিন যেতে পারব না। এখানেই আমায় মরতে হবে।

না, না, ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ তারা নীরবে বসে মাছি তাড়াতে লাগল। আরবরা তাদের টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চেপে সব কিছু দেখতে লাগল।

শেখ আবেল বেন তার পাশের একজন আরবকে বলল, দুটো মেয়ের মধ্যে কোন্ মেয়েটা হীরকদেশের রহস্য জানে তা জান?

আরবটা বলল, মেয়েদুটো দেখতে একরকম।

শেখ বলল, ওদের একজনের কাছে কাগজটা আছে এবিষয়ে তুমি নিশ্চিত?

আরব বলল, হ্যাঁ, কাগজটা ছিল একজন বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গের কাছে। সেই বৃদ্ধই হলো মেয়েটার বাবা। যে শ্বেতাঙ্গ যুবকটা মুখ বাড়িয়ে কথা বলছে মেয়ে দুটোর সঙ্গে সে প্রথমে বৃদ্ধকে হত্যা করে কাগজটা হাত করার এক ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু পরে মেয়েটা সে ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে কাগজটা তার বাবার কাছ থেকে নিয়ে নেয়। বৃদ্ধ আর ঐ যুবকটা মনে ভাবছে কাগজটা হারিয়ে গেছে।

দুশোজন নিগ্রোভৃত্য যখন ট্রাকগুলোর সঙ্গে বাঁধা মোটা মোটা দড়ি ধরে টানাটানি করছিল, টমাস ওরমান তখন একটা লম্বা চাবুক হাতে দাঁড়িয়েছিল তাদের কাছে। তার পোশাকগুলোয় কাদা লেগে ছিল। তার সারা দেহে ঘাম ঝরছিল।

ওরমান তার দলবল নিয়ে হলিউড থেকে তিন-মাস হলো এখানে এসেছে। কিন্তু যেখান থেকে ছবি তোলার কাজ শুরু হবে, সেই নির্দিষ্ট জায়গাটায় এখনো পৌছতে পারেনি। সবচেয়ে ভাবনার বিষয় হলো এই যে, এখানকার আদিবাসীরা তাদের পিছু নিয়েছে। তারা এখন প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছে তাদের পথে।

আবার মোটরবাহিনী এগিয়ে চলল। সামনের দিকে ছিল সশস্ত্র প্রহরী আর মালবাহকরা। সহ-কারী পরিচালক প্যাট ওগ্রেডির উপর ভার ছিল ট্রাকগুলোর। তার হাতে কোন চাবুক ছিল না। প্যাটের পাশে ছিল মেজর হোয়াইট। হোয়াইট একসময় প্যাট ওগ্রেডিকে বলল, সবকিছুর ভার যদি তোমার উপর থাকত তাহলে খুব ভাল হত। মন মেজাজের দিক থেকে ওরমান মোটেই এ কাজের উপযুক্ত নয়।

সফরিটা আবার ধীর গতিতে এগিয়ে চলতে লাগল। ওরমান হোয়াইটকে পাশে নিয়ে সামনের দিকে রইল। নিগ্রোভৃত্যরা কুড়ুল আর ছুরি দিয়ে পথ পরিষ্কার করতে করতে যাচ্ছিল। কিছুদূর যাওয়ার পর ওরা একটা নদী পেল। ওরমান বলল, আজ এখানেই শিবির স্থাপন করব।

গাড়িগুলো সব দাঁড়িয়ে রইল। একটা গাড়ির নিচে বসে ওরমান এক বোতল স্কচ খাচ্ছিল। ম্যাডিসন তার একটা সিগারেট ধরাল। সে বনের চারদিকে তাকাচ্ছিল। দেখল নদীর ওপারেও ঘন বন। ম্যাডিসন একসময় বলল, ফিরে চল টম তা না হলে আমরা সবাই মারা পড়ব।

ওরমান বলল, আমাকে আমার ছবি করবার জন্য পাঠানো হয়েছে। যাই ঘটুক না কেন, আমাকে আমার কাজ করতেই হবে। যাও, তোমার সিংহ-মানুষকে তোমার মনের কথা জানাওগে।

একসময় নিগ্রোদের সর্দার কামুড়ি ওরমানের সামনে এসে বলল, আমার লোকরা আর তোমাদের সফরির সঙ্গে যাবে না।

ওরমান বলল, কিন্তু তোমরা সই করেছ চুক্তিপত্রে।

কামুড়ি বলল, কিন্তু আমরা বানসুটোদের অঞ্চলে আসার জন্য সই করিনি। তোমরা যদি এখান থেকে ফিরে যাও তাহলে আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকব।

ওরমান তার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চাবুক বার করল। বলল, আমি তোমাদের উচিত শিক্ষা দেব।

মেজর হোয়াইট ওরমানের কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বলল, থাম। এতদিন আমি তোমার কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিনি। কিন্তু এখন আমাদের সকলের জীবন বিপন্ন।

ওগ্রেডি বলল, তুমি নির্বোধের মত কাজ করছ টম। মেজর ঠিকই বলছে। কিছু মনে করো না মেজর। তুমিই এখন সবকিছুর ব্যবস্থা করো। কিভাবে আমরা এই ভয়ঙ্কর জায়গাটা থেকে বেরিয়ে যেতে পারি তার জন্য চেষ্টা করো।

তার সহকারী ওগ্রেডি এখন তাকে আর সমর্থন করছে না দেখে চুপ করে গেল ওরমান। ওগ্রেডি মেজরকে জিজ্ঞাসা করল, এই বানস্যুটো অঞ্চল থেকে আমাদের বার হতে আর ক'দিন লাগবে?

হোয়াইট বলল, ট্রাকগুলোর জন্য পথ করে এগোতে আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে। তা না হলে দুদিনের মধ্যেই এ অঞ্চলের বাইরে গিয়ে পড়তাম। তবে এখন আমাদের দুসপ্তা লাগবে, তাও যদি ভাগ্য ভাল হয়।

কামুড়ির সঙ্গে কথা বলে ফিরে এসে হোয়াইট ওগ্রেডিকে বলল, ওরা বেশী টাকা পেলে আমাদের সঙ্গে যাবে। তবে ওদের আর চাবুক মারা চলবে না।

সকাল হবার অনেক আগেই শিবিরের সবাই জেগে উঠল। সকালে উঠেই হোয়াইট জানতে পারল কামুড়ির অধীনস্থ পঁচিশজন নিগ্রোভৃত্য রাত্রিবেলায় শিবির ছেড়ে পালিয়ে গেছে। প্রহরী-দের জিজ্ঞাসা করে জানল তারা কাল শিবির ছেড়ে কখন গেছে তা ওরা দেখতেই পায়নি।

প্রাতরাশের পর আবার রওনা হয়ে পড়ল ওদের সফরি। নদীটা পার হয়ে ওপারের বন-ভূমিতে গিয়ে পড়ল ওরা। নদীতে জল খুব কম ছিল আর তলায় পাথর থাকায় ট্রাকগুলো সহজেই পার হয়ে গেল। বানস্যুটোদের কোথাও চিহ্ন পাওয়া গেল না। আর কোন অশুভ ঘটনাও ঘটল না। ওদের চারপাশের বনভূমিতে কোথাও কোন জনপ্রাণী আছে বলে মনে হল না। ক্রমে দুপুর হয়ে গেল। দলের সবার মনে সাহস ফিরে এল।

সহসা অতর্কিতে একঝাঁক তীর ছুটে এল। দুজন নিগ্রোভৃত্য মারা গেল সঙ্গে সঙ্গে। মেজর হোয়াইট ওরমানের পাশে একসঙ্গে পথ হাঁটছিল। তার বুকেও একটা তীর এসে লাগলে সে তীরটা বুক থেকে জোর করে তুলে ওরমানের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। শ্বেতাঙ্গ যাত্রীরা রাইফেল হাতে ছোটাছুটি করে বনটা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল। সকলেই ট্রাক থেকে নেমে পড়ল।

পরদিন আবার যাত্রা শুরু করল ওরা। কামুড়ির লোকরাও রয়ে গেল। একটা ট্রাকের উপর মৃতদেহ চাপানো হলো। এরপর যেখানে শিবির স্থাপন করা হবে সেখানে কবর দেওয়া হবে। বিক্ষুব্ধ নিগ্রোভৃত্যরা রাগের সঙ্গে রাস্তা পরিষ্কার করে যেতে লাগল। আরবরা যথারীতি দলের পিছনে রইল। আজ সকাল থেকেই ওরমানের হাতে চাবুক ছিল না। আজ সে ভালভাবে কথা বলছিল নিগ্রো-ভৃত্যদের সঙ্গে। তাদের মনে সাহস সঞ্চার করার চেষ্টা করছিল। সে বলল, আগামীকালই আমরা এ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যাব।

সারাদিন আর কোন ঘটনা ঘটল না। কিন্তু বিকালের দিকে আবার এক জায়গায় শিবির স্থাপন করার আগে কিন্তু আবার কয়েকটা তীর এসে বিদ্ধ করল তিনজনকে। তিনজন নিগ্রো মারা গেল। আর একটা তীর ওরমানের মাথার উপর দিয়ে যাবার সময় তার শিরস্ত্রাণটা ফেলে দিল। অল্পের জন্য বেঁচে গেল সে।

তখনো সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসেনি ওদের শিবিরে। সামান্য যে একটু আলো ছিল তাতে রোণ্ডা তার ঘরে টেবিলে বসে কি লিখছিল একা একা। একটু দূর থেকে আতুই নামে আরবটা লক্ষ্য করছিল তাকে। হঠাৎ মার্কাস এসে রোণ্ডার সামনে বসে তাকে বলল, কবিতা লিখছ নাকি?

রোণ্ডা বলল, দৈনন্দিন ডায়েরী লেখার কাজটা সেরে রাখছি।

মার্কাস বলল, এ ডায়েরীর মধ্যে থাকবে বহু দুঃখজনক ঘটনার সকরুণ কাহিনী।

রোণ্ডা বলল, ঘটনাক্রমে এই ম্যাপটা সেদিন আমার ব্যাগের মধ্যে পেয়ে যাই। সেদিন একটা দৃশ্যে আমার ছবি তোলার সময় এটা পাই।

ম্যাপটা খুলে রোণ্ডা যখন মার্কাসকে দেখাচ্ছিল তখন আতুই আরো কাছে এসে কুটিল চোখে তা দেখল।

মার্কাস বলল, ওটা তোমার কাছেই রেখে দাও। ওরা চাইলে তবে দেবে। ওরা কি এই ম্যাপটা স্টুডিওতে তৈরী করে?

রোণ্ডা বলল, না। জো একটা দোকান থেকে একটা পুরনো বই কিনে তার মধ্যে এটা পায়। এই মানচিত্রটাকে কেন্দ্র করেই ও কাহিনীর পটভূমি রচনা করেছে। ব্যাপারটা বেশ মজার নয়? লোকের মনে হবে এই ম্যাপটা দেখে হীরক দেশের উপত্যকায় যাওয়া সহজ হবে।

রোণ্ডা ম্যাপটা এবার গুটিয়ে ভাঁজ করে তার ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। আতুই সেটা লক্ষ্য করল।

মার্কাস বলল, অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলেই কবর দেওয়া হবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলেই কবর দেওয়ার কাজটা সারা হয়ে গেল। ম্যাডিসন বসে ভাবতে লাগল।

সে রাতে ওরমান একেবারেই ঘুমোতে পারল না। লণ্ঠনের আলোটা মিটমিট করে জ্বলছিল তার ঘরে। শেষ রাতের দিকে পাশের ঘর থেকে ওগ্রেডি তাকে লক্ষ্য করে বলল, ঘুমিয়ে পড় টম। তা না হলে তোমার মাথা গরম হয়ে যাবে।

ওরমান বলল, আমি ঘুমোতে পারছি না। আমি সারাক্ষণ হোয়াইটকে দেখতে পাচ্ছি। আমিই তাকে হত্যা করেছি। আমিই নিগ্রোদের হত্যা করেছি।

ওগ্রেডি বলল, এটা তোমার দোষ নয়। স্টুডিও কর্তৃপক্ষ তোমাকে যে কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়েছে তুমি শুধু সেই কাজ জোরের সঙ্গে করে যাচ্ছ।

ওরমান তবু বলল, না, সব দোষ আমার। হোয়াইট বারবার আমায় নিষেধ করেছিল।

ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহটা জেগেছিল

প্রথমে বিল ওয়েস্টের মনে। সে ছুটে নিগ্রো-ভৃত্যদের শিবিরে চলে গেল। কামুড়ীর খোঁজ করল। বিল দেখল শিবিরে একটা নিগ্রোভৃত্যও নেই।

বিল ওয়েস্টের ডাকাডাকিতে ওরমান আর ওগ্রেডি ছুটে এল। ওরমান বিলকে বলল, প্রাত-রাশের কি হলো?

বিল বলল, প্রাতরাশ এবার থেকে নিজের হাতে তোমায় তৈরী করে নিতে হবে। শিবির ছেড়ে নিগ্রোভৃত্যরা সব পালিয়েছে। আগুনটা পর্যন্ত নিবিয়ে দিয়ে গেছে। শিবিরে কোন পাহারা নেই। মনে হয় আমাদের কিছু খাদ্যদ্রব্যও নিয়ে গেছে।

ওরমান বলল, কিন্তু কখন কোন্ দিকে পালাল? কোথায় যাবে তারা?

সবাই ওরমানের মুখপানে তাকাতে লাগল। তারা দেখল ওরমান প্রথমে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে নিল নিজেকে। সকলে তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ওরমান নির্দেশ দিল, ট্রাকগুলো সব দেখ। ড্রাইভারদের সব বলল, মালপত্র সব ঠিক আছে কিনা তারা দেখুক। বিন, তুমি এ কাজগুলো করো। প্যাট একজন প্রহরী বসিয়ে দাও শিবিরের সামনে। আরবরা এখনো আছে শিবিরে। প্যাট, তুমি বরং তাদের প্রহরীর কাজে লাগিয়ে দাও। তারপর সকলকে খাবার টেবিলে ডাক।

ওরমান শিবিরে একবার ঘুরে এসে খাবার টেবিলে এসে দেখল সবাই সেখানে বসে নিগ্রোদের শিবিরত্যাগের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে।

ওরমান শান্তভাবে বলল, কি হয়েছে তোমরা সকলেই জান। এর জন্য কাউকে দোষারোপ করে লাভ নেই। আমাদের অবস্থা এখনো একেবারে হতাশাব্যাঞ্জক হয়নি। আমরা কোনরকমে বান-সুটোদের এই এলাকা পার হতে পারলে আর কোন ভয় নেই। তখন আমরা কোন আদিবাসীদের গাঁয়ে কিছু মালবাহক যোগাড় করব। এর মধ্যে

তোমাদের সকলেই আপন আপন কাজ করে যেতে হবে। এবার হতে তোমাদের শিবির স্থাপন করতে হবে, শিবির গোটাতে হবে, মাল বোঝাই, মাল নামানো, রান্না, পথ পরিষ্কার করা, পাহারার কাজ সবই করতে হবে। এখন আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। কে রান্না করতে পারবে?

রোগুা বলল, সে রান্না করবে।

ওরমান বলল, মোট তিনজন রাধুনির দরকার। আর কে কে রান্না করবে?

ওবরস্কি বলল, আমি সাহায্য করব রোগুাকে।

সবাই হেসে উড়িয়ে দিল কথাটাকে। অবশেষে ঠিক হলো রোগুা রান্নার কাজ করবে আর জিমি ও শর্টি তাকে সাহায্য করবে।

খাবার সময় নাওমি তার গাড়ির সীটে বসে রইল। খেতে গেল না। তাঁবু গুটিয়ে মাল বোঝাই করে সফরি রওনা হবার সময় রোগুা সব কাজ সেরে তার গাড়িতে গেল। সে কাগজে মোড়া গোটাকতক স্যাণ্ডউইচ নাওমিকে দিয়ে বলল, এগুলো তোমার জন্য এনেছি, তুমি খেয়ে নাও।

নাওমি ম্যাডিসন নীরবে তা খেয়ে নিল।

সফরির গতিটা খুব ধীর ছিল। শ্বেতাঙ্গরা পথ পরিষ্কারের কাজ ঠিকমত পারছিল না তারা একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল গরমে। কুড়ুল দিয়ে গাছকাটার কাজে অভ্যস্ত ছিল না তারা। পথের সামনে এখানে অনেক গাছ ছিল।

বিল ওয়েস্ট তার কপাল থেকে ঘাম ঝেড়ে বলল, পথপ্রদর্শক না থাকায় আমরা বুঝতে পারছি না কোন্ পথে কোথায় যাচ্ছি।

যেতে যেতে ওরা বন পার হয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। জায়গাটা মানুষসমান লম্বা লম্বা ঘাসে ভর্তি, একটাও গাছ নেই।

ওরমান বলল, এখানে কোন গাছ না থাকায় শত্রুরা আমাদের বিরক্ত করবে না। জোরে গাড়ি চালাও। যাত্রীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কিন্তু ঘাসের উপর গাড়িগুলো কিছুটা এগিয়ে যেতেই ঘাসগুলোর ভিতর থেকে আবার একঝাঁক তীর উড়ে এল। এবার আর লুকিয়ে রইল না শত্রুরা। বানসুটো আদিবাসীরা যুদ্ধের ধ্বনি দিতে দিতে বর্শা হাতে সামনে ছুটে এল। রাইফেলগুলো গর্জে উঠল। শ্বেতাঙ্গ যাত্রীরা সকলেই গুলি চালাতে লাগল। রোণ্ডাও রিভলবার হাতে বেরিয়ে পড়ল তার গাড়ি থেকে। আদিবাসীদের অনেকেই মারা গেল। তারা দু'মিনিটের মধ্যেই আবার ঘাসগুলোর মধ্যে পালিয়ে গেল। শ্বেতাঙ্গদের দশ-বারোজন মারা গেল।

নয়েস, বেন ও সাতজন আমেরিকান আর তিনজন আরব মারা গেল। তাদের মৃতদেহগুলো একটা ট্রাকের উপর চাপানো হলো।

ওগ্রেডি ওরমানকে বলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে টম। শয়তানরা ঘাসগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে।

ওরমান আবার যাত্রা শুরু করার হুকুম দিল। ওগ্রেডি বলল, কিন্তু ওবরস্কি কোথায়? তাকে ত দেখছি না।

মার্কাস বলল, আমি দেখছি আক্রমণের সময় ও গাড়ি থেকে নেমে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। আক্রমণটা আমাদের বাঁদিকে শুরু হওয়ায় ও ডানদিকে চলে যায়।

ওরমান নিজে ঘাসের মধ্যে ওবরস্কির খোঁজ করতে গেল। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন খুঁজতে লাগল। কিন্তু অনেক খুঁজেও ওবরস্কিকে পাওয়া গেল না কোথাও। তার মৃতদেহও কেউ দেখতে পেল না।

যাই হোক, সফরি আবার এগিয়ে চলল। বিকালের দিকে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করা হলো। রান্নার কাজ শেষ হলে সবাই বিষণ্ণ মুখে খাবার টেবিলে বসল।

স্টানলি ওবরস্কির চেহারাটা অসাধারণভাবে বলিষ্ঠ হলেও মনে একটুও সাহস বা পৌরুষবোধ ছিল না। অথচ তাকে দেখে তা মনে হত না। কিন্তু আসলে তার মনটা ছিল দারুণ ভীরু প্রকৃতির। কিন্তু লজ্জায় সে তার ভীরুতা প্রকাশ করত না কখনো। আজও তাই বানসুটো অধিবাসীরা তাদের অকস্মাৎ আক্রমণ করলে সাহসের সঙ্গে দলের আর পাঁচজনের মত সম্মুখীন

না হয়ে কোন লড়াই করে ঘাসের ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

একজন আদিবাসী তাকে দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু পরে সে তাদের দলের লোক-দের ডাকে। সে একটা ছুরি বার করে। ওররস্কির হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। সে তার দলের লোক-দের কাছে ছুটে পালাতেও পারল না।

ওররস্কি তখন তার সামনের নিগ্রো আদিবাসীটিকে দুহাত দিয়ে মাথার উপরে তুলে মাটিতে আছাড় মেরে ফেলে দিল। জীবনে আজ সে প্রথম লড়াই করল নিজের হাতে। তার দেহে এতখানি শক্তি ছিল, মনে এত সাহস ছিল তা নিজেই জানত না সে। আজ প্রথম সে পরিচিত হলো তার নিজের শক্তি আর সাহসের সঙ্গে।

কয়েকজন বানসুটো আদিবাসী এসে ওররস্কির হাতদুটো পিঠের দিকে ঘুরিয়ে বেঁধে দিল। তারপর লড়াই শেষে পালিয়ে যাবার সময় ওররস্কিকেও হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। ক্রমাগত অনেকক্ষণ ধরে পথ চলে আদিবাসীরা বিকালের দিকে একটা গাঁয়ে গিয়ে পৌছল।

ওররস্কিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের সব লোক, নারী, শিশু সবাই ছুটে এল। তার গায়ে থুথু দিতে লাগল আর ময়লা ফেলতে লাগল। গাঁয়ের সর্দার এসে দর্শকদের তাড়িয়ে দিল। অবশেষে এক অন্ধকার কুঁড়ে ঘরের সামনে তার মধ্যে ঢুকে পড়তে বলল। কিন্তু দরজাটা খুব ছোট বলে ঢুকতে পার-ছিল না ওররস্কি।

আদিবাসী যোদ্ধারা তাকে কোনরকমে টেনে ঢোকাল। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হলেও ওররস্কি দেখতে পেল কামুড়ি আর দুজন নিগ্রো হাত পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে মেঝের উপর।

ওররস্কি সিংহমানুষের অভিনয় করার জন্য এসেছিল বলে নিগ্রোভৃত্যরা তাকে সিম্বা বলত। ওররস্কিকে দেখেই আশ্চর্য হয়ে কামুড়ি বলল, তোমাকে কি করে ধরল বাওয়ানা সিম্বা ?

ওররস্কি বলল, তুমি তাহলে পালিয়ে এসে ভাল কাজ করনি কামুড়ি।

কামুড়ি বলল, আমাদের দলের অনেকে পথে ওদের হাতে মারা যায়। কিছু লোককে বন্দী করে এনেছে। কিছু লোক পালিয়ে যায়।

ওররস্কি বলল, ওরা আমাদের খুন করছে না কেন ?

কামুড়ি বলল, কারণ ওরা আমাদের খাবে।

ওররস্কি বলল, তুমি কি বলতে চাও ওরা মানুষখেকো ?

কামুড়ি বলল, হ্যাঁ। তবে অন্য সব নরখাদক আদিবাসীদের মত নয়। ওরা সব সময় সব মানুষ খায় না বা মানুষের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খায় না। ওরা কেবল যারা কোন না কোন দলের প্রধান বা সর্দার, যারা বীর সাহসী এবং বলবান ওরা শুধু তাদেরই হত্যা করে তাদের মাংস খায়। কারণ তাদের ধারণা তাহলে তারাও বীর, বলবান ও প্রধান হবে। আবার মৃতদেহের বাছাই করা শুধু কয়েকটা অঙ্গ খায় তারা। তারা আমাদের হৃৎপিণ্ড, হাতের তালু, পায়ের তলা, আর হাতপায়ের পেশীগুলো খাবে।

সেদিন রাতের খাওয়া হয়ে গেলে ওরমান আর বিল ওয়েস্ট গিয়ে রোণ্ডাকে বলল, তোমরা যাও, আমরা ডিশগুলো ধুয়ে নেব। জিমি আর শর্টি আমাদের সাহায্য করবে।

রাত্রি দুপুর হলে শ্বেতাঙ্গরা আরবদের ডেকে পাহারায় বসিয়ে দিয়ে শুতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ল তারা।

পরদিন সকালে রোদ ওঠার পর গর্ডন মার্কাস প্রথমে উঠল। উঠেই শিবিরটার চারদিকে তাকিয়ে তার কেমন মনে হতে লাগল। শিবিরটাকে ফাঁকা ফাঁকা মনে হলো তার। আগুনের কাঠ সব নিভে গেছে। ধোঁয়া হচ্ছে না তাতে। তার উপর কেউ পাহারায় নেই। এরপর সে দেখল আরবরা শিবির ছেড়ে পালিয়ে গেছে। মার্কাস তখন ছুটে গিয়ে ওরমান আর ওগ্রেডির তাঁবুতে গিয়ে তাদের জাগাল। ব্যস্তভাবে বলল, আরবরা পালিয়ে গেছে। তাদের ঘোড়া, মালপত্র কিছুই নেই।

ওরমান আর ওগ্রেডি মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। সব শুনে ওরমান বলল, মনে হচ্ছে কয়েক ঘণ্টা আগেই ওরা পালিয়েছে। যাই হোক, ওদের ছাড়াই আমাদের চলতে হবে। এখন প্রাত-রাশের জন্য খাবার তৈরীর জন্য মেয়েদের ডাক। জিমি আর শর্টিকেও ডেকে তোল।

মার্কাস মেয়েদের ঘরে চলে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, মেয়েদের পাওয়া যাচ্ছে না রোণ্ডা, নাওমি কেউ নেই। তাদের ঘরটার সবকিছু তছনছ হয়ে আছে। আরবরা ওদের ধরে নিয়ে গেছে। ওদের চেঁচাবার সুযোগ দেয়নি। কিন্তু কেন তারা ওদের নিয়ে গেল।

ওগ্রেডি বলল, হয়ত মুক্তিপণ চায় মোটা রকমের অথবা ওদের বিক্রি করে দিতে চায় মোটা দামে।

ওরমান বলল, এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক জায়গায় মেয়ে বিক্রির বাজার আছে।

এরপর ওরমান কোথায় যাবার জন্য তার জামা কাপড়, খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে তৈরী হতে লাগল। তা দেখে বিল ওয়েস্টও সেই-ভাবে যাবার জন্য তার জিনিষপত্র গোছাতে লাগল।

ওরমান তাকে বলল, কোথায় যাবে তুমি?

ওয়েস্ট বলল, আমি যাব তোমার সঙ্গে।

ওগ্রেডি বলল, তোমরা যদি মেয়েদের খোঁজ করতে যাও তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

অনেকেই যেতে চাইল। কিন্তু ওরমান বলল, না, আমি একা যাব। দলবলের থেকে একজন লোক অনেক দ্রুত যেতে পারে। ওরা ঘোড়ায় গেলেও অনেক জায়গায় নামতে হবে ওদের। তার থেকে আমি হেঁটে তাড়াতাড়ি যাব। আমার অনু-পস্থিতিতে সফরির ভার থাকবে ওগ্রেডির উপর।

ওগ্রেডি বলল, কিন্তু তুমি একা, ওদের ধরতে পারলেই বা কি করবে? কি করে একা লড়াই করবে?

ওরমান বলল, আমি ত লড়াই করব না। আরবরা ওদের বিক্রি করে যত টাকা পাবে আমি তাদের আরো বেশী টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে আনব।

এরপর ওরমান প্রাতরাশ খেতে খেতে বলল, ওম্বাম্বি জলপ্রপাতের কাছে তোমরা অপেক্ষা করবে আমার জন্য। সেখানে গেলে কিছু আদিবাসী ভৃত্য পাবে। দক্ষিণ দিকের পথ দিয়ে একজন লোককে জিঞ্জায় পাঠিয়ে আমাদের আমেরিকার স্টুডিওতে

খবর পাঠিয়ে দেবে। যা যা ঘটেছে তা জানিয়ে দেবে এবং এখন কি করা হবে তার নির্দেশ চাইবে।

ওরমান যাবার জন্য উদ্যত হতেই বিল ওয়েস্ট তার পিছু নিল। বলল, আমাকে যেতেই হবে। রোণ্ডা কোথায় কেমন আছে তার কিছুই জানি না।

ওরমান বলল, বুঝেছি। আমি একথাটা ভাবিনি। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পার।

ওরমান আর ওয়েস্ট শিবির থেকে বেরিয়ে যে পথে আরবরা ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে গেছে সেই পথ ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে।

সে তাদের বলল, খাবার আর জলের জন্য তোমরা চীৎকার করো।

সারারাত নাচগান করে কাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে গ্রামবাসীরা প্রায় দুপুর পর্যন্ত ঘুমোল। তারপর মেয়েরা উঠে রান্নার কাজ করতে লাগল। কয়েকজন প্রহরী এসে বন্দীদের পায়ের বাঁধনগুলো খুলে দিয়ে তাদের সকলকে বানস্তুটো আদিবাসীদের সর্দার বঙ্গুলার ঘরের সামনে নিয়ে গেল। বঙ্গুলা কামুড়িকে তাদের ভাষায় কি বললে কামুড়ি ওবরস্কিকে বলল, সর্দার জিজ্ঞাসা করছে তোমরা ওদের দেশে কি করছিলে?

রাত্রিশেষে নতুন দিনের আলোকে স্বাগত জানাল ওবরস্কি। কারণ এদিন মৃত্যু এসে তার বন্দীত্বের সব দুঃখকষ্টভোগের অবসান ঘটাতে পারে। দড়ির শক্ত বাঁধনগুলোর জন্য তার হাতে পায়ে ব্যথা লাগছিল। তার উপর ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা। ঘরের ছোট ছোট ইঁদুরগুলো গায়ে উঠে কামড়াচ্ছিল। সারা রাত ধরে গ্রামবাসীরা নাচগান করতে থাকায় তাদের সেই ভয়ঙ্কর নাচগানের শব্দে রাতে একটুও ঘুম হয়নি ওবরস্কির। কিন্তু ওবরস্কি দেখল কামুড়ি ও তার দুজন লোক বেশ ঘুমোচ্ছে।

ওবরস্কি বলল, আমরা একটা কাজে চলে যাচ্ছিলাম। ওদের কোন ক্ষতি করিনি। আমরা বন্ধু। আমাকে ছেড়ে দিতে বল।

কামুড়ির মাধ্যমে সে কথা শুনে রঙ্গুলা বলল, সব শ্বেতাঙ্গদের মারা হবে। গতকাল তাকেও মারা হত, শুধু তার চেহারাটা খুব বলিষ্ঠ বলে সঙ্গে সঙ্গে মারা হয়নি।

কামুড়ি রঙ্গুলাকে বলল, কিন্তু আমাদের কোন খাদ্য বা পানীয় না দিয়ে এভাবে শুকিয়ে রাখলে তাতে কি লাভ হবে তাদের?

কামুড়ির কথার কোন জবাব না দিয়ে রঙ্গুলা তাদের যোদ্ধাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা একটা লোককে ডেকে ওবরস্কির পাশে দাঁড়াতে বলল। দেখল ওবরস্কি তার থেকেও লম্বা এবং তার পেশীগুলো সত্যিই বেশ বলিষ্ঠ আর সুগঠিত।

কামুড়ি আর ওবরস্কিকে আবার সেই ঘরটার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। এবার আর তাদের পাগুলো বাঁধা হলো না। রঙ্গুলার নির্দেশে একটা আদিবাসী মেয়ে তাদের জল আর খাবার দিয়ে গেল।

এইভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল। তারপর একদিন রাত্রিবেলায় কামুড়ির একজন বন্দী লোককে তিন-চারজন যোদ্ধা এসে তাকে সর্দারের ঘরের সামনে নিয়ে গেল। গ্রামবাসীরা ঢোলের তালে তালে উল্লাস করতে লাগল। সেই উল্লাসের মাঝে একসময় এক তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আর্ত চীৎকার শুনতে পেল ওবরস্কি।

কামুড়ি বলল, সব শেষ।

পরদিন রাতে আবার একজন বন্দীকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করল ওরা।

তৃতীয় দিন কামুড়ি বলল, আজ আমার পালা। আজ রাতে তোমাকে একা থাকতে হবে মালিক।

কিন্তু রাত্রি হতেই কামুড়ি আর ওবরস্কি দুজনকেই নিয়ে যাওয়া হলো সর্দারের বাড়ির সামনে সেই বধ্যভূমিতে। ওবরস্কির সামনে কামুড়িকে নির্মম পীড়নের মাধ্যমে ধীরে ধীরে হত্যা করা হলো। কিন্তু সেদিন ওবরস্কিকে হত্যা করা হলো না। কামুড়িকে হত্যা করার পর ওবরস্কিকে আবার সেই ঘরে এনে রাখা হলো।

এদিকে টারজন দূর থেকে রঙ্গুলাদের গাঁ থেকে পর পর তিন রাত ঢাক-ঢোলের আওয়াজ, নাচ-গানের শব্দ শুনতে পেয়েছে।

আজ রাতে আবার বানস্টুটোদের গাঁ থেকে দমদম নাচের বাজনার শব্দ শুনতে পেল। কি মনে হতে সেই গাঁয়ের দিকে গাছের ডালে ডালে এগোতে লাগল টারজন। জাদ-বাল-জা তখন তার সঙ্গে ছিল না।

গাঁয়ের কাছে গিয়ে টারজন দেখল গাঁয়ের সর্দারের ঘরের সামনে নাচের আসর বসেছে। জ্বলন্ত আগুনের আলোয় দেখতে পেল তারই মত অনেকটা দেখতে বলিষ্ঠদেহী এক শ্বেতাঙ্গ যুবককে একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। একটু পরেই অর্থাৎ নাচ হয়ে গেলেই তার উপর অকথ্য পীড়ন চালিয়ে হত্যা করা হবে তাকে।

টারজন দেখল সর্দারের ঘরের আশেপাশে ও পিছনে অনেকগুলো গাছ রয়েছে। গাঁয়ের পিছন দিক দিয়ে সে সর্দারের কুঁড়ের কাছে একটা গাছের উপরে উঠে গেল। সেখান থেকে ওদের নাচটা ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছিল টারজন। মুখে রং-মাখা যোদ্ধারা বাজনার তালে তালে নাচছিল আর মাঝে মাঝে লাফাচ্ছিল। সর্দার রঙ্গুলা একপাশে দাঁড়িয়েছিল। বন্দী শ্বেতাঙ্গ যুবকটিকে দেখে কৌতূহল জাগল তার মনে। তার মত অনেকটা দেখতে। সে কে এবং কোথা থেকে এসেছে তা বুঝতে পারল না।

সর্দার রঙ্গুলা একটা টুলের উপর বসেছিল।

সে হঠাৎ হুকুম দিল, বন্দীকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেল এবার।

কিন্তু ওবরস্কিকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য যোদ্ধারা তার কাছে এলেই ওবরস্কি একজনকে তুলে এনে অন্য যোদ্ধাদের উপর সজোরে ফেলে দিল। তাতে অনেকে পড়ে গেল। বঙ্গুলা চীৎকার করে বলতে লাগল, ওকে ধরে ফেল। বেঁধে ফেল।

কিন্তু সমানে একা অনেক লোকের সঙ্গে লড়াই করে যেতে লাগল ওবরস্কি। নিগ্রোযোদ্ধারা সংখ্যায় বেশী থাকায় ক্রমে তারা ওবরস্কিকে ধরে ফেলল। কিন্তু তার হাত পা বাঁধতে গেলে সে আবার ঘুষিতে বেশ কয়েকজনকে ঘায়েল করল। তবু তারা ওবরস্কিকে মাটিতে ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছের উপর থেকে অলক্ষিতে একটি দড়ির ফাঁস এসে সর্দার বঙ্গুলার গলায় আটকে গেল। তার হাতদুটোও বাঁধা পড়ে গেল ফাঁসে। বঙ্গুলা ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে চীৎকার করে উঠল। তার পাশের লোকরা কিছু বোঝার আগেই তার দেহটা আশ্চর্যজনকভাবে গাছের উপর উঠে গেল। অথচ গাছের উপর কোন লোক দেখতে পেল না তারা।

ওবরস্কি নিজেও কম আশ্চর্য হলো না।

হঠাৎ গাছের উপর থেকে এক অদৃশ্য লোকের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বঙ্গুলাকে সে কণ্ঠস্বর বলল, আমাকে দেখতে পাচ্ছ? দেখ আমি কে।

বঙ্গুলা ভয়ে ও যন্ত্রণায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, হ্যাঁ পাচ্ছি, ওয়ালাম্বে।

টারজন বলল, না, আমি ওয়ালাম্বে বা মৃত্যুর দেবতা নই। আমি তার থেকেও বড়। আমি হচ্ছি বাঁদরদলের টারজন। আমি যেকোন সময়ে মৃত্যু এনে দিতে পারি। যেকোন লোকের মৃত্যু ঘটাতে পারি।

বঙ্গুলা তেমনি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কি চাও তুমি? কি করবে আমাকে নিয়ে?

টারজন বলল, আমি নিজেকে দু'ভাগে ভাগ করে আর একটি মানুষকে আমার মত করে তাকে পাঠিয়েছিলাম তোমাদের কাছে। তোমরা তার

সঙ্গে কেমন ব্যবহার করো তা দেখতে চেয়েছিলাম। আমি দেখলাম সে তোমার কোন ক্ষতি না করলেও তোমরা তাকে বিনা কারণে হত্যা করো, তার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করো। এজন্য তোমাকে মরতে হবে।

বঙ্গুলা বলল, তুমি গাছের উপর এখানে রয়েছ, আবার গাছের তলাতেও রয়েছ। তুমি তাহলে দানব। তোমাকে খাদ্য, পানীয়, অস্ত্রশস্ত্র এবং মেয়ে দিয়ে সন্তুষ্ট করব। তুমি আমাকে মেরো না।

টারজন বলল, তোমার জীবনের একটা মূল্য ছাড়া আর আমি কিছুই চাই না।

বঙ্গুলা ভয়ে ভয়ে বলল, সেটা কি মালিক?

টারজন বলল, তোমাকে কথা দিতে হবে তুমি কোন শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে লড়াই করবে না। তোমাদের দেশে কোন শ্বেতাঙ্গ এলে বরং তাকে সাধ্যমত সাহায্য করবে।

বঙ্গুলা বলল, কথা দিচ্ছি মালিক। আমি তাই করব।

টারজন বলল, তাহলে তোমাদের লোকদের বল ঐ বন্দীর বাঁধন খুলে তাকে যেন ছেড়ে দেয় তারা। তারপর গাঁয়ের গেট খুলে দেয় যেন। আমরা চলে যাব।

রঙ্গুলা চীৎকার করে তার লোকদের সেইমত হুকুম দিল। টারজনও তখন তার গলা থেকে ফাঁসটা খুলে দিল।

ওবরস্কি এই সব ব্যাপার দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল একেবারে। গাছের উপর থেকে টারজন এবার ইংরেজিতে তাকে বলল, তুমি গাঁয়ের বাইরে বনের ধারে চলে যাও। ওরা তোমার কোন ক্ষতি করবে না। আমি যাচ্ছি এখনি।

ওবরস্কি টারজনের কথামত গাঁয়ের বাইরে বনের মধ্যে ঢুকতেই তার পিছনে গিয়ে হাজির হল টারজন। ওবরস্কি মুখ ঘুরিয়ে বলল, কে তুমি?

টারজন বলল, আমি বাঁদরদলের রাজা টারজন।

ওবরস্কি আগেই টারজনের নাম শুনেছিল। সে ভেবেছিল টারজন কোন রক্ত মাংসের মানুষ নয়।

টারজন কিন্তু সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে পথ চলতে লাগল।

অবশেষে তারা একটা ফাঁকা জায়গায় একটা নদীর ধারে এসে থামল। চাঁদেব আলো ছড়িয়ে পড়েছিল ফাঁকা জায়গাটায়।

কিন্তু সে সৌন্দর্য ভাল করে উপভোগ করতে না করতেই দুটো সিংহ দেখে ভয় পেয়ে গেল ওবরস্কি। তাদের মধ্যে একটা সিংহ আর একটা সিংহী ছিল। সিংহীটা ওদেব দেখে গর্জন কবতে লাগল।

টারজন ওববস্কিকে বলল, কোন ভয় নেই, তুমি দাঁড়াও। সিংহীটাকে আমি চাই না, দেখি কি ব্যাপাব।

ওবরস্কি সেইখানে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। সে দেখল টারজন সিংহটাব দিকে এগিয়ে গেল। সে ভাবল টারজন পাগল।

সে শুধু আফ্রিকার রূপকথার এক কাল্পনিক চরিত্র।

বনের মধ্যে যেতে যেতে টারজন বলল, আমার পিছু পিছু এস।

ওবরস্কি বলল, তোমাকে আমার ধন্যবাদ জানানো হয়নি। তুমি এসে আমাকে উদ্ধার না করলে আজ আমার জীবন চলে যেত।

কিন্তু ওবরস্কি আশ্চর্য হয়ে দেখল টারজন এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে সিংহটার সঙ্গে। সে বলল, টার্মাঙ্গানী এসেছে, জাদ-বাল-জা তুমি তোমার সিংহীকে সাবধান করে দাও।

জাদ-বাল-জা নামে সিংহটা কাছে গিয়ে কি বলতেই সিংহীটা চলে গেল। জাদ-বাল-জাও তার সঙ্গে চলে গেল।

টারজন এবার ওবরস্কির ঘাড়ে একটা হাত রেখে বলল, জাদ-বাল-জা আর তোমার কোন ক্ষতি করবে না কখনো। সে এবার থেকে তোমার গন্ধ শুঁকে তোমাকে চিনতে পারবে।

টারজন এবার ঘাসের উপব সটান শুয়ে পড়ে বলল, এখানেই শুয়ে পড়। জাদ-বাল-জা পাহারা দেবে যাতে আমাদের ক্ষতি না হয়। আচ্ছা তুমি এ অঞ্চলে কিভাবে এলে?

ওবরস্কি তখন আমেরিকা থেকে কখন কিভাবে কি কারণে আফ্রিকার জঙ্গলে এল তা সব বলল।

টারজন তা শুনে বলল, আমি যদি জানতাম তুমি ঐ সফবির লোক তাহলে আমি তোমাকে উদ্ধার করতাম না।

ওবরস্কি বলল, কেন?

টারজন বলল, তোমাদের দলনেতা লোকটা বড় খারাপ। সে নিগ্রোভৃত্যদের প্রায়ই চাবুক মারত।

ওবরস্কি বলল, লোকটাকে আমিও দেখতে পারতাম না। শুধু টাকার জন্য ছবিতে অভিনয় করতে আসি আমি। লোকটা পরিচালক হিসাবে খুব নামকরা। তবে বড় মদ খায় আর মদ খেয়েই চাবুক মারত লোকগুলোকে।

ইয়াদ নামে এক আরব যুবক আতুইকে বলল, এই মেয়েটাকে ধবে এনে আমার মনে হয় ভুল করেছে শেখ। শ্বেতাঙ্গরা রাইফেল নিয়ে আমাদের ধরতে আসবে।

আতুই বলল, হীরের দেশের উপত্যকা আমরা কোনদিন খুঁজে না পেলেও আমরা শুধু হাতে দেশে ফিরে যাব না। মেয়েছুটো বিক্রি করে দিলে মোটা দাম পাওয়া যাবে। এমন কি ওদের দলের শ্বেতাঙ্গরাও মুক্তিপণ হিসাবে অনেক টাকা দিয়ে ফিরিয়ে নিতে পারে ওদের। তাছাড়া ম্যাপটাতে ইংরিজি ভাষায় যেসব কথা লেখা আছে তা পড়ার জন্য মেয়েছুটোর দরকার। আমি ইংরিজি বলতে পারি। কিন্তু পড়তে বা লিখতে পারি না।

সকাল থেকে সারাটা দিন ধরে অশ্বারোহী আরবরা ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছিল মেয়েছুটোকে নিয়ে। নাওমি একসময় রোণ্ডাকে বলল, আর আমি হাঁটতে পারছি না। আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ব।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লে শেখ শিবির স্থাপন করল পথের ধারে এক জায়গায়।

সন্ধ্যের পর শেখ আতুইকে ম্যাপটা আনতে বলল। বলল, আমাকে বুঝিয়ে দাও কোথায় হীরকদেশেব উপত্যকাটা আছে আব সেখানে যাবাব পথটাই বা কোনদিকে।

আতুই আবার রোণ্ডাকে ডাকল।
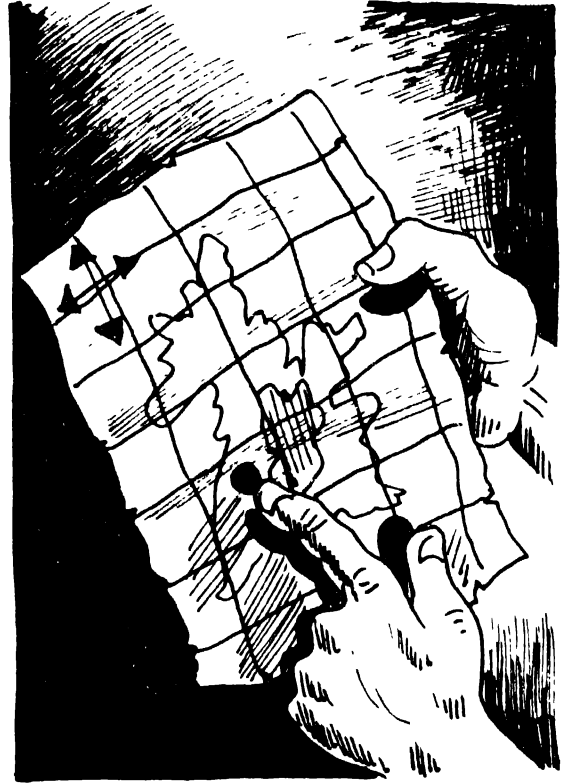
বোণ্ডা ম্যাপটা দেখে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, কোথায় হীরকদেশ? ও ত কল্পনা। আমাদের যে ছবি হবে তাতে ঐ ধরনেব জায়গাব একটা কল্পনা করা হয়েছে।

আতুই বলল, দেখ, বেদুইনদের তুমি ঠকাতে পারবে না। তুমি যদি আমাদের এটা দেখিয়ে না দাও তাহলে তোমার গলা কেটে দেব।

নাওমি ভয়ে শিউরে উঠে রোণ্ডাকে বলল, তুমি ওদের বুঝিয়ে দাও। কেন এমন করছ?

বোগু তখন ম্যাপটার উপর ঝুঁকে পড়ে শেখকে বোঝাতে লাগল। এক জায়গায় হাত দিয়ে বলল, এটা হলো উত্তর দিক। এটা হলো হীরক-দেশের উপত্যকা। এখানে কতকগুলো তীর রয়েছে। এগুলো হচ্ছে পথনির্দেশ। উপত্যকায় যাবার পথ। উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটা নদী রয়েছে। সেই নদীটা আবার আর একটা বড় নদীতে পড়েছে। এখানে এক নরখাদক উপজাতিদের বস্তী আছে।

শেখ একটা আঙুল দিয়ে বলল, এটা বোধ হয় ওম্বাম্বি জলপ্রপাত আর এটা হলো বানস্টোদের গা। আগামীকাল আমরা এই নদীটা পেরিয়ে ফাঁকা প্রান্তরটায় গিয়ে পড়ব। তারপর একটা রুক্ষ পাহাড় পাব।

আরবরা মেয়েদের শোবার জন্য একটা তাঁবুর ঘরে কম্বল বিছিয়ে দিল। বোগুর চোখে কিন্তু ঘুম এল না। সে একসময় নাওমিকে বলল, ওরা যখন সত্যি সত্যিই হীরের দেখা বা খোঁজ পাবে না, তখন আমাদের উপর ক্ষেপে যাবে। আমাদের তখন যেখানে হোক বিক্রি করে দেবে। সুতরাং এখনি আমাদের পালিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।

নাওমি বলল, সে কি, এই রাত্রিতে বনের ভিতর দিয়ে কি করে পালাবে? যাই হোক, তোমার মতলবটা কি?

বোগু বলল, তুমি শুধু আমাকে অনুসরণ করে যাবে। কোন কথা বলবে না।

আতুই বলল, কাল যদি ওখানে যেতে পারি তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আমরা হীরকদেশের উপত্যকায় গিয়ে পড়ব।

শেখ আতুইকে কি বলতে বোগু তাকে জিজ্ঞাসা করল শেখ কি বলল।

আতুই বলল, শেখ বলছে হীরকদেশে গিয়ে অনেক হীরে পেলে সে ধনী হবে। তখন সে তোমাদের দুজনকেই রেখে দিতে পারবে। সে তখন আর বিক্রি করবে না তোমাদের।

এই বলে সে উঠে দেখল আরবরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। একজন পাহারাদার শুধু আগুনের ধারে জেগে আছে। সেও তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে ঝিমোচ্ছে।

বোগু চুপি চুপি উঠে গিয়ে একটা জ্বলন্ত কাঠ এমনভাবে সজোরে প্রহরীটার উপর গুঁজে ধরল যে, সে সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হয়ে পড়ে গেল।

বনের মধ্যে অশ্বারোহীদের যাবার মত যে একটা পথ ছিল সেই পথ ধরে ওরমান আর বিল ওয়েস্ট এগিয়ে চলেছিল।

ওরমান একসময় বলল, আমি ভেবেছিলাম একদিনের মধ্যেই আরবদের দেখা পেয়ে যাব এবং দেখা করেই শিবিরে ফিরে আসব। কিন্তু এবার দিন কেটে গেল। আর কোন আশাই নেই। এখন আমাকে ফিরে গিয়ে আমার চাচা লর্ডের বাড়ি পাঠাবার কথা ভাবতে হবে।

ওরা বুঝতে পারল ওরা পথ হারিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ ওয়েস্ট বলল, কিসের একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে কে যেন আসছে।

ওরমান বলল, ওটা একটা সিংহ হলে মুশকিল হবে। কারণ এখানে পথটা সরু এবং দুধারে ঘন ঝোপ।

ওরমান আগে গুলি করল। গুলিটা সিংহটার মাথার খুলিতে লাগল। বিলের গুলি লাগল না। সিংহটা ক্ষেপে গিয়ে ওরমানকে আক্রমণ করল। ওয়েস্ট হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু ওরমানকে কোনভাবে আহত করবার আগেই একটা গাছ থেকে টারজন সিংহটার উপর অতর্কিতে লাফিয়ে পড়ে তার কেশর ধরে বারবার ছুরি বসাতে লাগল তার গায়ে। সিংহটা মারা গেলে তার মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে বিজয়সূচক এক চীৎকার করল। ওরমান আর ওয়েস্ট অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তারা কোন ধন্যবাদ দেবার আগেই টারজন অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে।

প্রহরীটাকে মেরে রোণ্ডা শিবিরের সব ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিল। তাদের জন্য দুটো ঘোড়াকে বেছে নিয়ে নিজে একটাতে চেপে অন্যটাতে নাওমিকে চাপাল। অন্য ঘোড়াগুলোকে বনের মধ্যে তাড়িয়ে দিল। ঘোড়াগুলো ছাড়া পেয়ে এদিক সেদিক ছুটে পালাতে লাগল।

ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে বনপথ ধরল ওরা।

কিছুদূর যাবার পর তারা একটা নদীর সামনে এসে পড়ল। নদীটা কিভাবে পার হতে হবে তা বুঝতে পারল না।

রোণ্ডা বলল, নদীটা পার হতে হবে। এখন ফিরে গেলে আরবদের কবলে পড়ব আমরা। আমার সঙ্গে সঙ্গে এস। নদীটা তেমন চওড়া বা গভীর নয়। ঘোড়াগুলোকে নামিয়ে দিলে ঠিক পার হয়ে যাব।

নদী পার হতেই সকাল হয়ে গেল। দূরে সামনে পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। নদীটার এপারে ফাঁকা মাঠ। মাঝে মাঝে কিছু গাছপালা ছড়িয়েছিল।

নদী পার হয়ে ওরা আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল। সহসা সামনে কতকগুলো গাছের ওধার থেকে একটা সিংহের গর্জন শোনা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সিংহটা ওদের সামনে এসে রোণ্ডার ঘোড়াটাকে আক্রমণ করল আগে। রোণ্ডা ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মরার মত শুয়ে রইল স্থির হয়ে। সিংহটা ঘোড়াটাকে মেরে তার উপর থাবা গেড়ে বসে রইল। এদিকে সিংহটা রোণ্ডার ঘোড়াটাকে মারতে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে নাওমির ঘোড়াটা তীরবেগে পিছন দিকে ঘুরে পালিয়ে গেল। নদী

পার হয়ে যে পথে এসেছিল ওরা, সেই পথেই পালাতে লাগল ঘোড়াটা। নাওমি তার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারল না কোনভাবে। নাওমি একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল সিংহটা সেইভাবে বসে আছে ঘোড়ার মৃতদেহটার উপর আর তার অদূরে রোণ্ডা তেমনি শুয়ে আছে নিস্পন্দ হয়ে।

এদিকে ওরমান আর বিল ওয়েস্ট পথ হারিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে অনেক ঘুরে বেড়াল। কিন্তু কোন পথ খুঁজে পেল না। ওরা হারানো মেয়ে-দুটোর খোঁজে বেরিয়েছে দু'সপ্তাহ হয়ে গেল। কয়দিন কিছুই খাওয়া হয়নি। আজ আবার পথে সিংহ ওদের আক্রমণ করায় ভয় পেয়ে গেছে দুজনেই।

ওরমান বলল, আমি ভূত বিশ্বাস করি না। ওবরস্কি ভূত নয়, ওবরস্কি নিজেই আমাদের উদ্ধার করে চলে গেছে। তবে তার মাথার ঠিক নেই। সে পাগল হয়ে গেছে বলে গায়ে তার জোর অনেক বেড়ে গেছে এবং সে আমাদের চিনতে পারেনি।

ওয়েস্ট বলল, ওবরস্কি যাই করুক সে শুধু আমাদের বাঁচায়নি, সে আমাদের আর একটা উপকার করে গেছে সিংহটাকে মেরে।

ওরমান বুঝল সিংহটার মাংস খাবার কথা বলছে ওয়েস্ট।

ওরা দুজনে বসে ছুরি দিয়ে সিংহটার মৃতদেহ কেটে পেট ভরে মাংস খেল এবং অনেকটা মাংস কেটে সঙ্গে নিয়ে নিল। মাংস খেয়ে কিছুটা গায়ে বল পেল ওরা।

সন্ধ্যার দিকে ওয়েস্ট হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ওরমানকে কি দেখাল। ওরমান তা দেখে বলল, ও হচ্ছে ঈয়াদ নামে সেই আরবটা। কিন্তু ওর সঙ্গে ত দলের অন্য কেউ নেই। ও এক জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে একা বসে আছে তার পাশে।

ওরমান আর ওয়েস্ট রাইফেল হাতে এগিয়ে গেল। ওদের দেখে ঈয়াদও রাইফেল তুলে গুলি করতে গেল। কিন্তু তার আগেই ওরমান ওকে লক্ষ্য করে রাইফেল তুলে ধরেছে। সে ধমক দিয়ে বলল, বন্দুক নামাও।

ঈয়াদ বাধ্য হয়ে এবার বন্দুক নামাল।

ওরমান ওকে জিজ্ঞাসা করল, শেখ আবেল বেনেম কোথায়? আমাদের দল থেকে যে মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়েছিলে তারাই বা কোথায়?

ঈয়াদ শুধু নামগুলো ছাড়া ওদের কোন কথা বুঝতে পারল না। সে ইংরিজিতে কথা বলতে জানে না, আতুই জানত। সে হাবভাবে ও ইশারা করে বুঝিয়ে দিল, একটা মেয়েকে সিংহতে খেয়েছে। সে ছাড়া বাকি আরবদলের সবারই অবস্থা খুব খারাপ। তারা সবাই বিপদাপন্ন।

ওরা বুঝল ঈয়াদ নিশ্চয়ই কোন বিপদ থেকে বাঁচার জন্য দল ছেড়ে একাই পালিয়ে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে। না খেতে পেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

একটা নদীর ধারে সন্ধ্যার সময় শিবির স্থাপন করল ওরা। ওদের সঙ্গে যে মাংস ছিল তা রান্না করল ওরমান। ঈয়াদ ওদের সঙ্গেই রয়ে গেল। ওরমান বলল, আগামীকাল সকালে আমরা আমাদের সফরির খোঁজে বার হব। ঈয়াদ আমাদের কাছে থাকবে পথ দেখাবার জন্য।

এদিকে ওদের শিবিরের কাছ থেকে ওদের

অলক্ষ্যে অগোচরে টারজন কখন ওদের দেখে গেছে তা বুঝতে পারেনি ওরা। টারজন সেই রাতেই ওররস্কির কাছে গিয়ে বলল, আমি তোমাদের দুজন সঙ্গীকে দেখে এসেছি তাদের নাম ওরমান আর ওয়েস্ট। তাদের সঙ্গে একজন আরবও ছিল। আমাদের এখান থেকে উত্তর দিকে কয়েক মাইল দূরে।

ওররস্কি বলল, মেয়েদের দেখনি?

টারজন বলল, না, কালই তোমায় ওরমানের কাছে নিয়ে যাব। সেখানে গেলেই জানতে পারবে সবকিছু।

সেদিন সিংহটার আক্রমণের পর চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল রোণ্ডা ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে। চেতনা ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকাতেই সে দেখল একটা সিংহ তার মরা ঘোড়াটার উপর একটা পায়ের থাবা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তখন ভয়ে আবার চোখ বন্ধ করল।

সিংহটা এবার তার কাছে এসে তার দেহটাকে শুঁকতে লাগল। রোণ্ডা যতদূর পারল শ্বাসরুদ্ধভাবে মরার ভান করে রইল। সে জানত সাধারণতঃ মরা মানুষকে কোনরকম পীড়ন করে না সিংহরা। দেখল কিছুক্ষণ পর ঘোড়ার মৃতদেহটা টানতে টানতে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেল সিংহটা।

রোণ্ডা শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করতে লাগল সিংহটাকে। সে দেখল কাছে একটা গাছ রয়েছে। গাছটায় কোনরকমে একবার উঠতে পারলেই আপাততঃ মুক্তি পাবে সিংহটার কবল থেকে। সিংহটা মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকে দেখছিল।

সিংহটা যখন অন্যদিকে তাকিয়ে বসেছিল তখন রোণ্ডা ছুটে গিয়ে গাছটার একটা ডাল ধরে ফেলল। ক্রমে সে গাছের উপরে উঠে গেল। সিংহটাও ততক্ষণে একটা লাফ দিয়ে তাকে ধরতে গিয়ে তার নাগাল পেল না। গাছের উপর চারদিকে তাকাতে লাগল রোণ্ডা। দেখল তার উত্তরপূর্ব দিকে এক বিশাল প্রান্তর বিস্তৃত হয়ে আছে। প্রান্তরটার মাঝে মাঝে আছে কিছু কিছু গাছের জটলা।

প্রান্তরটা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে একটা পাহাড়ে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। সহসা তার আতুই-এর একটা কথা মনে পড়ে গেল। ঐ পাহাড়ের নিচে উপত্যকাটার শেষ প্রান্তে একটা জলপ্রপাত আছে। তার নাম ওম্বাম্বি জলপ্রপাত। তার মনে হলো ঐ জলপ্রপাতের কাছে কোনরকমে গিয়ে পড়তে পারলেই সে তার সঙ্গীদের দেখা পাবে। ওরমান ওখানেই যেতে বলেছিল। এক নতুন আশার আলো দেখতে পেল রোণ্ডা।

প্রায় একঘণ্টা কেটে গেল। তারপর রোণ্ডা দেখল সিংহটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে যে নদীটা তারা পার হয়ে এসেছে সেই নদীর ধারে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। রোণ্ডা দেখল এই হচ্ছে সুযোগ। সে তাই গাছ থেকে নেমে উপত্যকার উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল সামনের পাহাড়টাকে লক্ষ্য করে। একবার পিছন ফিরে দেখল সিংহটা আর আসছে না তার পিছনে। ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছিল সে।

ক্লান্তি ও দুর্বলতায় আর পথ চলতে পারছিল না বোণ্ডা। একসময় একটা পাথরের উপর বসে পড়ল। এমন সময় তার পিছনে কে ইংরাজিতে বলল, ও একা আছে। ওকে আমরা আমাদের দেবতার কাছে নিয়ে যাব।

বোণ্ডা মুখ ঘুরিয়ে দেখল দুটো গোরিলা মানুষের মত কথা বলছে।

একটা লোমশ হাত বোণ্ডাকে ধরে ফেলল। একটা গোরিলা তাকে বলল, এস আমাদের সঙ্গে। আমরা তোমাকে আমাদের দেবতার কাছে নিয়ে যাব।

বোণ্ডা গোরিলাদুটোর কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগল। কিন্তু পারল না। একজন গোরিলা তাকে শক্ত করে ধরে পথ চলতে লাগল।

পথের মধ্যে দুজন গোরিলা ঝগড়া শুরু করে দিল নিজেদের মধ্যে। যে গোরিলাটা বোণ্ডাকে ধরেছিল সে বলল, সে তাকে তাদের দেবতার কাছে নিয়ে যাবে।

নাওমির ঘোড়াটা ঊর্ধ্বশ্বাসে আরবদের শিবিরের দিকে ছুটতে লাগল। নাওমি ঘোড়াটার লাগাম টেনে তার গতিটা অন্য দিকে ঘোরাবার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু ঘোড়াটা তাকে সোজা আরবদের শিবিরে নিয়ে গেল। আতুই তাকে দেখতে পেয়ে আবার বন্দী করে ফেলল।

নাওমিকে দেখে খুশি হলো শেখ। সে বলল, অন্য মেয়েটি কোথায়?

নাওমি বলল, সিংহ তাকে খেয়ে ফেলেছে।

শেখ বলল, ঠিক আছে। তুমি হলেই চলবে। আমাদের কাছে ম্যাপটা আছে। তাই আমাদের হীরকদেশের উপত্যকায় নিয়ে যাবে।

নাওমি বলল, আমি যদি তোমাদের সেখানে নিয়ে যাই তাহলে বল আমাকে মুক্তি দেবে? আমার সঙ্গীদের কাছে পাঠিয়ে দেবে?

শেখ আতুই-এর মাধ্যমে কথাটা শুনে বলল, ওকে বল তাই করব। কিন্তু আমরা হীরে পেয়ে গেলেও ওকে ছাড়ব না। একথা যেন ওকে কিন্তু বলো না।

তখন বিকাল হয়ে গিয়েছিল। আরবরা নদীর ধারে গিয়ে সে রাতটার মত ওখানেই শিবির স্থাপন করল। পরদিন সকালেই ওরা আবার যাত্রা শুরু করল। নাওমি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। নদীটার ধারে ধারে সরু পথটা ধরে ওরা এগোতে লাগল।

কিন্তু নদীটা বড় খরস্রোতা এখানে। তার উপর জলে অনেক কুমীর আছে। কোনখান থেকে নদীটা পার হওয়া সহজ হবে তা দেখতে গিয়ে দুটো দিন কেটে গেল ওদের। তারপর একটা জায়গা ওরা নির্বাচন করল। কিন্তু সেখান থেকেও নদী পার হতে গিয়ে সকাল থেকে প্রায় সারাদিন কেটে গেল। কিন্তু ওরা যখন নাওমিকে নিয়ে নদীর ওপারে গিয়ে পৌঁছল তখন দেখা গেল ওদের দুজন লোক মারা গেছে এবং তাদের ঘোড়াদুটোকে কুমীরে ধরে নিয়ে গেছে।

নদীর ওপারে গিয়ে ওরা একটা চওড়া রাস্তা দেখতে পেল। সেই পথ ধরে ওরা যেতে লাগল।

আতুই নাওমির পাশে পাশে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল। একসময় আতুইকে দেখাল নাওমি, ঐ দেখ, লাল গ্র্যানাইট পাথরের একটা স্তম্ভ। ম্যাপে ওটা দেখানো আছে। ওর পূব দিকেই আছে হীরকদেশের উপত্যকায় যাবার প্রবেশ পথ।

আতুইয়ের মুখে হাসি ফুটে উঠল কথাটা শুনে।

নাওমি বলল, আমি আমার কথামত কাজ করেছি। তোমরা তোমাদের কথামত কাজ করো। আমাকে আমার সঙ্গীদের কাছে পাঠিয়ে দাও।

আতুই বলল, থাম, এখন নয়। এখনো আমরা উপত্যকায় পৌঁছইনি।

পরদিন সকালেই টারজন তার কথামত ওবমান আর ওয়েস্টের সন্ধানে বার হতে চাইল। কিন্তু ওবরস্কি হঠাৎ জ্বরে পড়ে গেল। সে শুয়ে শুয়ে জ্বরের ঘোরে ভুল বকতে লাগল।

অবশেষে সে ওবরস্কিকে কাঁধে তুলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। সারাদিন ধরে ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে এগোতে লাগল।

দিনের শেষে একটা গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছল টারজন। ওবরস্কির তখনো জ্ঞান ফিরে আসেনি। টারজনের থাকার জন্য একটা কুঁড়েঘর দিয়েছিল গাঁয়ের সর্দার পুন্দ্র। সেই ঘরে ওবরস্কিকে শুইয়ে দিয়ে নিজে পেটভরে খেয়ে নিল টারজন। তারপর একাই উত্তর দিকের একটা বনপথ ধরে হাঁটতে লাগল। তখন গোধূলি হয়ে গেছে।

এদিকে সেই গোরিলাদের পার্বত্য নগরীর প্রাসাদঅন্তঃপুরে বন্দী অবস্থায় সাতদিন কাটাল রোণ্ডা। রাণীরা তাকে ভাল চোখে কেউ না দেখলেও কনিষ্ঠা রাণী ক্যাথারিন পার তাকে ঘৃণা করত সবচেয়ে বেশী। কারণ রাজা রোণ্ডাকে বিয়ে করলে তার আদর একেবারেই কমে যাবে রাজার কাছে।

ক্যাথারিন বলল, আমরা সব মিলিয়ে ছ'জন রাণী। তাদের নাম হল ক্যাথারিন অফ আরাগন, এ্যানি বোলিন, জেন সেমুর, এ্যানি অফ ক্লীভস্, ক্যাথারিন হাওয়ার্ডে ও ক্যাথারিন পার।

রোণ্ডা বলল, আজ হতে চারশ' বছর আগে ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরির রাণীদের এই সব নাম ছিল।

ক্যাথারিন পার বলল, এটা হলো ইংলণ্ড এবং আমাদের বিয়ের পর এই সব নাম দেওয়া হয়েছে।

রোণ্ডা বলল, তোমাদের দেবতা কোথায় থাকে?

ক্যাথারিন পার বলল, ঐ প্রাসাদটায়। ওর ভিতরটায় কোনদিন ঢুকিনি। তাঁকে দেখিওনি কখনো। তবে শুনেছি তিনি নাকি খুবই বৃদ্ধ। দেবতার কাছে কেবলমাত্র রাজা আর তাঁর সামন্তরা ছাড়া কেউ যেতে পারে না।

এমন সময় বাইরে তুমুল গোলমালের শব্দ শোনা গেল। জানালা দিয়ে ক্যাথারিন পার আর রোণ্ডা উঁকি মেরে দেখল প্রাসাদের উঠোনে দুদল গোরিলা লড়াই করছে ভয়ঙ্করভাবে।

ক্যাথারিন বলল, উলসিব দলেব গোবিলারা উলসিকে টাওয়ার থেকে মুক্ত কবে এনেছে। রাজার দলের গোরিলাদেব সঙ্গে উলসিব দল তাই লড়াই কবছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লড়াইটা অন্তঃপুরেব বাবান্দায় চলে এল। হঠাৎ ঘবেব দরজা ঠেলে একদল পুরুষগোবিলা ঘবে ঢুকল। তাদের নেতা ঘবে ঢুকেই বলল, সেই লোমহীন মেয়েটা কোথায় ?

এই বলে সে রোণ্ডাব কাছে এসে তার হাতেব কব্জিটা ধরে টানতে টানতে তাকে নিয়ে গেল। বলল, এস, দেবতা তোমায় ডেকে পাঠিয়েছে।

আরবরা সরু পথটা ধরে এগিয়ে যেতে থাকল। আতুই নাওমির পাশে পাশে তার ঘোড়াকে চালাতে লাগল। সে যে হীরকদেশে যাবে এবং সেখানে গিয়ে অনেক হীবে ও ধনরত্ন পাবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না তাব।

ক্রমে পথটা উঁচু হতে হতে একটা খাড়াই পাহাড়ের সামনে এসে পড়ল ওরা। আব ঘোড়া চালানো সম্ভব নয়। এবাব পায়ে হেঁটে সাবধানে পাহাড়টা পার হয়ে ওধারেব উপত্যকাটায় পৌছতে হবে।

ঈয়াদ সেইখানে ঘোড়ায় চেপে প্রতীক্ষায় রইল। শেখরা পা টিপে টিপে পাহাড়ে উঠতে লাগল। সহসা ঈয়াদ নীচে থেকে দেখতে পেল পাহাড়ের গা দিয়ে যে পথে শেখরা যাচ্ছিল সেই পথের ধারে ও উপরে ঘন বাঁশবন ছিল। সেই বাঁশবন থেকে মানুষেব মত অনেকটা 'দেখতে কালো লোমওয়ালা একটা গোবিলা মুখ বাড়িয়ে উঁকি মেরে শেখদের দেখতে লাগল। এমনি কবে পব পর কয়েকটা গোরিলা বাঁশবন থেকে বেবিয়ে এসে গর্জন করতে করতে আববদেব সামনে এসে দাঁড়াল। ঈয়াদ নিচে থেকে চীৎকাব কবে শেখকে সাবধান করার চেষ্টা কবলেও তখন কোন উপায় ছিল না।

আরববা পব পব গুলি কবতে লাগল। তাতে দু-চারটে গোবিলা মাবা গেল। জনকতক আহত হলো। কিন্তু বাকি সব গোবিলাগুলো আববদেব হাত থেকে সব বন্দুক কেড়ে নিয়ে সেগুলা ভেঙ্গে ফেলে দিল। তাবপব তাবা আববদেব ধবে তাদেব ঘাড়ে কামড় দিতে লাগল আর তাদের হাতেব কুড়ুল আর লাঠি দিয়ে আঘাত কবতে লাগল। বাকিংহাম নামে যে গোবিলাটা আগে রোণ্ডাকে ধবেছিল সেই গোবিলাটা নাওমিকে তুলে নিয়ে পালাতে লাগল।

ঈয়াদ দেখল দুজন গোবিলা তাকে ধরাব জন্য পাহাড়েব উপর থেকে নেমে আসছে। সে তখন সেখানে আব না দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে ছুটিয়ে দিল পিছন দিক দিয়ে।

গোরিলাদেব হাতে ধবা পড়ে ভয়ে নাওমিব বক্ত হিম হয়ে যেতে লাগল। আরবদের থেকে এবা আরো ভয়ঙ্কব।

এদিকে পুঙ্গুব গাঁয়ে ওববস্কিকে রেখে দিয়ে ওরমানদের খোঁজে জঙ্গলে ক্রমাগত গাছেব ডালে ডালে এগিয়ে যেতে থাকল টারজন। বাতটা সে একটা গাছে কাটিয়ে সকালে আবার বওনা হলো। কিছুদূর যাওয়ার পব বাতাসে শ্বেতাঙ্গদেব গন্ধ পেল।

পথে একটা হরিণ দেখতে পেয়ে সেটাকে শিকার

করল টারজন। তার অল্প কিছু দূরেই ওরমান আর ওয়েস্ট সেই পথে আসছিল।

হঠাৎ ওরমান ওয়েস্টকে বলল, কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ওয়েস্ট বলল, নিশ্চয় কোন জন্তু।

ওরমান বলল, ওবরস্কি আসছে।

ওয়েস্ট দেখল ওবরস্কির মত অবিকল দেখতে একটা লোক কাঁধের উপর একটা মরা হরিণ নিয়ে তাদের দিকে আসছে।

টারজন দেখল, ওরা দুজনেই তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

টারজন বলল, তোমবা নিশ্চয় খুবই ক্ষুধার্ত।

ওরমান বলল, ওবরস্কি তুমি?

টারজন বলল, তুমি কি ভেবেছিলে আমি ভূত?

টারজন তার নিজের পবিচয় না দিয়ে বলল, আমি তোমাদের দলের মেয়েদের খোঁজ করছি। তোমাদেব দলের বাকি সবার খবর কি?

ওরমান বলল, তারা এখন কোথায় আছে কিছুই জানি না আমরাও মেয়ে দুটির খোঁজ কবছি। আমরা এই আববটিকে ধরেছি। এর কাছে জানতে পারি একটি মেয়ে সিংহেব কবলে পড়ে মারা যায়। অন্যটির ও আরবদের কি অবস্থা হয়েছে তা ও জানে না।

টারজন তখন আরবী ভাষায় ঈয়াদকে প্রশ্ন কবতে সে বলল, একটা মেয়ে সিংহের হাতে ধবা পড়ে। অন্যটিকে গোরিলাদের হাতে ধরা পড়তে দেখেছি আমি। গোবিলারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে তার পূর্ণ বিবরণ জেনে নিল টারজন ঈয়াদের কাছ থেকে। তারপর সে ওরমানকে বলল, মনে হয় ও সত্য বলছে। যাই হোক, আমি এখনি সেই উপত্যকায় গিয়ে দেখব।

এই বলে আবার গাছের উপর লাফ দিয়ে উঠে কোথায় চলে গেল টারজন।

ওরমান আর ওয়েস্ট সেইদিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

এদিকে বাকিংহাম নামে সেই গোরিলাটা নাওমিকে নিয়ে দক্ষিণ দিকের পাহাড়টা পার হয়ে উপত্যকাটাব দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ যাওয়াব পর ওবা দেখল আব একটা গোরিলা ওদের তাড়া করে আসছে। বাকিংহাম নাওমিকে কাঁধে তুলে নিয়ে একটা বনে ঢুকে পড়ল।

বন থেকে ছুটে গিয়ে একটা পাহাড়ের গুহাব সামনে এসে বাকিংহাম বলল, তুমি এখানে থাক। আমি সাফোককে মেরে তাড়িয়ে দিয়ে আসছি।

নাওমি সেই গুহাটায় একা রয়ে গেল। গুহার কাছে একটা ছোট ঝর্ণা ছিল। তাব জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটাল সে। এইভাবে দুটো দিন দুটো রাত কাটানোর পর তৃতীয় দিনে বাকিংহাম গুহাটায় ফিবে এসে বলল, তাড়াতাড়ি করে তুমি আমার পিঠে চাপ।

নাওমিকে পিঠে চাপিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল বাকিংহাম। অনেকক্ষণ ধরে এইভাবে যাবার পর পিছনে কার গর্জন শুনে থমকে দাঁড়াল। দেখল নগ্নদেহ এক শ্বেতাঙ্গ তার কাছে এসে পড়েছে।

নাওমি টারজনকে দেখে ওবরস্কি ভাবল। বলল, স্ট্যানলি, তুমি আমাকে বাঁচাও।

টারজন বাকিংহামকে বলল, তুমি চলে যাও বোলগানি। এ মেয়ে আমার। তোমাকে খুন করে ফেলব।

বাকিংহাম ইংরিজিতে কথা বলায় আশ্চর্য হয়ে গেল টারজন। সে তাকে আক্রমণ করতে তার পিঠের উপর চড়ে তার ঘাড়টা ধরল। টারজনের সঙ্গে লড়াই করার জন্য নাওমিকে এক জায়গায় নামিয়ে দিয়েছিল বাকিংহাম। সেখান থেকে ওদের লড়াই দেখতে লাগল।

হঠাৎ টারজন তার ছুরিটা বার করে বারবার বসিয়ে দিতে লাগল বাকিংহামের বুকে। অবশেষে বাকিংহাম নিষ্প্রাণ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে টারজন নাওমিকে নিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

নাওমি ক্ষুধায় ও দুর্বলতায় কথা বলতে পারছিল না। তাকে কাঁধের উপর তুলে পথ হাঁটছিল টারজন। নাওমি বলল, কোথায় যাবে এখন স্ট্যানলি?

টারজন বলল, জলপ্রপাতের কাছে ওরমান আর ওয়েস্ট অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

নাওমি বলল, তারা তাহলে এখনো বেঁচে আছে?

টারজন বলল, তারা তোমার খোঁজ করছিল। বোওকে বোধহয় সিংহতে খেয়েছে।

নাওমি হাত বাড়িয়ে গোরিলাদের নগরটাকে দেখিয়ে বলল, না, বোওকে গোরিলারা ধরে নিয়ে গিয়ে ঐ নগরের মধ্যে একটা পাথরের প্রাসাদে বন্দী করে রেখেছে। গোরিলাটা আমায় বলছিল, সে ওদের দেবতার কাছে আছে।

পথে এবার সেই নদীটা পেল ওরা। টারজন এক জায়গায় নাওমিকে ধরে সাঁতার কেটে সহজেই নদী পার হলো। নাওমি আশ্চর্য হয়ে গেল।

জলপ্রপাতটার কাছে গিয়ে টারজন নাওমিকে দেখাল পাহাড়ের তলায় তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। টারজন বলল, ওরা হলো ওরমান, ওয়েস্ট আর ঈয়াদ নামে একটা আরব।

ওরমান ওদের দেখতে পেয়ে ছুটে এল। নাওমিকে জড়িয়ে ধরলে তার চোখে জল এল।

টারজন বলল, আমাকে ওদের নগরটাকে দেখতে হবে। অনেককিছু জানতে হবে।

তখন অন্ধকার হয়ে আসছিল। সন্ধ্যার সেই ঘনায়মান অন্ধকারে ওদের বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল টারজন। সে খাড়াই পাহাড়টার গা বেয়ে অবলীলাক্রমে উঠে যেতে লাগল।

ওয়েস্ট সেইদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, আমিও যাব।

সেই পাহাড় আর উপত্যকা পার হয়ে প্রাচীরঘেরা একটা নগর দেখতে পেল টারজন। টারজন প্রাচীরটা পার হয়ে নগরমধ্যে পড়ল। ভিতরটা অন্ধকার। কোন গোরিলাকে কোথাও দেখতে পেল না। একটা বড় বাড়িতে আলো দেখতে পেল টারজন। সে অনুমান করল ঐটাই বোধহয় দেবতার প্রাসাদ, যার কথা নাওমি তাকে বলেছিল। প্রাসাদটা পাহাড় কেটে নির্মাণ করা হয়েছে।

টারজন অন্ধকারে নগরটার একধার দিয়ে চলে যাওয়া পথটা ধরে প্রাসাদটার দিকে এগিয়ে চলল।

প্রাসাদের একটা ঘরে মাত্র আলো জ্বলছিল। প্রাসাদের গেটে কোন পাহারা ছিল না।

প্রাসাদের ভিতর ঢুকে পর পর কয়েকখানা ঘর দেখতে পেল টারজন। কিন্তু হাত দিয়ে দেখল প্রতিটি ঘরের দরজায় তালা লাগানো আছে। একটা ঘরে তালা ছিল না। সেই ঘরে ঢুকে সে একটা সিঁড়ি পেল। সিঁড়িটা নিচে নেমে গেছে। সিঁড়িটা দিয়ে নিচে নেমে গিয়ে একটা সরু টানা বারান্দা পেল। তারপর একটা দরজা। দরজাটায় চাপ দিতেই সেটা খুলে গেল। কিন্তু টারজন খোলা দরজা দিয়ে একটা লম্বা ঘরে ঢুকে পড়তেই পিছন থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। টারজন হাত দিয়ে দেখল সেটা আর খুলছে না। ঘরখানার মধ্যে একটা মশালের আলো জ্বলছিল। মশালটা ঘরের এককোণে ছিল। টারজন দেখল নাওমির মত দেখতে এক সুন্দরী যুবতী তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে।

এমন সময় দরজা খুলে স্বয়ং রাজা হেনরি বোণ্ডাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য ঘরে ঢুকল। রাণীরা তখন ভয়ে বোণ্ডার কাছ থেকে সরে গেল। হেনরি সোজা বোণ্ডার কাছে এসে বলল, দেবতা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে। কিন্তু সে তোমাকে পাবে না। তুমি আমার।

এই বলে হেনরি বোণ্ডাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে প্রাসাদের সুড়ঙ্গপথ দিয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে একটা ঘর ছিল। সেখানে গিয়ে হেনরি বলল, এদিকে কেউ আসতে পারে না।

ঘরটা থেকে বেরিয়েই উপত্যকায় গিয়ে পড়ল হেনরি। একটা নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে বোণ্ডাকে নামিয়ে দিল।

নদীর ধার দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে নদীটা পার হলো হেনরি। সে বোণ্ডার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে।

টারজন তার দিকে এগিয়ে যেতে মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলল, স্ট্যানলি ওবরস্কি, তুমিও এখানে বন্দী হয়েছ?

হঠাৎ জোর গোলমালের শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠল বোণ্ডা টেরী। জানালা দিয়ে দেখল, প্রাসাদের উঠোনে রাজা হেনরীর গোরিলাদের সঙ্গে দেবতার গোরিলাদের জোর লড়াই হচ্ছে। রাজার দল ক্রমশই হেরে যাচ্ছিল।

হঠাৎ একটা সিংহের গর্জন শুনতে পেল গোরিলারাজা হেনরি। ঘন কুয়াশায় ছেয়েছিল সমস্ত উপত্যকাটা। কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

এবার সিংহটা খুব কাছে এসে পড়াতে বোণ্ডা ভালভাবে দেখতে পেল। তার মনে হলো সিংহটা খুব ক্ষুধার্ত। হঠাৎ হেনরি বোণ্ডাকে তুলে নিয়ে সিংহটার মুখের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কিন্তু বোণ্ডা মরার মত শক্ত হয়ে পড়ে রইল। সে জানত মরা মানুষকে সিংহ মারে না।

হেনরি একা ছুটে পালাচ্ছিল। কিন্তু তার জীবন্ত শিকার পালাচ্ছে দেখে সিংহটা লাফ দিয়ে তাকে ধরে ফেলল। দুজনেই গর্জন করতে লাগল। রোণ্ডা একবার চোখ মেলে দেখল কিছুদূরে কতক-গুলো গাছ রয়েছে। সে আরো দেখল সিংহ গোরিলারাজা হেনরিকে মেরে তার মুখটা চিবিয়ে খাচ্ছে। সে এখন তার শিকারের মাংস নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ভেবে রোণ্ডা উঠে ছুটে গিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বনের মধ্যে ঢুকে একটা নদী পেল রোণ্ডা। সে ভাবল নদীটার পাড় দিয়ে ওম্বাম্বি জলপ্রপাতের কাছে যেতে পারলেই ওর সঙ্গীদের দেখা পাবে।

নিবিড় ক্লান্তিতে পা টেনে টেনে চলছিল রোণ্ডা। হঠাৎ তার সামনে একটা গাছ থেকে আধা-মানুষ আধা-গোরিলার মত একটা ভয়ঙ্কর জন্তুকে নেমে পড়তে দেখে চমকে উঠল সে। সে জন্তুর মুখটা মানুষের মত। কিন্তু দেহ আর কানটা বাঁদরের মত।

রোণ্ডা ভাবল সে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে ওপারে পালিয়ে যাবে। কিন্তু ঝাঁপ দেবার আগেই গোরিলা মানুষটা ধরে ফেলল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ঐ ধরনের গোরিলা-মানুষ গাছ থেকে নেমে রোণ্ডার অন্য হাতটা ধরে ফেলল। দুজন দুদিকে তার দুটো হাত ধরে টানতে লাগল। রোণ্ডার মনে হতে লাগল তার হাত দুটো ছিঁড়ে যাবে।

এমন সময় এক নগ্ন শ্বেতাঙ্গ মানুষ কোথা থেকে এসে তার হাতের মোটা লাঠি দিয়ে গোরিলা দুটোকে মেরে তাড়িয়ে দিল। তারপর সে তার কাঁধের উপর রোণ্ডাকে তুলে নিতেই প্রায় বিশটা গোরিলা এসে ঘিরে ফেলল তাদের। রোণ্ডা দেখল যে মানুষটা তাকে ধরেছিল তার দেহ ও মুখচোখ সত্যিই সুন্দর ও সুগঠিত। তার মাথায় ছিল লম্বা লম্বা চুল। সিংহের কেশরের মত ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল চুলগুলো। গোরিলাগুলো শ্বেতাঙ্গ মানুষটার ভয়ে কেউ রোণ্ডার কাছে আসতে পারছিল না।

ঠিক এই সময়ে কাছের একটা গাছ থেকে উলঙ্গ এক শ্বেতাঙ্গ যুবতী নেমেই ছুটে এল তাদের দিকে।

মেয়েটি আসতেই সকলেই সম্ভ্রমের সঙ্গে পথ ছেড়ে দিল। কিন্তু সেই শ্বেতাঙ্গ লোকটা রোণ্ডাকে কাঁধের উপর চাপিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগল। সেই শ্বেতাঙ্গ মেয়েটিও ছুটতে লাগল লোকটার পিছু পিছু।

টারজন যখন দেখল রাজার গোরিলাদল একে-বারে হেরে গেল এবং দেবতার গোরিলাদলের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে তখন সে গোরিলা দেবতার কাছে গিয়ে তার প্রতিশ্রুতির কথাটাকে স্মরণ করিয়ে দিল। দেবতা গোরিলা তখন পলাতক রাজা হেনরির খোঁজ করছিল। টারজন বলল, আগে সেই বন্দিনীকে খুঁজে বের করতে হবে।

গোরিলাদেবতা টারজনকে সঙ্গে করে জনকতক গোরিলাযোদ্ধা নিয়ে প্রাসাদের অন্তঃপুরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

অন্তঃপুরে ঢোকার মুখে সিঁড়ির কাছে সাক্কোক আর হাওয়ার্ড পাহারা দিচ্ছিল। তারা দুজনেই রাজার দলের গোরিলা হলেও তারা যখন দেখল রাজার দল হেরে গেছে এবং রাজা পালিয়ে গেছে তখন তারা গোরিলাদেবতার বশ্যতা স্বীকার করল। গোরিলাদেবতাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হয়ে বলল, তারা দেবতারই সেবক এবং রাজাকে তারা তাড়িয়ে দিয়েছে প্রাসাদ থেকে।

গোরিলাদেবতা বলল, সেই বন্দিনী মেয়েটি কোথায় ?

সাফোক বলল, অন্তঃপুরে ছিল। হেনবি তাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

কোন্ পথে পালিয়েছে ?

আসুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে সে গোরিলাদেবতা আর টারজনকে নিয়ে সেই গুপ্ত সুড়ঙ্গপথটাব শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেল। তারপর বলল, এইদিকে হেনরি নগরের বাইরে কোথায় চলে গেছে।

টারজন আর না দাঁড়িয়ে তখনি নগবের বাইরে বেরিয়ে পড়ল রোণ্ডার খোঁজে।

আরো এগিয়ে বনের মাঝে গিয়ে টারজন দেখল মাথায় ঝাঁকরা চুলওয়ালা একজন নগ্ন শ্বেতাঙ্গ এক শ্বেতাঙ্গ নারীকে কাঁধের উপর নিয়ে ছুটছে আর এক শ্বেতাঙ্গ নারী সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় তাকে তাড়া করে ছুটছে তার পিছনে।

বনটা পার হয়ে লোকটা একটা পাহাড়ে উঠতে লাগল। সে পিছন ফিরে টারজনকে দেখে বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায় বলল, ফিরে যাও। তা নাহলে তোমাকে মেরে ফেলব।

এবার রোণ্ডাকে চিনতে পেরে বলল, রোণ্ডা !

লোকটা তখন টারজনকে মারার জন্য রোণ্ডাকে পাহাড়ের গায়ে এক জায়গায় নামিয়ে রাখল। টারজন বলল, বোণ্ডা, তুমি পাহাড়ের মাথায় উঠে যাও। আমি ওর সঙ্গে লড়াই কবে ওকে আটকে রাখব।

সেই উলঙ্গ শ্বেতাঙ্গ যুবতী তখন শ্বেতাঙ্গ লোক-টাকে বলল, মেয়েটা পালাচ্ছে, ওকে ধর।

লোকটা তখন টারজনকে ছেড়ে বোণ্ডাকে ধরতে যেতেই টারজন তাকে গিয়ে ধরে ফেলল। লোকটার গায়ে প্রচুর শক্তি থাকলেও টারজন তার মুখে জোরে ঘুষি মেরে তাকে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর বসে আবার তার মাথায় আঘাত করল। কিন্তু তাকে হত্যা করল না। টারজন এবার উঠে দেখল সেই উলঙ্গ মেয়েটা বোণ্ডাকে ধরতে যাচ্ছে। সে তখন মেয়েটাকে ধরে পাহাড়ের মাথায় বোণ্ডাব

কাছে উঠে গিয়ে তার দড়িটা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল তাকে। মেয়েটা অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও পেরে উঠল না টাবজনের সঙ্গে।

টারজন দেখল সেই গোবিলাগুলো এবার পাহাড়ের নিচে থেকে উপরে ওঠাব চেষ্টা করছে। কিন্তু ওরা যেখানে আছে সেখান থেকে পালাবাব কোন পথ নেই। সে তখন চাৎকাব করে গোরি-লাদের বলল, তোমরা ফিরে যাও। তা না হলে তোমাদেব দলের এই মেয়েটিকে হত্যা করব।

মেয়েটি তখন টাবজনের মুখপানে তাকিয়ে হেসে বলল, ওবা থামবে না। তুমি আমাকে হত্যা করলেও ওবা তোমাকে ছাড়বে না। ধবতে পাবলে ওবা আমাদেব সকলকে খাবে। তুমি বরং পাথর ছুঁড়ে ওদের মার। তাহলে ওবা আর আসতে পারবে না।

টাবজন দেখল মেয়েটি এখন শান্ত এবং কোন-বকম বিরোধিতা করছে না তাব। মেয়েটি টাবজনকে বলল, এখন আমি তোমার। ওদেব কাছে আর যাব না।

টারজন পাথব কুড়িয়ে গোবিলাদের মাথায় মারতে লাগল। তখনই সেই মেয়েটির বাঁধন খুলে দিতে সেও পাথব ছুঁড়তে লাগল। রোণ্ডাও তাই করতে লাগল। মাথায় পাথব লাগায় গোরিলাদের

কয়েকজন ঘায়েল হলো। তারা একটা গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল।

মেয়েটি বলল, আমরা এখানে দিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকব। অন্ধকার হয়ে গেলে ওরা আর বেরোবে না বা আমাদের তাড়া করবে না।

টারজন একসময় মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি মানুষের মাংস খাও?

মেয়েটি ইংরিজিতে বলল, আমি বা মালবিয়াত কেউই খায় না।

টারজন বলল, মালবিয়াত কে?

মেয়েটি বলল, আমার লোক। আগে আমি ওর কাছে ছিলাম। এখন তুমি তার সঙ্গে লড়াই করে আমাকে জয় করে নিয়ে নিয়েছ। এখন আমি তোমার। তবে ও মেয়েটা কে?

এই বলে বোগুাকে দাঁত বার করে আক্রমণ করতে গেল। টারজন তাকে ধরে ফেলল।

মেয়েটি বলল, যতদিন তোমার কাছে আমি থাকব ততদিন তুমি অন্য কোন মেয়েকে কাছে রাখতে পারবে না।

টারজন বলল, ও আমার নয়।

মেয়েটি বলল, ওর নাম কি? তোমারই বা নাম কি? আমার নাম বালজা।

টারজন বলল, ওর নাম রোগুা আর আমার নাম স্ট্যানলি বলতে পার। তুমি ইংরিজি শিখলে কোথা থেকে?

বালজা বলল, যখন আমি লণ্ডনে ছিলাম। পরে লণ্ডন থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেয় ওরা।

টারজন বলল, কেন তাড়িয়ে দিয়েছে তোমায়?

বালজা বলল, কারণ আমি ওদের মত নই। ওরা আমায় অনেক আগেই তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমার মা আমায় লুকিয়ে রেখেছিল। পরে আমার সন্ধান পায় ওরা। তখন আমি পালিয়ে আসি।

টারজন বলল, মালবিয়াতও তোমার মত?

বালজা বলল, ও ইংরিজি শিখতে পারেনি। তুমি ওর থেকে ভাল। তোমাকে আমার ভাল লাগে। তুমি কি মালবিয়াতকে মেরে ফেলেছ?

টারজন বলল, না মরেনি বোধ হয়। আহত হয়ে পড়ে আছে।

বালজা একটা পাথর কুড়িয়ে শায়িত মালবিয়াতের উপর ছুঁড়ে দিল। মালবিয়াত কোনরকমে হাতেপায়ে গুড়ি মেরে ওদের চোখের আড়ালে চলে গেল।

বালজা বলল, আমি ওর কাছে ফিরে গেলে ও আমাকে মারবে। তবে আমি সুন্দরী বলে আমাকে কিছু বলবে না। কিন্তু আমি ওর কাছে আর যাব না। আমি তোমার সঙ্গেই যাব।

ক্রমে পাহাড়গুলোর উপর সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসতে ওরা পাহাড়টা থেকে নেমে একটা গুহার দিকে গেল। গুহাটায় গিয়ে টারজন দেখল সরু হলেও গুহার দুটো দিক খাড়াই হয়ে উপরে উঠে গেছে এবং উপরটা ফাঁকা। ভাবল এখানে থাকার থেকে উপরে উঠে যাওয়া ভাল।

টারজন ওদের বলল, আমি আগে উপরে উঠে যাই। পরে দড়িটা নামিয়ে একে একে উঠে যাবে তোমরা।

উপরে উঠে গেল ওরা। তখন রাত্রি হয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে একটা জলনিকাশের নালা দেখতে পেল। হঠাৎ রোণ্ডা দেখল সেই নালাটির কতক-গুলো পাথর অন্ধকারে জ্বলছে। সে বেশ বুঝতে পারল ওগুলো হচ্ছে হীরে। হীরে ছাড়া অন্ধকারে কোন পাথর এমন করে আলো দিতে পারে না।

রোণ্ডা বলল, পাথরগুলো কুড়িয়ে নিতে পারি ?

বালজা বলল, তুমি যতটা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে, নিতে পার।

সারারাত ধরে পথ চলল ওরা। রোণ্ডা অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে পড়ায় টারজন তাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বালজা সমানে অক্লান্তভাবে পথ হাঁটতে লাগল। এইভাবে উঁচুনিচু অনেক পাহাড়ী পথ পার হয়ে ওরা ভোরবেলায় সেই পাহাড়টায় গিয়ে পৌঁছল।

কিছু পরে রোদ উঠতেই কুয়াশা কেটে গেল। ওরা সেই পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলো। টারজন বলল, এখান থেকে আমাদের শিবির আর বেশী দূরে নয়।

রোণ্ডা বলল, এগুলো হীরে আর এইজন্যই এটাকে বলে হীরকদেশের উপত্যকা। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। ওদের নিয়ে ট্রাকে করে অনেক হীরে বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারি।

টারজন বলল, না, জীবনে আর কখনো এই অভিশপ্ত হীরকদেশের নাম করবে না। এটাকে চির-কালের মত বিদায় জানাবে।

এরপর ওরা রাতের মধ্যে দক্ষিণ দিকে একটা পথ ধরল। গোরিলা-নগরী থেকে পালিয়ে আসা গোরিলাগুলো যে গুহায় থাকে সেগুলোকে দূর থেকে ওদের দেখিয়ে দিল বালজা। ওরা এখান থেকে দক্ষিণ দিকে গিয়ে সেই পাহাড়টায় গিয়ে পৌঁছবে, তার পাদদেশে আছে ওম্বাম্বি জলপ্রপাত যেখানে ওরমানদের অপেক্ষা করতে বলে এসেছে টারজন।

রোণ্ডা বলল, এবার আমাকে নামিয়ে দাও স্ট্যানলি, এবার আমি হাঁটতে পারব। কিন্তু শিবিরে যাবার আগে বালজার জন্য একটা স্কার্ট যোগাড় করতে হবে।

টারজন বলল, ও সভ্য জগতে গিয়ে বদলে যাবে একেবারে।

মাইলখানেক যাবার পর কতকগুলো তাঁবু দেখতে পেল ওরা। রোণ্ডা চীৎকার করে উঠল, সফরি, আমাদের সফরি। প্যাটকে দেখতে পাচ্ছি।

ওরা শিবিরের কাছে এগিয়ে যেতেই শিবিরের একজন ওদের দেখতে পেয়ে চীৎকার করতে লাগল। তখন সবাই ছোটাছুটি শুরু করে দিল। সবাই রোণ্ডাকে চুম্বন করল তাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে। নাওমি ম্যাডিসন টারজনকে চুম্বন করতেই বালজা তাকে মারতে গেল।

টারজন তার কোমর ধরে তাকে শান্ত করে বলল, ওরা সবাই তোমার বন্ধু। কাউকে মারতে নেই। ওদের সঙ্গে হলিউডে যাবে। সভ্য হবে।

বালজাকে দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। ওরমান ও ওগ্রেডি তার জন্য একটা নতুন ভূমিকা সৃষ্টি করল ছবিতে। ওরমান বলল, সে ছবির কাজ শুরু করবে। সে বলল, সে নিজেও কোন একটা ভূমিকায় অভিনয় করবে। ওগ্রেডি অভিনয় করবে মেজর হোয়াইটের শিকারীর ভূমিকায়।

শেষে ওরমান বলল, বালজার জন্য এমন একটা ভূমিকা তৈরী করেছি যে ভূমিকায় ও অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দেবে সবাইকে।

এরপর দুসপ্তাহ ধরে ওরমান পরপর কয়েকটা দৃশ্যের ছবি তুলে ফেলল। টারজন একসময় একটা দূর আদিবাসী গাঁ থেকে একদল নিগ্রোভৃত্য নিয়ে এল শিবিরের কাজ ও মালপত্র বহন করার জন্য।

হঠাৎ একদিন একটা পিওন এসে একটা টেলিগ্রাম দিয়ে গেল ওরমানের হাতে। ওদের স্টুডিওর প্রযোজক খবর পাঠিয়েছে ওকে, দলের সকলকে ও ছবির যাবতীয় সাজসরঞ্জাম ও মালপত্র নিয়ে হলিউডে ফিরে যেতে হবে।

আর ছবি তোলা হবে না ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল ওরমানের। কিন্তু বাকি সবাই খুশিতে লাফাতে লাগল। দীর্ঘদিন পর সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে আবার ফিরে যাবে ওরা হলিউডে।

টারজন ওরমানকে বলল, ও ওদের সঙ্গে বানস্তুটোদের গাঁ পর্যন্ত যাবে। সে ওদের বলল, বানস্তুটোদের গাঁয়ের সর্দারের সঙ্গে তার কথা হয়েছে সে আর ওদের কোন ক্ষতি করবে না।

বানস্তুটোদের গাঁয়ের সীমানাটা ওদের পার করিয়ে দিয়ে টারজন ওদের বলল, আমি এক জায়গায় যাচ্ছি। জিঞ্জায় গিয়ে তোমাদের সঙ্গ নেব।

সেখান থেকে পুঙ্গুদের গাঁয়ে ওবরস্কির খোঁজে চলে গেল টারজন। সে তখনো পর্যন্ত দলের কাউকে তার আসল পরিচয় দেয়নি। সবাই তাকে স্ট্যানলি ওবরস্কি বলেই জানে।

কিন্তু পুঙ্গুর সঙ্গে দেখা হতেই সে বলল, দুঃখের কথা বাওয়ানা, তোমার সেই লোকটি এক সপ্তাহ আগে জ্বরে মারা গেছে। আমরা তার মৃতদেহটা জিঞ্জায় শ্বেতাঙ্গদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি যাতে আমরা মেরেছি বলে কারো কোন সন্দেহ না হয়।

টারজনের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ও ভেবেছিল ওবরস্কিকে ওদের সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার পর নিজের আসল পরিচয়টা দেবে। কিন্তু তা আর হলো না। আর ও ওদের কাছে ফিরে যাবে না কখনো।
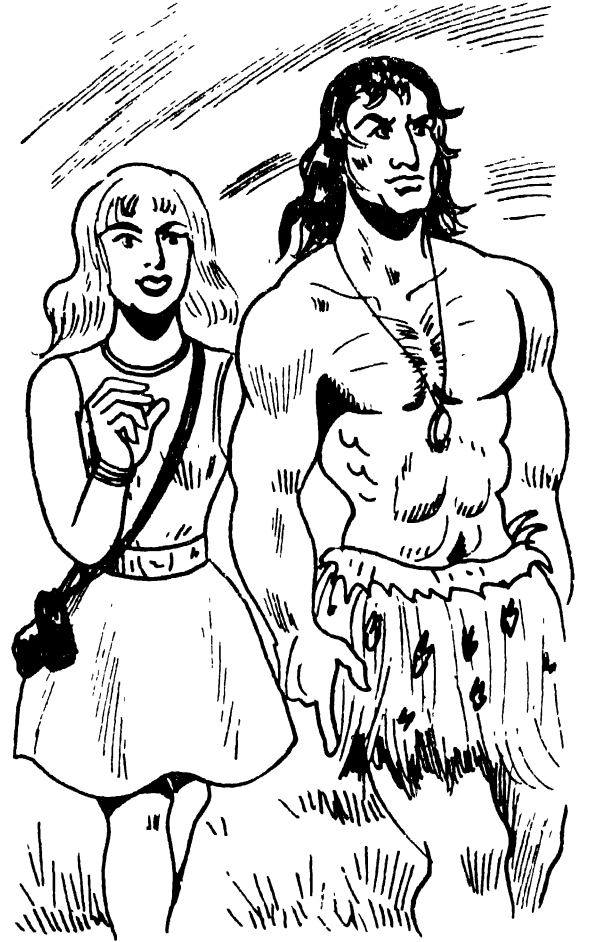
টারজন ও জঙ্গলে খুন

টারজন এ্যাণ্ড দি জাঙ্গল মার্ডারস্
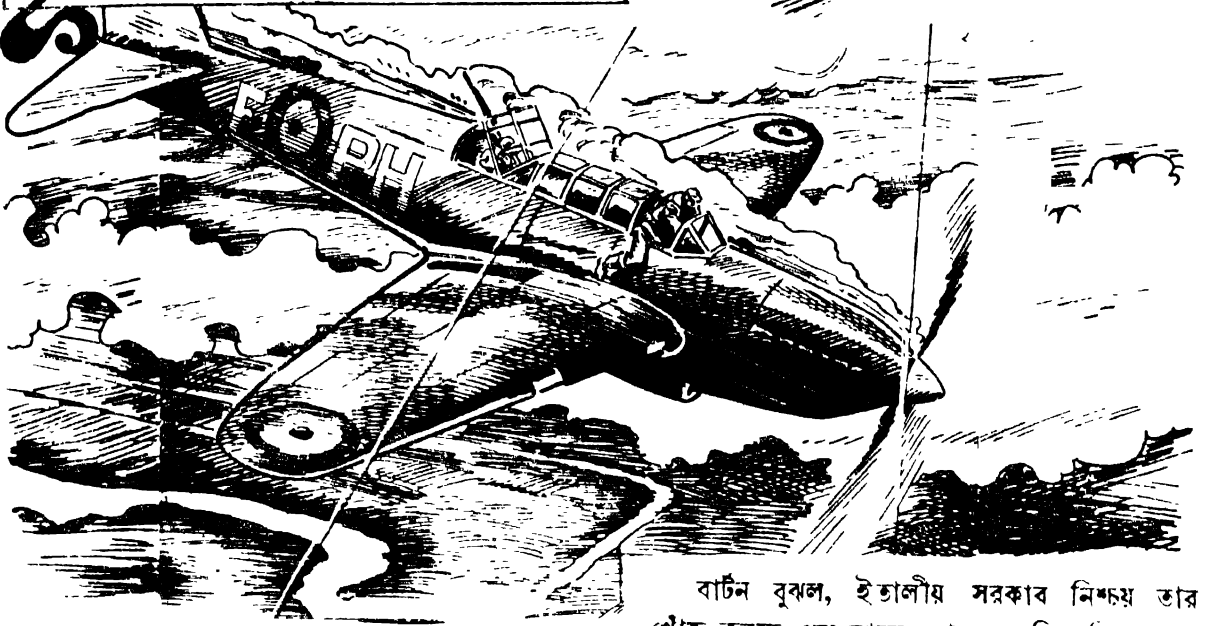
লেফটন্যান্ট সিসিল বার্টন ভূমধ্যসাগরের উপব দিয়ে দক্ষিণ দিকে আফ্রিকার উপকূলভাগের দিকে উড়ে চলেছিল। সে হঠাৎ পশ্চিমে ফিরে লণ্ডনে চলে যেতে পাবত। কিন্তু ইংরেজ সরকাব থেকে নির্দেশ এসেছে তাকে আফ্রিকার কেপটাউনে যেতে হবে। যাবার পথে বঙ্গানিতে নেমে তার রাখা সেখানকার রেসিডেন্ট কমিশনারের হাতে নক্সাটা দিয়ে যেতে হবে।

বঙ্গানিতে একটা বিমানবন্দব ছিল। কিন্তু সেটা জরুরী অবস্থায় কাজ চালানোব জন্য ব্যবহৃত হত। সেখানে বিমানে তেল নেবার ব্যবস্থা আছে কি না তা না জানায় বার্টন ঠিক করল সে তিউনিসে নেমে ট্যাঙ্কে তেল ভরে নেবে।

সে যখন ট্যাঙ্কে তেল ভরছিল আর অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছিল তখন তিউনিসের একজন অধিবাসী তাকে ইংরেজি ভাষায় বলল, ইতালীরা তোমাকে মারতে মারতে কেপটাউনে নিয়ে যাবে যদি বেশীক্ষণ এখানে থাক।

বার্টন বুঝল, ইতালীয় সরকাব নিশ্চয় তার খোঁজ করছে এবং তাকে ধরার জন্য পিছু নিয়েছে।

তাই তেল ভরেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিমান ছেড়ে দিয়ে আকাশে উঠল বার্টন। বুঝল তিউনিসের স্থানীয় লোক তাকে সতর্ক করে দিয়ে ভালই করেছে। তাব উপকার করেছে।

বারবার পিছন ফিরে আকাশপথে দেখতে লাগল বার্টন কোন অনুসরণকাবী বিমান তার পিছু পিছু আসছে কি না। তিউনিসের বিমানবন্দরে তাব মোট সময় গেছে আধঘণ্টা। তখন গোধূলিবেলা। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে তখনো কিছু দেরী আছে। তাই বার্টন ভাবল সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত যদি সে অনুসরণকারীদের দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকতে পারে তাহলে রাত্রিব অন্ধকারে তাকে ধরতে পারবে না তারা। সে যাচ্ছিল বঙ্গানি বিমানবন্দরের দিকে। কেপটাউনে যাবার আগে সেখানে থামবে সে।

সহসা পিছন ফিরতেই অস্তম্লান সূর্যের শেষ রশ্মিতে বার্টন একসময় দেখল তার পিছনে অনেক দূরে একটা উড়ন্ত বিমানেব রূপালি পাত চকচক করছে।
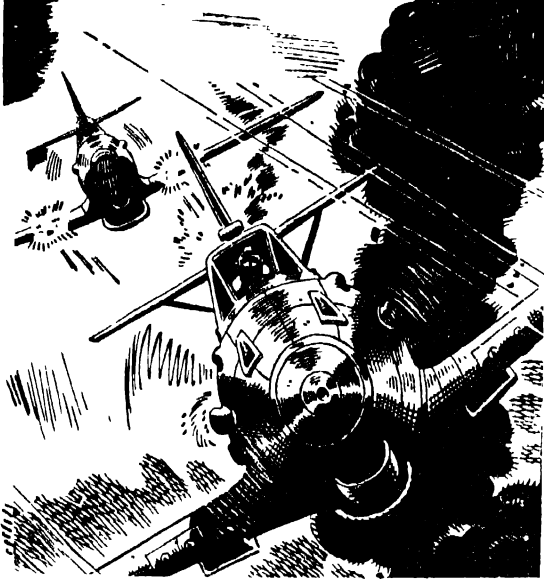
তার বিমানের আলো দেখে পিছনের বিমান সারারাত ধরে অনুসরণ করে আসতে লাগল। বিমানটা তার বিমানের থেকেও দ্রুতগামী। তাই তার খুব কাছে কাছে আসছে।

শত্রুদের আসল উদ্দেশ্যের কথাটা বুঝতে পারল বার্টন। শত্রুরা তাকে চায় না, চায় শুধু সেই নক্সাটা আর তার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র। একবার সে কোন রকমে বঙ্গানিতে পৌঁছতে পারলেই আর তার কোন ভয়ই থাকবে না। তার নক্সা ও সরকারী কাগজপত্র সব নিরাপদে রেখে দিতে পারবে। তার যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে।

কিন্তু তা আর হলো না। সকাল হতেই বার্টন দেখল অনুসরণকারী বিমানটা তার একেবারে কাছে বাঁ দিকে এসে পড়েছে। তার একদিকের পাখাটা প্রায় ঠেকছিল তার বিমানের পাখায়।

বার্টন দেখল সেটা ইতালির বিমানবাহিনীর এক অনুসন্ধানকারী বিমান। ইতালীয় সামরিক বিভাগের একজন অফিসার সেটা চালাচ্ছে। এ ছাড়া সে বিমানে যে দুজন যাত্রী ছিল তাদের চিনত না বার্টন। তবে তার মনে হলো তারাই হলো জুবানোভ আর ক্যাম্পবেল। তাদের কখনো চোখে দেখেনি এবং চিনত না। তবু তার মনে হলো তারা ছাড়া আর কেউ নয় এই দুজন যাত্রী।

উড়ন্ত বিমান দুটোর পিছনে ছিল উন্মুক্ত প্রান্তর। অনুসরণকারী বিমানের চালক তাকে প্রায়ই থামতে বলছিল। কিন্তু বার্টন থামবে না। সে দেখছিল আর মাত্র পঞ্চাশ মাইল পরেই বঙ্গানির বিমান-বন্দর। সুতরাং সে ইশারায় জানাল সে থামবে না।

তখন পিছনের বিমান থেকে মেশিনগানের গুলি ছুটে এসে তার বিমানের পিছনে লাগল। বার্টনের হাতে তখন ছিল মাত্র একটা পিস্তল। সেই পিস্তল থেকে সে বিমানের কন্ট্রোলরুমের যাতে ক্ষতি হয় তার জন্য আরো তিন চারবার গুলি করল সে।

পিছনের বিমানটা তখন তার দিক পরিবর্তন করল। মনে হলো সেটা নামতে শুরু করেছে। বার্টন তখনো এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যাবার আগে তার শত্রুরা চরম আঘাত হেনে গেল তাকে। মেসিন গান থেকে আবার গুলি করতে সে গুলির আঘাতে তার বিমানের পিছনের রাডার ও স্টেবিলাইজার ভেঙ্গে গেল। বিমানটা ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে নিচে নামতে লাগল।

বার্টন তখন এঞ্জিন থেকে বেরিয়ে এসে প্যারা-সুটে করে মাটিতে নামল। নামার সময় দেখল অনুসরণকারী শত্রুবিমানটা দক্ষিণ দিকে নিচে নামতে নামতে বনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একই বনের মধ্যে দু জায়গায় ভেঙ্গে পড়ে থাকা এই বিমান দুটিকে দেখে টারজন।

প্যারাসুট থেকে বাইরে এসে বার্টন দেখল, চারদিকে শুধু বন আর বন। কোথাও কোন জনবসতি বা জনপ্রাণী নেই। দেখল আফ্রিকার বিশাল গভীর জঙ্গলের মাঝখানে এসে পড়েছে সে। তার মনে হলো এখান থেকে পূর্ব দিকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে পড়বে বাসেলি।

বার্টন দেখল তার বিমানটা একশো ফুট দূরে পড়েছে। এঞ্জিনে আগুন লাগেনি। এঞ্জিনটা কেটে দিয়েছিল সে শুধু। বিমানে গিয়ে কিছু খাবার আর গুলি নিয়ে এসে তার ধারণামত পথ ধরে বঙ্গানির দিকে রওনা হয়ে পড়ল সে।

সে বুঝতে পারল তার অনুসরণকারীদের বিমানটাও এখান থেকে কিছু দূরে পড়েছে এবং তারা তার খোঁজে বেরিয়ে পড়বে নিশ্চয়। সে ভাবল বঙ্গানি যদি এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে হয় তাহলে আজ থেকে তৃতীয় দিনের মধ্যে সে পৌছবে সেখানে।

কিন্তু বার্টন জানত না যে এ অঞ্চলে সিংহ আছে এবং এখানকার আদিবাসীরা মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন নয়। সে আরও জানত না বঙ্গানি এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল নয়, তিনশো মাইল দূরে অবস্থিত।

সিসিল বার্টনের পথে বুইরো নামে এক নর-খাদক আদিবাসীদের বস্তী ছিল। কিন্তু সে তাদের দেখা না পাওয়ায় সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পার হয়ে গেল তাদের অঞ্চলটা। অথচ এই আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে যার জন্ম সেই বাঁদরদলের রাজা টারজন ঘটনাক্রমে বুইরোদের আকস্মিক আক্রমণে আহত ও বন্দী হলো।

টারজন সেদিন প্রতিকূল বাতাসে বনের মধ্য দিয়ে যখন যাচ্ছিল তখন অনুকূল বাতাসের অভাবে কোন গন্ধ-সূত্র না পাওয়ায় সে মোটেই জানতে পারেনি প্রায় বিশজন বুইরো তার পথ ধরেই আসছে। তারা শিকার করতে করতে এসে পড়ে সেইদিকে।

তারা খুবই নিঃশব্দে তার দিকে এগিয়ে আস-ছিল বলে তাদের পদক্ষেপের কোন শব্দ শুনতে পায়নি টারজন।

এমন সময় তার বাঁ দিকে একটা আহত সিংহকে দেখতে পেল সে। সিংহটার গায়ের একপাশ থেকে রক্ত পড়ছিল। সিংহটা হঠাৎ ঘুরে আক্রমণ করল টারজনকে। টারজন তার ডান কাঁধ থেকে ভারী বর্শাটা নামিয়ে তা দিয়ে সিংহটাকে মারতে উদ্যত হতেই পিছন থেকে বুইরোরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

তাদের সর্দার পিঙ্গুর ছেলে চেমিঙ্গো চিনতে পেরেছিল টারজনকে। এই টারজনই একবার তাদের গাঁ থেকে তাদের এক বন্দীকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে বোকা বানায় তাকে।

চেমিঙ্গো তাই সময় নষ্ট না করে তার বর্শা দিয়ে টারজনের পিঠে আঘাত করল। তবে আঘাতটা তত জোর হয়নি, তেমন আহত হলো না টারজন। টারজনও তার পিঠের তূণ থেকে একটা তীর নামাল।
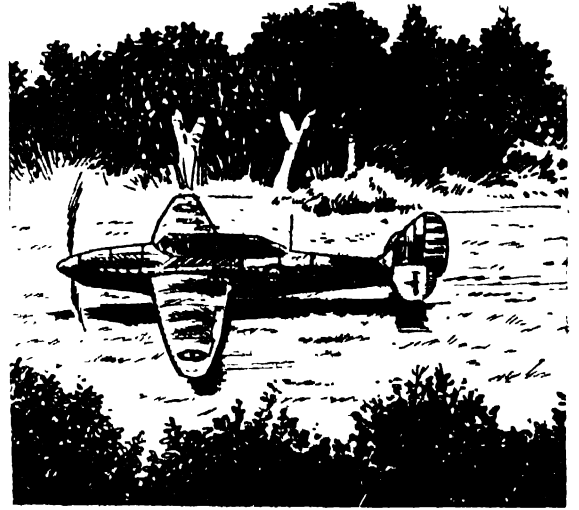
এদিকে সিংহটা তখন ঢাল হাতে একজন বুইরো যোদ্ধার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ফেলে দিল। তখন অন্য যোদ্ধারা একযোগে আক্রমণ করে ঘায়েল করে ফেলল সিংহটাকে।

চেমিঙ্গো এবার খুশি হয়ে বন্দী টারজন আর সিংহের একটা মৃতদেহ নিয়ে বিজয়গর্বে তাদের গাঁয়ে গিয়ে হাজির হলো।

তাদের গাঁয়ের যাদুকর ডাক্তার বন্দী অবস্থায় না রেখে তখনি মেরে ফেলতে বলল টারজনকে। কিন্তু গাঁয়ের অনেকে টারজনকে ছেড়ে দিতে বলল। কারণ তাকে বধ করলে তার মৃত আত্মা গাঁয়ের অনেক ক্ষতি করবে।

তখন চেমিঙ্গোর বাবা সর্দার পিঙ্গু একটা আপোষ করল।

পিঙ্গু হুকুম দিল, বন্দীকে ভাল করে বেঁধে উপযুক্ত পাহারার মধ্যে রেখে দাও। তার ক্ষত-স্থানের চিকিৎসা করো। এর মধ্যে যদি কোন অশুভ ঘটনা না ঘটে তাহলে অন্যান্য বন্দীদের মত তারও অবস্থা হবে। তখন ভোজন উৎসব চলবে।

টারজনের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে গেল। সাধারণ মানুষ হলে সেই ক্ষততেই মৃত্যু হত তার। কিন্তু টারজন সাধারণ মানুষ নয়। এরই মধ্যে সেরে উঠেছে সে। মুক্তির কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে।

বুইরোরা তাকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছিল। প্রতিদিন রাতে তারা বাঁধনটা শক্ত করে দিত। আবার টারজন তার পরে একটু একটু করে আলগা করে দিত সে বাঁধন যাতে তার হাতে পায়ের রক্ত চলাচলে কোন অসুবিধা না হয়।

টারজন বুঝতে পারে তারা ওকে খাইয়ে মোটা করতে চাইছে। তার শক্ত পেশীবহুল দেহটার মাংস খেতে ওদের ভাল লাগবে না। তাই তার দেহে চর্বির সঞ্চার করে ওর দেহটাকে নরম করতে চায়।

বন থেকে বাতাসে ভেসে আসা অনেক শব্দই শুনতে পায় সে। শীতা বা চিতা বাঘের ডাক, ভাঙ্গো বা হায়েনার অট্টহাসি, নুমা বা সিংহের গর্জন —অনেক কিছুই শুনতে পায় সে।
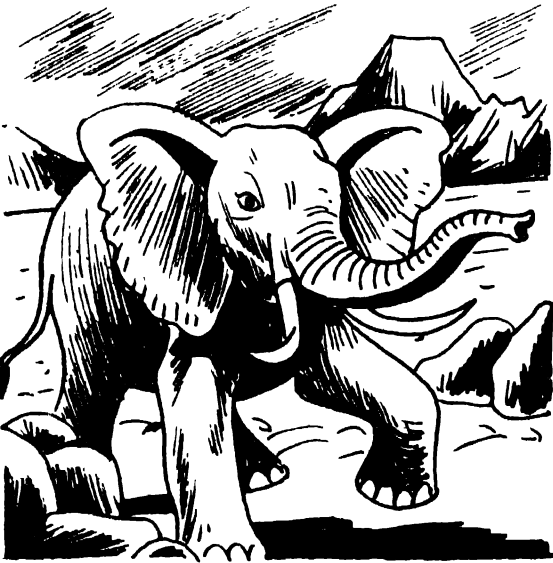
সহসা একটা শব্দ শুনে সজাগ হয়ে ওঠে সে। মাথাটা দোলাতে দোলাতে মন্ত্র উচ্চারণের মত মুখ থেকে একটা শব্দ বার করতে থাকে। প্রহরারত রক্ষী তাকে জিজ্ঞাসা করে, কি করছ?

টারজন বলে, আমি প্রার্থনা করছি।

রক্ষী পিঙ্গুর কাছে গিয়ে কথাটা জানালে সে বলে, ঠিক আছে। ওকে প্রার্থনা করতে দাও।

রক্ষী এসে দেখে সেইভাবে প্রার্থনা করতে করতে মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠছে টারজন।

টারজন বুঝতে পারে তার চীৎকারে কাজ হচ্ছে। কানে এক বাঞ্ছিত শব্দ আর নাকে এক আকাঙ্খিত গন্ধ পায় সে। বুইরোরা এসব কিছুই বুঝতে পারে না।

টারজন যখন এক একবার গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে তখন বুইরোরা ভাবে তার গলায় খুব জোর আর সে তার দেবতাদের শোনাবার জন্য এত জোরে চীৎকার করছে।

এদিকে জঙ্গলের গভীরে তখন টারজনের হাতি-বন্ধু ট্যান্টর একদল হাতির সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে ছিল দলপতি। সে হঠাৎ টারজনের ডাক শুনতে পায়। সে তখন চীৎকার করে তার দলের অন্য সব হাতিদের জড়ো করে এক জায়গায়। তারপর একযোগে টারজনের গলার শব্দকে লক্ষ্য করে বুইরোদের বস্তীর দিকে আসতে থাকে।

গাছপালা ভেঙ্গে গর্জন করতে করতে গাঁয়ের দিকে আসতে থাকা হাতির দলের শব্দটাকে টারজনই প্রথম শুনতে পায়। হাসি ফুটে ওঠে টারজনের ঠোঁটে। তার প্রার্থনায় তাহলে কাজ হয়েছে।

টারজন এবার স্পষ্ট শুনতে পায় কাঠের গেট ভেঙ্গে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছে মস্ত হাতির দল। সে তখন জোরে চীৎকার করে ওঠে, ট্যান্টর ট্যান্টর, তোমরা আমার কাছে এস। এই যে আমি।

কিন্তু টারজনের ডাক শোনবার কোন প্রয়োজন ছিল না হাতিদের। তার গন্ধ তারা পেয়েছিল।

গোটা গাঁটাকে বিধ্বস্ত করে সব কুঁড়েগুলোকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে টারজনের ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হল হাতিরা। তারপর ঘরের চালটাকে তুলে ফেলে টারজনকে শুঁড় দিয়ে পিঠে উঠিয়ে নিল তার বন্ধু ট্যান্টর।

হাতির পিঠে উঠেই টারজন অন্য হাতিদের কি

করতে হবে না হবে নির্দেশ দিতে লাগল। গোটা গাঁটা একেবারে বিধ্বস্ত হলে এবং বুইরোরা হাতিদের অত্যাচারে গাঁ ছেড়ে সাময়িকভাবে পালিয়ে গেলে টারজন হাতির দলকে বনে ফিরে যাবার নির্দেশ দিল। টারজনের হাতদুটো বাঁধা ছিল তখনো। হাতির পিঠে চেপে বনে ফিরে গেলে বাঁদরেরা খুলে দিল তার হাতের বাঁধন।

ট্যাণ্টরকে আদর করে হাতিদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর আবার গাছে উঠে যাত্রা শুরু করল টারজন। কিন্তু এবার আর বিদেশী বিমানযাত্রীদের খোঁজে নয়। সেই ইংরেজ বিমানযাত্রী হয়ত এতদিনে আর বেঁচে নেই। হয় সে বনের মধ্যে না খেয়ে মারা গেছে অথবা কোন হিংস্র জন্তুর পেটে গেছে।

যাই হোক, এখন বঙ্গানি যেতে হবে। সেখানকার রেসিডেন্ট কমিশনার তার বন্ধুবর টারজনকে ঢোল সহরৎ করে খবর পাঠিয়েছেন সে যেন অবিলম্বে দেখা করে তাঁর সঙ্গে। বুইরোদের গাঁয়ে বন্দী অবস্থায় থাকার সময়েই এই ঢোল সহরতের কথা শুনতে পায় সে।

আফ্রিকার গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিনের পর দিন ধরে পথ চলাকালে দু দুবার সিংহের কবলে পড়েছিল বার্টন। কিন্তু দুটোরই কাছাকাছি একটা গাছ পেয়ে যাওয়ায় সেই গাছের উপর উঠে পড়ে প্রাণ বাঁচায় সে। একবার সারাদিন গাছে উঠে বসে থাকতে হয় সিংহের ভয়ে। তৃষ্ণায় একটু জল পর্যন্ত খেতে পায়নি। অবশেষে অধৈর্য হয়ে শিকারের আশা ছেড়ে চলে যায় সিংহটা। আর একদিন আর একটা সিংহের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কিন্তু সিংহটার পেট ভর্তি ছিল বলে সে কোন মনোযোগ দেয়নি বার্টনের দিকে। বার্টন অবশ্য ভাবত সিংহমাত্রই সব সময় নরখাদক। তারা জীবজন্তুকে দেখলেই বা হাতের কাছে পেলেই খেয়ে ফেলে।

কিন্তু খাদ্যের সমস্যাটা দিনে দিনে প্রকট হয়ে উঠল বার্টনের কাছে। খেতে না পেয়ে তার শরীর রোগা হয়ে যেতে লাগল দিনে দিনে। হাতের কাছে ফলমূল যা পেতে লাগল তাই খেতে লাগল।

কিন্তু দেহটা তার শীর্ণ হলেও মনে তখনো জোর ছিল। আশা ছিল বার্টনের।

একদিন সকালের দিকে পাহাড়ের ধারে বসেছিল সামনে উপত্যকাটার দিকে তাকিয়ে। সহসা দেখতে পেল উপত্যকাটার উপর থেকে একদল যাত্রীর একটা সফরী এগিয়ে আসছে তার দিকে।

বহুদিন পর আজ প্রথম মানুষের দেখা পেল আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে। আনন্দে চীৎকার করে উঠল বার্টন। দেখল সফরীতে রয়েছে একদল শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আর দুজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা। কুলিরা মালপত্র বয়ে নিয়ে আসছিল পিছনে। রোদের তাপ থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য শ্বেতাঙ্গদের মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ। সামনেই একজন স্থানীয় পথপ্রদর্শক ছিল।

সফরীর কাছে ছুটে গেল বার্টন। তার চোখে জল এসে গিয়েছিল, আনন্দে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সে হাত বাড়িয়ে ডাকতে লাগল তাদের।

তার ডাকে থেমে গেল চলমান সফরীটা। কিন্তু বার্টন দেখল তার প্রতি পথিকদের কারো কোন উৎসাহ বা আগ্রহ নেই।

বার্টনের ছেঁড়া ময়লা পোশাক আর শীর্ণ চেহারা দেখে একটি মেয়ে বলে উঠল, কি ভয়ঙ্কর !

বার্টন মেয়েটিকে চিনত। সে বলল, তোমার আচরণে আমি দুঃখিত বারবারা। তুমি শুধু উপরের পোশাকটাকেই দেখলে, কিন্তু সে পোশাক যে মানুষটা পরে আছে তাকে দেখলে না।

মেয়েটি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, তুমি চেন আমাকে ?

বার্টন বলল, ভালভাবেই চিনি। তুমি হচ্ছ বারবারা রামসগেট। লর্ড জন রামসগেট নামে ঐ ভদ্রলোক তোমার ভাই। অন্যদের আমি চিনি না।

পথিকদের একজন বলল, লোকটা বোধহয় আমাদের এই সফরীর কথা কারো কাছে শুনেছে। যাই হোক, তোমার কথা বল। তুমি কি তোমাদের সফরীর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছ ? তুমি কি ক্ষুধার্ত ? তুমি কি আমাদের যাত্রীদলে যোগ দিতে চাও ?

লর্ড জন বলল, থাম বার্ট। ওকে ওর কথা বলতে দাও।

বার্টন বলল, আজ যদি তোমাদের একজন কুলির সঙ্গে আমার দেখা হত, তাহলে সে আগে আমায় কিছু খাদ্য ও পানীয় দিত।

মেয়েটি লজ্জিত হয়ে বলল, আমি দুঃখিত। আমি খাবার ও জল আনতে বলছি।

বার্টন বলল, তাড়াতাড়ি করতে হবে না। আমি আগে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেব। আমি লণ্ডন থেকে একটি বিমানে করে কেপটাউন যাচ্ছিলাম। পথে নামতে বাধ্য হই। তার পর থেকে আমি বঙ্গানির দিকে এগিয়ে চলেছি। এবার আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি। আমার নাম লেফটন্যাণ্ট সিসিল গাইলস বার্টন। আমি সরকারী বিমান-বাহিনীতে কাজ করি।

লেডি বারবারা বলল, অসম্ভব ! এ কখনই হতে পারে না।

লর্ড জন বলল, আমরা বার্টনকে চিনি। তোমাকে তার মত দেখতে লাগছে না।

তার জন্য দায়ী আফ্রিকা। তোমরা কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখলে অবশ্যই চিনতে পারবে। প্রতি সপ্তার শেষে আমি তোমাদের রামসগেট প্রাসাদে অতিথি হিসাবে যেতাম।

লর্ড জন ভাল করে বার্টনকে দেখে চিনতে পেরে বলল, হা ভগবান ! সত্যিই ত। ক্ষমা করো বন্ধু। এই বলে করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল তার।

বার্টন কিন্তু সে হাত গ্রহণ করল না। বলল, এই হাত একজন দুর্দশাগ্রস্ত বিপন্ন পথিকের দিকে আগেই বাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। সুতরাং এখন এ হাত আমি মর্দন করতে পারব না।

লর্ড জন তার বোনকে বলল, ঠিকই বলেছে। ভুলটা আমাদেরই।

আর আপত্তি করল না বার্টন। তারা পরস্পরের করমর্দন করল। বারবারা তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ডানকান ট্রেণ্ট নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

খাওয়ার পর সফরীর অন্য সব সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হলো বার্টন। সেই দলে মিঃ রোমানফ

নামে এক রুশীয় পথিক ছিল। সে দাড়ি কামাতে কামাতে বার্টনকে জানাল বঙ্গানি সেখান থেকে এখনো দুশো মাইল দূরে।

বার্টন আরো জানতে পারল আসলে দুটো সফরী ছিল। একটা ছিল রোমানফের আর একটা ছিল লর্ড জনদের। পরে যখন ওরা দেখল ওদের গন্তব্যস্থল এক অর্থাৎ ওরা সকলেই বঙ্গানি যাবে তখন এক করে ফেলল দুটো সফরী।

জন বলল, তফাৎ এই যে রোমানফরা বন্দুক নিয়ে শিকার করে আর আমরা ক্যামেরা নিয়ে শিকার করি।

ট্রেন্ট বলল, সব বাজে। এর থেকে পশুশালায় গিয়ে জীবজন্তুদের ছবি তুলে আনলেই হলো।

বার্টন আরও জানল জিরাল্ড ছিল আগে রোমানফের পথপ্রদর্শক। বার্টন জানতে পারল একে একে সে ছাড়া আরো দুজন বিপন্ন পথিক এই সফরীতে যোগদান করে। তারা হলো স্মিথ আর পিটারসন। তাদের আদিবাসী সঙ্গীরা নাকি তাদের ত্যাগ করে চলে যায়।

বার্টন বলল, ওদের দেখে কিন্তু ভাল মানুষ মনে হচ্ছে না।

লর্ড জন বলল, ওরা নিজেদের কোন কাজই করতে চায় না। তাছাড়া গন্টের আচরণ বড়ই প্রভুত্বমূলক। সে কথায় কথায় সকলকে বিদ্রূপ করে। সবাই তাকে ঘৃণা করে। আমাদের এই সফরীটাকে মোটেই এক সুখী পরিবার বলা যায় না।

ডিনারের পর কফি আর সিগারেট দেওয়া হলো সকলকে।

বার্টন বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল, আজ সকালেই আমি না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে মরে যাচ্ছিলাম। কার ভাগ্যে কি আছে তা কেউ জানে না।

বারবারা বলল, ভবিষ্যতে আমাদের কি আছে সেটা আগে হতে জানতে না পারাটাই বোধ হয় ভাল।

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। বার্টনের সঙ্গে জন রামসগেটের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যেতে লাগল। বিশেষ করে সে বারবারাকে ভালবেসে ফেলল। তার লক্ষণ দেখে ডানকান ট্রেন্ট ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

একদিন গোলমাল বাধল সফরীর মধ্যে। বার্টন হঠাৎ সেখানে এসে পড়ায় সে গোদেনস্কিকে একটা ঘুষি মেরে ফেলে দিল। গোদেনস্কিও তার ছুরি বার করল। তখন বারবারা এসে পড়ায় গোদেনস্কি চলে গেল।

বারবারা বার্টনকে বলল, তোমার একজন শত্রু হলো।

বার্টন বলল, আমার অনেক শত্রু আছে।

এরপর ডানকান ট্রেন্ট এসে বার্টনকে স্পষ্ট বারবারার কাছ থেকে সরে যেতে বলল।

শান্তভাবে বার্টন বলল, আমার মনে হয় এ ব্যাপারটা বারবারার উপরেই ছেড়ে দেওয়া ভাল। কে সরে যাবে না যাবে সেটা সেই ঠিক করবে।

এতে ট্রেন্ট প্রথমে আঘাত করে বার্টনকে। বার্টন তখন জোর একটা ঘুষি মেরে ফেলে দেয় ট্রেন্টকে।

পরদিন সকালে লর্ড জন গোদেনস্কিকে জানিয়ে দেয় বঙ্গানিতে পৌঁছে গেলেই কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে তাকে। সকলেই এড়িয়ে চলতে লাগল গোদেনস্কিকে। এমন কি স্মিথ ও পিটারসনও তাকে দেখতে পারত না। সারাদিন সে তাই একা একা মুখ ভারী করে পথ চলত ও তার কাজ করে যেত।

আগুনের মত গরম রোদের নিষ্ঠুর তাপে সকলেরই কষ্ট হচ্ছিল। মালবাহী কুলীদের কষ্ট হচ্ছিল সবচেয়ে বেশী। গল্ট সব সময় ছোটাছুটি করে কুলিদের দেখাশোনা আর বকাবকি করছিল।

এক সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলে গল্ট একটা কুলিকে মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দিল। সে উঠে দাঁড়ালে আবার তাকে ফেলে দিল।

বার্টন তখন নিকটেই ছিল। সে গল্টের সামনে এসে বলল, খবরদার মারবে না বলে দিচ্ছি।

গল্ট বার্টনকে বলল, তুমি নিজের চরকায় তেল দাওগে। এ সফরী আমি পরিচালনা করছি।

বার্টন বলল, কার সফরীকে পরিচালনা করছ তা আমি দেখতে চাই না। তুমি কোন লোককে মারবে না বা গালাগালি দেবে না।

গল্ট সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘুষি চালিয়ে দিল। বার্টন সরে গিয়ে সেটা এড়িয়ে গেল। তারপর এক ঘুষিতে ফেলে দিল গল্টকে।

সফরীতে আসার পর এই হলো বার্টনের তিন নম্বর লড়াই।

লর্ড জনকে বার্টন বলল, আমি দুঃখিত রামসগেট সকলের সঙ্গেই আমার ঝগড়া বাধছে।

তাকে সমর্থন করে রামসগেট বলল, তুমি ঠিকই করেছ।

বারবারাও বলল, গল্টকে উচিত শিক্ষা দিয়ে খুব ভাল করেছ তুমি। লোকটাকে সবাই খারাপ বলে।

বার্টন বলল, আর কারো সঙ্গে শত্রুতা করতে হবে না। আগামী কালই আমরা বঙ্গানিতে পৌছব।

এর পর পরস্পরকে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে সকলেই শুতে চলে গেল শিবিরের মধ্যে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল বার্টন, আজ সে সত্যিই সুখী। আগামী কালই তার বাবার সঙ্গে দেখা হবে। তাছাড়া বারবারাকে সে পেয়েছে প্রেমিকারূপে।

শান্তিপূর্ণ এক স্তব্ধতা বিরাজ করছিল নৈশ শিবিরের মধ্যে। জ্বলন্ত আগুনের পাশে বসে ছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রহরী। দূরে এক সিংহের গর্জন শোনা গেল। জ্বলন্ত আগুনে বেশী করে কাঠ ফেলে দিল আস্কারি।

তখনো কিছুটা রাত ছিল। ভোর হয়নি ভাল করে। আগের প্রহরীর পর নতুন যে প্রহরী এসেছে সে একগাদা কাঠের পাশে পিঠ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম ভাঙ্গতেই দৈত্যাকার নগ্ন এক শ্বেতাঙ্গকে আগুনের ধারে বসে থাকতে দেখে চমকে ওঠে সে। ভাল করে চোখ মেলে দেখে বুঝল এটা স্বপ্ন নয়, তার দেখার কোন ভুল হয়নি।

প্রহরী দৈত্যাকার লোকটিকে বলল, কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ? তুমি যদি কোন দৈত্যদানব হও তাহলে আমি তোমাকে খাবার এনে দেব। কোন ক্ষতি করো না আমার।

আগন্তুক লোকটি বলল, আমার নাম টারজন। এটা কার সফরী?

প্রহরী বলল, এ সফরী দুজনের—বাওয়ানা রোমানক আর বাওয়ানা রামসগেটের।

টারজন বলল, ওরা বঙ্গানি যাচ্ছে ত?

আমরা আগামী কালই বঙ্গানিতে পৌছব।

ওরা শিকার করে?

বাওয়ানা রোমানক শিকার করে। কিন্তু বাওয়ানা রামসগেট শুধু ছবি তোলে।

এরপর টারজন বলল, তোমাদের শিবিরের মধ্যে একজন মৃত লোক আছে।

এই বলে শ্বেতাঙ্গদের শিবিরটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল।

শিবিরের ভিতরে গিয়ে প্রহরী ডাকাডাকি করে সকলকে তুলল। বলল, কোথা থেকে দৈত্যের মত একটা নগ্নদেহ শ্বেতাঙ্গ এসে বলছে এই শিবিরের মধ্যে একটা মৃত লোক পড়ে আছে।

সকলেই টারজনের চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। ভয় পেয়ে গেল। অবশেষে রামসগেট তার কাছে গিয়ে কথা বলল তার সঙ্গে।

টারজন বলল, আমার নাম টারজন। সত্যিই এই শিবিরের মধ্যে একটা লোক মরে পড়ে আছে।

রামসগেট বলল, কি করে বুঝলে তুমি?

বাতাসে গন্ধ পেয়ে বুঝলাম। মানুষ মরে গেলেই একটা বিশেষ গন্ধ বার হয় তার দেহ থেকে।

সকলেই হেসে উড়িয়ে দিল তার কথাটা। বলল, লোকটা পাগল।

কিন্তু রামসগেট গল্টকে ডেকে খোঁজাখুঁজি করতে বলল। বলল, সবাইকে ডেকে তোল। আজ খুব সকালেই যাত্রা শুরু করব।

এমন সময় একজন ভৃত্য ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল বার্টন তার ঘরে মরে পড়ে আছে।

সকলেই বলতে লাগল, ঐ উলঙ্গ আধ-পাগলা লোকটাই খুন করেছে বার্টনকে। কিন্তু লর্ড জন রামসগেট বা বারবারা এ কথা মানতে পারল না। ওরা বলল, ওর তাতে স্বার্থ কি? তাছাড়া প্রহরী বলছে, মাত্র কিছুক্ষণ আগে আসে লোকটা। এসে ঠাণ্ডায় আগুন পোয়াতে থাকে।

টারজন শান্তভাবে বলল, আমি আসার আগেই লোকটি নিহত হয়।

বার্টনের মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখা গেল। তার পিঠে ছোরা মারা হয়েছে। ছোরাটা তার হৃৎপিণ্ড-টাকে বিদ্ধ করেছে।

রামসগেট বলল, আগন্তুককে সন্দেহ করার কোন অর্থ হয় না। বারবারা বলল, বার্টনের শত্রু ছিল এই শিবিরে। গল্ট আর ট্রেণ্টের সঙ্গে তার মারামারি হয় এবং ওরা তাকে খুন করবে বলে ভয় দেখায়।

অবশেষে ঠিক হলো বঙ্গানিতে গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে ব্যাপারটাকে। পুলিশ প্রমাণ করবে কে খুন করেছে।

গল্ট আর ট্রেণ্ট বলল, লোকটাকেও আমরা বেঁধে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

কিন্তু গল্ট টারজনের কাছে যেতেই তাকে সরিয়ে দিল টারজন। ট্রেণ্ট তখন পিস্তল তুলে ধরে টারজনকে বলল, পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করব।

কিন্তু ভয়ে লক্ষ্য ঠিক করতে পারল না ট্রেণ্ট গুলিটা অন্য দিকে চলে গেল। টারজন তা[র] পিস্তলধরা হাতটা ধরে ফেলল। তারপর তাকে টানতে টানতে বনের দিকে নিয়ে গেল।

ট্রেণ্ট চেঁচাতে লাগল, তোমরা কিছু করতে পারছ না? ও আমাকে বনে নিয়ে গিয়ে খু[ন] করবে।

রামসগেট বলল, গুলি করলে ট্রেণ্টের গায়ে লাগবে। আমরা কিছুই করতে পারছি না।

বনের মধ্যে নিরাপদে ঢুকেই ট্রেণ্টকে ছেড়ে দিল টারজন। ট্রেণ্ট ছুটে শিবিরে এসে বলল, আমা[র] হাতের কব্জি ভেঙ্গে গেছে। সাংঘাতিক জো[র]

লোকটার গায়ে। আমাকে ছেড়ে দিয়েই গাছের উপর উঠে বাঁদরের মত ডাল থেকে ডালে লাফ দিয়ে দিয়ে চলে গেল।

একটা স্ট্রেচারে বার্টনের মৃতদেহটাকে চাপিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল কুলিরা।

আবার যাত্রা শুরু হলো সফরী। আজ দেরী হয়ে গেল শিবির গোটাতে।

সেদিন বঙ্গানি পৌঁছতে পারল না ওরা। রাতে আবার এক জায়গায় শিবির স্থাপন করল ওরা। কিন্তু সেদিন মাঝরাতে পিটারসন খুন হলো। তারও পিঠে একটা ছোরা বসিয়ে দেওয়া হয়।

স্মিথ বলল, সেই উলঙ্গ লোকটার কাজ। সে এসেছিল। আমি পালিয়ে যাবার সময় গুলি করেছি। অন্ধকারে দেখতে পাইনি গুলিটা লেগেছে কিনা। সে রাতে আর ঘুম হলো না কারো, ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় স্তব্ধ হয়ে রইল সবাই।

বঙ্গানিতে মৃত সিসিল গাইলস বার্টনের বাবা কর্ণেল জিরাল্ড গাইলস বার্টনের সরকারী বাংলোতে বসেছিল টারজন।

বার্টনের মৃত্যু সংবাদটা টারজনই দিল তার বাবাকে।

কর্ণেল বার্টন বলল, কিন্তু কে কোন্ স্বার্থে আমার ছেলেকে খুন করল?

টারজন বলল, স্বার্থ নিশ্চয়ই আছে। তবে ওদের সফরীতে ট্রেন্ট নামে একটা লোক আছে। সে আর বার্টন একটি মেয়েকে ভালবাসত। সুতরাং অনেকের সন্দেহ ট্রেন্টও ওকে মারতে পারে।

বার্টন বললেন, সফরী বঙ্গানিতে এলে আমি ওদের সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। দোষীকে খুঁজে বার করতেই হবে।

টারজন বলল, খুনী যদি আফ্রিকাতে থাকে তাহলে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।

সফরী বঙ্গানিতে পৌঁছেই শিবির স্থাপন করল। তারপর রোমানক আর রামসগেট কর্ণেল বার্টনের বাংলোতে এসে দেখা করল। তারা বার্টনের মৃত্যু-সংবাদ দিলে কর্ণেল বললেন, এ খবর আগেই জেনেছেন তিনি।

ওরা আশ্চর্য হয়ে বলল, তা কি করে সম্ভব?

এমন সময় টারজন এসে তাদের সামনে দাঁড়াল।

রামসগেট বলল, গতরাতে আমাদের শিবিরে পিটারসন নামে আর একজন লোক খুন হয়।

টারজনকে দেখেই রামসগেট বলল, ওই হচ্ছে খুনী। ওই বার্টনকে এবং আগের রাতে পিটারসনকে খুন করেছে। স্মিথ ওকে গতরাতে দেখেছে শিবিরে।

কর্ণেল বার্টন বলল, এ কখনই হতে পারে না। টারজন কখনই আমার ছেলেকে খুন করতে পারে না। আর গতরাতে ও আমারই কাছে ছিল। সুতরাং পিটারসনকে ও খুন করেনি।

টারজনকে সঙ্গে নিয়ে কর্ণেল বার্টন রামসগেট-দের শিবিরে গেলেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।

তিনি গিয়ে বললেন, এই শিবিরের কেউ কারো নামে কোন অভিযোগ করতে চায়?

বারবারা বলল, আমি ট্রেন্টের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনছি।

টারজন কর্ণেলের অনুমতি নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। সে প্রথমে সকলের ছুরি পরীক্ষা করল।

তারপর রামসগেটকে বলল, স্মিথ ও পিটারসনকে কতদিন থেকে চেন তোমরা ?

রামসগেট বলল, মাত্র কয়েকসপ্তা আগে আমাদের সফরীতে যোগদান করে ওরা।

পিটারসন কিছুটা খুঁড়িয়ে চলত ?

রামসগেট বলল, হ্যাঁ।

স্মিথ বলল, এ সব খোঁজে দরকার কি ? লোকটার মাথায় ছিট আছে।

টারজন হঠাৎ স্মিথের পেটের কাছে দেখল তার শার্টটা উঁচু হয়ে আছে। সে হাত দিয়ে দেখল সেখানে বেশ কিছু কাগজপত্র আছে।

টারজন এবার সকলের সামনে জোর গলায় বলল, ট্রেন্ট বার্টনকে খুন করেনি, স্মিথই হচ্ছে খুনী। সে বার্টনকে খুন করেছে। সে পিটারসনকেও খুন করেছে।

কর্ণেল বার্টন বললেন, কিন্তু কি কারণ থাকতে পারে এই খুনের ?

টারজন স্মিথের জামার তলায় লুকোন কাগজগুলো টেনে বার করে বলল, এই দরকারী কাগজগুলোই হলো একমাত্র কারণ। আসলে ওদের স্মিথ আর পিটারসন নাম নয়। স্মিথের আসল নাম হলো যোশেফ ক্যাম্পবেল আর পিটারসনের নাম হলো জুবানেভ। বার্টনের কাছ থেকে এই কাগজগুলো ছিনিয়ে নেওয়াই ছল ওদের একমাত্র লক্ষ্য। বার্টনের জীবিত অবস্থায় ওরা যদি চুরি করত কাগজগুলো তাহলে শিবিরের মধ্যে খোঁজ করলেই ধরা পড়ত ওরা। ক্যাম্পবেল তাই খুন করে ওকে। পরে ক্যাম্পবেল জুবানেভকেও খুন করে কারণ তাহলে এই কাগজগুলো ইতালি সরকারের কাছে বিক্রী করলে যা টাকা পাবে তাতে ভাগ দিতে হবে না কাউকে।

কর্ণেল বার্টনের সঙ্গে যে পুলিশবাহিনী ছিল তারা ক্যাম্পবেল ওরফে স্মিথকে গ্রেপ্তার করল।

রামসগেট কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল টারজনকে, জুবানেভই যে মৃত পিটারসন এটা কি করে বুঝলে ?

টারজন বলল, আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়টা বড় প্রবল। কারণ আমি জঙ্গলে ছোট থেকে পশুদের কাছে মানুষ। পশুদের মতই আমার ঘ্রাণশক্তি প্রবল। সভ্য জগতের কেউ বুঝতে পারবে না একথা। ওদের ভাঙ্গা বিমান দুটো আমি দেখেছি। সেখানে একটা দস্তানা কুড়িয়ে পাই। সেই দস্তানাটা শুঁকে যে গন্ধ পাই পিটারসনের মৃতদেহটা শুঁকেও সেই গন্ধ পেয়েছিলাম।

সব কথা শেষ করে সব রহস্যের সমাধান করে টারজন বলল, বিদায় বন্ধুগণ, আমি এবার আমার বাড়ি যাচ্ছি। মাঝে মাঝে আমার নিজের লোকদের দেখতে বাড়ি যাই বটে, কিন্তু জঙ্গলের ডাক না শুনে পারি না, তার টানে ধরা না দিয়ে পারি না।

টারজন ও চ্যাম্পিয়ন

টারজন এ্যাণ্ড দি চ্যাম্পিয়ন

এক বিশাল প্রান্তরেব এক প্রান্তে বনটা যেখানে থেমে গেছে সেখানে একটা মাল বোঝাই ভারী ট্রাক এগিয়ে যাচ্ছিল বনেব দিকে।

ট্রাকটা যেদিকে যাচ্ছিল তাব উল্টো দিকে প্রান্তরের উপব দূরে একজন পথিক দাড়িয়ে ছিল। ট্রাকটা দেখে অবাক হয়ে গেল পথিকটি।

হেলমেট মাথায় একজন শ্বেতাঙ্গ ট্রাকটা চালাচ্ছিল। তার পাশে বসে ছিল একজন নিগ্রো। ট্রাকের উপব যে সব মাল বোঝাই কবা ছিল তাব উপব আরো কয়েকজন নিগ্রো ছিল।

পথিকটি ধীর গতিতে ট্রাকটা যেদিক থেকে আসছিল সেই দিকে এগোতে লাগল। তার পরনে পোশাক বলতে ছিল মাত্র একটা কৌপীন। হাতে ছিল আদিম যুগের অস্ত্র—একটা তীর ধনুক, তূণ আব একটা বর্শা। তার কাঁধের উপব ছিল একটা ছোট বাঁদর। লোকটি জাতিতে শ্বেতাঙ্গ হলেও আফ্রিকায় দীর্ঘকাল থাকার জন্য রোদে পুড়ে পুড়ে গায়েব চামড়াটা তামাটে হয়ে যায়। বাঁদবটা একটা হাত দিয়ে লোকটির ঘাড়টা জড়িয়ে ধবে বসেছিল তার কাঁধের উপর। বাঁদরটার নাম কিমা।

ট্রাকেব ড্রাইভার দূরে টারজনকে দেখতে পেয়ে আদিবাসী ভেবে পিস্তলটা খাপ থেকে বার কবল। সে দেখল তার পাশে বসা যুবকটির হাতেও একটা রাইফেল রয়েছে।

ড্রাইভাব তার পাশের কৃষ্ণকায় নিগ্রো যুবকটিকে বলল, লোকটা কে?

যুবকটি উত্তর করল, একজন শ্বেতাঙ্গ মালিক।

টারজনের কাছে এসে ট্রাকটা থামাল শ্বেতাঙ্গ ড্রাইভার।

টারজন ট্রাকটার পাশে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারকে বলল, এখানে তোমরা কি করছ?

মেলটন তাব সামনে একজন নগ্ন লোককে দেখে তার এই প্রশ্নটাকে একটা বেয়াদবি বলে মনে করল।

মেলটন বলল, দেখছ ত, একটা লরী চালাচ্ছি।

টারজন এবার তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। বলে টারজন তখন তার একটা হাত বাড়িয়ে মেলটনের হাতের কব্জিটা ধরে তাকে জোর করে নামাল ট্রাক থেকে। তারপর তার পিস্তলটা কেড়ে নিল।

ট্রাকের উপরে যে সব নিগ্রো বসেছিল তারা হতবুদ্ধি হয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। তারা দেখল মেলটনকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তার ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল লোকটা।

মেলটনের গায়েও শক্তি ছিল। কিন্তু টারজনের সঙ্গে পেরে উঠল না সে। মেলটনের মনে হলো, কোন মানুষ নয়, সে যেন কোন বন্য জন্তুর কবলে পড়েছে।

টারজন এবার মেলটনকে ছেড়ে রাইফেল হাতে নিগ্রো যুবকটার দিকে তাকিয়ে বলল, রাইফেল ফেলে দাও।

যুবকটি ইতস্ততঃ করছিল। মেলটন বলল, ফেলে দাও।

মেলটন এরপর টারজনকে বলল, আমার কাছে কি জানতে চাও তুমি ?

আমি জানতে চাই তোমরা এখানে কি করছ।

আমি কয়েকজন আমেরিকান লোককে খুঁজতে যাচ্ছি।

তারা কোথায় ?

মেলটন বলল, ঈশ্বর জানেন। আজ সকালে তারা একটা ছোট গাড়িতে করে বেরিয়ে যায়। আমাকে বলেছিল বনটার প্রান্তে এসে অপেক্ষা করতে। সেখানে তাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে দিনের শেষে। হয়ত তাদের কোন বিপদ ঘটেছে।

এখানে কি করতে এসেছিল তারা ?

শিকার করতে।

এটা ত নিষিদ্ধ এলাকা। এদিকে কেন তারা এল ?

মুলারগান কোন কথা শুনবে না। সে নিজেকে সবজান্তা ভাবে। সে ভাবে সে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নামকরা হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন। এমন লোক জীবনে আমি দেখিনি কখনো। মুলারগানের ম্যানেজার লোকটা তত খারাপ নয়। কিন্তু লোকটা আধপাগলা, তার কথা শুনে হাসি পায়। সে শুধু নিউ ইয়র্কে ফিরে যেতে চায়। এখানে খুব ভয়ে ভয়ে আছে। ওরা দুজনে নিউ ইয়র্কে চলে গেলে আমি বাঁচি।

টারজন বলল, আর কেউ তাদের সঙ্গে নেই ?

না।

তাহলে তাদের আশা ছেড়ে দিতে পার। এটা সিংহের রাজ্য।

মেলটন বলল, তাহলেও আমার উপর যখন দায়িত্ব আছে তখন তাদের একবার খুঁজে দেখি, তুমি আবার বাধা দেবে না ত ?

না। যাও, খুঁজে দেখ। তবে বলবে তারা যেন এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়।

এই বলে টারজন বনের মধ্যে চলে গেল।

মেলটন চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে, পরিচয়টা দিলে না ?

টারজন বলল, আমার নাম টারজন।

একটা সিংহের গর্জনে বিশাল প্রান্তরের নিস্তব্ধতাটা ভঙ্গ হলো। সিংহটা তখনো অবশ্য দূরে ছিল। কিন্তু গাড়িতে বসে থাকা মুলারগান ও তার ম্যানেজারের কানে আসতে লাগল গর্জনটা।

মুলারগান বলল, ওটা কিসের শব্দ ?

মার্কস বলল, একটা শুয়োর।

দিনের আলো থাকলে শুয়োরটাকে মারা যেত। এখন গোটাকতক শুয়োরের চপ হলে ভাল হত। এখন দেখছি ঐ ইংরেজটা ছাড়াই আমরা চালিয়ে নিতে পারব।

মুলারগান বলল, তা অবশ্য বটে।

হঠাৎ সামনে একটা আলো দেখতে পেয়ে মার্কস বলল, ঐ দেখ আলো। মনে হয় আমাদের ট্রাকটা।

দুটো গাড়ি এক জায়গায় হলে সকলে গাড়ি থেকে নেমে হাত পা ছড়িয়ে বসল। তারা সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

মুলারগান ট্রাকের ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

মেলটন বলল, শিবির থেকে বেরিয়ে আমরা ত সোজা আসছি। আপনাদের হালকা গাড়ির মত এই ভারী ট্রাকটা এত খারাপ রাস্তায় তাড়াতাড়ি যেতে পারে না। যাই হোক, কোন শিকার পেলেন ?

না। আমার মনে হয় এখানে শিকারের মত কোন জীবজন্তু নেই।

শিকার যথেষ্টই আছে। এখানকার কোন জায়গায় স্থায়ীভাবে শিবির স্থাপন করলে শিকার পাওয়া যাবে।

মার্কস বলল, আমরা আজ কিছু বুনো মোষ দেখেছিলাম। কিন্তু মোষগুলো পালিয়ে গেল।

মুলারগান বলল, আমি পায়ে হেঁটে কিছুদূর তাদের অনুসরণ করেছিলাম। কিন্তু তারা পালিয়ে যায়।

আপনার ভাগ্য ভাল যে পালিয়ে গেছে।

তার মানে ?

আপনি যদি তাদের একটাকে গুলি করতেন তাহলে আপনি নিজেই মারা পড়তেন।

মুলারগান বলল, তুমি যা খুশি বলতে পার। কিন্তু আমি গবাদি জাতীয় কোন পশুর ভয়ে ভীত নই।

মেলটন নিগ্রোদের সাহায্যে সেখানেই শিবির গড়তে লাগল। মুলারগান ও মার্কসকে বলল, আজকের মত এখানেই রাত কাটানো যাক। কাল সকালে ত ফিরে যেতেই হবে।

মুলারগান চীৎকার করে বলল, ফিরে যাব মানে ? এখানে আমি শিকার করতে এসেছি। শিকার করব।

মেলটন বলল, আজ পথে একটা লোকের সঙ্গে আমার দেখা হলো। সে বলল এটা নিষিদ্ধ অঞ্চল। আমাদের চলে যেতে হবে।

সে আমাদের চলে যেতে বলার কে ? সে কে তা বলেছিল তোমায় ?

তার নাম টারজন।

তাকে বলেছিলে আমি কে ?

হ্যাঁ বলেছিলাম। কিন্তু সেটা সে গ্রাহ্য করেনি।

সে কি ভাবে, আমাকে আফ্রিকা থেকে তাড়িয়ে দেবে সে ?

মেলটন বলল, সে যখন বলেছে তখন চলে যাওয়া উচিত।

মার্কস হেসে বলল, আমি এখনি চলে যাবার জন্য প্রস্তুত। এই জবসদি নিয়ে আফ্রিকায় থাকা উচিত নয়।

মুলারগান বলল, আমি ভাল শিকার না পাওয়া পর্যন্ত যাব না।

নিগ্রোরা ট্রাক থেকে মালপত্র নামাতে লাগল। একজন রাতের রান্নার জন্য আগুন জ্বালাল। অনেকে হাসিঠাট্টা ও গান করতে লাগল। একজন নিগ্রো মাথায় করে ভারী একটা বোঝা ট্রাক থেকে নামিয়ে শিবিরে ঢুকতে গিয়ে মুলারগানের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। মুলারগান পড়ে যায়। সে উঠে একটা চড় মারে নিগ্রোটাকে।

মেলটন এগিয়ে এসে মুলারগানকে বলল, আর তুমি কখনো ওদের গায়ে হাত দেবে না, আমি অনেক সহ্য করেছি এতদিন। আর কারো গায়ে হাত দেবে না।

মুলারগান তখন রেগে গিয়ে বলল, তাহলে তোমারও একটা চড় খাবার মন হয়েছে।

কিন্তু সে মেলটনকে চড় মারতে উদ্যত হতেই পিস্তল উঁচিয়ে ধরল মেলটন। বলল, বাঁচতে চাও ত দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাও।

মুলারগান মুখ ঘুরিয়ে চলে গিয়ে মার্কসকে বলল, ইংরেজরা রসিকতা বোঝে না।

ওদের সকলের রাতের খাওয়া হয়ে গেলে একটা সিংহের গর্জন শুনতে পেল ওরা। মনে হলো সিংহটা ওদের শিবিরের খুব কাছেই আছে।

মুলারগান বলল, সেই শুয়োরটা।

মেলটন বলল, কোথায় শুয়োর ?

শব্দ শুনতে পাচ্ছ না ?

মুলারগান ট্রাকের পাশে গিয়ে স্পটলাইট ঘোরাতেই দেখল একটা বড় সিংহ দাঁড়িয়ে রয়েছে ! সিংহের চোখে জোর আলো পড়তে সে আস্তে আস্তে চলে গেল।

আফ্রিকায় বাবাঙ্গো নামে এক ধরনের আদিবাসী আছে। তাদের দেহগুলো খুবই বলিষ্ঠ। মাথাগুলো কামানো। দাঁতগুলো খুব সাদা ঝকঝকে না হলেও তারা নরখাদক। অন্যান্য জীবজন্তুর থেকে মানুষের মাংস খেতে তাদের ভাল লাগে বলেই তারা মানুষ খায়। তারা জীবজন্তু শিকারের মতই খাবার জন্য মানুষ শিকার করে। অন্য সব অঞ্চলের লোকরা তাদের ভয় করে।

সম্প্রতি টারজনের কাছে একটা খবর যায়, বাবাঙ্গোরা দখলিভুক্ত এক অঞ্চলের অধিবাসীদের আক্রমণ করেছে। টারজন তাই বহু দূর থেকে বহু পথ হেঁটে এ বিষয়ে তদন্ত করতে এসেছে। তার পিছনে সর্দার মুভিরোর অধীনে একদল ওয়াজিরি যোদ্ধা আসছে।

মেলটনের সঙ্গে টারজনের যেদিন দেখা হয় তার পরদিন সকালে টারজন সেই প্রান্তরের কাছাকাছি বনের ভিতর দিয়ে পথ হাঁটছিল সচকিতভাবে। পথের ঘাসের ভিতর বিষাক্ত পোকা, গাছের উপর ওৎ পেতে থাকা চিতা, কালো পিঁপড়ে প্রভৃতি সব কিছুর সামনে কড়া নজর রেখে চলেছিল সে।

সহসা একটা মোটর গাড়ির শব্দ শুনতে পেল টারজন। তারপরই দেখল একদল জেব্রা ছুটে পালাচ্ছে আর একটা চলন্ত মোটর গাড়ি থেকে একটা লোক একটা সাব-মেশিনগান থেকে গুলি করছে। গুলি করতে করতে চলে গেল গাড়িটা। সেই গুলিতে অনেকগুলো জেব্রা মারা গেল, অনেকগুলো আহত হলো। কিন্তু অকারণে নিরীহ জন্তুগুলোকে মেরে চলে গেল গাড়িটার আরোহীরা। গাড়িটাতে ছিল মাত্র দুজন লোক।

গাড়িটা যেদিকে গেল সেইদিকেই এগিয়ে যেতে লাগল টারজন। সে ভাবল, ঘটনাক্রমে লোকদুটোর সঙ্গে দেখা তার হবেই। তখন দেখা যাবে।

এদিকে মুলারগান তার মোটরগাড়িটা আরো কিছুদূর নিয়ে গিয়ে একটা খাদের কাছে থামল। তারপর মার্কসকে বলল, যদি এমনি করে একদল সিংহের দেখা পেতাম জো, তাহলে কেমন মজা হত ?

মার্কস বলল, চমৎকার হয়েছে। তোমার লক্ষ্য ভাল। সব তাড়িয়ে দিয়েছ ঝাঁকের মধ্যে গুলি করে।

খাদের কাছে এসে বনটা থেমে গেছে। ওরা বসে কথা বলছিল। মুলারগান বলল, আমাদের এখন থামলে চলবে না। এমন সব জিনিস শিকার করে নিয়ে গিয়ে তার নমুনা দেখাতে হবে যা দেখে তাক লেগে যাবে সাংবাদিকদের।

সহসা একটা হাতি দেখতে পেয়ে তার সাব-মেশিনগানটা তুলে নিল মুলারগান। সে গুলি করল। কিন্তু একটা নয়, পর পর অনেকগুলো হাতি এগিয়ে আসছে এই দিকে। গুলিটা কোন হাতির গায়ে লাগেনি।

হাতিদের চোখ ছোট বলে তারা ওদের গাড়িটার কাছে এসে চারদিকে তাকাতে লাগল। বিপদটা কোনদিকে তা দেখতে কিছুটা সময় লেগে গেল হাতিগুলোর। এই অবসরে আবার গুলি ভরে গুলি করল মুলারগান। একটা হাতি পড়ে গেল। অন্যগুলো পালিয়ে গেল। কিন্তু একটা পুরুষ হাতি পাগলা হয়ে ছুটে এল। মুলারগান আর মার্কস গাড়িটার উল্টো দিকে চলে গেল। হাতিটা উল্টে দিল গাড়িটাকে। চাকাগুলো উল্টে গেল উপর দিকে।

হাতিটা আগেই গুলি খেয়েছিল। এবার উল্টে পড়ে গেল।

মুলারগান বলল, আমাদের হাতের পিস্তল ছাড়া আর সব অস্ত্র গাড়িটার মধ্যে চাপা পড়ে গেল।

এদিকে টারজন বন্দুকের গুলির আওয়াজের সঙ্গে হাতিদের আর্তনাদ শুনতে পায়। সে বুঝতে পারল যে দুজন শ্বেতাঙ্গ জেব্রাদের ঝাঁকে গুলি করেছে তারাই হাতিদেরও মারছে।

এক প্রচণ্ড রাগে অভিভূত হয়ে সেই শব্দ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল টারজন। খাদের কাছে গিয়ে সে থামতেই দেখতে পেল মুলারগান আর মার্কস।

কিমা মারপিটের আশঙ্কায় টারজনের কাঁধ থেকে একটা গাছের উপর বসে দেখতে লাগল কি হয়।

টারজন তাদের কাছে গেলে মুলারগান তাকে বলল, কি চাও তুমি ?

মরা হাতিটাকে দেখিয়ে টারজন বলল, তোমরা এটাকে মেরেছ ?

মেরেছি ত কি হয়েছে ?

পিস্তলটা হাতে ধরে বলল মুলারগান।

টারজনও তোমাদের মারবে।

মুলারগান তার পিস্তল থেকে গুলি করতে না করতেই পা দিয়ে লাথি মেরে তার হাত থেকে পিস্তলটা ফেলে দিল টারজন। মার্কসএর হাত থেকেও পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

মুলারগান বলল, তুমি টারজন না ?

এই বলে টারজনের মুখে একটা ঘুষি মারতে

গেলে সরে গেল টারজন। তারপর মুলাবগানের মাথার পাশে এমন একটা চড় মারল যাতে সে পড়ে গেল মাটিতে।

মার্কস ভয়ে লাফাতে লাফাতে চীৎকার করে মুলারগানকে বলতে লাগল, উঠে পড়। ওকে মেরে ফেল।

মুলারগান আবার উঠে দাঁড়িয়ে টারজনকে ঘুষি মারতে লাগল। কিন্তু তাতে কিছুই হলো না তার। টারজন এবার মুলারগানকে ধরে উপরে উঠিয়ে মাটিতে জোরে ফেলে দিল। তারপর তার বুকের উপর বসে তার গলাটা দুহাত দিয়ে টিপে ধরল।

মুলারগান অস্পষ্টভাবে মার্কসকে বলতে লাগল, আমাকে বাঁচাও। আমাকে মেরে ফেলছে।

এমন সময় কিমা চীৎকার করে উঠল অন্য কারণে। কিমা চীৎকার করে টারজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু টারজন তখন একমনে লড়াই করাতে শুনতে পায়নি তা সময়ে।

মার্কসও দেখতে পায়। কিন্তু তখন বড় দেরী হয়ে গেছে। খাদের ওপার থেকে প্রায় একশো-জন বাবাঙ্গো এসে কখন ওদের ঘিরে ফেলেছে তা বুঝতে পারেনি ওরা। বাবাঙ্গোরা ওদের জীবন্ত ধরে নিয়ে যেতে চাইল। তাই ওরা ওদের কোন-রকম আঘাত না করেই বেঁধে ফেলল পিছন থেকে।

টারজন কিছুটা লড়াই করল প্রথমে। কিন্তু সংখ্যায় ওরা অনেক বেশী ছিল বলে পেরে উঠল না। সেও বন্দী হলো।

বন্দীদের পিছনে বর্শা দিয়ে খোঁচা দিতে দিতে বাবাঙ্গোরা তাদের গায়ে নিয়ে গেল তাদের। কিমা তখন হতাশ হয়ে বনের শেষে সেই প্রান্তরটার দিকে ছুটে গেল।

বনের মধ্য দিয়ে একটা পায়ে চলা পথের উপর দিয়ে তিনজন শ্বেতাঙ্গ বন্দীকে তাদের গাঁয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল বাবাঙ্গোরা।

মার্কস একসময় ভয়ে ভয়ে মুলারগানকে জিজ্ঞাসা করল, ওরা আমাদের নিয়ে কি করবে?

মুলারগান বলল, ঐ লম্বা চওড়া টারজন নামের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করো।

মার্কস বলল, লোকটা মানুষ নয়, পশু। ওর গর্জন শুনেছিলে? ও তোমাকে ফ্লাইওয়েটের মত তুলেছিল আর হেভিওয়েটের মত মাটিতে ফেলে-ছিল। খুব ভাগ্য ভাল যে বেঁচে গেছ।

অবশেষে একটা ছোট নদী যেখানে একটা বড় নদীতে গিয়ে পড়েছে সেখানে এলোমেলোভাবে গড়ে ওঠা একটা অস্থায়ী শিবিরে গিয়ে থামল বাবাঙ্গোরা।

শিবিরের সামনে গিয়ে ওরা দাঁড়াতেই অনেক নারী ও শিশু ছুটে এল চীৎকার করতে করতে। নারীরা থুথু ফেলতে লাগল বন্দীদের উপর আর ছেলেরা ছড়ি দিয়ে মারতে লাগল। তখন যোদ্ধারা তাদের সরিয়ে দিল।

এরপর বন্দীদের গলায় দড়ি দিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো।

মার্কস অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়ায় মাটিতে শুয়ে পড়ল। মুলারগান ঠেস দিয়ে বসে রইল। টারজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকের পরিবেশ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সে একমনে শুধু মুক্তির কথা চিন্তা করতে লাগল।

সহসা কি একটা আর্তনাদ শুনে মার্কস তার সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বলল, ওটা কিসের শব্দ? শুনতে পাচ্ছ?

নদীর দিক থেকে একটা আর্তনাদ আসছিল। কিন্তু নদীর ধারে গাছপালা থাকার জন্য ওরা কিছু দেখতে পাচ্ছিল না।

টারজন বলল, ওটা খাওয়ার থেকে আরও খারাপ। ওরা খাবার মাংসগুলোকে নরম করছে। যারা আর্তনাদ করছে তারা হলো কিছু নরনারী আর শিশু। তিন চারদিন আগে ওদের হাত পা ভেঙ্গে দিয়েছে। ওদের মাথাগুলোকে বাঁশের লাঠির সঙ্গে বেঁধে এমনভাবে নদীর জলে ঝুলিয়ে রেখেছে যাতে ওরা ডুবে না যায় বা আত্মহত্যা করতে না পারে। ওরা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। এইভাবে তিন চারদিন ওদের মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে তারপর ওদের কেটে সেই মাংস খাবে।

একথা শুনে মুলাবগানের মুখ সাদা হয়ে গেল। ভয়ে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল মার্কস।

টারজন বলল, তোমরা ভয় পেয়ে গেছ। কষ্টভোগ করতে চাও না। কিন্তু জেব্রা আর হাতিগুলো তোমাদের আঘাতে অনেক কষ্ট অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছে।

মুলাবগান বলল, ওরা পশু। কিন্তু আমরা মানুষ।

টারজন বলল, তোমরাও একদিক দিয়ে জন্তু। আহত হলে জন্তুদের মতই তোমাদেরও কষ্ট হয়। বাবাঙ্গোরা তোমাদের খাবার জন্য তোমাদেরও কষ্ট দেবে—এতে আমি খুশি। তোমরা বাবাঙ্গোদের থেকেও খারাপ। হাতি ও জেব্রাগুলোকে মারার কোন কারণ ছিল না তোমাদের।

এরপর তিনজনই চুপ করে রইল। সবাই ভাবতে লাগল। মার্কস ভয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মুলাবগানও ভেঙ্গে পড়ল। সব সাহস হারিয়ে ফেলল।

মুলাবগান অবশেষে বলল, আমি তোমার কথাটা ভাবছি। সত্যিই আমরা জীবহত্যা করে আনন্দ পাই। এ কথাটা কোনদিন ভেবে দেখিনি। এখন বুঝছি এ সব কাজ না করলেই ভাল হত।

সে রাত্রিতে বন্দী তিনজনকে এক জায়গায় শুতে দেওয়া হলো। সে রাত্রিতে উৎসবে মেতে রইল বাবাঙ্গোরা। তাদের কথাবার্তা থেকে টারজন বুঝতে পারল পরদিন রাত্রিতে বন্দী শ্বেতাঙ্গদের হাত পা ভেঙ্গে জলে ভাসিয়ে দেবে।

টারজন মুলারগানকে বলল, আমি তোমার হাতের বাঁধন খুলে দেব প্রথমে। তারপর তুমি আমার বাঁধন খুলে দেবে।

মুলাবগান বলল, ঠিক আছে।

বন্দীদের কাছে কোন প্রহরী ছিল না। টারজন জানত ওদের উন্মত্ত নাচগান বন্ধ হলেই ওরা পাহারার ব্যবস্থা করবে। সে প্রথমে মুলারগানের বাঁধনটা খুলে দিল। মুলাবগান তারপর টারজনের হাতের বাঁধন খুলে দিল। মার্কসএর বাঁধন আরো সহজে খোলা হয়ে গেল।

তিনজনই এইভাবে মুক্ত হলে টারজন চুপি চুপি তাদের বলল, আমার পিছু পিছু তোমরা বুকে হেঁটে এস। কোন গোলমাল করবে না।

মুলাবগান পশুহত্যার ব্যাপারে তার দোষ স্বীকার করায় টারজন তাদের একটা সুযোগ দিতে চায় তাদের মুক্ত করে।

টারজন বুকে হেঁটে বনের দিকে ফাঁকা জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেল। সে একা ওদের সামনে দিয়ে ছুটে পালাতে পারত বনে। কারণ ওর গতিবেগ অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুত। ওরা ধরতে পারত না ওকে। কিন্তু সঙ্গে আরও দুজন লোক আছে। তাদের নিয়ে কোনরকমে ওদের অলক্ষ্যে অগোচরে বনের মধ্যে চলে যাওয়াই হলো ওর একমাত্র লক্ষ্য।

ওরা এইভাবে প্রায় একশো ফুট যাওয়ার পর কয়েকবার হাঁচতে থাকে মার্কস। সেই শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে বাবাঙ্গোরা।

টারজন তখন ওদের বলে, এবার উঠে পড়ে বনের দিকে ছুটতে থাক।

ওরা সবাই বনের দিকে ছুটতে থাকলে বাবাঙ্গোরাও ওদের ধরার জন্য ছুটতে থাকে। প্রথমে মার্কসকে ওরা সহজেই ধরে ফেলল। তারপর মুলারগানকে। টারজনকে ওরা ধরতে পারল না। মুলারগানও হয়ত পালাতে পারত। কিন্তু সে মার্কসকে ফেলে রেখে উদারতার বশবর্তী হয়ে পালাতে চায়নি।

মুলারগানকে ওরা ধরে ফেললেও সহজে কিন্তু ধরা দিতে চায়নি সে। সে পর পর ঘুষি চালিয়ে কয়েকজনকে মাটিতে ফেলে দেয়। কিন্তু পিছন থেকে একজন বাবাঙ্গো এসে বর্শার লম্বা বাটটা দিয়ে তার মাথায় এমনভাবে মারল যে সে পড়ে গেল মাটিতে।

ফাঁকা জায়গাটার শেষ প্রান্ত থেকে বনটা শুরু হয়েছে। একটা গাছের উপরে উঠে টারজন দেখতে লাগল। মুলারগানের বীরত্ব ও সাহসের জন্য মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না সে। একজনকে বাঁচাতে গিয়ে সে তার আত্মত্যাগ ভিত্তিক যে বীরত্বের পরিচয় দিল সে আজ সে বীরত্ব বনের পশুদের মধ্যে দেখাই যায় না।

কিমা আবার প্রান্তর পার হচ্ছে। কিন্তু এবার একা একা নয় বা টারজনের কাঁধে চড়ে নয়, এবার সে ওয়াজিরিসর্দার মুভিরোর কাঁধে চড়ে সেই প্রান্তরটার উপর দিয়ে যাচ্ছিল। টারজনের মত মুভি-

রোর কাঁধের উপর থাকলেও কিমার সাহস দারুণ বেড়ে যায়। তার হৃদযন্ত্রটা হয়ে ওঠে সিংহের মত।

মেলভিল তার দল নিয়ে মুলারগানদের দেখতে না পেয়ে বন থেকে ফিরে আসার পথে মুভিরোর নেতৃত্বে ওয়াজিরিদলটাকে দেখতে পেল।

সে তার বাইনোকুলার দিয়ে ভাল করে দেখল দলটাকে। তারা আদিবাসী যোদ্ধা হলেও তাদের হাবভাব মোটামুটি বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হলো। তবু সে লরীর উপর বসে থাকা নিগ্রোদের সব বাড়তি রাইফেলগুলোকে ঠিক করে রাখতে বলল।

কিন্তু একজন নিগ্রো বলল, ওরা কিছু করবে না। ওদের গুলি করবেন না। তাহলে আমাদের সকলকে মেরে ফেলবে। ওরা হলো বিরাট যোদ্ধা, ওদের বলে ওয়াজিরি। এই অঞ্চলের কোন একটা জায়গা বাবাঙ্গোরা আক্রমণ করেছে তাই ওরা বাবাঙ্গোদের তাড়িয়ে দিতে যাচ্ছে। তবে ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করবে না।

মুভিরো ট্রাকের সামনে এসে হাত তুলে ট্রাক থামাল।

মেলটন গাড়ি থামাল। মুভিরো তাকে জিজ্ঞাসা করল, কোথা হতে আসছ?

মেলটন খাদের কাছে আসার পথে জেব্রাদের মৃতদেহ দেখে বুঝতে পারল মুলারগানরা কোন্ পথে গেছে। আরো এগিয়ে গিয়ে একটা খাদের ধারে মুলারগানের মোটরটা উল্টোন অবস্থায় দেখে।

মেলটন কাছে গিয়ে যা যা দেখেছিল এবং যাদের খোঁজে সে গিয়েছিল তা বলল সব।

মুভিরো বলল, তোমাদের বন্ধু দুজন ছাড়া আর কোন শ্বেতাঙ্গকে দেখেছিলে?

গতকাল টারজন নামে এক শ্বেতাঙ্গকে দেখেছিলাম।

তোমাদের লোকের সঙ্গে তিনিও কি ধরা পড়েছেন?

মেলটন বলল, তা ত জানি না।

মুভিরো বলল, আমাদের সঙ্গে এসে বনের প্রান্তে শিবির স্থাপন করো। তোমার বন্ধুরা যদি বেঁচে থাকে তাহলে তাদের আমরা ফিরিয়ে আনবই।

যাই হোক ওয়াজিরি যোদ্ধারা বেশ জোর কদমে চলতে লাগল। মেলটন তার ট্রাকটা ধীর গতিতে চালিয়ে তাদের পিছু পিছু যেতে লাগল।

এদিকে বাবাঙ্গোরা সারারাত উৎসবে মেতে থাকার পর গভীরভাবে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। তারা দুপুরের আগে উঠবে না। তাদের একজন বন্দী পালিয়ে গেছে। তার উপর মুলারগানের আঘাতে তাদের কয়েকজনের চোয়াল আর নাক ভেঙ্গে গেছে।

বাবাঙ্গোদের সঙ্গে লড়াইয়ে মুলারগানের মাথাটা ব্যথা করছিল। মার্কস-এর সর্বাঙ্গ ব্যথা করছিল। সে বলল, নোংরা লোকগুলো আমাদের দেহের তিন চার জায়গার হাড়গোড় ভেঙ্গে জলে তিন চার দিন ডুবিয়ে রাখবে। তারপর খাবে।

মুলারগান তাকে ধমক দিয়ে বলল, চুপ করো। আমি এসব কথা ভুলে যেতে চাইছি।

টারজন ওয়াজিরিদের সন্ধানে বন পার হয়ে সেই প্রান্তরের কাছে গেল। কিন্তু তাদের দেখা না পেয়ে আবার সে বনের মধ্য দিয়ে গাছে গাছে বাবাঙ্গোদের বস্তীর সামনে এসে হাজির হলো। সে বুঝতে পারল সে একা কখনো তাদের কবল থেকে বন্দী দুজনকে মুক্ত করতে পারবে না।

অন্য পথ দিয়ে সে শিবিরে পৌঁছল। সেই নদীটার ধারে এসে দেখল নদীর জলে ভিজিয়ে রাখা বন্দীরা তখনো তেমনিভাবে আছে। শিবিরের কাছে সে সিংহের গন্ধ পেল। গন্ধ শুঁকে সে বুঝল একটা সিংহ আর সিংহী ক্ষুধার্ত অবস্থায় শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রায় একডজন বাবাঙ্গো যোদ্ধা মুলারগান আর মার্কসএর কাছে এসে তাদের বাঁধন কেটে দিল। তারপর তাদের দেহদুটোকে জোরে নাড়া দিয়ে তাদের দাঁড় করিয়ে দিল।

এরপর তারা তাদের বস্তীর মধ্যভাগে নিয়ে গেল। সেখানে একটা গাছের তলায় তাদের সর্দার আর যাদুকর ডাক্তার বসে ছিল। যোদ্ধারা অর্ধ বৃত্তাকারে তাদের সর্দারকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের পিছনে ছিল নারী আর শিশুরা।

তখন রাত্রিকাল বলে শিবিরের ধারে আগুন জ্বলছিল।

বন্দী দুজনকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে দেওয়া হলো। দুজন যোদ্ধা তাদের প্রতিটি হাত পা ধরে ছিল।

অদূরে একটা গাছের উপরে ঘন পাতার আড়াল থেকে সব কিছু লক্ষ্য করছিল এক নগ্নপ্রায় শ্বেতাঙ্গ। বন্দীদের উদ্ধার করার একটা সুযোগ খুঁজছিল সে। সুযোগ না পেলে সে কিছুই করতে পারবে না। সে ওদের বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন দিতে পারবে না।

এদিকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের কাছ থেকে দুটো সিংহ এক নিমেষহারা চোখে তাকিয়ে ছিল ঘটনা-স্থলের দিকে। তাদের লেজদুটো নড়ছিল।

এমন সময় নদী থেকে একটা আর্তনাদের শব্দ পেয়ে সিংহীটা সেইদিকে চলে গেল। কিন্তু সিংহটা লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাবাঙ্গোদের দিকে।

যাদুকর ডাক্তার বন্দী দুজনের দিকে এগিয়ে এল। তার এক হাতে ছিল একটা জেব্রার লেজ। সে লেজের উপর পালক লাগানো ছিল। আর এক হাতে ছিল একটা লাঠি।

প্রার্থনার কথাগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করল মুলারগান। তাদের দুজনের উপর জেব্রার লেজটা বুলিয়ে তাদের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল সে আর কি সব বিড় বিড় করে বলতে লাগল।

এরপর হঠাৎ একসময় সে একটা লাফ দিয়ে মুলারগানের শায়িত দেহটার উপর তার লাঠিটা ঘোরাতে লাগল। দুজন যোদ্ধা তাকে আলগা করে ধরে ছিল।

যোদ্ধাদের হাতগুলো এক ঝটকায় সরিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুলারগান। তারপর যাদুকর ডাক্তারের মুখের উপর এমন জোরে একটা ঘুষি মারল যার ফলে তার চোয়াল ভেঙ্গে গেল আর সে মাটিতে পড়ে গেল।

সমবেত যোদ্ধারা চীৎকার করে ঘিরে ধরল মুলারগানকে।

এদিকে সিংহীটা নদীর ধার থেকে তার ধারাল নখওয়ালা একটা থাবা বাড়িয়ে বাবাঙ্গোদের বলি একজন নারীর ভেসে থাকা মাথাটাকে ধরে ফেলল।

মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠতেই বাবাঙ্গোরা সেদিকে মনোযোগের সঙ্গে তাকাতেই সিংহটা তাদের আক্রমণ করল। তার ভয়ঙ্কর গর্জনে মাটি কাঁপতে লাগল।

বাবাঙ্গোরা তখন বন্দী দুজন আর আহত যাদুকর ডাক্তারকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল যে যেদিকে পারল।

মুলারগান উঠে দাঁড়াবার আগে সিংহটা তার কাছে গিয়ে পড়ল। শায়িত লোকটির ভীত সন্ত্রস্ত চোখপানে তাকিয়ে রইল সিংহটা। মুলারগান তার নিঃশ্বাসের গন্ধ পাচ্ছিল। তার হলুদ চোয়াল আর দাঁত দেখতে পাচ্ছিল।

এমন সময় একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল মুলারগান। এ দৃশ্য সত্যিই অভূতপূর্ব।

দেখল টারজন গাছ থেকে নেমে লাফিয়ে পড়ল সিংহটার উপর।

দেখল টারজনের পাদুটো সিংহের ছোট ছোট পা দুটোকে জড়িয়ে ধরেছে। তার বেশীবহুল লৌহ-কঠিন হাতদুটো সিংহের গলাটা জড়িয়ে ধরে আছে। টারজন তার দেহের সমস্ত ভার দিয়ে চেপে আছে সিংহটার পিঠে।

সিংহটা তার পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে খাড়া টারজানের দেহটাকে ফেলে দিতে চাইছে আর ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করছে। কিন্তু কিছুতেই মুক্ত করতে পারছে না নিজেকে।

মুলারগান দেখল সিংহটা এবার নিজে থেকে মাটিতে পড়ে টারজনকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাও পারছে না।

জীবনে বহু লড়াই, বহু কুস্তীর প্যাঁচ দেখেছে মুলারগান। কিন্তু সিংহ ও মানুষে এমন প্রাণপণ লড়াই জীবনে কখনো কোথাও দেখেনি বা তার কথা শোনেওনি।

সিংহদের শক্তির অনুপাতে সহ্যশক্তি নেই। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল সিংহটা। সে এবার চারপায়ের উপর ভর দিয়ে কোনরকমে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

টারজন তখন একটা হাত সিংহটার ঘাড় থেকে ছাড়িয়ে খাপ থেকে তার শিকারের ছুরিটাকে বার করল। এই সুযোগে সিংহটা ঘুরে টারজনের হাতটাকে কামড়াতে গেল। কিন্তু টারজন তার ছুরিটা সিংহের ঘাড়ের উপর আমূল বসিয়ে দিল।

সিংহটা বিকট গর্জন করতে করতে যতবার শূন্যে লাফ দিতে লাগল ততবারই তার ঘাড়ে ও পাঁজরে ছুরিটা সজোরে আমূল বসিয়ে দিতে লাগল টারজন।

সিংহটা পড়ে গেলে তার মৃতদেহের উপর একটা পা রেখে আকাশের পানে মুখ তুলে বিজয়ী বাঁদরগোরিলাদের মত ভয়ঙ্করভাবে চীৎকার করে উঠল টারজন। তা শুনে মাটিতে বসে পড়ল মার্কস। মুলারগানের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। বাবাঙ্গোরা সিংহগর্জনের থেকে আরো ভয়ঙ্কর সেই অচেনা চীৎকার শুনে ছুটে আরো দূরে পালাতে লাগল।

টারজন বন্দীতজনকে মুক্ত করে সেই নৈশ অন্ধকার বনের মধ্য দিয়ে সেই প্রান্তরের কাছটায় নিয়ে এল।

পরদিন আপন আপন লোকদের সঙ্গে মিলন হলো সকলের। মুলারগান আর মার্কস মেলটনের সঙ্গে এক শিবিরে রইল। টারজন ওয়াজিরিদের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগল। বাবাঙ্গোদের ঐ অঞ্চল হতে তাড়াবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে লাগল তারা।

যাবার আগে টারজন মুলারগান ও মার্কসকে বলল, আফ্রিকা থেকে সোজা আমেরিকায় চলে যাবে। আর কখনো আসবে না।

মুলারগান বলল, কখনো না। একথাটা ক'দিন মনে রাখতে পারব তা জানি না।

মার্কস টারজনকে বলল, শোন মিস্টার, তুমি যদি আমার হয়ে একবার কুস্তি লড়ো তাহলে তোমাকে একশো স্বর্ণমুদ্রা দেব।

টারজন মুখ ঘুরিয়ে ওয়াজিরিদের সঙ্গে চলে গেল সেখান থেকে।

মার্কস মুলারগানকে বলল, দেখলে, লোকটা একশো স্বর্ণমুদ্রা প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল! এরে তোমার পক্ষে ভালই হয়েছে। কারণ ও একবার লড়াইয়ে নামলে এক রাউণ্ডেই তোমার চ্যাম্পিয়ন-পদ কেড়ে নিত।

—— ——

সেদিন আফ্রিকার বিষুবরেখার পাঁচ ডিগ্রী উত্তরে এক শূন্য বিশাল প্রান্তরে আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি করে যাচ্ছিল জ্বলন্ত সূর্য। একটি লোক একটা ছেঁড়া শার্ট আর ছেঁড়া পায়জামা পরে টলতে টলতে অতি কষ্টে পথ হাঁটছিল। তার জামা ও পায়জামার উপর ছিল শুকনো রঙের দাগ। হাঁটতে হাঁটতে একসময় সে মাটিতে পড়ে গিয়ে অনড় হয়ে শুয়ে রইল।

ঝোপে-ঢাকা একটা ছোট পাহাড়ের মাথা থেকে একটা সিংহ এই দৃশ্যটির উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকিয়ে ছিল।

একটা শকুনি আকাশে ঘুরতে ঘুরতে শায়িত লোকটিকে মৃত ভেবে লক্ষ্য করছিল তীক্ষ্ণ ও লুব্ধ দৃষ্টিতে।

সেই প্রান্তরটার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে অন্য একটি লোক এগিয়ে আসছিল উত্তর দিকে। কোন ক্লান্তি বা অবসাদের চিহ্ন ছিল না লোকটির মধ্যে। তার পেশীবহুল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে বাদামী রঙের চামড়াটা চকচক করছিল। এক অবাধ উচ্ছলতায় ভরা তার প্রতিটি নিঃশব্দ পদক্ষেপ শীতা বা চিতাবাঘের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু তার চেহারায় বা চোখে মুখে কিছুমাত্র সংশয় বা শঙ্কার চিহ্নমাত্র ছিল না।

পোশাক বলতে একটা শুধু কৌপীন জড়ানো ছিল তার কোমরে। তার একদিকের কাঁধে ঝোলানো ছিল একটা ঘাসের দড়ি আর একদিকের কাঁধে ছিল তীরভরা একটা তূণ। কোমরে ঝোলানো ছিল খাপে ভরা একটা ছোরা। তার এক হাতে ছিল একটা বর্শা আর এক হাতে ছিল একটা ধনুক। তার শান্ত-ধূসর একজোড়া চোখের উপর একঝাঁক কালো লম্বা চুল এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিল মাথাটার চারপাশে।

সিংহটার বাসা এখান থেকে অনেক দূরে উত্তর দিকে হলেও এ জায়গাটা অচেনা নয় তার।

দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে এগিয়ে আসা লোকটি হলো টারজন।

সে এখানে এসেছে এক সম্রাটের আদেশে একটি গুজবের বিষয়ে তদন্ত করতে। গুজবটা হলো এই যে ইউরোপীয় শক্তি নাকি ঘুষ নিয়ে স্থানীয় এক উপজাতি দলের সর্দারকে হাত করছে। তখন যুদ্ধ চলছিল সারা দেশ জুড়ে।

টারজন পথ চলতে চলতে তার সামনে সাদা চকচকে কি একটা বস্তুকে পড়ে থাকতে দেখল। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই সে দেখল শুধু একটা মাথার খুলি নয় একটা গোটা নরকঙ্কাল পড়ে রয়েছে। আরও দেখল কঙ্কালটা অনেক দিন ধরে পড়ে আছে। কিছু কাঁটা গাছ গজিয়ে উঠেছে তার মধ্যে থেকে। দেখল তার পাশে একটা ভাঙ্গা লাঠির ডগায় এক-টুকরো রেশমী কাপড়ে বাঁধা একটা চিঠি। কাপড়টা শুকিয়ে মড়মড়ে হয়ে গেলেও তার ভিতরে চিঠিটা ঠিক আছে।

টারজন চিঠিটা খুলে দেখল সেটা ইংরিজিতে লেখা এবং হাতের লেখাটা বেশ পরিষ্কার। চিঠিতে লেখা আছে, জানি না এ চিঠি কার হাতে পৌঁছবে। আমি এই চিঠি একজনের মাধ্যমে পাঠাচ্ছি, কিন্তু জানি না সে এই অভিশপ্ত দেশ থেকে বার হতে পারবে কি না। সে আশা আমি করি না। তবে যদি কোনদিন এ চিঠি কোন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির হাতে পড়ে তাহলে তিনি যেন নিকটবর্তী কোন রেসিডেন্ট কমিশনার বা কোন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন যাতে তাঁরা তাড়াতাড়ি আমাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারেন।

আমি আর আমার স্ত্রী রুডলফ উত্তরাঞ্চলে অভিযানে বেরিয়েছিলাম সে আজ বহুদিন আগের কথা। আমরা তখন যে অঞ্চলে ছিলাম সে অঞ্চলে এক ভয়ঙ্কর উপজাতি বাস করত। নানারকম গুজব শুনে আমাদের ভৃত্যেরা আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যায়। তবু আমরা যেন কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির টানে এগিয়ে চলেছিলাম।

মাফা নদী যেখানে নিউবারি নদীতে পড়েছে সেইখানে একটা খাদ পার হয়ে একটা মালভূমিতে গিয়ে পড়তেই কাজী নামে এক ভয়ঙ্কর নারী উপজাতির মেয়েরা ধরে ফেলল আমাদের। এক বছর

পর আমার কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যাসন্তান প্রসব করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার স্ত্রীকে বধ করে কাজীদের নারী শয়তানরা। আমার স্ত্রী পুত্র সন্তান প্রসব করলে মারত না তারা। তারা শ্বেতাঙ্গ লোক চায়। তাই আমাকে আর আরো বারোজন শ্বেতাঙ্গ বন্দীকে হত্যা করেনি তারা।

যে জলপ্রপাত থেকে উৎসারিত হয়েছে মাফা নদী সেই জলপ্রপাতের উপরে এক বিস্তৃত মালভূমির উপরে অবস্থিত কাজীদের দেশটা। জায়গাটা কিন্তু খুবই দুর্গম। কেবলমাত্র মাফা নদী আর নিউবারি নদীর সঙ্গমস্থলের কাছ দিয়ে যাওয়া যায়।

একমাত্র সশস্ত্র শ্বেতাঙ্গদের বড় রকমের একটি দল অভিযান চালিয়ে আমাকে ও আমার মেয়েকে উদ্ধার করতে পারে কাজীদের কবল থেকে। আমার মনে হয় কৃষ্ণকায় কোন আদিবাসী এ দেশে প্রবেশ করবে না কিছুতেই। কাজী মেয়েরা শয়তানের মত লড়াই করে। তাদের এক অদ্ভুত অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে। আমি নিজের চোখে তাদের সে শক্তির নিদর্শন দেখেছি।

এমন কি শ্বেতাঙ্গদের এক বড় বাহিনীও কাজীদের কাছে হেরে যেতে পারে। কারণ অতি-প্রাকৃত শক্তিসমূহের সঙ্গে লড়াই করে পেরে ওঠা সম্ভব নয়।

কাজীদের দখলে আছে প্রচুর পরিমাণে হীরে। আমি যতদূর জানি কাজীদের হীরের ওজন হলো ছয় হাজার ক্যারেট আর দাম হবে দু লক্ষ পাউণ্ড। কাজেই বিপদের ঝুঁকির তুলনায় পুরস্কারটাও কম নয়।

এ চিঠি কারো মারফৎ বাইরের জগতে পাঠাতে পারব এ আশা আমি কোনদিন করিনি। পরে একদিন এদেরই এক নিগ্রোগুপ্তচরকে ঘুষ দিয়ে বশ করে এ চিঠি বয়ে নিয়ে যেতে রাজী করিয়েছি।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি এ চিঠি যেন যথা-সময়ে কোন যোগ্য ব্যক্তির হাতে পৌঁছয়। ইতি

মাউন্টফোর্ড।

চিঠিখানার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত দুবার পড়ল টারজন। মাউন্টফোর্ড! সে মনে করে দেখল অনেক-দিন আগে লর্ড ও লেডী মাউন্টফোর্ডএর রহস্যময় নিখোঁজের কথা সে শুনেছিল। সেই মাউন্টফোর্ড এখনো বেঁচে আছে এ কথা সে ভাবতেই পারেনি।

এতদিনে আসল খবরটা জানতে পারল, কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে। কুড়ি বছর হয়ে গেছে লেডী মাউন্টফোর্ড মারা গেছেন। লর্ড মাউন্টফোর্ড আজ বেঁচে আছেন কি না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ছোট থেকে এই সব অসভ্য বর্বর নারীদের মাঝখানে তাঁদের কন্যাও কখনো এতদিন বেঁচে থাকতে পারে না।

এবার সে মন থেকে এ সব কথা সরিয়ে দিয়ে বাস্তব পরিবেশের দিকে মন দিল।

একটা শকুনির লক্ষ্যবস্তুটার দিকে এগিয়ে গেল টারজন। দেখল একটা সিংহও একটা উঁচু জায়গা থেকে নেমে আসছে একই লক্ষ্যের দিকে। সিংহটা যেমন টারজনের উপস্থিতিটাকে গ্রাহ্য করল না তেমনি টারজনও সিংহটাকে আসতে দেখেও তার গতি পরিবর্তন করল না।

এইভাবে লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে গিয়ে একটি শ্বেতাঙ্গ লোকের শায়িত দেহ দেখতে পেল।

টারজন দেখল সিংহটা শুধু কৌতূহলের বশেই ঝাঁপ দিয়েছে লোকটার উপরে। সে ক্ষুধার্ত নয়। তার পেট ভর্তি।

লোকটাকে নিরুত্তর দেখে টারজন বলল, তুমি ইংরিজি জান?

লোকটি বলল, হ্যাঁ। আমি একজন আমেরিকান। আমি আহত নই। কয়েকদিন কিছুই খেতে পাইনি আমি। আজ একেবারেই জল পাইনি।

লোকটিকে তার কাঁধের উপর তুলে নিয়ে টারজন বলল, যেখানে খাদ্য ও জল পাওয়া যাবে সেখানে যাব আমরা। তারপর তোমার সব কথা শুনব।

লোকটি দেখল সিংহটা একেবারে তার কাছে এসে পড়তেই একটা নগ্নপ্রায় লোকও সিংহের মত গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল।

টারজন এবার লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, তুমি কি আহত না ক্ষুধাতৃষ্ণায় এমন দুর্বল হয়ে পড়েছ?

যার মুখ থেকে পশুর গর্জন বেরিয়ে এসেছিল তাকে ভদ্রলোকের মত ইংরিজিতে কথা বলতে শুনেও তেমনি আশ্চর্য হয়ে গেল লোকটি। সে দেখল সিংহটা যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই চলে গেল।

অবশেষে জলের ধারে এসে টারজন লোকটিকে একটা গাছের তলায় শুইয়ে দিল। এরপর জল এনে লোকটির মাথাটা তুলে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে কয়েক ফোঁটা জল ঢেলে দিল। ঠাণ্ডা জল দিয়ে লোকটির চোখ মুখ ধুইয়ে দিল।

টারজন তাকে বলল, এখন শান্ত হও। চুপ করে থাক। আমি খাবার নিয়ে আসছি।

অল্পক্ষণ পরেই খাবার নিয়ে এসে টারজন দেখল লোকটি শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। তখন রাত্রির অন্ধকার নেমে আসছে ধীরে ধীরে।

টারজন তার তীর ধনুক দিয়ে একটা পাখি আর একটা খরগোস মেরে এনেছিল। মরা পাখিটার উপর একতাল কাদা লেপে দিয়ে আগুন জ্বেলে তাতে পোড়াতে দিল। মরা খরগোসটাকেও একটা কাঠিতে গেঁথে আগুনে ঝলছে নিল। আগুনে কাদাটা শুকিয়ে গেলে শুকনো মাটির সঙ্গে পাখির গায়ের পালকগুলোও উঠে গেল।

পেট ভরে খাবার ও জল খেয়ে লোকটি টারজনকে বলল, এবার বল তুমি কে? কেনই বা আমাকে বাঁচালে?

টারজন বলল, তার আগে বলত তুমি কে? এ অঞ্চলে কি করছিলে তুমি'

লোকটি এবার বলল, আমার নাম উড, আমি একজন লেখক। বেশী টাকাকড়ি না নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এই জন্যই এক নির্জন বন-পথে আমাকে অসহায় ও বিপন্ন অবস্থায় দেখেছিলে তুমি। আমার অবস্থা যত অসহায়ই হোক আমার মাথায় এমন এক অভিজ্ঞতার কথা আছে যা আজ পর্যন্ত কোন ভ্রমণ কাহিনীতে কেউ লিখতে পারেনি। আমি যে সব জিনিস দেখেছি তা সভ্য জগতের কোন লোক স্বপ্নেও দেখেনি কখনো এবং সে সব জিনিস বিশ্বাস করতে পারবে না তারা। আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং নিজের হাতে ধরেছি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হীরকখণ্ড। আমার মনে হচ্ছে আমি মনে করলে তা সঙ্গে করে আনতেও পারতাম।

আবার পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী এবং নিষ্ঠুরতমা নারীকেও দেখেছি। আমার মনে হয় আমি তাকেও আনতে পারতাম আমার সঙ্গে। আমি তাকে ভালবাসতাম, এখনো বাসি। আবার তাকে ঘৃণাও করি, মাঝে মাঝে অভিশাপ দিই তাকে। ঘৃণা আর ভালবাসা—এই দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ আবেগ

আর লেডী মাউণ্টফোর্ডের রহস্যময়ভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কথা নিশ্চয় শুনে থাকবে?

টারজন বলল, কে তা না শুনেছে।

লোকটি বলল, আজ হতে কুড়ি বছর আগে তারা সভ্য জগৎ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আজও কত গুজব রটে চারদিকে। এই রহস্যময় ব্যাপারটা এমনইভাবে মায়ায় জড়িয়ে ফেলে আমার মনটাকে যে এই গুজবের সত্যাসত্য যাচাই করে দেখার জন্য নিজেই এক অভিযানে বার হবার মতলব করি আমি।

আমি বব ভ্যান আইককে আমার পরিকল্পনার কথা বলতেই সে আমার সঙ্গে এক অভিযানে যেতে চাইল এবং খরচপত্রের দায়িত্ব বহন করতে চাইল। ভাবলাম আমার পরিকল্পনাটা অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে এবার।

পুরো একটি বছর ধরে ইংলণ্ড ও আফ্রিকায় অনুসন্ধানকার্য চালিয়ে বেশ বুঝতে পারলাম যে নিউবারি নদীর ধারে রুডলফ্ হ্রদের উত্তর পশ্চিম দিকে কোন একটা জায়গা থেকে নিখোঁজ হন লর্ড ও লেডী মাউন্টফোর্ড।

আফ্রিকার জীবনযাত্রার সঙ্গে অভিজ্ঞতা আছে এমন কিছু শ্বেতাঙ্গ শিকারী নিয়ে এক সফরী গড়ে তুললান আমরা।

নিউবারি নদীর ধারে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত ভালই চলল আমাদের অভিযান।

ক্রমে আমাদের দল ছেড়ে চলে যেতে লাগল আমাদের নিগ্রোভৃত্যেরা। কেউ কোন কারণ বলল না।

অবশেষে নিগ্রোভৃত্যদের একজন সর্দার আমাদের একদিন বলল, যে সব আদিবাসীদের সঙ্গে এর আগে তাদের কথা হয়েছে তারা তাদের বলেছে নিউবারি নদীর উপরদিকে উত্তরে এক ভয়ঙ্কর উপজাতি আছে। তাদের দেশে কোন পুরুষ নেই, সবাই মেয়ে। কিন্তু তারা বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্মম। তাদের দেশে কোন নিগ্রো গিয়ে পড়লে তাকে হয় তারা ক্রীতদাস করে রাখবে চিরদিনের জন্য, না হয় তাকে হত্যা করবে। তারা এক যাদু জানে, তাদের হাতে এমন এক অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে যার জন্য যদিও তাদের কোন বন্দী তাদের হাতছাড়া হয়ে কোনরকমে পালিয়ে আসে তাহলেও তার নিষ্কৃতি নেই। সেই পলাতক বন্দী তার নিজের দেশে পৌঁছনোর আগে কোন না কোনভাবে মৃত্যু ঘটে তার। যুদ্ধ করে সেই উপজাতিয় মেয়েদের পরাজিত বা ধ্বংস করা সম্ভব নয়। কারণ ওরা মানুষ নয়, ওরা নারী রূপিনী রাক্ষসী।

আমাদের অভিযাত্রীদলে স্পাইক ও স্ট্রোল নামে যে দুজন শিকারী ছিল, আমি সর্দারের কথাটা তাদের জানাতেই তারা হেসে উড়িয়ে দিল কথাটা।

তাই তারা অবশিষ্ট নিগ্রোভৃত্যদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে লাগল। পরদিন সকালে দেখা গেল একজন নিগ্রোভৃত্যও আমাদের দলে নেই। আমরা তখন মাত্র চারজন শ্বেতাঙ্গ ছাড়া আর কেউ ছিল না আমাদের দলে। অথচ সঙ্গে যা মালপত্র ছিল তা বহন করার জন্য পঞ্চাশজন লোকের দরকার। বব, ভন আইক, স্পাইক আর স্ট্রোল— আমরা তখন ছিলাম মোট এই চারজন।

এ রকম পরিস্থিতিতে জীবনে কখনো পড়িনি এর আগে। কোন প্রত্যক্ষ বিপদ নেই, কোন প্রত্যক্ষ ভয়ের বস্তু নেই। আমাদের কেবলি মনে হত অদৃশ্য অবস্থায় কারা যেন লক্ষ্য করছে আমাদের সব সময়। তার উপর মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেতাম।

সেদিন রাত্রিতে চারজনে মিলে এক পরামর্শ-সভায় বসলাম। স্পাইক ও স্ট্রোল বলল, এখন আমাদের উচিত ঐ শব্দ লক্ষ্য করে এক অভিযান চালানো। আমরা বেশী কিছু সঙ্গে নেব না। শুধু

একটা করে রিভলবার, রাইফেল, কিছু অস্ত্রশস্ত্র আর খাবার। বাকি সব রেখে যাব শিবিরে।

পরদিন সকালে নীরবে প্রাতরাশ করার পর সঙ্গে যা নেবার নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

পাঁচ মাইল যাবার পর পথের উপর একজন শ্বেতাঙ্গ লোককে শুয়ে থাকতে দেখলাম। লোকটির বয়স পঞ্চাশের মধ্যে। সে যেমন অতি বৃদ্ধ নয়, তেমনি ক্ষুধাতৃষ্ণাতেও কাতর বলে মনে হলো না। তবু মনে হলো চলার শক্তি নেই তার।

আমরা তার পাশে থামতেই সে চুপি চুপি আমাদের বলল, ফিরে যাও।

তার কথা শুনে বুঝলাম সে এত দুর্বল যে কথা বলতে পারছে না।

আমার কাছে ফ্লাস্কে ভরা কিছু ব্রাণ্ডি ছিল। লোকটিকে তাই কিছুটা খাইয়ে দিতে একটু শক্তি ফিরে পেল সে।

তখন লোকটি বলল, ঈশ্বরের নামে বলছি, তোমরা ফিরে যাও। তোমরা সংখ্যায় বেশী নেই। ওরা তোমাদের ধরে ফেলবে। আমাকে যেমন বিশ বছর ধরে আটকে রেখেছিল তেমনি তোমাদেরও আটকে রাখবে। তোমরা পালাতে পারবে না। কুড়ি বছর ধরে আমি কত বার পালাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাদের শক্তির কাছে হার মেনেছি আমি। আমার অবস্থা দেখছ। আমি মুমূর্ষু। তোমরা বরং ফিরে গিয়ে শ্বেতাঙ্গদের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে এসে আক্রমণ করবে ওদের। নিগ্রোরা ওদেশে ঢুকবে না। এ হলো কাজীদের দেশ। কিন্তু সমস্ত শক্তি আছে একটি মাত্র লোকের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। সে-ই সব মেয়েদের শেখাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে সে?

সে বলল, মাফকা।

সে-ই কি সর্দার?

না, সে সর্দার নয়, তবে সর্বশক্তিমান। সে যাদুকরের থেকেও অনেক বেশী শক্তিমান। সে হচ্ছে আস্ত একটা শয়তান।

আমি লোকটিকে বললাম, তুমি কে?

সে বলল, আমি মাউন্টফোর্ড।

লর্ড মাউন্টফোর্ড?

সে বলল, হ্যাঁ।

টারজন উডকে জিজ্ঞাসা করল, লোকটি তোমাকে হীরের কথা কিছু বলেছিল?

উড তখন টারজনের মুখপানে তাকিয়ে বলল, তুমি কি করে জানলে এ কথা?

টারজন বলল, কিছুক্ষণ আগে তুমি ভুল বকছিলে। তার থেকে জানতে পারি।

উড বলল, কাজীদের হীরে আকারে সত্যিই বিরাট, তার দাম হবে প্রায় দশ মিলিয়ন ডলার। মাউন্টফোর্ডের কাছ থেকে হীরের কথাটা শুনে স্পাইক ও স্ট্রোল হীরের লোভে কাজীদের দেশের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। মাউন্টফোর্ডের কথায় মোটেই ভয় পেল না তারা। তাছাড়া তখন হয়ত ইচ্ছা করলেও ফিরতে পারতাম না আমরা।

টারজন তখন উডকে বলল, তারপর মাউন্ট-ফোর্ডের কি হলো ?

উড বলল, তিনি একটি মেয়ের সম্বন্ধে বিড বিড় করে কি বলছিলেন। কিন্তু তখন মৃত্যুর আর দেরী ছিল না। বেশী কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর কথাটা ছিল্…মেয়েটাকে বাঁচিও। মাফকাকে হত্যা করো।

এই কথা বলেই মারা গেলেন মাউন্টফোর্ড।

আমরা কিন্তু কাজীদের দেশে যাওয়ার পরেও তিনি যে লোকটার কথা বলেছিলেন সেই মাফকা লোকটাকে দেখতে পাইনি। শুনেছি বহু শতাব্দী আগে নির্মিত এক প্রাচীন আমলের প্রাসাদে থাকত সে। সেই প্রাসাদেই হীরে থাকত। কেউ বলত প্রাসাদটা নির্মাণ করে পর্তুগীজরা তাদের আবি-সিনিয়া অভিযানের সময়ে। আবার ভন আইক বলত এটা নির্মিত হয় ক্রুসেড ধর্মযুদ্ধের কালে। এ প্রাসাদ যারাই গড়ে তুলুক, মোট কথা কাজীরা করেনি।

কাজীরা মনে করে বড় হীরকখণ্ডটাই ওদের যত কিছু শক্তির উৎস। তারা তাই প্রাসাদটাকে চার-দিক থেকে কড়া পাহারা দিয়ে ঘিরে রেখেছে। মাফকা আর তাদের রাণীও সেই প্রাসাদেই থাকে।

এ কথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে ওদের রাণী হলো সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী নারী। তার মত সুন্দরী মেয়ে জীবনে আমি কোথাও কখনো দেখিনি। এক এক সময়ে রাণীর মধ্যে নারীসুলভ দয়া মায়া মমতা প্রভৃতি গুণগুলির পূর্ণ পরিচয় পেয়েছি, কিন্তু আবার পরমুহূর্তেই তাকে মনে হয়েছে এক নিষ্ঠুর শয়তান, যেন একটা আস্ত রাক্ষসী। রাণীকে ওরা বলে কনফালা আর হীরক-খণ্ডটাকে বলে কনফাল।

এই রাণীই তার নারীসুলভ দয়ামায়ার বশবর্তী হয়ে কোন এক দুর্বল মুহূর্তে আমাকে মুক্ত করে দেয়। পরে সে হয়ত অনুতপ্ত হয়ে মাফকাকে বলে দেয়, মাফকার শক্তিবলেই আমার এই শোচনীয় অবস্থা হয়।

টারজন উডকে বলল, তোমার অন্য তিনজন সঙ্গীর কি অবস্থা হয় ?

তারা এখনো সেখানে বন্দী হয়ে আছে।

আমি মুক্তি পেয়ে ভাবি শ্বেতাঙ্গদের একটি বড় দল নিয়ে এসে তাদের মুক্ত করব।

টারজন বলল, তারা কি এখনো জীবিত আছে ?

উড বলল, হ্যাঁ। কাজীরা তাদের বাঁচিয়ে রেখে বিয়ে করবে। কাজীদের দেশে সবাই মেয়ে। তারা একদিন কৃষ্ণকায় ছিল। তাই তারা শ্বেতাঙ্গদের বিয়ে করে ওরাও শ্বেতাঙ্গ হতে চায় এবং কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের তাড়িয়ে দেয়। শ্বেতাঙ্গদের বিয়ে করা তাদের ধর্মের একটা অঙ্গ।

টারজন বলল, যদি ওরা পুত্রসন্তানদের এইভাবে মেরে ফেলে তাহলে যোদ্ধা পায় কোথা থেকে ?

উড বলল, এখানে মেয়েরাই যুদ্ধ করে। আমি ওদের যুদ্ধ কখনো দেখিনি। তবে যা শুনেছি তাতে মনে হয় যোদ্ধা হিসাবে ওরা বড় ভয়ঙ্কর, বড় হিংস্র।

এটা ছমাস আগের ঘটনা। বব পেয়েছে এক দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চ। আমি পেয়েছি লেখার উপাদান। স্পাইক আর স্ট্রোল হীরে পায়নি, কিন্তু তারা প্রত্যেকে সাতজন করে স্ত্রী পেয়েছে। গনফালা রাণী হিসাবে শ্বেতাঙ্গ বন্দীদের স্ত্রী নির্বাচন করে দেয় ওদের মধ্য থেকে। কিন্তু গনফালা নিজে কাউকে বিয়ে করতে পারে না।

টারজন উডকে কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, মাফকা যে ওষুধ তৈরী করে তার থেকে বেশী শক্তিশালী ওষুধ আছে আমার কাছে।

ঘন্টাখানেক পথ চলার পর এক জায়গায় উডকে তার কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল। বলল, এবার তুমি বোধ হয় নিজেই হাঁটতে পারবে।

এই বলে টারজন আবার উত্তর দিকে হেঁটে যেতে লাগল।

এদিকে উড মুখে এক আতঙ্কের ছাপ নিয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে ধরে ফেলল টারজন।

উড একসময় চীৎকার করে টারজনকে বলল, তুমি চলে যাও। আমি মাফকার কবলে পড়ে গেছি। মাফা নদী পার হয়ে কাজীদের দেশে যাচ্ছি আমি।

টারজন পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি আমার সঙ্গে যাবে বলেছিলে ত?

উড বলল, বলেছিলাম, কিন্তু আমার পাগুলো ওইদিকে টানছে। অন্য দিকে যেতে পারছি না আমি।

উড আর্তকণ্ঠে টারজনকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি মনে করো আমি কোনদিন শয়তান মাফকার ভয়ঙ্কর ইচ্ছাশক্তির কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারব?

টারজন বলল, হয়ত পারবে না। কারণ আমি শুনেছি আফ্রিকার অনেক সাধারণ যাদুকর অনেক বন্দী পলাতককে অনেক বছর পরেও শত শত মাইল দূর থেকে ফিরিয়ে আনে তাদের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা।

মাফকার শক্তি নিশ্চয় সাধারণ যে কোন যাদুকরের শক্তির থেকে বেশী।

সে রাতে নিউবারি নদীর ধারে এক জায়গায় দুজনে শুয়ে পড়ল। পরদিন সকালে উঠে টারজন দেখল উড চলে গেছে।

উড চলে যাওয়ার পর তৃতীয় দিন বিকালবেলায় টারজন উঁচু পাহাড়ের ধারে এসে থামল। তার সামনে এক খরস্রোতা পার্বত্য নদী বয়ে যাচ্ছিল। তার মনে হলো, কাজী আর জুলিদের দেশের মধ্যবর্তী এক জায়গায় এসে পড়েছে সে।

তার পিছনে ছিল পূবদিকে উঁচু পাহাড়। তার সামনে পশ্চিম দিক থেকে বইতে থাকা বাতাসে বেবুন, চিতাবাঘ আর বুনো মোষের গন্ধ পাচ্ছিল। কিন্তু টারজন বুঝতে পারেনি তার পিছনে পাহাড়ের মাথা থেকে কয়েক জোড়া চোখ লক্ষ্য করছে তাকে।

পাহাড়টার উপরে তখন ছিল এগারজন যোদ্ধা। তাদের মধ্যে দুজন ছিল দাড়িওয়ালা শ্বেতাঙ্গ আর পাঁচজন ছিল কৃষ্ণকায় আদিবাসী। তাদের হাতে ছিল তীর ধনুক আর বর্শা। পিঠে ঢাল। তাদের গলায় ছিল বিভিন্ন জন্তুর দাঁতের ও হাড়ের মালা।

যোদ্ধাদের মধ্যে বলিষ্ঠ চেহারার একজন শ্বেতাঙ্গ ছিল দলনেতা। তার মাথার ও দাড়ির চুল কিছু কিছু পাকা ছিল। তার চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ ছিল। দলের লোকেরা তাকে লর্ড বলে ডাকছিল।

তিন দিন ধরে অনেক পাহাড় ডিঙ্গিয়ে খাদ পার হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল টারজন। তার উপর চিতাবাঘদের জ্বালায় গতরাতে মোটেই ঘুম হয়নি তার।

তখনো ঘণ্টাখানেক বেলা ছিল। একটা ঝোপের পাশে নদীর ধারে ঢালু জায়গাটায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল টারজন।

তার যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন সে দেখল তখনো দিনের আলো নিবে যায়নি। দেখল প্রায় ডজন-খানেক সাদাকালো চেহারার যোদ্ধা ঘিরে আছে তাকে। তাদের হাতে সে এখন বন্দী। এখন করার কিছু নেই। মুক্তির জন্য চেষ্টা করেও কোন লাভ নেই। তাই চুপচাপ শুয়ে রইল টারজন।

টারজনের কোন ভয় বা উত্তেজনার চিহ্ন দেখতে না পেয়ে আশ্চর্য হলো যোদ্ধারা।

অবশেষে লর্ড বলল, তাহলে কাজী, তুমি এখন আমাদের হাতে বন্দী। কারণ আমরা জানি জুলি আর কাজী ছাড়া এই পার্বত্য অঞ্চলে অন্য কেউ আসে না।

এরপর লর্ড তার লোকদের টারজনের হাত-দুটো পিছনের দিক করে বেঁধে দিতে বলল।

তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। কাজী টারজনকে নিয়ে যোদ্ধারা পার্বত্য পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল তাদের বস্তীতে। টারজন পথটা ঠিক চিনতে পারল না।

অবশেষে এক সমতল উপত্যকায় এসে পড়ল ওরা। টারজন দূরে অনেকগুলো জ্বলন্ত আগুনের আলো দেখে বুঝতে পারল ওটাই ওদের গাঁ।

ওরা গাঁয়ের গেটের সামনে এসে পড়লে লর্ড হাঁক দিয়ে কি বলল। কয়েকজন সশস্ত্র নারী যোদ্ধা পাহারা দিচ্ছিল গেটে। তাদের দেখে টারজনের মনে হল তারা সবাই শ্বেতাঙ্গ।

গাঁয়ের ভিতরে ঢুকে জ্বলন্ত আগুনের আভায় টারজন দেখল পথের ধারে ধারে সারবন্দী অনেক পাথরের ঘর রয়েছে। ঘরগুলোর দেওয়াল পাথরের আর ছাউনিগুলো শুকনো ঘাসের। গাঁয়ের মাঝখানে একটা দোতলা পাথরের বাড়ি রয়েছে।

টারজন আরো দেখল কতকগুলোর সামনে জ্বলন্ত আগুনের পাশে কতকগুলো মেয়ে বসেছিল। তাদের পাশে ছিল কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। টারজনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে মেয়েরা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

ছয়জন নারীপ্রহরীসহ লরো লর্ড ও টারজনকে উরাব ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

একটা বড় ঘরে ঢুকে টারজন দেখল দূরে একধারে একটা উঁচু মঞ্চের উপর মাথায় একরাশ চুল নিয়ে ভুঁড়ি মোটা একটা লোক বসে আছে। তার চোখদুটো আগুনের মত জ্বলজ্বল করছিল। প্রায় বিশজন সশস্ত্র নারীযোদ্ধা চারদিক থেকে ঘিরে ছিল মঞ্চটাকে।

টারজনকে মঞ্চের সামনে নিয়ে যাওয়া হলে তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল উরা। দেখে কেমন যেন বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল সে। তারপর টারজনকে প্রশ্ন করল, আমার ভাই কেমন আছে?

টারজন বলল, আমি তোমার ভাইকে চিনি না।

উরা রাগতভাবে বলল, কি, আমার মিথ্যাবাদী, খুনী, চোর ভাইকে চেন না তুমি?

টারজন ঘাড় নেড়ে বলল, না, আমি তোমার ভাইকে চিনি না। আমি কাজী নই।

উরা তখন লর্ডএর উপর অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, তুমি যে বলেছিলে তুমি একজন কাজীকে বন্দী করে এনেছ?

লর্ড বলল, আমরা ওকে মাফা নদীর উৎসের কাছে বন্দী করি। ও অঞ্চলে কাজী ছাড়া আর কে আসবে?

উরা গর্জন করে উঠল, তুমি একটা আস্ত বোকা। আমি ওকে প্রথম দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছি ও কাজী নয়।

এরপর টারজনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে উরা বলল, তুমি জুলিদের দেশে কি করছিলে?

টারজন বলল, আমার একজন হারানো সঙ্গীর খোঁজ করছিলাম।

তুমি কি ভেবেছিলে আমাদের দেশে সে আছে?

না, আমি তোমাদের দেশে আসতে চাইনি; আমি কাজীদের দেশে যেতাম।

তুমি মিথ্যা কথা বলছ। কাজীদের দেশ না হয়ে কেউ কখনো মাফা নদীর উৎসমুখে আসতে পারে না।

আমি কাজীদের দেশে না গিয়ে অন্য পথে এখানে এসেছিলাম।

উরা বলল, আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি কাজী নও, তুমি হচ্ছ মাফকাব চর। তার দ্বারা নিযুক্ত এক চাকর। সে আমাকে খুন করার জন্য পাঠিয়েছে তোমাকে।

উরার প্রাসাদের দোতলার একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছিল টারজন আর লর্ডকে। সে ঘরে ছিল একটামাত্র জানালা। জানালাটা কাঠের রড দিয়ে ঘন করে ঘেরা ছিল।

প্রহরী ঘরেব দরজা বন্ধ করে চলে গেলে টারজন উঠে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল। সেদিন ছিল জ্যোৎস্না রাত। আকাশে কোন মেঘ ছিল না। চাঁদের আলোয় টারজন দেখল বাইরে পাঁচিল ঘেরা খানিকটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে।

টারজন এবার মুখ ঘুরিয়ে লর্ডকে বলল, আমি তখন তোমাকে বললাম আমি কাজী নই। কিন্তু তুমি তখন শুনলে না আমার কথা। শুনলে তোমাকে এই বিপদে পড়তে হত না।

লর্ড বলল, আমাকে হত্যা করার এটা একটা অজুহাত মাত্র। ওরা আমাকে মারার একটা সুযোগ খুঁজছিল। এই জুলিদের দেশে পুরুষদের প্রয়োজন আছে। তারা যুদ্ধ করে। উবা শুনেছে একদল লোক এখান থেকে ওদের ধাতুটাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এর সঙ্গে আবার উরাকে হত্যা করাব ষড়যন্ত্রও জড়িয়ে আছে। কাজীদেশ ছাড়া এখান থেকে বাইরেব জগতে যাবার অন্য কোন পথ নেই। তাই ভেবেছিলাম ঐ পান্না ধাতুটা মাফকাকে ঘুষ দিয়ে তাদেব দেশ থেকে বেরিয়ে যাবার অনুমতি পাব। উরার বিশ্বাস আমিই এই ষড়যন্ত্রের নায়ক। তাই ও আমাব জীবন নাশ করতে চায়।

উরা ইচ্ছা করলেই অবশ্য যে কোন সময়ে আমাকে মারতে পাবে। কিন্তু ও সুযোগ খুঁজছিল।

লর্ড আবো বলল, শোনা যায় উরা আর মাফকা দুই যমজ ভাই। বহুদিন আগে ওবা নাকি কলম্বিয়া থেকে পালিয়ে আসে। সঙ্গে পান্নার তালটা ছিল। কাজীরা গলফান নামে হীরকখণ্ডটা কি করে পায় তা আমি জানি না। হয়ত ওরা কোথাও থেকে চুরি করে আনে। ওদের বিশ্বাস কাজীদের গলফান আর জুলিদের পান্নাই সব শক্তির উৎস। কিন্তু উরাকে না মারলে পান্নাটা পাওয়া যাবে না। আমরা তাই উবাকে মারতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের সে স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। এখন আমাকে উরা সিংহেব মুখে ফেলে দিয়ে মজা পাবে। আর তোমাকে ওরা টুকরো টুকরো করে কাটবে।

টারজন বলল, কিন্তু দুজনের এই মৃত্যুদণ্ডের মধ্যে তফাৎ কেন ?

কারণ উরার ধারণা তোমার মস্তিষ্কে বুদ্ধি আছে। তোমার মাথাটাকে তাই চায় ওরা।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব ?

ওরা তা খাবে।

বুঝেছি। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধবনের প্রথা আছে। ওদেব ধাবণা ওরা কারো মস্তিষ্কটা খেলে তাব বুদ্ধিটা পাবে। কোন বীর শত্রুর হৃৎপিণ্ড খেলে তার সাহস পাবে। কোন দ্রুতগামী মানুষের পায়ের পাতা খেলে তার মত ছুটতে পাববে আর কোন তীবন্দাজের হাতের তালু খেলে তার মত তীর ছুঁড়তে পারবে।

যত সব বাজে কুসংস্কার।

টারজন বলল, তবে আমাব ধাবণা যদি তুমি পালাতে চাও তাহলে ওরা তোমাকে সিংহের মুখে ফেলতে পারবে না আর আমারও মাথা খেতে পাববে না।

পালাব ? পালানোর কোন পথ নেই।

পথ অবশ্য আমি জানি না। তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

কি কবে পালাব ? দরজা জানালাগুলো দেখ। বাইবে জানালার নিচে তাকিয়ে দেখ। বাইরে আছে চিতাবাঘ।

টারজন আবার জানালার ধারে গিয়ে পরীক্ষা করল। তারপর বলল, জানালাটা অশক্ত।

এই বলে সে জানালাটা ভেঙ্গে দিয়ে দুটো কাঠের রড নিজে নিয়ে একটা রড লর্ডকে দিল। বলল, এইগুলোই হবে এখন আমাদের অস্ত্র।

লর্ড বলল, কিন্তু চিতাটা। আমরা পালাতে গেলেই চিতাটা চীৎকার করবে আর তখন প্রহরীরা ছুটে আসবে।

টারজন দেখল, বাইরে ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে একটা বড় কালো চিতাবাঘ তার পানে তাকিয়ে গর্জন করছে।

টাবজন বলল, আমরা গাঁয়ের বাইবে গিয়ে পড়লে তুমি পথ চিনতে পারবে ? নাকি মাফকার মত উরার ইচ্ছাশক্তি আবার তোমায় ফিরিয়ে আনবে ?

এই জন্যই ত উরাকে আমরা খুন করতে চেয়েছিলাম।

জুলিদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি রকম ? তারা কি ওর প্রতি অনুরক্ত ?

ওরা তাকে ভয় করে এবং ঘৃণা করে। ওদের উপর উরার প্রতাপেব একমাত্র ভিত্তি হলো ভয়।

সব মেয়েরাই ?

হ্যাঁ, প্রত্যেকেই।

উরার মৃত্যু হলে ওরা কি করবে ?

যে সব কৃষ্ণকায় ও শ্বেতাঙ্গ বন্দী হয়ে আছে তারা সবাই একযোগে মেয়েদের সঙ্গে বাইরের জগতে পালিয়ে যাবে। এখানকার মেয়েরা বিদেশীদের মুখ থেকে বাইরের জগতের নানা কথা শুনে সেখানে যেতে চায় তারা। শ্বেতাঙ্গরা জুলিদের বুঝিয়েছে, যে পান্নায় তালটা উরার কাছে আছে এটা এক মূল্যবান ধাতু। ওটা বিক্রি করলে অনেক টাকা হবে। তারা অনেক সুখে থাকতে পারবে।

কিন্তু উরাকে ওরা খুন করেনি কেন এতদিন ?

কারণ এক অতিপ্রাকৃত শক্তির ভয়: ওরা নিজের হাতে ত মারতে পারবেই না, আবার কাউকেও মারতে দেবে না।

টারজন এবার জিজ্ঞাসা করল, উরা কোথায় ঘুমোয় ?

ওর সিংহাসনের পিছনে একটা ঘরে। কিন্তু এ কথা জানতে চাইছ কেন ?

টারজন বলল, আমি তাকে হত্যা করতে যাচ্ছি। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

কিন্তু কেন তুমি ওকে মারতে যাচ্ছ ?

কারণ আমার একজন দেশবাসী কাজীদের হাতে বন্দী আছে। উরাকে মেরে জুলিদের সাহায্যে আমি তাকে মুক্ত করতে পারব। তার সঙ্গে অন্যান্য বন্দী-দেরও মুক্ত করব।

উরা যে ঘরে বসে সে ঘর ছাড়া অন্য কোন পথ দিয়ে কি তার শোবার ঘরে যাওয়া যায় ?

পথ একটা আছে, কিন্তু সে পথে তুমি যেতে পারবে না। আমাদের নিচের তলায় যে ঘরে শোয় উরা বাইরের ঐ উঠোনটার দিকে একটা জানালা আছে।

টারজন বলল, উরার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সব কিছু বলত। কে ওর কাছে থাকে। কখন খায় ? কখন শোয় বা ওঠে ?

লর্ড বলল, আমরা যতদূর জানি ওর কাছে কেউ শোয় না। রোজ সূর্য ওঠার পরেই ও ওঠে। ওর ঘরের মধ্যে একটা ফুটো দিয়ে ওর প্রাতরাশ দেওয়া হয়। ওর তিনটে ঘর আছে। সে সব ঘরে ও কি করে তা কেউ জানতে পারে না। কেউ সেখানে যেতে পায় না। ভয়ে কেউ কোন কথা বলে না। প্রাতরাশ খাওয়ার একঘণ্টা পর দরবার ঘরে মঞ্চের সিংহাসনে এসে বসে উরা; সেখানে অনেক অভি-যোগ ওকে শুনতে হয়, বিচার করে শাস্তির বিধান করতে হয়। শিকারীদল ও যোদ্ধাদের নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিতে হয়। কৃষিকার্য সম্বন্ধেও যাবতীয় নির্দেশ দিতে হয়। সব কাজ সেরে তার ভিতরকার ঘরে চলে যায় উরা। তবে রাতের খাওয়াটা সে দরবার ঘরে বসে খায়।

টারজন বলল, ঠিক আছে।

কিন্তু চিতা ?

সেটা দেখা যাবে।

টারজনের এক হাতে ছিল ভাঙ্গা জানালা থেকে নেওয়া মোটা একটা বড় রড। তাই নিয়ে জানালার বাইরে গিয়ে জানালার নিচেকার কাঠটা এক হাতে ধরে ঝুলতে লাগল। তারপর লাফ দিয়ে নিচে পড়ল।

লর্ড জানালার ধার থেকে দেখতে লাগল রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে। নেমেই নিঃশব্দে ঘুমন্ত চিতাটার দিকে এগিয়ে গেল সে। কিন্তু অর্ধেক পথ যেতেই জেগে উঠল চিতাটা।

কালো চিতাটা যথাসাধ্য প্রচণ্ডতার সঙ্গে নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজনের উপর। কোন গর্জন করল না। শুধু মাটির উপর ধুপধাপ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নিশীথ রাতের নিস্তব্ধতাটাকে ভঙ্গ করল না।

টারজন তখন দুহাতে সেই কাঠের মোটা রড-টাকে ধরে এক আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিতাটার মাথায় ক্রমাগত মেরে চলেছিল।

কোনক্রমেই চিতাটা তার চোয়ালবারকরা দাঁত-গুলো বসিয়ে দিতে পারছিল না টারজনের গায়ে।

লর্ড যখন রুদ্ধশ্বাসে চিতার সঙ্গে টারজনের এই লড়াই দেখছিল তখন উরার ঘরের জানালা দিয়ে আর একজোড়া চোখ নিঃশব্দে দেখছিল সে লড়াই।

লাঠির ঘায়ে চিতার মাথাটার হাড়গুলো সব ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল চিতাটা। তা দেখে ভয় পেয়ে গিয়ে উরার ঘরের জানালা থেকে সেই চোখজোড়াটা সরে গেল। নিঃশব্দে ভিতরের ঘরের অন্ধকারে চলে গেল।

চিতাটাকে বধ করার পর উরার ঘরের দিকে চলে গেল টারজন। খোলা জানালাটার ভিতর দিয়ে লাফিয়ে পড়ল ঘরের ভিতরে। গন্ধ শুঁকে

দেখল সে ঘরে কোন লোক নেই। সে শুনেছে ভিতরে উরার তিনখানা ঘর আছে। কিন্তু কোন্ ঘরটাতে উরা আছে কে জানে? তার মনে হলো উরা তার ঘর থেকে চিতাটার সঙ্গে তার লড়াই দেখে ভয়ে ভিতরদিকে একটা ঘরে ঢুকে পড়েছে। সে নিশ্চয় রক্ষীদের ডাকতে যায়নি। তাহলে শব্দ হত হাঁক-ডাকের।

চাঁদের কিছুটা আলো ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায় টারজন দেখল সেই ঘরের দেওয়ালে একটা দরজা রয়েছে। নিঃশব্দে দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে। গন্ধ শুঁকে বুঝল কিছুক্ষণ আগে উরা সে ঘরে ছিল, কিন্তু এখন নেই। ঘরটা অন্ধকার।

সেই ঘর থেকে ভিতরে অন্য একটা ঘরে যাবার একটা দরজা ছিল। টারজনের মনে হল ঐ দরজা দিয়ে উরা ভিতরে আর একটা ঘরে চলে গেছে। সেই ঘরে যাবার জন্য সে পা বাড়াতেই পায়ের তলায় জালের দড়ি ঠেকল তার। তার সন্দেহ হলো এটা একটা ফাঁদ। তাকে ধরার জন্য পাতা আছে।

আর না এগিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে যাবার চেষ্টা করল টারজন। কিন্তু কোথা থেকে জালটা টানতেই মোটা দড়ি দিয়ে বোনা জালটায় আটকে পড়ল সে। শত চেষ্টা করেও জাল থেকে মুক্ত করতে পারল না কিছুতেই।

এমন সময় তার সামনের দরজাটা খুলে ভিতরের একটা আলোকিত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল উরা। টারজন দেখল উরার পিছনে আলোকিত ঘরের দেওয়ালে অনেক মাথার খুলি সাজানো রয়েছে। একটা টেবিলের উপর মধ্যযুগীয় যাদুবিদ্যার নানা উপকরণ রয়েছে সাজানো। টেবিলের উপর পান্নার সেই তালটা থেকে একটা সবুজ আলো বিকীর্ণ হচ্ছিল।

উরা বলল, এখানে তোমাকে কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করব। তারপর আমার প্রিয় পোষা এত ভাল চিতাটাকে মারার জন্য আমি চরম প্রতিশোধ নেব তোমার উপর। তীব্র যন্ত্রণা আর পীড়নের মধ্য দিয়ে তোমার মৃত্যুকে দীর্ঘায়িত ও বিলম্বিত করব। কিন্তু তুমি যাতে সে পীড়নের কিছু দেখতে না পাও তার জন্য তোমার চোখদুটোকে আগে নষ্ট করে দেব। উরার শক্তি এবার দেখ।

এই বলে সে পাশের ঘরে গিয়ে একটা উনোনে জ্বলতে থাকা কয়লার আগুনে একটা সূঁচলো লোহার রড পোড়াতে দিল। সেই রডটা হাতে করে এনে উরা বলল, এই জালের দড়ি পাগলা হাতিতেও ছিঁড়তে পারে না।

উরা জালের মধ্যে আবদ্ধ টারজনকে বলল, আমরা ভেবেছিলাম তোমাকে পরে মারব। কিন্তু এখনই তোমাকে ভয়ঙ্করভাবে মারা হবে।

টারজন কোন কথা না বলে জালটাকে পরীক্ষা করে দেখল। জালের দড়িগুলো চামড়ার দড়ি দিয়ে বোনা।

উরার চোখে মুখে আর কোন ভয়ের চিহ্ন ছিল না। তার পরিকল্পনা সফল হওয়ায় সে খুশি হয়েছিল।

এই বলে সে সেই রডের সূঁচলো লাল গরম মুখটা টারজনের চোখে ঢুকিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে এল।

কিন্তু টারজন পর পর দুবার সেই রডটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিল। রডটাকে উরা টারজনের চোখের কাছে আনতেই পারল না। টারজন কোন ক্ষমা প্রার্থনা না করায় এবং তার রডটা ঠেলে সরিয়ে দেওয়ায় উরা আরও রেগে গেল।

উরা পাশের ঘর থেকে আর একটা রড নিয়ে এসে বলল, এটা আরো গরম। এটা দিয়ে তোমার চোখদুটোকে এবার ঠিক বিদ্ধ করব।

টারজন দেখল সে রডের উপরটা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত লাল হয়ে উঠেছে। সেই রডটা ধরে উরা টারজনের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, এবার তুমি নিশ্চয় চীৎকার করে ক্ষমা চাইবে।

কিন্তু টারজন দেখল তার পিছনে দরজাটা ঠেলে কে প্রবেশ করল ঘরে। মুখ ঘুরিয়ে সে দেখল কাঠের সেই মোটা রডটা নিয়ে লর্ড এসে ঘরে ঢুকেছে।

ঘরে ঢুকেই লর্ড তার দুহাতে রডটাকে লাঠির মত ধরে সজোরে উরার হাতে মেরে তার হাতের কব্জি ভেঙ্গে দিল। জ্বলন্ত রডটা পড়ে গেল তার হাত থেকে। তারপর সে তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে উরার মাথায় ক্রমাগত ঘা দিয়ে যেতে লাগল। উরার মাথাটা ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে গেল উরা।

টারজন এবার লর্ডকে বলল, ঠিক সময়েই এসে পড়েছ।

লর্ড বলল, কিভাবে চিতাটাকে মেরেছ আমি তা নিজের চোখে দেখেছি। তারপর তুমি উরার ঘরের দিকে এগিয়ে এলে আমিও অনুসরণ করি তোমায়।

এই বলে একটা ছুরি উরার টেবিল থেকে তুলে নিয়ে জালের দড়ি কেটে মুক্ত করল টারজনকে।

লর্ড এরপর টারজনকে বলল, এখন এই পান্নার তালটা আমাদের দুজনের। এখনো রাত শেষ হতে অনেক দেরী। চল আমরা এখান থেকে চলে যাই। এখন উরার ঘরে কেউ আসবে না। ওর মৃতদেহটা আবিষ্কার করতে কয়েকদিন সময় লেগে যেতে পারে।

টারজন লর্ডকে বলল, তুমি তোমার বন্ধুদের কথা ভুলে গেছ।

লর্ড বলল, উরা মরে গেছে। এবার ওরা মুক্তি পাবে। ওদের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছি। এই ধাতুটা এখন আমাদের।

টারজন বলল, তুমি কাজীদের কথাও ভুলে গেছ। তাদের দেশের ভিতর দিয়ে কি করে এটা নিয়ে যাবে? মাফকার শক্তি উরার থেকে আরো বেশী। মাফকার হাত থেকে পালাতে পারবে না।

তাহলে এখন কি করব আমরা?

টারজন বলল, আমি আগে সেখানে গিয়ে মাফকাকে খতম করব।

লর্ড বলল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে টারজন বলল, না, আমি একা যাব। মাফকার অলৌকিক শক্তি দূর থেকেও তার শত্রুদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে

সে শক্তির কবল থেকে তুমি মুক্ত করতে পারবে না নিজেকে। একমাত্র আমার উপর সে শক্তি কাজ করবে না। তুমি গেলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এই বলে সে একটা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে পান্নার তালটাকে জড়িয়ে রাখল।

ওটা নিয়ে কি করবে তুমি?

এটা সঙ্গে থাকলে মাফকার দেখা পাওয়া সহজ হবে আমার পক্ষে

লর্ড হেসে বলল, তুমি কি ভেবেছ আমাকে বোকা বানিয়ে এটা একা নিয়ে যাবে তুমি? তুমি জান এটার কত দাম। আমরা দুজনে এটা ভাগ করে নেব।

টারজন বলল, তুমি দেখেছ আমি কিভাবে চিতাটাকে মেরেছি। তুমি যদি আমার কাজে হস্তক্ষেপ কর তাহলে—

লর্ড বলল, কিন্তু এর দাম অনেক।

টারজন বলল, দাম যাই হোক, আমার তাতে প্রয়োজন নেই। আমি এটাকে নিয়ে গিয়ে মাফকার কবল থেকে আমার লোকদের উদ্ধার করার কাজে এটাকে ব্যবহার করতে চাই শুধু।

এই বলে দড়ি দিয়ে কাপড়ে জড়ানো পান্নার তালটাকে ভাল করে বেঁধে তার কোমরের সঙ্গে বেঁধে দড়িতে ঝুলিয়ে নিল। তারপর ছুরিটা তুলে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো।

যাবার জন্য উদ্যত হয়ে সে বলল, একদিন পর তুমি যারা এখান থেকে যেতে চায় তাদের নিয়ে কাজীদের দেশে তাদের সঙ্গে লড়াই করে পথ করে চলে যাবে। তবে আমি মাফকাকে আমাদের পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারলে তোমাদের সুবিধা হবে। কাজ সেরে আমি এই পান্নাটাকে নিউবারি আর মাফা নদীর সঙ্গমের কাছে এক জায়গায় রেখে আমার কাজে চলে যাব। তিন সপ্তাহ পর আমি আবার ফিরে এসে সেই পান্নার তালটাকে জুলিদের হাতে তুলে দেব।

লর্ড বলল, তাহলে আমার কি হবে? তুমি জুলিদের দেবে? এই জন্যই কি আমি উরার হাত থেকে তোমাকে বাঁচালাম?

টারজন বলল, আমি চাই এটা তোমরা সবাই মিলে ভাগ করে নাও। তুমি ত বলেছিলে এটা কাজীদের ঘুষ দিয়ে তাদের দেশের ভিতর দিয়ে পথ করে বাইরের জগতে চলে যাবে। তুমি অন্য সবাইকে ফাঁকি দিয়ে একা এটা নিতে চাও তা ত আমি জানতাম না।

টারজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে লর্ড দরবার,

ঘরে চলে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে রক্ষীদের ঘরে গেল।

উরার দরবার ঘর থেকে লর্ডকে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে রক্ষীরা অবাক হয়ে গেল। মেয়ে যোদ্ধাদের মধ্যে লরো বলল, কি হলো লর্ড, তুমি কি ভাবে তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে এলে?

লর্ড বলল, সেই কাজী বন্দীটা উরাকে খুন করে পান্নার তালটা নিয়ে পালিয়েছে।

সব মেয়ে যোদ্ধারা তখন একযোগে বলে উঠল, উরাকে খুন করেছে। উরা তাহলে মৃত!

হ্যাঁ হ্যাঁ, উরা খুন হয়েছে। কিন্তু পান্নার তালটা চুরি গেছে।

জুলি মেয়েরা তখন উল্লসিত হয়ে ছুটে বেরিয়ে গাঁয়ের পথে পথে এই সুখের সংবাদটা প্রচার করতে লাগল।

এদিকে টারজন তখন গাঁ থেকে কিছুটা দূরে অন্ধকারে একা একা পথ চলতে চলতে গাঁ থেকে অনেক হৈ হুল্লোড়ের শব্দ শুনতে পেল। সেই সঙ্গে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে জয়ঢাক বাজানোর শব্দও শুনতে পেল।

টারজন বুঝতে পারল লর্ড সবাইকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তারা এবার একযোগে তাকে ধরতে আসবে।

টারজন তার চলার গতি বাড়িয়ে দিল।

এদিকে লর্ড জুলির সকলকে বোঝাতে লাগল, যদি আমরা পান্নার তালটাই না পাই তাহলে উরার মৃত্যুতে আমাদের কি লাভ হবে। আমরা মুক্ত হয়ে বাইরের জগতে গিয়ে কি করব?

টারজন এবার তার অনুসরণকারীদের পদশব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল। সে বুঝতে পারল তারা এখন বিক্ষুব্ধ। তারা যদি একবার ধরতে পারে তাকে

তাহলে তার জয়ের উদ্দেশ্য সাধনের কোন আশাই থাকবে না।

নদীর ধারে ধারে আরো কিছুটা এগিয়ে গেলে টারজনের মনে হল সে যেন একা নেই। ছায়ার মত কে যেন তাকে জড়িয়ে ধরে তার সঙ্গে হাঁটছে। তার নিঃশ্বাস পড়ছে তার গায়ে। অথচ তার তীব্র ঘ্রাণ-শক্তির মাধ্যমে সে বুঝল কেউ নেই।

কোন যাদুশক্তি বা মায়ায় বিশ্বাস করে না টারজন। অথচ অশরীরী প্রেতের মত কে তাকে অনুসরণ করছে তা বুঝতে পারল না। একবার মনে হলো উরার প্রেতাত্মা। কিন্তু পরে বুঝল এটা হলো পান্নার ধাতব শক্তি।

তা যদি হয় তাহলে কাজীদের হীরকখণ্ড গলফানের মধ্যেও আছে এই একই শক্তি। সেই গলফানই হলো মাফকার সকল শক্তির উৎস এবং মাফকা এই পান্নার তালটা পেলে দ্বিগুণ শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

টারজন এবার পথটা ছেড়ে এক পাশের এক বড় পাথরের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইল। দেখল তার অনুসরণকারী জুলিরা লর্ডএর নেতৃত্বে অনেক কাছে এসে পড়েছে। ওদের দলে আছে পঞ্চাশজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আর প্রায় চারশো জুলি মেয়ে যোদ্ধা। ওদের ধারণা পলাতক বেশী দূরে যেতে পারেনি।

টারজন পান্নার তালটার উপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে দুহাত দিয়ে ছুঁয়ে মেয়ে যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে মনে মনে বলতে লাগল, তোমরা ফিরে যাও। নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যাও।

মেয়েরা তবু সেই পথ ধরে এগিয়ে আসছিল অব্যাহত গতিতে। টারজন তবু হতাশ হলো না। পান্নার তালটা থেকে সব আবরণ সরিয়ে সেটা একটু তুলে ধরতেই চাঁদের আলোয় চকচক করতে লাগল সেটা। এক উজ্জ্বল সবুজ আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল টারজনের দেহটা। সে বেশ বুঝতে পারল এক নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে তার দেহে। যতবারই সে ডান হাত দিয়ে পান্নার তালটাকে স্পর্শ করে ততবারই অলৌকিক বৈদ্যুতিক শক্তির তরঙ্গ সঞ্চারিত হয় তার দেহের প্রতিটি শিরায়। মেয়েদের লক্ষ্য করে সে আবার তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করল। মনে মনে বলল, ফিরে যাও।

জুলি মেয়েরা হঠাৎ থেমে গেল চলতে চলতে।

শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের একজন বলে উঠল, কি হলো, থামলে কেন?

একজন মেয়েযোদ্ধা বলল, আমরা ফিরে যাচ্ছি।

কেন?

তা জানি না। আমরা বিশ্বাস করি না উরা মরে গেছে। সে আমাদের ডাকছে। ফিরে যেতে বলছে।

লর্ড বলল, বাজে কথা। আমি নিজে দেখেছি সে খুন হয়েছে। তার মাথাটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে একতাল মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে।

মেয়েরা ফিরে যেতে লাগল।

লর্ড বলল, ওদের যেতে দাও।

লর্ডের নেতৃত্বে পঞ্চাশজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ দাঁড়িয়ে রইল। জুলির মেয়েযোদ্ধারা ক্রমে পথের বাঁকটায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

লর্ড বলল, ভাল হলো। আমরা মোট পঞ্চাশজন আছি। পান্নাটা পেয়ে মেয়েগুলোকে আর ভাগ দিতে হবে না।

আড়াল থেকে মুচকি হাসল টারজন।

লর্ড তার দলের লোকদের বলল, এগিয়ে চল। দেরী করছ কেন?

কিন্তু কেউ নড়ল না। কেউ পা তুলতে পারল না। এমন কি লর্ড নিজেও চলতে পারল না।

একজন লর্ডকে বলল, কি হলো, যাচ্ছ না কেন?

লর্ড বলল, তোমরাই বা যেতে পারছ না কেন?

লর্ডের মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন দারুণ ভয় পেয়ে গেল। সে বলল, আমি বা তোমরা কেউ যেতে পারবে না। মেয়েরা ঠিকই বলেছিল, উরার শক্তি কাজ করছে।

লর্ড বলল, আমি নিজে দেখেছি সে মরে গেছে।

তাহলে তার প্রেতাত্মা। ঐ দেখ।

এই বলে পথের ধারে যে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ছিল টারজন সেই দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল।

সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। পাথরের ওধার থেকে একটা সবুজ আলো বেরিয়ে এসে চাঁদের আলোকে ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

শ্বেতাঙ্গরা ভয়ে বুকে ক্রশ আঁকতে লাগল তা দেখে।

এমন সময় পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল টারজন।

লর্ড বলল, সেই কাজী।

অন্য একজন বলল, সেই পান্নার তাল।

কিন্তু কেউ অস্ত্র তুলল না। কেউ এগিয়ে গেল না টারজনের দিকে।

টারজন এবার তাদের কাছে এসে বলল, তোমরা সংখ্যায় পঞ্চাশজন আছ। আমার সঙ্গে কাজীদের দেশে এস। সেখানে আমার কয়েকজন লোক বন্দী হয়ে আছে। তাদের মুক্ত করে আমরা ওদেশ থেকে বেরিয়ে যাব। তারপর যার যেখানে ইচ্ছা চলে যাবে।

লর্ড বলল, কিন্তু পান্নাটা? তুমি বলেছিলে আমাকে তার ভাগ দেবে।

টারজন বলল, কিছুক্ষণ আগে তুমি আমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলে। ফলে সে অধিকার তুমি হারিয়ে ফেলেছ। তাছাড়া আমি এখন এই পান্নার শক্তির স্বরূপটা বুঝতে পেরেছি। এ শক্তি বিপজ্জনক। তোমার মত অযোগ্য লোকের হাতে পড়লে তা দারুণ ক্ষতি করবে। কাজীদের দেশ থেকে আমি বেরিয়ে গেলে নিউবারি নদীর জলে এটা ফেলে দেব যাতে কেউ এটাকে খুঁজে না পায়।

লর্ড বলল, আসলে তুমি এটা নিজের কাছেই রেখে দিতে চাও। কাউকে ভাগ দিতে চাও না।
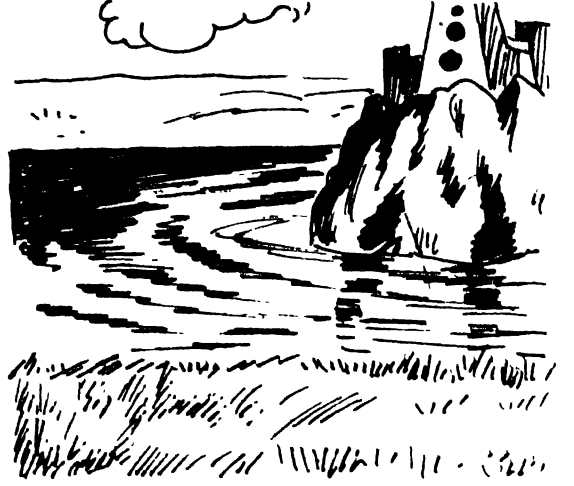
টারজন বলল, যা খুশি ভাবতে পার। এখন এস আমার সঙ্গে।

টারজনের পিছু পিছু নীরবে এগিয়ে যেতে লাগল ওরা।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু আগে পথের ধারে একটা উঁচু জায়গা থেকে টারজন কাজীদের নগর আর মাফকার দুর্গটা দেখতে পেল। একটা উপত্যকার একপ্রান্তে একটা খাড়া পাহাড়ের কোলে গড়ে উঠেছে নগরটা। জুলিদের গ্রামের থেকে এ নগরটা অনেক বড় এবং আরো বিস্তৃত জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে।

দূর থেকে কাজীদের নগরটা দেখার পর টারজন তার দলের লোকদের বলল, আমরা অনেক পথ হেঁটেছি। তার উপর কিছুই খাওয়া হয়নি। তোমরা সবাই ক্লান্ত। রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে না ওঠা পর্যন্ত ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। সুতরাং তোমরা এখন বিশ্রাম করো।

একজনের কাছ থেকে একটা বর্শা নিয়ে তার মুখ দিয়ে একটা জায়গার চারদিকে একটা গণ্ডী টেনে দিল টারজন। তারপর বর্শাটা যার হাত থেকে নিয়েছিল তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, তোমরা কেউ এই গণ্ডীর বাইরে পা বাড়াবে না।

এই বলে সেই গণ্ডীর রেখার বাইরে কিছুটা দূরে সে নিজে শুয়ে পড়ল। পান্নার তালটা তার পাশে রাখল এবং তার উপর একটা হাত চাপিয়ে রাখল।

সকলেই বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে শুয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। একমাত্র লর্ড একা জেগে রইল। পান্নাটার দিকে সব সময়ের জন্য নিবদ্ধ করে রাখল তার জাগ্রত দৃষ্টি। ধাতুটা থেকে বিচ্ছুরিত এক সবুজ আভার বৃত্তসীমার মধ্যে অর্থদ্বারা ক্রয়যোগ্য সভ্য জগতের সকল সম্পদ ও সকল ঐশ্বর্যকে আবদ্ধ দেখতে পেল সে।

সন্ধ্যা গিয়ে রাত্রি এল। তবু চাঁদ উঠল না আকাশে। চারদিকে ঘোর অন্ধকার। শুধু পান্নার সবুজ একটুখানি অস্পষ্ট আলো এ জায়গার কিছুটা অন্ধকার দূর করেছিল।

লর্ড লক্ষ্য করল টারজনের একটা হাত পান্নার উপর চাপানো আছে। তার মনে পড়ল উরা যখন কাউকে দিয়ে জোর করে কিছু করাত তখন সে পান্নাটার উপর হাত দিয়ে রাখত। সে তাই বুঝল যতক্ষণ কেউ তার কোন অঙ্গ দিয়ে ছুঁয়ে থাকবে পান্নাটাকে ততক্ষণই সে এক অলৌকিক অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী থাকবে।

দেখতে দেখতে লর্ড একসময় দেখল ঘুমের মধ্যে একবার পাশ ফিরতেই টারজনের হাতটা পান্নার উপর থেকে খসে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের বর্শাটা নিয়ে ঘুমন্ত টারজনের দিকে এগিয়ে গেল। লর্ড গণ্ডীটা পার হবার সময় একটু ইতস্ততঃ করল। তারপরই সে টারজনের কাছে গিয়ে পান্নাটা তুলে নিল। বর্শা দিয়ে টারজনকে হত্যা করার কথাও একবার ভেবেছিল সে। কিন্তু তা করল না কারণ ভাবল তাকে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করলেও মরার আগে সে চেঁচালে সকলে জেগে উঠবে। তখন পান্নাটা নিয়ে একা পালাতে পারবে না। তাহলে সকলকেই ভাগ দিতে হবে।

পান্নার তালটা নিয়ে লর্ড একা নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

হঠাৎ চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠল টারজন। চাঁদের আলো ঝরে পড়ছিল তার মুখের উপর। তার মনে হলো সে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে। হাতের কাছে পান্নার তালটা না পেয়ে তার খোঁজ করতে লাগল।

কিন্তু সেটা না পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে ঘুমন্ত লোকগুলোর কাছে গেল। দেখল সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু লর্ড নেই। টারজন ভাবল লোকগুলোকে জাগিয়ে তুলে কোন লাভ হবে না। কারণ এখন তার সব শক্তির উৎস পান্নার তালটা নেই। এখন সে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এখন তারা সবাই শত্রু হয়ে উঠবে।

সারা শিবিরটার চারদিকে ঘুরে গন্ধসূত্র ধরে সে বুঝতে পারল লর্ড মাফা নদীর উপত্যকার উপর দিয়ে পালিয়ে গেছে। সে গেছে নিউবাবি নদীর দিকে। লর্ড হয়ত ঘণ্টা দুই আগেই চলে গেছে। কিন্তু যত আগেই সে যাক সে তাকে ধরবেই।

রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল টারজন।

প্রায় একঘণ্টা ধরে লর্ডকে অনুসরণ করার পর টারজন দূরে অস্পষ্ট একটা সবুজ আলো দেখতে পেল। দেখল আলোটা ডান দিকে ঘুরে একটা পথ ধরল। মনে হলো লর্ড বোধ হয় কাজীদের নগরটাকে পাশ কাটিয়ে অন্য একটা পথ ধরেছে। কিন্তু ও যে পথেই যাক তাকে ধরে ফেলবে সে।

দ্রুতপায়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ টারজনের পায়ের মাটিটা নেমে গেল। সে একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। সে বুঝল গর্তের উপরটা নরম মাটি আর ডালপালা দিয়ে ঢাকা ছিল। আসলে এটা চিতাবাঘ ধরার একটা ফাঁদ। ফাঁদটা কাজীরা পেতেছে।

টারজন দেখল গর্তের মুখটা অনেক উঁচুতে। লাফ দিয়ে সেখানে উঠে বার হওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। সে বুঝল কাজীরা কাল দিনের বেলায় ফাঁদটা দেখতে আসবে। ততক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তারা এসে হয় তাকে বধ করবে পশুর মত অথবা বন্দী করে নিয়ে যাবে। তবে ফাঁদের মুখটা আর ঢাকা নেই বলে কোন চিতা অন্ততঃ এ গর্তে আর পড়বে না।

রাত্রি গভীর হতেই ঘুমিয়ে পড়ল টারজন সেই অন্ধকার গর্তটার মধ্যে। আসন্ন বন্দীত্ব বা মৃত্যুর সম্ভাবনাপূর্ণ এই শোচনীয় অবস্থাও কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারল না তার মাথার স্নায়ুগুলোকে।

টারজনের যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন সূর্য মাথার উপরে উঠে গেছে অনেকটা। সে কান পেতে একসঙ্গে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পেল। তাদের কথাবার্তাও শুনতে পাচ্ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টারজন মুখ তুলে দেখল কয়েকজন মেয়েযোদ্ধা আর কয়েকজন পুরুষ গর্তের উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছে তাকে। তাদের একজন বলল, চমৎকার একটা চিতা ধরা পড়েছে।

আর একজন বলল, মাফকা খুশি হবে। কিন্তু আমাদের নগরের কাছে উপত্যকায় যে সব প্রহরী ছিল তাদের চোখে ধুলো দিয়ে এখানে ও এল কি করে?

গর্তের মধ্যে একটা মোটা দড়ি ফেলে দিল ওরা। টারজন বলল, ধর দড়িটা, আমি উঠছি।

দুটো কারণে ধরা দিতে চাইল টারজন। প্রথমতঃ এখানে বাধা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে যাওয়া মানে অবধারিত মৃত্যু। দ্বিতীয়তঃ তাকে বন্দী মাফকার কাছে নিয়ে গেলে সে অন্তত: উড ও তার সঙ্গীদের উদ্ধার করার সুযোগ পাবে একটা।

দড়ি ধরে উঠে গর্তের উপর টারজন পা দিতেই কতকগুলো বর্শা তার চারদিকে উঁচিয়ে ধরল যোদ্ধারা।

টারজন দেখল আটজন মেয়েযোদ্ধা আর চারজন পুরুষ। সকলেই শ্বেতাঙ্গ এবং সশস্ত্র।

একজন মেয়ে আশ্চর্য হয়ে বলল, কে তুমি ?

টারজন বলল, আমি একজন শিকারী।

এখানে এলে কি করে ?

টারজন বলল, আমি উত্তর দিক থেকে পার্বত্য অঞ্চলে শিকার করতে করতে আসছি। পরে পার্বত্য এলাকা এড়িয়ে এই উপত্যকার পথে চলে আসি। আমি আবার নিউবারির দিকে চলে যাব।

মেয়েযোদ্ধাটি বলল, না, তুমি এখন আমাদের বন্দী। আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

টারজন বলল, ঠিক আছে, তাই নিয়ে চল। তোমরা বারোজন, আমি একা। তোমাদের হাতে অস্ত্র আছে, আর আমি নিরস্ত্র।

টারজনকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল ওরা। কিন্তু হাত দুটো বাঁধল না।

ইচ্ছা করলেই পালাতে পারত টারজন। তার সঙ্গে ছুটে পারত না ওরা। কিন্তু যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও পালালো না সে। কারণ সে কাজীদের দেশেই যেতে চায়।

যে চারজন শ্বেতাঙ্গ লোক টারজনের সঙ্গে যাচ্ছিল তাদের কথাবার্তা হতে টারজন জানতে পারল তাদের একজনের নাম স্ট্রোল। স্ট্যানলি উডের মুখ থেকে তার সঙ্গী স্ট্রোল ও ভন আইকের নাম শুনেছিল।

টারজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি উড আর ভন আইকের সঙ্গে ছিলে ?

স্ট্রোল বিস্মিত হয়ে টারজনের মুখপানে তাকাল। তুমি উডকে চিনতে ?

টারজন বলল, হ্যাঁ, সে কি আবার ধরা পড়েছে ?

স্ট্রোল বলল, হ্যাঁ, মাফকার কবলে একবার পড়লে আর নিষ্কৃতি নেই। সে তোমাকে দূর থেকেও টেনে আনবেই। উড পালিয়ে গিয়েও আবার ফিরে এসেছে। আচ্ছা তোমার নাম কি ক্লেটন ?

টারজন বলল, হ্যাঁ।

তোমার কথা উডের কাছ থেকে অনেক শুনেছি। তোমার চেহারার বর্ণনা তার মুখ থেকে শুনেছিলাম বলেই তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারি।

উড কি এখনো বেঁচে আছে ?

হ্যাঁ, মাফকা এখনো মারেনি তাকে। তবে ওকে মরতেই হবে। মাফকা ওর পালানোর জন্য দারুণ রেগে আছে। লোকটা ভয়ঙ্কর। একমাত্র টমি সেনাদের এক বিরাট দলই তাকে জব্দ করতে পারে।

টারজন আবার জিজ্ঞাসা করল, মাফকা কি সত্যি সত্যিই মৃত্যুদণ্ড দিতে চায় উডকে ?

স্ট্রোল বলল, ও হয়ত উডের শুধু পালানোর জন্য

এত রাগত না। উডের সবচেয়ে বড অপরাধ সে রাণী গলনালাকে ভালবাসে এবং গলনালারও একটা দুর্বলতা আছে তার প্রতি।

সারা পথটা স্ট্রৌল টারজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেতে লাগল। নগরের কাছাকাছি এসে টারজন দেখল নগরপ্রাচীরটা পাথর দিয়ে গাঁথা। নগরের ভিতরের বাড়িগুলো সব পাথরের এবং সেগুলো একতলা অথবা দোতলা। একমাত্র মাফকার প্রাসাদটা চারতলা।

রাজপথের উপর দিয়ে টারজনকে নিয়ে ওরা মাফকার প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল। পথে অনেক কৃষ্ণকায় নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আর মেয়ে-যোদ্ধা দেখল। পথে যে সব শিশুরা খেলা করছিল তারা সবাই মেয়ে।

মাফকার প্রাসাদের কাছে এলে চারজন পুরুষ সরে গেল। শুধু আটজন মেয়েযোদ্ধা প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেল টারজনকে। টারজন দেখল উরার প্রাসাদের থেকে মাফকার প্রাসাদে ঐশ্বর্যের পরিমাণ অনেক বেশী। মাফকা অনেক লুটের মাল পায়, উরা সেটা পায় না।

দরবার ঘরে ঢুকে টারজন দেখল ঘরের শেষ প্রান্তে একটি মঞ্চের উপর পাতা একটি সিংহাসনে যে মানুষটি বসে আছে তাকে দেখতে অবিকল উরার মত। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। তখন উডের কথাটা মনে পড়ল তার। উড বলেছিল আসলে মাফকা আর উরা দুই যমজ ভাই; দেখতে একই রকমের।

টারজনকে ধরার সময় যে সব মেয়েযোদ্ধারা ছিল তারা বন্দী সম্বন্ধে বিবরণ পেশ করল মাফকার কাছে। মাফকা সে বিবরণ খুঁটিয়ে দেখার পর উরার মতই গলফান নামক সেই হীরের তালটার উপর হাত রেখে টারজনকে প্রশ্ন করল, কে তুমি?

টারজন বলল, আমি একজন ইংরেজ, শিকার করছিলাম।

কি কারণে?

খাদ্যের জন্য।

মাফকার পাশেই একটি চেয়ারে একটি সুন্দরী মেয়ে বসেছিল। টারজন বুঝতে পারল ঐ মেয়েটিই হলো গনফালা অর্থাৎ কাজীদের রাণী। তার বুকে ও পেটের উপর খাঁটি সোনার বক্ষাবরণী ও উদরবেষ্টনী। পরনে ছিল চিতার নরম চামড়া দিয়ে তৈরী স্কার্ট। তার হাতে, বাহুতে ও পায়ে ছিল অনেক তামা ও সোনার গয়না। তার মাথার উপর ছিল হালকা একটা মুকুট।

উরার মত মাফকার পরনে ছিল মাত্র একটা কৌপীন এবং ভুঁড়িটা মোটা। টারজন বুঝল রাণীর বেশভূষা যতই জাঁকজমকপূর্ণ হোক, তার মুকুট যতই শক্তির প্রতীক হোক, আসল শক্তি আছে কৌপীন পরা ঐ কুৎসিতদেহী লোকটার হাতে।

টারজনকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখার পর মাফকা হুকুম দিল, নিয়ে যাও ওকে এখান থেকে। ওকে হত্যা করা হবে।

রক্ষীরা টারজনকে উপরতলার একটি বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে একা রেখে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে চলে গেল। ছুটো বেঞ্চ ছাড়া আর কোন আসবাব-পত্র ছিল না সে ঘরে। ঘরের দেওয়ালে নগরের দিকে কতকগুলো ছোট ছোট জানালা ছিল। তাই দিয়ে বাইরে থেকে কিছু আলো আসছিল। এক-দিকের দেওয়ালে আগুন জ্বালাবার একটা বড় চুল্লী ছিল। কিন্তু সেখানে কোন আগুন জ্বালানো ছিল না।

ঘরটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল টারজন। জানালাগুলো ঘরের অনেক উপরে। সেদিক দিয়ে বাইরে যাবার কোন উপায় নেই।

সে তখন আগুন জ্বালাবার শূন্য চুল্লীটাকে পরীক্ষা করে দেখল। দেখল সেটা আসলে কোন চুল্লী নয়, নিচের তলায় যাবার একটা গুপ্ত পথ। সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ দিয়ে নিচের তলায় একটি বড় ঘরে গিয়ে পড়ল টারজন। ঘরটির দরজায় ভিতর থেকে খিল আঁটা ছিল। মৃদু আলোকিত সেই ঘরের একপ্রান্তে একটি চেয়ারের উপর কাজীদের রাণী গনফালা বসে তন্ময় হয়ে কি ভাবছিল।

নিঃশব্দে গনফালার দিকে এগিয়ে গেল টারজন। বুঝতে পেরে মুখ ফিরিয়ে টারজনকে দেখে বিস্মিত হলো গনফালা। কিন্তু চীৎকার করল না।

টারজন বলল, ভয় পেও না। আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে আসিনি।

গনফালা বলল, আমি ভয় পাইনি। আমার হাতের নাগালের মধ্যে অনেক যোদ্ধা আছে এবং ডাকলেই তারা ছুটে আসবে। কিন্তু তুমি কি করে এলে এখানে?

টারজন দেখল রাণী গনফালার মধ্যে প্রভুত্বসূচক কোন কঠোর বা উদ্ধত ভাব নেই। সে এখন শান্ত মিষ্টি একটি মেয়ে।

টারজন তার কোন জবাব না দিয়ে বলল, স্ট্যানলি উড এখন কোথায়? ওরা ওকে নিয়ে কি করবে?

তুমি স্ট্যানলি উডকে চিনলে কি করে?

আমি তার বন্ধু। সে এখন কোথায়?

গনফালা বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে টারজনের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি তার বন্ধু? তাতে কিছু যায় আসে না। তার যত বন্ধুই থাক, কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না।

তোমারই সাহায্যে সে কিন্তু একদিন মুক্ত হয়ে পালিয়ে যায়।

চুপ করো। মাফকা আমাকে এ ব্যাপারে সন্দেহ করে বলেই আমাকে কড়া পাহারায় এ ঘরে নজরবন্দী করে রেখেছে। সে বলে আমারই নিরা-পত্তার জন্যই এই পাহারার ব্যবস্থা। কিন্তু আমি জানি এর আসল কারণ কি।

মাফকা কোথায়? আমি তাকে দেখতে চাই।

তুমি তাকে আগেই দেখেছ। তোমাকে বন্দী করে তারই কাছে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়।

কিন্তু তুমি একজন বিদেশী হয়ে তাকে না জানিয়ে তার নগর সীমানার মধ্যে প্রবেশ করেছ শুনে তোমাকে দেখতে চায় সে। কিন্তু তুমি আসলে কে ?

টারজন নিচু গলায় বলল, কিন্তু তুমি স্ট্যালনি উডকে মুক্ত করতে চাও এবং তার সঙ্গে তুমি যেতে চাও। তবে তুমি কেন আমাকে সাহায্য করছ না ?

কিন্তু কি করে তোমায় সাহায্য করতে পারি আমি ?

তুমি শুধু আমাকে বলে দাও মাফকাকে একা কোথায় পেতে পারি আমি।

সহসা গনফালার মুখের ভাবটা বদলে গেল একেবারে। এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার ছাপ ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। উডের কথাটা মনে পড়ে গেল টারজনের। মাঝে মাঝে এমনি করে আশ্চর্যভাবে বদলে যায় গনফালা।

কোন কথা না বলে 'রক্ষী' 'রক্ষী' বলে চীৎকার করে উঠল গনফালা ! সে তার কোমরের খাপ থেকে ছুরিটা বার করে টারজনকে মারতে গেল লাফ দিয়ে। টারজন তার হাতের কব্জিটা ধরে ফেলে কেড়ে নিল ছুরিটা। তারপর বলল, বল, কিছু হয়নি। ওদের যেতে বল।

রক্ষীরা গনফালার চীৎকার শুনে রুদ্ধ দরজায় করাঘাত করছিল। গনফালা আরো জোরে চীৎকার করতে লাগল সাহায্যের জন্য।

টারজন তখন তাকে ধরে ঘরের অন্য দিকের একটি দরজা খুলে ভিতর দিকের একটি ঘরে তাকে ভরে দরজাটায় শিকল তুলে দিল। তারপর যে গোপন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে এসেছিল সেই পথে এক মুহূর্তে তার উপরতলার ঘরে চলে গেল।

রক্ষীরা সেই ঘর খুলে গনফালাকে মুক্ত করলে গনফালা বলল, লোকটা কোথায় ? তাকে ধরেছ ?

রক্ষীবাহিনীর একজন বলল, এ ঘরে ত কেউ নেই।

যে লোকটাকে আজ বন্দী করে আনা হয় সেই লোকটা নেই ?

এখানে ত কেউ ছিল না।

মাফকার কাছে গিয়ে এখনি জানাও বন্দীটা পালিয়েছে। তোমাদের মধ্যে কয়েকজন বন্দীর ঘরে এখনি গিয়ে দেখ সে সেখানে আছে কি না। আমি বলছি লোকটা আমার ঘরে একটু আগে এসেছিল। আমার ছুরিটা সে কেড়ে নিয়ে ঐ ঘরে আমাকে ভরে রাখে। তোমরা কয়েকজন এ ঘরে থাক। সে আবার আসতে পারে।

রক্ষীরা টারজনের ঘরে গিয়ে যখন দেখল সে বসে আছে সেই ঘরে তখন তারা আশ্চর্য হয়ে গেল সকলে।

একজন রক্ষী জিজ্ঞাসা করল তাকে, কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?

কোথায় আর যাব ?

তুমি রাণী গনফালার ঘরে গিয়েছিলে।

সেটা আমাকে জিজ্ঞাসা না করে রাণীকে জিজ্ঞাসা করগে। কেউ যদি পাগল হয়, আমি ত আর পাগল নই।

রক্ষীরা চলে গেল ঘর বন্ধ করে। ঘণ্টাখানেক পর ডজনখানেক মেয়েযোদ্ধা এসে টারজনকে সঙ্গে করে মাফকার কাছে নিয়ে গেল। টারজন দেখল মাফকার শোবার ঘরটা রাণীর ঘরের পাশেই।

একটা টেবিলের ধারে তখন দাঁড়িয়ে ছিল মাফকা। টেবিলের উপর কাপড় জড়ানো কি একটা জিনিস ছিল। তার পাশেই ছিল গনফাল নামে সেই হীরকের তাল। মাফকা তার উপর একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল।

নাকে রক্তের গন্ধ পেল টারজন। সে দেখল কাপড় ঢাকা যে বস্তুটা টেবিলের উপর ছিল তার উপর রক্তের দাগ রয়েছে। সে বুঝল বস্তুটা যাই হোক সেটা তাকে দেখাতে চায় মাফকা।

মাফকার সামনে দাঁড়িয়েছিল টারজন। দুজনেই ছিল নীরব নির্বাক, শুধু মনে মনে যুদ্ধ চলছিল।

হঠাৎ মাফকা প্রশ্ন করল টারজনকে, রাণীর ঘরে কি করে গিয়েছিলে?

টারজন কড়া গলায় বলল, কিন্তু তুমি কেমন করে জেনেছ যে আমি রাণীর ঘরে গিয়েছিলাম?

গনফালা তোমাকে দেখেছে।

গনফালা আমাকে সশরীরে দেখেছে না এটা তার মনের অসার কল্পনা। তাছাড়া এমনও হতে পারে যাদুকর মাফকাই হয়ত তার মনে এই চিন্তাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

মাফকা গর্জন করে উঠল, না, আমি তা করিনি।

টারজন এবার বুঝল উপরতলার কারাকক্ষ থেকে নিচের তলায় গনফালার ঘরে যাবার যে একটা গোপন সুড়ঙ্গপথ আছে মাফকা তা জানে না।

টারজন আরও লক্ষ্য করল যে ঘরে দাঁড়িয়ে

আছে মাফকা সে ঘরের পিছনে আর একটি আলোকিত ঘর রয়েছে। সেইটিই তার শোবার ঘর ও গবেষণাগার।

এবার এক নতুন প্রশ্ন করল মাফকা, কেন তুমি আমাকে না জানিয়ে জুলিদের দেশে গিয়েছিলে?

টারজন বলল, একথা কে বলেছে আমি ওখানে গিয়েছিলাম?

তুমিই আমার ভাই উরাকে মেরেছ। তুমিই তার পান্নার তালটা চুরি করেছিলে। তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য এদেশে এসেছ। তুমি জানতে চাইছিলে কে বলেছে আমাকে এ সব কথা। বলেছে এই লোকটি।

এই কথা বলেই সেই রক্তমাখা কাপড়টা টেনে সরিয়ে দিল মাফকা। সঙ্গে সঙ্গে লর্ডের কাটা মুণ্ডটা আর তার পাশে পান্নার সবুজ ধাতব তালটা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সে।

কিন্তু টারজনের মুখের ভাবের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। সে মোটেই বিচলিত হলো না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মাফকা বলল, মাফকার শত্রুদের এই অবস্থাই হয়। তোমাকেও এইভাবে মরতে হবে। যারা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে, আমার লোকদের উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ করে তুলছে তাদেরকেও মরতে হবে এমনি শোচনীয়ভাবে।

এরপর সে তার রক্ষীদের ডেকে বলল, যাও, লোকটাকে সেই ঘরে বন্দী করে রাখগে। অন্য সব ষড়যন্ত্রকারীদেরও ওর সঙ্গে একই ঘরে রাখবে। একই সঙ্গে মারা হবে ওদের।

আগে যে ঘরে টারজন ছিল উপরতলার সেই ঘরে রক্ষীরা নিয়ে গেল তাকে। আর কোন কোন্ বন্দীকে তার ঘরে আনা হবে তা বুঝতে পারল না টারজন। সে জানালা দিয়ে নগরটার দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে তা দেখার চেষ্টা করছিল আর ভাবছিল উডের সঙ্গে কিভাবে দেখা হতে পারে তার।

টারজন একটা পরিকল্পনা খাড়া করল বটে, কিন্তু সেটা নির্ভর করছে উডের উপর।

টারজন যখন আপন মনে এই সব কথা ভাবছিল হঠাৎ তখন ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে খোলা হলো। চারজন বন্দী ঘরে ঢুকল। দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। মুখ ঘুরিয়ে টারজন দেখল চারজন বন্দীর মধ্যে উড একজন।

টারজনকে দেখেই চীৎকার করে উঠল উড, ক্লেটন না? আরে তুমি কি করে এখানে এলে? এখানে কি করছ তুমি?

তোমাদের মতই মৃত্যুর জন্য প্রহর গণনা করছি।

তুমি কি করে ধরা পড়লে? আমি ভেবেছিলাম তোমাকে ওরা কিছুতেই ধরতে পারবে না।

টারজন তখন তাকে বুঝিয়ে বলল, কি ভাবে সে এদিকে আসতে আসতে চিতাবাঘ ধরার ফাঁদে পড়ে যায় এবং কিভাবে তারা ধরে তাকে।

উড তখন তার সঙ্গী তিনজনের সঙ্গে টারজনের
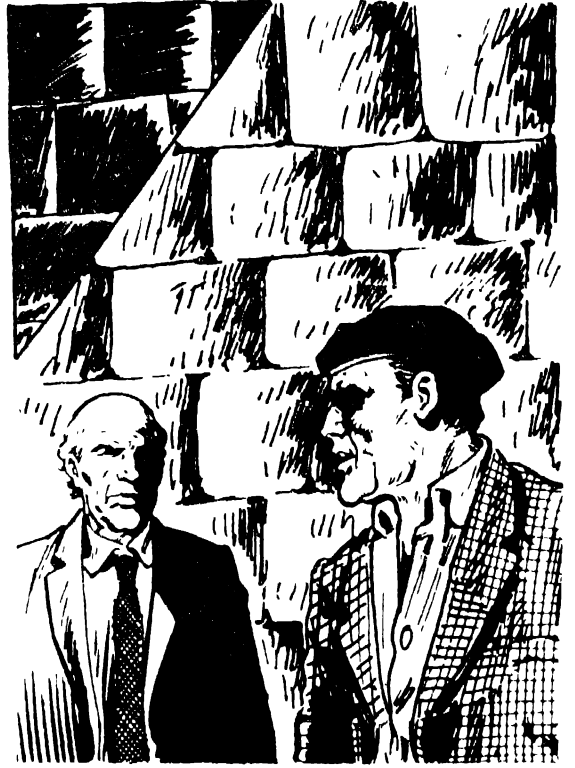
পরিচয় করিয়ে দিল। তার সঙ্গে ভন আইক, স্ট্রোল আর স্পাইক। স্ট্রোলের সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল টারজনের। এই তিনজন সঙ্গী তাদের সফরীতে ছিল।

টারজন বলল, মাফকা আমাকে একটু আগে বলেছে, আমাদের সবাইকে মারবে ওরা। মাফকা বলেছে তোমরা গোলমাল বাধাও।

ভন আইক বলল, কোন গোলমাল বাধাবার আগেই ও সব জানতে পারে। তুমি কিছু ভাববার আগেই ও তা জানতে পারে।

টারজন বলল, স্পাইক ঠিকই বলেছে, গনফালার মধ্যে নিগ্রো রত্ন আছে। আমি কিছুক্ষণ আগে ওকে দেখেছি।

তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছ তাকে?

হ্যাঁ বলেছি। সে তোমাকে সাহায্য করতে চায়।

প্রথমে সে এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিল এবং আমাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু পরে হঠাৎ সে বদলে যায় এবং চীৎকার করে আমাকে ধরাবার জন্য প্রহরীদের ডাকতে থাকে অকারণে।

টারজন বলল, এখন আমাদের একমাত্র ভাববার বিষয় হলো কিভাবে আমরা মুক্তি পেতে পারি। তবে আমাদের যা কিছু তাড়াতাড়ি করতে হবে। হঠাৎ ওকে ধরতে হবে।

উড বলল, কিন্তু কড়া পাহারার মধ্যে রুদ্ধদ্বার ঘরে বন্দী থাকাকালে কি ভাবে ওকে হঠাৎ ধরব?

টারজন বলল, অন্য বন্দীদের খবর কি? তারা কি আমাদের দলে যোগদান করবে?

উড বলল, একবার যদি হীরের তালটা হস্তগত করতে পারতাম! ঐ ধাতুটাই ওর সমস্ত শক্তির উৎস।

টারজন বলল, ওটা আমরা হাত করতে পারি।

উড বলল, অসম্ভব। মাফকা তার ঔষধিবিদ্যা আর যাদু জানে। তার সাহায্যে ও একটা নকল হীরকখণ্ড তৈরী করেছে। সেটা যখন তখন দেখায়। আসল হীরেটা লুকিয়ে রাখে। রাত্রিবেলায় নকল হীরেটা সামনে রেখে আসলটা তার কাছেই কোনভাবে লুকিয়ে রাখে। রাত্রিবেলায় কেউ হীরে চুরির জন্য তার ঘরে ঢুকলে নকল হীরেটাই দেখতে পাবে সামনে। অবশ্য আসল হীরেটাও কাছেই রাখে।

ভন আইক বলল, হীরেটা নিতে হলে রাত্রিবেলায় ওর নির্জন ঘরে ঢুকতে হবে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়।

টারজন বলল, মাফকার ঘরটা কি গনফালা বা রাণীর ঘরের পাশেই?

হ্যাঁ পাশেই, কিন্তু মাফকা দুটো ঘরের মাঝখানের দরজাটা তালাবন্ধ করে রাখে রাত্রিতে।

টারজন বলল, আমার মনে হচ্ছে মাফকার ঘরে আমি যেতে পারব। আমি যাচ্ছি।

কেমন করে যাবে শুনি?

এরপর সে সেই চুল্লীর ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গপথে চলে গেল।

ভন আইক উডকে জিজ্ঞাসা করল, লোকটা কে?

ক্লেটন নামে এক ইংরেজ। আমি অন্ততঃ তাই জানি। ও নিজে আমাকে বলেছে।

আমার মনে হয় টারজন নামে যদি কোন লোক থাকে ত ও হচ্ছে সেই।

উড বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছিল। ও গাছের উপর দিয়ে বাঁদরের মত যাওয়া আসা করে। তীর ধনুক দিয়ে জীবজন্তু মেরে কাঁচা মাংস খায়।

যে সুড়ঙ্গপথ দিয়ে গনফালার ঘরে গিয়ে পড়েছিল টারজন সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে সে গনফালার ঘরটা পাশে ফেলে রেখে মাফকার বড় ঘরটায় গিয়ে পৌঁছল। দেখল মাফকা তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে নাক ডাকিয়ে গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে। তার খাটের পাশে টেবিলে হীরে ও পান্নার দুটো তালই রয়েছে।

টেবিলের উপর একটা ধারাল দা আর একটা বড় ছোরা রয়েছে। গনফালার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া ছুরিটা টারজনের হাতে ছিল।

টারজন নিঃশব্দে মাফকার খাটের কাছে গিয়ে টেবিল থেকে অস্ত্রগুলো সরিয়ে রাখল। তারপর মাফকার ঘাড় ধরে তাকে কিছুটা নাড়াল। মাফকা জেগে উঠতেই টারজন বলল, চুপ করে থাক। তাহলে তোমার কোন ক্ষতি করা হবে না।

মাফকা তার ঘরের চারদিকে তাকাল। দেখল সাহায্যের কোন আশা নেই।

সে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, বল কি চাও? তুমি আমাকে মেরো না। যা চাও তাই দেব।

টারজন এবার মাফকাকে উপুড় করে শুইয়ে তার হাতদুটো পিছন থেকে বেঁধে ফেলল। তারপর তার মুখটা আর চোখদুটোও বেঁধে দিল। তারপর মাফকাকে তার খাটের উপর সেইভাবে ফেলে রেখে গনফালার ঘরে চলে গেল। গিয়ে দেখল গনফালা তার ঘরের মাঝখানে বিছানার উপর বসে আছে।

টারজন বলল, মাফকা যদি কোনরকম হস্তক্ষেপ না করে তাহলে মেয়েযোদ্ধারা তোমার কথা শুনবে ত?

হ্যাঁ।

কোথায় যাবে তুমি?

ইংলণ্ড।

ইংলণ্ডে কেন যাবে?

কারণ আমাকে স্নেহ ও অনুগ্রহ করতেন এমন একজন আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন মুক্তি পেলে আমি যেন ইংলণ্ডে চলে যাই।

ঠিক আছে, তোমার চিঠি সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত হও। তুমি মুক্তি পাবে আজই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি উড আর তার তিনজন সঙ্গী তোমার কাছে আসব। তুমি তৈরী হয়ে থাকবে। তবে তোমার মেয়েযোদ্ধারা

যাতে আমাদের যেতে বাধা না দেয় তার জন্য তাদের হুকুম দেবে তুমি।

সেখানে থেকে বেরিয়ে টারজন সোজা সেই ঘরটায় চলে গেল উড আর তার সঙ্গীরা যেখানে ছিল। টারজন তাদের চুপি চুপি কি বলতে টারজনের পিছু পিছু তারাও বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

টারজন তাদের সোজা মাফকার ঘরে নিয়ে গেল। হীরে আর পান্না দুটোর ধাতুর তাল থেকে আলোর ছটা বেরিয়ে আসছিল ঘর থেকে। স্পাইক আর ট্রোল দুজনে ধাতু দুটোর সামনে দাঁড়িয়ে এক মুগ্ধবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারা বুঝল পান্নার তালটা জুলিদের দেশ থেকে আনা হয়েছে।

ট্রোল হাত দিয়ে ধাতুদুটোকে স্পর্শ করতে গিয়ে ভয়ে স্পর্শ করতে পারল না। এই দুটো ধাতুর শক্তির কথা সে জানত।

উড আর তার সঙ্গীরা মাফকাকে বিছানায় চোখ মুখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে দারুণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল।

উড টারজনকে বলল, কি করে তুমি এ কাজ করলে?

টারজন বলল, আমি প্রথমে ধাতু ছুটোকে সরিয়ে নিয়েছিলাম ওর কাছ থেকে। আসলে ঐ ছুটো ধাতু থেকেই ও সব শক্তি পেত। এবার এখান থেকে চলে যাব আমরা।

এরপর উডেব দিকে মুখ ঘুবিয়ে টারজন বলল, তুমি আর ভন আইক ধাতু ছুটোকে নাও। স্ট্রোল আর স্পাইক মাফকাকে বয়ে নিয়ে যাবে।

ভন আইক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাব আমবা?

সে জানত মাফকার ঘরের বাইরে বারান্দায় মেয়েযোদ্ধারা পাহারা দিচ্ছে।

টারজন বলল, আমরা প্রথমে যাব গনফালার ঘরে।

স্পাইক বলল, সে চীৎকার করে উঠলেই মেয়েযোদ্ধারা ছুটে এসে সব বানচাল কবে দেবে।

গনফালাব কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমাকে যা বলছি তাই করো। তবে সঙ্গে এই সব অস্ত্রগুলোও নিতে পার। বলা যায় না, দরকার হতে পারে।

তারা চলে গেল গনফালার ঘরে।

ওরা গিয়ে দেখল গনফালা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘরেব মাঝখানে। মাফকার অবস্থা দেখে ভয়ে চুপসে গেল। তারপর উডকে দেখে ছুটে গেল তাব কাছে।

ভন আইক টারজনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি স্পাইকের সঙ্গে একমত। ওকে না মারলে যখন আমাদের মরতে হবে তখন আমরা ওকে খুন কবব না কেন?

টাবজন বলল, এখন মাফকাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। কাবণ কাজী মেয়েদেব মনোভাব আমরা জানি না। ওকে তাবা দেবতার মত মানে। মাফকাকে মেবে ফেললে ওবা ক্ষেপে যেতে পাবে।

উড বলল, ক্লেটন ঠিক বলেছে।

গনফালার ঘরের বাইরে দারুণ গোলমাল ও চেঁচামিচির শব্দ শোনা গেল। অনেকে মাফকার ঘরেব দবজায় ঘা দিয়ে মাফকার নাম ধরে ডাকছে।

টারজন তখন গনফালাকে বলল, তুমি মেয়েযোদ্ধাদের মধ্যে প্রধানা একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করো ওরা কি চায়। আমবা পাশের ঘরে যাচ্ছি।

অন্যদেব ডেকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল টারজন।

গনফালা দরজার কাছে যে নাকাড়া ছিল তাতে তিনবার ঘা দিয়ে দরজা খুলে দিল। একজন মেয়েযোদ্ধা ঘরে প্রবেশ করে নতজানু হলো।

মেয়েযোদ্ধাটি বলল, জুলিরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কবতে আসছে। তাবা একজন দূত পাঠিয়ে তাদের পান্নার তালটাকে ফেবৎ চাইছে। তারা সংখ্যায় অনেক। আমবা তাই মাফকার শক্তির শরণাপন্ন হয়েছি। আমরা চাইছি মাফকার শক্তি দিয়ে তাদের দুর্বল করে দিতে। তখন আমরা তাদের যুদ্ধে পরাজিত করে সহজেই তাড়িয়ে দিতে পারব।

গনফালা বলল, তাদের এখন কোন শক্তি নেই,

কারণ উবা এখন মৃত। আমাদেব যোদ্ধাদেব বল, আমি রাণী গনফালা তাদের হুকুম দিচ্ছি তাবা যেন জুলিদের মেবে তাড়িয়ে দেয় আমাদেব নগব থেকে।

জুলিরা আমাদের নগবদ্বাবে ঢুকে পড়েছে। আমাদের যোদ্ধাবা ভয়ে পেয়ে গেছে। মাফকার শক্তি ছাড়া তাবা দুর্বল বোধ করছে। কিন্তু মাফকা কোথায়? আমাদের ডাকে সে সাড়া দিচ্ছে না কেন?

গনফালা মেঝের উপর পা ঠুঁকে বলল, আমি যা বলছি তাই করো। আমাব সামনে প্রশ্ন করার কোন অধিকার নেই তোমাব। যাও, নগর বক্ষা করো। আমি রাণী হিসাবে তোমাদেব শক্তি যোগাব। তোমরা জুলিদেব পবাজিত করবে।

মেয়েযোদ্ধাটি তখন ক্রুদ্ধভাবে বলল, মাফকাকে একবার দেখতে দাও আমাদের।

গনফালা বলল, ঠিক আছে। আগে আমার হুকুম তামিল কবো। তাবপর জুলিদের বন্দী কবে নিয়ে দরবার ঘরে এস। তখন মাফকাকে দেখতে পাবে।

মেয়েযোদ্ধাটি চলে গেলে যে ঘরে টারজনরা অপেক্ষা কবছিল গলনালা সে ঘরের দরজা খুলে দিল। টারজন বেরিয়ে এসে বলল, আমি সব শুনেছি। তোমার এখন পরিকল্পনা কি?

আমি কিছু সময় চাই।

এরপর তাহলে মাফকাকে দরবার ঘরে হাজির করাতে চাও?

না, কাবণ মাফকাকে বাঁধা অবস্থায় দেখলে ওরা আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। আবার মাফকাকে ছেড়ে দিলেও সে আমাদের হত্যা করবে।

তাহলেও এটা একটা ভাল মতলব। আমরা এটাই করব।

টাবজনের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

গনফালা বলল, তুমি কি পাগল হয়েছ?

হয়ত তাই। আমবা যদি এখন এখান থেকে চলে যাই তাহলে আমরা কাজীদেব সঙ্গে যুদ্ধ না কবে যেতে পাবব না। মেয়েদেব সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না আমি। আমার মনে হয় উপায় একটা আছে। আচ্ছা তুমি জান আসল গনফালটা কোথায় আছে?

হ্যাঁ জানি।

এই বলে গনফালা মাফকাব ঘরে গিয়ে একটি দবজা খুলল। সেই দরজা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আবাব একটা ছোট দরজা পেল। সেই দবজা খুলে বেরিয়েই তারা দরবার ঘরে মঞ্চেব পিছনে এসে পড়ল।

দরবার ঘব তখন শূন্য। মেয়েযোদ্ধাবা তখনো ফিবে আসেনি। টাবজনের নির্দেশ অনুসারে উড সিংহাসনেব পাশে একটি উঁচু জায়গায় আসল গনফালটা রাখল। স্ট্রোল আর স্পাইক হাতপা ও চোখমুখ বাঁধা অবস্থায় মাফকাকে তাব চেয়াবে বসিয়ে দিল। গনফালা পাশেব একটি চেয়াবে বসল।

টাবজন গলফান বা হীরের তালটায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অন্যরা চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। ভন আইক পান্নার তালটা চামড়া দিয়ে ঢেকে রাখল।

এমন সময় ঘরের বাইরে বারান্দায় পদশব্দ শোনা গেল। ঘরের দরজা খুলে দেওয়া হলো। কাজী যোদ্ধাদের নেত্রীরা ঘরে ঢুকল। মাফকা আর রাণীর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তারা সবাই মাথা নত করল।

কিন্তু মাফকার অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। একজন ক্রুদ্ধভাবে গনফালাকে প্রশ্ন করল, এ সবের অর্থ কি গনফালা!

কয়েকজন অপরিচিত বিদেশীকে মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আরো আশ্চর্য হয়ে গেল তারা।

তাদের প্রশ্নের উত্তর দিল টারজন। বলল, এর অর্থ হচ্ছে এই যে মাফকার আর কোন শক্তি নেই। সে তোমাদের সকলের জীবনকে তার হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছিল। সে তার নিজের স্বার্থের জন্য তোমাদের দিয়ে যুদ্ধ করিয়ে নিয়ে যুদ্ধের সব ফল সে একা ভোগ করেছে। তোমাদের সে বন্দী করে রেখেছিল। তোমরা তাকে ভয় করতে, ঘৃণা করতে। কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারতে না।

মেয়েযোদ্ধাটি তখন বলল, মাফকা আমাদের শক্তি যোগ্যতা। তার শক্তি চলে গেলে আমরা শক্তিহীন হয়ে পড়ব।

টারজন বলল, সে শক্তি যায়নি। শুধু সে শক্তি এখন মাফকার হাতে নেই।

মেয়েযোদ্ধাদের একজন বলল, ওদের মেরে ফেল। মেরে ফেল।

তখন সবাই এই কথা বলে চীৎকার করতে লাগল। তারা এইভাবে চীৎকার করতে করতে মঞ্চের দিকে এগোতে লাগল।

টারজন তখন গলফানের উপর একটি হাত রেখে বলল, থাম, তোমরা রাণীর সামনে নতজানু হও।

কথাটা শুনতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধারা সবাই নতজানু হলো।

টারজন বলল, এবার উঠে দাঁড়াও। যাও, নগরদ্বারে যাও। বন্দীদের নিয়ে এস। তারা আসবে। যুদ্ধ বন্ধ হবে না।

যোদ্ধারা সকলে দরবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে টারজন তার দলের লোকদের বলল, আমাদের পরিকল্পনা ঠিকমত কাজ করেছে। আমি জানতাম এতে কাজ হবে। মাফকার যা কিছু অলৌকিক শক্তি ছিল তা এই গলফানের মধ্যেই আছে নিহিত। পান্নার তালটাতেও এই একই শক্তি আছে। তবে বাজে লোকের হাতে পড়লে এর ফল খারাপ হবে। এ শক্তিকে ভাল কাজে নিয়োজিত করতে হবে।

গনফালা সব কিছু মন দিয়ে শুনছিল। এমন সময় বারান্দায় আবার পদশব্দ শোনা গেল। গনফালা বলল, ওরা আসছে।

পঞ্চাশজন মেয়েযোদ্ধা ঘরে ঢুকল। তাদের মধ্যে অর্ধেক ছিল কাজী আর অর্ধেক জুলি। অনেকের গা থেকে তখন রক্ত ঝরছিল। তাদের দেহে অনেক ক্ষত ছিল।

টারজন তাদের বলল, এখন তোমরা মুক্ত। উরা আর মাফকা দুজনেরই শাসন থেকে মুক্ত তোমরা। উরা মৃত। আর মাফকাকে আমি

তোমাদের হাতে তুলে দেব। তোমাদের যা খুশি করবে। গনফালটা সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে তার সব শক্তি চলে গেছে। আমরা এ দেশ থেকে চলে যাচ্ছি। রাণী গনফালাও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। যে সব বন্দী ও ক্রীতদাসরা আমাদের সঙ্গে যেতে চায় তারা যেতে পারে। আমরা নিরাপদে এ দেশের সীমানা ছেড়ে চলে গেলে গনফালটা আমি তোমাদের হাতে দিয়ে দেব। এখন সকাল হয়ে গেছে। আমরা যাচ্ছি। এই নাও মাফকাকে।

এই বলে টারজন মাফকাকে দুহাত দিয়ে তুলে মেয়েযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিল।

মেয়েযোদ্ধারা সব স্তব্ধ হয়ে রইল। টারজন তার দলের লোকদের নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার হাতে ছিল চামড়া ঢাকা গনফাল। ভন আইকের হাতে ছিল জুলিদের পান্নার তালটা।

নগরের রাজপথে এলে তারা দেখল একদল নিগ্রো ক্রীতদাস ও শ্বেতাঙ্গ বন্দী দাঁড়িয়ে ছিল পথের ধারে।

টারজন তাদের বলল, আমরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তোমরা ইচ্ছা করলে আমাদের সঙ্গে যেতে পার।

বন্দীরা ভয়ে ভয়ে বলল, মাফকা আমাদের খুন করবে।

টারজন বলল, মাফকা আর কাউকে খুন করতে পারবে না।

নিরাপদে তারা কাজীদের দেশের সীমানাটা পার হয়ে গেল। গনফাল হাতে টারজন তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। বন্দী ও ক্রীতদাসদের মন থেকে ভয় কাটেনি তখনো।

অবশেষে নিউবারি নদীর উপত্যকায় এসে পড়ল।

টারজন তখন সবাইকে বলল, আমি এবার চলে যাব। তোমরা যাবে দক্ষিণে আর আমি যাব উত্তরে।

এই বলে সে তার হাত থেকে হীরের তালটা ভন আইকের হাতে দিয়ে বলল, এটা আজ রাতের মত রেখে দাও। কাল সকালে আমাদের সঙ্গে যে তিন-জন কাজীদের মেয়েযোদ্ধা এসেছে তাদের একজনকে এটা দেবে।

এরপর সে মেয়েযোদ্ধাদের বলল, আমি তোমাদের হাতে এটা তুলে দেব বলেছিলাম। এটা তোমরা ভাল কাজে ব্যবহার করবে। কোন অন্যায় করবে না।

এবার উডকে বলল, উড, গনফালার পক্ষ থেকে এই পান্নার তালটা নাও। আশা করি এর দ্বারা সুখী হবে সে।

স্পাইক বলল, তাহলে আমরা কি পাব?

টারজন বলল, শুধু মুক্তি নিয়ে চলে যাবে তোমরা। দিনকতক আগে এই মুক্তির কথাও ভাবতে পারতে না তোমরা।

স্পাইক বলল, এত বড় হীরের তালটা ঐ সব নিগ্রো মেয়েদের দিয়ে দিলে? আমরা তার একটা অংশও পাব না। এটা কিন্তু ঠিক নয়। এটা তুমি করতে পার না।
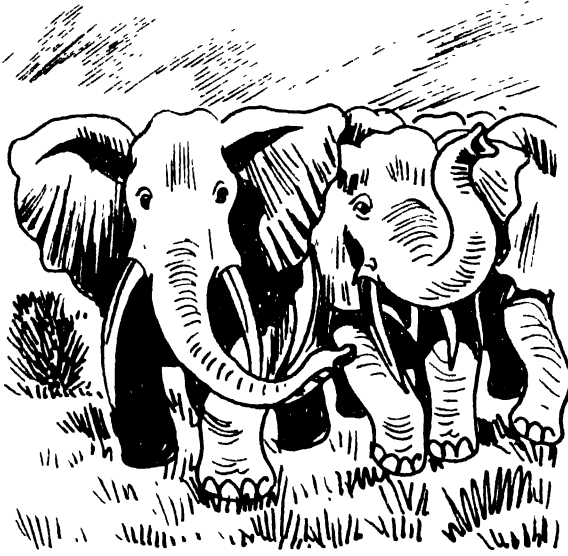
টারজন বলল, আমি তা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছি।

স্পাইক তখন তার সঙ্গীদের বলল, এর জন্য তোমরা সবাই রুখে দাঁড়াবে না? ঐ দুটো ধাতু আমরা লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে সব টাকা সমানভাবে ভাগ করে নেব।

ভন আইক বলল, আমি আমার জীবন নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি—এতেই আমি খুশি। গনফালার একটা ধাতুতে অধিকার আছে। অন্য ধাতুটা জুলি আর কাজীরা ভাগ করে নেবে। তাই নিয়ে তারা বাইরের জগতে চলে যাবে। তারপর যা হয় হবে।

কয়েকজন বন্দী শ্বেতাঙ্গ সমর্থন করল স্ট্রোলকে। অন্য শ্বেতাঙ্গরা বলল, আমরা মুক্তি পেয়েছি এটাই যথেষ্ট।

টারজন তাকে বলল, তুমি পাবে না। আমি যা বলার সব বলে দিয়েছি। আমি এখন উত্তর দিকে যাচ্ছি। কিন্তু তোমরা এ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই আবার আমি ফিরে আসব দক্ষিণ দিকে। আমি এসে দেখব তোমরা কেউ কোন অন্যায় কাজ করেছ কিনা।

এই বলে চলে গেল টারজন। রাত্রির অন্ধকার তখন ঘন হয়ে উঠেছে। একশোজন পলাতকের সেই দলটি তখন শিবির স্থাপন করে রান্না খাওয়ায় মন দিল। যে সব নিগ্রো ক্রীতদাস হয়ে ছিল কাজীদের দেশে তারা এখন কুলির কাজ করতে লাগল আর শ্বেতাঙ্গদের ভৃত্য হিসাবে ফাই-ফরমাশ খাটতে লাগল।

উড আর ভন আইক টারজনের সহকারী ছিল। টারজনের অনুপস্থিতিতে তারা এখন দলের নেতৃত্ব করতে লাগল। টারজন তাদের বলে গেছে দক্ষিণ দিকে মাইল তিনেক গেলেই আদিবাসীদের একটা গাঁ পাবে। তারপর এ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যাওয়া সহজ হবে তাদের পক্ষে।

গনফালা বলল, সে যতক্ষণ আমাদের মাঝে ছিল বড় নিরাপদ বোধ করতাম। ও যে আফ্রিকার একটা অংশ। এখানকার সব কিছুই ওর জানা।

রাত্রিটা ছিল মখমলের মত নরম। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল শিবিরের উপর। নিগ্রোরা কিছু তীর ধনুক তৈরী করল।

শ্বেতাঙ্গরা এক একটা ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গল্প করতে লাগল। উড গনফালা আর ভন আইক কাজীদের দেশ থেকে আনা একটা চামড়ার উপর শুয়ে ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করতে লাগল। গনফালা যাবে লণ্ডনে। অন্যান্য শ্বেতাঙ্গরা আমেরিকায় তাদের বাড়ির কথা ভাবতে লাগল। তাদের বাড়ির লোকেরা তাদের মৃত ভেবে তাদের আশা ত্যাগ করেছে।

কিছুক্ষণ কথা বলার পর গনফালা তার ছোট আস্তানাটায় শুতে চলে গেল। উডও শুয়ে পড়ল। গনফালার কিন্তু ঘুম এল না চোখে।

কিছুক্ষণের মধ্যে শিবির থেকে নিঃশব্দে বনচ্ছায়ার মধ্যে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল। শিবিরের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। চাঁদ তখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

গাছের ছায়ার মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছিল গনফালা ধীর পায়ে।

সহসা এক জায়গায় কাদের কথাবলার চাপা শব্দ শুনতে পেল।

গনফালা স্পষ্ট শুনতে পেল আড়াল থেকে কে একজন বলছে, হীরে আর পান্না দুটোই হাতছাড়া হয়ে গেল আমাদের। তার দাম কত জান স্টোল? আমরা কিছুই পেলাম না।

স্টোল বলল, পান্নার তালটাকে ও নিগ্রো মেয়েটাকে দিয়ে দিল জোর করে। ওটা কিন্তু দেখো, উড নামে ঐ আমেরিকানটা ভালবাসার নাম করে ভুলিয়ে নেবে ওর কাছ থেকে, ও কখনো নিগ্রো মেয়েটাকে বিয়ে করবে না।

কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আর দাঁড়াল না গনফালা। ছায়াঘেরা নৈশ বনপথের মধ্যে ছুটতে লাগল সে। কোথায় যাবে সে তা জানে না।

পরদিন সকালে উড ঘুম থেকে উঠেই কামুদিকে ডাকল। বলল, সবাইকে ডাক। আজ আমরা তাড়াতাড়ি রওনা হব।

ভন আইক চারদিকে তাকিয়ে কিসের খোঁজ করতে লাগল। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল।

ভন আইক বলল, গনফাল নেই। গতরাতেও এইখানে ছিল একটা চামড়ায় মোড়া।

উড তার বিছানাটা ভাল করে খুঁজে দেখল, তারপর হতাশ হয়ে বলল, পান্নার তালটাও নেই। কে এ কাজ করল?

এরপর তারা দুজনে শিবিরের অন্য জায়গায় গিয়ে মেয়েযোদ্ধারা যেখানে শুয়ে ছিল সেখানে গিয়ে খোঁজ করল।

টারজন সেটা রাত্রির মত ভন আইককে রাখতে

এরপর দেখা গেল স্পাইক আর স্টোল শিবিরে নেই।

এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল ওরা।

উড বলল, এরকম কিছু একটা ঘটবে তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। ওরাই সেটা নিয়ে পালিয়েছে।

উড তখন গনফালার তাঁবুতে গেল। গনফালার নাম ধরে অনেক ডাকাডাকি করল। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পেল না। তারপর ও নিজে ঢুকল তাঁবুতে। কিন্তু হতাশ হয়ে বেরিয়ে এল পরমুহূর্তে। মুখখানা সাদা হয়ে উঠল ওর। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ওরা ওকেও নিয়ে পালিয়ে গেছে।

ভন আইক বলল, কিন্তু তা কি করে সম্ভব? গনফালা ত তাহলে চীৎকার করত। তাহলে শিবিরের সবাই জেগে উঠত। ওকে ত ওরা জোর করে নিয়ে যেতে পারবে না।

উড পাগলের মত বলল, তাকে আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। তাড়াতাড়ি করতে হবে।

ওরা যে পথে পালিয়ে গেছে নিগ্রোভৃত্যরা সেই পথই ধরল। পথটা চলে গেছে দক্ষিণ দিকেই।

এরপর দুসপ্তা কেটে গেল। টারজন তার কাজ সেরে উত্তর দিক থেকে ফিরতে লাগল

সেদিন বিকালের দিকে টারজন বনের মধ্যে শিকারীদের পায়ে চলা একটা পথ পেল। হালকা মৃদুমন্দ বাতাসে তার মাথার কালো লম্বা চুলগুলো দুলছিল। সহসা সামনের দিক থেকে একটা সিংহের গন্ধ এসে লাগল তার নাকে। গন্ধ থেকে টারজন বুঝল সিংহটা বুড়ো।

এর পরেই টারজন আর একটা গন্ধ পেল। সে গন্ধ হলো এক শ্বেতাঙ্গ মহিলার।

গাছের উপর দিয়ে সেই দিকে এগিয়ে যেতে লাগল টারজন। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখল আলুথালু বেশে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে একটি শ্বেতাঙ্গ মেয়ে বনপথে কোনরকমে পা টেনে টেনে চলেছে। তার পরনের পোশাক ময়লা এবং ছেঁড়া। ক্রমাগত অনাহার, অনিদ্রা আর পথকষ্টে তার ইন্দ্রিয়চেতনাগুলো ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। কোন কিছু সে যেন শুনতে পাচ্ছিল না।

সহসা পিছন ফিরে একটা সিংহকে দেখে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

গনফালা থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে সিংহটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর মাটিতে পেটটা ঠেকিয়ে শুয়ে ঝাঁপ দেবার জন্য গর্জন করে উঠল ভয়ঙ্করভাবে। এমন সময় গনফালা তার বিস্ফারিত চোখ দিয়ে দেখল একটা গাছের ডাল থেকে একজন নগ্নপ্রায় লোক সিংহটার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সিংহটার মত এক ভয়ঙ্কর গর্জন করে উঠল। সে দেখল একটা ধারাল চকচকে ছুরি বারবার ওঠানামা করতে লাগল। তারপর শেষবারের মত একবার গর্জন করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সিংহটা।

লোকটি এবার খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াতে গনফালা চিনতে পারল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

গনফালা তখন যা যা হয়েছিল সব বলল। বলল, এই সব শুনে আমি বুঝলাম আমি থাকলে বিপদ নেমে আসবে উডের জীবনে। তাই আমি শিবির ছেড়ে একা পালিয়ে এসেছি। ওরা দক্ষিণ দিকে যাবে বলেই আমি এসেছি উত্তর দিকে।

গনফালা সব শেষে বলল, সে এখন কাজীদের দেশেই ফিরে যেতে চায়। কারণ সে তাদেরই শুধু চেনে।

টারজন বলল, সেখানে যাবে না তুমি। এখন মাফকা নেই। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।

টারজন বলল, এখন তুমি আমার সঙ্গে এস। পরে যা হোক একটা ব্যবস্থা হবে। উডের সঙ্গে অবশ্যই দেখা হবে।

কয়েক সপ্তা ধরে পথ চলার পর টারজন তার আফ্রিকার বাংলোতে তার স্ত্রীর কাছে নিয়ে গেল গনফালাকে। তার স্ত্রী গনফালাকে যথেষ্ট আদর যত্নের সঙ্গে রেখে দিল বাড়িতে।

এদিকে উড ও ভন আইকের অনেক খোঁজ করল। কিন্তু তাদের বা তাদের দলের কোন সন্ধান

পেল না। এরই মধ্যে কোথায় কতদূরে গেল তারা তা বুঝতে পারল না টারজন।

দুজন শ্বেতাঙ্গ অন্ধকার বনপথ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা পথ হারিয়ে ফেলেছিল।

উড একবার থেমে মাথার ঘাম মুছল। তারপর ভন আইককে বলল, আমরা যদি পূবদিকে আরও এগিয়ে যাই তাহলে কোন গাঁ পাব। তাহলে আমরা কাউকে পথপ্রদর্শক হিসাবে নিতে পারব।

এক ঘণ্টার মধ্যেই তারা একটা বড় বাংলোবাড়ির সামনে গিয়ে পৌঁছল। ভিতরে মুভিরো খবর পাঠাতেই টারজন বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

টারজনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে গেল উড আর আইক। দুজনেই একবাক্যে বলে উঠল, ক্লেটন!

টারজন বলল, তোমাদের অনেক খোঁজ করেও কোন খবর পাইনি। ওখানে কি করছিলে? যাই হোক, তোমাদের দেখে খুব আনন্দ পেলাম। কোথায় ছিলে এতদিন?

উড বলল, যে রাতে তুমি চলে আস সেই রাতেই স্পাইক আর স্ট্রোল গলফান আর পান্না দুটো ধাতুই চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়। গনফালাকেও ধরে নিয়ে যায়। আমরা তাদের খোঁজ করে বেড়াচ্ছি।

টারজন বলল, হীরে আর পান্না দুটোই চুরি গেছে? একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। ওগুলো সুখের থেকে দুঃখই নিয়ে আসত তোমাদের জীবনে।

উড বলল, ওসব পাথর চুলোয় যাক। আমি শুধু গনফালাকে চাই।

টারজন বলল, আমার মনে হয় খুব শীঘ্রই তাকে পাওয়া যাবে। এখন চল তোমাদের থাকার ঘর দেখিয়ে দিই। তোমরা স্নান করে নতুন পোশাক পাবে। তারপর বাগানে চলে যাবে। সেখানে আমরা থাকব।

ভনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠল গনফালা। বব তুমি! সে কোথায়?

গনফালা তুমি! উড এখানে আছে। তুমি স্পাইক আর স্ট্রোলের হাত থেকে মুক্তি পেলে কি করে?

স্পাইক আর স্ট্রোলের সঙ্গে আমি কখনো ছিলাম না। আমি ত একাই চলে আসি।

এরপর সে রাতের ঘটনাটা সব বলল গনফালা। গনফালা বলল আমি তখন দেখলাম আমার জন্য স্ট্যানলির জীবন বিপন্ন হতে পারে। সে শুধু পান্না ধাতুটার জন্য আমাকে চায় এটা আমি ভাবতেই পারিনি।

ভন আইক বলল, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি এ বিষয়ে কথা বলেছিলাম তার সঙ্গে। সে আমাকে বলেছে দরকার হলে তোমাকে নিয়ে নরকে যাবে, তোমার তুলনায় পান্না তুচ্ছ তার কাছে।

গনফালার চোখে জল এল। বলল, তার সঙ্গে এখন দেখা হবে?

এমন সময় উড বাগানে এসেই গনফালাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে ভাবতেই পারেনি যে গনফালাকে কত কষ্ট করে খুঁজে আসছে এতদিন সেই গনফালাকে এখানে দেখতে পেয়ে যাবে।

সন্ধ্যাবেলায় তারা সকলে মিলে ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করতে লাগল।

উড বলল, আমরা এখন আমেরিকায় চলে যেতে চাই। সেখানেই আমাদের বিয়ে হবে।

কিন্তু গনফালা বলল, আমাকে তার আগে একবার লণ্ডনে যেতে হবে। ঔপনিবেশিক দপ্তর থেকে আমি একখানি চিঠি পেয়েছি।

গনফালা উঠে গিয়ে তার ঘর থেকে একখানা চিঠি বার করে এনে টারজনকে পড়তে দিল।

'এই চিঠিখানি আমি লিখছি আমার মেয়ের উদ্দেশ্যে। সে যদি ভাগ্যক্রমে কাজীদের দেশ থেকে কখনো মুক্তি পায় তাহলে সে যেন লণ্ডনে গিয়ে পরিচয় দান করে। কাজীদের দেশেই তার জন্ম হয় এবং তার জন্মের পরেই কাজীরা তার মাকে হত্যা করে। পরে তাকে তারা তাদের রাণী করে এবং তাকে গনফালা নামে অভিহিত করে। মাফকা নিষেধ করায় আমি তাকে বলতে পারিনি সে আমার মেয়ে। কারণ মাফকা তাকে তার মেয়ে বলেই প্রচার করত।
—মাউন্টফোর্ড।'

বনের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে উড একসময় গনফালাকে বলল, খুব ক্লান্তি বোধ হচ্ছে ?

গনফালা বলল, মোটেই না।

ভন আইক বলল, কষ্ট হবে বৈকি ! তুমি ত শুধু ওখানে সারাদিন সিংহাসনে বসে থাকতে।

গনফালা বলল, কিন্তু মাঝে মাঝে কাজীদের সঙ্গে শিকার করতাম আমি, তাই আমার সঙ্গে ছুটে পারবে না তোমরা।

গনফালা, উড আর ভন আইক পথ চলছিল বনের ভিতর দিয়ে। ওরা টারজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলেছে সভ্য জগতের দিকে। টারজন ওদের জন্য এক ভাল ও নির্ভরযোগ্য সফরী আনিয়ে দিয়েছে।

সারাদিন পথ চলার পর ওরা এক জায়গায় শিবির গড়ে তুলল। রাত্রিতে শিবিরের ধারে আগুন জ্বালিয়ে পাহারার ব্যবস্থা হলো।

এদিকে এই শিবিরের উত্তর দিকে এক মাইল দূরে স্পাইক আর স্ট্রোল আগুন দেখতে পেল।

ওটা কাদের শিবির, কারা ও আগুন জ্বেলেছে তা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল দুজনে। ও আগুন আদিবাসীরা জ্বালাতে পারে আবার শ্বেতাঙ্গ শিকারীদলও হতে পারে। আবার ক্রেটনও হতে পারে।

রাত্রিকালে এই বনাঞ্চলে সিংহের দারুণ ভয়। তবু ওরা আগুনটাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে লাগল। তারা তখন সংখ্যায় মাত্র চারজন।

আগুনের কাছে গিয়ে শিবিরটাকে ভাল করে দেখল।

হঠাৎ গনফালাকে দেখতে পেয়ে স্পাইক চুপি চুপি স্ট্রোলকে শিবিরের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, ঐ দেখ কে।

স্ট্রোলও দেখতে পেয়ে বলল, গনফালা।

তার সঙ্গে আছে উড আর ভন আইক।

স্ট্রোল বলল, আমরা শুধু গনফালাকে চাই। ওরা চুলোয় যাক।

কিন্তু গনফালাকে নিয়ে কি করব আমরা? কি কাজ হবে আমাদের?

তুমি একটা আস্ত বোকা। গনফালা কাছে থাকলে আমাদের হীরেটা কাজ করবে। যেমন করত মাফকার হাতে।

শিবিরের মধ্যে তখন উড, ভন আইক আর গনফালা কথা বলছিল। তাদের কথাবার্তার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা স্ট্রোল আর স্পাইক।

পরদিন ওরা কি করবে তার একটা কর্মসূচী তৈরী করছিল ভন আইক।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পরই শিকারে বেরিয়ে পড়ল ওরা তিনজন। ভন আইক গেল পূবদিকে, উড গেল দক্ষিণে আর গনফালা গেল উত্তর দিকে। প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল বন্দুকহাতে একজন করে সহকারী।

উডদের শিবিরের উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি ছোট পাহাড়ের উপর থেকে স্ট্রোল আর স্পাইক উডদের এই শিকার-অভিযান লক্ষ্য করতে লাগল। গনফালা তার বন্দুকধারী সহকারীকে নিয়ে কোন্ দিকে গেল তা বিশেষ করে নজর রাখতে লাগল তারা।

গনফালাকে একা ভিন্ন এক দিকে শিকারে যেতে দিতে কিছুতেই মন চাইছিল না উডের। কিন্তু গনফালা না ছাড়ায় বাধ্য হয়েছে তাকে যেতে দিতে।

কিন্তু গনফালা তখন ঘূণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি একটা পাহাড়ের উপর থেকে স্ট্রোল আর স্পাইক তাকে লক্ষ্য করছে।

এমন সময় দুটো রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনে গনফালা তার বন্দুকবাহককে বলল, ওরা কেউ শিকার পেয়েছে। আমরা হয়ত ভুলপথে এসেছি।

বন্দুকবহনকারী বলল, না মেমসাহেব, ঐ দেখুন। এই বলে একদিকে হাত বাড়িয়ে গনফালাকে দেখাল। গনফালা সেদিকে তাকিয়ে একটা গাছের তলায় বড় খাদের মাঝে একটা সিংহকে দেখতে পেল।

গনফালা হাঁটু গেড়ে বসে তার বন্দুক থেকে গুলি করল। গুলিটা সিংহটার পায়ে লাগল, কিন্তু সে থামল না। সিংহটা মাটিতে পড়ে গিয়ে একবার গড়াগড়ি দিয়ে আবার উঠে ভয়ঙ্করভাবে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল তাদের দিকে। গনফালা আবার গুলি করল। কিন্তু গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। তখন তার বন্দুকবাহক একটা গুলি করল। কিন্তু সে গুলিটাও লাগল না। সে তখন ছুটে পালাতে লাগল।

সিংহটা তখন গনফালাকে ছেড়ে পলাতক বন্দুক-বাহকের দিকে ছুটতে লাগল। গনফালা আবার গুলি করল। গুলিটা এবার সিংহের গায়ে লাগল।

কিন্তু সিংহটা পলাতক বন্দুকবাহককে ধরে ফেলল। তাকে ধরেই তার মাথায় একটা কামড় বসিয়ে দিল।

গনফালার বন্দুকবাহক লোকটা মারা যেতেই স্ট্রোল স্পাইককে বলল, ভালই হলো, আমরা মেয়েটা আর সেই সঙ্গে দুটো বন্দুক পেয়ে যাব।

স্ট্রোল আর স্পাইক এবার গনফালার দিকে এগিয়ে গেল।

তারা গনফালার কাছে এসে অন্তরঙ্গতার হাসি হেসে বলল, তুমি অল্পের জন্য বেঁচে গেছ।

গনফালা তাদের জিজ্ঞাসা করল, এখানে কি করছিলে তোমরা?

স্পাইক বলল, আমরা কোন একটা রেল-স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলাম। তারপর পথ হারিয়ে ফেলি।

স্ট্রোল এবার মৃত বন্দুকবাহকের রাইফেল আর গুলিগুলো নিয়ে নিল। স্পাইক তখন গনফালার ভাল বন্দুকটাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

গনফালা বলল, তোমরা আমাদের শিবিরে চলে আসতে পার। আমরাও রেলস্টেশনের দিকেই যাব।

সে কথার উত্তর না দিয়ে স্পাইক তাকে বলল, তোমার বন্দুকটা ত চমৎকার। একবার দেখি।

গনফালা কোন সন্দেহ না করেই বন্দুকটা তুলে দিল তার হাতে।

গনফালা বলল, তোমাদের লোকরা আমার মৃত লোকটাকে আমাদের শিবিরে বয়ে নিয়ে যাক।

স্পাইক বলল, আমরা তোমাদের শিবিরে যাব না।

তুমি আর তোমাদের শিবিরে ফিরে যাবে না।

কি বলতে চাও তোমরা?

তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে।

না, আমি যাব না।

স্পাইক বলল, দেখ গনফালা, আমরা তোমার সঙ্গে কোন ঝামেলা করতে চাই না। তোমাকে কোনরকম আঘাত করতেও চাই না। সুতরাং আশা করি তুমি শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের সঙ্গে আসবে। তোমাকে আমাদের প্রয়োজন আছে।

কিন্তু কেন? কি প্রয়োজন?

তুমি ছাড়া হীরেটা কোন কাজ করছে না।

কাজ করছে না মানে?

আমরাও মাফকার মত এখানে একটা রাজ্য গড়ে তুলতে চাই এই ধাতুটার সাহায্যে। ওর একটা অলৌকিক শক্তি আছে। আমরা সেই শক্তির সাহায্যে সে রাজ্যের রাজা হব আর তুমি হবে তার রাণী।

স্ট্রোল তাকে থামিয়ে বলল, না তুমি তা পার না। ওর উপর আমারও অধিকার আছে। ও আমার।

গনফালা বলল, না, আমি তোমাদের কারোরই হব না। তোমরা বোকা। তোমরা আমাকে জোর করে নিয়ে গেলে তোমাদের খুঁজে বার করে হত্যা করা হবে। যদি তোমাদের মাথায় সুবুদ্ধি থাকে ত আমাকে ছেড়ে দেবে।

স্পাইক বলল, না, তোমাকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে।

ভন আইক পর পর দুটো গুলি করে একটা সিংহকে মেরে ফেলে। উডের ভাগ্যে কোন শিকার জোটেনি। সে তখন গনফালার নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল।

দুঘণ্টা ধরে তারা গনফালার খোঁজ করে বেড়াল। তার নাম ধরে ডাকল। কিন্তু তাকে দেখতে পেল না বা তার কোন সাড়া পেল না। তারপর খুঁজতে খুঁজতে গনফালার সঙ্গে সিংহটার যেখানে লড়াই হয় সেখানে এসে পড়ল তারা। দেখল বন্দুকবাহকটার মৃতদেহের উপর একটা সিংহ মরে পড়ে আছে। কিন্তু গনফালা সেখানে নেই। মৃত লোকটার বন্দুকও নেই।

শিবিরে গিয়ে দেখল গনফালা সেখানেও নেই।

তখন বিকাল হয়ে গেছে। তবু উড বলল, এখনি তার খোঁজে বার হতে হবে। সে তখন শিবিরের সব লোককে তিন দলে ভাগ করে দুটি দল সে নিজে ও ভন আইককে নিয়ে বেরিয়ে গেল। একটি দলকে শিবির রক্ষার কাজে রেখে গেল। বলল, তারা যেন সারারাত একটি বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে রাখে এবং মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ করে। গনফালা যাতে পথ হারিয়ে ফেললে ফিরে আসতে পারে শিবিরে।

কিন্তু উড বা ভন আইক কোন খোঁজ পেল না গনফালার। অবশেষে পরদিন দুপুরবেলায় ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে ফিরে এল শিবিরে।

ভন আইক বলল, গনফালা বেঁচে থাকলে আমাদের বন্দুকের আওয়াজ শুনে ঠিক ফিরে আসত সে।

উড বলল, সে মারা গেছে এটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তার দুটো বন্দুক ছিল। মৃত বন্দুকবাহকের বন্দুক আর সব গুলি সে নিয়েছে।

ভন বলল, কোন আশা থাকলে আমিও থেকে

যেতাম। কিন্তু যেহেতু কোন আশা দেখছি না। চল আমরা বাড়ির পথে রওনা হই। দেশে ফিরে গেলে তুমি সব ভুলে যাবে।

আমি আবার টারজনের কাছে ফিরে যাব। সে আমাকে সাহায্য করতে পারবে এ ব্যাপারে। যদি কেউ তাকে খুঁজে বার করতে পারে ত একমাত্র টারজনই পারবে।

দশদিন ধরে সেই শিবিরে রয়ে গেল উড। সে টারজনের বাড়িতে না গিয়ে একজন লোককে একটা চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিল।

একদিন উড যখন তার শিবিরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে গনফালার কথা ভাবছিল তখন হঠাৎ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল টারজন। টারজনকে দেখেই লাফিয়ে উঠে পড়ল উড। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, টারজন! তুমি মানুষ নও, দেবতা, আমি জানতাম তুমি আসবে।

টারজন বলল, তোমার চিঠি পেয়েই আমি চলে এসেছি।

উড তার ব্যর্থতার কথা সব বলল।

টারজন বলল, আজ আর হবে না। কাল খোঁজ করব।

পরদিন সকালেই উড আর টারজন সেই শিবিরটাতে গেল প্রথমে যেখানে একদিন স্পাইক আর স্ট্রোল ছিল এবং যেখান থেকে তারা গনফালার গতিবিধি লক্ষ্য করে।

আগে উড এ শিবিরটাকে দেখে ভেবেছিল এখানে হয়ত একজন নিগ্রো আদিবাসী থাকত সাময়িকভাবে। কোন শ্বেতাঙ্গ ছিল না।

কিন্তু টারজন শিবিরের উঠোনের ঘাসগুলো পরীক্ষা করে দেখে বলল, এখানে একদল লোক ছিল। তাদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গও ছিল।

তাদের গন্ধসূত্র ধরে উত্তর দিকে উডকে নিয়ে এগিয়ে চলল টারজন। ক্রমে তারা সেই জায়গাটায় গিয়ে পড়ল যেখানে সেই সিংহটা আর গনফালার বন্দুকবাহকটা মরে পড়েছিল।

টারজন বলল, এখান থেকেই একদল লোক ধরে নিয়ে যায় গনফালাকে।

উড বলল, সে আজ প্রায় এগার দিনের কথা।

টারজন বলল, আমি একা যাব। তুমি তোমার শিবিরে ফিরে যাও আজকের মত। কাল সকালে আমার বাড়িতে গিয়ে থাকবে। আমি গিয়ে খোঁজ করতে করতে যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করি তাহলে একজন লোক দিয়ে খবর পাঠাব। তুমি তাহলে আমার ওয়াজিরিদের সঙ্গে নিয়ে আমার সাহায্যে যাবে। এখন আমার সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না।

এই বলে সেখান থেকে চলে গেল টারজন সঙ্গে সঙ্গে।

বিষণ্ণ মনে একা একা তার শিবিরে ফিরে গেল উড।

দুদিন ধরে গন্ধসূত্র ধরে উত্তরদিকে এগিয়ে চলল টারজন। তারপর বাতাঙ্গো নামক এক উপজাতিদের এলাকায় এসে পড়ল। এই বাতাঙ্গোরা বড় যুদ্ধবাজ আর নরখাদক। তারা ওয়াজিরিদের চিরশত্রু।

টারজন ভাবল যারা গনফালাকে ধরে নিয়ে গেছে তারা এদিকে এসে পড়লে বন্দী হতে পারে বাতাঙ্গোদের হাতে। তারা ধরা পড়েছে কিনা সে বিষয়ে বাতাঙ্গোদের সর্দারের গাঁয়ে গিয়ে খোঁজ করতে হবে।

টারজন দেখল তার পূব দিকে কতকগুলো ছোট ছোট পাহাড় উত্তরদিকে বিস্তৃত হয়ে আছে। সে সব পাহাড়গুলোর কাছে গিয়ে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টার উপর উঠে দূরে কতকগুলো গাঁ দেখতে পেল।

টারজন দেখল সব গাঁগুলোর মধ্যে কোন্ গাঁটা সবচেয়ে বড়। সে বুঝল ঐ গাঁটাই তাহলে বাতাঙ্গোদের সর্দারের গাঁ।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। আকাশে চাঁদ ছিল না। দূর থেকে জ্বলন্ত উঠোনের আগুনের আলো দেখতে পাচ্ছিল।

পাহাড় থেকে একটা সিংহও নেমে এগিয়ে যাচ্ছিল সেই সব গাঁগুলোর দিকে।

গাঁগুলোর কাছাকাছি গিয়ে গ্রামবাসীদের ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আকাশের দিকে মুখ করে বুকের ভিতর থেকে পশুসুলভ এক ভীষণ চীৎকার করল টারজন।

সে চীৎকার শুনে ভয় পেয়ে গেল বাতাঙ্গোরা। পুরুষরা অস্ত্র তুলে নিল হাতে। মেয়েরা তাদের শিশুগুলোকে কোলে তুলে নিল।

একজন বাতাঙ্গো বলল, একটা দানব।

বাতাঙ্গোদের সর্দার বলল, এ চীৎকার আমি এর আগে একবার শুনেছিলাম। ওটা হলো ওয়াজিরি-দের শয়তান অপদেবতার চীৎকার। বহুকাল আগে আমরা একবার ওয়াজিরিদের দেশ আক্রমণ করে-ছিলাম।

তার কথায় কান না দিয়ে সকলে আবার এই ধরনের কোন চীৎকার হয় কিনা তা শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল।

টারজন গাঁয়ে গেটের কাছে এসে দেখল তার পাশে একটা বড় গাছ ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। দেখল গাঁয়ের চারদিকে একটা অনুচ্চ পাঁচিল ঘিরে আছে গাঁটাকে।

খাওয়ার পর বাতাঙ্গোদের অনেকেই তাদের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। একদল নাচগান করতে লাগল বাজনা বাজিয়ে। গাঁয়ের কাছে এসে একটা সিংহ গর্জন করছিল মাঝে মাঝে।

টারজন এবার সর্দারের কুঁড়েটাকে দেখতে গেল। দাওয়ায় যে মশালের আলো জ্বলছিল তাতে সে দেখতে পেল একটা টুলের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে সর্দার। তার পায়ের কাছে রয়েছে সেই পান্নার তালটা যা স্ট্রোল আর স্পাইক নিয়ে পালিয়ে আসে।

তা দেখে টারজনের সন্দেহ হলো গনফালা, স্ট্রোল আর স্পাইক এই গাঁয়েই বন্দী হয়ে আছে।

অবশেষে রাত গভীর হতে নাচগান বন্ধ হয়ে

গেল। গাঁয়ের পথঘাট একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়লে গাছ হতে নিঃশব্দে নেমে পড়ল টারজন। ছায়ার মত গাঁয়ের পথ ধরে প্রতিটি কুঁড়ের সামনে থেকে বাতাসে গন্ধ শুঁকে শুঁকে পরীক্ষা করল ঘরগুলো। কিন্তু কোথাও কোন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ বা মহিলার সন্ধান পেল না।

অবশেষে সর্দারের ঘরের দরজার সামনে এসে টারজন দেখল ঘরের দরজার কাছে মেঝের উপর পান্নার তালটা পড়ে আছে। সর্দার তার স্ত্রীদের নিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

টারজন এবার ঘরে ঢুকে সর্দারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার গলাটাকে আলতোভাবে দুহাত দিয়ে ধরল।

সর্দার চমকে জেগে উঠতেই টারজন চুপি চুপি বলল, যদি বাঁচতে চাও ত চেঁচাবে না।

সর্দার নিচু গলায় বলল, কে তুমি? কি চাও?

আমি শয়তান—দেবতা। দুজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আর একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা কোথায়?

আমি কোন শ্বেতাঙ্গ নারী দেখিনি। বেশ কিছু-দিন আগে বনে শিকার করতে গিয়ে বনের দুজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে দেখি। কিন্তু তাদের সঙ্গে কোন নারী ছিল না। একটা সিংহ আমাদের সকলকে আক্রমণ করতেই তারা ছুটে পালিয়ে যায়।

টারজন আবার সর্দারকে বলল, তারা কোন্ দিকে পালিয়েছে ? সঙ্গে লোক ছিল ?

জঙ্গলের পশ্চিম দিকে। তারা ছিল মোট দুজন। দুজন শ্বেতাঙ্গ আর সব আদিবাসী। বন্দুক বা খাবার ছিল না তাদের সঙ্গে।

টারজন বলল, এই পান্নাটা তোমরা চুরি করে এনেছ ?

সর্দার বলল, না, তারা ভয়ে পালিয়ে যাবার সময় এটা ফেলে যায়। তারা সাদা পাথরটা সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

টারজন বলল, আচ্ছা, পরে কি কোন শ্বেতাঙ্গ মহিলা তোমাদের গাঁয়ের পাশ দিয়ে যায় ?

কোন শ্বেতাঙ্গ মহিলা আমাদের গাঁয়ের পাশ দিয়ে যায়নি। গেলে অবশ্যই আমি জানতে পারতাম।

আর কিছু না বলে নিঃশব্দে পান্নার তালটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল টারজন। গেটের কাছে এসে দেখল সিংহটা তখনো ওৎ পেতে বসে আছে। টারজন আর সে রাতে সিংহটাকে না ঘাঁটিয়ে সেই গাছটার উপর শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিল।

এদিকে স্ট্রোল আর স্পাইকের সঙ্গে সমানে উত্তর দিকে হেঁটে চলল গনফালা। বাতাঙ্গোদের গাঁটাকে এড়িয়ে যাবার জন্য অনেকটা ঘুরতে হয় তাদের।

একজন নিগ্রোভৃত্য হীরের তালটাকে বয়ে নিয়ে যেত।

কিছুক্ষণ একটা সফরীর সঙ্গে যাবার সময় স্পাইক পাহাড়ঘেরা একটা উপত্যকা দেখে। ও এখন সেই জায়গাটায় যেতে চাইছিল।

সে একদিন গনফালাকে বলে, জায়গাটা যেন স্বর্গোদ্যান মিস। আমরা সেখানে রাজার হালে থাকব। সেখানকার আদিবাসীরা শান্তিপ্রিয়।

এদিকে বাতাঙ্গোদের গাঁটাকে ফেলে পশ্চিম দিকে গিয়ে বনের প্রান্তে এসে দাঁড়াল টারজন। সেইখানে সে কয়েকটা গাছে ঘেরা ত্রিভুজাকৃতি একটা জায়গায় মাটি খুঁড়ে পান্নার তালটা পুঁতে রেখে মাটি চাপা দিয়ে তার উপর কিছু ঘাস আর গাছের পাতা দিয়ে সেখানকার মাটিটা ঢেকে দিল।

ঝড়েতে গন্ধসূত্রটা হারিয়ে যাওয়ায় পলাতকদের অনুসরণের পথে বাধা পড়ল।

সে ভাবল, ওরা যখন গনফালাকে পেয়েছে তখন তাকে দিয়ে হীরের তালটাকে কাজে লাগাবে। তার অলৌকিক শক্তির দ্বারা অনেক কিছু চাইবে তারা এবং তার জন্য নিশ্চয় ওরা অন্য কোথাও না গিয়ে কাজীদের দেশেই ফিরে যাবে। সেখানে গিয়ে গনফালাকে রাণী করে রাজাসুখ ভোগ করতে চাইবে ওরা। কারণ কাজীরা গনফাল আর গনফালার মর্ম বোঝে।

এই ভেবে টারজনও উত্তর দিক বরাবর স্পাইক-

দের পথের সমান্তরাল একটা পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল।

দুদিন যাওয়ার পর পথে এক জায়গায় হায়েনার অট্টহাসি শুনে সেখানে গিয়ে দেখল একটা বড় গর্তের মধ্যে একটা বড় হাতি পড়ে আর্তনাদ করছে।

এই হাতিটি টারজনের সেই হাতিবন্ধু প্রিয় ট্যান্টর না হলেও তারই সমজাতীয়। টারজন তাই গর্তের একপাশে মাটি খুঁড়ে মুক্ত করল হাতিটাকে। গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে তার শুঁড় দিয়ে টারজনের দেহটাকে সোহাগভরে স্পর্শ করল কিছুক্ষণ ধরে। তারপর আবার উত্তর দিকে রওনা হয়ে পড়ল টারজন।

এদিকে টারজনের বাড়িতে টারজন ফিরে না আসায় অধৈর্য হয়ে পড়ল স্ট্যানলি উড। টারজনের কোন খবর পেল না সে। তাই একদিন ওয়াজিরিদের সর্দার মুভিরোকে উড বলল, আমাকে কিছু লোক দাও, আমি নিজেই গনফালার খোঁজে বার হব।

অবশেষে মুভিরো তাকে দুজন ওয়াজিরি যোদ্ধা দিল। তাই নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়ল উড।

বাতাঙ্গোদের দেশে তারা এসে পড়লে ওয়াজিরিরা সেদিকে না গিয়ে স্ট্রোল ও স্পাইকদের মত অন্য পথে যেতে লাগল।

কয়েকসপ্তা যাবার পর আদিবাসীদের একটা গাঁয়ে এসে তারা বুঝল, ঠিক পথেই এসেছে তারা। আদিবাসীদের সর্দার বলল, ন'জন লোকের এক সফরী এসেছিল তাদের গাঁয়ে। তাতে ছিল দুজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা আর ছ'জন নিগ্রোভৃত্য। সর্দার তাদের সঙ্গে পথপ্রদর্শক দিয়ে উত্তরের দিকে আর এক গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

তা শুনে আশান্বিত হলো উড। বুঝল গনফালা তাহলে বেঁচে আছে এখনো।

সেদিন উত্তরাঞ্চলের এক গাঁয়ে এক আদিবাসী সর্দারের সঙ্গে কথা বলছিল স্ট্রোল আর স্পাইক।
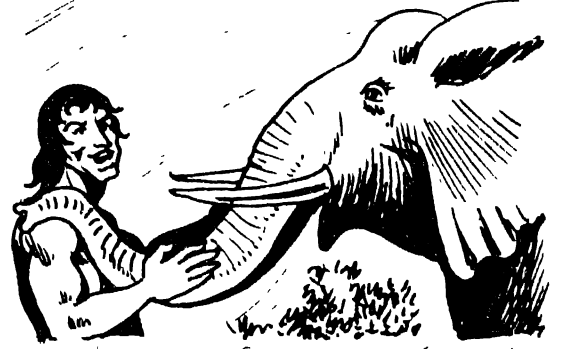
স্পাইক একসময় জিজ্ঞাসা করল সর্দারকে, উত্তর দিকে কি আছে?

সর্দার বলল, শুধু পাহাড় আর পাহাড়।

আমি যে উপত্যকার কথা বলছি সে উপত্যকাটা ঐ পাহাড়গুলো দিয়েই ঘেরা।

সর্দার বলল, আমি আগামী কাল তোমাদের সঙ্গে কিছু পথপ্রদর্শক দেব।

স্পাইক তখন নিশ্চিন্ত হয়ে স্ট্রোল আর গনফালার পাশে বসে কথা বলতে লাগল। সে তার পরিকল্পনাটার কথাটা তুলে বলল, আর দেরী নেই। সেই উপত্যকাটায় একবার গিয়ে পৌঁছলেই আমরা নিরাপদ হয়ে উঠব।

গনফালা বলল, মোটেই না। স্ট্যানলি আর টারজন তোমাদের খুঁজে বার করবেই।

স্পাইক বলল, আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে ওরা যেতেই পারবে না। সে জায়গা কখনো খুঁজে পাবে না।

সর্দার ওদের পথপ্রদর্শক দেবে যেমন আমাদের দিচ্ছে।

সে রাতে ভাল করে খাওয়ার পর তারা শুতে চলে গেল তাড়াতাড়ি। কিন্তু স্ট্রোল ঘুমোল না। ইচ্ছা করে জেগে কান পেতে রইল।

স্ট্রোল শুধু ভাবতে লাগল স্পাইক কখন ঘুমিয়ে পড়বে গভীরভাবে। এই স্পাইকই তার সেই মধুর স্বপ্নপূরণের পথে একমাত্র বাধা!

স্ট্রোল বিছানা থেকে উঠে ঘরের দরজার কাছে এসে দেখল গাঁয়ের সব লোক ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘর থেকে নিঃশব্দে বার হতে গিয়ে একটা রান্নার পাত্রে তার পা লেগে গিয়ে জোর শব্দ হলো। স্পাইকের ঘুমটা সে শব্দে কিছুটা ব্যাহত হলো, কিন্তু ভাঙ্গল না একেবারে। তবে ঘুমটা পাতলা হয়ে গেল তার।

এদিকে গনফালার ঘরের দিকে চুপিসারে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল স্ট্রোল।

গনফালা তখনো ঘুমোয়নি। সে দরজার ওপারে অন্ধকারে তাকিয়ে ছিল শূন্য দৃষ্টিতে। সহসা দরজার কাছে কার চাপা পদশব্দ শুনে চমকে উঠল সে। বুঝতে পারল কে একজন হাতে পায়ে হেঁটে গুড়িমেরে তার ঘরে ঢুকছে।

গনফালা ভয়ে ভয়ে বলল, কে তুমি ? কি চাও ?

স্ট্রোল চাপা গলায় বলল, চুপ করো। কোন গোলমাল করো না।

স্ট্রোল তেমনি চাপা গলায় বলল, আমার কথা শোন। ওই উপত্যকায় যাবে না তুমি। তুমি নিশ্চয় স্পাইকের সঙ্গে সারা জীবনটা কাটাতে চাও না সেখানে। সেখানে গেলেই সে আমাকে খুন করে একা আধিপত্য করবে তোমার উপর। আমি ওকে জানি। তার থেকে আমার সঙ্গে হীরেটা নিয়ে ইউরোপে চল।

আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যেতে চাই না। চলে যাও এখান থেকে। তা না হলে আমি স্পাইককে ডাকব।

গনফালার গলাটা টিপে ধরল স্ট্রোল। গনফালা স্পাইকের নাম ধরে চীৎকার করে উঠল। সে স্ট্রোলের হাতদুটো তার গলা থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। সে ছটফট করতে লাগল।

চীৎকার শুনে জেগে উঠল স্পাইক। সে স্ট্রোলের নাম ধরে ডাকতে লাগল। কিন্তু দেখল স্ট্রোল ঘরের মধ্যে তার বিছানায় নেই।

স্পাইক তখন গনফালার ঘরের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু দরজার কাছেই বাধা দিল স্ট্রোল। সে ঘুষি পাকিয়ে গর্জন করতে লাগল। গনফালা ঘরের এককোণে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওরা দুজনে জড়াজড়ি করে খালিহাতে মারামারি করতে লাগল।

কিন্তু সর্দার তার যোদ্ধাদের পাঠাবার আগেই ওরা নিজেরাই থেমে গেল।

স্পাইক গুঁড়ি মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গনফালা তা দেখে ভাবল স্পাইক নিশ্চয় স্ট্রোলকে খুন করে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। সে তাই ছুটে গিয়ে গাঁয়ের একটা কুঁড়ের মধ্যে আশ্রয় নিল।

দুজনের মধ্যে স্পাইককেই সব সময় বেশী ভয় করত গনফালা। সে-ই বেশী বিপজ্জনক দুজনের মধ্যে। কারণ সে বেশী শক্তিমান এবং দুঃসাহসী। স্ট্রোলের অতটা সাহস বা শক্তি ছিল না তার মত।

কিন্তু আসলে স্ট্রোল মরেনি। পরদিন সকালে গাঁয়ে একটা রাস্তার উপর আহত অবস্থায় পড়ে ছিল স্ট্রোল। তা দেখতে পেয়ে স্পাইক তার কাছে গেল।

স্ট্রোল বলল, কি হয়েছিল, আমার এই অবস্থা হলো কেন ?

স্পাইক বলল, তুমি লরীচাপা পড়েছিলে।

কই, আমি ত কোন লরী দেখিনি।

গনফালা যে ঘরে লুকিয়ে ছিল সে ঘর থেকে ওদের দুজনকে দেখতে পেয়ে বেরিয়ে তাদের দুজনের সামনে এসে হাজির হলো।

তাকে দেখে স্ট্রোল বলল, মেয়েটিকে দেখতে আমার বোনের মত মনে হচ্ছে।

স্পাইক দেখল, স্ট্রোল বেশী আহতও হয়নি। তবে তার মাথাটায় হয়ত কোন গোলমাল হয়েছে।

যাই হোক, সেদিন সকালেই কিছু খাওয়ার পর দুজন পথপ্রদর্শককে সঙ্গে নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল তিনজনে। স্পাইক চলল আগে আগে। স্ট্রোল গনফালার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। এক বিহ্বলতার ভাব ছিল তার চোখে।

গনফালা বলল, চল আমরা ফিরে যাই। কি হবে আর এগিয়ে গিয়ে? তার থেকে আমায় আমার বন্ধুদের কাছে নিয়ে চল। অজানা দেশে গিয়ে তুমি নিজেই যদি নিহত হও তাহলে গলফান নিয়ে কি হবে? কিন্তু আমাকে আমার বন্ধুদের কাছে নিয়ে গেলে আমি তাদের বলে গলফানটা তোমায় দিয়ে দেব এবং তোমাকেও ছেড়ে দেওয়া হবে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আমি উডকে যা বলব সে তাই করবে।

স্পাইক মাথা নেড়ে বলল, না, তোমাকে আমি ছাড়ব না। আমি যেখানে যাবার ঠিক যাব তোমাকে নিয়ে। তাতে যদি গলফানটা আমায় হারাতে হয় ত হবে।

গনফালা বলল, আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিলাম। তুমি বোকা বলে তা গ্রহণ করতে পারলে না।

পথপ্রদর্শকরা চলে গেলে ওরা অজানা পার্বত্য পথে দিনের পর দিন ধরে এগিয়ে চলল। প্রতিদিনই

সকাল হলেই স্পাইক ভাবে আজ সে ঠিক তার স্বপ্নের সেই মায়াময় দেশে পৌঁছে যাবে। প্রতি রাত্রেই সে বলে পরের দিন সে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।

স্ট্রোলের মানসিক অবস্থা সেই একই রকমের রয়ে গেল। সে ভাবতে লাগল গনফালা তার বোন। এই ভেবে গনফালার নিরাপত্তা সম্বন্ধে বেশী তৎপর হয়ে উঠল সে।

স্ট্রোল জানে না সে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে। দিনের পর দিন সে শুধু মূক পশুর মত নীরবে পথ হেঁটে যায়।

এইভাবে বহুদিন ধরে সেই পার্বত্য অঞ্চলে সেই মায়াময় উপত্যকার সন্ধানে এগিয়ে যেতে লাগল স্পাইকরা। অবশেষে একদিন একটা পাহাড়ের উপর একটা ঝর্ণার ধারে বিকালের দিকে শিবির স্থাপন করল ওরা।

তখন বিকাল বেলা। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল পশ্চিম আকাশে। স্পাইক বসেছিল গনফালার পাশে।

স্পাইক বলল, ওটা সূর্য নয়, আগুন। হয়ত ওখানে একটা আগ্নেয়গিরি আছে। মনে হয় আমরা আমাদের সেই আকাঙ্খিত উপত্যকায় এসে গেছি।

গনফালা কোন উত্তর দিল না। এখন আর সে ভয় করল না স্প্যাইককে। কারণ সে জানে স্প্যাইক তার কোন ক্ষতি করতে এলে বা পীড়ন করলে স্ট্রোল খুন করবে স্প্যাইককে।

সেদিন রাতে খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছিল স্প্যাইককে। কিন্তু পরদিন যখন সে শুনল তাদের ছজন নিগ্রোভৃত্য তাদের সফরী ছেড়ে চলে গেছে তখন তার মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। তবে দেখল গলফানটা নিয়ে যায়নি তারা।

এরপর থেকে স্প্যাইক গলফানটা কাছে নিয়ে শুত।

সেদিন দুপুরের দিকে একটা বিস্তীর্ণ উপত্যকা পেল তাদের সামনে।

একজন নিগ্রোভৃত্য হঠাৎ থেমে কানখাড়া করে কি শুনে বলল, একদল মানুষ আসছে বাওয়ানা।

স্প্যাইক গনফালার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি ত কিছু শুনতে পাচ্ছি না, তুমি পাচ্ছ?

গলফালা বলল, হ্যাঁ, আমি মানুষের গলার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

স্প্যাইক বলল, তাহলে পথ থেকে সরে গিয়ে আমরা এক জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারি।

এই বলে সে তাদের সব লোকদের একশো গজ দূরে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেল। তারপর সেখানে থেমে কান পেতে কি শুনতে লাগল। তারা বুঝল আগন্তুকরা সেইদিকেই আসছে।

স্পাইক কোন লুকোবার জায়গা পেল না। তাদের পিছনে যে একটা ঝোপ ছিল তাতে প্রবেশ করা যাবে না, বড় দুর্গম।

পিছন ফিরে তাকিয়ে গনফালা দেখল, আগন্তুক-দের যে দলটা উপত্যকার উপর দিয়ে এগিয়ে আসছিল তাদের সামনে ছিল প্রায় বারোজন কৌপীনপরা নিগ্রো। তাদের পিছনে ছিল ছজন অদ্ভুত পোশাকপরা শ্বেতাঙ্গ। তাদের সেই পোশাকের মধ্যে জাঁকজমক ছিল। তাদের পিছনে কিছুদূরে ছিল আরো বিশজন সশস্ত্র শ্বেতাঙ্গ। তবে তাদের পোশাকে কোন জাঁকজমক ছিল না। তাদের হাতে ছিল বর্শা আর তরবারি। একজন যোদ্ধার হাতে একটা মানুষের রক্তাক্ত কাটা মুণ্ডু ঝোলানো ছিল।

গনফালা বলল, ওরা শ্বেতাঙ্গ। ওরা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে পারে।

স্প্যাইক বলল, আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। গলফান আর তোমার নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি আমি।

এই বলে গনফালা দলের অন্যদের মত পালাবার চেষ্টা না করে থমকে দাঁড়িয়ে রইল। বলল, তোমার থেকে যে কোন লোকই ভাল আমার কাছে।

স্পাইক চীৎকার করে বলল, বোকামি করো না, চলে এস।

এই বলে সে গনফালার একটা হাত ধরে তাকে টানতে লাগল।

গনফালা স্ট্রোলকে বলল, স্ট্রোল, তুমি আমাকে বাঁচাও।

স্টোল তাদের কিছুটা আগে ছিল। গনফালার ডাকে সে পিছন ফিরে দেখল স্পাইক আর গনফালা ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে।

স্টোল তা দেখে রেগে গিয়ে চীৎকার করে স্পাইককে বলল, ছেড়ে দাও ওকে, আমার বোনকে ছেড়ে দাও।

বলতে বলতে স্পাইকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল স্টোল। দুজনে পরস্পরকে কিল, চড়, ঘুষি মারতে লাগল।

প্রথমে কি করবে তা ভেবে পেল না গনফালা। তারপর সে অগ্রসরমান যোদ্ধাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এগিয়ে গেল কিছুটা। আসলে সে স্পাইকের কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাইছিল। সে দেখল যোদ্ধারা তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। দেখল সামনের সারির নিগ্রোদের দুজন একটা সিংহকে ধরে আছে।

গনফালা দেখল সহসা আগন্তুক দলের একজন যোদ্ধা থমকে দাঁড়িয়ে উপত্যকার একদিকে হাত বাড়িয়ে কি দেখাল। তখন তাদের সকলেই তাদের পথ থেকে অন্য দিকে ছুটতে লাগল। চামড়ার দড়ি-বাঁধা সিংহটাকে টানতে টানতে নিয়ে যেতে লাগল তারা।

গনফালা ওদের পালাবার কারণ খুঁজতে গিয়ে যোদ্ধাটা যে দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়েছিল সেদিকে তাকিয়ে দেখল প্রায় একশোটা হাতি পিঠে কয়েকজন করে যোদ্ধাকে নিয়ে এই দিকেই এগিয়ে আসছে। এদিকে তার পায়ের কাছে তখন স্টোল আর স্পাইক মারামারি ও ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল ভয়ঙ্করভাবে।

স্পাইকরা যেখানে তাদের পথপ্রদর্শকদের ছেড়ে দিয়ে একটি পথ ধরে এগিয়ে চলতে থাকে স্ট্যানলি উড দুজন ওয়াজিরি যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে সেই পথই ধরে।

উড হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ভাবল আজ টারজন থাকলে অনায়াসে পথ খুঁজে পেত।

এমন সময় হঠাৎ একজন ওয়াজিরি উডকে একদিকে দেখাল, একটা নগর দেখা যাচ্ছে বাওয়ানা।

সেদিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল উড। দেখল, খড়ের চালওয়ালা কতকগুলো কুঁড়েঘরের সমন্বয়ে গড়া কোন গাঁ নয়। সাদা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সোনার গম্বুজ ও চূড়াওয়ালা অসংখ্য প্রাসাদ আর অট্টালিকায় ভরা এক মনোরম নগর।

উড সেই ওয়াজিরিকে জিজ্ঞাসা করল, এ কোন্ নগর ?

আমি ওদিকে কোনদিন যাইনি বাওয়ানা তাই ঠিক জানি না।

অন্য একজন ওয়াজিরি যোদ্ধা বলল, মেমসাহেব বোধ হয় ঐ নগরেই আছে বাওয়ানা।

উড বলল, হয়ত আছে। কিন্তু ওখানকার লোকগুলো কেমন হবে তা জানি না। যদি শত্রুভাবাপন্ন হয় তাহলে সেখানে গেলেই তারা আমাদের সবাইকে বন্দী করবে।

ওয়াজিরি যোদ্ধারা বলল, আমরা ওয়াজিরি, আমাদের সবাইকে বন্দী করতে পারবে না। আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি। আমরা ভয় পাইনি।

উড বলল, তোমরা বরং ফিরে গিয়ে টারজনকে খবর দাও। সে যা হয় ব্যবস্থা করবে। টারজন না থাকলে মুভিরোকে বলবে।

ওয়াজিরি যোদ্ধারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে গেল। উড তখন একা পা চালিয়ে দিল সেই স্বর্ণনগরীর পথে।

এদিকে টারজন তখন সেই ওনথার উপত্যকার একধারে একটি উঁচু মালভূমির একটি প্রান্ত থেকে সেই স্বর্ণনগরী ক্যাথনির দিকে তাকিয়ে ছিল। নগরদ্বারের কাছে যে একটা নদী ছিল তার উপর একটা সোনার সেতু চকচক করছিল সূর্যের আলোয়।

কিন্তু ওই স্বর্ণনগরী অজানা নয় টারজনের। ও নগরে একদিন বন্দী ছিল সে। তারপর সেখানকার রাজনৈতিক উত্থানপতনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সে। স্বর্ণনগরী ক্যাথনি থেকে কিছু দূরে এ্যাথনি নামে আর একটা নগর আছে। সেখানকার সব কিছু হাতির দাঁত দিয়ে বাঁধানো অথবা নির্মিত। তাই বলা হয় ক্যাথনি যেমন স্বর্ণনগরী তেমনি এ্যাথনি হচ্ছে হাতির দাঁতের নগরী।

এই দুই নগরীর অধিবাসীদের মধ্যে এক তীব্র বিরোধ ও শত্রুতা চলে আসছে। সুযোগ পেয়ে এক নগরের লোকেরা আক্রমণ করে অন্য নগরের লোকদের। ক্যাথনির যোদ্ধারা পোষমানা সিংহদের গলার দড়ি ধরে ঘুরে বেড়ায় আর এ্যাথনির যোদ্ধারা হাতির পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়।

টারজন ভাবল একদিন সে নগরে বন্দী থাকলেও আজ সে নগরীতে আর শত্রু নেই তার। কারণ তার প্রধান শত্রু রাণী নেমোনি আজ আর নেই। আলেক্সটার নামে তার নিজের যে ভাইকে কারাগারে বন্দী করে রাখে রাণী নেমোনি সেই ভাইই আজ রাজা হয়েছে এবং ফোর্সো, যুডো, জেমনন নামে টারজনের অন্তরঙ্গ বন্ধুরাই তাকে রাজা করে। তার সেই সব বন্ধুরা আজও আছে সে নগরীতে। রাণীর প্রধান পরামর্শদাতা কুখ্যাত তোমো হয়ত এতদিনে নিহত হয়েছে। তাকে আব ভয় করার কিছু নেই।

এই ভেবে সাহসের সঙ্গে উপত্যকাটা পার হয়ে নগরদ্বারে উপস্থিত হলো টারজন। প্রহরীরা টারজনকে এগিয়ে আসতে দেখে আগেই চিনতে পেরেছিল।

নগরদ্বারের কাছে এসে টারজন থামতেই অভ্যর্থনা জানাল তাকে।

প্রহরীদের ক্যাপ্টেন টারজনকে সঙ্গে করে রাজপ্রাসাদের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

ক্যাপ্টেন বিষাদগম্ভীর মুখে বলল, আমি দুঃখিত টারজন, আলেক্সটার আমাকে আপনাকে গ্রেপ্তার করাব হুকুম দিয়েছেন।

টারজন দেখল কুড়িটা বর্শা তাকে ঘিরে আছে। আলেক্সটাবের অকৃতজ্ঞতায় সে বিস্মিত ও মর্মাহত হলেও বাইরে সে বিস্ময়ের বা বিহ্বলতার ভাবটা প্রকাশ করল না।

যোদ্ধারা টারজনের সব অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে রাজপ্রাসাদের দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গেল। টারজন দেখল এই ঘরটা বড় এবং তাতে আলো

বাতাস আছে। আগের বারে সে যখন বন্দী ছিল এখানে তখন তাকে একটা অন্ধকার ঘরে রাখা হয়েছিল।

যোদ্ধারা ঘরের দরজাটা বন্ধ করে চলে গেলে টারজন একটা খোলা জানালার ধারে গিয়ে বাইরে উঠোনের দিকে তাকিয়ে কি দেখতে লাগল। তারপর একটা বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়ে কোন বিপদের কথা চিন্তা না করেই ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত্রির অন্ধকার বাইরে ঘন হয়ে উঠলে টারজনের ঘরের দরজা খুলে একজন ঘরে ঢুকল। তার হাতে ছিল একটা জ্বলন্ত মশাল। সে ঘরে ঢুকে তার পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর সে টারজনের কাছে এসে তার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে টারজনের প্রতি তার বন্ধুত্ব ও আনুগত্যের কথা জানাল।

টারজন তাকে চিনতে পেরে বলল, তোমাকে দেখে খুশি হলাম জেমনন। ডোরিয়া আর তার বাবা মা ভাল আছে ত? তোমার বাবা ফোর্তোই বা কেমন আছেন?

জেমনন বলল, তারা সবাই ভাল আছে, কিন্তু কেউ সুখে নেই। তোমার প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে তার থেকে তুমি অনুমান করতে পেরেছ রাজ্যের অবস্থা কি চলছে।

টারজন বলল, বুঝতে পারছি কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু কি তা জানি না।

শীঘ্রই সব বুঝতে পারবে। দেশের অবস্থা সত্যিই দুঃখজনক।

মানুষই হচ্ছে সব পশুদের মধ্যে জঘন্য এবং নিকৃষ্ট। আমি ত ভেবেছিলাম নেমোনির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব অশান্তির অবসান ঘটেছে।

আমরাও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু আমাদের সে ধারণা ভুল। আলেক্সটার অকৃতজ্ঞ, কাপুরুষ এবং

দুর্বলমনা। রাজা হওয়ার পরই সে তোমার প্রভাবের অধীন হয়ে পড়ে। এর ফল কি হতে পারে তা জান তুমি। আমরা সকলেই তার কুনজরে পড়ে আছি। আসলে তোমোই হচ্ছে এ রাজ্যের প্রকৃত শাসক। তবু জনগণ আমাদের ভালবাসে বলে গণ-বিক্ষোভের ভয়ে আমাদের মেরে ফেলতে সাহস পায় না ওরা।

এরপর জেমনন বলল, কিন্তু তোমার খবর কি? তুমি আবার কাথনিতে ফিরে এলে কি করে?

টারজন বলল, সে এক দীর্ঘ কাহিনী। একটি কুমারী মেয়ে আর তার প্রেমিক আমার হেফাজতে ছিল। তারা বাড়ির পথে রওনা হলে মেয়েটিকে দুজন শ্বেতাঙ্গ চুরি করে নিয়ে যায়। আমি একথা জানতে পারার পর মেয়েটির খোঁজে বেরিয়েছিলাম।

জেমনন বলল, আর তোমাকে বেশী খুঁজতে হবে না। আমি জানি মেয়েটি কোথায় আছে। তবে এখন তুমি তোমোর বন্দী। সুতরাং তা জেনেও কোন লাভ হবে না তোমাদের কারো।

টারজন বলল, কি করে জানলে মেয়েটি কোথায় আছে?

জেমনন বলল, আলেক্সটার আমাকে প্রায়ই থেনার উপত্যকায় এ্যাথনির লোকদের আক্রমণ করার জন্য পাঠায়। যে সব সামন্তকে সে ভয় করে

তাদেরও পাঠায় সে। সম্প্রতি আমি এই ধরনের এক অভিযানে গিয়েছিলাম। আমরা সংখ্যায় বেশী ছিলাম না বলে আমাদের অভিযান সফল হয়নি তেমন। শুধু শত্রুদের একটা মাথা নিতে পেরেছিলাম। আসার সময় পথে আমরা এ্যাথনির একদল লোককে হাতির পিঠে চড়ে আসতে দেখি। সেই সময় উপত্যকায় একদল লোককে দেখি। সে দলে দু জন শ্বেতাঙ্গ, একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা আর চার পাঁচজন নিগ্রোভৃত্য ছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে মেয়েটি ছুটে আসতে থাকে সাহায্যের জন্য। আমরা তাদের সকলকে হয়ত বন্দী করে আনতাম।

টারজন বলল, এখন তোমো আমাকে নিয়ে কি করবে?

তুমি অবশ্য একটা পরিকল্পনা খাড়া করতে পার।

টারজন বলল, আগে আমাকে তোমার পরিকল্পনার কথা জানতে হবে। এখন আমার কথা হলো তুমি আমার ঘর থেকে চলে যাও এই মুহূর্তে। কেউ দেখে ফেলতে পারে।

জেমনন বলল, আমি কি তোমার জন্য কিছুই করতে পারি না? তুমি আমার জন্য কত করেছিলে।

টারজন বলল, তুমি শুধু তোমার ছোরাটা আমাকে দিয়ে যাও। আমি আমার কৌপীনের নীচে সেটা লুকিয়ে রাখব।

জেমনন ঘর থেকে চলে গেলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল টারজন। বন্য পশুর মতই সকল অবস্থাতেই নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন সে।

টারজনকে মৃত্যুদণ্ড দান করেছে আলেক্সটার। তোমোর পরামর্শেই এই দণ্ডের বিধান করেছে সে।

তখন বেলা এগারটা বাজে। সূর্য উজ্জ্বলভাবে কিরণ দিচ্ছিল আকাশে।

টারজনকে শৃংখলিত অবস্থায় প্রহরীরা প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ পার হয়ে রাজপথে নিয়ে গিয়ে থামল। রাস্তার দুধারে জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। সেখান থেকে এক মিছিল বার হয়ে নগরের বাইরের এক প্রান্তরে যাবে। মিছিলের সামনে ছিল রাজ্যের সামন্ত ও যোদ্ধারা, তারপর ছিল সিংহটানা রাজার রথ আর তারপরে কয়েকজন নিগ্রো একটা সিংহকে গলবদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছিল।

এ মিছিল আগেও একবার দেখেছিল টারজন। টারজনকে রাজার রথের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল শিকল দিয়ে।

সিংহপ্রান্তরে মিছিলটা পৌঁছলে টারজনের শিকল খুলে দেওয়া হলো। শিকল বাঁধা শিকারী সিংহটাকে কখন খুলে দেওয়া হবে, কখন সে সিংহ বন্দীর দেহটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে সে দৃশ্য দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল জনতা। রাজা আলেক্সটারের চোখে মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। তার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। টারজন দেখল মুখখানা নিষ্ঠুরতায় ভরা।

আলেক্সটার একসময় বলল, তাড়াতাড়ি করো, আমার ভাল লাগছে না।

রাজার আদেশে আসল অনুষ্ঠানের জন্য সবাই তাড়াহুড়ো করতে লাগল। তাড়াতাড়ি এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল। শিকারী সিংহটাকে যে নিগ্রোটা

ধরে ছিল হঠাৎ তার হাত থেকে শিকলটা পড়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে সিংহটা গর্জন করতে করতে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বর্শাধারী যোদ্ধাদের আক্রমণ করল। নিরস্ত্র জনতা প্রাণভয়ে পালাতে লাগল।

চারদিকে বিরাট গোলমাল ও হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। সামন্তরা বিব্রত হয়ে পড়ল। তখন রথের উপর দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছিল আলেক্সটার। সে চীৎকার করে বার বার বলতে লাগল, যে এই সিংহটাকে মারতে পারবে তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে। সে যা চায় তাই দেওয়া হবে।

কিন্তু সবাই তখন নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত। কেউ তার কথায় কান দিল না।

তার প্রধান পরামর্শদাতা ভোমোও তখন পালিয়ে গেছে সেখান থেকে।

আলেক্সটার কিন্তু পালাতে পারল না।

সহসা মুখ ঘুরিয়ে রথের উপর দাঁড়িয়ে থাকা আলেক্সটারকে লক্ষ্য করে ছুটে আসতে লাগল সিংহটা। এবার সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে গেল আলেক্সটার। অথচ পালাবার কোন উপায় নেই, কোন পথ নেই। ভয়ে হিম হয়ে গেল তার গায়ের রক্ত।

আলেক্সটারের কয়েকজন দেহরক্ষী শুধু সিংহটাকে বর্শা দিয়ে আক্রমণ করল। আর সবাই পালিয়ে গেছে। আর আছে শুধু বন্দী টারজন।

এমন সময় বন্দী তার পরনের কৌপীনের ভিতর থেকে একটা ছোরা বার করে রথের উপর ঝাপিয়ে পড়া সিংহটাকে আক্রমণ করল। সিংহটা তাকে লক্ষ্য করে একটা জোর লাফ দিতেই টারজন বসে পড়ে পিছন থেকে সিংহটার পিঠে চেপে পড়ে তার কেশর ধরে ফেলল। সিংহটার মত টারজন অদ্ভুতভাবে একধরনের গর্জন করতে লাগল। সে তার ছুরিটা সিংহটার বুকে পাঁজরে পিঠে বারবার বসিয়ে দিতে লাগল।

আলেক্সটার আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগল একবার টারজন সিংহটার পিঠে আর একবার সিংহটা টারজনের পিঠে চেপে দুজনেই গড়াগড়ি দিতে লাগল। তবে টারজন বারবার ছুরিটা বসাতে লাগল সিংহটার ঘাড়ে।

এদিকে রাজার দেহরক্ষীরা লড়াইরত টারজন ও সিংহটাকে চারদিকে ঘিরে বর্শাহাতে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু টারজনকে বাদ দিয়ে সিংহটার গায়ে বর্শা দিয়ে আঘাত করার কোন সুযোগই পাচ্ছিল না তারা।

অবশেষে আপনা থেকে অবশ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সিংহটা। টারজন তার মৃতদেহের উপর একটা পা রেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে বাঁদর-গোরিলাদের মত এমন অদ্ভুতভাবে চীৎকার করল যা শুনে ভয় পেয়ে গেল আলেক্সটার। আগে সে সিংহটাকে ভয় করছিল এখন তার ভয় এই লোকটাকে। তার মনে হলো এ লোক সিংহের থেকেও ভয়ঙ্কর। এ নিশ্চয় তাকে একদিন খুন করবে।

একজন সামন্ত আলেক্সটারকে জিজ্ঞাসা করল, এখন কি করব একে নিয়ে?

আলেক্সটার বলল, ওকে নিয়ে যাও। ওকে মেরে ফেল।

সামন্ত বলল, কিন্তু ও আপনার জীবন রক্ষা করেছে।

আলেক্সটার বলল, এখন নিয়ে যাও। ঘরে আটক করে রাখ। পরে যা হয় করা যাবে।

সামন্ত রক্ষীদের টারজনকে আবার সেই কারাকক্ষে নিয়ে যেতে বলল। আলেক্সটারের কথায় সে নিজেই লজ্জিত হলো। সেও বন্দী টারজনের সঙ্গে প্রাসাদের দিকে যেতে লাগল। পথে সে টারজনকে বলল, তুমি যা করেছ তার জন্য এর থেকে অনেক বড় পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল।

টারজন বলল, আমি নিজে শুনেছি রাজা বলেছিল সিংহটাকে কেউ মারতে পারলে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে তাকে। সে যা চাইবে তাই দেওয়া হবে।

হ্যাঁ আমিও শুনেছি।

আমার মনে হয় উনি তা ভুলে গেছেন।

কিন্তু তুমি কি চাইতে?

কিছুই না।

সামন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, সেকি! কিছুই না?

শত্রুর কাছ থেকে আমি কিছুই চাই না।

সামন্ত বলল, আমার কাছে বলতে পার, আমি ত তোমার শত্রু নই।

আমি সকাল থেকে কোন খাদ্য বা পানীয় পাইনি।

তুমি দুটোই পাবে।

টারজনকে এবার রাজপ্রাসাদের অন্য একদিকের দোতলায় রাস্তার দিকের একটি ঘরে রাখা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে একজন যোদ্ধা দরজা খুলে ঘরে ঢুকে টারজনকে খাবার দিয়ে গেল।

যোদ্ধাটি বলল, সিংহের সঙ্গে তোমার লড়াই আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি রাণী নেমোনির সামনে ফোবেগের সঙ্গে তোমার লড়াইও দেখেছিলাম। ফোবেগকে তুমি হারিয়ে দিয়েছিলে। তাকে তুমি তখন মেরে ফেলতে পারতে। জনতা তাকে মারবার জন্য বারবার উত্তেজিত করছিল তোমায়। তবু তাকে তুমি মারনি।

টারজন বলল, ফোবেগ এখনো বেঁচে আছে?

হ্যাঁ, সে এখন মন্দিরে রক্ষীর কাজ করছে।

তাকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।

যোদ্ধাটি এবার টারজনের কাছে এসে তার কানে কানে বলল, কোন মদপান করবে না এখানে। আর কোন ঘরে ঢুকলে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবে।

টারজন ভেবে দেখল যোদ্ধাটি তাকে ঠিক পরামর্শ দিয়েছে। মদের সঙ্গে ওরা বিষ মিশিয়ে দিতে পারে আর তাকে পিছন থেকে মারার জন্য কোন আততায়ীকে পাঠাতে পারে। সে বুঝল ক্যাথনির যোদ্ধাদের মধ্যে তার অনেক বন্ধু আছে।

টারজন দেখল, রাজপথের ওধারে একদল লোক জড়ো হয়ে কি বলাবলি করছে। তারা মাঝে মাঝে রাজপ্রাসাদের দিকে তাকাচ্ছে।

টারজন দেখল জনতার ভিড় ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। চারদিক থেকে বহু লোক এসে যোগ দিচ্ছে

সেই জনতার সঙ্গে। তাদের মধ্যে অনেক যোদ্ধাও ছিল। অন্ধকার হয়ে উঠলে অনেকে মশাল হাতে ছোটাছুটি করতে লাগল। তারা প্রাসাদের সামনে এসে জড়ো হতে লাগল।

প্রাসাদ থেকে একজন সামন্তর অধীনে একদল যোদ্ধা এসে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করল। কিন্তু জনতা চীৎকার করে বলে উঠল, টারজনকে ছেড়ে দাও। তাকে মুক্ত করে দাও।

বলিষ্ঠ চেহারার একজন লোক হাতের জ্বলন্ত মশালটা নাড়িয়ে চীৎকার করে উঠল, ধিক আলেক্স-টারকে। তার লজ্জা হওয়া উচিত।

টারজন চিনতে পারল লোকটি হলো ফোবেগ।

এরপর রাজার যোদ্ধাদের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জনতার মারামারি শুরু হয়ে গেল। অনেকের মাথা ভাঙল। অনেকে আহত হলো। রাজার যোদ্ধারা হেরে গিয়ে প্রাণ নিয়ে কোনরকমে পালিয়ে গেল প্রাসাদের মধ্যে।

গোটা রাজপথ তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে বিক্ষুব্ধ জনতার ভিড়ে। প্রাসাদের সামনে গেটের উপর করাঘাত করতে করতে জনতা ধ্বনি দিতে লাগল, তোমো নিপাত যাক। তোমোর মৃত্যু চাই।

এমন সময় জনতার মধ্য থেকে একজন লোক বলল, আলেক্সটার শিকারী সিংহদের ছেড়ে দিয়েছে আমাদের মারার জন্য। আলেক্সটার নিপাত যাক।

টারজন দেখল প্রাসাদের আস্তাবল থেকে পঞ্চাশটা শিকারী সিংহকে দড়ি ধরে তাদের রক্ষীরা এগিয়ে আসছে জনতার দিকে। এদিকে জনতার ক্ষোভ তখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তারা তবু ছুটে পালাল না সিংহদের ভয়ে। তারা সমানে ধ্বনি দিতে লাগল টারজনের মুক্তির জন্য।

টারজন তখন আর চুপ করে থাকতে পারল না। তারই জন্য এতগুলি লোক জীবন বিপন্ন করে লড়াই

করছে অথচ তাদের জন্য কিছুই করতে পারবে না সে। না, সে আর কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকবে না চুপ করে।

তাই সে গর্জন করে জানালার গরাদগুলো ভেঙ্গে দেখল, জানালার নিচে উঠোনটা একেবারে খালি। উঠোনের বাইরেই রাজপথ। রাজপথে সমবেত জনতার দিকে সিংহগুলোকে নিয়ে তাদের রক্ষীরা এগিয়ে আসছে।

টারজন জানালা থেকে উঠোনটায় নেমে পিছনের দরজা দিয়ে সোজা জনতার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জনতার মধ্য থেকে কয়েকজন তাকে চিনতে পেরে ধ্বনি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাল।

টারজন বলল, যাদের হাতে মশাল আর বর্শা আছে তারা সামনে এগিয়ে এস।

এই বলে সে নিজে একটা মশাল ধরে কয়েক-জনকে মশাল নিয়ে তার সঙ্গে সিংহগুলোর মুখের কাছে যেতে বলল। অন্যান্য জন্তুদের মত সিংহরাও আগুনকে ভয় করে। মুখের কাছে জ্বলন্ত মশালের আঁচ পেয়ে সিংহগুলো পিছিয়ে যেতে লাগল। তাদের রক্ষীরাও পিছু হটতে লাগল।

জনতা এবার অধৈর্য হয়ে প্রাসাদের মধ্যে ঢুকতে চাইল। টারজন তাদের বলল, থাম, সিংহগুলোকে

আগে চলে যেতে দাও। তারপর আমি আলেক্সটার আর তোমোর কাছে যাব।

ফোবোগ এগিয়ে এসে বলল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

টারজন জনতাকে বলল, আমরা সামনের গেট দিয়ে নয়, পিছনের দরজা দিয়ে যাব। তোমরাও আমাদের সঙ্গে চল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে টারজন দেখল একটি ঘরের মধ্যে রাজা আলেক্সটার কয়েকজন সামন্তের সঙ্গে নৈশভোজন করছে। বিক্ষুব্ধ জনতার ধ্বনি ক্রমাগত শুনতে শুনতে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। তার উপর শিকারী সিংহরা জ্বলন্ত মশালের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে শুনে আরো ভয় পেয়ে গেছে সে। তোমো তাকে বোঝাচ্ছিল সিংহরা পালালেও প্রাসাদের যোদ্ধারা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেবে।

আলেক্সটার বলল, তোমার জন্যই এমন হলো তোমো। সব তোমারই দোষ। তুমি ঐ বুনো লোকটাকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখতে বলেছিলে। তার ফলে কি হলো দেখ। জনগণ আমাকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করতে চাইছে। এখন কি করব?

আলেক্সটারের মত তোমোও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। জনতাও তার মৃত্যু চায়—এই ধ্বনি সে নিজের কানে শুনেছে।

তোমো তাই একটা পরিকল্পনা খাড়া করে বলল, ঠিক আছে, বুনো লোকটাকে এখানে আনাও। তাকে মুক্তি দিয়ে কিছু টাকা দিয়ে দাও। তারপর জনতাকে একথাটা জানিয়ে দাও লোক মারফৎ।

আলেক্সটার সেইমত আদেশ দিল তার লোকদের।

তোমো বলল, তারপর অবশ্য আমরা এককাপ মদপান করতে দিতে পারি লোকটাকে।

সঙ্গে সঙ্গে টারজনকে উপরতলা থেকে আনার জন্য একজন সামন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় বেরোতেই সে দেখল টারজন দাঁড়িয়ে আছে। সে তাদের কথা শুনছিল।

সামন্ত ফিরে এসে ঘরে ঢুকে আলেক্সটারকে জানাল, টারজন এসে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে টারজন ঘরে ঢুকে পড়ল। তার পিছু পিছু ফোবেগ ও জনতার একটি অংশ ঘরে ঢুকে পড়ল।

তাদের দেখে আলেক্সটার, তোমো ও সামন্তরা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আলেক্সটার ও তোমো দুজনে পালাবার চেষ্টা করছিল ভিতরের দরজা দিয়ে। কিন্তু টারজন এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেলল তাদের।

কোন সামন্তই তরবারি কোষমুক্ত করে এগিয়ে এল না আলেক্সটারের সাহায্যে। তারা সকলেই তাকে ছেড়ে চলে গেল।

আলেক্সটার টারজনের সামনে নতজানু হয়ে তার জীবন ভিক্ষা করতে লাগল। সে বলল, তুমি বিশ্বাস করো, কিছুক্ষণ আগেই আমি আদেশ দিয়েছি

তোমাকে মুক্ত করে দেবার জন্য। তোমাকে এখানে এনে অনেক ধনরত্নও দিতাম। তোমার জন্য একটি প্রাসাদ, দাসদাসী এবং অনেক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিতাম।

টারজন বলল, একথা সেই সিংহপ্রান্তরে তোমার ভাবা উচিত ছিল। তোমার দান আমি গ্রহণ করি বা না করি, জনগণ অন্ততঃ এভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠত না।

আলেক্সটার বলল, তাহলে এখন আমাকে নিয়ে কি করতে চাও তোমরা?

টারজন বলল, তোমার প্রজারা কি করবে তা জানি না, তবে যুডোকে যদি তারা রাজা না করে তাহলে ভুল করবে।

টারজন জানত সামন্তদের মধ্যে যুডোই রাজা হবার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। সে অভিজাত-বংশীয়। ভদ্র, উদার এবং মার্জিত স্বভাব। জনগণ তাকে ভালবাসে।

টারজনের মুখ থেকে যুডোর নাম শুনে তার নামে সমর্থনের ধ্বনি দিতে লাগল জনগণ।

তা শুনে আলেক্সটারের মুখখানা ভয়ে সাদা হয়ে গেল। সে তখন ধীর পায়ে তোমার কাছে গিয়ে বলল, তুমিই আমার এই সর্বনাশ করলে। আমার বোনের আমলে তুমি আমাকে চক্রান্ত করে বছরের পর বছর ধরে কারাগারে বন্দী করে রাখ। তুমিই আমার বোনের জীবন মাটি করে দাও। আমার জীবনকেও কুপরামর্শ দিয়ে মাটি করে দিয়েছ। তোমার জন্যই আমি সিংহাসন হারালাম। কিন্তু আর তুমি কারো সর্বনাশ করতে পারবে না।

এই বলে সে মুহূর্তের মধ্যে খাপ থেকে তরবারি খুলে এত তাড়াতাড়ি এবং এত জোরে তোমোর মাথায় মারল যে তার মাথাটা দু ফাঁক হয়ে গেল চোখের নিমেষে।

তার বোন নেমোনি যেমন একদিন পাগল হয়ে গিয়েছিল তেমনি আলেক্সটারও পাগল হয়ে গেল। তোমোকে হত্যা করার পর সে এক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সেই তরবারিটা নিজের বুকে ঢুকিয়ে দিল। তারপর পড়ে গেল।

এইভাবে ক্যাথনির রাজবংশের শেষ রাজা আলেক্সটারের জীবনের অবসান ঘটল।

ক্যাথনি থেকে যে পথটা এ্যাথনি নগরের দিকে চলে গেছে সেই পথ দিয়ে যেতেই এ্যাথনির দক্ষিণ দিকের নগরদ্বার পাওয়া যায়। নগরদ্বারের সামনে আছে এক বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর। সেখানে যোদ্ধারা হাতিদের প্রশিক্ষণ দেয়। নগরের উত্তর দিকে আছে প্রচুর চাষের জমি। সেখানে ক্রীতদাসরা চাষের কাজ করে।

তখন বিকাল বেলা। নগরদ্বারের উপরে যে পর্যবেক্ষণের ঘর ছিল সেখানে প্রহরীরা দিনরাত পাহারা দেয়।

সহসা একজন প্রহরী বলে উঠল, দক্ষিণ দিক থেকে একটা লোক আসছে।

পাশা খেলতে খেলতে অন্যান্য প্রহরীরা বলল, কত জন?

বললাম ত একজন।

তাহলে বিপদসূচক ঘণ্টা বাজাবার দরকার নেই। কিন্তু একা এ্যাথনিতে কে আসবে? ও কি ক্যাথনির লোক?

প্রথম প্রহরী বলল, লোকটা অবশ্য এখনো অনেক দূরে আছে। তবে তার পোশাক দেখে ত ক্যাথনির লোক বলে মনে হচ্ছে না। ওর পোশাকটা অদ্ভুত ধরনের মনে হচ্ছে।

প্রহরীদের অফিসার আরো উপরে উঠে গিয়ে ভাল করে দেখল। পরে বলল, লোকটা ক্যাথনির নয়। লোকটা হয় খুব বোকা না হয় খুব সাহসী। তা না হলে একা ও এ্যাথনিতে আসত না।

স্টানলি উড একা হাঁটতে হাঁটতে নগরদ্বারের কাছে এসে পড়লে প্রহরীরা যে ভাষায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল সে ভাষা বুঝল না সে।

উড ইশারা করে বলল, সে বন্ধু।

গেট খুলে বেরিয়ে এল প্রহরীরা। তারা উডের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু উড তাদের কোন কথা বুঝতে না পারায় তারা নগরের ভিতরে নিয়ে গেল।

উড দেখল রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট পাকা দোকান ঘর রয়েছে।

উডকে দেখার জন্য রাস্তার ধারে ধারে কিছু ভিড় জমে উঠল। তাদের ভাষা বুঝতে না পারার জন্য খুবই অস্বস্তিবোধ করতে লাগল উড। গনফালা সম্বন্ধে সে কার কাছে কিভাবে খোঁজখবর নেবে তা বুঝতে পারল না। তাছাড়া ওরা বন্দী করবে না অতিথি হিসাবে রেখে দেবে তাও বুঝতে পারল না।

উড ঠিক করল যেমন করে হোক ওদের ভাষাটা আগে শিখে নিতে হবে।

উডকে প্রথমে নগরের মাঝখানে এক বিরাট প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটা বড় বাড়ির উঠোনে নিয়ে যাওয়া হলো।

উডকে সেখান থেকে বার করে তার দিয়ে ঘেরা একটা চারকোণা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় মিলে প্রায় পঞ্চাশজন বন্দী ছিল। উড বুঝল তাকে ওরা বন্দী করেছে।

হঠাৎ বন্দীদের মধ্যে কে একজন উডের নাম ধরে ডাকতেই চমকে উঠল উড। দেখল, শ্বেতাঙ্গ বন্দীদের মধ্যে স্পাইক আর স্ট্রোল রয়েছে।

স্পাইককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে রাগে জ্বলে উঠল উডের সর্বাঙ্গ। সে ঘুষি পাকিয়ে তাকে মারতে গেল। স্পাইক আর স্ট্রোলই বিশ্বাসঘাতকতা করে গলফান ও গনফালাকে চুরি করে নিয়ে পালায়।

কিন্তু স্পাইক রাগল না। সে উডকে বলল, কি করে তুমি এলে এখানে? এখন ওসব করে বা ঝগড়াঝাঁটি করে কোন লাভ হবে না। এখন এক-যোগে কাজ করতে হবে। উদ্ধারের কথা ভাবতে হবে।

উড বলল, গনফালা কোথায়? তাকে নিয়ে কি করেছ তোমরা?

স্ট্রোল বলল, ওরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। তার পর থেকে তার আর দেখা পাইনি আমরা। যেদিন আমাদের বন্দী করে ওরা সেদিন থেকেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

স্পাইক বলল, আমার মনে হয় গনফালাকে রাজপ্রাসাদে রাখা হয়েছে। ওরা বলছে ওদের রাজার নজর পড়েছে গনফালার উপর। সেই নোংরা লোকটা গলফ্যালা আর গনগাদা তুলি কেড়ে নেবে।

উড বলল, তোমরা কি জন্য পাথর চুরি করেছিলে? যদি তোমাদের কেউ [illegible] থাকে তাহলে --

স্ট্রোল বলল, আমার পাথরের ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।

স্পাইক বলল, এখান থেকে তাকে নিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত কেউ তার কোন ক্ষতি করেনি। তবে এখান থেকে তাকে নিয়ে যাবার পর কি হয়েছে জানি না।

স্পাইক বলল, সত্যিই পাথরটা সব সময় অভিশাপ হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে। ওটা শুধু দুর্ভাগ্যই এনেছে। আমার ও স্ট্রোলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। আমাদের অবস্থা কি হয়েছে দেখ। আমার পান্নাটা হারিয়েছি, হীরেটাও হারালাম। এখন আমাদের হাতির খাদ্য একরকমের ভূষি খাওয়ানো হয়।

উড দেখল স্পাইক ইতিমধ্যেই ঐ অঞ্চলের কিছু ভাষা শিখেছে। তার কিছু কিছু কথা অন্যান্য বন্দীরা বুঝতে পারছে।

উড এবার নিজেকে বুঝিয়ে ঠিক করল, স্পাইক আর স্ট্রোলের প্রতি তার মনোভাবের পরিবর্তন করা উচিত। তারা যত শত্রুতাই করে থাক, এখন তাদের উপর কোন প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা না করে একসঙ্গে মুক্তির কোন উপায়ের জন্য বরং চেষ্টা করা উচিত।

এরপর উডকে ভালথরের কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল ওদের ভাষায়। বলল, আমার বন্ধু তোমার কাছে তোমাদের ভাষা শিখতে চায়।
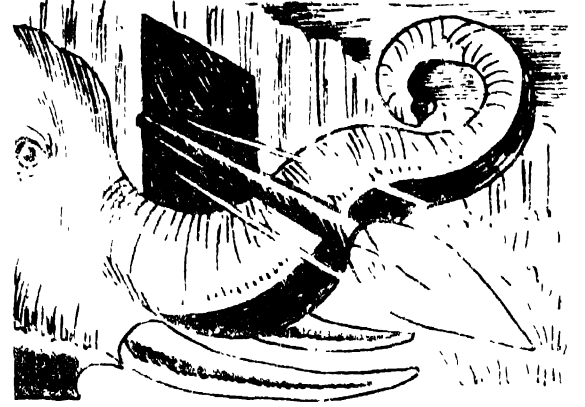
ভালথর উডের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা মর্দন করে হাসিমুখে বলল, ঠিক আছে, ও আমাকে ইংরিজি ভাষা শিখিয়ে দেবে, আমি ওকে আমাদের ভাষা শিখিয়ে দেব।

সেদিন থেকে স্বেরাচারী শাসক জোনাসের প্রাসাদের আস্তাবলে হাতিদের দেখাশোনার কাজ করতে লাগল উড অন্যান্য ক্রীতদাসদের মত।

আস্তাবলের কাজ ছাড়াও আর একটা কাজ করতে হত উডকে। ভালথর, স্পাইক আর স্ট্রোলের সঙ্গে তাকে নগরের দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত প্রান্তরে হাতির পিঠে চড়ে গিয়ে হাতিদের বশ করতে হত। সাধারণ ক্রীতদাসদের থেকে তার বুদ্ধি বেশী ছিল বলে এ কাজের ভার দেওয়া হয় তাকে।

রোজ সকালের দিকেই হাতির পিঠে চড়ে ফাঁকা মাঠে যেতে হত তাদের। একদিন সকালবেলায় মাঠ থেকে ফিরে আসার পর যখন হাতিদের গা ধুয়ে দিচ্ছিল তখন হঠাৎ হুকুম আসে তাদের আবার হাতি নিয়ে মাঠে যেতে হবে।

হাতির পিঠে চড়ে মাঠের দিকে তারা এগোতেই যোদ্ধারা তাদের বলল, একটা বুনো হাতিকে বশ করে আস্তাবলে নিয়ে আসার জন্যই তাদের পাঠানো হচ্ছে। বুনো হাতিটা মাঠের ফসলের ক্ষতি করছে এবং কিছুতেই পোষ মানতে চাইছে না।
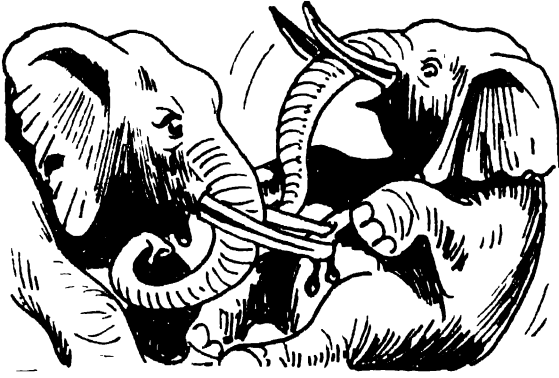
একজন যোদ্ধা আবার বলল, হাতিটা একেবারে বুনো এবং পাগলা। তা যদি হয় তাহলে আমরা কেউ জীবন নিয়ে আর ফিরতে পারব না।

ভালথর বলল, আইগোর শাসনকালে সামন্তরা বুনো হাতি বশ করে আনতে যেত, ক্রীতদাসদের পাঠানো হত না।

ভালথর একজন সামন্ত। তাই ভালথরের দুপাশে যোদ্ধা ও ক্রীতদাসরা হাতি চালিয়ে যেতে লাগল। উড ছিল ভালথরের একেবারে পাশে।

একজন যোদ্ধা চীৎকার করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দেখা গেল দূরে একটা বাঁশবন থেকে সেই বুনো হাতিটা বেরিয়ে আসছে।

ভালথর উডকে সাবধান করে দিল, হাতিটা আকারে বিরাট এবং একেবারে বুনো। ও এই দিকেই আসছে। একটুও ভয় নেই। তুমি সাবধানে এগোবে, রক্ষীরা যাই বলুক বেশী এগোবে না ওর কাছে তাহলে সংযত করতে পারবে না তোমার হাতিকে।

উড বলল, এত বড় হাতি আমি কখনো দেখিনি।

ভালথর বলল, আমিও না। ওর দাঁতটা আবার কালো।

উড বলল, এখন আমাদের কি করতে হবে? কিভাবে ওকে বশ করা হবে আমি ত তার কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

ভালথর বলল, কয়েকটা মেয়ে হাতিকে ওর আশে পাশে পাঠিয়ে ওকে ভুলিয়ে নগরদ্বারের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে।

এমন সময় বুনো হাতিটা ওদের দেখে তার শুঁড়টা তুলে ক্রুদ্ধভাবে গর্জন করতে লাগল। যে অফিসার ওদের নেতৃত্ব দান করছিল সে কয়েকজন ক্রীতদাসকে তাদের মেয়ে হাতি নিয়ে বুনো হাতিটার কাছে যেতে বলছিল।

কিন্তু বুনো হাতিটা মেয়ে হাতিদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অফিসার যে পুরুষ হাতিটার পিঠে চেপে ছিল সেই পুরুষ হাতিটাকে আক্রমণ করল। হাতিটা পড়ে যেতে তার পিঠ থেকে অফিসারও পড়ে গেল। অফিসারের আর্ত চীৎকারের সঙ্গে বুনো হাতিটার গর্জন মিশে গেল। অফিসার ছুটে পালাতে লাগল।

ভালথর উডকে নিয়ে তাদের মেয়ে হাতিদুটোকে চালিয়ে বুনো হাতিটার দিকে যেতে লাগল। কিন্তু তারা তার কাছে যাবার আগেই বুনো হাতিটা ছুটতে থাকা অফিসারকে শুঁড় দিয়ে ধরে পা দিয়ে পিষে ফেলল।

তার ক্রোধের বস্তুটাকে ইচ্ছামত মেরে পিষে ফেলার পর শান্ত হয়ে লেজ নাড়ছিল বুনো হাতিটা। ঠিক তখনি ভালথর আর উড তাদের দুটো মেয়ে হাতি নিয়ে গিয়ে বুনো হাতিটার দুপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন আর পাগলামির চিহ্নমাত্র নেই তার মধ্যে।

এ্যাথনির লোকেরা হাতি ধরার সময় অনুচ্চ স্বরে এক ধরনের সুরেলা গান গাইত। সে গানের কোন বাণী ছিল না।

দুটো মেয়ে হাতির মাঝখানে বুনো হাতিটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল নগরের দিকে। আর কোন দৌরাত্ম্য দেখাল না। অন্যান্যরা তাদের পিছু পিছু আসতে লাগল।

সকলেই ভালথরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগল। উড তাকে বুনো হাতি ধরতে সাহায্য করায় তার কথা রাজপ্রাসাদে চলে গেল।

পরদিন একজন অফিসার এসে উডকে জানাল ফোরোস তাকে দেখতে চেয়েছে।

সূর্য কিছুক্ষণ আগে পশ্চিম আকাশটাকে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নিঃশব্দে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছিল থেনারের উপত্যকার উপরে। টারজন তখন একা ক্যাথনি থেকে এ্যাথনি নগরীর দিকে এগিয়ে আসছিল গনফালার খোঁজে।

টারজনের সহায়তায় যুডো ক্যাথনির সিংহাসনে বসার পর সে টারজনকে একা এ্যাথনিতে যেতে নিষেধ করে। জেমননও তাকে এ কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু কারও কথা শোনেনি টারজন। সঙ্গে কোন সেনাদল না নিয়েই একা যাবে এ্যাথনিতে।

যুডো তখন তাকে বলে, ঠিক আছে, তুমি যাও। কিছুদিনের মধ্যে ফিরে না এলে তোমাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমি এক সেনাদল পাঠাব।

টারজন বলল, আমি ফিরে না এলে বুঝবে আমি মরে গেছি।

যুডো বলল, ওরা তোমাকে মারবে না। ওদের নগরে এখন কাজের লোকের দরকার। তোমার মত চেহারার লোককে ওরা কিছুতেই মারবে না।

জেমনন বলল, হাতির পরিচর্যা না করিয়ে তোমাকে ওরা যুদ্ধের কাজে লাগাবে।

থেনারের উপত্যকায় অনেক সিংহ আছে বলে দিনের বেলায় সেদিকে পথ চলত না টারজন। থেনারের উপত্যকার সিংহগুলো সাধারণ সিংহ নয়। তাদের বেশীর ভাগই ক্যাথনি থেকে পালিয়ে মানুষ

শিকারের জন্য প্রশিক্ষণ পাওয়া সিংহ। তাদের মানুষের মাংস খেতে দেওয়া হত।

টারজন দেখল তার সামনে কিছুদূরে একটা পাহাড়ের উপর চাঁদ উঠেছে।

টারজন তার চলার গতি বাড়িয়ে দিল। সে ডাক শুনে বুঝল মোট পাঁচটা সিংহ একসঙ্গে আসছে। সে আরও বুঝল সিংহগুলো তার পিছনে এক মাইল দূরে আছে আর তার সামনে যে বন আছে তার দূরত্ব সেখান থেকে তিন মাইল।

এবার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল টারজন। কিন্তু বনের কাছে যেতেই দেখল সামনে একটা সিংহ তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে তার পিছনে সেই পাঁচটা সিংহ এগিয়ে আসছে দ্রুত গতিতে। টারজন তখন তার বুকের ভিতর থেকে বাঁদর গোরিলাদের মত এক ভয়ঙ্কর শব্দ বার করে চীৎকার করে উঠতেই তার পথ থেকে সরে গেল সিংহটা। টারজন এক লাফে একটা গাছের ডালে উঠে পড়ল। এদিকে সেই পাঁচটা সিংহ তাকে ধরার জন্য লাফ দিল একসঙ্গে।

টারজন গাছের অনেক উপরে তাদের নাগালের বাইরে উঠে গিয়ে গাছ থেকে পাতা আর শুকনো ডাল ফেলে সিংহগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তাদের রাগিয়ে দিল আরও। তারপর সেখানে আর সময় নষ্ট না করে গাছের ডালে ডালে এ্যাথনির দিকে চলে গেল।

বাগানটার একদিকে একটা টিনের চালা ছিল। তার মাথায় উঠে দেখল সেদিকে প্রাচীরের ওপারেই একটা রাস্তা নগরের মধ্যে চলে গেছে। টিনের চাল থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ল টারজন।

চাঁদের আলোয় পথঘাট সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পথে কোন লোক ছিল না। পথের দুধারের বাড়িগুলোর সব দরজা বন্ধ। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সহসা টারজন দেখল একটা বাড়িতে জানালা খুলে একটা লোক তাকে প্রশ্ন করল, কে তুমি? এত রাতে এখানে কি করছ?

টারজন অনুচ্চ গলায় উত্তর করল, আমি ডাইমন।

এটা জেমননের কাছ থেকে শিখেছিল সে। জেমনন তাকে বলেছিল এ্যাথনির লোকেরা বিশ্বাস করে ডাইমন নামে এক প্রেতাত্মা রাত্রিতে ঘুরে বেড়ায় এবং ইচ্ছামত যে কোন মানুষের জীবন নাশ করতে পারে। তাই হঠাৎ কারো মৃত্যু ঘটলে বা রাত্রিতে কেউ মারা গেলে তারা বলে ডাইমন তাকে নিয়েছে।

টারজনের মুখ থেকে 'ডাইমন' নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জানালা বন্ধ করে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল সেই লোকটা।

ছায়াচ্ছন্ন সেই রাস্তাটা দিয়ে এগিয়ে নগরের মাঝখানে রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি এসে পড়ল টারজন। সে শুনেছিল এ্যাথনির রাজপ্রাসাদের উত্তর ও দক্ষিণদিকের দরজাতেই দিনরাত পাহারা থাকে।

প্রাসাদের চারদিকে যে প্রাচীর ছিল, পশ্চিম দিকে গিয়ে সেই প্রাচীরের উপর উঠে পড়ল। টারজন উঠে দেখল তার গায়ে একটা সুন্দর সাজানো বাগান রয়েছে। সেই বাগানে নেমে সে একটা বড় বাড়ির কাছে চলে গেল। সে বুঝল এটাই রাজপ্রাসাদ। দেখল বাড়িটার মধ্যে অনেকগুলো ঘরে তখনো আলো জ্বলছে।

সেই সব ঘরগুলোর মধ্যে একটা ঘরে দেখল ভোজসভার অনুষ্ঠান চলছে। প্রশস্ত ঘরখানার মাঝখানে একটা বিরাট লম্বা টেবিলের চারদিকে প্রায় একশোজন লোক খাওয়ার পর ঝিমোচ্ছে। বেশীর ভাগ লোকই অতিরিক্ত মদ খেয়ে মাতাল হয়ে উঠেছে। অনেকে কথা বলছে, হাসছে, আবার মারামারি করছে।

লোকগুলোকে দেখে ক্যাথনির সামন্তদের মত ভদ্র বলে মনে হলো না টারজনের। এই ভোজসভার যে প্রধান সে টেবিলের সামনে বসে ছিল। লোক-

টাকে একটা পশু বলে মনে হচ্ছিল। সে কেবল ভৃত্য ও ক্রীতদাসদের হুকুম করছিল। এই লোকটাই হলো রাজা ফোরোস।

এক সময় সেই গুহস্বামী লোকটা টেবিল চাপড়ে একজন ক্রীতদাসকে বলল, আমি তাকে নিয়ে আসার জন্য বলছি তোকে।

ক্রীতদাসটি বলল, কাকে হুজুর?

কেন, সেই মেয়েটিকে।

কোন্ মেয়েটিকে?

ক্রীতদাসটি ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, আমি আনতে পারব না। মেনোফ্রা তাহলে আমার পিঠের চামড়া তুলে নেবে।

ফোরোস বলল, মেনোফ্রা জানতে পারবে না। সে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ফোরোসের পাশে যে একটা লোক বসেছিল সে কিন্তু অন্যান্যদের মত মাতাল হয়নি। সে ফোরোসকে পরামর্শ দিল, কাউকে পাঠিও না মেয়েটাকে আনার জন্য। ওকে আনতে হবে না। লেনোফ্রা তাহলে যে আনতে যাবে তার ও তোমার হৃৎপিণ্ড উপড়ে নেবে।

ফোরোস তখন চীৎকার করে বলে উঠল, তাহলে রাজা কে?

অন্য লোকটি বলল, মেনোফ্রাকে জিজ্ঞাসা করো একথা।

ফোরোস জোর গলায় বলল, আমি রাজা।

এই বলে সে একজন ক্রীতদাসকে ডাকল। কিন্তু ক্রীতদাসটা অন্য দিকে তাকিয়ে থেকে না শোনার ভান করল। ফোরোস তখন একটা মদের পেয়ালা ছুঁড়ে দিল লোকটার দিকে। একটুর জন্য বেঁচে গেল তার মাথাটা।

ফোরোস গর্জন করে বলল, যাও, মেয়েটাকে নিয়ে এস।

ক্রীতদাসটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ফোরোস বলল মেনোফ্রা যদি তার কাজে নাক গলাতে আসে তাহলে সে তাকে ছেড়ে দেবে না।

এই বলে জোরে হাসতে গিয়ে ফোরোস পড়ে গেল মাটিতে। এমন সময় সকলেই ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে মুখ তুলে তাকাল।

ঘরখানার বাইরে পিছন দিক থেকে সব দেখছিল ও শুনছিল টারজন। সারাক্ষণ নীরবে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে। তবে ফোরোসের কথা শুনে বুঝতে পারল না যে মেয়েটিকে সে আনতে বলল সে মেয়েটি কে।

ঘরের সকলে দরজার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই টারজনও সেদিকে তাকাল। সে দেখল, উঁচু পুরুষালি চেহারার একটি মেয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে টারজন দেখল মেয়েটার গালপাট্টা আর নাকের নিচে স্পষ্ট মোচের রেখা রয়েছে।

টারজন বুঝল এই মেয়েটাই ফোবোসের স্ত্রী মেনোফ্রা।

মেনোফ্রা সোজাসুজি ফোরোসকে জিজ্ঞাসা করল, এই অসময়ে তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন?

ফোবোস অবাক হয়ে গেল। সে ভয় পেয়ে গেল।

ফোরোস বলল, আমরা এই উৎসবে যোগদান করার জন্য তোমাকে ডাকছিলাম।

মেনোফ্রা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, কিসের উৎসব?

ফোবোস তার পাশের লোককে বলল, কিসের উৎসব ক্যাণ্ডো?

ক্যাণ্ডো কি উত্তর দেবে খুঁজে না পেয়ে জিব দিয়ে ঠোঁটদুটো ভিজিয়ে নিতে লাগল।

মেনোফ্রা তীক্ষ্ণগলায় বলল, আমার কাছে মিথ্যা কথা বলো না। আসলে তুমি আমাকে নয়, অন্য কোন মেয়েকে ডেকে পাঠিয়েছিলে।

এরপর যে ক্রীতদাস তাকে ডাকতে গিয়েছিল তার দিকে ঘুরে মেনোফ্রা বলল, বল আমাকে আনতে কি ও পাঠিয়েছিল তোমায়?

ক্রীতদাসটি নতজানু হয়ে বলল, হে মহীয়সী রাণীমা, আমি ভেবেছিলাম উনি আপনাকেই আনতে ওকে কি বলেছিল তোমায়?

উনি বলেছিলেন, 'মেয়েটিকে নিয়ে এস।' আমি যখন ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ মেয়েটি তখন উনি বললেন এ্যাথনিতে ত একটিই মেয়ে আছে।

মেনোফ্রা এবার ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল, এবার বুঝেছি কোন্ মেয়ে। সেই বিদেশী মেয়েটা যাকে দুটো লোকের সঙ্গে ধরা হয়েছিল। অনেকদিন থেকেই তুমি এটা চাইছিলে। কিন্তু সাহস পাওনি।

এরপর মেনোফ্রা উপস্থিত সবাইকে বেরিয়ে যেতে বলল ঘর থেকে। বলল, যত সব শুয়োরের দল। বেরিয়ে যাও ঘর থেকে।

এই বলে সে সোজা ফোরোসের কাছে গিয়ে তার একটা কান ধরে বলল, এই রাজামশাই, তুমি এবার আমার সঙ্গে এস ত।

টারজন এবার সেই ঘরের বাইরে জানালা থেকে সরে গিয়ে দোতলার দিকে তাকাল। তার মনে হলো দোতলার কোন একটা ঘরেই শুয়ে আছে গন-ফালা। চুপ করে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে তার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির দ্বারা উপরতলার ঘর থেকে আসা গন্ধের শ্রেণীবিশ্লেষণ করে দেখতে লাগল সে। নাকডাকার শব্দে সে বুঝতে পারল সে ঘরে কেউ একজন ঘুমোচ্ছে। সে ঘরটা ছিল একেবারে অন্ধকার।

টারজন সেই জানালা দিয়ে উপরতলায় উঠে গরাদহীন জানালার ভিতর দিয়ে দোতলার অন্ধকার ঘরটায় পড়ল।

একটা ঘর থেকে জোর বাক-বিতণ্ডার শব্দ আসছিল। টারজন বুঝল ফোরোস আর মেনোফ্রার মধ্যে জোর ঝগড়া হচ্ছে। হঠাৎ সেই ঘরের মেঝের উপর একজনের পড়ে যাওয়ার শব্দ হলো। তারপরই সব চুপ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফোবোস দরজা খুলে একটা রক্তমাখা তরোয়াল নিয়ে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে আসতে লাগল।

টারজন তখন সেই অন্ধকার ঘরখানার মধ্যে দরজাটা অর্ধেক খুলে তার পাশে লুকিয়ে রইল। সে দেখল ফোরোস সেই বারান্দাটার শেষ প্রান্তে গিয়ে আর একটা বারান্দায় গিয়ে পড়ল। টারজন অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

তারপর দেখল ফোরোস চাবি বার করে একটা ঘরের তালা খুলে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিন্তু দরজাটা বন্ধ করল না। টারজনও দরজা ঠেলে ঘরে মধ্যে নিঃশব্দে এমনভাবে ঢুকে পড়ল যে ফোরোস তা টের পেল না। চবি দিয়ে জ্বালানো একটা প্রদীপের আলোয় স্বল্প আলোকিত ছিল ঘরখানা।

সেই ঘরের এককোণে হাত পা বাঁধা অবস্থায় গনফালা শুয়ে ছিল। আর এক কোণে সেইভাবে শুয়েছিল স্ট্যালনি উড।

ফোরোস হঠাৎ তরোয়ালটা নিয়ে গনফালার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু সে তরোয়ালটা ধরে গনফালাকে হত্যা করার জন্য তুলতেই টারজন সেটা পিছন থেকে কেড়ে নিয়ে ফোরোসকে ফেলে দিল মেঝের উপর।

টারজন চাপা গলায় বলল, চুপ করে থাকবে, তা না হলে তোমায় খুন করব।

ফোরোস দেখল নগ্নপ্রায় এক দৈত্যাকার মূর্তি তারই তরোয়ালটা তার বুকের উপর ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

ফোরোস বলল, কে তুমি? বল কি চাও। তুমি যা চাও তাই দেব, শুধু আমাকে প্রাণে মেরো না।

টারজন বলল, আমি যা চাই তা আমি ঠিক নেব, তুমি নড়বে না।

এই বলে সে প্রথমে উডের ও তারপর গনফালার

বাঁধন কেটে দিল। এরপর উডকে বলল, ফোরোসকে বেঁধে ফেল। তার মুখটাও বেঁধে দাও যাতে চেঁচাতে না পারে।

উড তাই করলে টারজন তাকে বলল, এখানে কি করে এলে?

উড বলল, আমি গনফালার খোঁজ করতে করতে এই নগরে এসে পড়ি। তারপর ওরা বন্দী করে আমায়। স্পাইক ও ট্রোলকেও ওরা বন্দী করে রেখেছে। তাদের কাছ থেকে গনফালটাও নিয়ে নিয়েছে।

এরপর তিনজনেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সহসা বারান্দায় কার পায়ের শব্দ শুনতে পেল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে দরজার সামনে একবার দাঁড়িয়ে তাদের দেখে নিল মেনোফ্রা। তার মাথা ও কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছিল তখনো। তার পোশাকটা রক্তে ভিজে গেছে।

মেনোফ্রা কিছু না বলে দরজাটায় তালা দিয়ে রক্ষীদের ডাকতে গেল।

উড বলল, আমরা বেশ ফাঁদে পড়লাম।

গনফালা বলল, কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য !

উড বলল, রক্ষীরা ছুটে আসছে।

বারান্দায় মেনোফ্রার সঙ্গে রক্ষীদের কথাবার্তা হচ্ছিল।

মেনোফ্রা দরজা খুলে রক্ষীদের বলল, একটা বুনো লোক ঢুকে বন্দীদের মুক্ত করে দিয়েছে আর রাজাকে বেঁধে রেখেছে। ওরা রাজাকে মেরে ফেলতে পারে। আমি সেটা চাই না। আমি নিজের হাতে রাজাকে মারতে চাই। তোমরা বিদেশীদের বন্দী করে রাজাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

টারজন দরজার কাছে গিয়ে রক্ষীদের বলল, যদি তোমরা আমার বিনা অনুমতিতে ঘরে ঢোক তাহলে রাজাকে আমি হত্যা করব।

রক্ষীরা মুস্কিলে পড়ল। কি করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল মেনোফ্রার সঙ্গে।

উড ফোরোসকে বলল, রাণী তোমাকে পেলে মেরে ফেলবে।

কিন্তু মুখ বন্ধ থাকায় ফোরাস কোন কথা বলতে পারল না।

টারজন বলল, ভালথর আমাদের কোনভাবে সাহায্য করতে পারে না ?

উড বলল, তাকে ওরা ক্রীতদাস করে রেখেছে।

টারজন বলল, আমি ক্যাথনিতেই এসব শুনেছিলাম। তাই এখানে এসে ভালথরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলাম।

এমন সময় দরজায় কারা ঘা দিল।

টারজন বলল, কি চাও তোমরা ?

রক্ষীরা দরজা খুলে বলল, রাজাকে রাণীর হাতে তুলে দাও। তাহলে তোমাদের মুক্তি দেওয়া হবে। কোন ক্ষতি করা হবে না।

টারজন তখন উডকে রাজার মুখের বাঁধন খুলে দিতে বলল।

ফোরোস কাতর মিনতির সুরে বলল, আমাকে তোমরা রাণীর হাতে তুলে দিও না। ও আমাকে খুন করবে।

টারজন বলল, আমরা তাহলে একটা চুক্তি করতে পারি।

ফোরোস বলল, যে কোন শর্ত আমি মেনে নেব।

টারজন বলল, আমাদের মুক্তি দিয়ে প্রহরীসহ থেনার উপত্যকা পার করে দিতে হবে।

ফোরোস বলল, কথা দিচ্ছি তাই হবে।

উড বলল, হীরের তালটাও দিতে হবে।

হ্যাঁ, তাই দেওয়া হবে।

টারজন বলল, কি করে জানব তুমি তোমার কাজ করবে ? আমরা তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। তারপর ছেড়ে দেব।

ফোরোস বলল, আমি তোমাদের সব দাবি মেনে নেব। শুধু রাণীর হাতে আমাকে তুলে দিও না।

টারজন বলল, আর একটা কথা। ভালথরকে মুক্তি দিতে হবে।

সে দাবিও মঞ্জুর করলাম।

উড টারজনকে বলল, ফোরোসকে তুমি নগরের বাইরে নিয়ে গেলেই ওরা অন্য কাউকে রাজা করবে।

এরপর সে ফোরোসকে বলল, রক্ষীরা তোমার কথা শুনবে ত ?

ফোরোস বলল, তা ত জানি না। ওরা সবাই রাণীকে ভয় করে।

টারজন এবার ফোরোসের বাঁধন খুলে বলল, আমার সঙ্গে দরজার সামনে চল।

ফোরোস মেনোফ্রাকে বলল, আমার কথা শোন।

মেনোফ্রা বলল, কোন কথা শুনব না, খুনী কোথাকার। আমি শুধু তোমাকে একবার আমার হাতে পেতে চাই।

ফোরোস বলল, আমার কথা শোন। ক্যাণ্ডোকে ডেকে পাঠাও। তাকে সব কথা বল।

মেনোফ্রা রক্ষীদের বলল, কাপুরুষের দল, দেখছ কি ? তাদের টেনে বার করে আন ঘর থেকে।

ফোরোস বলল, থাম তোমরা, এগোবে না। আমি রাজা। রাজার আদেশ।

মেনোফ্রা বলল, আমি রাণী। আমি বলছি যাও, রাজাকে মুক্ত করে আন।

ফোরোস বলল, আমি ঠিক আছি। আমাকে মুক্ত করার প্রয়োজন নেই।

তখন একজন অফিসার গিয়ে ক্যাণ্ডোকে ডেকে আনল।

ক্যাণ্ডো এসে রাণীর সব কথা শুনে রাণীকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কি আলোচনা করল। তারপর সে টারজনের সামনে এসে বলল, সব ঠিক হয়ে গেছে। রাণী অনুমতি দিয়েছেন। তোমরা কাল সকালেই প্রাতরাশ খাওয়ার পর মুক্তি পেয়ে চলে যাবে। তোমাদের সঙ্গে প্রহরী দেওয়া হবে। এখন রাত্রিকাল। তাই বেরোন ঠিক হবে না। শুধু তোমরা কথা দেবে তোমরা রাজার কোন ক্ষতি করবে না।

টারজন বলল, কথা দিলাম।
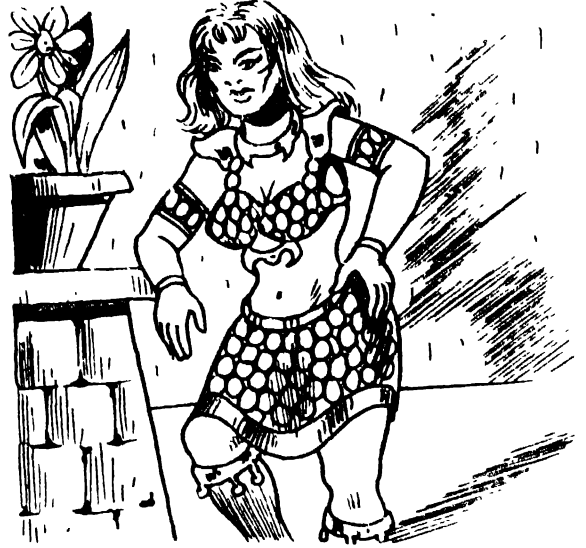
পরদিন সকাল হতেই উডের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে ভাবল সব বিপদ কেটে গেছে একেবারে। সে বলল, এখন আমার ক্ষিদে পেয়েছে। এখন খাবার চাই।

এমন সময় কে একজন দরজার তালা খুলে ছুটো খাবারের থালা ঘরের মধ্যে রেখেই দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

খাবার মানে শক্ত জিনিস কিছু নেই। শুধু দু থালা ঝোল। তরল ঝোলের সঙ্গে কুচি কুচি মাংস মেশানো ছিল। ওরা তিনজনে ভাগ করে তাই খেল।

ফোরোস বলল, এটা খুবই সুস্বাদু খাবার। মেনোফ্রা ভাল খাবারই পাঠিয়েছে।

কিন্তু সে খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম নেমে এল গনফালার চোখে। সে বলল, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। চোখ দুটোকে খুলে রাখতে পারছি না।

উডেরও তাই হলো। উডও তাই বলল।

দেখতে দেখতে সকলেরই চোখ জড়িয়ে এল। গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে উঠল সবাই।

একটি ঘরের মধ্যে খাটের উপর পাতা বিছানায় কনুইএর উপর ভর দিয়ে হাতের তালুতে মাথা রেখে শুয়ে ছিল মেনোফ্রা। দরজার কাছে চারজন যোদ্ধা পাহারায় নিযুক্ত। মেনোফ্রার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ক্যাণ্ডো। তার পায়ের দিকে খাটের নিচে উড আর গনফালা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে ছিল। ফোরোসও অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে ছিল। তবে তাব হাত পা বেঁধে রাখা হয়েছিল।

মেনোফ্রা ক্যাণ্ডোকে জিজ্ঞাসা করল, আমার কথামত বুনো লোকটাকে ক্রীতদাসদের ঘরে বেঁধে রেখেছ ?

ক্যাণ্ডো বলল, হ্যাঁ রাণীমা। সে খুব বলবান বলে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছি।

উডই প্রথমে চোখ খুলল। তার জ্ঞান ফিরলে সে দেখল তার পাশে শুয়ে আছে গনফালা। তার তখনো জ্ঞান ফেরেনি। তবে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটা ওঠানামা করছিল বলে বুঝল সে এখনো বেঁচে আছে।

উড এবার রাণী ও ক্যাণ্ডোর পানে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বলল, এইভাবে তোমরা তোমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করেছ। আমাদের আর একজন কোথায় ?

ক্যাণ্ডো বলল, সে নিরাপদেই আছে। রাণীমা দয়া করে তোমাদেব কাউকেই মারেননি।

উড আবার জিজ্ঞাসা করল, আমাদের নিয়ে কি করতে চাও তোমরা ?

মেনোফ্রা বলল, বুনো লোকটাকে সিংহের মুখে ফেলে দেওয়া হবে। আব আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের হত্যা করা হবে না।

কি তোমার উদ্দেশ্য ?

কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবে।

এই বলে সে ক্যাণ্ডোকে আদেশ করল, একজন পুরোহিতকে ডেকে আন। ফোরোস এখনি জেগে উঠবে।

গনফালা এবার জেগে উঠে বসে বলল, আমরা এখন কোথায় ? কি হয়েছে ?

উড বলল, আমরা এখন বন্দী। ওরা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

গনফালার চোখে জল এসেছিল। উড তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, সাহস অবলম্বন করো, ধৈর্য ধরো।

এমন সময় ফোরোস জেগে উঠল। মেনোফ্রা বলল, ইঁদুরটা জেগে উঠেছে।

ফোরোস বলল, তুমি তাহলে আমাকে উদ্ধার করেছ ?

এখন তা বলতে পার। পরে বুঝতে পারবে।

ফোরোস বলল, ক্যাণ্ডো, আমার বাঁধন খুলে দাও। রাজাকে এভাবে বেঁধে রাখাটা ভাল দেখায় না।

আমার কিন্তু ভালই লাগছে দেখতে। তপু লোহার শিকল দিয়ে তোমাকে বেঁধে রাখা উচিত ছিল।

এমন সময় একজন যোদ্ধা এসে খবর দিল, পুরোহিত এসে গেছে।

মেনোফ্রার আদেশে উড আর গনফালা একটা বেঞ্চের উপর বসল।

পুরোহিত ঘরে ঢুকলে মেনোফ্রা তাকে বলল, এদের বিয়ে দিয়ে দাও।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল উড আর গনফালা। গনফালা বলল, এটা কখনই স্বাভাবিক বিয়ে নয়। এর মধ্যে কোন কুমতলব আছে।

অল্প সময়েব মধ্যেই বিয়েটা হয়ে গেল। বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল মেনোফ্রার মুখে। রাগে লাল হয়ে উঠল ফোরোসের মুখখানা।

বিয়েটা হয়ে গেলে মেনোফ্রা ফোরোসকে বলল, আমাদের দেশের আইন তুমি জান। বাজা বা প্রজা যেই হোক, এদের মাঝখানে এলেই তার মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে। এবাব ফোরোস চিরদিনের মত মেয়েটাকে হারাল। আমি তোমাকে বাঁচিয়ে বাখব। একই ঘরে তুমি মেয়েটার সঙ্গে বাস করবে। কিন্তু খুব সাবধান। আমি তোমার উপব লক্ষ্য রাখব।

এরপব সে বক্ষীদের বলল, এই লোকটাকে ক্রীতদাসদের ঘরে নিয়ে যাও। তবে দেখবে এব যেন কিছু না হয়। আব ফোরোস ও মেয়েটাকে আমাব ঘরের পাশের ঘবটায় তালাবন্ধ করে রাখবে।

এদিকে টারজন জ্ঞান ফিরলে দেখল তার হাত পা শিকল দিয়ে বাঁধা। তার গলায় লোহাব বেড়ী। সে যে ঘরে বন্দী হয়ে আছে সে ঘরে আর কেউ নেই।

সূর্যেব অবস্থান দেখে সে বুঝল খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল এবং সেই খাবার খেয়ে এমন ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল সে। ওষুধের ক্রিয়া এখন শেষ হয়ে গেছে। জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই উড আর গনফালাব জন্য ভাবনা হতে লাগল তার।

সহসা টারজন দেখতে পেল রক্ষীরা উডকে তার ঘরের দিকে নিয়ে আসছে।

উড এসে তাকে বলল, আমি ত ভাবছিলাম তোমাকে ওরা মেরে ফেলেছে।

এরপর যা যা ঘটেছিল তাদের ভাগ্যে সব টারজনকে বলল সে। শেষে বলল, মেনোফ্রা একটা মেয়ে নয়, রাক্ষসী, একটা পশু। কিন্তু ওরা আমাদের না বেঁধে শুধু তোমাকে বাঁধল কেন তার কিছু জান?

টারজন বলল, ওরা হয়ত আমাকে নিয়ে কোন বিশেষ মজা পেতে চায়।

বিকালের দিকে ভালথর এসে দেখা করল টারজনের সঙ্গে। ভালথর বলল, টারজন তুমি?

টারজন বলল, হ্যাঁ ভালথর, আমি।

এরপর ভালথর উডকে বলল, তুমি তাহলে আবার ফিরে এসেছ? আমি ত ভেবেছিলাম তোমাকে আর দেখতেই পাব না। কি হয়েছিল?

উড তাকে যা যা হয়েছিল সব বলল।

ভালথর বলল, মেনোব্রা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন গনফালা নিরাপদ। কিন্তু ক্যাণ্ডো মেনোব্রাকে বেশীদিন বাঁচতে দেবে না। তখন ফোরোস আবার রাজা হবে। সে রাজা হলে সে তোমাকে ধ্বংস করবে। তখন গনফালার আর কোন আশা থাকবে না। ভূতপূর্ব রাজা জাইগো আবার শাসনক্ষমতায় ফিরে না এলে অবস্থার কোন উন্নতি হবে না।

একজন লম্বা নিগ্রো টারজনের কাছে এসে বলল, আমাকে চিনতে পারছ না মালিক?

টারজন বলল, হ্যাঁ পারছি। তুমি হচ্ছ জেম্বা। তুমি ক্যাথনিতে যুডোর বাড়িতে কাজ করতে। কি করে এলে এখানে?

জেম্বা বলল, একবার অভিযানের সময় এরা আমাকে বন্দী করে আনে। সেই থেকে বন্দী হয়ে আছি। এরা বড় নিষ্ঠুর। এখানে খাটুনিও বেশী। আমি এখন ক্যাথনিতে ফিরে যেতে চাই।

টারজন বলল, সেখানে গেলে তুমি স্বাধীনতা পাবে। তোমার পুরনো মালিক এখন ক্যাথনির রাজা হয়েছে।

সে যদি জানতে পারে আমি এখানে বন্দী হয়ে আছি তাহলে সে এ্যাথনির উপর যুদ্ধ ঘোষণা করে আমাকে মুক্ত করবে।

ভালথর বলল, তাহলে ক্যাথনির সেনাদলকে আমরা বরণ করে নেব। কিন্তু তার সম্ভাবনা নেই। কারণ তাকে তোমার সম্বন্ধে কিছু জানাবার কোন উপায় নেই।

টারজন বলল, আমার এই গলার বেড়ীটা একবার খুলতে পারলে আমি নিজে ক্যাথনিতে গিয়ে যুডোর সেনাবাহিনীকে নিয়ে আসতাম। যুডো নিজে এসে আমার বন্ধুদের মুক্ত করত।

দিনকতক এইভাবে কেটে গেল। তবু মনের জোর কমে না টারজনের।

একদিন বিকালবেলায় ক্রীতদাসরা কাজ থেকে ফিরলে কয়েকজন অফিসার এসে প্রতিটি ক্রীতদাসকে গুণে হিসাব নিতে লাগল। সব ক্রীতদাসদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। টারজন জানতে পারল, কয়েকজন ক্রীতদাসের একটি দল পালাবার চেষ্টা করে এবং তাদের হাতে একজন অফিসার নিহত হয়। হিসাব নিয়ে দেখা গেল তিনজন ক্রীতদাস পালিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে জেম্বাও আছে।

অফিসাররা চলে গেলে টারজন দেখল ক্রীতদাসরা সব বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে। একটু উস্কানি পেলেই তাদের চাপা ক্ষোভ ফেটে পড়ে আগুনের মত জ্বলে উঠবে। ভালথর তাদের বুঝিয়ে ধৈর্য ধরে শান্ত হয়ে থাকতে বলল।

ভালথর বলল, এখন আমাদের হাতে অস্ত্র নেই। সুশিক্ষিত সশস্ত্র যোদ্ধাদের সঙ্গে পেরে উঠব না। নগরবাসীদের মধ্যেও দারুণ অসন্তোষ। জাইগো একদিন ফিরে এসে আবার রাজা হবে।

একজন ক্রীতদাস বলল, রাজা যেই হোক, আমাদের ত ক্রীতদাসই থাকতে হবে।

ভালথর বলল, না, জাইগো রাজা হলে তোমরা মুক্তি পাবে। আমি কথা দিচ্ছি।

ক্রীতদাসরা বলল, আমরা একমাত্র তোমার কথায় বিশ্বাস করি।

রাত্রিতে ক্রীতদাসরা তাদের খাবার রান্না করে নিত। হাতির মাংস আর মাঠ থেকে চুরি করে আনা কিছু শাকসব্জী দিয়ে একটা ঝোল রান্না করত ওরা।

টারজন আসার পর থেকে স্প্যাইক খুব ভয় পেয়ে যায়। সে বুঝতে পারে তারা এখান থেকে মুক্তি পেলেও হীরেটা টারজন নিয়ে নেবে। স্টোলের অবশ্য কোন ভয় নেই। তার শুধু একমাত্র চিন্তা তার বোন গনফালার কেউ যেন কোন ক্ষতি না করে। এখনো তার ধারণা গনফালা তার বোন। হীরেটা সম্বন্ধে তার কোন চিন্তা নেই।

একদিন সন্ধ্যার পর একজন অফিসার এসে ভালথরের গলায় একটা লোহার বেড়ী পরিয়ে দিয়ে গেল।

ভালথর অফিসারকে বলল, জানতে পারি কি ফোরোস আমাকে এভাবে কেন সম্মানিত করেছে?

অফিসার বলল, ফোরোস নয়, মেনোফ্রার আদেশ। তিনিই এখন দেশ শাসন করছেন।

ভালথর বলল, ফোরোস তাকে বিয়ে করার আগে মেনোফ্রা ছিল একটা রাস্তার মেয়ে।

ভালথরের গলায় লোহার বেড়ী পরিয়ে দিলে ক্রীতদাসরা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। রাণীর ধারণা ভালথরই ক্রীতদাসদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। তাই তার এই শাস্তি।

উড একদিন জানতে পারল দু একদিনের মধ্যেই টারজন আর ভালথরকে নগরের বাইরে ক্রীড়াঙ্গনে নিয়ে গিয়ে সিংহকে দিয়ে খাওয়ানো হবে। সিংহের
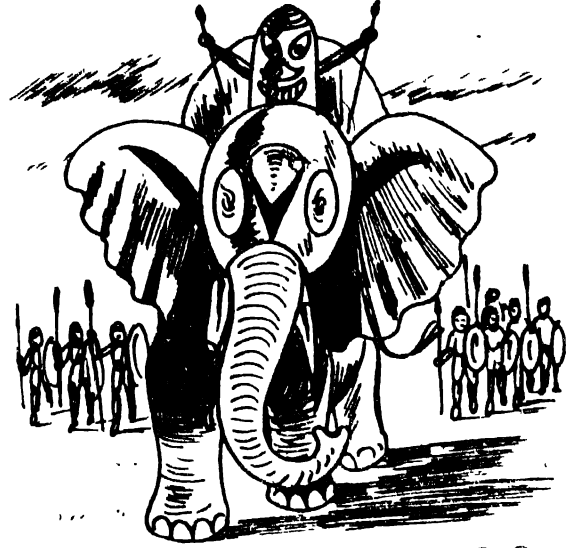
সঙ্গে সকলের লড়তে হবে তাদের। অথবা হাতি দিয়ে পিষিয়ে মারা হবে।

নির্দিষ্ট দিনে বিকেলবেলায় প্রায় পঞ্চাশজন যোদ্ধা এসে টারজন আর ভালথরকে বন্দীশালা থেকে বার করে নিয়ে গেল। প্রাসাদ থেকে এক বিরাট মিছিল বেরিয়ে তা নগরের বাইরে ক্রীড়াঙ্গনে যাবে। তার সঙ্গে নগরের বহু লোক যাবে দর্শক হিসাবে।

প্রাসাদের সামনেই মিছিলটাকে গড়ে তোলা হচ্ছিল। মিছিলে অনেক সুসজ্জিত হাতি ছিল। সেই সব হাতির পিঠে একজন করে গণ্যমান্য লোকদের বসার জন্য একটা হাওদা সাজানো হয়েছিল। সব হাওদাগুলোই খোলা ছিল এবং তাতে কয়েকজন করে বসবে। একটা হাওদা রাণী মেনোফ্রার জন্য বিশেষভাবে সাজানো হয়েছিল। তাতে শুধু রাণী একা বসবে।

একশোটা সুসজ্জিত হাতি সারবন্দীভাবে এগিয়ে চলতে লাগল ধীর গতিতে। সশস্ত্র যোদ্ধারা পায়ে হেঁটে যেতে লাগল। দুপাশে দর্শকরা যেতে লাগল নীরবে।

টারজন দেখল মিছিলটা যতই জাঁকজমকপূর্ণ হোক, তার মধ্যে প্রাণ নেই। জনতার মধ্যে নেই কোন উল্লাস বা হর্ষধ্বনি।

টারজন আর ভালথরকে শৃংখলিত অবস্থায় পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বধ্যভূমির দিকে। তাদের দেখে জনতার ক্ষোভ বেড়ে যাচ্ছিল। ক্রীড়াঙ্গন নয়, যেন এক বধ্যভূমির দিকে নীরব নিষ্প্রাণ একটা মিছিল এগিয়ে চলেছিল ধীর গতিতে।

রাজপথের উপর দিয়ে গিয়ে দক্ষিণ দিকের নগর-দ্বারে গিয়ে পৌঁছল শোভাযাত্রাটা। অবশেষে নগর-দ্বার পার হয়ে পূব দিকে ঘুরে ক্রীড়াঙ্গনে মিছিলটা যেতেই টারজন আর ভালথরকে শোভাযাত্রা থেকে বার করে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। ঢোকার মুখে অনেক সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা ছিল।

আরো অনেক বন্দীকে টারজনদের কাছে আনা হলো। ভালথর টারজনকে বলল, এরা হচ্ছে সেই সব সামন্ত যারা এরিথরাদের দলে যোগদান করেনি। ফোরোস আর মেনোফ্রা মনে করে সব সামন্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের হত্যা করে তারা নিষ্কণ্টক হয়ে উঠবে। তাদের বিরোধিতা করার আর কেউ থাকবে না। কিন্তু এভাবে শত্রুর শেষ করা যায় না। শত্রুর শেষ করতে গিয়ে আরো শত্রু বাড়াচ্ছে।

কুস্তিখেলা অর্থাৎ নিধনযজ্ঞ শুরু হলো। হাতির পিঠ থেকে নেমে মেনোফ্রা রাজার জন্য নির্মিত মঞ্চে গিয়ে বসল।

টারজন ভালথরকে বলল মোটা লোকটাকে সহজেই মারতে পারত ও।

পরের প্রতিযোগী ছিল একজন বৃদ্ধ লোক আর একটা সিংহ। বৃদ্ধের হাতে ছিল শুধু একটা ছোরা।

টারজন বলল, সিংহটাও বুড়ো। তার অনেকগুলো দাঁত নেই।

ভালথর বলল, তবু লোকটাকে মেরে ফেলার মত শক্তি ওর আছে।

সেই রক্ষীটি তখন টারজনের পাশ থেকে বিদ্রূপের সুরে বলল, তুমি কি সিংহটাকেও মেরে ফেলতে পারবে নাকি?

টারজন বলল, সম্ভবতঃ পারব।

একথা শুনে হো হো শব্দে হেসে উঠল রক্ষীটি।

সিংহটার হাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যু ঘটল বৃদ্ধটির। এবপরই হায়ার্কের সঙ্গে টারজনের লড়াইএর অনুমতি দিল মেনোফ্রা। অফিসার অনুমতি পেয়ে ঘোষণা করল, একদিনের মধ্যে দুটো লোককে মারতে পারলে হায়ার্ককে ক্যাপ্টেন করবে রাণী মেনোফ্রা।

সেই রক্ষী তখন অফিসারকে বলল, এই বুনো লোকটা বলছে সিংহটাকেও মারতে পারবে ও।

অফিসার বলল, তার আগে হায়ার্কই ত ওকে

মেবে ফেলবে। তাহলে কি করে বুঝব ও সিংহ মারতে পারবে।

টারজন চীৎকার করে বলল, একই সঙ্গে হায়ার্ক আর সিংহটার সঙ্গে লড়াই করব অবশ্য হায়ার্ক যদি সিংহ দেখে ভয় না পায়।

অফিসার উৎসাহিত হয়ে বলল, তাহলে ত খুব ভাল কথা। এখনই অনুমতি নিয়ে আসছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে মেনোফ্রার অনুমতি নিয়ে এল অফিসার।

হায়ার্কের কিন্তু এ প্রতিযোগিতায় মন ছিল না। সে মেনোফ্রাকে জানাল তার স্ত্রী অসুস্থ। তাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে তখনি। কিন্তু মেনোফ্রা বলল, সে যদি বুনো লোকটার সঙ্গে লড়াই না করে তাহলে তাকে সে খুন করবে।

টারজনকে একটা ছোরা দেওয়া হলো। লড়াই শুরু হয়ে গেল। একটা সিংহকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য লোক চলে গেল। হায়ার্ক ভাবল সিংহটা আসার আগেই টারজনকে মেরে ফেলতে পারলে তার আর কোন ভয় থাকবে না। তাই সিংহটা আসার আগেই সে তার বর্শাটা সজোরে ছুঁড়ে দিল টারজনের খোলা বুকটা লক্ষ্য করে।

কিন্তু টারজন এক আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বর্শার বাঁটটা ধরে ফেলল। তারপর বর্শাটাকে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিল। হায়ার্ক তখন তার তরবারিটা বার করতে গেল। কিন্তু আগেই টারজন লোহার মত শক্ত হাত দিয়ে তাকে ধরে বন্‌বন্ করে ঘোরাতে লাগল। দর্শকরা হর্ষধ্বনি করে অভিনন্দন জানাল টারজনকে।

এমন সময় সিংহটা টারজনের দিকে আসতে লাগল। টারজন তার ছোরাটা আগেই ঢুকিয়ে রেখেছিল তার কৌপীনের মধ্যে। তাতে দর্শকরা আরো আশ্চর্য হয়ে যায়।

টারজন তার পরিকল্পনা মত হায়ার্ককে ধরে সিংহের দিকে ছুঁড়ে দিল। হায়ার্ক উঠেই প্রাণভয়ে ছুটতে লাগল। টারজন জানত ছুটন্ত লোককে আগে ধরে সিংহরা। হলোও ঠিক তাই। হায়ার্ক যদি একপাশে দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে সিংহটা টারজনকেই ধরতে যেত। হায়ার্ক সিংহটার সঙ্গে ছুটে পেরে উঠল না। এক লাফে তাকে ধরে তার মাথাটা চিবোতে লাগল সিংহটা। মেনোফ্রার মঞ্চের কাছেই হায়ার্ক ধরা পড়ে সিংহের হাতে।

টারজন এবার ফেলে দেওয়া বর্শাটা কুড়িয়ে নিয়ে সিংহটার কাছে নির্ভয়ে চলে গেল। সিংহটা তখন হায়ার্কের মৃতদেহটাকে খাচ্ছিল। তার কাছে গিয়ে টারজন হাত থেকে বর্শাটা ফেলে দিয়ে সিংহটার কেশর আর তার পিঠের আলগা চামড়া ধরে তাকে মৃতদেহটা সমেত শূন্যে তুলে ফেলল। তারপর তার অতি-মানবিক শক্তির সাহায্যে সিংহটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে মেনোফ্রার মঞ্চের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। চেয়ারসমেত উল্টে পড়ে গেল মেনোফ্রা। কিন্তু তার কোন ক্ষতি হলো না। কারণ সিংহটা ভয়ে আর্তনাদ করছিল। সে উঠেই মুক্তির জন্য পালাতে লাগল।
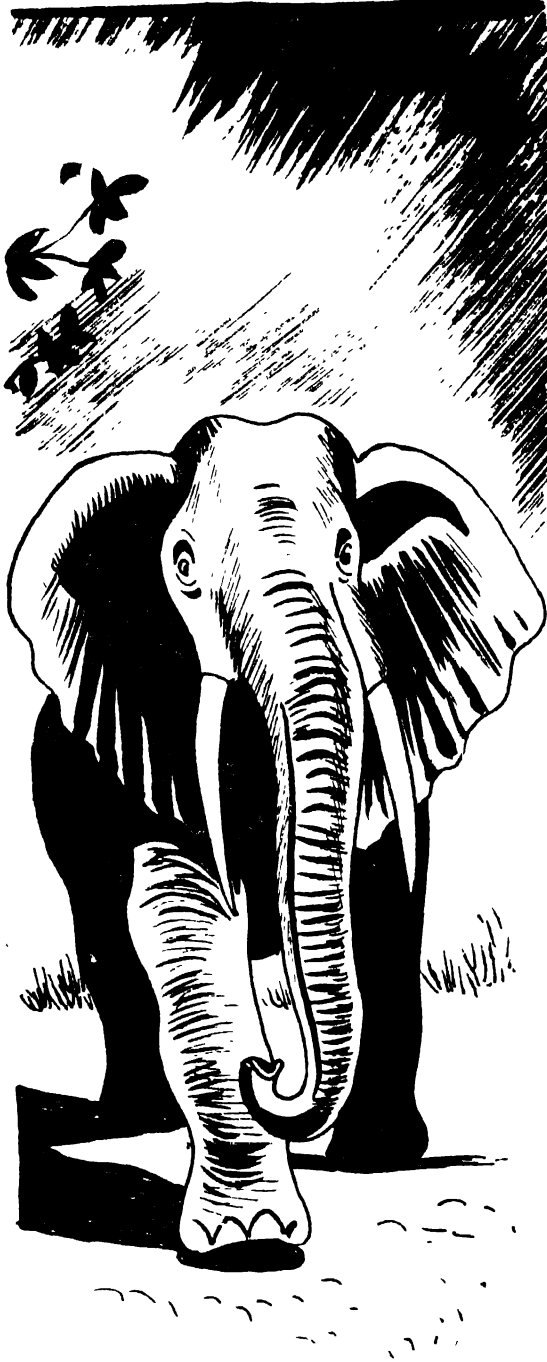
চারদিকের তুমুল চীৎকার ও হৈচৈ স্তব্ধ হয়ে গেলে ভারপ্রাপ্ত অফিসার টারজনের কাছে এসে জানাল, তুমি সিংহটাকে মেনোফ্রার চেয়ারের উপর ফেলে না দিলে মেনোফ্রা তোমাকে মুক্তি দিত। এখন ও তোমাকে অবিলম্বে মারার জন্য আদেশ দিয়েছে। তোমাকে হাতির পায়ের তলায় পিষে মারা হবে।

রঙ্গভূমির কেন্দ্রে টারজন আর ভালথরকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাতিটা প্রথমে ওদের দেখতে পায়নি। সে পালাবার পথ খুঁজছিল।

হাতিটা হঠাৎ টারজনদের দেখতে পেয়ে শুঁড় দুলিয়ে সেইদিকে আসতে লাগল।

টারজন দেখল হাতিটার একটা দাঁত কালো। তা দেখে ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, একদিন ও এই হাতিটাকেই গর্ত থেকে উদ্ধার করেছিল। গর্তের উপর দাঁড়িয়ে কয়েকটা হায়েনা অট্টহাসি হেসেছিল। মাথার উপর শকুনি উড়ে বেড়াচ্ছিল।

হাতিটা গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছিল। টারজন তখন কিছুটা তার দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা হাত তুলে তাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল ডাণ্ডো টান্টর! টারজন হো!

সে ডাক শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল সেই বিরাট হাতিটা। ভালথরকে তার পিছু পিছু আসতে বলে টারজন হাতিটার কাছে গিয়ে তার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে তাকে বলল, টারজন! টারমাঙ্গানি!

হাতিটা তখন একে একে টারজন আর ভালথরকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে পিঠের উপর তুলে নিল। টারজন তখন পশুদের ভাষায় পালিয়ে যেতে আদেশ করল এবং হাতিটা তার কথা বুঝল।

কাঠের বেড়া ভেঙ্গে হাতিটা বেগে চলে গেল ক্রীড়াঙ্গনের সীমানার বাইরে। এ্যাথনির যোদ্ধারাও মিছিলের হাতিগুলোর পিঠে চেপে তাদের ধরতে বেরিয়ে গেল।

টারজনরা আধ মাইল যাবার পর দেখল একদল হাতির পিঠে চেপে এ্যাথনির যোদ্ধারা তাদের ধরতে আসছে। টারজন বলল, পিঠে পাঁচ ছজন করে লোক আছে। ওদের আসতে দেরী হবে।

ভালথর বলল, আর আধ ঘণ্টা যেতে পাবলে আমাদের আর ধরতে পাববে না।

একসময় হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল। টারজনকে বলল, ঐ দেখ, একদিকে হাতির দল আর একদিকে ক্ষুধিত সিংহের মাঝখানে পড়ে গেছি আমবা।

মুখ ঘুরিয়ে দেখল টারজন, ভয়ঙ্কর একদল সিংহ নিয়ে ক্যাথনি থেকে এক সেনাবাহিনী আসছে এ্যাথনিব দিকে।

ভালথব বলল, একটা উপায় আছে। পূবদিকের পাহাড়গুলোর দিকে হাতিটাকে চালিয়ে নিয়ে যাও। সেখানে গিয়ে জাইগো আর তার অনুচরদের সঙ্গে কথা বলব।

টারজন বলল, ক্যাথনি থেকে যারা আসছে তারা আমাদের বন্ধু। ওদেব কাছ থেকে পালাব কেন?

ভালথব বলল, তবে তোমাকে চিনতে পারার আগে যেন শিকাবী সিংহগুলোকে ছেড়ে না দেয়।

টারজন হাতিটাকে কি বলতে সে তাদের নামিয়ে দিল। তারপর টারজন হাতিটার কানে কানে কি বলতে সে মুখ ঘুরিয়ে এ্যাথনির হস্তীবাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য ছুটে গেল।

টারজন বলল, আমরা অন্ততঃ কিছুক্ষণ সময় পাব।

ক্যাথনির যোদ্ধাদের মধ্য থেকে একজন অফিসার টারজনকে তাদের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে ছুটে এল টারজনেব কাছে। টারজন দেখল সে হলো জেমনন। সে বলল, আমরা ত তোমাকেই উদ্ধার করতে যাচ্ছি। আমি দূর থেকেই তোমাকে দেখতে পাই।
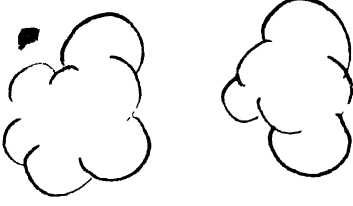
টারজন বলল, কি করে জানলে আমি বন্দী হয়ে আছি ?

জেম্বা পালিয়ে যায় এখান থেকে। সে-ই খবর দেয় আমাদের। জেম্বা যুডোকে খবর দেয় তোমাকে ওরা হত্যা করবে।

টারজন বলল, আমার তুতিনজন বন্ধু এখনো বন্দী হয়ে আছে এ্যাথনিতে। তবে ফোরোসের একদল সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় এখানেই পাবে।

যুডোও এগিয়ে এসে ওদের অভ্যর্থনা জানাল। যুডো ও জেমনন ভালথারকে চিনত। তারা তুজনেই ভালথারকে অভ্যর্থনা জানাল।

যুডো বলল, এ্যাথনির আগেকার সামন্তদের প্রতি আমার সমর্থন আছে।

ভালথর বলল, 'যুডো আমাদের সহায় আছে। আমরা জাইগোকে আবার সিংহাসনে বসাব। তোমাদের সিংহবাহিনীকে ছেড়ে দাও।

এদিকে কালো দাঁতওয়ালা বুনো হাতিটা এ্যাথনির হস্তীবাহিনীকে আগেই ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। অনেক যোদ্ধা হাওদা থেকে পড়ে গেছে। আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে অনেক হাতি মরে গেছে।

এমন সময় ক্যাথনির শিকারী সিংহরা হাতিগুলোর পিঠে লাফ দিয়ে উঠে যোদ্ধাদের ছিঁড়ে খুঁড়ে খেতে লাগল। তারা হাতিগুলোর কোন ক্ষতি করল না। হাতির পিঠ থেকে নেমে এ্যাথনির যোদ্ধারা বর্শা নিয়ে আক্রমণ করার আগেই ক্যাথনির পদাতিক সৈন্যরা আক্রমণ করল। এ্যাথনির সৈন্যরা নগরে না গিয়ে বিভিন্ন দিকে পালাতে লাগল।

যুডো তার বিজয়ী বাহিনীকে নিয়ে এ্যাথনিতে প্রবেশ করল। টারজন আর ভালথার সঙ্গেই ছিল। কেউ তাদের বাধা দিল না।

তারা গিয়েই প্রথমে উড, স্পাইক আর ট্রোলকে মুক্ত করল। তারপর উডকে নিয়ে তার প্রাসাদের মধ্যে গনফালার খোঁজে চলে গেল। রক্ষীরা ভয়ে পালাতে লাগল।

গনফালা যে ঘরে বন্দী ছিল সে ঘরের তালা ভেঙ্গে ঢুকে ওরা দেখল ছুরি হাতে ফোরোসের মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে আছে গনফালা। উডকে দেখতে পেয়েই গনফালা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

গনফালা বলল, মেনোফ্রা মরে যাওয়ায় ফোরোস আমায় জ্বালাতন করতে থাকে। তাই তাকে আমি হত্যা করেছি।

জাইগোকে ডাকিয়ে আনিয়ে তাকেই এ্যাথনির সিংহাসনে বসানো হলো।

টারজন এক সপ্তাকাল এ্যাথনিতে থেকে গেল। তারপর তার বাড়ির দিকে রওনা হলো টারজন। নগরের বাইরে গিয়ে দক্ষিণ দিকে এগোতে লাগল তারা। কিছুদুর যাবার পর মুভিরোর সঙ্গে দেখা হলো তাদের। একশোজন যোদ্ধার এক দল নিয়ে টারজনের খোঁজে আসছিল মুভিরো।

স্পাইক আর স্টোলকে এই শর্তে মুক্তি দিল যে তারা সোজা কোন উপকূলে চলে যাবে এবং তারা কখনো আফ্রিকায় আসবে না। উড আর গনফালা টারজনের সঙ্গে তাদের বাড়িতে যাবে।

স্পাইকের কাতর অনুনয় বিনয়ে হীরের তালটা তাকে দিয়ে দিল টারজন। ওরা চলে গেলে উড আর গনফালা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে টারজন হেসে বলল, ওটা আসল গনফাল নয়। আসলটা আমার বাড়িতে আছে। ওটা নকল গনফাল মাফকার কাছে থাকত। পান্নার তালটাও আমি উদ্ধার করে পথে এক জায়গায় পুঁতে রেখেছি।